মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

উত্তর ভাগ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট

কলিকাতা;

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

এল, এন, প্রেস,—২৪, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৮ সাল।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ উত্তর ভাগের সূচীপত্র।

বিষয়	সর্গ	পৃষ্ঠা।

বিষয়	সর্গ	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

উত্তর ভাগ।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যদি দেহ ও প্রাণাদির উপর অহম্ভাবাদি কল্পনার পরিহার ও সর্ব্বকর্ম্ম বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে তো দেহীর দেহই থাকিবার নয়; সুতরাং জীবিতাবস্থায় কল্পনা পরিহার কিরূপে সম্ভবপর হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কল্পনাত্যাগ জীবদ্দশাতেই তো হয়; অজীবিতের তাহা সম্ভবে না। রামচন্দ্র! কল্পনাত্যাগের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা তুমি অবগত হইতে পার নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি তাহাই বলি, তুমি সেই শ্রবণভূষণ তত্ত্ব শ্রবণ কর। যে সকল সুধী কল্পনাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অহম্ভাবকেই কল্পনা নামে নির্দ্দেশ করেন। ঐ অহম্ভা-বকে যে অপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মাকাশরূপে ভাবনা, তাহারই নাম কল্পনা ত্যাগ, কল্পনাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে বাহ্য পদার্থের অনুভবই কল্পনা। আর ঐ বাহ্যার্থের অনুভবকে আকাশরূপে অবধারণ করাই কল্পনা ত্যাগ। এই দেহাদি দৃশ্য বস্তুর প্রতি যে একটা আত্মাভিমান, তাহাই সাধু সুধীগণের মতে কল্পনা। এই কল্পনাত্যাগ—কেবল মাত্র সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিন্ন শূন্য ব্রহ্মভাবে ভাবনা করা বৈ আর কিছুই নয়। কেবল যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বর্ত্তমান দৃশ্য বস্তুর ভাবনাই কল্পনা বা 'সঙ্কল্প, তাহা নহে, ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ন্যায় তুমি অপরোক্ষজ্ঞান-স্মৃতিকেও কল্পনা বা সঙ্কল্প বলিয়া অবধারণ করিও। সাধুগণ বিদিত আছেন—উক্ত স্মৃতির অভাবই শিবব্রহ্ম। স্মৃতি কি? অতীত ও অনাগত বিষয়ের ভাবনাই স্মৃতি। হে মহামতে! তুমি

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয়ের ভাবনা একেবারেই পরিত্যাগ কর, এবং সমস্ত দৃশ্য বস্তু বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মাকারে লীন করত একেবারে কাষ্ঠবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত হও। সমস্ত বস্তু-বিস্মৃতিই তোমার রূপ হউক। তুমি তদবস্থায় অর্দ্ধসুপ্ত শিশুর স্পন্দ ক্রিয়ার ন্যায় অযত্নোপস্থিত অভ্যস্ত নিত্য কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করিয়া যাও। যেমন কুম্ভকারচক্রের কোনই কল্পনা নাই, অথচ অভ্যাসবশে নিত্যই সে ঘূর্ণমান হইতে থাকে, হে অনঘ! তুমিও তেমনি কোন সঙ্কল্প না করিয়া অভ্যাস বা পূর্ব্বসংস্কারাগত নিত্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাক। তোমাতে চিত্ত বিদ্যমান নাই; বাসনা-বিরহিত চিত্তের সংস্কারমাত্রই তোমাতে অবস্থিত। ঐ সংস্কারপ্রবাহে যে সকল কর্ম্ম আপতিত হইবে, তুমি সেই সেই স্বকর্ম্ম-করণেই কেবল স্পন্দশালী হইও। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছি, তথাচ আমার এ হিতকথা বোধ হয় কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। যাহা হউক, আমি এ কথা বলিতে বিরত হইব না যে, সঙ্কল্পত্যাগই পরম শ্রেয়স্কর। এই শ্রেয়স্কর বিষয় অন্তরে ভাবনা করিতেছ না কেন? অহো! মোহই এইরূপ ভাবনায় অন্তরায়। মোহের কি এ অদ্ভুত মাহাত্ম্য!—নিখিল দুরিত-দুঃখহারী বিচার-চিন্তামণি হৃদয়ে বিরাজিত রহিলেও লোকে তাহা দূরে পরিহার করিতেছে।

রামচন্দ্র! তুমি অসঙ্কল্পনা ও অভাবনাময় হইয়া অবস্থিত হও। এ যাবৎ আমি যাহা বলিয়া আসিলাম,—তাহা সত্য সত্যই শ্রেয়স্কর কি না, তাহা নিজেই একবার অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া দেখ। ভাবো, যে পরম পদের নিকট সাম্রাজ্য-সম্ভোগও তৃণবৎ অসার—অকিঞ্চিৎকর; মাত্র তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেই তাহা যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আর তাহা না করে কে? দেশান্তর-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পথিক পদসঞ্চালন করে; কিন্তু সেই পদচালনে যেমন সঙ্কল্প কিছুই নাই, তেমনি সেই পথিক-পদসঞ্চালনবৎ বিনা সঙ্কল্পে তুমি কর্ম্ম করিয়া যাও। সমস্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সুপ্ত জনবৎ কেবল সংস্কারবশে সমুপনীত কর্ম্মমাত্রেরই অনুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি স্থাপন করিও না। বুদ্ধিস্থাপন করিবার পাত্র—সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশ। তৃণাদির যেমন আপনা

হইতে কোন স্পন্দনাদি চেষ্টা নাই, অন্য বস্তুর সংযোগ বা বায়ুচালনেই তাহা স্পন্দিত হয় মাত্র, তেমনি তুমি কোন সঙ্কল্প বা সুখদুঃখাদির ভাবনা না করিয়া অবুদ্ধিপূর্ব্বক সংস্কারবশে সমাগত কর্ম্মেই কেবল স্পন্দিত হও। কাষ্ঠপুত্তলী দর্শকের কৌতুকের জন্য নৃত্য করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার যেমন নটজনবৎ রসজ্ঞান হয় না, তেমনি তোমাকেও বলি, তুমি যখন কর্ম্ম করিবে, তখন মূর্খজনের ন্যায় তোমারও যেন রসবোধ না হয়, তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিচয় হেমন্তকালীন তরুনিকরের ন্যায় নীরস হইয়া যাউক, তাহারা আকারমাত্রেই লক্ষিত হউক বৃক্ষ যেমন শীতে সৌরাতপে নীরস লতায় জড়িত হইয়া নিজেও নীরস হইয়া পড়ে, তুমিও তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উত্তাপ-শুষ্ক প্রাণাদি ষড়্‌বর্গের সত্তামাত্র লইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকা হেন সম্পন্দে বিরাজ কর। হেমন্তকাল যেমন বাহ্য রস-হীন তথা অন্তঃসরস তরুনিকর ধারণ করে, তুমিও তেমনি নিরাবরণ ইন্দ্রিয়-বর্গকে অন্তরে চিৎরসে সরস করিয়া ধারণ করিতে থাক। তোমার ইন্দ্রিয় যদি বাহ্যরসে সরস হয়, তাহা হইলে তোমার কর্ম্ম করা বা না করা, কিছুতেই এই সংসারের অনর্থসার্থ নিবৃত্তি পাইবে না। যদি বায়ু, বহ্নি ও জলাদি অচেতন পদার্থবৎ তুমি অসঙ্কল্প হইয়া স্পন্দশালী হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত শ্রেয়োলাভ হইবে। বাসনা-বিরহিত অবস্থায় অভ্যাসের বশে আপনার ব্যবহারকর্ম্মে কর্ত্তৃতাই পরম ধৈর্য্য। এইরূপ ধৈর্য্য হইতেই জন্ম-জ্বরের নিবারণ। বাসনারে বিসর্জ্জিয়া—সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, যথালব্ধ কর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক কুলালচক্র-ভ্রমের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মে স্পন্দশালী হও। তোমার বুদ্ধি যেন কর্ম্মফলের দিকে আকৃষ্ট হয় না। কর্ম্মত্যাগ-জনিত ফলেরও তুমি আকাঙ্ক্ষা করিও না। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্মকরণ অথবা না করণ উভয়ই তুল্য হইয়া থাকে। সুতরাং যদি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে কর্ম্ম করিতে থাক কিম্বা পরি-ত্যাগ কর, যাহা ইচ্ছা সেইরূপই তোমার কর্ত্তব্য হইতে পারে। অধিক কি কহিব, সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, সঙ্কল্পই মনের বন্ধন; আর সঙ্কল্পের যে অভাব, তাহারই নাম মোক্ষ। এ জগতে কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই নাই; আছেন মাত্র সেই একাদ্বয় আত্মা। তিনি শিব, শান্ত, অজ, সর্ব্বগময়

ও অনন্ত। সুতরাং তুমি নূতন কিছুই হইবে না; তুমি যেমন, তেমনই ভাবে অবস্থান কর। কর্ম্মেকে অকর্ম্ম আর অকর্ম্মকে কর্ম্মরূপে তুমি ভাবনা করিতে থাক। ফলে কর্ম্মই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আর নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তুমি যথাস্থিত চিৎস্বরূপেই সুখে বিরাজিত হও। সাধুগণ জানেন,—দৃশ্য পদার্থের অভাবনাই চিত্তক্ষয় এবং তাহাই অকৃত্রিম যোগ; সুতরাং তুমি একান্তে তাদৃশ যোগেই তন্ময় হইয়া অবস্থান কর। একত্ব-দ্বিত্ব-বর্জ্জিত সম শান্ত বিশুদ্ধ অনন্ত আত্মতত্ত্বই আছে; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই যখন নাই, তখন কাহার আর কি খেদের বিষয় থাকিতে পারে? মরুস্থলীতে অঙ্কুরোৎপত্তি না হইবার ন্যায় তোমাতে সঙ্কল্পোদয় না হউক, কিম্বা পাষাণোদরে লতিকার ন্যায় তোমাতে ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভবই হউক, তুমি যখন দৃশ্য পদার্থের ভাবনা-বিরহিত শান্ত ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহ, তখন তুমি জীবিত বা অজীবিত, যে কোন দশাতেই থাক, তোমার কোন কার্য্যে কিম্বা অকার্য্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম অকর্ম্ম, উভয়েরই যখন তুমি বাধস্বরূপ, এবং নিত্য অভেদরূপ, তখন প্রাতিভাসিক কর্ম্মস্বরূপ হইলেও বাস্তব পক্ষে তোমাতে কোন কর্ম্মত্ব নাই এবং কর্ত্তৃরূপে বিবর্ত্তমান হইলেও বস্তুতঃ তোমাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। সত্য কথা বলিতে কি, যে পর্য্যন্ত 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তুমি দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে না। যখন ঐ জ্ঞান অন্তর্হিত হইবে, তখনই তোমার দুঃখমুক্তি ঘটিবে। সুতরাং এখন তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তদনুসারে কার্য্য কর। সত্যই বলিতেছি, আমি বা আমার বলিয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই,--আছেন কেবল সেই এক পরমাত্মা; তিনি অদ্বিতীয়, পরাৎপর, শান্ত, শিব। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রাতিভাসিক দৃশ্য বস্তুর আবির্ভাব। কিন্তু এই দৃশ্য অলীক বস্তু; ইহার স্বরূপ কিছুই নাই। এই যে জগদভিধেয় দৃশ্যবস্তু আছে, ইহা প্রকৃত পক্ষে কনকের বলয়াকৃতির ন্যায় সেই শান্ত শিব আত্মা হইতে অপৃথক্ বস্তু। ইহাকে পৃথক্‌রূপে অবিদিত হওয়াই ইহার ক্ষয়; ইহাই সাধুগণের মত। এই জগদাখ্য বস্তুর ক্ষয় ঘটিলেই এক মাত্র সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম পরিশিষ্ট রহেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহাই আত্মস্বভাবে অবস্থিত—যাহা অদ্বৈত, একত্ববিশিষ্ট, শান্ত ও মনন-বর্জ্জিত। যেমন পঙ্কময় সৈন্য—পঙ্কেরই রূপান্তর, তেমনি সেই জগৎও শান্ত শিব আত্মারই বিবর্ত্ত মাত্র। মন বল—অহঙ্কার বল আর বুদ্ধি প্রভৃতি রূপ-সম্পন্ন চিত্তই বল, সকলই আত্মময়। এই কাল, আকার, ক্রিয়া ও শব্দ শক্তি প্রভৃতি সমস্তই ঐ শিবাত্মায় নিবদ্ধ। রূপ, আলোক ও মনঃ প্রভৃতি সমস্তই সেই শিবাত্মরূপ পঙ্কময়। অর্থাৎ আত্ম-পঙ্কেরই বিকার মাত্র। কাজেই রূপাদি তন্ময় অনন্ত বলিয়া উহার কে কিরূপ অনুভব করিবে? প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, দেশ, কাল, দিক্, ভাব, অভাব ও বিবর্ত্তাদি সকলই সেই শিবাত্ম-পঙ্কময়। সুতরাং সর্ব্বসার আত্মস্বরূপ পরমেশ হইতে পৃথগ্‌ভূত 'অহং' 'মম' ইত্যাকার আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাই বলিতেছি, তুমি তোমার চিত্তকে আসক্তিশূন্য কর এবং অনাসক্ত হইয়া শিলাখণ্ডবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত হও।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! 'অহং' 'মম' ইত্যাকার অলীক ভাবনা যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ যদি কর্ম্ম করেন, তাহা হইলেই বা কি অশুভ হইবে আর যদি নাই করেন, তাহাতেই বা কি শুভপ্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা? আমার ধারণা হয়, কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মকরণ, এই দুইই তাঁহার পক্ষে তুল্য মূল্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! আমি তোমার নিকট একটী তত্ত্ব-কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি জান, তবে বল দেখি কর্ম্ম কি? কর্ম্মের বিস্তারই বা কীদৃশ? এবং তাহার মূলই বা কি? আর সেই মূলের বিনাশ করিতে হইলে কিরূপেই বা তাহার বিনাশ করিতে হয়?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহা নাশনীয়, তাহা সমূলেই নাশ করিতে হয়, তাহার শাখাদি ছেদনে ফল কিছুই হয় না। যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি স্বীয় শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম সমূলেই নাশ করিয়া থাকেন। আর

তাঁহার সেই কর্ম্ম অনায়াসেই আমূল নষ্ট হইতে পারে। হে ব্রহ্মন্! কর্ম্মবৃক্ষের মূল সকল সমুৎপাটিত করিতে পারিলে, ঐ বৃক্ষ আর কখনই অঙ্কুরিত হয় না। এক্ষণে ঐ কর্ম্মবৃক্ষের মূল কি, তাহা বলি শুনুন।

হে ব্রহ্মন্! আমি বুঝিয়াছি, এই দেহই কর্ম্ম-বৃক্ষ। এই বৃক্ষের উৎপত্তিস্থান সংসার-কানন। এই যে কর-চরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এ সকল ইহার শাখা-প্রশাখা। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এ দেহের বীজ এবং সুখদুঃখ ফলরাজি। যৌবন শোভার বিস্তারে এই দেহবৃক্ষ ক্ষণেকের তরে মনোরম হয়, এবং জরারূপ কুসুমসমূহে উহা বিকসিত হইয়া উঠে। এ বৃক্ষে একটা মর্কট আছে, তাহার নাম কাল। সেই কাল-মর্কট বড়ই উদ্ধত; সে প্রতি মুহূর্ত্তে এই বৃক্ষ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতেছে। নিদ্রা যেন হেমন্ত ঋতু; সেই ঋতুতে উহার স্বপ্ন-রূপ দলরাজি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বার্দ্ধক্য যেন শরৎকাল, সে কাল আসিলে এ দেহ-বৃক্ষের চেষ্টারূপ পর্ণদল ঝর-ঝর করিয়া ঝরিতে থাকে। এই জগৎ একটা বৃহৎ জঙ্গল; এই জঙ্গল-মধ্যেই ঐ দেহবৃক্ষের উৎপত্তি। কলত্র সকল যেন উপতৃণ; তাহারা এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া বিরাজিত হয়। হস্ত, পদ ও পৃষ্ঠাদি ইহার অরুণবর্ণ পল্লব-দল; এবং উহাদের তলভাগই ঈষদারক্ত সুরেখান্বিত চঞ্চল পত্র। যাহার মধ্যে স্নায়ু ও অস্থি জড়িত, তথাবিধ মৃদু মসৃণ অঙ্গুলীদল এই দেহবৃক্ষের সমীর-সঞ্চালিত বাল-পল্লব। এই যে দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ দর্শনীয় কোমল মসৃণ তীক্ষ্ণাগ্র নখরপঙক্তি, এ সকল ইহার কলিকা-রাজি। এই কলিকাগুলি এক এক বার উৎপন্ন হয়, আবার ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপে দেহ-বৃক্ষ-রূপে সমুৎপন্ন কর্ম্মসমূহের মূল হইল—কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল। ঐ মূলসমূহের মধ্যে যাহারা সচ্ছিদ্র, তাহারা কামাদি সর্প-সমূহে দূষিত আর যে সকল মূলের ছিদ্র নাই, তাহারা গ্রন্থিশালী; ইহাদের মধ্যে কোন কোন মূল সুদৃঢ় অস্থি-গ্রন্থি-যোগে সম্বদ্ধ এবং কোন কোন মূল পঙ্ক-মগ্ন। উহার আপন রক্তরূপ রসধারা বাসনা দ্বারা পীত হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, দেহীরা বাসনার বশেই কর্ম্ম-লিপ্ত হয় এবং তাহাতেই দেহের রক্ত শুকাইয়া ফেলে। উহার কতিপয় মূল গুল্‌ফযুক্ত পাদেন্দ্রিয়; তাহারা বিলক্ষণ সুদৃঢ়, সুত্বক্‌শালী ও মসৃণ। এই সকল

কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ মূলসমূহেরও অনেকগুলি মূল আছে; তাহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক মূল সকল বহু দূরস্থিত বিষয়ে সমুৎপন্ন হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদিগকে সহজে গ্রহণ করা যায়। চক্ষুর্গোলকাদি করিয়া যে পঞ্চবিধ স্থান আছে, ঐ ইন্দ্রিয়মূল সকল সেই সেই স্থান আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। উহারা বাসনারূপ পঙ্কমধ্যে মগ্ন থাকে, উহাদের সরসতা ও বিপুলতা বিরাজমান। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় নামক মূলেরও আবার মূল আছে, সে মূল ত্রিভুবনব্যাপী মন। ইহা বিপুল শুণ্ডাকারে বিরাজিত। এই মূল পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ শিরার সহায়তায় রূপাদি কত অনন্ত রস আকর্ষিয়া ভোগ করে এবং পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই যে মনোমূলের কথা কহিলাম, ইহারও আবার মূল আছে; এ মূলের নাম জীব। বিষয়োন্মুখ চিদাত্মাই ঐ জীব নামে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যত কিছু মূল আছে, সকলেরই এক মাত্র কারণ ঐ চেতন। উহা নিখিল চিত্তের নিদান। আবার ঐ যাহাকে চেত্যোন্মুখী চিৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও নির্ম্মূল নহে; তাহার মূল আছে। সেই মূল সেই পরাৎপর ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কি মূল আছে? না—তাঁহার মূল নাই—তিনি সম্পূর্ণ নির্ম্মূল। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, নাম নাই, তিনি বিশুদ্ধ সত্য-স্বরূপ।

এইরূপে বলা যায়, বিষয়োন্মুখী চিৎই নিখিল কর্ম্মের বীজ। এই বীজের সত্তাতেই দেহাকার বিশাল বিটপশালী শাল্মলীতরুর আবির্ভাব। জীবচৈতন্য অহঙ্কারাদি যোগে যৎকালে কর্ত্তা হইয়া 'অহং' ভাবনায় আবলিত হয়, তখন উহা কর্ম্মের বীজস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। নচেৎ উহা সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপেই বিরাজ করে। চৈতন্য যখন চেত্যাকার ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়েন, তখনই কর্ম্মের বীজরূপে বিভাত হন। অন্যথা, তিনি যে পরম পদ, সেই পরমপদরূপেই বিরাজমান। হে মুনীন্দ্র! দেহাদি অহম্ভাবাকার স্বীয় বেদনই কর্ম্মসমূহের কারণ; এই কারণ-তত্ত্ব আপনিও আমাকে উপদেশকালে বলিয়া দিয়াছেন। ফলে আমার নিরূপিত কর্ম্মমূল আপনারই অভিমত।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাঘব! দেহের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত এই বেদনাত্মক সূক্ষ্ম কর্ম্মের ত্যাগই বা কি, আর অনুষ্ঠানই বা কীদৃশ? চিৎ অন্তরে বাহিরে যেরূপ অনুভব করেন, তাহা অসত্য হইলেও ভ্রমের বশে তদাকারে পরিদৃশ্যমান হন এবং তৎক্ষণাৎ সত্য হইয়া পড়েন। তিনি যদি তথাবিধ অনুভব না করেন, তবে আর ঈদৃশ ভ্রমে পতিত হন না। চিত্তের এই প্রকার ভ্রম সত্য কি অসত্য, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, ঐ চিৎই উল্লিখিত ভ্রান্তিরূপে বিকসিত হইয়া উঠেন। বাসনা বল, ইচ্ছা বল, মন বল, কর্ম্ম বল, আর সঙ্কল্পই বল, এ সকল ঐ চিত্তেরই নামান্তর মাত্র। দেহীর এই দেহগৃহের স্থায়িত্ব যতকাল, ততকাল ঐ দেহী প্রবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ যাহাই কেন হউক না, উহার চিত্ত থাকিবেই। চিত্তকে ত্যাগ করা কিছুতেই হইয়া উঠিবে না। বিশেষ কথা এই যে, চিত্ত লইয়াই যখন জীবন, তখন জীবদ্দশাতেই বা তাহার পরিত্যাগ কিরূপে উপপন্ন হইবে? তবে এই মাত্র হয় যে, আমি অসঙ্গ অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্য—আমি নিষ্ক্রিয়, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে কর্ম্মশব্দের প্রতিপাদ্য যে বিষয়, তাহার ভাবনা যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই কর্ম্ম বা কর্ম্মরূপ বিকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ নিজেই অজ আত্মরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। ইহা ভিন্ন আর যতই উপায় থাকুক, কোন কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর নহে। অন্য কোনওরূপ উপায়যোগে যদি কর্ম্মত্যাগ করিতে যাওয়া যায়, তবে তাহা কিছুতেই হইবার নয়। এই দৃশ্য প্রতিভাসের যখন আপনা হইতেই বাধ-ঘটনা হয়, এ জগতের একান্ত অসত্তা তখনই অনুভূত হইয়া থাকে। সেই কালেই প্রকৃত চিত্তত্যাগ হইয়া উঠে। সেই যে ত্যাগ, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, আর তাহাই প্রকৃত মোক্ষ; ইহাই সাধুগণের মত। অনুভবযোগ্য দৃশ্য পদার্থ থাকিলেই তাহার অনুভব হইয়া থাকে; নচেৎ হইবার নহে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে অনুভাব্য পদার্থের জ্ঞান মোটেই ছিল না। সুতরাং অনুভবার্হ পদার্থের বিলয় ঘটিবার পর তাহার অনুভব বা জ্ঞানের থাকিবার স্থান কোথায়? অতএব জ্ঞানের যে জ্ঞেয়োন্মুখী ভাব, তাহাকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে তাহার যে স্বরূপ-স্থিতি,

তাহা জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই নহে; তাহা শান্ত ব্রহ্মশব্দেই অভিহিত হইয়া পড়ে। চিদাভাসাত্মক চেতনকেই কর্ম্ম বলা হয়; কেন না, তাহারই বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকর ব্যাপারে জল-বিম্বিত অভ্রের ন্যায় এই জগদাখ্য মিথ্যা প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে হইলে গোক্ষকে অচেতনস্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাই বলিয়া থাকেন। কাজেই যে পর্য্যন্ত দেহের স্থিতি, ততকাল কর্ম্মত্যাগ কিছুতেই হইতে পারে না। যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে কর্ম্মকে গ্রহণ করে, কর্ম্মের মূলত্যাগ তাহারা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারে না। বাসনাত্মক মনের সম্বিৎই স্ব স্ব কর্ম্মের মূল। তত্ত্ববোধ ব্যতীত আদেহ ঐ সম্বিৎ ত্যাগ সম্ভবপর নহে।

রামচন্দ্র! উল্লিখিত সম্বিৎ হইতেই বাসনাদি অপরাপর কর্ম্মমূল সকল সমুৎপাদিত হয়। স্বীয় যত্নপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যিনি মূলাজ্ঞান সহ চিদাভাসরূপা সম্বিৎকে বিচালিত করিতে পারেন, তিনি স্বযত্নে অননুসন্ধানযোগেই উহাকে উৎপাটিত করিতে সক্ষম। ফলে, সম্বিদের অনুসন্ধান বিনা উহা আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যায়। এই সংসার-বৃক্ষের মূলোচ্ছেদও উল্লিখিত ব্যক্তি দ্বারা সহজেই হইতে পারে। যাহাতে চিদাভাস নাই, স্বজাতীয় ভেদ-ভিন্নতা নাই, বা কোন প্রকার দৃশ্য নাই, একমাত্র সেই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান। সেই আকাশই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন,—তিনিই চেতনসমূহের সারস্বরূপ।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অবেদনের বেদন করা হয় কি-রূপে? অসতের ভাব ও সতের অভাব তো কিছুতেই হইবার নহে?

বশিষ্ঠ কহিলেন—রামচন্দ্র! অসতের ভাব আর সতের যখন অভাব নাই, তখন বেদনের অবেদনত্ব সুকর হওয়াই সম্ভবপর। জানিবে—বেদন-

শব্দ ও তদর্থ রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রম ও মৃগতৃষ্ণায় জলপ্রতীতির ন্যায় অসত্য। উহার জ্ঞানই দুঃখের কারণ এবং অজ্ঞানই শ্রেয়স্কর। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! যিনি কূটস্থ আত্মরূপ, তাঁহাকেই তুমি জানিবার চেষ্টা কর। যাহা অসৎ দৃশ্য, তাহাকে আত্মরূপে অবগত হইও না। বেদন বা জ্ঞান-শব্দের অর্থাববোধ করাই জীবের দুঃখ-নিদান; সুতরাং উহার অর্থাববোধ বর্জ্জন করিয়া তুমি যথাস্থিত ভাবেই অবস্থিত হও। সমস্ত দৃশ্য পদার্থের বোধরূপ ব্যবহারদশায় যদি উল্লিখিত অর্থাববোধের উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি ব্যবহারিক জ্ঞপ্তি শব্দার্থকে চিৎস্বরূপে ভাবিয়া ও তাহাতেই মুক্তির অভ্যুদয় নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্ষেপ-বিরহিত-ভাবে ব্যবহার-পরায়ণ হও; বিবেকের আশ্রয় লইয়া স্বীয় শুভাশুভাত্মক কর্ম্ম নাশ করা একান্তই কর্ত্তব্য। নাস্তি ইত্যাকার জ্ঞানে যখন তত্ত্ববোধ সমুদিত হয়, তখনই ঐ কর্ম্মনাশও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মের মূল যে কালে সমূলে উন্মূলিত হইয়া পড়ে, তখনই সংসারশান্তি হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহার মূলোচ্ছেদ ঘটে, ততদিন নিয়ত তত্ত্ববিচারে নিরত থাকাই কর্ত্তব্য। বিল্বাভ্যন্তরের মজ্জা তদভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, তাহা যেমন বিল্ব হইতে অভিন্ন, তেমনি চিদাকার আত্মা আপনাতে যে চিন্তাখ্য ত্রিপুটী করেন, তাহা কিছু মাত্রেই চিদাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ভূলোকান্তঃপাতী জম্বুদ্বীপাদি বিভাগ যেমন ভূর্লোক হইতে অভিন্ন, তেমনি আকাশান্তর্গত ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জও পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক্। জল ও জলান্তর্গত দ্রবত্ব যেমন পরস্পর অভিন্ন বস্তু, তেমনি চিন্ময়ত্ব ও চিত্ত এই উভয়ই একই পদার্থ। জলে দ্রবত্ব ও তেজে আলোকের ন্যায় পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব উভয়ই বিদ্যমান। দৃশ্যনিচয়ের প্রকাশ করাই চিত্তের কর্ম্ম। ঐ দৃশ্যোদয় কূটস্থ চিৎ হইতে ভ্রমপ্রতীত যক্ষবৎ বৃথাই হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহার অনুদয়ই প্রসিদ্ধ; সুতরাং কর্ম্ম নাই, ইহাই নিশ্চিত। যেমন চেতন ও দৃশ্যপ্রকাশ, পবন ও পবনস্পন্দবৎ অপৃথক্, তেমনি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায় প্রতীয়মান পদার্থপরম্পরাও আত্মা হইতে অভিন্ন। ফলে ঐ সকলই আত্মা বৈ আর কিছুই নয়। দেহই সর্ব্বকর্ম্মের বিস্তার এবং

অহম্ভাবই সংসার। যদি চিদাভাসাত্মক ক্রিয়ার সমূলে সমুচ্ছেদ করা যায়, তাহা হইলেই নিস্পন্দ পবনবৎ উহা শান্ত হইয়া থাকে। এইরূপে এই চিদাভাসের উচ্ছেদ হইলেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অনন্ত আত্মা হইয়া উপলবৎ অটলভাবে বিরাজ করেন। তাই বলিতেছি, হে রাঘব! বরাহ যেমন বিশাল দন্তযোগে মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক মুস্তাদির মূলোত্তলন করে, তেমনি তুমি সংসারের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলো। ঐ রূপে যদি মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলেই কর্ম্মবীজের মূলোচ্ছেদ তোমার করা হইবে। ইহাই এ পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়; এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

হে রঘুনাথ! ঐরূপ চেষ্টা করিতে করিতে নিত্য তোমার অন্তর-বস্থিত দৃশ্য পদার্থসমূহের অনুভূতিরূপ কর্ম্মবীজ সম্পূর্ণই শান্ত হইয়া যাউক। উক্ত কর্ম্মবীজের বর্জ্জনে ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত চিদাভাসাত্মক সমস্ত ইদৃশ্য প্রপঞ্চ-বিলীন হইয়া থাকে। সে সময়টা এমনই যে, তখন আর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য কোন কিছুই থাকে না; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সে কালে শান্তভাবে বিরাজ করেন। ত্যাগ কিম্বা গ্রহণ যে কি, তাহাও তিনি আদৌ অবগত হইতে পারেন না। তিনি আকাশবৎ শূন্যহৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকেন। যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহাই কেবল আচরণ করিয়া যান। ঐ যথালব্ধ কর্ম্মও তিনি এতদূর সাবধানতার সহিত করেন যে, একটুকু পরে সে কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আর মনেই হয় না। নদীর প্রবাহের উপর কাষ্ঠখণ্ডাদি কত কি বস্তু পতিত হয়; কিন্তু তাহারা যেমন স্বস্ব চেষ্টার অভাব সত্ত্বেও স্পন্দমান হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি মনোবিকারের ব্যতিরেকে সুপ্ত-বালবৎ স্পন্দনশীল হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, তাঁহারা যখন বাহ্যিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহাদের মন তাহাতে লিপ্ত হয় না, মনের গতি সে কালে স্থির হইয়া থাকে। তিনি কি করিলেন বা না করিলেন, তাহা তাঁহাদের মন মোটেই জানিতে পারে না। যে কালে বিষয়বিরহিত নিতান্ত আনন্দরস উপলব্ধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল আনন্দোপভোগের জন্য প্রধাবিত হইলেও রাগসম্পর্ক না থাকায় তাহারা স্বস্ব বিষয় প্রকাশে অক্ষমতা নিবন্ধন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই প্রকার অনির্ব্বচনীয়

আনন্দের অনুভবই কর্ম্মত্যাগ; এই ত্যাগ তত্ত্বজ্ঞানের লাভে আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞগণের দেহ স্পন্দরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান উভয়ই সমান হইয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান ও জ্ঞেয় শূন্য হইয়া বাসনা-বিরহিত-ভাবে কৃতাকৃত কর্ম্মের অনুসন্ধানপূর্ব্বক শান্তভাবে যে অবস্থিতি, তাহাকেই কর্ম্মত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম-সমূহের চির-বিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভ-মধ্যবৎ নিশ্চল নিস্পন্দভাবে যে অবস্থিতি, তাহারই নাম কর্ম্মত্যাগ। যাহারা বিপরীত বোধে অভ্যাসকে ত্যাগ বলিয়া বুঝে, কর্ম্মত্যাগরূপ পিশাচী আসিয়া সেই সকল মূর্খ পশুদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। যাহারা সমূলে কর্ম্মোন্মূলনপূর্ব্বক শান্তি লাভ করে, তাহাদের কর্ম্মন কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠানের কোনই আবশ্যক হয় না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম কর্ম্মবীজ সমূলে সমুৎপাটিত করিয়া সমাহিতভাবে পরব্রহ্মে অবস্থান করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানিগণ প্রবাহ-পতিত কর্ম্মে 'আমার' ইত্যাকার অভিমান রাখেন না। তাঁহারা তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র স্পন্দিত হইয়া থাকেন। যে কালে তাঁহারা মোক্ষ-লক্ষ্মীরূপিণী কামিনীর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের আনন্দের উন্মাদনা এতই উপস্থিত হয় যে, মনে হয়—তাঁহারা যেন মদিরাপানেই মত্ত হইয়াছেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের এতই আনন্দ হয়, সে আনন্দে তাঁহারা এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের দেহাদির অস্তিত্ব-বোধ একেবারে নাই বলিয়াই তখন মনে হয়। যেমন অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধপ্রসুপ্ত ব্যক্তি, তাঁহারা তেমনই হইয়া কোন এক অদৃষ্ট ভূমিতেই যেন উপনীত হইয়া থাকেন। যাহাকে সমূলে পরিত্যাগ করা হয়, তাহাই প্রকৃত পরিত্যক্ত, আর মূলোচ্ছেদ না করিয়া যে পরিত্যাগ, তাহা কেবল শাখাচ্ছেদ-মাত্রবৎ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মবৃক্ষের শাখা হইতে আরম্ভ করিয়া মূলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব যদি সমূলে সমুৎপাটিত করিতে না পারা যায়, তবে উহা পুনর্ব্বার সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দুঃখের নিমিত্তই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! বেদনত্যাগের যেরূপ ক্রম কথিত হইল, উক্ত ক্রমে ঐ ত্যাগ সম্পন্ন হইলেই কর্ম্মত্যাগ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কর্ম্মত্যাগ

সিদ্ধির বেদনত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাই বলিতেছি, তুমি উক্ত প্রকার উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত হও। এইরূপে যাহারা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মান্তর-করণে অগ্রসর হয়, ফলে যাহা ত্যাগযোগ্য নয়, তাহাই করিতে যায়, তাহারা আকাশের বিনাশকার্য্যেই লিপ্ত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তগণ ইচ্ছাবর্জ্জিত; তাঁহারা মহাড়ম্বরে কোন কর্ম্ম করিলেও তাহা অক্রিয়াস্বরূপ হয়। কারণ, কর্ম্মের বীজ-বাসনা; সে বাসনা তাঁহাদের কৃতকর্ম্মে একেবারেই নাই; তাহা পূর্ব্বেই তাহাদের দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ভোগাসক্তির সহিত রসভাবনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। সুদাম-যোগে জড়িত কূপঘটী যদি জল উত্তোলনপূর্ব্বক শস্যক্ষেত্রে জল-সেচনানন্তর শস্যোৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই তাহার সাফল্য হয়, অন্যথা অনর্থক দৈহিক চেষ্টারূপ কর্ম্ম নিষ্ফলই হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে একবার যদি কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়, তখন সেই বাসনাবর্জ্জিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি গৃহে কিম্বা অরণ্যে যেখানেই বাস করুন, অথবা দরিদ্র বা ধনাঢ্যই হউন, তিনি সমভাবেই অবস্থান করেন। যিনি উপশান্ত-পদে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট গৃহই জনসমাগম-হীন সুদূরকানন-স্থানীয়; আর যাহার শমত্ব লাভ ঘটে নাই, তাহার পক্ষে যাহা নির্জ্জন গভীর অরণ্যময়, তাহাও জনতাপূর্ণ নগরীবৎ প্রতিভাত হয়। যিনি শান্তচেতা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার হৃদয়েই নির্ম্মল বিশাল বনভূমি; সে ভূমি অতীব মনোহারিণী। মানব তাহাতে স্বপ্নেও প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহার জ্ঞানাগ্নি দাহে দৃশ্য প্রপঞ্চ ভস্মীভূত ও তৎসহ সেই জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পক্ষে এই সমগ্র বিশ্বই শূন্যময় অবিস্পান্দ মহারণ্য। সেই যে তাঁহাদের অরণ্য—সংসারের কোন বস্তুর সহিতই তাহার সম্বন্ধ-সম্পর্ক থাকে না। যাহার তত্ত্বজ্ঞান আদৌ নাই, যে একান্তই মূঢ়গতি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখিল ব্যাপারই তাহার অন্তরে অবস্থিত। অনন্ত সঙ্কল্প-কল্পনাই ঐরূপ অবস্থিতির মূল। এই সসাগরা সমগ্র ধরা উল্লিখিত মূঢ়মতির হৃদয়েই বিরাজিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞান এবং হীন, তাহার হৃদয়েই এই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বপরিপূর্ণ আড়ম্বরযুত নানা গ্রামশ্রেণী বিদ্যমান। এই নানা কার্য্য-বিকার-দশাময়ী নানা নগর-পত্তনপর্ব্বতশালিনী

ধরণী, অজ্ঞ জনের মলিন-হৃদয়েই মুকুরতল-গতা প্রতিকৃতির ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখন অহন্তাবাদি জড় পদার্থপুঞ্জের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। স্নেহক্ষয়ে দীপ-নির্ব্বাণবৎ সমস্ত দৃশ্য পদার্থের যে ত্যাগ, তাহাই হইল মোক্ষ। কর্ম্মত্যাগ যে প্রকৃত ত্যাগ, তাহা বলা যায় না; যাঁহাতে জগৎস্ফূর্ত্তি নাই, অহঙ্কারাদি যাবতীয় জড় পদার্থের যিনি অতীত, তথাবিধ অবিনশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, আত্মাই সম্যক্ ত্যাগ পদার্থ। ফলে তিনিই প্রকৃত মুক্তিস্বরূপ। দেহপ্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি আর জাগতিক বস্তুতে আত্মার ভোগ্য বলিয়া ধারণা একেবারে অপগত হইলে—তৈল-পরিহীন প্রদীপ-বৎ সম্পূর্ণ নির্ব্বাণপথে উপনীত হইলে, একমাত্র নিত্যোদিত চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাই মাত্র অবশিষ্ট রহেন। এই অবস্থার নামই পরম নির্ব্বাণ অবস্থা। দেহে যে আত্মবুদ্ধি হয় এবং জগতে যে মমত্ব জ্ঞান জন্মে, তাহা যাহার না সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায়, কি জ্ঞান, কি শান্তি, কি ত্যাগ, কি নির্ব্বৃতি, কিছুই তাহার ঘটে না। দেহাত্মবুদ্ধির অপগম, এবং জগতে যে মমত্ব জ্ঞানের অবসান, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই শিবাত্মরূপে পরিণাম। এই অবস্থাতেই আশার অবসান হইয়া যায়। 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব যখন তত্ত্বজ্ঞানবলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জগতের প্রতি মমত্ববুদ্ধি থাকে না। সে কালে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধ অপগত হইয়া যায়। এ জগৎ তখন নির্ব্বাণঘন চিদাকারে বিরাজ করে। কোথাও কিঞ্চিৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। নিরহন্তাবের ভাবনা করিতে করিতে তাহা হইতেই অনায়াসে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়। এই অহঙ্কারনাশই মোক্ষোপায়। এই বিষয়ে আর বহুতর শ্রম-ক্লেশসাধ্য উপায় স্বীকারের আবশ্যক নাই।

অহংবোধ ও নিরহংবোধ উভয়ই ভ্রম। বাস্তব পক্ষে চিৎস্বভাবের অতিরিক্ত সত্তা উহার নাই। চিৎস্বরূপ আকাশবৎ সুনির্ম্মল। তাহাতে ভ্রমের সম্ভাব হইবে কিরূপে? ভ্রম, ভ্রমের হেতু, ভ্রমের কার্য্য এবং ভ্রমের কর্ত্তা কিছুই নাই। এ সকলই কেবল অজ্ঞান। যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইবে, তখন আর ঐ সমস্ত তোমার কিছুই থাকিবে না। সকলই চিদাকার। সেই সত্য চিন্মূর্ত্তিই অসদাকারে প্রতীয়মান। তাই বলিতেছি, তুমি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান কর। সকলই সত্য চিদাকার; সুতরাং সকলই নির্ব্বাণস্বরূপ। যে নিমেষে অহংবুদ্ধির উদয় হয়, সেই নিমেষেই যদি নিরহং-বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই আর শোক করিতে হয় না।

এইরূপে সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত নিরহংভাব আনয়ন করিতে হয়। সেই নিরহংভাবের প্রভাবেই অহংবুদ্ধিকে আকাশ-কুসুমবৎ করিয়া লইয়া রণে শরাসনারূঢ় অর্জ্জুন-বাণবৎ অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মপদ দৃঢ়রূপে অবলম্বন-পূর্ব্বক নিশ্চল স্থিতি লাভ কর। যেমন আকাশকুসুম অলীক পদার্থ, তেমনি এই অহংবুদ্ধিকে তুমি অলীক বলিয়া ভাবনা করিবে; কোনরূপেই কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইবে না। এই ভাবেই তুমি ভবাম্বুধির পরপারে উপনীত হও। মাত্র স্বীয় স্বভাবের জয়কার্য্যেই যাহার বীরত্ব নাই, বল দেখি—তথাবিধ পশুর উত্তম পদ প্রাপ্তি বিষয়ে কি কথা আছে? যিনি সুপণ্ডিত—স্বয়ং কামাদি রিপুষড়্বর্গ জয় করিতে সক্ষম, তিনিই কেবল পরম ফলের অধিকারী। যে মানব কামাদিরে জয় করিতে পারে না, সে তো গর্দ্দভোপম; পরম ফলের অধিকারী হওয়া তাহার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। নিজের অন্তঃকরণের বলে যিনি মনোজয়-ব্যাপারে নিরত, অথবা যিনি আপন মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তিনিই প্রকৃত পুরুষ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সমুদ্রসলিলে শিলাখণ্ডবৎ যে যে বিষয়ই তোমাতে নিক্ষিপ্ত হউক, আত্মার নির্লিপ্ততার বিষয় চিন্তা করিয়া সেই সকল হইতে নিজেই তুমি দূরে অবস্থান করিতে থাক। যখন যুক্তিতর্কের উপন্যাসে—বিচারালোচনায় অহম্ভাব নিবৃত্ত হয়, তখনই চিদানন্দ-সুখ উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় মোহের কবলে

পতিত হইবার আর কোনই কারণ থাকে না। কটকাদি অলঙ্কার-নিকরের কনকভাব ব্যতীত যেমন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তেমনি অজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যবস্তু-সমূহেরও পৃথক্ সত্তা অসম্ভব। দৃশ্য পদার্থপুঞ্জের স্মরণ-বর্জ্জনেই তোমার অজ্ঞান নাশ ঘটিবে। সমীরে যেমন চাঞ্চল্যোদয় হয়, তেমনি তোমাতে যখন যে ভাবের উদয় হইবে, অহম্ভাবের পরিহাররূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের প্রভাবে সে সমুদায়ের আশ্রয় তুমি-নষ্ট করিয়া ফেলো। লোভ, লজ্জা, মদ ও মোহ এই সকল জয় করিতে যে ব্যক্তি পারে নাই, অধ্যাত্মশাস্ত্র লইয়া আলোচনা করা তাহার পক্ষে নিষ্ফল। পবনে যেমন স্পন্দশক্তি, তেমনি তোমাতে এখন যে অহম্ভাব বিরাজ করিতেছে, যদি পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইতে পার, তবে বায়ু হইতে স্পন্দশক্তির বাস্তব অভিন্নতার ন্যায় অহম্ভাবেরও তোমা হইতে পার্থক্য রহিবে না। যেমন মাল্য-বিলীন ভ্রান্ত সর্প, তেমনি কূটস্থ চিন্মাত্রের প্রভাবে এই জাগতী সৃষ্টি পরমাত্মায় লীন ও আশ্রয়াকারে পর্য্যবসিত হইয়া প্রতিভাত হয়। পরমাত্মার কদাচ উদয় বা অস্ত নাই। তাঁহা হইতে ভিন্ন পদার্থও কিছুই নাই। সুতরাং ভাবাভাব বা উৎপত্তি লয় আত্মার আছে কি? জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল ভাব যখন তত্ত্বজ্ঞানের বলে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শান্ত শিব পূর্ণ পরতত্ত্বই অবস্থিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সূর্য্যে নিশাসম্পর্ক নাই; তাহাতে নিশাসম্পর্ক যেমন ভ্রমকল্পিত, নির্ব্বাণহীন ব্রহ্মে নির্ব্বাণ সম্বন্ধও তেমনি ভ্রান্তি-বিলসিত। ফল কথা এই যে, নির্ব্বাণ হইল ব্রহ্মেরই স্বরূপ; কিন্তু তাহা তাঁহার ধর্ম্ম বা ফল নহে। শান্ত ব্রহ্মে যে শান্তিলাভ, তাহাও নূতন ব্যাপার নহে; ব্রহ্ম পরমানন্দরূপ, তাঁহাতেও আনন্দাবাপ্তি নূতন কিছুই নয়, ফলে ব্রহ্মের স্বরূপ সকলই। আকাশাদি যে কিছু পদার্থ, তাহারাও অসত্য; সুতরাং তাহার নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণও অনির্ব্বাণই। শস্ত্রাঘাত সহ্য করা যায়—রোগের যাতনা সহনীয় হইয়া থাকে; কিন্তু মনস্তাপের নিবৃত্তি মাত্র কি এতই ক্লেশকর যে, তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করা যাইবে না? এই জগৎপদার্থের অঙ্কুর—অহম্ভাব, সেই ভাবটাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিতে পারিলেই জগৎও নির্ম্মূল হইয়া যায়। বাষ্প অসার হইলেও তাহা যেমন সারবান্ বস্তুর ন্যায় আদর্শকে মলিন করিয়া

তুলে, আবার সেই বাষ্পের অপগমে আদর্শ যেমন সুনির্ম্মল হয়, তেমনি অহঙ্কার অসার হইয়াও স-সার পদার্থের ন্যায় জীবকে মলিন করিয়া ফেলে; কিন্তু ঐ অহঙ্কার যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে আত্মা প্রসন্ন হইয়া উঠেন। পরমাত্মা পবনস্বরূপ; তাহাতে অহম্ভাবই যেন স্পন্দশক্তি। এই শক্তির অপগম ঘটিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা—অনাভাস, অনির্দ্দেশ্য, অজ, অব্যয়, অনন্ত আকাশমাত্র। অগ্রে অহম্ভাবই চিদাত্মায় দ্রব্যাভাস প্রতি-ভাসিত করে, পরে সেই অহম্ভাব যখন চলিয়া যায়, তখন ঐ চিৎশক্তি নিরাভাস, অজ, অনন্ত অব্যয়রূপেই প্রতিভাত হন। অহম্ভাবরূপ নিবিড় জলদজাল অপগত হইলে পরমাত্মরূপ শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডল পরম শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্ম যেন সুবর্ণ; উহা চিরদিন অহম্ভাবরূপ তাম্রমলের সংসর্গে থাকিয়া জীবভাবাকারে তাম্রভাব প্রাপ্ত হয়; তদীয় প্রকৃত স্বরূপ তিরোহিত হইয়া যায়; পরন্তু যখন ঐ অহম্ভাবরূপ তাম্রমল লুপ্ত হয়, তখন তিনি পরমোজ্জ্বল কান্তিপুঞ্জময় হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। যেমন সৈন্ধব-করকাদি নামের নিবৃত্তিঘটনায় সেই সেই নামের অর্থসম্পত্তিও অনির্দ্দেশ্য হয়, তেমনি অহম্ভাব তিরোহিত হইলে, চিৎশক্তিও অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম ভাব লাভ করেন। অহম্ভাবস্থ ব্রহ্মেরই পদার্থান্তরবৎ নাম-সম্বন্ধ হয়। যেমন বিলুপ্ত বীচিমালা কারণাকারে পর্য্যবসিত হইয়া জলাখ্যায় অভিহিত হয়, তেমনি ব্রহ্মও বিশেষ বিশেষ নামনিচয়ে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। জগতের মূল অহম্ভাব; যদি বাসনার অভাবে তাহা বিনষ্ট হয়, তবে কি তুমি, কি আমি, কি জগৎ, কি বন্ধন, এই এই প্রকার বিচার নিরর্থক হইয়াই পড়ে। যদি ঘটাকারে পরিণতি হয়, তাহা হইলে ঘটের উপাদন মৃদাদির যেমন বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে, অহম্ভাবের উদয়ে সৎব্রহ্ম, শিব ও আত্মভাবাদিরও তেমনি ঘটনা হয়। অহম্ভাব যেন বীজ; তাহা হইতে সত্তারূপিণী বিশ্ব-লতার উৎপত্তি; এই যে চরাচর অনন্ত জগৎ, ইহা ঐ লতার ফলস্বরূপ। এই সকল আসিতেছে; যাইতেছে। ভূধর, সাগর, ধরণী, নদী, বহিরিন্দ্রিয়, মন, রূপ, আলোক ও কামনা ইত্যাদি সমস্তই অহম্ভাবরূপ উল্লিখিত মরীচবীজের চমৎকার কৃতি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য,

পবন, গগন, গিরি, নদী, দিঙ্মণ্ডল, এই সকলই অহম্ভাবরূপ প্রস্ফুটিত পুষ্পের উৎকট সৌরভ। রূপ, দর্শন ও চেতনা, এতদুভয়ের হেতু যেমন দিনপ্রবৃত্তি, তেমনি এই যে জগৎসৃষ্টি, ইহার হেতুও অহম্ভাব বিস্তৃতি। দিবসের প্রবর্ত্তনায় যেমন পদার্থ প্রকাশ হয়, তেমনি অহম্ভাব হইতেই এই অসৎ জগৎ বিকাশ পাইতে থাকে। ব্রহ্ম যেন জলরাশি, তাহাতে অহম্ভাবরূপ তৈলবিন্দু পতিত হইয়া সহসা বিস্তার প্রাপ্ত হয়। এ হেন বিস্তার-প্রকারই এই ত্রিজগৎচক্র! অহম্ভাব দৃষ্টি-প্রসারণবৎ উন্মেষ-মাত্রেই এই অসত্য জগৎ সত্য বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু উহার তিরোভাব হইলেই আর কিছুই অনুভূত হয় না! নিত্য জ্ঞানের মাহাত্ম্যে যখন এই অহম্ভাব নির্ম্মল হয়, তখন এই সংসারমরীচিকা সম্পূর্ণরূপেই অপসৃত হইয়া যায়। নিত্যসিদ্ধ আত্মচৈতন্যই প্রধান বস্তু; তাহাই একমাত্র প্রার্থনীয় এবং ভাবনা মাত্রেই তাহা প্রাপ্তব্য। ইহার জন্য তুমি খেদ কিম্বা ভ্রম প্রাপ্ত হইও না।

হে নিষ্পাপ রাম! ঐ অহম্ভাব বর্জ্জন করিতে হইলে সহায়াদি সাধনসামগ্রীর প্রয়োজন হয় না; স্বীয় যত্নমাত্রেই ঐ কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, উক্ত অহম্ভাব বর্জ্জন হইতে তোমার পক্ষে অধিক শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই। তুমি অগ্রে ব্যষ্টি অহম্ভাব ভুলিয়া যাও, অনন্তর বিশ্ব-বিখ্যাত শৈল, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, জলধি, বায়ু, বায়ুপথ আকাশ ইত্যাদিরূপে অশেষ বিশ্ব পরিপূর্ণ করিয়া সমষ্টিভাবে বিরাজ কর। তৎপরে এই সমস্ত-ব্যস্ত স্থাবর-জঙ্গম নিখিল বিশ্ব--একমাত্র ব্রহ্মই' ইত্যাকার ভাবনায় বিভোর হইয়া তুমি প্রপঞ্চাতীত, কারণ-বর্জ্জিত, নির্ম্মল অখণ্ড, চিদাত্মভাবে অবস্থান কর—সুস্থ শান্ত ও শোকবর্জ্জিত হও।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অগ্রে মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের স্বভাব জয় করিয়া যে জন বিবেকাশ্রয় করে, তাহার সমস্ত চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে। যাহার বুদ্ধি নাই, অন্তঃকরণের স্বভাব মাত্র জয় করিতেও যাহার শক্তি নাই; তাহার পক্ষে উত্তম পদ লাভ একান্তই অসম্ভব। যেমন বালুকা-নিষ্পীড়নে তৈল পাওয়া যায় না, তেমনি উত্তম পদ লাভও তাহার ঘটে না। সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল বস্ত্রাদিতে তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা যেমন সহজেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি বিশুদ্ধ-হৃদয়ে স্বল্প মাত্র উপদেশও লব্ধপ্রবেশ হইয়া থাকে। কিন্তু মনো-বৃত্তি যদি বহির্ম্মুখী বা অবিশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে দর্পণতলে মুক্তা যেমন লগ্ন হয় না, তেমনি কোনও প্রকারে ধর্ম্মোপদেশই তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না! এই বিষয়ে একটা পৌরাণিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়া থাকে। ঐ ইতিহাস পূর্ব্বে মেরুশিখরে ভুষুণ্ড আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

একদা নির্জ্জন সুমেরুশিখরের কোটরে ভুষুণ্ডকে আমি একটা কথার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—ভুষুণ্ড! আত্মজ্ঞান-হীন কোনও মূঢ়মতি দীর্ঘজীবী জনের কথা তোমার স্মরণ হয় কি? রামচন্দ্র! আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভুষুণ্ড আমায় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—অতি পূর্ব্বকালে লোকালোক-শৈলের শিখরদেশে অনেক বিদ্যাধরের বসতি ছিল। ঐ বিদ্যাধরের চিত্ত সদাই বিক্ষিপ্ত; সুতরাং তাঁহাকে নিত্যই দুঃখভোগ করিতে হইত। ঐ বিদ্যাধর সদাচারনিষ্ঠ ছিলেন বটে; কিন্তু নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক তাঁহার হইয়াছিল না। বিবিধ তপস্যা এবং যম ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় দেহ শুষ্ক করিয়াছিলেন, তপস্যার উৎকর্ষে তাঁহার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তিনি চারিকল্প কাল জীবিত রহিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ভাবে সেই বিদ্যাধর চারিকল্প যাবৎ তপস্যা করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞান কিছুতেই আবির্ভূত হইল না।

অনন্তর চতুর্থ কল্পের অবসান হইল। বিদূরভূমি হইতে নবমেঘ-শব্দে সহসা মণির আবির্ভাবের ন্যায় তখন সেই বিদ্যাধরের বিবেক বিকাশ পাইল। বিদ্যাধর ভাবিতে লাগিলেন,—জন্মের পর জরা; জরার পর মৃত্যু; আবার জন্ম; আবার জরা; আবার মৃত্যু! এই ভাবেই জনন-মরণ-প্রবাহ চলিতেছে। কিন্তু এ প্রবাহে পড়িয়া আমার ফল তো কিছুই নাই। আমি এই সকল যতই আলোচনা করি, ততই কৃতাকৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জা বা নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতেছি। বিদ্যাধর এইরূপ ভাবিয়া কি যে এক মাত্র নির্ব্বিকার শাশ্বত সনাতন বস্তু আছেন, তাহা অবগত হইবার জন্য আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন আমার নিকট আসিলেন, তখন তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি মমতা নাই। সংসারের প্রতি অনুরাগ নাই; তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন।

সে কালে বিদ্যাধর মৎসমীপে আগমন করিয়া যথাযোগ্য প্রণাম করিলেন, আমিও তাঁহার সৎকার করিলাম। পরে অবসর ক্রমে বিদ্যাধর এই সকল সার কথা কহিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রিয় শস্ত্রস্বরূপ; উহা আপাততঃ মৃদুস্পর্শ হইলেও পরিণামে বড়ই দুঃখজনক। ঐ ইন্দ্রিয়-শস্ত্র প্রস্তরবৎ একান্তই দুর্ভেদ্য এবং ছেদ-ভেদ-ব্যাপারে নিতান্তই সুদক্ষ। আত্মার নিপাত ঐ ইন্দ্রিয়-শস্ত্র দ্বারাই হয়। ইন্দ্রিয়বর্গ যেন হৃদয়-মধ্য-গত অন্ধকারপূর্ণ অরণ্য; কামাদি ঐ অরণ্যচারী মর্কট-কুল; ঐ ইন্দ্রিয়ারণ্য দুঃখরূপ পবনহিল্লোলে তরঙ্গায়িত ও দাবানল-যোগে সঙ্কট-সঙ্কুল। কিন্তু এ বড় বিস্ময়ের বিষয় যে, ঐ দুঃখ-দাবানলে ইন্দ্রিয়ারণ্য দগ্ধ হয় না; কেবল শমাদি গুণের অঙ্কুর কদাচিৎ উৎপন্ন হয় মাত্র। এই ইন্দ্রিয়নিচয় অজ্ঞানরূপ ধূমান্ধকারে পরিব্যাপ্ত; ইহাদিগকে জয় করিতে পারিলে প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। পরন্তু ভোগ দ্বারা প্রকৃত সুখলাভ কদাচ ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং ভোগে আমার কি প্রয়োজন আছে?

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

বিদ্যাধর কহিলেন,—হে কাকরাজ ভুষুণ্ড! দীপ্তশিরা ব্যক্তি যেমন জলরাশির দিকে ধাবিত হয়, তেমনি এ সংসারে ত্রিতাপদগ্ধ আমি,—বিলম্ব সহিতে পারি না, যাহা নিত্য নির্দ্দোষ পরম পদ, তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; অতএব যাহা উদার, যাহা অনাতিশয়-বর্জ্জিত আদি-অন্ত-বিরহিত, পরম পাবন, পরম পদ, তাহারই সন্ধান আমায় বলিয়া দিন। আমি এতকাল সুপ্ত, জড়াত্মক হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম। হে মুনে! অধুনা আত্মার অনুগ্রহে প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমি কামরোগে উপতপ্ত, দুর্ব্বাসনায় বিক্ষুব্ধ ও দুরুচ্ছেদ্য কর্ম্মজালে জড়িত হইয়াছি। 'আমি' ইত্যাকার অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপ অজ্ঞান হইতে আমাকে এখন আপনি উদ্ধার করুন। বিশাল-দল কমল রম্য গুণের আধার হইলেও তদুপরি যেমন তুষারপাত হয়, তেমনি শ্রীমান্ গুণবান্ ব্যক্তিকেও দুঃখদায়ক কামাদি দোষ আসিয়া আক্রমণ করে। তাই বলিতেছি, আমি বিদ্যাধর—সর্ব্ব-বিদ্যার আধার হইলেও ঐ সকল দোষ আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছে; আমি উহাদের আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এই ত দেখিতেছি, কমল-কোষের মধ্যে যেমন মশক দল, তেমনি কত শত শত জীর্ণ জন্তু জন্মিতেছে, মরিতেছে,—হায়! ধর্ম্ম বা মোক্ষ কিছুরই ত তাহারা ভাজন হইতেছে না। ঐরূপ আমিও তো অসার বিষয়-ভোগ-লালসার অধীন হইয়া বারম্বার কতই না ক্লেশ ভোগ করিয়া—বিষয়সমূহের নিকট কতবারই না বঞ্চিত হইয়াছি। বুঝিয়াছি, ভোগ সকল নশ্বর; কিন্তু তাহাদেরই আশায় এতকাল আমি অবিরাম গমনে কত দিকে কত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছি। এই সংসার-পদ্ধতি যেন মরুভূমি; তথাচ এখানে ভ্রমণ করিতে আমার বিরাম হয় নাই। কেবলই ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কি বলিব, উহার অন্ত বা স্থৈর্য্য আমি কোথাও দেখি নাই। ফলে, এ সংসারের অন্ত ও স্থিরত্ব নিশ্চিতই নাই। এই যে সংসারস্থ আপাত-মধুর ভোগসামগ্রী, ইহা ক্ষণধ্বংসী; বারম্বার সংসারক্লেশ ইহা হইতেই

উৎপন্ন হয়। বোধ হয় বটে, ভোগের বস্তু আপততঃ মধুর; কিন্তু পরিণামে উহা বড়ই বিরস এবং বড়ই ভীষণ।

হে তাত! এই হত বিদ্যাধর-সম্পদে আমার আর অনুরাগ নাই। ইহাতে আমি আনন্দানুভব করিতে পারিতেছি না। উহা আমার নিকট তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়াই বোধ হইতেছে। নিজের উৎকর্ষ আপাদন এবং পরের অপকর্ষ সম্পাদন যাহাদের প্রধান কার্য্য, তাদৃশ দুরভিমানী ব্যক্তিবর্গের নিকটই উহা পরম মধুর বলিয়া মনে হয়। আমি বিষয়ভোগ যথেষ্টই করিয়াছি। কুসুম-কোমল চৈত্ররথ-বনভূমি দেখিয়াছি। সেখানে কত কল্পতরু কতই না বৈভব দান করিতেছে। আমি সুমেরুর কুঞ্জে কুঞ্জে, বিদ্যাধরগণের ভবনসমূহে, রম্য রম্য বিমানোপরি, এবং কত কত বাতস্কন্ধ প্রদেশে বিহার করিয়াছি। কতবার আমি সুরসেনার সহিত বিশ্রাম করিয়াছি এবং কতবার কত কামিনীর ভুজলতায় আশ্রয় লইয়াছি। ঐ সকল কামিনী সতত মনোহর হার-ভূষণে বিভূষিত থাকিত। আমি অনেকবার অনেক লোকপাল-পুরেও বিহার করিয়াছি। এক্ষণে সে সমুদায়ের কিছুই আমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি বুঝিতেছি, সেই সমস্তই আমার মানসী ব্যথারূপ বিষতাপে দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছে। আমি কান্তাজনের কমনীয় রূপরাশি দেখিবার লালসা পোষণ করিয়া কামিনীর বদনবিধুর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিব বলিয়া সতত সমুৎসুক-নয়নে কাল কাটাইয়াছি। সে কাল আমার দুঃখে দুঃখেই কাটিয়া গিয়াছে। তখন তো আমি ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, ঐ কামিনীজনের বসন ভূষণ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য আপাতমাত্রেই দৃষ্টিহারী; কিন্তু ইহার ঐ রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতিতে তো কমনীয়তার লেশ মাত্রও নাই। সে কালে ঐরূপ বিবেক-বিকল্পনা ছিল না, তাই নয়ন আমার ঐ দিকে ধাবিত হইত। চিত্ত অনর্থ-চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া যে পর্য্যন্ত না বিবেক-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপদের আস্পদ হইয়া পড়ে, সে যাবৎ অনর্থচেষ্টা হইতে কিছুতেই তাহার বিরতি হয় না।

অহো! আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইতস্তত ছুটিয়া

যাইতেছে, উদ্দাম অশ্বের গতি যেমন রুদ্ধ করা যায় না, তেমনি উহারও গতিরোধে আমি সক্ষম হইতেছি না। দুষ্ট দুরাশয় শত্রুর কবলে পড়িয়া লোকে যেমন তাহার প্ররোচনাক্রমে দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী-পথে নীত হয়, তেমনি আমিও এই দুর্ব্বৃত্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বলে শ্লেষ্মাদি দুর্গন্ধবহুল জল-বাহী বিলপথে নিয়োজিত হইতেছি। আমার এই রসনা কোনওরূপ নীতির ধার ধারে না; ইহার প্রেরণায় আমি অধিকাংশ সময় গজ-শৃগালাদি হিংস্র জন্তুগণের আবাসস্থলী—কত দুঃখপূর্ণ পর্ব্বতকন্দরে কতবার নীত হইয়া কত আঘাত পাইয়াছি। আদিত্যের বর্দ্ধনশীল নিদাঘতাপবৎ কিছুতেই আমি ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শলোলুপতা প্রতিহত করিতে পারিতেছি না। হরিণ তৃণভোজনের আকাঙ্ক্ষা করে; তাহার সেই আকাঙ্ক্ষাই যেমন তাহাকে অতি দুরধিগম কান্তার পথে লইয়া যায়, তেমনি আমার এই শ্রবণেন্দ্রিয়ও শ্রুতিমধুর শুভ শব্দাস্বাদে লোলুপ হইয়া আমাকে বিপথে পরিচালন করিতেছে। বলিবে,—তবে কি রূপাদি বিষয় তোমার পক্ষে দুর্লভ; তাই তাহাদিগকে তুমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ? না—রূপাদি বিষয় তোমার দুর্লভ নহে। তাহারা সর্ব্বদাই সৎসমীপে প্রণত হইয়াছে; আমার প্রিয় কার্য্য করিয়াছে; এবং বিনীত ভৃত্যবৎ সদাই আমার অনুগত রহিয়াছে। গীতবাদ্য-ধ্বনিময় কত মধুর শব্দ আমি শুনিয়াছি। কত কত সুন্দরী রমণী, কত কণিত মণি-ভূষণা চিত্ত-হারিণী কামিনী, কত রম্য রম্য গিরিদরী, কত রম্য সাগরতীরভূমি এবং কত শত সুরম্য পদার্থপুঞ্জ আমি দেখিয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি ও ভোগ করিয়াছি। বিনীত কান্তাজনেরা কত স্বাদু সুরম্য ষড়বিধ রস আনিয়া দিয়াছে; সে সকল আমি বহুদিন ধরিয়া আস্বাদন করিয়াছি। আমি কত দিন কত প্রশান্ত অট্টালিকা-কুট্টিমে বসিয়া বসিয়া কত পট্টবস্ত্র, কত কামিনী, কত হারগুচ্ছ, কত কুসুমস্তবক, কত দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যাতল ও কত মন্দ মারুত নিরাপদে ত্বগেন্দ্রিয়-যোগে সেবা করিয়াছি। আমি অনেকদিন যাবৎ মন্দ মারুতানীত বধূ-মুখ-সৌরভ, চন্দনাদির মিষ্ট গন্ধ ও কুসুমাদির আমোদ স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে উপভোগ করিয়াছি। বারম্বার আমি বিষয়ধ্বনি শুনিয়াছি, বিষয়রাশি স্পর্শ করিয়াছি, দেখিয়াছি, উপভোগ

করিয়াছি ও তাহাদের আঘ্রাণ লইয়াছি। কিন্তু অধুনা কি হই-য়াছে? অধুনা সে সকল আমার নিকট নীরস কর্কশ বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং বলুন দেখি, আমি কি আর সে সকল এখন উপভোগ করিব? এই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগদ্‌বিস্তারে যে কিছু ভোগ্য সামগ্রী আছে, সে সকল আমি সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছি, তথাচ আমার তৃপ্তি জন্মে নাই। বহুকাল পর্য্যন্ত সসাগরা ধরার একাধি-পত্য, অঙ্গনাগণের উপভোগ ও শত্রুদলের দলন, এ সকল করিয়া কি যে একটা লাভ হয়, তাহা তো আমি এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার মনে লয়, ঐ সকল করিয়া লভ্য কিছুই নাই। এই ত্রিজগতের উপর যাঁহারা আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এক কালে যাঁহাদের বিনাশ-সম্ভাবনা সম্পূর্ণই ছিল না, কালে এমন হইয়াছে যে, তাঁহারাও ভস্মসাৎ হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাহা পাইলে, যাহা দেখিলে, আর কিছুই প্রাপ্তব্য বা দ্রষ্টব্য থাকে না, তাদৃশ বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা যদি অতি কষ্টকরও হয়, তথাচ তাহাও করা বিধেয়। চিরদিন যাহারা রম্য রম্য ভোগ্য সকল উপভোগ করিতেছে, কৈ তাহাদের মধ্যে তো এমনটী কাহাকেও দেখা যায় না,—যাহার মস্তকে কল্পপাদপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; আর সেই কল্প-পাদপের প্রসাদাৎ তদীয় মনোভীষ্ট চিরদিনের তরে পূর্ণতা পাইয়াছে। অথবা ঐ সকল ভোগাসক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমনও তো কেহই নাই যে, যাহার একটা ব্যোমযান চির বশীভূত আছে, আর সে তাহার সাহায্যে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। যেমন কোন দুষ্ট বালক অন্য কোন শিষ্ট শান্ত শিশু জনকে প্রতারিত করে, তেমনি দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এই দুরধিগম বিষয়ারণ্যে আমাকে প্রতারিত করত লইয়া চলিয়াছে। আমি এমনই অজ্ঞ ছিলাম যে, এই সকল ইন্দ্রিয়কে আমি এত দিন শত্রু বা বঞ্চক বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিলাম,—ইহারা পরম শত্রু। এই শত্রুদলই এতকাল আমায় বারম্বার বঞ্চনা করিয়া কঠোর ক্লেশ দিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ অতি দুষ্ট ব্যাধস্থানীয়; ইহারা হতভাগ্য মানবরূপ মৃগ-পালকে প্রতারিত

করিয়া শূন্য সংসার-জঙ্গলে লইয়া যায়। বাহিরে বারম্বার কত আশার আশ্বাসনা দেয়; কিন্তু অবকাশ পাইলেই একেবারে নিহত করে। ইন্দ্রিয়রূপ পন্নগ সকল বিষম দৃষ্টি-বিষধর; তাহারা যাহাদিগকে দেখে নাই বা দগ্ধ করে নাই, এমন লোক জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। যাহারা শরীর-নগরের সীমান্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়-সৈন্যদিগকে পরাজয় করিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে, তাহাদিগকেই প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কেন না, এই ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুসঙ্ঘ অত্যন্ত প্রবল; অহঙ্কার উহাদের নেতা; শীত ও উষ্ণাদি রথস্থানীয়; ভোগরূপ ভীষণ হস্তী দ্বারা উহারা সমৃদ্ধ; তৃষ্ণা উহাদের তরল বাগুরা, উহারা লোভরূপ ভীষণ অসিধারী; কোপরূপ কুন্তকুল উহাদের ভীষণ অস্ত্র; চেষ্টারূপ তুরঙ্গম দ্বারা উহারা সর্ব্বদাই সুসজ্জিত। এই সৈন্য-সঙ্ঘ হইতে নিয়তই কাম-কোলাহল উত্থিত হইতেছে। মদমত্ত ঐরাবত মাতঙ্গের গণ্ডস্থল ভেদ করা বরং সহজ হইতে পারে; কিন্তু উন্মার্গ-ধাবিত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত করা বড়ই কঠিন কার্য্য।

হে সাধুশীল! যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও একমাত্র ইন্দ্রিয়-জয়-কার্য্যই—মহত্ত্ব, বীরত্ব, পুরুষত্ব ও বিশ্রাম-সম্পত্তির সীমান্ত। কৃপণ ইন্দ্রিয়বর্গ যৎকালে পুরুষকে তৃণের ন্যায় অবশভাবে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তখনই তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। যে সকল মহাসত্ত্বশালী লোক ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইয়াছেন, এই পৃথিবীমধ্যে তাঁহারাই প্রকৃত পুরুষ-পদ-বাচ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য যে সকল পুরুষ, তাহাদিগকে আমি স্পন্দ-শীল মাংসযন্ত্র মাত্র বলিয়াই মনে করি। মানুষের মন যেন সেনাপতি; আর পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার অধীনস্থ সেনা-স্বরূপ। যদি এই সকল সেনা জয় করিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি উহাদিগকে জয় করিয়া লই। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যদি ভোগাশারে বিসর্জ্জন দেওয়া না যায়, তাহা হইলে ঔষধই বলুন, তীর্থপর্য্যটনই বলুন, আর মন্ত্রই বলুন, কিছুতেই এই ইন্দ্রিয়রূপ

মহাব্যাধির শান্তি সম্ভাবনা নাই। এরূপ ঘটনার কথা শুনা যায় যে, তস্করেরা যদি পথিমধ্যে কোন পথিককে অসহায় অবস্থায় পায়, তবে তাহাকে গভীর অরণ্যপথে লইয়া গিয়া তাহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে থাকে। আমারও এই দশাই ঘটিয়াছে। আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আমাকে সংসার-জঙ্গলের গভীরতার দিকে লইয়া গিয়া আমাকে একান্তই আর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইন্দ্রিয় যেন পাপ-পঙ্কময় অপ্রসন্ন পল্বল; উহা দুর্গন্ধ শৈবালে বেষ্টিত এবং মহা দৈন্য-দুর্ভাগ্যের আকর। জড়তা যেন হিমস্তোম; তাহা দ্বারা উহা নিবিড়তম; সুতরাং অতীব দুর্গম। ইন্দ্রিয়-রূপ পঙ্কোৎপন্ন মৃণাল সচ্ছিদ্র ও গ্রন্থিযুক্ত। ইহার অন্তর্গত গুণ অতি সূক্ষ্ম; তাই তাহারা দুর্লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়স্বরূপ লবণসলিল রুক্ষ, তরঙ্গ-ভঙ্গময় ও ভয়ঙ্কর। এই দুগ্রহরূপ ভীষণ গ্রাহ সকল ঐ ইন্দ্রিয়রূপ লবণসলিলে অবস্থান করে; এইজন্য ঐ ঘোর লবণাম্বু মোহরাত্রিযোগে রত্নবৎ চাকচিক্যময় বলিয়া বোধ হয়। কাজেই উহা মানবদিগের রত্ন লোভ জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গকে মৃত্যুস্বরূপ বলিয়াও মনে হয়। কেন না, মৃত্যু দ্বারা বন্ধুবর্গ উদ্বেগ ভোগ করে, ইন্দ্রিয়গণও অকার্য্য সাধনে বন্ধুজন-গণের উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বাসনার না বিলয় ঘটে, ততক্ষণ আত্যন্তিক দেহলয় ঘটিবার নহে। এদিকে আবার ইন্দ্রিয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততকাল বাসনার বিলয় হইবার নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়কেই পুনর্দেহ লাভের হেতু বলা যায়। মৃত্যু ঘটিলে আত্মীয় বন্ধুজন করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করে, মৃত্যু হইবে বলিয়া মুমূর্ষুর নেত্রেও জলবিন্দু পতিত হয়। এইরূপে ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ-রূপ মৃত্যু নানা অনিষ্ট উদ্ভাবন করিয়া মানবকে করুণভাবে ক্রন্দন করাইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়দিগকে বহু বিস্তৃত কাননরূপেও বর্ণন করা যায়। ফলে, এ কানন অনন্ত, ইহা অবিবেকী-দিগের শত্রুস্থানীয় এবং বিবেকীদিগের মিত্রস্বরূপ। ভীষণ জীমূত ও ইন্দ্রিয়বর্গ, এ উভয়ও সমধর্ম্মী, কারণ উক্ত উভয়ই ঘনাস্ফোট, সারহীন, মালিন্যসম্পন্ন ও বিদ্যুৎপ্রকাশ।—ইন্দ্রিয় পক্ষে বিদ্যুৎসদৃশ ক্ষণিক সুখ-নিদান। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও গর্ত্তময় ভূভাগ, উভয়কেই তুলনা করা যায়। কেন না, উক্ত উভয়ই ক্ষুদ্র জীবের আশ্রয় স্থান, কৃতার্থগণের পরিত্যক্ত

এবং রজ ও তমঃপ্রসারে আক্রান্ত। পুরাতন বিলদ্বার ও ইন্দ্রিয়বর্গ এ উভয়কেও সমান বলা যায়; কেন না পাতিত করিবার শক্তি উভয়েরই বিদ্যমান। দোষরূপ ভুজঙ্গযোগে উভয়ই পরিপূর্ণ; লক্ষ লক্ষ রূক্ষ কণ্টক দ্বারা উভয়েই পরিকীর্ণ। রাক্ষস এবং ইন্দ্রিয়, এ উভয়ও সমধর্ম্মী; কেন না, দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মম্ভরিতা, অনার্য্যতা, সাহসিকতা, ও তমঃ-প্রিয়তা এ সকল ধর্ম্ম উভয়েরই তুল্য। জীর্ণ বংশস্তম্ব ও ইন্দ্রিয়বর্গ, এতদুভয়ও সমানধর্ম্মী; কেন না, উক্ত উভয়ই শূন্যগর্ভ, অন্তঃসার-বিরহিত, কুটিল, গ্রন্থি-সম্পন্ন এবং দগ্ধ হইবার যোগ্য। ফলে, ইন্দ্রিয়নিচয় ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী ও বন্ধনক্ষম; উহাদিগকে ভস্মসাৎ না করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব। ইন্দ্রিয় এবং অসাধুজনময় নগর, এতদুভয়েরও তুল্যতা আছে। কারণ মোহান্ধ লোকেরা যে সকল অপকার্য্য করে, সেই সমস্তই উক্ত উভয়ের সমভিব্যাহারী; এবং উহারা দুষ্কূপ-গহন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বার দেহবিকারে পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে কু-নগরের কূপ অপরিষ্কৃত ও গহন। এদিকে আবার কুলালচক্র এবং ইন্দ্রিয় এতদুভয়কেও সমান বলা যায়। কেন না, ঘটাদি নানা পদার্থের কারণ উভয়ই এবং ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ উভয়ত্রেই অবস্থিত। বিশেষ কথা এই যে, যদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি না থাকে, তবে ঘটাদির অস্তিত্ব থাকে না। জীবের যখন সুষুপ্তি-কাল, তখন তৎপক্ষে ঘটাদির অভাব হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইলেই ঘটাদির উৎপত্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইন্দ্রিয়কে ঘটাদির মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ইন্দ্রিয়ের ফল—ভ্রমজ্ঞান এবং পঙ্ক বা পাপসঙ্কল্পও ইন্দ্রিয় হইতেই ঘটে; সুতরাং ভ্রম ও পঙ্কসম্বন্ধ তথায় বিদ্যমান। এদিকে ঘটের কারণ কুলালচক্র, আর তাহার ভ্রম ও পঙ্কসংযোগ, এ সকলই প্রত্যক্ষ।

হে বিপদুদ্ধারকারিন্! আমি তো ইন্দ্রিয়রূপ বিপৎসাগরে ডুবিয়া আছি। আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, আমাকে আপনি দয়া প্রকাশে জ্ঞানোপদেশে উদ্ধার করুন।" এ জগতে যে সকল সাধুপুরুষ প্রধান পদে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সংসর্গই পরম শোকহর বলিয়া উল্লিখিত।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ভূষুণ্ড কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! সে কালে আমি সেই বিদ্যাধরের তাদৃশ পবিত্র বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্পষ্টবাক্যে তদীয় প্রশ্নানুরূপ এই প্রকার উত্তর প্রদান করিলাম যে, হে বিদ্যাধরপতে! সাধু সাধু! ভাগ্যগুণে তোমার মতি পরম মঙ্গলের পথে ধাবিত হইয়াছে; তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। এই সংসার যেন একটা গভীর অন্ধকূপ; তুমি যে বহুকালের পরে ইহা হইতে উত্থিত হইবার প্রয়াসী হইয়াছ, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যেমন বহ্নি-বিশুদ্ধ কনকলেখা, তেমনি তোমার এই বিবেক-বিধৌত অবিচল বুদ্ধি একান্তই সুশোভন হইয়াছে। তোমার অন্তঃকরণ নির্ম্মলতাগুণে সুশোভন হইয়াছে; তাই ইহা উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবে, নিশ্চিতই। ফল কথা, দ্রব্য-প্রতিবিম্ব সহজেই বিমল মুকুরে পতিত হইয়া থাকে। এখন শুন, আমি যে কথা বলিয়া যাই, তুমি সে সকলই অঙ্গীকার করিয়া লও; এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইও না। আমরা বহুকাল ধরিয়া বহু বিচার বিতর্ক ও গবেষণাপূর্ব্বক একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। দেখ, তোমার অন্তরে যে যে ভাবের অভ্যুদয় হয়, তাহা আত্মা নহেন। তুমি যদি চিরকাল ধরিয়া অন্তরে আত্মাকে অনুসন্ধান কর, তথাচ আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। যিনি আত্মা—তিনি এই সমস্ত পদার্থেরই অতীত বস্তু। আত্মার সম্বন্ধে তোমার যে একটা ভ্রম-ধারণা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান বিষয়ে আমি যে প্রকার উপদেশ প্রদান করি, তাহাতেই আস্থা বর্দ্ধন কর। তুমি যখন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে যে, তুমি আমি বা জগৎ কিছুই নাই, তখন তোমার থাকিবে সকলই; কিন্তু তোমার দুঃখের মূল হইবে না তাহার কিছুই। ফলে তাহা সুখ ও মঙ্গলেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। জগতের উৎপত্তি অজ্ঞান হইতে, কি অজ্ঞানের উৎপত্তি জগৎ হইতে? ইহা আমরা বিচার বিতর্ক করিয়াও স্থির করিতে সমর্থ হই নাই;—কেন হই নাই? তাহার কারণ এই যে,

অজ্ঞান ও জগৎ একই। মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্ম-পদার্থেই জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। যাহা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়, তাহাতে বস্তুত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা ভ্রমদৃষ্টির বিষয় হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অসত্য বৈ আর কিছুই নয়। এই জগৎটা অসত্য; সুতরাং অকিঞ্চিৎ। পক্ষান্তরে ইহাকে কিঞ্চিৎ বলাও অসঙ্গত নয়; কেন না, ইহা তো ব্রহ্মাই। মরীচিকায় জলপ্রতীতি হয়; কিন্তু তাহা জল নয়—ভ্রমমাত্র; এইরূপ ব্রহ্মেই জগদ্‌ভ্রম অর্থাৎ 'তুমি' 'আমি' 'সে' ইত্যাকার ভ্রম দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিলে জগৎ—'তুমি' 'আমি বা 'সে' এ সকল এক একটা পৃথক্ বস্তু কিছুই নয়;—কেবল ব্রহ্মাই। জগতের অবিদ্যমানতা-জ্ঞান যাহাতে হয়, তাহাতে জগতের প্রতিভাস বা ভ্রমজ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। জগতের বীজ কি, তাহা যদি তুমি জানিতে চাও, তবে জানিবে—অহম্ভাবই জগতের বীজ। সেই বীজ হইতেই এই নদ-নদী-গিরি-জলধি-প্রভৃতি-পরিপূর্ণ জগন্মণ্ডলরূপ প্রকাণ্ড বনস্পতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অহম্ভাব—বীজ সূক্ষ্ম; তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্ববৃক্ষের সমুদ্ভব। বিষয়রসান্বিত পাতাল প্রভৃতি অধোভুবন ঐ বিশ্ববৃক্ষের মূল স্থান। অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র উহার প্রশস্ত কলিকা; অপরাপর নক্ষত্রপুঞ্জ উহার কোরকরাজি; জীবনিবহের ধর্ম্মাধর্ম্ম-বাসনা উহার কুসুমগুচ্ছ; এবং পূর্ণিমার পরিপূর্ণ নিশাকর উহার ফলসমষ্টি। স্বর্গাদি লোক সকল ঐ বিশ্ববৃক্ষের শাখাগত প্রশস্ত কোটর এবং সুমেরু, সহ্য ও মন্দরাদি শৈলকুল উহার পত্রপঙ্ক্তি। ভূবলয়-ব্যাপ্ত সপ্ত সাগর ঐ বিশ্ববৃক্ষের আলবাল; পাতাল উহার মূলকোটর এবং কৃত ও ত্রেতা প্রভৃতি যুগচতুষ্টয় উহার ঘুণস্বরূপ; বর্ষ ও মাসাদি কাল-বিভাগ সকল ঐ বিশ্ববৃক্ষের শাখাদি পর্ব্ব-বিস্তার; অজ্ঞান উহার উদ্ভবভূমি; জীবনিবহ বিহঙ্গসঙ্ঘ; ভ্রমজ্ঞান—মধ্যস্তম্ভ; এবং নির্ব্বাণপ্রাপ্তিই উহার দাবদহন। ঐ বৃক্ষবরের কুসুমসৌরভ রূপালোক ও মনস্কার; সুবিপুল সূক্ষ্মাকাশ ঐ বিশ্ববৃক্ষের বনপ্রদেশ; জগতে যত কিছু শক্তি আছে, তৎসমস্ত উহার আদ্য আবরণ ত্বক্। বসন্তাদি ঋতু সকল ঐ বিশ্ববৃক্ষের বিচিত্র শাখা; দশদিক্ উহার উপশাখা; ঐ বিশ্ববৃক্ষ জ্ঞানরূপা রসসঞ্চারে পরিপুষ্ট; সদাগতি-

শীল সমীর উহার নিত্য স্পন্দ। রবি-শশীর কিরণপুঞ্জই ঐ বৃক্ষের নতোন্নত-স্বভাব রম্য পুষ্পমঞ্জরী এবং অন্ধকারপুঞ্জই ঐ বিশ্ববৃক্ষ-বরের কুসুমলোভাকৃষ্ট ভ্রান্ত ভ্রমরশ্রেণী। ঐ বৃক্ষ অসত্য হইলেও আকাশ, পাতাল ও দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সত্য বৃক্ষবৎ বিরাজিত। উল্লিখিত বিশ্ববৃক্ষের অহম্ভাবরূপ বীজ যদি অনহম্ভাবরূপ বহ্নিযোগে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার বিবর্ত্তোপাদান সদ্‌ব্রহ্ম হইতেও পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! এই দৃশ্যমান সংসারতরু অহঙ্কার-নামক অঙ্কুর হইতেই আবির্ভূত হয়। পাতালাদি সপ্তলোকাশ্রয় ভূলোক ঐ অহঙ্কার-তরুর মূলদেশ এবং লোকালোকাচলের গভীর গহ্বর উহার আলবাল-স্বরূপ। দিগন্তরে ও অম্বরে সঞ্চরণশীল বিবিধ প্রাণিপুঞ্জরূপ শাখা-পল্লবাদি বিস্তৃত হওয়ায় ঐ সংসার-তরু সদাই অতি চঞ্চল। যিনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ঐ অহঙ্কার-বীজকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন, এই বিশ্ব তাহার নিকট প্রকাশ পায় না। যে পরীক্ষক বিশেষরূপ বিচারালোচনা করিয়া পরীক্ষা করেন, 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ভাবগুলি তাঁহার নিকট কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবেই সংসারবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। অহংজ্ঞান অপগত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার সংসারবীজ বিনষ্ট হইবে না। যখন অহংজ্ঞানের অভাব হইবে, তখনই 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি কোন কিছুই তিষ্ঠিবে না। 'অনহং'জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যখন দেখা যায়, এই বিশ্বোৎপত্তিই নাই, তখন 'আমি' 'তুমি'ই বা কোথায় আর একত্ব-দ্বিত্বাদির বিচরালোচনাই বা কি? ফলে এ সকলই ভ্রম। অগ্রে যাঁহারা হৃদয়ে গুরূপদেশ ধারণ করেন, পরে তদনুসারে সর্ব্ব সঙ্কল্প পরি-

হারের জন্য ঐকান্তিক যত্নসহকারে উদ্যোগী হইয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারাই মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সূপকার প্রথমে পাক-শাস্ত্র অভ্যাস করে, পরে যত্নের সহিত পাককার্য্যে একান্ত নৈপুণ্য দেখায়, তৎপশ্চাৎ উত্তম পাককার্য্য করিয়া রাজসম্মানাদি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে অধিকারী ব্যক্তি যদি যত্ন করে, তাহা হইলেই বিবেকিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন; অন্যথা ইহার সম্ভাবনা নাই।

হে বিদ্যাধর! এই জগৎকে তুমি চিচ্চমৎকার মাত্র বলিয়াই বিদিত হইবে; তদিতর অন্য কিছুই বুঝিবে না। কাজেই কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি দিগন্তে, কোথাও ঐ জগতের স্থিতি নাই। যদি বাসনার বিকাশ হয়, তাহা হইলেই জগদাকার চিত্ত বিলোকিত হইয়া থাকে। অনন্তর চিত্রপট-চিত্রিত চিত্রকরের চিত্র যেমন কালে নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি উহা নিমেষমধ্যেই বিনষ্ট হয়। এই সংসার যেন একটা প্রকাণ্ড মণ্ডপ; ইহা বহুলক্ষ যোজন বিস্তৃত ও কাঞ্চন-মণি-মুক্তা-জালে খচিত। উহার বহু স্তম্ভ আছে; সে সকল সুমেরুসদৃশ সুবিপুল ও মণিময়। উহা অসংখ্য ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা রঞ্জিত; তাই কল্পান্ত ও সন্ধ্যার জলদ-জালবৎ পরম সুন্দর। ঐ মণ্ডপের স্থানে স্থানে কত বালবৃদ্ধ অবলাজন নিয়ত বাস করে। তাহাদের ক্রীড়াসাধন স্বর্গ-পাতালাদি সমস্ত লোক যেন সমুদ্গক-সমূহের ন্যায় ঐ মণ্ডপমধ্যে স্থাপিত। উহার অভ্যন্তরে কত গিরি নদী, বন উপবন বিদ্যমান; তাহাতে উহা অতীব সুন্দর। কত জীবনিবহরূপ বীজ সকল উহার স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত; অন্ধকার-হর রবিশশি-প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমে উহা নিত্য সশব্দ হইয়া আছে। উহার কোন স্থান অন্ধকার-পূর্ণ এবং কোন স্থান বা তেজঃপ্রকর্ষে সমুজ্জ্বল। ঐ ক্রীড়া কৌতুকভবন—মণ্ডপমধ্যে রমণীবৃন্দের ভূষণসাধন কল্পবৃক্ষ সকল সুরক্ষিত; তাহাদের সৌরভ-বিস্তারে দশদিক্ আমোদিত। কুলাচল সকল ঐ স্থানের শিশুক্রীড়া সামগ্রী—কন্দুকবৎ প্রতিভাত। শিশুজনের অতি লঘু নিঃশ্বাস-পতনযোগেও উহারা পরিচালিত। সন্ধ্যার মেঘমালা কর্ণভূষণের, শরতের মেঘ চামরের এবং প্রলয়ের মেঘবৃন্দ ঐ মণ্ডপে তালবৃন্তের ন্যায় বিরাজমান। এই ভূতল উহার দ্যূত ক্রীড়ার যোগ্য। চিত্রিত পত্র এবং নক্ষত্রমালা-মণ্ডিত অন্তরীক্ষ

উহার বিতান। ঐ মণ্ডপের পরিষ্কৃত চত্বর হইল আকাশ; তাহাতে গৃহী লোক সকল এই জগতের উদ্ভব-বিলয়-জ্ঞান পণস্বরূপে ধরিয়া নিত্য দ্যূত-ক্রীড়ায় নিরত। অগণিত প্রাণিপুঞ্জের অনবরত জনন-মরণাদিই ঐ ক্রীড়ার শারিকা; ঐ সকল শারিকা পুনঃপুন ঘুরিয়া ফিরিয়া আগমন করিতেছে এবং রবিশশিপ্রমুখ নব গ্রহগণ উহাতে নয়টী শারিকারূপে প্রতিভাত হইতেছে।

বিদ্যাধর! এই যাহা বলিলাম, ইত্যাকার সঙ্কল্প যেমন সঙ্কল্পকর্ত্তার অন্তরে নিত্যই ভাবনাবলে সত্যবৎ প্রতিভাত হয়, তেমনি এই যে চিচ্চমৎ-কাররূপ বিশ্ববিস্তার ইহার স্বরূপ লক্ষণ,—ঐ মণ্ডপও সঙ্কল্পানুবলে চিত্রকরের চিত্রিত চিত্রবৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ফলে সকলই মিথ্যা-প্রকাশ এবং সকলই প্রতিভাসবলে বিদ্যমান। পরমার্থ পক্ষে কিছুরই বিদ্যমানতা নাই। যেমন অকস্মাদুৎপন্ন মায়াকৃত গজাশ্বাদি, তেমনি সমস্ত অসদা-কারেই পরিদৃশ্যমান। যেমন কনক ও কেয়ূরাদি বস্তু সকলই কনকে বিদ্যমান, তেমনি সেই একমাত্র চিচ্চমৎকারের অভ্যন্তরেই এই সমগ্র সংসার বিরাজমান। এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞগণেরই একান্ত আয়ত্ত। অতএব যেরূপে যত্ন করিতে চাও—কর, যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক অন্নপানাদি ও পারলৌকিক যজ্ঞদানাদি নিখিল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন, এই বর্ত্তমান জন্মই তাঁহার চরম জন্ম; আর তাঁহাকে জন্ম লাভ করিতে হইবে না। কেন না, তিনি কর্ম্মকে অতিক্রম করেন; তাই তাঁহার বন্ধন কিছুই থাকে না।

হে শুদ্ধবুদ্ধে! তুমি পতনসাধনী অবিবেকপদবী হইতে অধুনা ত্রিভুবন-পাবন দ্বিতীয় বিবেকপথে উপনীত হইয়াছ। তোমার চিত্তের যেরূপ পবিত্রতা জন্মিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, তুমি আর কদাচ অধঃপাতের পথে যাইবে না। অতএব এখন নিশ্চেষ্ট নির্ম্মল চিন্ময় পদ অবলম্বনপূর্ব্বক মনঃপ্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে দূরে পরিহার কর।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন—হে অনঘ! কি চেত্য, কি চিৎস্বরূপ, তাঁহার তত্ত্ব তুমি যথাযথ অবিদিত হইলেও সলিলাভ্যন্তর-গত সৌর-কিরণবৎ তাপ-বিরহিত হইয়াই প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে থাক। বাহ্য দর্শনে যদিও আপনার সম্পূর্ণ অসদৃশ, তথাচ অনল যেমন জলরাশি মধ্যে অবস্থিত, তেমনি যাহা চেত্য, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে যদিও অচেতন, তথাচ চেতন বলিয়াই চিন্মাত্রের অভ্যন্তরে বিরাজমান। আরও দেখ, একমাত্র পবন যেমন বহ্নিশিখার উদ্ভাবক ও বিলয়-কারক, তেমনি একমাত্র চিৎশক্তিই চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ বৃত্তিরই কারণ। সুতরাং তোমার অহং-জ্ঞানাদি-স্বরূপ চেতনাংশ চিন্মাত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক। ঐ অবস্থায় যেরূপ হওয়া উপযুক্ত, তুমি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াই থাক। যেমন দুগ্ধমিশ্র নির্ম্মল জলরাশির অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই দুগ্ধাকার, তেমনি চিৎ-স্বরূপে সর্ব্বভাবেরই অন্তরে বাহিরে নিখিল স্থানেই তুমি তখন বিরাজিত হইবে। তোমার অহংজ্ঞান-বিরহিত চিদ্‌ভাব যখন চিত্তের সহিত মিশাইয়া যাইবে, তখন ব্রহ্মস্বরূপ তুমি—কাহার সহিত তোমার উপমাসঙ্গতি হইবে? সে কালে তোমা ব্যতীত তো আর কিছুই রহিবে না। যেমন চিত্রলিখিত সুরাসুর-পরিবৃত স্বর্গ-পাতালরূপ সংসারসন্নিবেশ,—প্রীতি, হর্ষ, ক্রোধ, যুদ্ধ, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি নানাভাবে সমাকুল হইয়াও কুড্যস্বরূপে মুনিদেহবৎ নির্ব্যাপাররূপেই অবস্থিত, তেমনি এই মায়াশবল দৃশ্য সংসারও শুদ্ধ চিদাকাশে অদ্বয় ব্রহ্মের অভিন্নভাবেই বিরাজিত ;- বস্তুতঃ জগদ্ভাবে নহে। যে কালে এই অসত্য জগৎ ও সত্য চেতন ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকারে প্রতিভাসিত হইবে, তখন চেতন ও অচেতন এই উভয়ের মধ্যে তোমার যাহাতে আস্থা, তাহাই অধিকার করিয়া লইবে। দেখ, মরুপ্রদেশে সৌর কিরণ অবলোকন করিয়া অজ্ঞ লোকেরা উহাকে মহানদীরূপে বিদিত হয়, পরে ঐ নদী পার হইবার উপায় না পাইয়া কূলদেশেই অবস্থান করে ; কিন্তু যাহারা উহাকে সূর্য্যেরই কিরণ বলিয়া মনে করে, তাহাদের

ধারণায় ঐ প্রদেশ অপ্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এইরূপে এই সংসার-ভাব তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট বিস্ময়জনক ব্যাপার হইলেও তাঁহারা ইহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া কখনই মনে করেন না। যাহাদের দৃষ্টি দোষান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা যেমন আকাশে কেশগুচ্ছ দর্শন করে, তেমনি যে সকল ব্যক্তি মূঢ় এবং সংসারেই মগ্ন, তাহাদের নিকটই এই অসত্য জগৎস্বরূপ বিলসিত হইয়া থাকে। এই বৃথা জ্ঞানময় জগৎ ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব বৈ আর কিছুই নয়। এ জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানীদিগের কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। যাহারা অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাহাদিগেরই ইহা একটা কল্পনা মাত্র। যেমন অর্কাংশজালে অলীক গন্ধর্ব্ব-নগরাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তেমনি এই জগৎ স্ফুরিত হইতেছে।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! এ জগৎ অচেতন; কিন্তু চেতন ব্রহ্ম হইতেই ইহার বিকাশ। সুতরাং ইহা চেতন বলিয়াই বিজ্ঞেয়। যেমন জলবিম্বিত বহ্নি জল হইতে অভিন্ন, তেমনি এই যে জগৎ, ইহারও চৈতন্য ব্যতীত জড়ত্ব অসম্ভব। তাই বলিতেছি, তুমি চেতন ও অচেতনকে অভিন্ন বলিয়াই অবধারণা করিয়া স্বস্থভাবে অবস্থান করিতে থাক। অক্ষুব্ধ জলধিজলে যেমন ভাবী ফেনবিন্দু বিদ্যমান, তেমনি প্রলয়ে সূক্ষ্ম অচিদাকারে ব্রহ্মে জগতের অবস্থিতিজ্ঞাপক শ্রুতি-খ্যাতি প্রভৃতি বিরাজমান; কিন্তু ইহা হইলেও তাহার চিদাকারতার অপলাপ হয় না। নির্ম্মল জলে কারণ বিনা ফেনবিন্দুর যেমন বিকাশ নাই, তেমনি ব্রহ্ম হইতে কারণাভাবে কিরূপে এই জড় জগৎসৃষ্টি প্রকট হইবে? এই যে অকারণ সৃষ্টি-ব্যাপার, ইহাতে তো কারণ কিছুই নাই। অতএব এই যে জগদাদি পরিদৃষ্ট হয়, ইহা জন্মে না; কাহারও যে বিনাশ আছে—তাহাও নাই। কারণের একান্তই অসদ্ভাব; তাই এই দৃশ্য বিশ্ব কিছুই জন্মে না।

মরুস্থলীতে সলিলবৎ এ বিশ্ব সম্মুখভাগে পরিদৃশ্যমান হইলেও ইহা যে কিছুই নহে, তাহা নিশ্চিতই। যিনি অজ, যিনি অনন্ত, সেই একমাত্র প্রশান্ত ব্রহ্মই বিদ্যমান। কারণাভাবে সৃষ্টিব্যাপার নাই; কাজেই একাদ্বয় অখণ্ড ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। তিনিই মাত্র বিদ্যমান। অতএব তুমি আকাশবৎ ব্রহ্ম বলিয়া অজ; তুমিই একমাত্র জ্ঞানাধার; সুতরাং তুমি শঙ্কাবিরহিত-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অচেতন চিদাভাসরূপে নিজেই উপশান্ত হইয়া বিরাজ কর। ব্রহ্ম নিত্যানন্দ-ময়; সুতরাং তদীয় কার্য্যকর কারণ কিছুই নাই। অতএব সৃষ্টি প্রভৃতির একান্ত অসম্ভাবনা হেতু একমাত্র অজ অনাদি শিবই বিরাজমান। কিন্তু সেই যিনি একমাত্র অজ-চিন্ময় বস্তু, তাঁহার সত্তা যাহারা অজ্ঞতার ফলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সৃষ্টির অভাবে তাহাদের যে বন্ধনদশা কি প্রকার হইতে পারে, তাহা কি ধারণা করিতে পারিতেছ না? যত্র যত্র পরব্রহ্ম, তত্র তত্র এই জগৎ; এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরা নিশ্চিতই অর্দ্ধমুক্ত। তাঁহারা মনে করেন,—তৃণে, কাষ্ঠে, জলে, কুড্যে সর্ব্বত্রই পরব্রহ্ম বিরাজিত। সৃষ্টিপরম্পরা পরস্পর সর্ব্বত্রই অন্তরে অন্তরে গ্রথিত। পরব্রহ্ম অনন্ত; তাঁহাতে স্বত্ব অস্বত্ব উভয়েরই অভাব; তাই তাঁহার স্বভাব নিরূপণ করা একান্তই অসম্ভাব্য। পরব্রহ্মে অভাববিরোধী ভাবের একান্ত অসম্ভাবনা, তাই তাঁহাতে স্বভাবাদি-দৃষ্ট বাগ্‌বিন্যাস আশ্রয় লইতে পারে না। ফল কথা, তদীয় স্বভাব নিরূপণ অযৌক্তিক ব্যাপার। এইরূপে নিত্য অনন্ত ব্রহ্মে অস্বত্ব ও অভাবের একান্তই অসম্ভাবনা; তাঁহাতে স্বত্বভাব স্বতঃ প্রত্যাত্ত। অতএব স্বভাবোক্তি অসম্ভব। পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি মতে এ সংসারে শুদ্ধ বোধযোগে অহম্ভাব- সম্পূর্ণই দুর্লভ। কাজেই বালকসমীপে যক্ষবাক্যবৎ উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। অহং শব্দার্থ হইতে মুক্ত হইলেই পরম পদ লব্ধ হইয়া থাকে। এই অহম্ভাবপূর্ণ দৃশ্যনিচয় সম্যক্ অনুভবযোগে বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা যদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেই বিলয় পাইয়া থাকে। জগৎ ও ব্রহ্ম এই উভয়ের ভেদাভেদ শব্দেরই একটা পর্য্যায় স্ফুরণমাত্র। বস্তুতঃ কনক ও কটক এই উভয় যেমন পরমার্থতঃ অভিন্ন, তেমনি, উহাদের

ভেদও মাত্র সঙ্কল্প বলিয়াই উল্লিখিত। বাস্তব পক্ষে জগৎ-ব্রহ্মের ভেদ নাই।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! যিনি অনাবৃত-কলেবরে তীক্ষ্ন প্রহার সহ্য করেন এবং তরুণীর পীন স্তনাদির স্পর্শসুখ অনুভব করেন, এই সকল করিয়াও নির্ব্বিকার-চিত্তে অবস্থান করিতে থাকেন, পরম পদে প্রতিষ্ঠা লাভ তাঁহারই হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত পুরুষের শস্ত্র-কান্তাদি বাহ্য পদার্থ হইতে বিকার বিগত হইয়া না যায় এবং যত দিনে না সুখ-শ্রান্তিরূপিণী সুষুপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ততকাল যাবৎ পুরুষ যত্ন ও ধৈর্য্য সহকারে অভ্যাস করিতে থাকিবে। পদ্ম জলমধ্যে মগ্ন হইলেও তাহাতে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি প্রকৃত তত্ত্বস্বরূপ-বেত্তাকে কোনরূপ ক্লেশ আসিয়াই অভিভূত করিতে পারে না। অজ্ঞ জনেরই মনে হইয়া থাকে যে, স্বীয় দেহে অস্ত্রাদি সংলগ্ন হইতেছে; কিন্তু যে শান্তচেতা জন অস্ত্রাদি সমস্তই অসংলগ্ন বলিয়া দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা; তিনিই চরম জ্ঞানশালী। বিষ যদিও অন্তরে স্বয়ং ঘুণাকারে পর্য্যবসিত হয়, তথাচ স্বরূপ-পর্য্যালোচনায় তাহাকে বিষ ব্যতীত ঘুণতানামক কোন বিশিষ্ট পদার্থ বলা যায় না, তেমনি ব্রহ্মও বাস্তব স্বরূপ পরিহার না করিয়া জীবভাবে বিরাজ করিলেও আপাত-দৃষ্টিতে ঐ ভাব তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বটে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে অবিরোধী বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। উল্লিখিত বিষ মরণধর্ম্মী না হইয়াও যেমন মরণধর্ম্মী ক্ষুদ্র জীবাকারে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি ব্রহ্মের চিতিশক্তিও স্ব স্ব ভাবের অপরিহারে জড়াকার আশ্রয় করেন। ঘুণ যেমন বিষাভিন্ন হইয়াও তদ্‌ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনি এই যে সংসারবিস্তার, ইহাও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মাবস্থিত

হইলেও তদ্‌ভিন্ন বা তদনধিষ্ঠিতবৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিষ যখন তাহার বিষস্বভাব না বর্জ্জন করে, তখন তদীয় স্বভাবদর্শনে জনন-মরণের সম্ভাবনা করা যায় না, কিন্তু অন্তর্গত কৃমি প্রভৃতি দেহধর্ম্মীর স্বভাব দেখিলে জনন-মরণের অবশ্যম্ভাবিতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি জীবেরও যে কালে ব্রহ্মস্বভাব দৃষ্ট হয়, তখন তাহার জনন-মরণের একান্তই অসম্ভাবনা ; কিন্তু উহাতে যখন জীবস্বভাব থাকে, তখন তাহার জনন-মরণ অবশ্যম্ভাব্যই হয়। যে সকল বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদির বিষয়, তাহাতে 'অহং' 'মম' ইত্যাদি বোধ স্থাপন করিয়া যিনি একেবারেই বিষয়ে বিভোর হইয়া নাই, তিনিই ভবাব্ধি হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন ; অন্যথা কেবল দৈব-মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া রহিলে, উদ্ধারের পথ পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছি,—হে মহোদয়-শালিন্! সর্ব্ববিধ প্রিয়ভাবের অন্তঃসুখময়ী সর্ব্বাতিশায়িনী শীতল অবস্থা যে পূর্ণব্রহ্মে অবস্থিত, তথাবিধ ব্রহ্মের প্রতি অবহেলা করিবে কেন? যে কালে জগৎপদার্থের সত্তাজ্ঞান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে হইবে, তখন মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি কলঙ্ক নির্ম্মল আত্মারে স্পর্শ করিবে না। স্বীয় দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া তুমি যেমন ঘট-পটাদি দর্শন কর, তেমনি স্ব-দেহকে সন্দর্শন করিতে থাক। পরন্তু কি অহম্ভাব, কি মমত্বাদি বোধ, এ সকলের সহিত একযোগে কদাচ দেখিও না। তুমি সর্ব্বসাক্ষী হইয়া বাহিরে জাগতিক বস্তুসমূহের এবং অন্তরে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া যাহা স্বাভাবিক সংস্থান, তাহাতেই বিচরণ করিতে থাক। ঐ-রূপ সংস্থানে কি সম্পদ, কি বিপদ, এই উভয় হইতে সুখ বা দুঃখমূলক কোনরূপ দোষ-গুণ কাহারই কখন হইবার নহে। কেন না, সে কালে বিবেকী ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিছুতেই থাকে না ; কাজেই কিছুরই তিনি ভোক্তা হন না।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! শুনিতে থাক। আকাশে আরও একটা আকাশ জন্মিয়াছে, এই প্রকার কল্পনা যখন ভ্রম-মূলক, অদ্বয় সূক্ষ্ম আত্মায় প্রপঞ্চাকার অহম্ভাবের কল্পনাও তেমনি ভ্রম মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। আকাশে দ্বিতীয়াকাশের জন্ম, এই ভ্রমের যেমন বিধান-কর্ত্তা আমিই, তেমনি অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া এই অসদাকারে সমুদিত বিশ্বকে আমিই সদাকারে ব্যবহার করিতেছি। যেমন অদ্বয় আকাশাত্মাই আকাশে বিদ্যমান, দ্বিতীয় আকাশের কল্পনাকারী পুরুষেরই কল্পনা আকাশাবয়বে প্রতিভাসমান, তেমনি অবিদ্যোপহিত চিদাত্মা, 'স্বদেহ অবিদ্যাই আমি' ইত্যাকার অভিমন্তব্যরূপে কল্পনা করিয়া প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন। সুতরাং অহং বা অনহং নামে কিছুই নাই। পরমাণুর অভ্যন্তরে সুবৃহৎ সুমেরুর যেমন অধ্যাহার হয়, তেমনি যিনি পরম সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই সর্ব্ববিধ স্থূল-কল্পনার আধার বলা হয়। যাহা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সেই চৈতন্যকে অজ্ঞানলক্ষণ চিদ্‌ঘনই অহম্ভাবাদির অধ্যাসে পর পর স্থূলত্ব-কল্পনায় বিদিত হইয়া থাকেন। আত্মচৈতন্য অহম্ভাবাদির আশ্রয় লয়েন, তাহাতেই পাঞ্চভৌতিক জগতের আবির্ভাব হয়। জলের বিস্তার হইতেই আবর্ত্তাদির উৎপত্তি দেখা যায়। প্রশান্ত পয়োরাশির ন্যায় অচিদাকার জগতের যখন বিশ্রাম বা প্রলয় ঘটে, তখন নিষ্পন্দ সমীর ও চিদাকাশ সহ উহার উপমাসঙ্গতি হয়। কাজেই দেশ-কালাত্মক জগতের প্রকাশ-ব্যাপারে নিরাভাস চিন্মাত্রের বিকাশই প্রধান কারণ। আকাশ, কাল, জল, স্থল, নিদ্রা; জাগরণ বা স্বপ্নাবস্থা, যাহাতেই যখন ঐ চিন্মাত্র উন্মুখ হইয়া উঠেন, তখনই পরিদৃশ্যমান চেত্য বিষয়ের প্রকাশঘটনা হয়। চিদাকাশ অতি নির্ম্মল নির্ব্বিকার; তাঁহা হইতে প্রসারণ বা অপ্রসারণ কিছুই সম্ভবপর নহে। যিনি তত্ত্বাভিজ্ঞ, তিনি সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন না। জলের যেমন দ্রবত্ব, তেমনি তিনি কূটস্থ পরব্রহ্মেই বিরাজ করেন, তাঁহার কোনই সঙ্কল্প নাই। এই নিমিত্ত অন্ধকারে যেমন উরগগতি চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না, তেমনি বুদ্ধি, হ্রী, হর্ষাত্মিকা মনোবৃত্তি,

ভীতি, স্মৃতি, কীর্ত্তি বা ইচ্ছার বিষয় তিনি দেখেন না। ব্রহ্ম যেন চন্দ্র-মণ্ডল; তাহা হইতে নির্গত জীবচৈতন্য যেন জ্যোৎস্না। আর তদংশ চাক্ষুষাদি জ্ঞান যেন অমৃত দ্রব; এই যে সৃষ্টি, ইহা সেই অমৃতদ্রবময়; ইহাকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলা যায় না। এইরূপে পরমেশ ব্রহ্ম আত্মাভিন্ন জগদাকারে পরিস্ফুরিত হন সত্য; কিন্তু বাস্তব পক্ষে তিনি যখন সচ্চিদানন্দরূপে দেদীপ্যমান, তখন আত্মাভিমানরূপী অহম্ভাব-রূপে অন্য যাহা কিছু দেহাদিতে স্ফুরিত হইয়া উঠে—যাহা সর্ব্ব জগৎ-জীব ও জীবের বন্ধন-মোচনকল্পনারূপে জলে তরঙ্গাদিবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা কল্পিত চিত্ত মাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সংসার-সৃষ্টি যেন তরঙ্গ, আবর্ত্ত ও ফেনবুদ্বুদাদিময়ী নদী; ইহা জীবনিবহের উন্মজ্জন ও নিমজ্জন-জাত কলকল কল্লোলসহকারে অনবরত প্রবাহিত হয়, আবার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটিলে ঐ নদী বিলয় পাইয়া যায়। জলের আবর্ত্তাকারে এবং ধূমের মেঘাকারে পরিণতির ন্যায় ব্রহ্ম ও মন হইতে পৃথগাকারে প্রতীত এই জড়স্বরূপ সৃষ্টিও পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইবে, এই সৃষ্টিও ব্রহ্ম ও মন হইতে অপৃথক্। কোন কাষ্ঠখণ্ড করপত্র দ্বারা পাটিত করিলে তাহা যেমন বৃক্ষকাণ্ড হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, তেমনি এই সৃষ্টি দিক্, দেশ ও কালাদির অতীত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহা হইতে ভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া থাকে। এই সংসারনামক কদলীকাণ্ড মৃদু হইলেও পাষাণবৎ সুদৃঢ়; ইহা আদি অন্ত একরূপ হইলেও সঙ্কল্প-রূপ পল্লবসমূহে কিয়ৎপরিমাণ বৈষম্য লাভ করিয়াছে। যদি সঙ্কল্পরূপ পল্লবদল ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে বিবেকদর্শনে উহা সমান বলিয়াই লক্ষিত হয়। এই জগৎ একটা চিত্রার্পিত প্রকাণ্ড রাজ্যরূপে প্রতিভাত। সহস্র সহস্র খুর, শির, নেত্র, বক্ত্র ও হস্তের ব্যাপার ইহাতে সুসম্পন্ন; ইহা দেখিতে অতীব সুন্দর; কত কত সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও নাগ ইহাতে অবস্থিত; ইহার প্রাদেশ-প্রমাণবৎ অতি সঙ্কীর্ণ অবসরে কত প্রকার পর্ব্বত, কত বিবিধ কলেবর, কতবিধ দেশ ও কত কত নদী কেমন সুপ্রসারিত-ভাবে বিরাজমান। এই জগৎচিত্র

নানাবর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু ইহাতে বিরাগ আসিয়াও ইহার কোন কোন অংশ মার্জ্জিত ও প্রোঞ্ছিত করিতে ব্যাপৃত। জড়াকার পবনহিল্লোলে সদাই ইহা সম্পন্দ এবং অন্তঃসারশূন্য। এই জগৎচিত্র অত্যধিক উপর্দ্দম-সহনে অক্ষম। অর্থাৎ যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এ চিত্রের আর কিছুই থাকিবার নয়; সম্পূর্ণই নষ্ট হইয়া যায়। রম্য রম্য কল্পনাগুণে ইহা বড়ই সুশোভন; এই চিত্রের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা সেই একমাত্র চেতন—ব্রহ্ম। জলে যদি তৈলবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইলে উহা যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তেমনি বিকল্পাত্মক অসত্য মনোমধ্যে প্রতিবিম্বরূপে পতিত হইয়া সম্বিৎও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সম্বিৎ মনোমধ্যে প্রতিবিম্বপ্রায় সমুদিত হইয়া হৃদয়-ক্ষোভ-জনিকা কামনা ও বাসনা প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত হয়, এবং পুত্র-কলত্রাদির প্রতি মমতা করিয়া অকিঞ্চিৎকর অসত্য বিষয়রাশির আস্বাদ লইতে লইতে ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে। যেমন জলত্ব হইতে বারিত্ব পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি উক্ত আদ্য সম্বিৎ এইরূপে আমি ইত্যাকার বিকল্পনায় বহির্ম্মুখী হইলেও বাস্তব পক্ষে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ফলে জলত্ব ও বারিত্ব উভয়ই যেমন একই, তেমনি জীবভাবগত সম্বিৎ ও ব্রহ্মসম্বিৎ উভয়ই এক অভিন্ন বস্তু। চিৎ-প্রভাকর-স্বরূপ পরমাত্মা নিজেই অগ্রে অহং ইত্যাকারে সৃষ্টিরূপে প্রথিত হন। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই যে, সৃষ্টি বা স্রষ্টা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ অনতিরিক্ত। জল স্পন্দিত হয়; এইরূপ বাক্যে জলকে যদি স্পন্দরূপে বুঝা যায়, তবে স্পন্দনের কর্তৃত্ব জলে সম্ভবপর হয় না; কাজেই বলা যায়, জল স্পন্দ নহে; ইহা হইল কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ স্পন্দ একটী জলদ্রব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই-রূপে বলা যায়, আকাশাদি প্রপঞ্চের নির্ম্মাণকালে চিদাত্মা আকাশ-রূপে অবস্থান করেন না, আকাশের কর্তৃরূপে বিরাজিত রহেন না, কিম্বা অন্য কাহারও আকাশাদি ভাব জাত হইতেও পারেন না। চিদাত্মায় যখন আকাশাদি বিকল্প-কল্পনার বর্ণন করা হয়, তখন অগ্রে কল্পনার সাহায্যে আকাশাদি বিভাগকল্পনা করিয়া লইতে হয়। কাজেই জল-দ্রবের সহিত চিদাত্মার কল্পনা অসম্ভাব্য নহে; ফলে, তুমি ইহা

জানিয়া রখিবে যে, মন, অহম্ভাব ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু বলা যায়, সকলই অবিদ্যা। যদি রীতিমত চেষ্টা করা হয়, তবে এই অবিদ্যার উচ্ছেদ-সাধন সত্বরই হইতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আলাপ-আলোচনায় ঐ অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ অপহৃত হয়; অনন্তর তত্ত্ব-বিচার করিতে করিতে উহার কিয়দংশ নষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ আত্ম-সাক্ষাৎকারে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যখন একেবারেই অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা—অনাম, অরূপ, সৎস্বরূপ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সাধুজন সহ সম্ভাষণে অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ, শাস্ত্রার্থের বিচারালোচনায় উহার কিয়দংশ এবং আত্মসাক্ষাৎকারে উহার অবশিষ্টাংশ অপহৃত হয় কিরূপে? তাহা আমায় বিশদভাবে বুঝাইয়া বলুন। হে মুনিপ্রবর! আপনি যে ঐ অবিদ্যার ক্রমে একই কালে উচ্ছেদের কথা কহিলেন,—ইহাই বা কি? তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই। অপিচ নাম নাই, রূপ নাই, এ হেন সদ্বস্তুই বা কি, আর অসদংশই বা তাহাতে কি, তাহাও আমায় স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে হইলে, অগ্রে সংসারের প্রতি বিরাগী হইতে হইবে, যাঁহারা এই সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার প্রয়াসী, তাদৃশ সাধু সজ্জনের এবং আত্মদর্শী পণ্ডিতের সহিত এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব লইয়া বিচার বিতর্ক করিতে হইবে। যাঁহার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই, যিনি সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ আত্মজ্ঞ সাধু জন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অন্বেষণ করিয়া লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি অতিযত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন।

হে তত্ত্ববিদ্গণের প্রধান্ ব্যক্তি রাম! এইরূপে যখন সাধু সহবাস সুসম্পন্ন হইবে, তখন বিশিষ্ট যোগভূমিকায় আরোহণ করা যাইবে। তাদৃশ ভূমিকারূঢ় হইতে পারিলে, জানিবে,—তখনই অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ অপহৃত হইয়াছে। সাধু জনের সংসর্গে অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ বিলীন হয়, শাস্ত্রার্থের বিচারালোচনায় উহার চারি ভাগের একভাগ নষ্ট হয় এবং

অবশিষ্ট ভাগ নিজের যত্নে নিরস্ত হইয়া থাকে। পুরুষ মুমুক্ষু হইলে, সে কালে তাহার বিষয়ভোগ হইতে বিরতি ঘটে। অধিক কি, বৈরাগ্য-ভোগেও তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই সময় তাহার স্বীয় চেষ্টাতেই অবিদ্যার অবশিষ্টাংশ সে নষ্ট করিতে পারে। এতাবতা জানিয়া রাখ, সাধুসংসর্গ, শাস্ত্রার্থ-সমালোচনা এবং নিজের অধ্যবসায় এই সকল দ্বারাই অবিদ্যামল প্রক্ষালিত হইয়া যায়। উল্লিখিত কারণত্রয় যদি যথাক্রমে লব্ধ হয়, তবে উহার ক্রমিক নাশই ঘটিবে, আর যদি যুগপৎ ঐ কারণ-ত্রয় উপস্থিত হয়, তবে একই কালে উহার উচ্ছেদ হইবে। অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট রহিবে, তাহা অনাম ও অরূপ; সুতরাং অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপ। এই অবশিষ্ট সৎ বস্তু আর কেহই নহেন—উনি অজর, অমর, অনাদি, অনন্ত, অদ্বয় ব্রহ্ম। উহাঁতে সঙ্কল্প-কল্পনার স্ফুরণ মাত্রও নাই। হে রাঘব! তুমি এই প্রকার ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হও এবং বীতশোক হইয়া অবস্থান করিতে থাক।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! ঐ দেখ, সৌর কিরণপুঞ্জ এককালে আকাশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উহাকে ধারণ করিয়া রাখে, এরূপ কোন স্তম্ভ বা আধার যেমন নাই এবং তাহা যেমন সম্ভবপরও নহে, তেমনি এই যে জগৎ মায়ার বশে প্রসৃত হইতেছে, ইহারও ধারণ-জন্য কোন পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ দেশ বা কোন সীমানির্দ্দেশক কাল নাই এবং হওয়াও সম্ভবপর নহে। কেন না, যখনই জগৎ কল্পনা হয়, দেশ-কালাদি-কল্পনার প্রবর্ত্তনাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। এই যে ত্রিজগৎবিস্তার দেখিতেছ, ইহা মনেরই সঙ্কল্প, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নিমিত্ত বায়ুর অভ্যন্তরগত যেমন সৌরভকণা, তেমনি ইহা অতি স্বচ্ছ, অতি লঘু ও অতি শান্ত।

হে সাধুশীল! ঐ যে চিদ্‌বৈচিত্র জগদণু, ইহার নিকট বায়ুমধ্য-গত গন্ধকণিকাও সুমেরুশৈলবৎ সুবিশাল। কেন না, বায়ুর অভ্যন্তরে যে-গন্ধকণা সঞ্চরণশীল, তাহা আঘ্রাণ দ্বারা অন্যে অনুভব করিতে পারে; পরন্তু জগদণুকে অনুভব করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হয় না। লোকে যেমন নিজের দেখা স্বপ্ন নিজেই অনুভব করিতে পারে, অপরে তাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারে না, এবং নিজের মনোরথ দ্বারা যাহা কল্পনা করা যায়, তাহা যেমন কল্পনাকারীর স্বচক্ষেই কেবল প্রতিভাত হয়, তেমনি এই জগৎও যাঁহা হইতে উদ্ভূত, কেবল তিনিই ইহার অনুভব করিবার যোগ্য। গন্ধকণার সহিত বৈষম্য এই যে, তাহা সর্ব্বসাধারণেরই অনুভাব্য; কিন্তু তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম এই জগদণু সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে। এই ইতিহাসে ত্রসরেণু মধ্যে ইন্দ্রের অবস্থিতি ঘটনার উল্লেখ আছে।

একদা এক কল্পবৃক্ষের কোন একটা যুগল শাখায় এক উডুম্বর ফল উৎপন্ন হয়। সুর ও অসুরাদি নিখিল প্রাণী সেই ফলাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া মশকবৎ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই স্থানত্রয় ঐ উডুম্বরের ভয়ঙ্কর কপাট; চিতের বৈচিত্র্য-গুণে ঐ ফলটী অতি মনোহর এবং বাসনাধনে পরিপূর্ণ। সর্ব্বপ্রকার অনুভব উহার সৌরভ এবং চিত্ত উহার মধুর স্বাদ। ঐ উডুম্বর বৃক্ষ ব্রহ্ম-স্বরূপ; উহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবী জগৎসত্তারূপ বহুশাখা বিদ্যমান। সেই সকল শাখার অভ্যন্তরে ঐ ফলটী বিরাজিত। যাহা অহঙ্কার, তাহাই উহার বৃহৎ বৃন্তস্বরূপ; এবং সতত সমান আলোকে উহা সমুদ্যোতিত। ঐ ফলের প্রকট প্রফুল্ল মুখ—জ্ঞান; উহা সাগর ও সরিৎরূপ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত; এবং পঞ্চতন্মাত্র কোষ দ্বারা পরিবৃত। ঊর্দ্ধে যে তারকাস্তবক প্রভাসিত, তাহারা উহার অঙ্গবিচ্যুত নীহারকণা। যখন মহাকল্পের অবসান হয়, তখন উহা পাকিয়া পড়িয়া যায়। ঐ উডুম্বর সুরাসুরাদি-রূপ মশকসমূহে পরিপূর্ণ; উহার মধ্যে ত্রিভুবনপতি সুরেন্দ্র বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে মনে হয়, যেন মধুপূর্ণ কলসের উপর মধুমক্ষিকাগণের রাজা উপবিষ্ট আছেন। গুরুপদে-

শের অভ্যাসে তদীয় কিঞ্চিদাবরণ ক্ষয় পাইয়াছে। ঐ সুরেন্দ্র মহাত্মা; তিনি সর্ববিধ কল্পনার সীমাস্ত-স্বরূপ আত্মবস্তুর ভাবনা করেন। পূর্বাপর বিচারে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা বীর্য্যবান্ নারায়ণপ্রমুখ দেবগণ কোন এক নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঐ সময় পূর্বোক্ত ইন্দ্রসহ প্রবল পরাক্রমশালী অসুর-দলের যুদ্ধারম্ভ হইল। সমরাঙ্গনে অসুরেরা অস্ত্রানল-জ্বালা উদ্গিরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে সেই যুদ্ধে ইন্দ্র অমিতবীর্য্য অসুর-দলের হস্তে পরাজিত হইলেন এবং রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাইতে লাগিলেন। অসুরদলও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। পাপচেতা ক্ষুদ্র লোক যেমন কুত্রাপি শান্তি প্রাপ্ত হয় না, তেমনি ইন্দ্র অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াও অসুর-শত্রুগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না বা কুত্রাপি নিজের বিশ্রাম-স্থান লাভে সমর্থ হইলেন না। সেই শত্রুদল তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া যৎকালে কিঞ্চিৎ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন ইন্দ্র সেই অবসরে স্বীয় স্থূল দেহের সঙ্কল্প আপনাতে লীন করিয়া সৌর কিরণ পুঞ্জের মধ্যগত কোন একটী ত্রসরেণুর অন্তরালে সম্বিদাকারে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই অবস্থা দর্শনে মনে হইল, যেন কোন কমলকোষের মধ্যে গিয়া মধুকর লুকাইত হইল। ইন্দ্র তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ অতীত হইল; পরে তিনি সমাশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে ইন্দ্র সেই ভূতপূর্ব্ব সমরবিবরণ বিস্মৃত হইয়া একেবারে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তিনি আর অন্যত্র কোথাও গেলেন না।

অনন্তর কল্পনার সাহায্যে সুরেন্দ্র সেই স্থানেই গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং আপনাকে গৃহমধ্যস্থ মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্র স্বীয় সিংহাসনে বসিতেন; তথায় বসিলে তাঁহার অন্তরে যেরূপ আনন্দানুভব হইত, অধুনা স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত গৃহমধ্যে কল্পিত পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াও তাঁহার তেমনিই আনন্দানুভূতি হইতে লাগিল। তৎপরে ইন্দ্র তথায় এক কল্পনাময় নগর নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন,— সেই নগরের প্রাচীর ও তত্রত্য মন্দিরশ্রেণী মণি, মুক্তা ও প্রবালদলে

নির্ম্মিত। পরে তিনি সেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—সেখানে এক বিপুল জনপদ বিদ্যমান। সেই জনপদের মধ্যে মধ্যে বিবিধ পর্ব্বত আছে, অরণ্য আছে, গ্রাম আছে, পুরী আছে, গোশালা আছে। তথাবিধ কৃতসঙ্কল্প ইন্দ্র এইরূপে ক্রমশঃ তথায় সমগ্র জগদ্বিস্তারই অবলোকন করিলেন, দেখিলেন,—সেই জগতের অভ্যন্তরেও নানা নদ-নদী-গিরি-সাগর বিরাজমান। বর্ষ মাসাদি কালভেদ, এবং যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ সকলই সেই জগতে চলিতেছে।

অতঃপর ইন্দ্র সঙ্কল্পের সাহায্যে সে স্থানে ত্রিবিধ জগৎ কল্পনা করিলেন; দেখিলেন,—তথায় পাতাল আছে, পৃথ্বী আছে, আকাশ আছে, স্বর্গ আছে; চন্দ্র-সূর্য্য আছে। সুরাধিপতি ইন্দ্র এইবার সেই ত্রিজগতের অভ্যন্তরে একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বিবিধ বিভূতিভোগে কাল কাটাইতে লাগিলেন কিয়ৎকাল পরে তাঁহার কুন্দ নামে এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্র অতি বীর্য্যশালী। ক্রমে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ইন্দ্র তথায় রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার যখন আয়ুঃশেষ হইল, তখন তিনি স্বীয় দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্নেহবিহীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর তৎপুত্র কুন্দ ত্রৈলোক্যের রাজা হইলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র উৎপন্ন হইল। তিনিও যথাকালে আয়ুঃশেষে পরম পদ লাভ করিলেন। কুন্দের যিনি পুত্র হইলেন, তিনিও পিতার ন্যায় রাজ্য পালনপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিলেন। অবশেষে যখন আয়ুষ্কাল ফুরাইল, তখন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

হে সুন্দর, বিদ্যাধর! এইরূপে ইন্দ্রের সেই কল্পিত রাজ্যে তাঁহারই পুত্র পৌত্রগণ রাজা হইয়া আসিতেছেন। ক্রমে সহস্র পুরুষ-অতীত হইয়াছে; এখনও সেই ইন্দ্রের বংশধরগণই উত্তরোত্তর রাজা হইয়া সেই রাজ্য ভোগ করিতেছেন। সেই ত্রসরেণুর মধ্যে সেই যে সঙ্কল্প-কল্পিত জগৎ আছে, তাহাতে এখনও ইন্দ্রবংশধরেরাই ইন্দ্রপদ লাভ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেছেন। জানিবে,—সেই আকাশ-মধ্য-গত সৌরকরপূত ত্রসরেণু ক্ষত বা বিগলিত হইয়া গেলেও সেই যে ইন্দ্ররাজ্য, তাহা এখনও নষ্ট হয় নাই।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত। ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

ভুষুণ্ড কহিলেন,—ঐ যে ত্রসরেণুর মধ্যগত জগতের উল্লেখ করিলাম; ঐ জগতে ইন্দ্রের বংশধর জনৈক সদ্‌গুণশালী রাজা একদা সুরাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই যে তাঁহার জন্ম হইল, উহাই তাঁহার শেষ জন্ম। ঐ দেহের অবসান হইলে তাঁহাকে আর জন্ম লইতে হইবে না। তিনি একেবারেই নির্ব্বাণপদবী লাভ করিবেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ঐ রাজা বিদিতবেদ্য হবির্ভোজী দেবগণের অধিপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রবংশে রাজা হইয়া নিয়ত কেবল যথালব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ত্রিজগতে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদা দানবদলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। অনন্তর অজ্ঞানোত্তীর্ণ সুরপতি এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে কোন কার্য্যবশতঃ তিনি মৃণালতন্তুর অন্তরালে বাস করিতে লাগিলেন। সেই যে সূক্ষ্ম মৃণালতন্তু, তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়াও যুদ্ধে জয় কিম্বা পরাজয় প্রভৃতি অশেষবিধ ঘটনার অনুভব তিনি করিতে লাগিলেন। ঐ দেবাধিপতি পরম জ্ঞানী ছিলেন। একদা তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, আমি বিধিমত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবলোকন করি। ইচ্ছা মাত্র তিনি একান্তে অবস্থিত হইলেন এবং ধ্যানবলে তাহাই দর্শন করিতে লাগিলেন। তদীয় বাহ্য ও আভ্যন্তর বিক্ষেপের সমস্ত হেতু তিনি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রশান্ত হইল। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌ ও সর্ব্ববস্তুময় পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই তিনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ধ্যানাসক্ত ইন্দ্র তখন দেখিলেন,—পরব্রহ্ম সর্ব্বময়; তিনি সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান; তাঁহার সংখ্যাতীত কর-চরণ সর্ব্বত্র সুপ্রসারিত; তদীয় মস্তক, মুখ ও নয়ন সর্ব্বদিকেই বিরাজিত; তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় অসংখ্য।

তিনি সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান। তাঁহাতে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে,

তাহাদের রূপাদি বিষয় গ্রহণের কোনই শক্তি নাই; অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রূপাদি বিষয় গ্রহণের যাবতীয় শক্তি তাঁহাতেই বিরাজমান। তিনি সর্ব্বত্র অনাসক্ত; অথচ তিনিই সকলের ধারণকর্ত্তা। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। চরাচর নিখিল ভূতের অন্তরে বাহিরে, তিনিই সদা অবস্থিত। তিনি অতি সূক্ষ্ম; তাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। তিনি দূরস্থ হইলেও নিকটস্থ; রবি ও শশিরূপে সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত এবং পৃথ্বীরূপে সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থান। তিনি পর্ব্বতাকারে সকল প্রদেশেই প্রতিভাত এবং সমুদ্রাকারে সর্ব্বত্রই অবস্থিত। সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর সাররূপে তাঁহার অবস্থিতি। আকাশরূপে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান। তিনি সংসাররূপে—এই বিশাল জগদাকারে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বত্র মোক্ষরূপে বিরাজ করিতেছেন, আদ্য চিদাকারে স্ফুরিত হইতেছেন; এবং সর্ব্ব বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অথচ এ সমুদায়ের কিছুই তাঁহাতে নাই; তিনি সর্ব্ব-বিবর্জ্জিত। তিনি ঘটে আছেন, পটে আছেন, অনলে আছেন, অনিলে আছেন, তরু, গিরি, সাগর, আকাশ, কোথায় তিনি নাই? সর্ব্বত্রই তাঁহার বিদ্যমানতা।

এইরূপে পরব্রহ্মের স্বরূপ সন্দর্শন করিতে করিতে দেবাধিপতি ইন্দ্র সেই সূক্ষ্ম পরমাণুগর্ভেই নানাপ্রকার প্রাণীর নানা চেষ্টা ও স্বর্গ-নগরাদি-সমাকুল ত্রিভুবন অবলোকন করিলেন। আবির্ভাব ও তিরোভাব-কালাত্মক চিন্ময়-আত্মার অভ্যন্তরেই মরীচের মধ্যস্থ তীক্ষ্ণতার ন্যায় এবং আকাশস্থ শূন্যতার ন্যায় এই ত্রিভুবন বিদ্যমান। জীবভাব-বিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানে এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে করিতে ইন্দ্র ক্রমশঃ ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি ধ্যানবলে সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মে বিলোকনপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এ সৃষ্টি আমারই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্র প্রথমে পাতাল হইতে স্বর্লোকান্ত সর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে ইন্দ্রলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ইন্দ্রদর্শনে স্বীয় 'ইন্দ্র' ইত্যাকার অহংসংস্কারের উদ্বোধনে, স্বয়ংই ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন। ইন্দ্রত্ব লব্ধ হইবার পর তিনি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ত্রিজগৎ শাসন করিতে লাগিলেন।

হে বিদ্যাধরগণের অধীশ্বর! সেই দেবরাজ পূর্ব্বতন ইন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন হইয়া এখনও পর্য্যন্ত সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছেন। সেই যে তিনি মৃণালসূত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, জ্ঞানযোগের অভ্যাসে সে ঘটনা তাঁহার সমস্তই স্মরণ আছে। ত্রসরেণুর মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্র আর মৃণালসূত্রের মধ্যগত ইন্দ্র, এই যে উভয় ইন্দ্রের কথা কহিলাম, এই আকাশমধ্যে ঐ রূপ শত সহস্র ইন্দ্রের ঐরূপ শত সহস্র ঘটনা চলিয়া গিয়াছে এবং এই বর্ত্তমান কালেও চলিতেছে। যে কালে যোগভূমিকাগুলি একে একে সকলই অধিগত হয়, তখন ব্রহ্মপদ অর্দ্ধসাক্ষাৎকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইতে থাকে। এই যে অতি দীর্ঘা মায়া-নদী দৃশ্যরূপ তরঙ্গভঙ্গিমায় চঞ্চল হইতেছে, ইহাও তখন সেই ব্রহ্মপদের অনুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে সেই সত্যস্বরূপ পূর্ণালোকে সম্পূর্ণ বিলয় পাইয়া যায়।

হে নিষ্পাপ! আত্মদর্শন হইলে মায়ার যে এইরূপে মূলোচ্ছেদ হয়, ইহা বড় একটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। মায়ার যে উৎপত্তি, তাহাও আকস্মিক দেখা যায়; কেন না, বাস্তবিক তো মায়া নাই অথচ যে কোন কালে যথা তথা হইতে মায়ার প্রাদুর্ভাব হয়। মায়ার যেমন আবির্ভাব, অমনি উহা দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া প্রকাশমান। যেমন বারিদ হইতে বৃষ্টি, তেমনি অহম্ভাবরূপ বৈচিত্র্য হইতেই ঐ মায়ার উৎপত্তি। যদি তত্ত্বদৃষ্টি দিয়া স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আতপ-তাপে নীহারবিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্ম সর্ব্ব-সাক্ষিভূত এবং পরমার্থদর্শনে সর্ব্ববিধ বিকল্পশূন্য; এই নিমিত্ত অহম্ভাববশে বিতত মানস বিকল্প বা ইন্দ্রিয়বিকল্প কিছুই ইহাঁতে নাই। এইরূপে বিচার করিতে করিতে সমস্ত শেষ করিলে, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আকাশ ও চিদাভাসস্বরূপ ব্যতীত কিছুই নহে।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ভুষুণ্ড কহিলেন,—বিদ্যাধর! যথায় 'আমি' 'তুমি' ভাব বিদ্যমান, জগৎ সেখানে পূর্ব্ব হইতেই বিরাজ করে। এই কারণ পরমাণু ও ত্রসরেণু এই উভয়ের মধ্যে ও ইন্দ্রের জগদাবির্ভাব ঘটিল। এই জগদ্ভ্রম আকাশ-নীলিমার ন্যায় উৎপন্ন; ইহার মূল অহম্ভাব। যিনি অহম্ভাবাভিমানী আত্মা, বুধগণের মতে তিনিই এই জগত্ত্রয়ের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অহম্ভাব যেন সূক্ষ্ম বীজ; সে বীজ ব্রহ্ম-পর্ব্বতের গগন-কাননে বাসনা-রসে পরিষিক্ত হয়; পরে তাহা হইতেই এই জগৎবৃক্ষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ যে নক্ষত্রনিকর দেখা যায়, উহারাই সেই জগৎবৃক্ষের পুষ্পপ্রকর; নীরদ-নীহারিকাময় নগমালা উহার পল্লবদল; নদীনিচয় উহার শিরাসন্ততি এবং বাসনামূলক ভোগরাশি উহার ফলসমষ্টি। অহম্ভাব যেন জল; এই জগৎকে তাহার স্পন্দ বলা যায়। চিতের যাহা চমৎকারিতা, তাহাই উহার মধুরিমা; পরপর বাসনা-বিস্তার ঐ অহম্ভাবরূপ জলের স্পন্দ-রূপ জগদূর্ম্মিমালার দ্রব-দ্রব্য। তারকানিকর ঐ অহম্ভাব-জলের বিন্দুরাজি; অনন্ত আকাশ উহার অনন্ত খাত; এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব ঐ অহম্ভাবরূপ জলাশয়ের ঘোর জলভ্রম। গিরিমালা উহার তরঙ্গ-বুদ্বুদাবলী; এ জগতে যত কিছু জীব আছে, তাহারা উহার আলেখ্য চিহ্নবৎ রেখা-পঙক্তি; চন্দ্র ও সৌরালোকরাশি উহার ফেনপুঞ্জ; এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহা ঐ অহম্ভাবরূপ জলাধারের বুদ্বুদমালা। এই জলাশয়ের উপর একটা বড় রকমের সেতু আছে, উহার নাম মোহসেতু; এই সেতুই মোক্ষ-পুরী প্রবেশের প্রতিবন্ধক। এই যে ভূভাগ দেখিতেছ, ইহা ঐ অহম্ভাব-জলাশয়ের পঙ্কপিণ্ড। যে সকল চিদাভাসক জীব, তাহারা এই জলাশয়ের বাসনা। পবনস্পন্দনের ন্যায় ঐ অহম্ভাব কদাচিৎ প্রতীত হয়, আবার কখন কখন বা দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এ কথা তোমায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তুমি জানিবে—এই অহম্ভাবই জগৎ। অপিচ এই অহম্ভাব যেন একটা কমল; ইহার সৌরভকেই তুমি জগৎ বলিয়া বুঝিও। যেমন

ও বায়ুস্পন্দ পরস্পর অভিন্ন, তেমনি অহম্ভাব ও জগৎ পরস্পরে কোনই ভেদ নাই। উভয়ে একই বস্তু। যেমন দ্রবত্ব জলের এবং উষ্ণত্ব অগ্নির, তেমনি এই জগদ্ভাব অহম্ভাবেরই। জগৎ ও অহম্ভাব এই উভয়ের মধ্যেই উভয় বিদ্যমান। এই অহম্ভাব ও জগৎ পরস্পরের আনুকূল্যেই প্রাদুর্ভূত; এবং আধার ও আধেয়ভাবে পরিস্ফুট। যে জন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য বস্তুনিচয়ের অভাব দ্বারা জগতের বীজভূত অহম্ভাবের ক্ষালন করিতে সক্ষম, যেমন জল-সহযোগে চিত্র ধৌত করে, তেমনি তিনিও এই জগৎমূলকে ধৌত করিতে পারেন। বিশদ কথা এই যে, 'অহং' বা 'ত্বং' নামে কোন পদার্থই নাই; সুতরাং এই যে 'ত্বং' 'অহং' ভাব, ইহাও কিছুই নয়। উহা শশশৃঙ্গবৎ অলীক বস্তু। ব্রহ্মপদ —অতি বিতত ও অনন্ত; সঙ্কল্পের লেশ মাত্র তাহাতে নাই—অহম্ভাবেরও কোন বীজ নাই। অতএব ঐ অহম্ভাব—অবস্তু অসত্য। লৌকিক ব্যবহারে সম্ভবপর হইলেও কারণ উহার কিছুই নাই। যেমন বন্ধ্যার পুত্র, তেমনি ইহা অলীক পদার্থ। অহম্ভাব কোথাও নাই; যখন উহা নাই, তখন জগতের অস্তিত্ব কোথাও নাই। এ জগতের অভাবই যখন সুসিদ্ধ, তখন যে যৎকিঞ্চিদবশিষ্ট, তাহাই চিন্ময় নির্ব্বাণ বৈ আর কিছুই নয়। তাই বলিতেছি, তুমি শান্ত হও—সুখে অবস্থান করিতে থাক। এখন বুঝিয়া দেখ, ঐরূপ যুক্তিযোজনায় এই জগৎ ও অহম্ভাব উভয়েরই অভাব প্রতিপন্ন হইল। কাজেই বাহ্যিকরূপের কথাই বল আর মনের কথাই বল, কিছুই তো তোমার নাই। যাহার অভাব, তাহার একেবারেই অভাব; সুতরাং অবশিষ্ট কেবল তুমিই;—তুমিই শান্তভাবে অবস্থিত।

বিদ্যাধর! তুমি সমীচীন জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সাবধানে থাক, আর কখনই অমূলক ভ্রম অর্জ্জন করিও না। জানিও—তুমি কল্পনা-কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত;—শুদ্ধ শান্ত শিবময় নিত্য ঈশ্বর। এই আকাশ অধ্যারোপক্রমে পর্ব্বতবৎ হইয়া উঠে, আবার অপবাদক্রমে এ জগৎ-প্রপঞ্চ পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম আকাশরূপে প্রতিভাত হন।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ভুষুণ্ড কহিলেন,—আমি এই পর্য্যন্ত বলিলাম; পরে তাকাইয়া দেখিলাম,—বিদ্যাধরপতি সমাধি-মগ্ন হইয়াছেন; তাঁহার বাহ্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সে চেষ্টায় কোন ফল হইল না। বিদ্যাধররাজ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। তিনি তখন পরম নির্ব্বাণ পদ অধিগত হইলেন। বাহ্য দৃশ্যবিষয়ে তাঁহার আর তখন দৃষ্টি নাই। আমি যতটুকু উপদেশ দিলাম, তাহাতেই তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার নিমিত্ত আমাকে আর বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না।

তখন বশিষ্ঠদেব রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—রামচন্দ্র! আমি এই কারণেই বলিয়াছিলাম যে, জলে তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা যেমন সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া যায়, তেমনি শুদ্ধ সুনির্ম্মল চিত্তে উপদেশ দিলেও তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তাদৃশ উপদেশে সহজেই ফল জন্মিয়া থাকে; জানিও—অহম্ভাব বলিয়া কোন একটা পদার্থ নাই; সুতরাং অন্তঃকরণে তুমি আর অলীক অহম্ভাবনা পোষণ করিও না। যাহাতে শান্তিসুখ লাভ করা যায়, তাহারই জন্য সযত্ন হও। ইহা ভিন্ন তোমাকে আর কি উপদেশ দিব? জানিও,—ইহাই উত্তম উপদেশ। মসৃণ মুকুরের উপর যদি নির্ম্মল মুক্তাফল রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়, তেমনি এই যে উত্তম উপদেশ, ইহাও অভব্য অধম লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিলে নষ্ট হইয়া থাকে; ফল কিছুই দর্শে না। যদি সূর্য্যকান্তমণির উপর সৌরকিরণ পতিত হয়, তাহা হইলে সে যেমন অগ্নি উদ্গিরণ করে, তেমনি এই উপদেশ যখন ভব্য সভ্য পুরুষের চিত্তে পতিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়, তাহাতে বিচার উপস্থিত হয়; সে বিচারে

মোহদাহক অনল উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। দুঃখ যেন কণ্টকময় শাল্মলী-বৃক্ষ; একমাত্র অহম্ভাবনাই উহার বীজস্বরূপ। যাহা মমত্ব ভাব, তাহা উহার মূল-স্কন্ধাদি; এই সকল হইতেই অনুরাগাদি কত শত শাখার উৎপত্তি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞান যাহার নাই, এমন লোকও তো দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই যে দীর্ঘজীবিত্বের হেতুভূত, এরূপ নিয়ম অবশ্য নাই। যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যাস করিয়া করিয়া চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বল্পমাত্র উপদেশ-দানেই অভয়প্রদ পরমপদ তাঁহাদের অধিগত হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পক্ষিবর ভুষুণ্ড জীবন্মুক্ত; তিনি আমাকে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত সকল বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; মনে হইল, যেন জলদ-জাল ঋষ্যমূক শৈলে প্রতিভাত হইল। বৎস! সেই জীবন্মুক্ত ভুষুণ্ড বায়স এবং তদ্বর্ণিত সেই বিদ্যাধর, এই উভয়ের সহিতই পরে আমি বিদায়-সম্ভাষণ করিলাম; অনন্তর মুনিজন-পরিশোভিত আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাম! উপদেশবশে বিদ্যাধরের যেরূপে সত্বর তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভুষুণ্ড-বায়সের উক্তি-প্রত্যুক্তি তোমার নিকট এই আমি প্রকাশ করিয়া কহিলাম। ভুষুণ্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎকারাদি কেবল অল্প দিনের কথা নয়; সে কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় একাদশ দিব্য যুগ অতীত হইয়া গেল।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! যে ইচ্ছা শুভাশুভ ফল উৎপাদন করে, যাহাতে সংসারফল জন্মাইয়া থাকে, যদি অহম্ভাব পরিত্যক্ত হয়, তবে অন্তরেই তাহা উপশান্ত হইয়া যায়। অহম্ভাবের অভাবজ্ঞান অভ্যাস

করিতে হয়; অসকৃৎ অভ্যাসে লোষ্ট্র, পাষাণ ও সুবর্ণ, সর্ব্বত্রই সমান জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে সংসারপীড়ার অবসান হয়। আর কখনই সংসারপীড়া পাইতে হয় না। পরমাত্মজ্ঞান যেন অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ, তাহাতে বহ্নির যোগ হইলে, তাহার প্রভাবে এই অহম্ভাবাদি দৃশ্য বস্তু সকল ভস্মসাৎ হইয়া যায়। যত কিছু দৃশ্য বস্তু আছে, এই দেহযন্ত্রও তাহার অন্যতম; নলীকাস্ত্রের মধ্যগত অগ্নিচূর্ণে অগ্নি সংযুক্ত হইলে তদন্তর্গত প্রস্তর গুলিকাদি যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তেমনি এই দেহ-যন্ত্রও পরমাত্মজ্ঞানের উদয়ে অহম্ভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাহা হইতে বহুদূরে গমন করে। অহম্ভাবের অভাবভাবনায় চৈতন্যজ্যোতি প্রতিফলিত হয়; তাহার প্রভাবে অহম্ভাবরূপ হিমজাল কোথায় যেন উড়িয়া সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত চৈতন্য-জ্যোতিতে অহম্ভাবরস শুষ্ক হয়; তাহাতে দেহরূপ পত্র বিবর্ণ হইয়া যায়। পরন্তু ঐ অহম্ভাবরস তখন যে কোথায় গমন করে, তাহা অতি দুর্জ্ঞেয় বিষয়। অহম্ভাবের অভাব ভাবনা যেন সৌর কিরণ; উহা যখন দেহপত্র হইতে অহম্ভাবরসকে বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, তখন তাহা পরভাগ বা ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর যেন বটবীজ; উহা শয্যা, পঙ্ক, পর্ব্বত, গৃহ, আকাশ, জল, স্থল, যেখানেই থাকুক,—স্থূল, সূক্ষ্ম, নিরাকার, রূপান্তরিত, সুপ্ত, প্রবুদ্ধ, ভস্মীভূত, গৃহীত, স্থানান্তর-নীত, নিমগ্ন, দূরস্থ বা অন্তিকস্থ, যাহাই না কেন হউক,—অন্তরে অহম্ভাবরূপ অঙ্কুর রাখিয়া তাহা হইতে সংসারাখ্য শাখা প্রশাখা ক্ষণমধ্যেই প্রকাশিত করিয়া থাকে। অহম্ভাবকেও বটবীজ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কেন না, এই বীজের অন্তরেই তো দেহাকার বৃহৎ বনস্পতি বিদ্যমান। এই বনস্পতিই যত্র তত্র সংসারাখ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া থাকে। বীজগর্ভেই শত শত শাখা পত্র ও পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধ বনস্পতি বিরাজিত। ইহা যেমন প্রত্যক্ষ, এই নিখিল প্রপঞ্চজ্ঞানযুত দেহ যে সূক্ষ্ম অহম্ভাবের অন্তর্নিহিত, তাহাও তেমনি জ্ঞানচক্ষুর গোচরীভূত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চিদাকাশকেই নিজের স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করেন, দেহ সত্ত্বেও অহম্ভাবের সত্তা তাঁহার থাকে না; সে পুরুষ জীবন্মুক্ত,—বিদেহ-মুক্ত হইয়া থাকেন। অসত্য অহম্ভাববীজ তদীয় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ

মহানলে দগ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং সে বীজের গর্ভ হইতে আর কখনই সংসারবৃক্ষ আবির্ভূত হয় না।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মৃত্যু ঘটিলেই মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়; এ কথা মূঢ় লোকেই বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাদের ঐরূপ কথা সম্পূর্ণই অসত্য। মনীষিগণের মত এই যে, পূর্ব্বভাবের বিস্মরণ ও তত্তৎ ভোগাদৃষ্ট-ক্ষয় যাবৎ পর্য্যন্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত যে সঙ্কল্পান্তরের দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহারই নাম মৃত্যু। তোমার সম্মুখেই ঐ দেখ, ঐ মেরু মন্দর প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ জলবিম্বিত শৈলজালবৎ অবাস্তব হইলেও যেন দিগ্মারুত-যোগে চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে। একই রূপ ভোগাদৃষ্ট লইয়া যাহারা বিদ্যমান, তাহাদিগের অন্তরে অনন্ত সংসার-পরম্পরা কদলীত্বকের ন্যায় পর পর সমাকারে সম্মিলিত। আর যাহারা ভিন্নাকার ভোগাদৃষ্টশালী, তাহাদিগের সংসার-সংস্থান ঐরূপ নহে; তাহা শূন্যে শূন্যাকারেই বিরাজমান।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি বলিলেন, ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে মেরু প্রভৃতি ভূধর যেন মারুতবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে! আপনার এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি, বুঝিলাম না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বীজের অভ্যন্তরে যেমন বিশাল তরু বিরাজমান, তেমনি প্রাণের মধ্যে চিত্ত এবং চিত্তমধ্যে এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ বিদ্যমান। নদীজল নিসর্গতই তরল; তাহা যেমন জলধিজলে মিশিয়া যায়, তেমনি জীবের পঞ্চত্ব লাভের পর তাহার প্রাণপবনও গগনগত মহামারুতের সহিত মিলিত হয়। প্রাণবায়ুগণ যখন আকাশে বায়ুবেগে পরিচালিত হয়, তখন উহাদের অন্তরালে সঙ্কল্পময় জগৎ-সকলও ইতস্ততঃ

সঞ্চরণশীল হইয়া থাকে। আমি জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা স্পষ্টতই দেখিতে পাইতেছি, নিখিল দিগ্বলয়ই সঙ্কল্পাত্মক অশেষ বিশ্বে প্রাণ-পবনময় আকাশ-বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ। আমার ন্যায় তুমিও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে,—ঐ সঙ্কল্পময় বিশ্বপ্রপঞ্চে মেরু মন্দর প্রভৃতি গিরীন্দ্রগণ প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। তৈল যেমন তিলমধ্যে প্রগাঢ়-সংশ্লিষ্ট, তেমনি আকাশ-মারুতের অভ্যন্তরে প্রাণপবন, প্রাণপবনের অন্তরালে মন এবং মনের অন্তরালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিরাজিত। গগনপ্রায় মনোময় প্রাণপবন যেমন গগন-পবনের বেগভরে ইতস্তত পরিচালিত হয়, জানিবে,—তাহার অঙ্গীভূত জগৎপুঞ্জও তেমনি পরিচালিত হইয়া থাকে। এই ত্রিজগৎ স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ এবং ব্যোম ও ক্ষিতি প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত হইলেও বাস্তব পক্ষে কোনই বস্তু নহে; ইহার বস্তুত্ব না থাকিলেও ভ্রমদর্শনে কুসুমাদির সৌরভবৎ ইহা সর্ব্বত্রই সঞ্চরণশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হে রাঘব! যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর-নিচয়, তেমনি এই সঙ্কল্পময় জগৎ-পুঞ্জ অলীক বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু এই জগৎপুঞ্জের অলীকত্ব জ্ঞান-দৃষ্টিতেই পরিদৃষ্ট হয়; বাহ্য-সৃষ্টিতে উহা দৃষ্টিগোচর করা যায় না। ঐ জগৎজাল আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম; এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই উহা বিদ্যমান। কিন্তু মাত্র কল্পনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহারা কিছুই নহে; কাজেই সম্পূর্ণই অচালিত। যেমন পবনগত শূন্যময় সৌরভ সর্ব্বত্র চালিত হয়, এই শূন্যস্বরূপ জগজ্জালও তেমনি চালিত হইতেছে। যদি ঘটাদি পাত্র স্থানান্তরে নীত হয়, তথাচ তদভ্যন্তরগত আকাশের যেমন বিপর্য্যয় কিছুই ঘটে না, তেমনি এই ত্রিজগৎ-ভ্রমময় চিত্তের স্পন্দনাদি হইতে থাকিলেও আত্মা যিনি, তিনি নিশ্চলরূপেই অবস্থিত। যাহারা মৃত ব্যক্তি, তাহাদিগের কাছে এ জগৎ কেবল সঙ্কল্পময় বলিয়া যেমন অলীক বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি তোমার দৃষ্ট জগৎও মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। জগৎ বলিয়া এই যাহা সমুদিত হইতেছে, উহা কেবল অলীক ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নহে। পরন্তু ঐ যে জগদ্ভ্রান্তি, উহারও প্রকৃত পক্ষে উদয় নাই বা লয় নাই। যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন ঐ ভ্রান্তিই আবার

ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া বিবেচনাস্পদ হইবে। ঐ জগৎ প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্তিময়; তথাচ উহাকে যদি তুমি সমুদিত বা আকাশপবন-বেগে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও নৌকামধ্যস্থ আরোহীরা যেমন নৌকার চলন অনুভব করিতে সক্ষম, তেমনি জীবনিবহ পৃথিবীস্থ হইলেও উহার স্পন্দনাদি লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। চিত্রণ-নিপুণ ব্যক্তি সাধারণ কাষ্ঠস্তম্ভে যোজনায়ত মহান্ প্রাসাদ চিত্রিত করে, কিন্তু উহার ক্ষুদ্রত্ব কল্পনায় উহা যেমন ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর অন্তরালেও বিপুলত্ব কল্পনায় বিপুল জগৎ অনুভূত হইয়া থাকে। মূষিকেরা রত্নাগারে প্রবেশ করে; কিন্তু তাহারা যেমন রত্ন অপেক্ষা ধান্যাদি বস্তুই সমধিক পচ্ছন্দ করিয়া থাকে, এবং বালকেরা যেমন সুবর্ণময় ভূষণাদি অপেক্ষা মৃৎপুত্তলিকা প্রভৃতিতেই বিশেষ আদর প্রদর্শন করে, তেমনি ক্ষুদ্রাশয় অজ্ঞ লোকেরাই যাহা ক্ষুদ্রতম বস্তু, তাহাকেই মহৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। চিত্তের ইহকাল, পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলের ভাবনা—অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবাত্মার অলীক ভ্রমবশতই হয়। এইটী হেয়, আর এইটী উপাদেয়, এই প্রকার জ্ঞানই আন্তরিক অজ্ঞতা; মানব সর্ব্বজ্ঞ হউক, তথাচ যত দিনে না তাহার ঐরূপ ব্যবহারিক প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তত দিন কিছু না কিছু মূঢ়তা তাহার থাকিবেই। এই নিমিত্তই সাধারণ পুরুষের স্বীয় অবয়বদর্শনের ন্যায় সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভনামা পুরুষ নিজের সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও অন্তরে বিশাল জগৎ দেখিয়া থাকেন। আত্মাকাশ শুদ্ধ চৈতন্যময়, অজ, অনন্ত, অব্যয়। তিনি মায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন বলিয়াই এই সমগ্র জগৎ আত্মাকাশেরই অবয়বরূপে প্রকাশমান। যদি লৌহপিণ্ড কখন চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে নিজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাকারে বিরাজিত ক্ষুর ও সূচীপ্রভৃতি বস্তুগুলি দর্শন করিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তে বলা যায়, জীবও নিজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ফলেই এই ভ্রান্তিপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করিতেছে। মৃৎপিণ্ড বাহ্য দৃষ্টিতে অচেতন হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্ব বস্তুই আত্মময় বলিয়া সচেতন; উহার যেমন শরাবাদি পাত্র নিজের অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়, তেমনি জীবও এই জগদ্‌বিস্তারকে স্বীয় অঙ্গরূপে অবধারণ করিতেছেন। ঐরূপে আরও

বলা যায়, অঙ্কুর সচেতন বা অচেতন যাহাই হউক, সে যেমন বৃক্ষ শব্দার্থ বৃক্ষত্বকে এবং দর্পণ যেমন বাহ্য ও আভ্যন্তর দর্শনে প্রতিবিম্বিত ও অপ্রতিবিম্বিত নগরকে ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত দর্শনে অনুভব ও অননুভব করিতে থাকে, তেমনি যিনি অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্ম,—তিনিই মাত্র ত্রিজগৎ অবলোকন করিতেছেন।

বৎস! এই ত্রিজগৎ যেমন কেবল অলীক দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যময়, এই অহম্ভাব বা আমিত্বও তেমনি; বাস্তব পক্ষে দেখা যায়, উক্ত উভয়ই আত্মা; তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই নিমিত্ত অহম্ভাব ও জগৎ এ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্রই নাই। অচেতন মৃৎপিণ্ডাদি কল্পনা মাত্র; তাহা দ্বারা উপমা প্রদর্শন করিয়া আমি তোমাকে যে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাতে উপমার একাংশ লইয়াই উপমেয়ের সমতা অনুভব করিতে হইবে। এই যে চরাচর জগৎ দেখিতে পাইতেছ, ইহা বাস্তব পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপে অতি সূক্ষ্ম জীবেরই দেহ বলিয়া স্থিরীকৃত। সুতরাং যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে,—যাহা সর্ব্ববিধ বিবর্ত্ত-জ্ঞান-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ, পরম বস্তু, তাহাতে বস্তন্তরের সংশ্লেষবিরহিত নির্ম্মল হীরকের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় কিছুমাত্র ভেদ ভিন্নতা নাই। মূঢ়মতি লোকেরা যে জন্য যথায় যখন যে ভাবে যাদৃশ বিকল্পজ্ঞান উদ্ভাবিত করিয়া তুলে, চিন্ময় আত্মা তদর্থ সেখানে সেই কালে সে ভাবে সেইরূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন। আকাশে যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তেমনি মন অচৈতন্য বলিয়া তাহাতে স্বতই সঙ্কল্পোদয় সম্ভবে না। অতএব দেখা যায়, মনে যখন চৈতন্যময় আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হন, তখনই তাহাতে সঙ্কল্পোদয় ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে যে যেরূপ বিকল্পজ্ঞানই অভ্যুদিত হয়, সকলই অসৎ। চিদাকাশ অনন্ত ও সর্ব্ব পরিব্যাপ্ত, তাই সকলই চিদাকাশের;—মনের কিছুই নহে। কিন্তু অন্তরে যদি জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে কোনরূপ বিকল্পযোগই তাহাতে পরিস্ফুরিত হওয়া সম্ভব হয় না। সঙ্কল্প-কল্পিত অখিল অলীক পদার্থ যে কখন কল্পনাযোগ্য অলীক পদার্থকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, ইহা তো বালকাদির হৃদয়েও সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরন্তু বাস্তব

পক্ষে যেমন স্বপ্নলব্ধ দ্রব্য; তেমনি উহা সত্যস্বরূপে অনুভবযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণই অসত্য। তাহার কারণ এই দেখ যে, কেহ কখন কি স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কূটস্থ সত্যাত্মা সঙ্কল্প, বাসনা ও জীব, এই পদার্থত্রয়কেই চিত্রিত রাখিয়াছেন। সুতরাং বলা যায়, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যেমন স্বপ্নপুরুষেরই বাহন; পরন্তু সত্য পুরুষের নহে, তেমনি অসত্য চিত্রিত জীব, এই সঙ্কল্পময় চিত্রিত অলীক সংসারকে সত্য বোধ করিলেও তাহা যে বস্তুতঃ অসত্য, ইহা নিশ্চিতই। ঐ অসত্য সংসার অসত্য জীবের;—পরন্তু যিনি সত্য কূটস্থ আত্মা, তাঁহার নহে। ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

হে রাম! তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে সত্য সনাতন ব্রহ্ম যেমন এ জগতে জগৎস্বরূপে স্বীয় সত্তা বিস্তারপূর্ব্বক সত্যনামে নিরূপিত হন, তেমনি যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহার জগৎস্বরূপতার বিলয়ে তিনি অসত্য-নামের ভাজন হইয়া থাকেন। ঐ সত্য ব্রহ্ম যদিও অবিদ্যার আবেশে আত্মহারা হইয়া সংসারপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়েন, তথাচ তিনি যে নিত্য-মুক্ত, এ কথা ধ্রুব সত্য। কেন না, যৎকালে আতিবাহিক দেহের সহিত একমাত্র অবিদ্যার বিলোপসাধন হইয়া যায়, তখনই জীবস্বরূপ আত্মা পূর্ণরূপে প্রকট হইয়া থাকেন এবং এ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করেন। এই নিমিত্তই বলিয়া আসিতেছি, কল্পনার বশেই এ জগতের বিদ্যমানতা; বাস্তব পক্ষে উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই জগৎ-পুঞ্জ যে গগনাঙ্গনে পবনবেগে শাল্মলীতূলবৎ পরিচালিত হইতেছে, ইহা কেবল অজ্ঞানদৃষ্টিতেই অবধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলে দেখা যাইবে, ইহাই বিপুল অচলখণ্ডবৎ অচলভাবে অবস্থান করিবে। এই জন্যই বলা যায়, এই শূন্যময় সুবিস্তৃত জগৎ নিখিল পদার্থের ভাণ্ডস্বরূপ; ইহাতে অবিদ্যার বশেই অনন্ত জগৎ-পরম্পরা বিরাজমান। ইহার মধ্যে কিয়ৎসংখ্যক জীবের ভোগাদৃষ্ট তুল্য; তাই কতকগুলি জগতের সাম্য এবং কতকগুলির ভোগাদৃষ্ট অসমান, তাই কতকগুলি জগতের অনৈক্য।

হে রাঘব! এই জগৎ সকল নিজেরই অন্তরবস্থিত সমগ্র ভোগ্য

পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গাদি লোকের তুল্য এবং বিবিধ কর্ম্ম-পরম্পরায় সমাকুল দিগ্‌দিগন্ত-স্থিত জনসমবায়ে পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; তাই এ সকল জগৎ অনন্তরূপে বিকাশমান। মনে হয় বটে যে, উহারা বদ্ধমূল; কিন্তু তাহা হইলেও চঞ্চল সলিলান্তঃপাতী প্রতিবিম্বের ন্যায় একান্ত ক্ষণবিনশ্বর। উহারা চিন্ময় মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-পরম্পরার ন্যায় স্ফুরণশীল। উহাদিগকে অনেক সময় চিরস্থির বলিয়া প্রতীত হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলেও বস্তুগত্যা উহারা যে বিনশ্বর, তাহাই সুনিশ্চয়। ঐ সকল জগৎ জাগ্রদবস্থায় উন্মীলিত বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা নিমীলিতই; অন্য দিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসমান রহিলেও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দেখ, নানা নদী-নিচয়ের জল যেমন নানা নদীতে বিভিন্নভাবে অবস্থিত রহিলেও জলধিজলে বিশেষরূপেই বিমিশ্রিত; এবং গগন-প্রাঙ্গণে ঐ যে একই কালে উদীয়মান রবি, শশী ও গ্রহ নক্ষত্রাদির দ্যুতি সম্যক্ সম্মিলিত থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে যেমন অসম্মিলিত, ঐ যে জগৎ-পরম্পরার কথা কহিয়া আসিলাম, উহাদের অবস্থাও সেইরূপই।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! জীবের স্বরূপ, তাঁহার স্থূল শরীর গ্রহণের প্রকার? তদীয় পরমাত্মতা, এবং তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারের উপায়, এ সকল কি প্রকার, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যিনি আপনার সঙ্কল্পবশে চৈত্যনামে নিরূপিত হইয়া থাকেন, যাঁহার নামান্তর চিৎ এবং যিনি অনন্ত চেতনাকাশ, সেই ব্রহ্মকেই বুধগণ জীব নামে অভিহিত করেন। তিনি না সূক্ষ্ম, না স্থূল, না শূন্য, না শূন্যান্তর্গত আকাশ, কিছুই নহেন। ব্রহ্ম একমাত্র চিৎ-স্বরূপ এবং সর্ব্বগত; তিনি আপন অনুভবযোগেই প্রকাশমান। যত

কিছু সূক্ষ্ম বস্তু আছে, তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্মতম এবং যত কিছু স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও তিনি স্থূলতম। তিনি কোন বস্তুস্বরূপ নহেন, অথচ তিনি সর্ব্ববস্তুস্বরূপ। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, তিনিই অবস্থা-বিশেষে জীব নাম ধারণ করেন।

হে রঘুবর! জানিও,—যে যে বস্তুতে যে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপাদি দৃষ্টি-গোচর হয়, একমাত্র ব্রহ্মই নিজেকে, সেই সেই রূপে ভাবনা করিতে করিতে সেই সেইরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জীবব্রহ্ম যে যে কালে যে যে ভাবে যে যে বস্তু ভাবনা করেন, সে কালে সেই সেই ভাবে সেই সেই সঙ্কল্পাত্মক বস্তুরূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন। যেমন স্পন্দনদ্বারা পবনের স্বরূপ অনুমেয়, তেমনি জীবেরও স্বরূপ স্বীয় অনুভব দ্বারাই নির্ণেয়। ঐ অনুভবযোগে জীবনির্ণয় যে কি প্রকার, শিশুজনানুভূত যক্ষবৎ তাহা আমি বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকিলেও স্পন্দন ভিন্ন পবনের অস্তিত্ব যেমন বিলুপ্তবৎ বিবেচিত হয়, তেমনি সুষুপ্তি কিম্বা মুক্তিকালেও বাহ্য বস্তুর অনুভবলোপে উল্লিখিত জীবের জীবত্ব লুপ্ত হয়; তৎকালে তিনি স্বীয় ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ জ্ঞানময়; তাই তিনি ইচ্ছা করিলেই 'অহং' ভাবনাবশে দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও সেই সেই সকলের শক্তি সমুদ্ভাবিত করিয়া নিজেই বিকাশ পাইতে থাকেন। সে কালে তিনি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যসমূহে আপনাতেই পরিব্যাপ্ত হন; অথচ অসত্য হইয়াও সত্যবৎ স্ফুরণশীল সেই সেই দেশ-কালাদি-কলেবরময় নিজ সমষ্টিচিত্ততা অনুভব করেন। ঐ সমষ্টি-চিত্ত প্রকৃত পক্ষে অসংখ্যেয় নহে, তথাচ উহা হিমবিন্দুবৎ অসংখ্যরূপেই প্রকট। জীবন থাকিতেও স্বপ্নকালে যেমন নিজ মরণ অনুভবগম্য হয় এবং ঐ স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে কদাচিৎ ব্যাঘ্রাদিরূপে ভাবনা করিলে স্বীয় অবয়বসমূহও যেমন ব্যাঘ্রাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, জানিবে,—জীবের সমষ্টি-চিত্তজ্ঞানও তেমনি অসত্য। জীব আপনার বিশুদ্ধ চিন্ময়তা ভুলিয়া গিয়া যখনই ঐরূপ অবস্থা ভাবনা করিতে থাকেন, তখনই তদবস্থ হইয়া উঠেন। তৎপরে তথাভূত জীব নিজেকে স্থূলসমষ্টি বিরাড়াত্মরূপে স্ফীতাকার ভাবনা করিতে থাকেন।

তাহাতে তিনি নিজেই মনঃসমষ্টিস্বরূপ দ্রবময় চন্দ্রবিম্ববৎ অনুভব করেন। ক্রমে আত্মা চন্দ্রবিম্বাকারে পরিণত হইলে, কাকতালীয় ন্যায়ে সহসা ভিন্ন ভিন্নরূপে সমুদিত যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাকে তিনি নিজেই অনুভব করিতে থাকেন। রন্ধ্রময় পঞ্চ স্থান পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপরসাদি ভোগের দ্বারস্বরূপ; জীব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানুভবের পর আপনা হইতেই ঐ পঞ্চ স্থানাত্মক পঞ্চা-ঙ্গের অনুভব করিতে থাকেন। অনন্তর অব্যক্ত আত্মা এইরূপে পঞ্চবিধ অবয়ব-সম্পন্ন হইয়া নিজাকারের অনন্তত্ব অনুভব করিতে করিতে পরিপূর্ণ বিরাট পুরুষরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। আত্মা—আকাশবৎ সুনির্ম্মল, নিত্যানন্দ, শান্ত ও জ্যোতির্ম্ময়; তিনি এইরূপে মনঃসমষ্টি কল্পনা করিতে করিতে প্রথমে মনোময়রূপেই প্রকাশিত হন। সুতরাং এক্ষণে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, স্থূলসমষ্টিস্বরূপ বিরাড়াত্মা অন্য কেহই নহেন; তিনি সেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষ পরমেশ্বর। তিনি সত্য সত্যই পঞ্চভূতাত্মক নহেন; অথচ তিনি পঞ্চভূতাত্মকরূপে অনুভূত। তিনি আপনা হইতেই আবির্ভূত হন; আপনা হইতেই তিরোভূত হন, আপনা হইতেই প্রসার লাভ করেন এবং আপনা হইতেই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার আপন সঙ্কল্পবলেই ক্ষণলবাদি সংখ্যাতীত কল্পকাল সৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে কদাচিৎ অনন্ত কল্পকাল, এবং কদাচিৎ ক্ষণকাল মাত্র প্রকাশিত হইয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বারম্বার আত্মপ্রকাশের পর বারম্বার বিলয় প্রাপ্ত হন। সেই মনোময় বিরাট পুরুষই সর্ব্বমূলীভূত ঈশ্বরের দেহস্বরূপ। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আতিবাহিক দেহ নামে নির্দ্দেশ করেন। নিখিল জীবের পুর্য্যষ্টক বলিতে তাঁহাকেই বলা হইয়া থাকে। তিনি আকাশস্বরূপ; তাঁহার সীমা নাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত সকলই তিনি এবং তিনিই সমুদায়ের বহিরন্তরচারী সর্ব্ব বস্তু। তাঁহার কোনই রূপ নাই। তিনি নিজে কিছুই নহেন। তথাচ তিনিই যেন কিছু বলিয়া প্রতীয়মান।

রামচন্দ্র! জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই আটটী তাঁহার প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত। ইহা ভিন্ন সমুদায় ভাবাভাবময়ই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনিই শব্দ ও শব্দার্থের কল্পনা করিতে করিতে

বেদচতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারই স্থাপিত মর্য্যাদা অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত আছে। ঐ যে অনন্ত ঊর্দ্ধাকাশ, উহাই তাঁহার শির, পৃথ্বী তাঁহার পাদদেশ; স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যাবকাশ তদীয় উদর স্থান; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার অবয়ব; অপরাপর যে কিছু লোক সকলই তাঁহার পার্শ্ব প্রদেশ; জলরাশি তাঁহার শোণিত; পুঞ্জ পুঞ্জ পর্ব্বতই তাঁহার মাংসপেশী; নিখিল নদনদী তদীয় সর্ব্বাঙ্গ-বাহিনী শিরাজাল; উজ্জ্বল মার্ত্তণ্ডমণ্ডল তাঁহার প্রখর নয়ন; বাড়বাগ্নি তাঁহার পিত্তস্থানীয়; চন্দ্রমণ্ডল—তদীয় জীব, শ্লেষ্মা, শুক্র, বসা, বল ও সঙ্কল্পনিলয় মন; আর যিনি পরাৎপর পরব্রহ্ম, তিনিই তাঁহার আত্মা। উল্লিখিত মনোময় চন্দ্রমণ্ডল অন্নাদিরূপে আনন্দনিদান, দেহতরুর মূলীভূত এবং কর্ম্মপাদপের বীজসমষ্টি। নিখিল পদার্থই মন হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। মণীষিগণ বলিয়া থাকেন,—দেহ, কর্ম্ম ও ব্যষ্টি মনঃসমূহের হেতুভূত মনোময় চন্দ্রমণ্ডলই বিরাট জীব। ঐ বিরাট চন্দ্রমণ্ডলনামক বীজ হইতেই ত্রিভুবনে নিখিল জীব, নিখিল মন, নিখিল কর্ম্ম, নিখিল সুখ এবং নিখিল মোক্ষ প্রথিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরপ্রমুখ দেবপ্রধানগণ তাঁহারই কল্পনাময় চিত্র এবং সুর ও অসুরাদি সকলই তদীয় চমৎকার চিত্তবিকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চিন্মূর্ত্তি বিরাটদেহ প্রজাপতি যৎকালে সাক্ষিস্বরূপে বিরাজ করিয়া উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলে সূক্ষ্মতম হিমকণাসমূহের ন্যায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অমৃতকলাংশ সকল অনুভব করিতে করিতে প্রথমে দেবাদির আকার ভাবনা করিতে থাকেন, তখন নিজেই সেই সেইরূপে প্রকট হন এবং অদ্য পর্য্যন্ত সেইরূপেই বিরাজ করিতেছেন। তাই বলিতেছি, হে রঘুকুল-ধুরন্ধর! তুমি জানিয়া রাখ, উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলই জীবসমষ্টিস্বরূপ বিরাট জীবের আস্পাদ, এবং উহাই পঞ্চাবয়বসম্পন্ন শরীর, এইরূপেই সকলের অনুভবগম্য হয়। ঐ চন্দ্রমণ্ডলরূপ বিরাট জীবদেহ হইতেই যে সকল অমৃতকণিকা ওষধিসমূহে নিপতিত হয়, সেই সমস্ত হইতেই অন্নোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ অন্ন হইতেই প্রাণীদিগের জীবনোপকরণ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যাহারা সজীব দেহী, তাহাদিগের দেহে ঐ সকল জীবনোপকরণই জীবরূপে বিরাজমান এবং উহাই অশেষ

প্রকার জন্ম-কর্ম্মের হেতুভূত মনঃস্বরূপে প্রকট হইয়া নানারূপে চেষ্টমান। ঐ প্রকার বিরাট জীব এত অতীত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার সংখ্যা নাই এবং কত যে মহাকল্প চলিয়া গিয়াছে, তাহারও সংখ্যা করা যায় না। ইহা ভিন্ন ভবিষ্যতেও যে কত হইবে এবং বর্ত্তমানেও যে কত আছে, নির্ণয় করা দুরূহ।

রামচন্দ্র! ঐ সঙ্কল্পাত্মক মহান্ বিরাট পুরুষ মহান্ অবয়বে অন্বিত; তাঁহার এই অবয়ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই বিরাজ করিতেছেন।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশবর্দ্ধন! ঐ যে সঙ্কল্পাত্মক বিরাট জীবের উল্লেখ করিলাম, উনি যখন যে ভাবে যে বস্তুর কল্পনা করেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকাশই তৎকালে সেই প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন,—এই সমগ্র বিশ্বই তদীয় সঙ্কল্পস্বরূপ। সৃষ্টির উপক্রমকালে সেই ব্রহ্মই পূর্ব্বতন বাসনার অনুসরণক্রমে পঞ্চভূতময় বিরাটাকারে প্রকাশ পাইয়া ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাত্মক বিষয়োপভোগ করিতে থাকেন। জানিবে—ঐ যিনি বিরাট পুরুষ, উনিই এই জাগতিক যাবতীয় বস্তুর কারণ। কার্য্যমাত্র কারণের তুল্য গুণ-সম্পন্ন; সুতরাং ঐ বিরাট জীবেরও জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে যাদৃশ সামর্থ্য, প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবেরও আপনাতে তেমনি সর্ব্ববিষয়ক সৃষ্টি ক্ষমতা; এ বিষয়ে আর সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে কি? যৎকালে বিভিন্ন মনোবৃত্তির অনুসারে আপন জ্ঞানই অন্তরে বাহিরে অশেষবিধ বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, বিরাট জীববৎ ব্যষ্টি জীবও সেই বস্তুকে সেই সেই রূপে অনুভব করে। বোধগম্য হইল না, এমন আর কোন বিষয়ই যখন তাঁহার থাকে না; তখন যথার্থ দর্শনে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব উভয়ই যে তুল্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। যেমন অতি

ক্ষুদ্র বীজ কোষের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড তরুর অবস্থান, তেমনি তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মহেশ্বরান্ত নিখিল জীবের অন্তরেই এই বিশাল বিশ্বভ্রম বিরাজমান। এইরূপে ভ্রমের বশে সরীসৃপ হইতে রুদ্রাবধি প্রত্যেক জীবই স্ব স্ব অনন্ত জ্ঞানে অনন্ত বিষয়ের সৃষ্টি করিতেছে। ফল কথা, বিরাট আত্মাতেও এই বিশ্বসংসার যেরূপ বিস্তৃতভাবে বিরাজিত, জানিবে—অতি ক্ষুদ্র অখিল ব্যষ্টি জীবেও তেমনি বিস্তৃতরূপে অবস্থিত। কিন্তু যদি পরমার্থভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—এ জগৎ স্থূল বা সূক্ষ্ম কিছুই নহে। উহার কোন আকৃতিই নাই। তবে জগতের যে বিভিন্ন আকার দেখা যায়, তাহা কেবল ভ্রান্তিরই মহিমা ; ফলে ভ্রান্তিই উহাকে যথায় যেরূপে বিস্তার করে, উহা সেখানে সেইরূপেই অনুভূতিগোচর হয়।

রামচন্দ্র! মনের কল্পনায় এ জগৎ প্রাদুর্ভূত ; মন চন্দ্রমা হইতে উৎপন্ন এবং চন্দ্রমাও মন হইতেই আবির্ভূত। এইরূপে বলা যায়, উক্ত বিরাট সমষ্টি জীব হইতেই ব্যষ্টি জীব সমুদ্ভূত। অথবা উহাদের কেহই কাহারও উৎপত্তির প্রতি কারণ নহে ; সমষ্টি ব্যষ্টি উভয়ই অভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে এ কথা অসঙ্গতও নয় যে, জল ও জলতরঙ্গ যেমন এক, তেমনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীব উভয়ই অভেদ। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, শুক্রই জীবের সার ভাগ। সেই শুক্রসার জীব হইতেই পিতামাতার সম্ভোগ-সময়ে আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দকণা প্রসৃত হয়। শুক্রসারবৎ জীবচৈতন্য শুক্রতন্ময়তা প্রাপ্ত হন এবং আপনিই আপনাতে তন্ময়রূপে যে ব্রহ্মাভাস-রূপ আনন্দ উপভোগ করেন, এবং নিজ হইতেই যে পাঞ্চভৌতিক দেহ-রূপতা অধিগত হন, সে সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে যদি বিচার করা যায়, তবে দেখা যাইবে,—তাহাতে কার্য্য-কারণ ভাব কিছুই নাই। ফলে জীবের স্বভাব ঐরূপই ; যদি স্বভাবই তাহার এই প্রকার হয়, তবে তাহা তো কিছুতেই অপনেয় নহে ; সুতরাং জীবের মুক্তি তো কখনই সম্ভবপর নহে। এ কথার উত্তর এই যে, এরূপ মনে করিবার কারণ কিছুই নাই ; কেন না, স্ব স্বভাবের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখা যাইবে; স্ব—জীব এবং স্বভাব—জীবত্ব। সুতরাং ঐ স্ব ও স্বভাব শব্দের মধ্যে যদি স্ব শব্দের অর্থ আত্মা বা শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়,

তবে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্তেরই সার্ব্বকালিকী অস্থিতির নিশ্চয়ত্ব নিবন্ধন স্ব ও স্বভাব একই বস্তু হইয়া পড়ে। উক্ত উভয় শব্দের মধ্যে কোনটীকেই ভেদ্য, ভেদক বা ভেদ বস্তু বলা চলে না। কাজেই 'স্ব' শব্দের যাহা অর্থ, তদ্ভিন্ন স্বভাব শব্দের প্রকৃত পক্ষে অন্যার্থ নাই। পক্ষান্তরে স্ব শব্দের অর্থ যদি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব বলা যায়, তবে স্বভাব শব্দের অর্থ জীবত্ব হইয়া দাঁড়ায়। জীব ও জীবত্ব আপনা হইতে এক হইয়া উঠে। কি আভ্যন্তরিক, কি বাহ্যিক, কোনরূপেই ঐ উভয় শব্দের ভেদ কিছুই উপলব্ধি হয় না। দেখ, বায়ু সর্ব্বদাই সঞ্চরণক্রিয়াত্মক, তথাচ বিকল্প জ্ঞানে সঞ্চরণ ক্রিয়া হইতে তাহার ভেদ কল্পনা করিয়া তৎসহ সঞ্চরণ ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যায়, বিকল্প-জ্ঞানের প্রভাবেই স্ব ও স্বভাব শব্দের ভেদ কল্পনা হয়। নচেৎ ভেদ কিছুই নাই। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন পথাদি দর্শন করিতে পারে না, সেই-রূপ চৈতন্যময় অমল ব্রহ্ম অবিদ্যারূপ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন বলিয়াই আত্মদর্শনে অক্ষম হইয়া থাকেন এবং প্রাণেন্দ্রিয়রূপ জড়ময় ভাব প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার বিবিধ বস্তু জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। স্পন্দনশক্তি-শালী পবন যেমন স্পন্দ হইতে অভিন্ন হইয়াও জনগণের চক্ষে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি ব্রহ্মই বিশ্ববিকাশিনী অবিদ্যাশক্তির আবরণে আবৃত হইয়া একমাত্র আপনাকেই দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য ভেদে দ্বিবিধরূপে কল্পনা করেন এবং তাহাতে অভিনিবেশপূর্ব্বক আপনার স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পারেন না। এই জন্যই মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, যাহা 'অহং' জ্ঞানময় অলীক অজ্ঞানগ্রন্থি, তাহার উচ্ছেদই মোক্ষ। তাই বলিতেছি,—রাম! তুমি অজ্ঞানরূপ মেঘাবরণ অপসারণ করিয়া মূর্ত্ত অমূর্ত্ত নিখিল পদার্থকেই অলীক বলিয়া অবধারণ কর এবং 'অহং' জ্ঞান হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আপনাকে নিরুপাধিক বিমল ঘনচৈতন্যময় জ্ঞান করত সর্ব্বকাল সুখে অবস্থান করিতে থাক।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সর্ব্বদা জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কদাচ জ্ঞানবন্ধু হইবে না। আমি অজ্ঞানীকেও বরং শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, তথাচ জ্ঞানবন্ধুতা কখনই উত্তম মনে করি না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! জ্ঞানবন্ধু কাহাকে বলে? এবং জ্ঞানীই বা কাহাকে বলা হয়? আর জ্ঞানবন্ধুত্ব ও জ্ঞানিত্ব এই উভয়ে ফলই বা কি আছে? এ সকল আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে ব্যক্তি সংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার নিমিত্ত অভিনেতার ন্যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে কিম্বা শাস্ত্র পাঠ করে, পরন্তু কস্মিন্‌কালেও শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্ন প্রকাশ করে না, সুধীগণ তাদৃশ লোককেই জ্ঞানবন্ধু নামে অভিহিত করেন। যাহার শাস্ত্রা-ভ্যাস-জনিত জ্ঞান ভোগব্যাপারেই নিরত; পরন্তু বৈরাগ্যাদি ফলে বঞ্চিত, অপিচ তত্ত্বকথায় পরবঞ্চনার চাতুরীবোধ যাহার উপজীবিকা, তথাবিধ লোকই জ্ঞানবন্ধু আখ্যায় অভিহিত। পক্ষান্তরে যাহা বর্ণোচিত, বেদ-বিহিত ও কুলাচারসঙ্গত, তথাবিধ নিষ্কাম অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যেই যিনি সতত সম্প্রবৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিও জ্ঞানবন্ধু নামে নির্দ্দিষ্ট। পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানবন্ধুতা অপেক্ষা এই প্রকার জ্ঞানবন্ধুতা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট;—সুতরাং বাঞ্ছনীয়; কেন না, ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনই তত্ত্বজ্ঞান অভ্যুদিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। মনীষিগণ বলেন, —যাহা আত্মজ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, আর তদিতর জ্ঞান জ্ঞানাবভাস মাত্র। কারণ অন্যান্য জ্ঞানের উদয়ে যাহা প্রকৃত সার ব্রহ্মানন্দরস, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহারা আত্মজ্ঞানরসের আস্বাদ না লইয়াই অন্নমাত্র অন্য বৃথা জ্ঞানের স্বাদেই সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশবহুল কার্য্যেই নিরত, জানিবে,—তাহারাই নিকৃষ্ট জ্ঞানবন্ধু আখ্যায় অভিহিত। যিনি মুমুক্ষু ব্যক্তি, তাঁহার যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়াদি ভেদ-জ্ঞান উপশম প্রাপ্ত হয়, তাবৎ-পর্য্যন্ত সসন্তোষ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ফলে ব্রহ্মের সহিত যখন একত্ব লাভ হইবে, তখনই সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া সমুচিত। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি বিষয়ভোগরূপ সংসাররোগে আক্রান্ত হইয়া সন্তোষ অনুভব করিও না; তোমাকে যেন জ্ঞানবন্ধু হইতে হয় না। এ সংসারে যিনি মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, পরিমিত পথ্য ও পবিত্র ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্তই তাঁহার অগর্হিত কার্য্য করা বিধেয়। প্রাণ-ধারণার্থ আহার করিতে হয় এবং তত্ত্বস্তু জানিবার জন্যই প্রাণ ধারণের প্রয়োজন হয়; অপিচ এই সংসারক্লেশে পুনর্ব্বার আর যাহাতে না আবৃত্ত হইতে হয়, তাহারই জন্য তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! জ্ঞানের পরিপাক দশায় ব্রহ্ম-তন্ময়তা হেতু যিনি বুঝিয়াছেন,—শব্দাদি বিষয় ও চিত্ত, এ সকল অসৎ পদার্থ এবং উহারা কেবল সঙ্কল্পাদিরই পরিণাম, অপিচ যদীয় হৃদয়ে কর্ম্মফল তিষ্ঠিতে পারে না, পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী জন। অন্তঃ-করণ-ভোগ্য বিষয়রাশির জ্ঞান—চাক্ষুষাদি; তদ্বিষয়ে যিনি সাক্ষিরূপে বিরাজমান এবং যিনি একাদ্বয় চিদাকার ব্রহ্মকে যথাযথরূপে বিদিত হইয়া সমস্ত দৃশ্য পদার্থকেই অসৎ বলিয়া মনে করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যিনি অকৃত্রিম একাত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া শান্তিধামে উপনীত হইয়াছেন, যদীয় সমস্ত ব্যবহারকার্য্যেই একটা শীতলভাব পরিলক্ষিত হয়, তিনিই জ্ঞানী নামের যোগ্য। যাহার প্রভাবে পুনর্জ্জন্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। তদ্ভিন্ন অন্য জ্ঞান কেবল ভোগ্য বস্তু-প্রদ। সুতরাং সে জ্ঞান সাধারণ শিল্প-সদৃশ জীবিকা মাত্র; উহাকে প্রকৃত জ্ঞানশব্দের প্রতিপাদ্য বলা যায় না। যিনি নিষ্কাম হইয়া শাস্ত্রীয়

আকাশমণ্ডলবৎ নিরাবরণ নির্ম্মল-চিত্তে ব্যবহারিক কার্য্য-পরম্পরা সম্পাদন করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিতপদ-বাচ্য। এই দৃশ্যমান নিখিল বস্তুই যখন ভ্রান্তি-মূলক, কাহারও যখন কোনই সত্তা নাই, তখন উহাদের উৎপত্তি বা উৎপত্তি-কারণ কি আছে? উহারা কারণ বিনা অনুৎপন্ন, অথচ যেন উৎপন্ন এবং বাস্তব পক্ষে অবিদ্যমান হইলেও যেন বিদ্যমান বলিয়াই ভ্রম জন্মে। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া মনে করিও না যে, বীজই অঙ্কুরের কারণ। কেন না, প্রলয়ে বীজ বা অঙ্কুরের যখন একটীও থাকে না, তখন সৃষ্টির উপক্রমে বীজ আসিবে কোথা হইতে? অতএব ভ্রমজ্ঞানের ফলে বীজাদি ভাব পদার্থের আবির্ভাবই উহার উৎপত্তি এবং যাহা তিরোভাব, তাহাই উহার ক্ষয়; এইরূপে যে বস্তু হইতে যে বস্তুর উৎপত্তিভ্রম, তাহাই তাহার কারণ বলিয়া ব্যবহৃত। এই প্রকার কারণব্যবহারে বীজাদি ভাবপদার্থ পরপর পরস্পরের কারণ হইয়া থাকে। শশশৃঙ্গ ও মরুমরীচিকার জল এ দুই বস্তু প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইলেও ভ্রমজ্ঞান যখন তিরোহিত হয়, তখন যেমন উহাদের আর সত্তা থাকে না, উহারা যে তখন একেবারেই অসত্য বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে পক্ষে আর সন্দেহের বিষয় কি? অতএব উহাদের উৎপত্তি বা উৎপত্তি-নিদান কি প্রকার? যাহারা ঐ শশশৃঙ্গাদি বস্তুর কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে বন্ধ্যার পুত্রপৌত্রাদির স্কন্ধেই আরোহণ করা হয়। ফল কথা, উক্ত উভয় ব্যাপারই ভ্রমের কার্য্য। বীজাদি বস্তু মূলে অসত্য, অথচ সত্যরূপে প্রকাশমান; উহাদের কারণকল্পনা যদি একান্তই করিতে যাও, তবে জানিয়া রাখ, অজ্ঞানই উহাদের কারণ। কেন না, জ্ঞানের বিকাশ হইবামাত্রই তো উহারা বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীব যখন বুদ্ধি-চিদাভাসাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক নিজেকে কূটস্থ চিন্ময় আত্মরূপে অবগত হইতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া উঠেন। অন্যথা বুদ্ধিপ্রভৃতিকে যদি আত্মরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে জীবের অবস্থাব্যত্যয় ঘটে না, তিনি যে জীব—সেই জীবই থাকিয়া যান। হেমন্তে আম্রতরু সুপ্তপ্রায় থাকে, যখন বসন্তাগম হয়, তখন তাহার রসসঞ্চার ঘটে; তাহাতে পুনরায় তাহার পল্লবোদ্গম হওয়ায় সে যেন জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই সহকার নাম ধারণ

করে। এই দৃষ্টান্তে বলা যায়, জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অচেতন থাকে, পরে যখন পরমাত্মরূপ রসসঞ্চার হয়, তখন সে বিমলভাবে উদ্ভাসিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া 'পরমাত্মা' নাম ধারণ করে। জীব ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মজ্ঞান করিয়া জীবরূপেই অবস্থান করে; সেই অবস্থায় তাহাকে বিবিধ যোনিতে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়; তাহাতে সে অশেষবিধ ক্লেশপরম্পরায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। সলিলরাশির দৃশ্যদর্শন-জ্ঞান নাই এবং আমি করিতেছি বলিয়া কোন রূপ অভিমানাদিও নাই, তাই তাহাদের নিম্নাভিমুখে গমনাদি কার্য্য যেমন স্বভাবের কার্য্য বৈ তাহাদের নিজ কার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না, তেমনি তত্ত্বদর্শী সাধু পুরুষেরাও যে কিছু কার্য্য করেন, সেই সেই কার্য্যে তাঁহাদের মননাদি অভিমান থাকে বলিয়া তৎসমস্ত কার্য্য বা কার্য্যচেষ্টা প্রকৃতভাবে গণনীয় হয় না। দৃশ্য-সমূহের সৌন্দর্য্যের মূল সীমা কি, যাঁহারা দর্শন করিতে পারিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্বদর্শীর চারিদিকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গোচর নিখিল পদার্থ থাকিলেও জানিবে,—তাঁহাদিগের পক্ষে সে সকল না থাকারই প্রায় হয়। কেন না, তাঁহারা সেই সেই পদার্থকে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থরূপে অবগত নহেন। যেমন স্পন্দনজ্ঞান নাই বলিয়া জলস্পন্দ হইলেও সে স্পন্দন তাহার অস্পন্দনেরই সমান হয়, তেমনি যাহাদিগের ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য জ্ঞানের অভাব, সেই সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কার্য্য বা কার্য্যচেষ্টা প্রকৃত বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। 'এই আমার কার্য্য, আমি ইহা করিতেছি' এই প্রকার অভিমান যাঁহাদিগের তিরোহিত হইয়াছে, উৎসৃষ্ট বৃষভের ন্যায় তাঁহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। সমীরণ তরুপল্লবাদিকে পরিচালিত করে,—করিলেও তৎসমুদায়ের সহিত সে যেমন লিপ্ত হয় না, তেমনি জ্ঞানী লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সে কর্ম্মে তাঁহারা লিপ্ত হইবার নহেন। যে জন নদীর তীরে বাস করে, সে যেমন কূপের সুখ্যাতি করে না, তেমনি যাঁহারা পরম দৃষ্টি লাভ করিয়া ভবাম্বুধির পরপার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, পারত্রিক স্বর্গাদি ফলের প্রশংসা তাঁহারাও তেমনি কদাচ করেন না।

হে অনঘ! যাহাদের অন্তঃকরণ বাসনায় বেষ্টিত, তাদৃশ মূঢ় লোকে-

রাই কর্ম্মের প্রশংসা করে। তাহাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞান নাই, তাই শ্রুতি-স্মৃতি-সমুদিত কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা সেই সেই কার্য্যফল ভোগ করে। অধঃপতিত আমিষোপরি শকুনপতনের ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গও স্বস্বগ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়োপরি সবেগে সম্পতিত হইয়া থাকে; অতএব যোগাসক্ত পুরুষ মনোদ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গকে বন্ধন করিয়া ব্রহ্মপদে চিত্ত সমাহিত করত তন্ময় হইয়া অবস্থান করিবেন। বৎস! কোনওরূপ গঠনসন্নিবেশ নাই, এরূপ সুবর্ণ যেমন প্রায়ই দেখা যায় না, তেমনি ব্রহ্মপদও জগৎ-সংস্থান-সন্নিবেশ-শূন্যরূপে প্রত্যক্ষ হইবার নহেন; কিন্তু যে পুরুষ ব্রহ্মতন্ময়তা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই শিবময় ব্রহ্ম সর্গাদি শব্দার্থ-বিরহিত, জগৎসন্নিবেশ-বর্জ্জিত বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকেন। প্রলয়কাল গভীর অন্ধকারময়;—অন্ধকার বৈ আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। সে সময়ে যেমন কোন একটা বিভাগাদি ব্যবহার হইয়া উঠে না; যিনি ঘন-চিন্ময় পরব্রহ্ম, তাঁহার অবস্থাও ঐরূপই; ফলে তাঁহাতে কোনও বিভাগাদির ব্যবহার হয় না; হইতে পারে না। বায়ুর প্রেরণায় মেঘখণ্ড পরিচালিত হয়; কিন্তু তাহার চলনকালে তন্মধ্য-গত ক্ষুদ্র বৃহৎ অবকাশাংশ যেমন অচল হইলেও দিগ্-বিভাগক্রমে প্রতীয়মান হয়, তেমনি প্রলয়ে ভূতবর্গের স্বীয় জ্ঞানাত্মিকা ঐশ্বরী সত্তাও বাস্তব পক্ষে অচল হইলেও সচল বলিয়াই সম্ভাবনা করা হয়। একটা নিস্পন্দ জলাশয়ের কিয়দংশের জল স্পন্দিত হইলে তাহা যেমন নিস্পন্দ জলাংশ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়; পরন্তু তাহা প্রকৃতই ভিন্ন কি অভিন্ন সে কথা অমীমাংস্য হইয়া থাকে, তেমনি যিনি ব্রহ্ম-সম্বিদাত্মা চিদাভাস, তিনিও ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ অভিন্নস্বভাব বলিয়া অবধারিত। একই গগনতল—দিগ্‌বিভাগ ক্রমে ভিন্ন অথচ ফলিতাংশে অভিন্ন; এরূপ হইলেও যেমন পূর্ব্বোক্ত ক্রমে বহুল গগনাংশের অনুভূতি অনিবার্য্য, তেমনি নিরবয়ব পরব্রহ্ম বাস্তব পক্ষে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীত হওয়ায় কল্পনার বশে তাঁহাতে এই নানা অবয়বান্বিত অপূর্ব্ব জগৎ-সৃষ্টি প্রকাশিত। এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের ফলেই জগদভ্যন্তরে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারাভ্যন্তরে জগৎ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত। হিমালয়াদি

পর্ব্বতের গাত্রচ্ছিদ্র হইতে সলিলরাশি নির্গত হইলেও তাহারা যেমন উহাদিগকে আপনা হইতে ভিন্ন মানস-সরোবরাদিরূপে সন্দর্শন করে, তেমনি অহম্ভাবময় জীবও বাহ্য ও মানস দৃশ্য দর্শনের অভিমানভরে ইন্দ্রিয়রন্ধ্রের সাহায্যে স্বীয় অন্তর্গত জগৎকেই যেন বহির্নিঃসৃত বাহ্য বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে। একটা সুবর্ণ-পিণ্ডের যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ গঠন-ঘটনা পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে যেমন কটকাদিরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; পরন্তু কেবল সুবর্ণরূপ যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি অহম্ভাবাপন্ন জীবও ভ্রমের বশে বিনা কারণে নিজেকেই জগদাকারে অবলোকন করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, জগতের যাহারা যথাযথ অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন সত্ত্বেও তাঁহারা জীবিত নহেন। গোষ্ঠগত ভাণ্ডের প্রতিই যে গোপের চিত্ত আসক্ত, সে, গৃহে থাকিয়া অন্যান্য গৃহ-কর্ম্ম করিলেও তাহার দৃষ্টি যেমন সেই সেই কর্ম্মের প্রতি আবদ্ধ থাকে না, তেমনি ব্রহ্মাসক্তমনা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিখিল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর রহিলেও সেই সেই কর্ম্মে তিনি প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টি অর্পণ করেন না। ব্রহ্মাণ্ড-ময় বিরাট পুরুষ; তাঁহার হৃদয়মধ্যে যেমন বিরাট জীবচন্দ্র বিরাজিত, তেমনি প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহেই রেতোময় হিমকণায় ব্যষ্টি-জীব অবস্থিত। জানিবে,— এই জীব স্থূলদেহে শূন্যাকারে এবং সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মাকারে বিরাজিত। অহঙ্কারাত্মা জীব পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অবস্থান করেন। তিনি প্রথমে জননীর জননেন্দ্রিয়ে নিক্ষিপ্ত হন; পরে আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনা করত অহংজ্ঞানবশে ক্রমশঃ অসত্য হইলেও সত্যস্বরূপে সমুদ্ভাসিত আত্মদেহ অনুভব করিতে থাকেন। কুসুমে যেমন সৌরভ থাকে, তেমনি অহম্ভাব-ময় জীব পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে ও নানা কর্ম্মের আধারভূত শুক্রসারময় শরীরে অবস্থান করিতে থাকে। চন্দ্রমণ্ডলগতা কৌমুদী যেমন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তেমনি শুক্রস্থিত অহম্ভাবনাই মাতৃগর্ভস্থ জীবের আপাদ-মস্তক সমস্ত অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়। ধূম যেমন মেঘাকারে গগনাঙ্গন পরিব্যাপ্ত করে, তেমনি অন্তঃকরণময় বাহ্য জ্ঞানরূপ জল ইন্দ্রিয়রন্ধ্ররূপ প্রণালীযোগে বাহিরে বহির্গত হইয়া এই

ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। অহং জ্ঞান যদিও অন্তরে বাহিরে সমগ্র দেহমধ্যে বিরাজিত, তথাচ হৃদয়গত শুক্রে ঐ জ্ঞান বিশেষরূপেই অবস্থিত। জীব সঙ্কল্পান্বিত হইয়া হৃদয়মধ্যে যেরূপে অবস্থান করে, তথাবিধ সঙ্কল্পানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া সত্বরই বহির্নিঃসৃত হয়। সমাধির পরিপাকদশায় চিত্ত চিরস্থির ব্রহ্মাকারে অবস্থিতি করে। চিত্তের ব্রহ্মাকারে অবস্থিতিই নিশ্চিত্ততা। এই নিশ্চিত্ততা ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারেই 'অহং'মিত্যাকার ভ্রম দূরীভূত হইবার নহে। তাই বলিতেছি, বৎস! ঐ 'অহং' ভ্রমকে যদি তুমি প্রশমিত করিতে চাও, তাহা হইলে মনন-নিদিধ্যাসনাদি যে সকল প্রসিদ্ধ শান্তির উপায় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল উপায়-যোগে ব্রহ্মচিন্তাকে ক্রমশঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা আকাশরূপে পরিণামিত করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশদ কথা এই যে, যে কালে ব্রহ্ম বস্তুকে তুমি সর্ব্বব্যাপী আকাশাকারে ভাবিতে পারিবে, তখন একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই তোমার অনুভূতিগোচর হইবে না। তোমার অহংজ্ঞান তদ্দণ্ডেই অপসারিত হইবে। যে সকল মানব ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন, এ জগতে বাহ্যিক বা মানসিক দৃশ্য পদার্থপুঞ্জের দর্শনাভিমান ও বাহ্য চিন্তনীয় বস্তুর চিন্তা তাঁহারা একেবারেই পরিহার করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকা হেন সর্ব্ব-কর্ম্মেন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিতভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়েই যাহার ভাবনা নাই, তাহাকে মুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। তিনি সর্ব্বদাই জীবনধারী এবং সর্ব্বদাই আকাশবৎ বিশুদ্ধ-চিত্ত। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র মনে হয়, তিনি যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া কি এক স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করিতেছেন।

রঘুবর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুক্রস্থিত 'অহং' জ্ঞানই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে সৌরী প্রভার ন্যায় দেহের আপাদ মস্তক সর্ব্বাংশেই পরিব্যাপ্ত হয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও নেত্রগোলক, আস্বাদেন্দ্রিয় ও রসনা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিবিবর, এই সকল রূপে একমাত্র শুক্রগত জীবচৈতন্যই আপনাকে ভাবনা করেন, ভাবিতে ভাবিতে নিজেই তিনি সেই সেইরূপে প্রকাশিত হন এবং নিজেই বাসনাজাল বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ভূতলব্যাপ্ত ভূমিরসের কিয়দংশ যেমন বসন্তে অঙ্কুরাকারে উদ্ভূত হয়,

তেমনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ায় অগ্রে মনোরূপে আবির্ভূত হইয়া পশ্চাৎ কিয়দংশ হইতে ইন্দ্রিয়াকারে প্রকট হইয়া থাকেন। এই সংসার, এই দেহ, ইত্যাদি বস্তুতে যে ব্যক্তি অভাবরূপতা চিন্তা করিতে পারে না, এবং মোক্ষলাভেও যত্ন প্রকাশ করে না, তথাবিধ মূঢ়বুদ্ধি লোকের অনন্ত দুঃখ কদাচ উপশম প্রাপ্ত হয় না। এ সংসারের নিখিল বস্তুকেই যিনি ব্রহ্মরূপে অবলোকন করেন, তিনি যে কোনরূপ বসনই পরুন, যাহা কিছু বস্তুই ভক্ষণ করুন, কিম্বা যে কোন শয্যাতেই শয়ন করুন, তাঁহার অন্তর সতত বাসনারসে পরিপ্লুত থাকে বলিয়া তিনি সর্ব্বদা রাজাধিরাজের ন্যায় বিরাজ করেন। তথাবিধ পুরুষ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাসনায় অন্বিত হইলেও জানিবে,—তিনি সম্পূর্ণই বাসনাহীন। তদীয় অন্তঃকরণ আকাশবৎ শূন্য হইলেও অশূন্য। তিনি আকাশের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ু-ক্রিয়াময়। তাঁহার মননক্রিয়ার অবসান হওয়ায় তদীয় হৃদয় কেবল ব্রহ্মানন্দরসেই পরিতৃপ্ত; শয়ন, উপবেশন ও গমন, যে কোন কার্য্যেই সেই মহাপুরুষ অবস্থিত হউন, যেমন কোন গভীর নিদ্রাক্রান্ত ব্যক্তিকে সহজে জাগাইয়া তোলা যায় না, তেমনি বহু যত্ন করিয়াও তাঁহাকে বাহ্য বিষয়ে উদ্‌বোধিত করা সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানময় জীব পুরুষ যদিও সর্ব্বত্র অবস্থান করেন, তথাচ পদ্মকেশরে গন্ধবৎ দেহস্থিত শুক্রমধ্যেই সুদৃঢ়রূপে তাঁহার অবস্থান। মনীষিগণের স্থির নিশ্চয় এই যে, নিখিল প্রাণীই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে বিরাজমান। সেই জ্ঞানের যে বাহ্য প্রসরণ, তাহাই এই ভ্রান্তিময় জগৎ; পরন্তু যখন ঐ জ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, তখনই জগদ্‌ভ্রান্তির অবসান হইয়া যায়। জানিও,—ইহাই সার উপদেশ।

রামচন্দ্র! ব্রহ্মানন্দ এক অনুপম ঐশ্বর্য্য; সে ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য নিজ হৃদয়কে তুমি পাষাণবৎ দৃঢ় ও নিশ্ছিদ্র করিয়া বিভবাদি নিখিল বাহ্য বিষয়েই যাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে থাক। হে সাধুহৃদয়! এতকাল ধরিয়া ভবদীয় হৃদয় চিদাত্মজ্ঞানে রঞ্জিত ছিল, অদ্য তাহার অভিলাষরূপ ছিদ্র অনন্ত ব্রহ্মানন্দরসে পরিপূরিতবৎ প্রকাশিত হউক। স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরে যেমন শূন্যময় কল্পিত ছিদ্র,

বস্তুতঃ তাহা অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন, ঐ অভিলাষরূপ ছিদ্রও সেই-রূপই। যাহা হউক, যিনি উল্লিখিত প্রকার জগত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, আর যিনি কিছুই জানে না, এই উভয়ের মধ্যে বৈষম্য এই যে, একজন ভাবাভাব-ময় নিখিল কার্য্যে সত্যতা বুদ্ধি পোষণ করেন না, অন্য জন তাহাতে সত্যতা-বুদ্ধি স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞেরই সত্যতাজ্ঞানের অভাব, আর অজ্ঞেরই সত্যতাজ্ঞানের সদ্ভাব। বুঝিতে হইবে, একমাত্র চৈতন্য-সত্তাই যখন বাসনা দ্বারা উন্মেষিত হন, তখন জগৎরূপে, আর যখন বাসনার অভাবে নিমেষিত হন, তখন অনাখ্য অপরিচ্ছিন্ন পরতত্ত্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সমগ্র দৃশ্য বস্তুই বারম্বার বিনষ্ট ও উৎপন্ন হয়; এই কারণ ঐ সকলকে অসৎ বলা যায়; আর যাহা কখনই বিনষ্ট হয় না বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই একমাত্র সৎ; ভাবিয়া দেখ, তুমিই সেই সৎ। আত্মাকে সৎ বলিয়া জ্ঞান করায় যখন জগতের মূল কারণ অজ্ঞান অপগত হইয়া যায়, এই জগদ্ভ্রান্তি তখনই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। সে কালে যদি তাহাকে বিশেষরূপে অন্বেষণ করাও হয়, তথাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মরুমরীচিকার যেমন জলদানের ক্ষমতা নাই, তেমনি তাহারও তখন আর জগদঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি থাকে না। ফলে প্রকৃত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটিলে যখন 'অহং' জ্ঞান ছিন্ন হইয়া যায়, তখন দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদনে অক্ষমতার ন্যায় অহংজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তরে সংসারা-ঙ্কুর-সমুৎপাদনে তাহার শক্তি থাকে না। বিষয়মাত্রেই অননুরাগ হেতু যাঁহার চিত্ত নষ্টপ্রায় হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া পরম স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, তথাবিধ নিত্যমুক্ত ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করুন, আর নাই করুন, তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপদেই বিরাজ করেন। সুতরাং বলা যায়, চিত্তের শান্তিই প্রকৃত শান্তি, নচেৎ যোগী পুরুষেরা কেবল শমদমাদি-সম্পন্ন হইলেই যে তাঁহাদিগকে শান্ত বলা যাইবে, এমন নহে। কেননা, চিত্তই যখন ভোগবাসনার মূলীভূত, তখন চিত্তশান্তি ব্যতীত প্রকৃত শান্তি কিছুতেই হইবার নহে। জীব যখন জ্ঞান লাভ করিয়া চিত্ত ও দেহাদি-রূপ মূর্ত্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হন, তখনই মেঘাবরণ-বিরহিত দিনকরবৎ বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা উপগত হইয়া থাকেন।

সে কালে তিনি রূপান্তরিত না হইলেও যেন অন্য ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। এতদবস্থাপন্ন পুরুষের চিত্ত যখন তাঁহার দেহ হইতে সুদূর চন্দ্রমণ্ডলাদি স্থানে চক্ষুরাদিযোগে প্রয়াণ করে, তখন সেই পুরুষ ও চন্দ্রমণ্ডলাদির অন্তরালে যে একটা আলোকময় রূপ প্রতিভাত হয়, জানিবে,—ঐ রূপ পরমাত্মারই। চিদাকাশ কর্পূরবৎ সুবিমল। অনন্ত, অব্যক্ত ও মনোহর; তিনি মায়াবশে আপনাতে যে চমৎকারিত্ব অনুভূতিগোচর করেন, তাহাই তাঁহার জগদাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

হে রাম! এই জগৎ যদিও বিদিতবেদ্য পুরুষের নিকট ভ্রান্তিবিগমে উপেক্ষিত হয়, দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ পায়, এবং উজ্জ্বল অবিনশ্বর ব্রহ্মাকারে প্রকাশিত হয়, তথাচ যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত নানাবিধ নিয়তি-নিয়মে ও অশেষ ভোগানন্দে পরিপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! বিপ্রবর মঙ্কি যেমন বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া নিখিল ভবভাবনা পরিহারপূর্ব্বক এই প্রত্যক্ষ সংসার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মপদে প্রয়াণ কর। শ্রবণ কর,—পূর্ব্বে মঙ্কি নামে এক চরিতব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি আমারই নিকট উপদেশ পাইয়া কিরূপে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়াছিলেন!

একদা তোমার পিতামহ, তাঁহারই কোন প্রয়োজনে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সপ্তর্ষিলোক হইতে ধরাতলে অবতরণ করিলাম এবং ভবদীয় পিতামহ-নিকেতনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ভূতলের পথে চলিতে চলিতে ক্রমে মরুদেশস্থ কোন এক প্রখর

দিনকর-করোত্তপ্ত ভীষণ অরণ্যমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তথাকার বালুকারাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং তাহার চারিদিক্ ধূলিজালে ধূসরাভ। বৎস! সেই অরণ্যের দৈর্ঘ্য এতই যে, তাহার সীমা সন্দর্শন ঘটে না। সেই মহারণ্যের কোন কোন প্রান্তে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় গগনমণ্ডল সর্ব্বদা ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন; অনবরত ঝঞ্ঝানিল প্রবাহিত এবং দিবসকরের প্রখর উত্তাপ অপ্রতিহত; তথাকার ভূভাগ দিবাকর-করে একান্ত উত্তপ্ত বলিয়া স্থানে স্থানে মৃগতৃষ্ণা প্রাণী-দিগকে সন্তাপিত করে; বলিতে কি, সে স্থানে শান্তির লেশ মাত্রও নাই। পথিকেরা সে স্থানে অতিকষ্টে পথ অতিক্রম করে। সেই শূন্য অরণ্যানী এতই বিশাল—এতই বিস্তৃত যে, তাহাকে ব্রহ্মের ন্যায় বিশ্ব-ব্যাপক বলিতেও কাহারও বোধ হয় আপত্তির বিষয় হয় না। সেই অরণ্য-দেশ দর্শনে অবিদ্যার কথা মনে হয়। অবিদ্যা যেমন মোহময়ী মরীচিকায় পরিব্যাপ্ত, তাহাও সেইরূপ মরীচিকা-মণ্ডিত, অপিচ অবিদ্যা যেমন ভ্রান্তিরূপ হিমানীসমূহে সমাকীর্ণ, শূন্য, জড়াকার ও বহুব্যাপিনী, তেমনি ঐ প্রদেশও দিগ্ভ্রম-জনক, শূন্য, জড়প্রায় ও নিতান্ত দীর্ঘ। আমি সেই অরণ্যপথ ধরিয়া চলিয়াছি, এমন সময় অদূরে এক পরিশ্রান্ত পথিক আমার নয়নগোচর হইলেন। সেই পথিক সে কালে যে সকল কাত-রোক্তি করিতেছিলেন, তাহাও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পথিক বলিতেছিলেন,—অহো! পাপজনক দুর্জ্জনসংসর্গের ন্যায় এই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অতীব সন্তাপদায়ক। উঃ! রবিকর-তাপে আমার মর্ম্মস্থান যেন গলিয়া যাইতেছে। প্রখরতর সৌর-করনিকরের মধ্য হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। ঐ সকল বনরাজির শিরো-ভূষণ—পল্লবদল আতপতাপে পরিম্লান ও সঙ্কুচিত হইতেছে। আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না; যাই ঐ সম্মুখস্থ গ্রামমধ্যে এখন গমন করি। ঐ স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, পরে দ্রুতপদে পথ চলিতে পারিব!

সেই পথিক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সম্মুখস্থ কোন এক কিরাতগ্রামে প্রবেশোদ্যত হইলেন। আমি তাঁহাকে সে কালে বলিলাম,

—হে সখে! তোমাকে এক জন কল্যাণাকৃতি লোক বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে; পরন্তু সংসারবিরাগী ব্যক্তিবর্গের যাহা যোগ্য পথ, তাহা তুমি পরিজ্ঞাত হও নাই। ওহে মরুস্থলীর মহারণ্যচর পথিক! হেথায় আগমন তোমার কল্যাণকর হউক। ওহে অনভিজ্ঞ পান্থ! তুমি এই পৃথিবীর পথে ঐ যে গ্রাম দেখিতে পাইতেছ, ওখানে অতিথি-সৎকার করে, এরূপ লোক একটীও নাই। আর যদিই বা ঐ গ্রামে গিয়া তুমি অন্ন-পানাদি দ্বারা শান্তি দূর করিতে পার, তথাচ যাহা প্রকৃতই বিশ্রামসুখ, তাহা তো তোমার অধিগত হইবে না। তুমি জানিয়া রাখ, —যাহারা কাম-ক্রোধাদির বশীভূত, তথাবিধ পামর জনগণের নিবাসভূমি—গ্রামে গেলে প্রকৃত বিশ্রামসুখ ঘটে না; সেখানে সে সুখ নাইও। লবণাম্বু পান কর, তাহাতে যেমন তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইয়া বরং তাহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিষয়োপভোগের সুখ হইতে বিশ্রাম তো ঘটেই না; তৎপরিবর্ত্তে শ্রান্তিভোগই হইয়া থাকে। ঐ যে সম্মুখে গ্রাম দেখিতেছ, কতকগুলি পুলিন্দজাতীয় বন্য মানব উহার অধিবাসী। উহারা মনুষ্যদিগের চরণচালন-শব্দ সহ্য করিতে অক্ষম। কুপথেই উহাদের বিচরণ; উহারা একান্তই দুর্ব্বৃত্ত। উহাদের হৃদয় যেন পাষাণমূর্ত্তি; কছুতেই তাহা ভীত হইবার নহে। উহারা কোনই বিষয় বিচার করে না; উহাদিগকে যদি জ্ঞানের কথা বলিতে যাওয়া যায়, তবে উহারা জ্বলিয়া উঠে। জলভার-ভুগ্ন শীতল বারিধরের যেমন মরুস্থলীতে প্রত্যয় হয় না, তেমনি যাহা অতি বড় প্রশস্ত উদার বুদ্ধি, তাহাও উহাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না। স্থূল কথা এই যে, যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিদরী-মধ্যে সর্প হইয়া থাকিতে হয়, বা শিলাভ্যন্তরে কীট হইয়া কাল কাটাইতে হয়, অথবা মরুস্থলীতে পঙ্গু কুরঙ্গ হইয়া বাস করিতে হয়, সেও বরং উত্তম; তথাচ ঐ সকল গ্রাম্য লোকের সংসর্গ কদাচ প্রশস্ত নহে। মধুসম্পৃক্ত বিষকণার আস্বাদন একটুকু কাল মধুর; কিন্তু পরক্ষণেই উহা যেমন দেহের বিকৃত অবস্থা উদ্ভাবন করিয়া আস্বাদকর্ত্তার জীবন নাশ করে, ঐ সকল গ্রাম্য জনের সংসর্গফলও সেইরূপই। গ্রামের অধর্ম্মনিষ্ঠ লোক যেন প্রচণ্ডপবন; উহা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া শীর্ণ বাসভবনে

জীর্ণ হয় এবং তৃণপর্ণাদি-পরিস্তৃত বনান্ত ভূমিতে ব্যগ্রতার সহিত প্রবাহিত হইতে থাকে।

হে অনঘ! আমি সেই পথিকের উদ্দেশে এই সকল কথা কহিলে, তিনি যেন সুধাসম শীতল সলিলে অবগাহন করিয়াই সুস্থ ও আশ্বস্ত হইলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার মনে হইতেছে, আপনি এক জন আত্মতত্ত্বদর্শী মহাত্মা; বলিতে কি, আমার বোধ হয়, আপনি নিজেই পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ। যাহার চিত্তে ঔৎসুক্য নাই, ব্যাকুলতা নাই, এ হেন পান্থ জন যেমন চলিতে চলিতে পথের মাঝে গ্রাম্য উৎসব অবলোকন করে, আমার ধারণা—আপনিও তেমনি অব্যাকুলমনে নিখিল লোক নিরীক্ষণ করেন। আপনি কি সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন? অথবা আপনিই কি সমস্ত লোকের অধীশ্বর? আপনার সহায়-সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাচ আপনি পরিপূর্ণ সুধাংশুর ন্যায় সুশোভন। মুনিবর! আপনাকে শূন্যময় বলিয়া বোধ হইলেও আপনি সর্ব্বপদার্থেই পরিপূর্ণ;—যেন আনন্দে উন্মত্ত হইয়াও স্থিরচিত্ত। এই যে সকল জাগতিক দৃশ্য বস্তু, উহাদের মধ্যে আপনি যেন কোন কিছুই নহেন; অথচ সকলই যেন আপনি। আপনি কিছুই নহেন বলিয়া প্রতীয়মান হন; অথচ আপনিই কি-যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। আপনাকে আমার এইরূপ বোধ হয়, যেন আপনি সকল বিষয়েই উপশান্ত, অথচ পরম কমনীয়; যেন আপনি নিতান্তই সমুদ্দীপ্ত অথচ সুদৃশ্য; যেন সকল বিষয় হইতেই উপরত অথচ যেন তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন। তাই জিজ্ঞাসিতেছি, আপনার এরূপ ভাব হইল কিরূপে, তাহা আমায় বুঝাইয়া বলুন। আপনি যদিও এই ভূলোকেই অবস্থিত, তথাচ মনে হয়, যেন নিখিল লোকোপরি শূন্যমার্গেই আপনি সমাসীন। আপনাকে দেখিতেছি,—যেন আপনি স্থিত অথচ অস্থিত, যেন সকল বিষয়েই অনাস্থ অথচ যেন অস্মাদৃশ জনের উদ্ধারকার্য্যে অতীব আস্থাসম্পন্ন। আপনার অন্তঃকরণ সুবিশুদ্ধ; উহা নির্ম্মল নিশাকরমণ্ডলবৎ অমৃতময়; তথাচ চন্দ্রামৃতবৎ কোন কিছুতেই লিপ্ত বা ওষধি প্রভৃতি কোন পদার্থাকারে বিরাজিত নহে। নিজে আপনি সুধাময় সুশীতল সুধাকরবৎ বিবেক-রসায়নে অন্বিত,

চতুঃষষ্ঠি বিদ্যাকলায় পরিপূর্ণ ও শীতলতায় সুসম্পন্ন হইলেও আপনার যে নিষ্কলঙ্ক, দীপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুত আত্মা, তাঁহাতে আমি এই সংসারমণ্ডলকে অঙ্কুরমধ্যগত প্রকাণ্ড কাণ্ডফলাদিময় বৃক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিতেছি, আর আপনারই ইচ্ছায় এই ভাবাভাবময় নিখিল বস্তু যেন আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মনে হয়, আপনি যেন হিরণ্যগর্ভ; ইচ্ছা হইলেই সমস্ত বস্তু আপনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

হে ভগবন্! আমি শাণ্ডিল্য-কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ; নাম আমার মঙ্কি। আমি বহুদূরদেশে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলাম। সেখানে বহু তীর্থ দর্শন করিয়া বহুকালের পর এক্ষণে আত্মীয় স্বজন-সমীপে গমনোদ্যত হইয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি, এ সংসারের সকল প্রাণীই বিদ্যুৎসদৃশ ক্ষণস্থায়ী; এ ভাব দর্শনে সংসারে আমার বিরাগ হইয়াছে। গৃহ গমনে আমার আর কিছুমাত্র অনুরাগ সঞ্চার হইতেছে না। ব্রহ্মন্! আপনি দয়া করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমায় অনুগৃহীত করুন। সাধুগণের মানস-সরোবর অতীব গম্ভীর এবং উহা অতীব প্রশান্ত। তাঁহারা দৃষ্টিমাত্রেই সকলকে দিবসকরবৎ মিত্র মনে করেন। তাদৃশ সাধুজনরূপ সরোবরের প্রান্তে প্রাণিপুঞ্জ পদ্মসমূহের ন্যায় বিকসিত ও সমাশ্বাসিত হইয়া উঠিবে, ইহা নিশ্চিতই।

হে মহাপুরুষ! আমি বুঝিতেছি, আমার চিত্ত মোহে মগ্ন আছে। ইহা নিজে কিছুতেই সংসার-ভ্রম-জনিত দুঃখমোক্ষণে সক্ষম নহে। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন; আমায় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া সেই দুর্ব্বিসহ দুঃখ দূরীভূত করিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে সুমতে! আমি বশিষ্ঠ মুনি; গগনতলে আমার বাস। অযোধ্যাধিপতি অজরাজের কি একটা প্রয়োজন আছে, তাই তাঁহার আহ্বানে আমি ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমায় বলি, তুমি আর আক্ষেপ করিও না; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে পথে প্রয়াণ করেন, তুমি সেই পথেই আসিয়াছ। জানিবে—সংসার-পারাবারের পরপার তোমার প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যাঁহার আত্মা এরূপ মহৎ নহে, তাহার কখনই এই প্রকার বৈরাগ্যবতী উদার মতি, এরূপ বচনরচনা

বা এতাদৃশ শক্তিমতী আকৃতি কখনই সম্ভবপর হয় না। তুমি যে একজন মহাত্মা, তাহাতে আমি কোনই সংশয় করিতেছি না। মণি যেমন সামান্য শাণসংঘর্ষেই বিমলাভা ধারণ করে, তেমনি বৈরাগ্যরূপ রঞ্জনের যোগেই চিত্ত বিবেকযুক্ত হয়। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট অধুনা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিসের জন্য এই সংসার-পরিহারের বাসনা পোষণ করিতেছ? আর কোন্ বিষয়টী জানিবারই বা তোমার ইচ্ছা আছে? তাহা আমায় প্রকাশ করিয়া বল। কেন না, গুরু শিষ্যকে যাহা উপদেশ দেন, শিষ্য বারম্বার প্রশ্ন করিয়া তাহা স্থির করিয়া লয়। শিষ্যের যদি রাগ-দ্বেষাদির লেশ না থাকে, তদীয় চিত্ত যদি বৈরাগ্য ও বিবেকাদির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয়, তবে তিনি গুরুজনের উপদেশ-বলে সেই শান্তিপূর্ণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি যে তোমার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছি, তাহাই তোমার পরীক্ষা হইয়াছে; তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, তুমি প্রকৃত জন্মাদি-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী; সুতরাং উপদেশ লাভের সম্পূর্ণই যোগ্য পাত্র।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমি যেমন এই কথা কহিলাম, অমনি সেই দ্বিজবর মঙ্কি মদীয় পদযুগলে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে সেই পথিমধ্যে আমাকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি চঞ্চল চক্ষুর ন্যায় বহুবার দিকে দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন সাধুর সন্দর্শন পাইলাম না, যিনি আমার সংশয় নিরসন করিতে সক্ষম হন। অধুনা আমি ভবৎকৃপায় জ্ঞানলেশ লাভ করিয়াছি; তাহাতে আমার এই দেহকে আমি সমগ্র দেবাদিদেহ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেহের সার বলিয়া মনে করিতেছি। দেহ-ধারণের যে একটা সাফল্য, তাহা

প্রকৃত আজই আমার বোধ হইল। হে বিভো! জীবগণের এই সংসার-ক্লেশদায়িনী অশেষ দশা সন্দর্শন করিয়া আমি বড় কাতর হইয়াছি। এই ত সংসারের জীব সকল বারবার জন্মিতেছে; বারবার মরিতেছে; এবং সর্ব্বদাই সুখ-দুঃখ-ভ্রম ঘটিতেছে। দেখিতেছি, সংসারের যে কিছু সুখকর কার্য্য, সকলই পরিণামে সত্য সত্যই দুঃখকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং সুখাবস্থা হইতে দুঃখাবস্থাই আমার নিকট উত্তম বলিয়া মনে হয়। হে সৌম্য! দুঃখকে যেমন সুখ বলিয়া আমি বিবেচনা করি, তেমনি আমার বিবেচিত সমস্ত সুখও পরিণামে ভীষণ দুঃখময় হইয়া আমায় দুঃখ প্রদান করে। আমার দন্ত, লোম ও শিরাদির সহিত আমার বয়ঃক্রম শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি আমার উত্তরোত্তর ভোগ্য ব্যাপারেই আসক্ত; তাই তাহা কোন ক্রমেই মোক্ষ-সাধনায় সযত্ন হয় না। বিষয়ানুরাগ দিন দিন বর্দ্ধমান; অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর তাহাতেই জড়িত। আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বাসনারূপ দুর্গন্ধময় বিষয়ামিষ-লোলুপ; তাহাদের চেষ্টাতেই জীবিকা আমার নিয়ত পাপময়ী। যেমন কণ্টক-সঙ্কীর্ণ লতা, তেমনি বুদ্ধি আমার কুটিল ও ভয়ঙ্কর। দীপালোকের অভাবে জীবগণের চক্ষু যেমন তিমিরময়ী যামিনীতে বৃথা কালাতিপাত করে, তেমনি আমার এই জীবনকালও অজ্ঞানান্ধকারময়ী ক্লেশকরী অনন্ত চিন্তায় অনর্থক ক্ষয় পাইতেছে। ফল নাই, পুষ্প নাই, এ হেন শুষ্কপ্রায় লতার ন্যায় আমার বিষয়তৃষ্ণা কিছু মাত্র রসগ্রহণে সক্ষম নহে। অথচ ইহা প্রায় নষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ নষ্ট হইতেছে না। আমি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য কিছু কিছু করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এত অপুণ্য সঞ্চিত ছিল যে, তাহারই জন্য তাহারা মাত্র কিয়ৎপরিমাণ দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় করিয়াই বিলয় পাইয়াছে। আমার বাসনাখ্য কর্ম্মবীজ কিছুতেই নষ্ট হইতেছে না; উহা অনর্থ ঘটাইবার নিমিত্তই আমাকে উত্তরোত্তর কাম্য ও নিষিদ্ধ কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে। পুত্র ও কলত্রাদিতে আসক্তি আছে; তাহাতে এ জীবন জীর্ণ হইয়া গেল। আমি সংসার-পারাবার পার হইতে পারিলাম না। ভোগাশা কেবল সংসারক্লেশ প্রদান করে; ভাগ্যে আমার তাহাই দিন দিন উপচিত হইতেছে। পুত্র-কলত্রাদি বিবরোৎপন্ন কণ্টক-বৃক্ষো-

পদ্ম; তাহাতে আমার আবাস কখন পূর্ণ, কখন অপূর্ণ, আমার অর্থোপার্জ্জনের প্রচুর প্রয়াস যেন মহাপদ; উহা চিন্তাজ্বরে বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে আমার ঐ আবাসেই ক্ষয় পাইতেছে। ভুজঙ্গের ফণামণি-সমুদ্ভাসিত বিবর যেমন রত্নলোভী দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, তেমনি ধনাশাও ধনলোভীকে নানা বিপদে নিপাতিত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমার মলিন চিত্ত অনন্ত আশারূপ কল্লোলজালে পরিব্যাপ্ত; তাই বিশুষ্ক বারিধির ন্যায় কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়। সুতরাং তাহার একান্তই দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। আমি ইন্দ্রিয়াধীন, বুঝিয়া বিবেকীরা আমায় স্পর্শ করেন না। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের ন্যায় আমার মন সর্ব্বদা বাসনাকণ্টকে আকীর্ণ ও অমেধ্য বিষয়ে সমাসক্ত। ঐ মন নিতান্তই অসৎ; অথচ উহার আড়ম্বর অতি বিপুল এবং দেহগত অর্জ্জুনাখ্য বাতের ন্যায় উহা অতীব চঞ্চলস্বভাব। আমি বহুবার মরিয়াছি নিশ্চিতই; কিন্তু আমার মন কখনই মরে নাই। উহা অভীষ্ট বস্তু-বিরহিত হইয়া কেবল দুঃখদানের জন্যই জীবিত আছে। আমার অজ্ঞান যেন যামিনী; এ যামিনীর অবসান কিছুতেই তো হইতেছে না। অহঙ্কার যক্ষের ন্যায় প্রতিনিয়ত ঐ যামিনীতে সুখ বিহার করিতেছে। শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ যেন চন্দ্র-তারা; উহারা উদিত হইলেও বিবেক-বিভাকরের উদয় ব্যতীত নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারপুঞ্জ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আমার বিবেক-সূর্য্য কিছুতেই প্রকাশ পাইল না। ঐ সূর্য্য কেশরীর ন্যায় অজ্ঞানান্ধকাররূপ মদমত্ত মাতঙ্গের দমনকর্ত্তা, কর্ম্মজালরূপ তৃণপুঞ্জের অনলোপম দহনকারক, এবং বাসনাময়ী রজনীর ভ্রান্তিময় অন্ধকারের বিনাশক। আমি ঐ বাসনা-রজনীর অন্ধকারে প্রকৃতই দৃষ্টিহীন হইয়াছি; তাই সর্ব্বদা অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করিতেছি। আমার চিত্তরূপ মাতঙ্গ সর্ব্বদাই উন্মত্ত; ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বদাই আমায় যন্ত্রণা দিতেছে। আমার ভাগ্যে আরও কি আছে জানি না। প্রাজ্ঞ লোকেরা সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্য অজ্ঞান-দৃষ্টিকে দূরে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। আমার ভাগ্যগুণে শাস্ত্রদৃষ্টিও আমায় অন্ধ করিয়া বাসনা-বাগুরায় বেষ্টিত করিতেছে। তাই বলিতেছি,—হে প্রভো! এই প্রকার মোহ-বিপদে পড়িয়া আমার যাহা করা উচিত, এবং ভবিষ্যতে আমার কল্যাণ

যাহাতে হইতে পারে, আমি তাহাই জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি দয়া করিয়া তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

হে ভগবন্! আমার জানা আছে, সাধুগণের উক্তি এই যে, সাধুসঙ্গ সংঘটিত হইলে, মোহরূপ মিহিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমস্ত মনোরথ যখন রাগাদি-দোষ হইতে পরিমুক্ত হয়, তখন শারদীয় দিঙ্মণ্ডলের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে মহর্ষে! যাহা সংসারের শান্তিপ্রদ উপদেশ, আপনি তাহা প্রদান করিয়া সাধু জনগণের বদন-বিনিঃসৃত ঐ বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করুন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দ্বিজ! ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়-ভোগরূপ জ্ঞান বা সম্বেদন, অতীত বিষয়ের বারম্বার চিন্তা, তথাবিধ চিন্তা হইতে চিত্তে তদনুরূপ সুদৃঢ় বাসনা এবং সেই বাসনা হেতু মরণাদি কালেও ভবিষ্য দেহ প্রভৃতির স্মৃতি, এই চারিটী পদার্থই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইয়াও ইহারা এ সংসারে অশেষ অনর্থের মূল। জন্মান্তরাদি-ঘটনারও ঐ পদার্থ-চতুষ্টয়ই নিদান। উল্লিখিত চারিটী পদার্থের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী, শেষোক্ত দুইটী অপেক্ষা অধিক দোষাকর। প্রথমোক্ত দুইটীর মধ্যে আবার প্রথমটীই বিশেষ গুরুতর। বসন্তকালের ভূমিরসে লতা যেমন অনুৎপন্নাকারে অবস্থিত, তেমনি ঐ আদ্য উল্লিখিত সম্বেদনাভ্যন্তরেই সমস্ত আপদ অদৃশ্যাকারে বিরাজিত। যাহারা বাসনার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অতি নিবিড় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগের নিকটে অতীত ঘটনা সকল বিবিধ আড়ম্বরসহকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বসন্তাপগমে ভূমিরস যেমন বিলয় পায়, তেমনি যিনি বিবেকশালী, তদীয় সংসারভ্রম সর্ব্ববিধ বাসনার সহিত ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এ সংসার যেন শল্লকী-

নামক কণ্টকগুল্ম ; বসন্তকালের ভূমিরসে কদলী প্রভৃতির যেমন পরিপুষ্টি, তেমনি একমাত্র বাসনা দ্বারাই উহার স্ফীতভাব। মধুমাসের ভূরস যেমন নানাবিধ তরুলতাময় কাননাকারে ভূতলে প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি এই যে অশেষ বস্তুময় অলীক সংসার, ইহারই আকারে একমাত্র বাসনা-রসই জীবচৈতন্যে অভ্যুদিত হইয়া থাকে। অসীম অনন্ত মহাশূন্য—মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা ; শূন্যতা ভিন্ন তাহাতে যেমন আর কিছুই নাই, তেমনি এই যে বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহাতে সেই একমাত্র শূন্যময় সুনির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বে যে ভোগজ্ঞান বা ভোগ-সম্বেদনের কথা বলিয়াছি, ব্রহ্মচৈতন্য ঐ সম্বেদনস্বরূপ নহেন ; তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র—এইরূপ একটা অনাদি স্থির-প্রতীতিই অবিদ্যাজন্য ভ্রম ; এবং সেই অবিদ্যাভ্রমই এই বিশাল বিশ্বে বিকাশমান। অতএব যেমন বালকবুদ্ধিতে পরিজ্ঞায়মান বেতাল, তেমনি সদাকারে প্রকাশমান এই সংসার। এই সংসারের যখন অজ্ঞানান্ধকারেই প্রাদুর্ভাব, তখন একমাত্র জ্ঞানালোকেই উহার ক্ষয়। ভূতল-বাহিত নিখিল নদীজল যেমন জলধিজলে মিলিত হইয়া তৎসহ একত্ব লাভ করে, তেমনি জ্ঞানের প্রভাবে সমগ্র দৃশ্য বস্তুর স্বাতন্ত্র্য যখন ঘুচিয়া যায়, তখন কোন কিছুর ভেদ-ভিন্নতা উপলব্ধি হয় না, সকলই জ্ঞানময় আত্মাকারে প্রতিভাসমান হয়। কাজেই তখন সকলই এক হইয়া যায়। মৃন্ময় ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, তেমনি এই জ্ঞায়মান অখিল পদার্থই জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ ; সমস্তই ব্রহ্মাভিন্নরূপে উপলভ্যমান। যে বস্তু বোধ-বোধিত, বুধগণ তাহাকে বোধরূপেই বর্ণন করেন। কেন না, বোধ ও জড় এ উভয়ের যদি আলোক ও অন্ধকারবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব থাকিত, তবে বোধ-বিরহিত জড় বস্তুকে বোধময় আত্মা কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। তাই বলা যায়, যাহা জড় বলিয়া তোমার নিকট বিবেচিত, সেই জড় ও বোধ এ দুয়ের পার্থক্য কিছুই নাই। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সমস্তই বোধময় ; সুতরাং আকাশকুসুমের ন্যায় বোধভিন্নতা বলিয়া কোন একটা পৃথক্ পদার্থ নাই। যেমন জলের সহিত জল, তেমনি সজাতীয় পদার্থ যখন সজাতীয় পদার্থ সহ সম্মিলিত হয়, তখনই তদুভয়ের একত্ব

প্রাপ্তি ঘটে। এ কারণ জানিবে,—এই যে নিজের অনুভবাত্মক জগৎ, ইহার সহিত নিজানুভবেরও পরস্পর একত্ব আছে নিশ্চিতই। শিলা-কাষ্ঠাদি বস্তু যদি বোধময় না হইত, তবে মিথ্যা শশশৃঙ্গাদি-বৎ সর্ব্বদা উহাদের অনুভব অসম্ভব হইয়া পড়িত। এই সকল দৃশ্য বস্তু বোধ হইতে বাস্তবিকই অভিন্ন, তথাচ যে অন্য বস্তুবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ কেবল ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল যদি বোধময় না হইত, তবে জ্ঞানের প্রভাবে কখনই উহাদিগকে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইত না। পবনের স্বরূপ যেমন একমাত্র স্পন্দন এবং জলধির স্বরূপ যেমন একমাত্র জল, তেমনি এই বিশাল বিশ্বগত নিখিল দৃশ্য পদার্থেরই স্বরূপ সেই একমাত্র বোধ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি করিয়া এ সংসারে যত কিছু পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, সে সকল একই বস্তু; যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখনই উহাদের ঐক্যানুভব হইয়া থাকে। পরস্পরাশ্লিষ্ট জতুকাষ্ঠের মিশ্রীভাব যথার্থ জ্ঞানের অভাববশে বাহ্য দর্শনেই দেখা যায়; পরন্তু প্রকৃত জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে উহাদের পরস্পর সংযোগ-ভেদ বৈ ঐ মিশ্রীভাব প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ বলা যায়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদির যে মিশ্রণ, তাহা সেরূপ সংযোগ মাত্র নয়। অজ্ঞানে দেখা যায় বটে যে, উহারা জতু-কাষ্ঠাদিবৎ সংযোগতঃ সম্মিশ্রিত; কিন্তু যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে জতুকাষ্ঠাদিবৎ উহাদের ভেদ থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন উহারা একই হইয়া যায়। দুই পাত্রস্থ জল ও দুই পাত্রস্থ ক্ষীর যেমন পরস্পর একই বস্তু; উহাদের প্রত্যেক বস্তুদ্বয়ের একত্ব যেমন অনুভব-সিদ্ধ; জানিবে,—দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুরও একত্ব সেইরূপই। ফলে উহাদের একত্ব জতুকাষ্ঠাদিবৎ সংযোগমাত্র-রূপ নহে।

হে দ্বিজেন্দ্র! এই নিখিল বস্তুই একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? সকলেই তো সেই নিত্য মুক্ত ব্রহ্ম। কাজেই বলা যায়, 'তুমি' 'আমি' ইত্যাকার ভেদজ্ঞানই ভববন্ধনের কারণ। আর 'অহং' জ্ঞানের যে বিলোপ, তাহাই মুক্তির হেতু। উল্লিখিত প্রকার ভববন্ধন খণ্ডন করিতে যখন নিজেই পার, ইচ্ছা করিলেই যখন অহঙ্কার পরিহার করিয়া মুক্তিপদে উপনীত হইতে

সমর্থ হও, তখন আর ঐ বিষয়ে তোমার ক্ষমতা নাই, এ কথা বলা যায় কি? ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, অহঙ্কার অসত্য, উহা বস্তুতঃ অনুৎপন্ন; তথাচ দ্বিতীয় চন্দ্র ও মরীচিকাজলের ন্যায় কেন যে উহা উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা বুঝি না। ইহা আমার, ইহা আমার নহে, এই এইরূপ ভ্রমজ্ঞানই সংসারবন্ধনের কারণ; কিন্তু আমি কিছুই নই, আমারও কিছুই নাই, সমস্তই সেই ব্রহ্ম, ইত্যাকার যে জ্ঞান—যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, এরূপ জ্ঞানও তো নিজেরই আয়ত্ত আছে। ফলে এইরূপ নিজায়ত্ত উপায় সত্ত্বে অপার সংসারযাতনা নীরবে ভোগ করিয়া যাওয়া কি কম অজ্ঞতার বিষয়! কুণ্ড-মধ্য-পতিত ক্ষুদ্র বদরীফল যেমন অননুভূত ও কুম্ভমধ্যেই অদৃশ্য হয় এবং ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে ঘট দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য যে অহঙ্কার দ্বারা অন্তরিত বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন, এরূপ অবশ্য মনে করিও না। কেন না, যিনি পূর্ণ আত্মচৈতন্য, তাঁহার এরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই—যাহাতে বদরীফলবৎ তিরোধান বা ঘটাকাশবৎ অবচ্ছেদ ঘটিতে পারে। আত্মা অদ্বিতীয়; তাঁহার যে ভিন্নরূপে কল্পনা, তাহা অবিদ্যা-প্রভাবেই কল্পনাসিদ্ধ মাত্র। অতএব যদি প্রকৃত আত্মচৈতন্য ও জীব-চৈতন্যের পরস্পর জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই উক্ত উভয়ের একাত্মতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। জৈমিনি মতাবলম্বিগণ বলেন,—জড় ও অজড় উভয়েরই একত্ব আছে। জানিবে,—ঐ একত্ব সম্যক্ অপরিজ্ঞান হইতেই সংঘটিত হয়। কেন না, যাহা কিছু জড়াংশগত, তৎসমুদয়ই জড় বলিয়া জড়াংশ-গত ঐক্যও জড় বৈ আর কিছুই নয়; অতএব জড়াকার ঐক্যের স্ফুরণ হইবে কিরূপে? এদিকে চৈতন্যাংশ যখন চৈতন্যই, তখন চৈতন্যাংশ-গত যে একত্ব, তাহাও চৈতন্যস্বরূপই; অতএব চৈতন্যময় ঐক্যের বিষয় চৈতন্য হওয়া অসম্ভব; কাজেই উহাদের একত্বও সম্ভবপর নহে। আর এক কথা, যদিও অংশগত হউক, তথাচ জড় বা অজড় কোন কিছুই নিজ রূপ পরিহার করে না; এইজন্য অংশী ও অংশের উভয়রূপতাও কখনই সম্ভাব্য হইতে পারে না। যে বস্তুর যে স্বভাব, তাহা সর্ব্বথা অনপনেয়; কাজেই যে বস্তু স্বভাবতই অজড়, তাহা স্বীয় স্বভাবগুণে নিজ অজড়তা-

রূপ পরিহারপূর্ব্বক কিছুতেই জড়তা লাভ করে না। চৈতন্যময় দৃশ্য অজড় বস্তুকে জড়াকারে দেখিতেছি বটে, কিন্তু ইহার কারণ উহাতে দ্বৈত ভ্রমমাত্র; এই দ্বৈত ভ্রম আছে বলিয়াই ঐরূপ বোধ হয়। নচেৎ যাহাতে অজড়কে জড় বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, এরূপ একত্ব জড়াজড়ে বাস্তব পক্ষে নাই। মনের অনন্ত কুৎসিত-বিকার হইতেই নানাবিধ বাসনায় ও অভিমানে জড়িত হইতে হয়; তদবস্থাপন্ন হইয়াই উল্লিখিত অসম্যক্ দৃষ্টিতে ব্রহ্মতত্ত্ব সমন্বয় করিতে করিতে অনেকে শৈলচ্যুত শিলাখণ্ডবৎ অত্যধিক অধঃপতিত হইয়া যায়। মানবগণ যেন তৃণরাশি; তাহারা বাসনাবায়ুর প্রবাহে পরিচালিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অনন্ত দুঃখ উপভোগ করে। তাহাদের ঐ সকল দুঃখ অনির্ব্বচনীয়। মানবগণ বিষয়রসে রঞ্জিত হইয়া কামিনীকুলের করতলাহত কন্দুকবৎ একান্ত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে যখন দেহান্ত হয়, তখন নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে। সেখানে তাহারা অশেষ ক্লেশে জর্জ্জরিত হয়,—হইয়া পুনরপি অন্যবিধ দেহ আশ্রয় করে।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যেমন বর্ষাগমে কীটকুল প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি যে সকল মানব বিষম সংসারপথে পতিত, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের লক্ষ লক্ষ ক্লেশজনক কর্ম্ম পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হয়। সংসারী মানবের পুত্র কলত্রাদি বস্তু সকল যেন মহারণ্য-গত উপলখণ্ডাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। উহাদের পরস্পর কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাচ একমাত্র ভাবনাই উহাদিগকে শৃঙ্খলাবৎ পরস্পর গ্রথিত রাখিতেছে। বসন্তাগমে ভূমির রসসঞ্চার হয়; সেই জন্য বনভূমি যেমন বৃক্ষবল্লী প্রভৃতি দ্বারা অগম্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তেমনি মানবদিগের যে চিত্তক্ষেত্র,

তাহাতে বিষয়রসের সঞ্চার হয়; সেই কারণ উহা বিবিধ ঘটনাবলীরূপ তরু-নিকরে নিবিড় ও তিমিরাবৃত হইয়া থাকে। আহা, কি খেদের বিষয়! জীবগণ একমাত্র বাসনার বশেই বিবশ হইয়া পড়ে; তাই তাহারা নানা জন্মে নানাবিধ সুখ দুঃখ সকল উপভোগ করিয়া থাকে। হায়-রে কি বিষম বস্তু—বাসনা! এই সংসারস্থ সমগ্র জনের স্বীয় সত্তা বাস্তবিক কিছুই নাই, তথাচ কেবল মাত্র বাসনারই বশে অন্তরে এই সংসার-ভ্রম অনুভব করে। আত্মায় এবং চন্দ্রমণ্ডলে ভেদ কিছুই নাই। কেন না, উভয়ই অপার আনন্দ ও অমৃতময় শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং উভয়ই নিখিল পদার্থে সুশীতল। সুতরাং শান্তির জন্য সেই শান্ত আত্মবস্তুর প্রতিই সাভিলাষ হওয়া কর্ত্তব্য। যে জন পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই যে কোন তুচ্ছ বিষয়ের অভিলাষী হয়, সেই মর্য্যাদা-বর্জ্জিত মূঢ় এবং যে কোন বালক এ উভয়ের পার্থক্য কিছুই নাই। মীন যেমন আপনার শুভাশুভ বুঝে না; না বুঝিয়াই যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ মধ্যে আর কিছুতেই আমিষগ্রথিত বড়িশ পরিত্যাগ করে না, তেমনি যে মূর্খের শুভাশুভ জ্ঞান নাই, সে তাহার লব্ধ বিষয়ামিষ আজীবনান্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার মুর্খ ও কীটজাতীয় মৎস্য এই উভয়ের আর বিশেষত্ব কি? দেহই বল, আর পুত্র কলত্র ও অর্থাদি অখিল বস্তুর কথাই বল, সকলই বালুকাময় শুষ্ক দেহবৎ একান্তই ক্ষণবিনশ্বর। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শত শত যোনিতে আকল্পকাল ভ্রমণ কর, একমাত্র শান্তিগুণ বিনা কিছুতেই চিত্তের শান্তি হইবে না। পথ বন্ধুর হইলেও যদি পথ দেখিয়া চলে, তবে উহার বন্ধুরতা যেমন পথিকের ক্লেশোৎপাদন করিতে পারে না, তেমনি যদি তত্ত্বপথ বিচার করা যায়, তাহা হইলেই আর সংসারবন্ধনে ক্লেশ পাইতে হয় না। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া থাকে, পিশাচে যেমন তাহার কিছুই করিতে পারে না, তেমনি তোমার চিত্ত যখন বিবেক-বিষয়ে অবস্থিত হইবে, তখন আর বাসনা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। নয়ন প্রসারণ করিলেই যেমন রূপালোক হয়, তেমনি চৈতন্যময় আত্মার প্রসরণক্রমেই এই অহম্ভাবময় জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

হে কামাদিরিপু-দমনকারিন্! নেত্র নিমীলন করিলে যেমন নিখিল রূপ দর্শনের নিবৃত্তি হয়, তেমনি যখন জীবচৈতন্য নিমীলিত হন, তখনই সমুদায় দৃশ্য বস্তুর উপশম ঘটিয়া যায়। এই যে অহম্ভাবময় জগৎ দেখিতেছ, ইহা একটা নিতান্তই অসৎ বস্তু; বায়ু যেমন গগনাঙ্গনে স্পন্দ বিস্তার করে, তেমনি সেই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য আত্মাই অবিবেক-বশে কিঞ্চিৎ প্রসৃত হইয়া নিজেই নিজের শূন্যময়াত্মায় ঐ অসৎ জগতের বিস্তার করিতেছেন। ব্রহ্মচৈতন্য অতীব বিমল; তিনি বাস্তব পক্ষে কিছুই না করিলেও অন্তরে মৃৎ-কনকাদি-কল্পিত কুম্ভবৎ অসত্য হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত এই জগতের আকারে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতেছেন। গগন যেমন শূন্য, পবন যেমন স্পন্দ এবং ঊর্ম্মি যেমন জলমাত্র, তেমনি এই যে জগৎ, ইহাও ব্রহ্মচৈতন্য মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যেমন সলিল-গত সলিলাব্যতিরিক্ত শৈলাকার তরঙ্গততি, জানিও,—এই ত্রিজগৎই তেমনি সেই নিরবচ্ছিন্ন, নির্ব্বিভাগ, শান্ত ব্রহ্মাকাশ। যাঁহার সর্ব্ববাসনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, তথাবিধ শান্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে এইরূপ একটা শীতলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাতে দহন-কণোপম সাংসারিক সর্ব্বতাপ চন্দ্রবৎ শীতল হইয়া যায়। নিখিল জগৎ যখন নিরতিশয় শান্ত সর্ব্বগত কল্যাণময় আত্মরূপে প্রকাশিত, তখন কি কার্য্যে বা কি সাধন-যোগে, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কি পদার্থ উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা? একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই নিখিল পদার্থের স্ব স্ব স্বরূপ। যাহাতে ব্রহ্মসত্তার স্ফূর্ত্তির কোনই ব্যাহতি নাই, তৎসমুদায়ই অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশমান। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুভবে যে যে পদার্থসত্তা বা উৎপত্তি প্রভৃতি বিকার সিদ্ধবৎ প্রতিপন্ন হয়, তৎসমুদায়েই বাধানুভব হইয়া থাকে। পরন্তু আমি তো বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু উহাদের সত্তা তো কৈ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমি বুঝিয়াছি,—ঐ সকল আকাশ-কুসুমবৎ অসত্য। হে বিপ্র! যে কিছু বাধক বস্তু বিলোকন করিতেছ, তৎসকলই মনের কল্পিত; মনের যখন বিনাশ হইবে, তখন উহাদেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিতেছি,—তুমি চিত্তকে পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানী হইয়া মহোপলখণ্ডবৎ শান্তভাবে অবস্থিত হও।

মনের বিলোপ হইলেই রূপাদি মনন ও রূপাদির প্রকাশক চক্ষুরাদির বিলোপ হইবে; অতএব জ্ঞানীরও বিলোপ অবশ্যই ঘটিবে; কাজেই মনঃশূন্য হইয়া অবস্থান করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না; কেন না, এই জ্ঞানী তাদৃশ চিত্তবিহীন নহেন; ইনি সেই অজ অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ।

হে দ্বিজ! যিনি চিত্ত পরিহার করিয়া আকাশকল্প আত্মভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার নামরূপের অনুভবই হয় না। তথাবিধ ভাবে অবস্থিতির দৃঢ়াভ্যাস না থাকায় সকলই স্বপ্নবিকারবৎ অনুভূত হয়। ব্রাহ্ম কর্ত্তা কেহই নাই; কিম্বা জগচ্চিত্রও কিছুই নাই। কোনরূপ উপাদান ও সামগ্রীসম্ভার বিনা শূন্যমার্গেই সঙ্কল্পবলে এই জগচ্চিত্র প্রকটিত হইতেছে। মন যে কালে যাহার কল্পনা করে, একমাত্র সেই চিন্ময় আত্মাই তখন মনঃকল্পিত সেই বস্তুতে তদাভাসাকারে অবস্থান করেন। সুতরাং আত্মাতিরিক্ত দৃশ্য যখন কিছুই নাই; তখন আত্ম ভিন্ন বলিয়া যে কোন দৃশ্যকে অবধারণ করিতেছ, তত্তাবৎই অসত্য; ফলে, কে কোথায় কিরূপে কি কার্য্য করিবে? 'আমি সুখী' এই প্রকার অনুভবই সুখ আর 'আমি দুঃখী' এইরূপ অববোধই দুঃখ; ইহা ভিন্ন সুখ বা দুঃখের কারণ অপর কোন পদার্থই নাই। কেন না, যে যৎকিঞ্চিৎ পার্থিব পদার্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে, সকলই সেই ব্যোমাত্মা এবং সকলই আত্মভাবে বিরাজিত। ফলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট শৈলাদি মিথ্যা, জানিবে—নিখিল পার্থিব বস্তুরই পার্থিবত্ব তেমনি মিথ্যা। অহঙ্কারের বশেই ঐ সমুদায়ের ভ্রমময় অস্তিত্ব অনুভূত হয়, আর অহঙ্কারের বিলোপ ঘটিলেই শান্তিরূপিণী ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুবর্ণময় বলয় যেমন সুবর্ণ হইতে বস্তুতঃ বিভিন্ন না হইলেও তাহাতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান বলয়-রূপতা বিদ্যমান, জানিবে—তেমনি তোমারও অসত্য অহম্ভাব অবস্থিত। যিনি শান্তির পথে অধিরোহণ করেন, তথাভূত মহাত্মায় অহম্ভাব থাকে না। সমগুণ-সম্পন্ন জ্ঞানী জন যদিও শূন্যময়, তথাচ তিনি ব্রহ্মানন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়াই বিরাজমান। হৃদয় তাঁহার সুশীতল থাকে; তদীয় মানসিক বৃত্তিগুলি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বলিয়া তিনি নির্ম্মনস্কভাবে অবস্থান করেন।

তাঁহার সর্ব্বকার্য্যেই ঔদাস্য, তাই তিনি যদি কোন কার্য্য করেনও, তথাচ তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াই অভিহিত করা হয়। তাঁহার কোনওরূপ বাসনা থাকে না; তাই তিনি চেষ্টাভিমান-বিরহিত হইয়াই বিরাজ করেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিলে যেন একটা পাষাণপ্রতিমা বলিয়াই মনে হয়। কাজেই তিনি যদি কোনও রূপ ব্যবহার-পরায়ণও হন, তথাচ মনে হয়, যেন তিনি কিছুই করিতেছেন না; যেন তিনি একই ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপই ধারণা হয়। দোলার উপর শিশুজন সুপ্ত আছে; সেই দোলা দোদুল্যমান হইতে থাকিলে, তত্রত্য সুপ্ত শিশুর অঙ্গ যেমন স্পন্দিত হইলেও তাহাতে তাহার আত্মাভিমান না থাকায় সে নিস্পন্দ হইয়াই অবস্থান করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্য-ব্যাপৃত হইলেও তাহাতে তাঁহার আত্মাভিমানের অভাবে তিনি যেন নিত্য নিস্পন্দভাবেই বিরাজ করেন। বাহ্য জ্ঞান অপগত হওয়ায় যিনি পূর্ণ জ্ঞানময়তা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, মমতা বা শুভেচ্ছা, কোন বিষয়েই নাই; তথাবিধ ব্যক্তি শান্ত অনন্ত আত্মময় বলিয়া কিরূপে তাঁহার আত্মাভিমান সম্ভবপর হইতে পারিবে? দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন কিছুরই জ্ঞান নাই বলিয়া যিনি একপ্রকার নিরাকার—নির্ব্বিকার, তথাভূত নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি কোন বিষয় দেখেনও, তথাচ তাঁহার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে? সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের জন্য যে অপেক্ষা, তাহারই নাম সুদৃঢ় সংসার বন্ধন, আর সকল বিষয়ের যে উপেক্ষা, তাহারই নাম সংসার-মোক্ষ। উক্ত প্রকার উপেক্ষার অভ্যন্তরেই যাঁহার বিশ্রাম, তিনি আর কোন্ বস্তু দেখিবেন? ফলে তিনি দেখিয়াও কিছুই দেখেন না। ভ্রমাত্মক স্বপ্নাঙ্গনার ন্যায় এই দেহের পার্থিবতা যখন অসত্য, তখন কে কাহার প্রতি কিসের জন্য সাপেক্ষ হইবে? ফল কথা, যিনি জ্ঞানী জন—তিনি সর্ব্ববিধ চেষ্টা, সর্ব্ব প্রকার কৌতুক ব্যাপার বা নিখিল ক্লেশ পরিহারপূর্ব্বক কেবল মাত্র জ্ঞানময় হইয়াই বিরাজ করেন।

রামচন্দ্র! ভুজঙ্গ যেমন কঞ্চুক পরিহার করে, তেমনি সেই দ্বিজবর মঙ্কি এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সুবিস্তৃত মোহজাল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি বাসনা-বিরহিত-মনে শত বর্ষ পর্য্যন্ত

অবিচ্ছেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত বৎসর অতীত হইলে সেই মঙ্কি কোন এক বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। মঙ্কি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান অন্তর্হিত হইল। ক্রমে তিনি পাষাণপ্রায় অবস্থাপন্ন হইলেন। সেই অবস্থায় অদ্যাপি তিনি অবস্থান করিতেছেন। যদি কখন অতি কষ্টে তাঁহাকে প্রবোধিত করা যায়, তবে তিনি প্রবুদ্ধ হন।

হে রঘুনন্দন! তুমিও ঐ মঙ্কির ন্যায় হও। ঐরূপ উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তোমার চিত্ত উদ্‌যোগী হউক। তুমি বিবেকের প্রসাদে আত্মানন্দে বিহার করিবার জন্য প্রকৃত শান্তি অবলম্বন কর। তোমার মতি যেন বিষয়ভোগে অনুরাগযুক্ত না হয় এবং তাহা যেন বিবেক-বিরহিত হইয়া শারদীয় নীরস নীরদরাজির ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যেই দীনদশায় উপনীত না হয়।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সুন্দর! তোমার বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ সমস্ত বৃত্তি বিদূরিত হউক। তুমি শান্তচিত্ত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্য-কলাপের অনুসরণ করিয়া যাও। যেমন স্ফটিক-মণিময় প্রতিমা, তেমনি তুমি সৎ হইয়াও অসদাকারে প্রতীত হইবার চেষ্টা কর। চিদাকাশ এক হইয়াও অনেকরূপে পরিব্যাপ্ত এবং যখন প্রবোধোদয় হয়, তখন তিনি ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন কিছুই বলিয়া অনুভূত হন না; সুতরাং তথাবিধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? সমস্ত শূন্য পথ আদি-অন্ত-বিরহিত, এবং উহা পরমাত্মা দ্বারাই পরিপূর্ণ; সুতরাং এই ভ্রমাত্মক দেহের উৎপত্তি-লয় দেখিয়া উল্লিখিত নির্ব্বিকার পূর্ণ-পরমাত্মার বিকারাদি আছে বলিয়া সম্ভাবনা করা যাইবে কিরূপে? জড় পদার্থের সৃষ্টি প্রভৃতি

কার্য্য মনেরই চাঞ্চল্য বশে পরিস্ফুরিত হয়, এবং মনের চাঞ্চল্য যখন অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখনই ঐ সকল পদার্থ জলে তরঙ্গস্তোমের ন্যায় এক পরমাত্মাতেই অভিন্নাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শুভ্র জলদজালে বাসনাশঙ্কা যেমন নিতান্তই নিষ্ফল ও মিথ্যা, এ দেহে 'অহম্ভাবনা'ও সেই-রূপই। তাই বলিতেছি, তুমি এই দেহাদি অসত্য পদার্থে 'অহং' জ্ঞান করিয়া মজিও না। ঐ প্রকার 'অহং'জ্ঞানের বশেই পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। অতএব যাহা সেই পরম কল্যাণময় পরমপদ, অনন্ত সুখ ও অপার ঐশ্বর্য্যলাভার্থ তাহারই ভাবনা করিতে থাক। সেই যিনি সমভাবাপন্ন চিদাকাশময় ব্রহ্ম, এ জগতে তিনিই একমাত্র পরম বস্তু। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; তোমার অন্তঃকরণ সেই পরম পদ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল হউক। তুমি ব্রহ্মবস্তু নির্ণয় করিয়া তাঁহাতেই যদি একনিষ্ঠ হইতে পার, তবে সেই নিরঞ্জন পরমাত্মরূপেই তোমার অধিষ্ঠান হইবে। ধ্যাতা, ধ্যান বা ধ্যেয় বলিয়া যে বস্তুকে অবধারণ করিতেছ, উহা সম্পূর্ণ অসত্য; ধ্যাতা, ধ্যেয়, সকলই সেই ব্রহ্ম; উহাদের পার্থক্য কিছুই নাই। দ্রষ্টা বল, দৃশ্য বল, আর দর্শন বল, সকলই চিদ্‌বিলাস মাত্র; আর যাহাকে জড় বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেছ, উহা চৈতন্যময় পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ফলে সকলই একমাত্র সেই চৈতন্য-মূর্ত্তি ব্রহ্ম। ধ্যান ও ধ্যেয় প্রভৃতি সকলই ভ্রমমাত্র; ধ্যেয় পদার্থ ব্রহ্ম, তিনি ধ্যান বিনা সর্ব্বদাই সমানভাবেই প্রকাশিত।

রামচন্দ্র! আত্মা চিন্ময়; তিনি সর্ব্বদাই শান্তিময় ও সমভাবাপন্ন। প্রতিপচ্চন্দ্রেরই উদয় হউক অথবা প্রলয়ের প্রভঞ্জনই প্রবাহিত হউক, অব্ধি যেমন তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হয় না, তেমনি ঐ আত্মতত্ত্বও ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হইবার নহেন। যে জন নৌকারোহণে দ্রুত গমন করে, তাহার নয়নে যেমন তীরগত তরুগিরি প্রভৃতি সঞ্চল বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং শুক্তিতে যেমন রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, তেমনি চিত্তের ভ্রান্তিক্রমে ব্রহ্মেই দেহাদি ও তৎসমুদায়ের সচলতা প্রতীত হয়। সেই পরম বস্তু ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সম্ভাবনা নাই। যাহা কিছু দেখিতেছ, তৎসমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে। তিনি জ্ঞানময়; তাই সকলে তাঁহাকে ব্রহ্ম

আখ্যায় অভিহিত করেন। সেই ব্রহ্ম পদার্থ ব্যতীত জগতের আদি কিছুই বিদ্যমান নাই। বলিতে কি, এমন যে ভ্রান্তি, তাহাও তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। যেমন গগনে কানন, বালুকাময় প্রদেশে জল এবং সুধাংশুমণ্ডলে সৌদামিনীর অসদ্ভাব, তেমনি তত্ত্বদর্শনেও দেহাদির বিদ্যমানতা অসম্ভব।

হে সত্যজ্ঞগণের অগ্রণী! এই অসত্য জাগতিক ভ্রমে তুমি ভয় পাইও না। আমি তোমায় যেরূপ যাহা বলিলাম, জানিও—ইহাই সত্য পরম বস্তু। এই জগৎই সত্য, ব্রহ্মের বিদ্যমানতা অসত্য, পূর্ব্বে তোমার এইরূপই ভ্রম জন্মিয়াছিল; কিন্তু তোমায় যে সকল নিশ্চিত উপদেশ প্রদান করা হইল, তাহাতে তোমার সে ভ্রান্তি এখন নিশ্চয়ই বিলীন হইয়াছে। তাই বলিতেছি, ভববন্ধনের অপর কি কারণ আছে? স্থালীর কথাই বল, আর কুম্ভাদির কথাই বল, তাহা যেমন একমাত্র মৃত্তিকা বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই যে জগৎ—জানিবে, ইহাও চিত্ত মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবেই এই জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

হে রাঘব! আমি তোমায় এই যে শান্তিময় উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহাতে নিরহম্ভাব হইয়া তুমি কি সম্পদ, কি বিপদ, কি উন্নতি, কি অবনতি, সকল সময়েই হর্ষবিষাদাদি পরিহারপূর্ব্বক সমভাবে অবস্থিত হও। আমার এই উপদেশ ভুলিয়া গিয়া তুমি ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাত্মতা বিস্মৃত হইও না। হে রঘুবংশাকাশের শশলাঞ্ছন, রাম! ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একাত্মতা স্পষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি যদি থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে চিত্তের সন্তাপকর হর্ষ-শোকাদি পরিত্যাগ কর, অথবা ঔদাস্যের সহিত তাহাদের অনুসরণপূর্ব্বক পরমসুখে বিরাজিত হও।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! বীজ, অঙ্কুর, পুরুষ ও কর্ম্ম অদৃষ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট; উহাদের প্রকৃত তত্ত্ব পুনর্ব্বার মৎসমীপে প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! প্রকৃত পক্ষে কেহই কাহারও উৎপাদক বা উৎপাদ্য নহে। এ জগতে অদৃষ্ট, পুরুষ, পুরুষকার ও ঘট-ঘটত্বাদি যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেছ বা যে কিছু দেখিতেছ, সে সকলই চিন্ময়ের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কি পুরুষ, কি পুরুষকর্ম্ম ঘট-পটাদি, চিন্ময়ের স্পন্দন ব্যতীত তাহাদের উৎপত্তির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? এই সমগ্র জগতের সৃষ্টি মাত্র সেই চিৎস্পন্দন দ্বারাই হয়। চিৎস্পন্দন বাসনাবিষ্ট হওয়াতেই এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের প্রাদুর্ভাব; পরন্তু যখন বাসনার অবসান ঘটে, এ সংসারের তিরোধানও তখনই হইয়া যায়। বিজ্ঞগণের মত এই যে, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সস্পন্দ হইলেও প্রকৃত পক্ষে নিস্পন্দ বলিয়াই প্রতীত, তেমনি চিৎস্পন্দ যখন বাসনা-বিরহিত, তখন অস্পন্দমধ্যেই পরিগণিত।

বৎস! চিৎস্পন্দময় পুরুষ ও কর্ম্মের সৃষ্টিব্যাপারে প্রভেদ মাত্র কল্পনাংশ; কল্পনাংশবশেই জল ও জলতরঙ্গবৎ পুরুষ ও কর্ম্মের দ্বিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। হিম ও শৈত্যের যেমন অভিন্নতা, তেমনি কর্ম্মেরই পুরুষতা এবং পুরুষতারই কর্ম্মতা। ফল কথা এই যে, হিম ও শৈত্য উভয়েরই যেমন পরস্পর একত্ব, তেমনি কর্ম্ম ও পুরুষ উভয়ই পরস্পর অভিন্ন। অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও পুরুষাদি সকলই চিন্ময়ের স্পন্দরসের পরিণতি; নচেৎ বাস্তব পক্ষে কর্ম্মাদি স্বতন্ত্র কিছুই নহে। স্পন্দন নিমিত্ত একমাত্র সেই ব্রহ্মচৈতন্যই জগতের বীজ; স্পন্দনের অসদ্ভাবে উহার আর বীজত্ব থাকে না। ঐ বীজই অভ্যন্তরে অঙ্কুরাকারে বিরাজিত; তাই উহা অঙ্কুর-স্বরূপ। মহাসমুদ্র যেমন কখন কোথাও স্পন্দময় এবং কখন কোথাও নিস্পন্দ,

তেমনি ঐ ব্রহ্মচৈতন্যও কদাচিৎ সম্পন্দ এবং কদাচিৎ নিস্পন্দ। ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বভাব এইরূপই। চিৎস্পন্দ যখন বাসনাবিষ্ট হন, তখন অকারণে বীজরূপে দেহাদি অঙ্কুরের কারণ হইয়া থাকে। তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতির অভ্যন্তরগত যথাযথ কার্য্য বীজ—ঐ চিৎস্পন্দই। তদ্ব্যতীত উহার বীজান্তর নাই। ফলে অগ্নি ও উষ্ণতা যেমন অভিন্ন, তেমনি বীজ ও অঙ্কুর অপৃথক্। যেমন বীজ ও কর্ম্ম, তেমনি বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই এক। জল যেমন স্পন্দনযুক্ত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম বুদ্বুদাদির উদ্ভাবক হয়, তেমনি সেই একাদ্বয় চিৎই ভূবিবরে স্পন্দমান হইয়া নানাবিধ স্থাবরাঙ্কুর প্রকাশ করেন। ভাবিয়া দেখ, ভূমধ্য অতি কোমল; ইহা হইতে বজ্র হেন কঠিন অঙ্কুর-নিকর উদ্ভাবিত করিবার শক্তি চিদ্ব্যতীত আর কাহার হইতে পারে? লতা প্রভৃতির অভ্যন্তরে যে রস থাকে, সে যেমন স্বীয় ভাবান্তর পুষ্প-ফলাদির বিস্তার করে, প্রাণীদিগের শুক্ররসের অভ্যন্তরে যে চিৎশক্তি, তিনিই এই সমগ্র জঙ্গমাকারে বিস্তার পাইতেছেন। ঐ চিৎ সর্ব্বত্র সমভাবেই অবস্থিত; একমাত্র তাঁহারই যদি প্রাধান্য না থাকিবে, তবে সুরাসুরাদির উদ্ভাবনশক্তি আর কাহার থাকিতে পারে? ব্রহ্ম জ্ঞানময়; তাঁহার যে বিস্ফুরণ, তাহাই নিখিল চরাচর বস্তুর আদ্য বীজ। এই বীজের আর বীজ কিছুই নাই। ঊর্ম্মি, বীচি ও তরঙ্গাদির ন্যায় বীজ ও অঙ্কুর এবং পুরুষ ও পুরুষকার্য্যের পরস্পর ভেদ কিছুই নাই। পুরুষে ও পুরুষকর্ম্মে এবং বীজ ও অঙ্কুরে দ্বিত্ব বোধ যাঁহা হইতে হয়, তথাবিধ মহানুভব বিজ্ঞ পশুর প্রতি সর্ব্বদাই আমার নমস্কার। বীজচৈতন্যই পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহের বীজভূত; উহারই অন্তরে যে বাসনারস বিরাজিত, ঐ রস হইতেই দেহাদি অঙ্কুর উল্লসিত হয়। অতএব অসঙ্গনামক পাবক দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলো। লোকে কোন কার্য্য করুক, আর নাই করুক, শুভ কিম্বা অশুভ কার্য্যে তাহাদের চিত্তের যে অনাসক্তি, উহাই বুধগণের মতে অসঙ্গ। পক্ষান্তরে বলা যায়, বাসনার যে উৎসাদন, তাহারই নাম অসঙ্গ। অতএব যে কোন প্রকারেই হউক, তুমি অন্তর হইতে বাসনার উৎসাদন কর। অথবা তুমি যদি মনে কর যে, পুরুষকার প্রয়োগে হঠযোগাদি অবলম্বনপূর্ব্বক যে কোনরূপে বাসনার উৎসাদন সুকর

হইতে পারে, তবে তাহাই কর—করিয়া বাসনাঙ্কুর সমূলে সমুৎসাদিত করিবার চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলেই পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। জানিও— অহম্ভাবই বাসনার মূল কারণ; তাই বলিতেছি, তুমি পুরুষকার কিম্বা অন্য কোন সুপরিজ্ঞাত উপায় যোগে ঐ অহম্ভাবকে দূরীভূত কর। জানিবে—উহাকে অপসারণ করিতে পারিলেই বাসনাক্ষয় হইবে। অহঙ্কারকে বর্জ্জন করিয়া বাসনারে যদি ক্ষয় করা না যায়, তাহা হইলে নিস্তারের আর উপায় নাই। সুতরাং যাহাতে অহঙ্কার এবং বাসনার অবসান হয়, এবম্বিধ পুরুষকার অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। নতুবা এই ভীষণ সংসার-পারাবারের পরপারে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। পূর্ব্বে যে আত্মচৈতন্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি, জানিবে—তিনিই জগতের আদিভূত এবং তিনিই বীজস্বরূপ। অপিচ অঙ্কুর, অদৃষ্ট, পুরুষ ও শুভাশুভ সমুদায় পুরুষকর্ম্ম একমাত্র তিনিই। কি বীজ, কি অঙ্কুর, কি দৈব, কি কর্ম্ম, কি মানব প্রভৃতি কিছুই সর্ব্বপ্রথমে ছিল না; ছিলেন কেবল সেই একাদ্বয় অনাদি অনন্ত চৈতন্যময় আত্মা।

হে সাধুশীল! এই যে বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাতে প্রকৃত পক্ষে বীজ ও অঙ্কুর এবং পুরুষ বা পুরুষকর্ম্মাদি কিছুরই সত্তার নাই। যেমন নট ব্যক্তি সুরনরাদির বিবিধ বেশ পরিধান করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মই এই দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চাকারে বিকাশ পাইতেছেন। ওহে নিরাময় রাম! তুমি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অনর্থক পুরুষ ও পুরুষকর্ম্মাদির বিচারাশঙ্কা পরিত্যাগ কর এবং বাসনা-বিরহিত ও সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প-শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাক। তুমি সর্ব্বাভিলাষ ও সর্ব্ব শঙ্কা পরিত্যাগ কর; কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাও এবং ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাক। তোমার মনস্কাম সফল হউক। তুমি নির্ভয় হও, তোমার হৃদয় শান্তিপূর্ণ হউক, তুমি ব্রহ্মানন্দরসে পরিপ্লুত ও পরিতুষ্ট হইয়া থাক।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়া বীতরাগ হও। তোমার দৃষ্টি বাহ্য বস্তু হইতে বিরত হইয়া অন্তর্মুখী হউক। তুমি সর্ব্বত্র সমুদায় কর্ম্মকে সুবিমল শান্ত চিন্মাত্রাকারে অবলোকনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাক। চিন্মূর্ত্তি আকাশসদৃশ বিমল ভাবাপন্ন, প্রাজ্ঞ ও অদ্বিতীয়; তুমি তদভিন্নাকারেই অবস্থিত হও, সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজ কর; সৌম্য হও, শান্ত হও, সতত সকল বিষয়ে সম, আনন্দময় ও মহাশয় হও; ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া সুখে অবস্থান কর। সামান্য বা অসামান্য যে কোন প্রকার শোক বা আপৎ আসিয়া উপস্থিত হউক, অথবা বিষম সঙ্কটসম্ভাবনাই হউক, ঐ সকল কালে তুমি অন্তরে দুঃখানুভব করিও না; তবে কেবল দেশকালাদির অনুসরণ ক্রমে বাহ্যিক অশ্রু বর্ষণ ও ক্রন্দনাদি করিয়া লৌকিক আচারের অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক সে সে কালে তোমার মৌখিক দুঃখ প্রকাশ তুমি করিবে। শীত বা গ্রীষ্মাগমে বস্ত্র বা চন্দনাদির ব্যবহার হইতে যে সুখ-সন্তোষ হয়, বাহ্যতঃ তাহা হইতেও তুমি বিরত হইবে না। তোমার স্বভাব যেন সর্ব্বদা সুনির্ম্মল থাকে। প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুর সমাগমে, কোন উৎসবে কিম্বা কোনরূপ অভ্যুদয়ে, তুমি বাহ্যিক আনন্দ দেখাইবে। সে কালে তুমি বাসনাবিষ্ট মূঢ় জনের ভাণ করিয়া থাকিবে।

হে রাঘব! তুমি আত্মাভিমান বর্জ্জন করিবে; এবং বাহ্যতঃ বাসনার বশীভূত হইয়া অজ্ঞ লোকের ন্যায় অবস্থান করিবে। ঐ অবস্থায় দাবানল-কৃত তৃণরাশি দহনের ন্যায় সংগ্রামে অস্ত্রানলবর্ষণে শত্রুসমূহকে তুমি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো। অর্থোপার্জ্জনের যে সকল ক্রমিক কার্য্য আছে, তাহাতে স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট হইয়া বকের ন্যায় একাগ্রচিত্তে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাক।

হে অরিন্দম! জলসম্পর্কহীন জলধরদিগকে পবন যেমন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তেমনি তুমিও পরম পদে একাগ্রহৃদয় ও নির্ব্বিকল্প হইয়া

বাসনাবিষ্ট মূঢ় লোকের ন্যায় অশেষ অরিব্যূহকে সবলে বিদলিত করিবে এবং যাহারা দয়ার পাত্র, তাহাদিগের প্রতি উদারতা দেখাইবে। যাহা আনন্দ-কর কার্য্য, তাহাতে তুমি বাহ্যিক আনন্দিত হইবে এবং যাহা দুঃখ-কর ব্যাপার, তাহাতে তুমি বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করিবে। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের প্রতি দয়াবান্ হইবে; যাহারা বীর, তাহাদের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিবে। যাঁহার উদার হৃদয় শান্তিপূর্ণ, তিনি অন্তর্দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সদানন্দভাবে আত্মসুখে বিহার করিতে করিতে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। হে নিষ্পাপ! তথাবিধ মহাশয় পুরুষ যেমন কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত নহেন, তেমনি তুমিও যদি আত্মাভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলে আর তোমাতে কর্ম্ম-লোপের সম্ভাবনা রহিবে না।

হে সাধো! যে কালে তুমি আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া অন্তর্দৃষ্টিশালী হইবে, তখন তোমার গাত্রে যদি বজ্রপাতও হয়, তথাচ তাহা কুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। যিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশস্বরূপ পরমাত্মায় যথেচ্ছ বিরাজমান, তিনিই তো আত্মারাম—তিনিই তো মহেশ্বর। তাদৃশ আত্মারাম ব্যক্তি কোনওরূপ অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইবার নহেন; অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল তাঁহাকে আর্দ্র করিবার শক্তি রাখে না, এবং সমীরণ তাঁহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে সক্ষম নহে। তাই বলিতেছি, যাঁহার জরা-মরণ নাই, যিনি নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ অনাদি অনন্ত ব্রহ্মময়, তাদৃশ আত্মাকে তুমি আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চিন্তমনে স্থিরভাবে বিরাজ কর। এই জগৎ যেন একটা বৃহৎ বৃক্ষ; বিবিধ পদার্থপুঞ্জ যেন তাহার কুসুমরাশি; সেই সকল কুসুমের সারভূত সৌরভস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যকে [illegible] আশ্রয় কর এবং নিখিল বাহ্য বস্তুসমূহকে অবিনশ্বর ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিতে করিতে অপার সুখে অবস্থান করিতে থাক। যাঁহাদের দ্বৈতবোধ নাই, যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লইয়াই বাহ্যিক সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের জীবন সত্ত্বেও তাঁহারা পাষাণবৎ বিরাজিত; তাঁহাদের অণুমাত্র বাসনার উদয় হয় না।

রামচন্দ্র! তুমি কূর্ম্মাঙ্গবৎ অন্তরে বাহিরে বৃত্তি-বিরহিত হইয়া থাক।

সেই অবস্থায় কর্ত্তব্য কর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাও এবং মনকে অপ্রসারিত ও অন্তঃসুপ্ত করিয়া রাখ। এইরূপে যে চিত্তের অন্তর্বৃত্তি নাই, অথচ বাহিরে বৃত্তিযুক্ত বলিয়া যাহা সুপ্ত ও প্রবুদ্ধপ্রায়, এ হেন চিত্তে অবস্থিত হইয়াই তুমি সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা কর। যদি অন্তরে বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া বলাকাপ্রভৃতির ন্যায় কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার চিত্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা নির্লিপ্ত হইয়াই রহিবে।

হে রঘুনন্দন! তুমি সতত নির্ব্বিকল্প সমাধি অভ্যাস কর; চিত্তকে অন্তরে বিলীনপ্রায় করিয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট রাখ। এই অবস্থায় সুখে অবস্থিত হও। হে নিষ্পাপ! জ্ঞানের প্রভাবে চিত্তকে তুমি নষ্ট করিয়া ফেলো। যাহা সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত, তথাবিধ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে তুমি অবস্থিত হও। এই অবস্থায় তোমা দ্বারা কোন কার্য্য করা হউক বা না হউক, তাহাতে তোমার প্রত্যবায় কিছুই নাই। তুমি জাগ্রদবস্থায় যে কার্য্যই কর কিম্বা সুষুপ্তাবস্থাতেই থাক, তাহাতে কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জ্জন করিও না। তুমি যদি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় কিম্বা সুষুপ্ত অবস্থাতে জাগ্রতের প্রায় অবস্থিত হইতে পার, তবে জাগ্রৎ-সুষুপ্তি অবস্থার একত্ব নিমিত্ত নিরাময় হইয়া সর্ব্বাতিবর্ত্তী পরমপদ-রূপেই বিরাজমান হইবে।

বৎস! এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশ তুমি অনাদি অনন্ত পরম পদ লাভে যত্নবান্ হও। এ জগতে ভিন্নতা বা একত্ব কিছুই নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি আকাশবৎ নির্ম্মলচিত্তে অনুত্তম বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! এইরূপই যদি নিশ্চিত হয়, তবে আমি যে রাম, আমিই বা কে, এবং আপনিই বা কিরূপে আমায় 'রাম' বলিয়া অবগত হইতেছেন? আপনার নাম বশিষ্ঠ, আপনাকেই বা কিরূপে হেথায় অবস্থিত বলিয়া বুঝিব?

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! রামচন্দ্র এই কথা কহিলে বক্তৃবর বশিষ্ঠ মুনি অর্দ্ধমুহূর্ত্ত কাল মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তূষ্ণীম্ভাবে রহিলে, সভাস্থ সমস্ত মহাজন 'এ কি হইল' ভাবিয়া বিস্ময়-

সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত আমার ন্যায় তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন? এ ত্রিজগতে শিষ্যবর্গের উদ্ভাবনীয় এমন তো কোন পূর্ব্ব-পক্ষই আছে বলিয়া মনে হয় না, যাহার উত্তর গুরুজনে করিতে পারেন না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! আমার আর শক্তি নাই, যুক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে; এরূপ অবশ্য তুমি মনে করিও না। তোমার প্রশ্ন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; জানিবে— মৌনাবলম্বনই উহার প্রকৃষ্ট উত্তর। বিজ্ঞ ও অজ্ঞভেদে প্রশ্নকর্ত্তা দুই প্রকার। উহাদের মধ্যে বিজ্ঞকে জ্ঞান-পূর্ণ এবং অজ্ঞকে অজ্ঞতাপূর্ণ উত্তর প্রদান করাই বিধেয়।

হে মতিমন্! এতকাল পর্য্যন্ত তুমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলে; তাই বিবিধ বিকল্প-জ্ঞানময় প্রত্যুত্তর তোমায় প্রদান করিয়াছি। অধুনা তুমি পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিয়াছ; তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে যে আর বিকল্প উত্তর প্রদান করিব, এরূপ অবসর এখন আর নাই। সেরূপ উত্তর পাইবার তুমি আর যোগ্য নহ। হে বাগ্মিবর! হে সাধো! গবাক্ষ-বিবরাদির মধ্য দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট সৌরকিরণ যেমন অসীম ত্রসরেণু যোগে পরিপূর্ণ, তেমনি কি সূক্ষ্মার্থ, কি পরমার্থ, কি অল্প, কি বহু, যত বাঙ্ময় বিদ্যমান, তৎসমস্ত-বাক্য-ব্যবহারেই প্রতিযোগী, ব্যবচ্ছেদ, সংখ্যা ও পরমার্থ প্রভৃতি ভ্রম প্রতিভাত। হে শোভন! শুনিয়া রাখ, যিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কখনই ভ্রম-মালিন্যময় উত্তর পাইবার যোগ্য নহেন। অপিচ যাহাতে ভ্রম-মলিনিমা নাই, এরূপ বাক্যের একান্তই অভাব। অতএব তুমি যখন তত্ত্বজ্ঞপদে উন্নীত হইয়াছ, তখন আর তোমায় আমার বাঙ্ময় উত্তর প্রদান করা উপযুক্ত হয় না। তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, আমার একজন প্রকৃষ্ট 'জ্ঞানী' শিষ্য হইয়াছ। সুতরাং যাহা প্রকৃত উত্তর, তাহাই প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। এই যে প্রশ্নবিষয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কাষ্ঠবৎ মৌনভাবই নির্দ্দোষ উত্তর। ইহাই বুধমণ্ডলীর অভিমত। বুধগণ বলিয়া থাকেন, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানোদয় হয়, ততকাল অজ্ঞানের প্রভাবেই পরম পদার্থকে বাগ্‌বিষয় বলিয়া বোধ

হয়; পরন্তু যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই বাক্যের অবিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাই বলিতে হয়, যখন তুমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছ, তখন তূষ্ণীম্ভাব প্রদর্শন দ্বারাই তোমাকে প্রকৃষ্ট উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

রামচন্দ্র! যদ্বস্তু বক্তার স্বরূপ, বক্তা তাবন্মাত্রেরই প্রখ্যাপক। কাজেই আমার স্বরূপ যখন নির্ব্বিকল্প—আমি যখন তত্ত্বজ্ঞানেরই অধিগম্য, তখন আমি যে বাক্যাতীত, ইহা নিশ্চিতই। অতএব বাক্যরূপ মলগ্রহণ আমি কিরূপে করিতে পারিব? যে কিছু বাক্য সকলই সঙ্কল্পযোগে কলঙ্কিত; সুতরাং আমি আর বাক্যাতীত বিষয় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! প্রতিযোগী ও ব্যবচ্ছেদাদি করিয়া বাক্যের বহু দোষ আছে সত্য; কিন্তু ঐ সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া আপনি নিশ্চয় বলুন,—কে আপনি?

বশিষ্ঠদেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞগণের অগ্রণী রঘুবর! শুনিবার যদি তোমার এতই আগ্রহ হয়, আর প্রষ্টব্য বিষয় যদি সেইরূপ করিয়াই বলা যায়, তাহা হইলে বলি শুন;—কে আমি? কে তুমি? কে এ জগৎ? জানিবে—তুমি, আমি বা জগৎ, কেহই কিছু নয়। কোনওরূপ সঙ্কল্পের লেশমাত্র আমাতে নাই। আমি সর্ব্বসঙ্কল্প-বর্জ্জিত নিরাময় চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহি। শুধু আমি বলিয়া কি? এই যে তুমি, এই যে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সকলই কেবল সেই শুদ্ধ চিদাকাশ মাত্র। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, সুবিমল ও জ্ঞানময়; তন্মধ্যে যে তুমি, আমি বা জগৎ, এ সকলই সুবিমল জ্ঞানময় আত্মা মাত্র বৈ আর কি বলা যায়? বস্তুতঃ সেই পরমাত্ম বস্তু হইতে আমাদের অণুমাত্র পার্থক্য নাই। আমরা সমস্তেই আত্মা হইতে অভিন্ন; ইহা ব্যতীত আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? শিষ্যবর্গ যাহাতে সংসার হইতে মুক্তি পাইতে পারে, বিদ্বান্ গুরু তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা স্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক অহম্ভাব প্রকাশ করেন এবং যিনি সেই একাদ্বয় পরম বস্তু, তাঁহাকেই নানাপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি শান্তিময় জীবন্মুক্ত

ব্যক্তি, তিনি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার ঔদাস্য; তাই তিনি অহম্ভাব-বর্জ্জিত, অন্যত্র ভেদজ্ঞান-বিরহিত ও সুখ-দুঃখাদি-বিকার-বিহীন ভাবে যে শবপ্রায় অবস্থান করেন, জানিবে,—তাঁহার সেই অবস্থানই পরম মঙ্গলময় পরম পদ। মুক্তির অভাবস্বরূপ বলিতে অহম্ভাবকেই বলা যায়। সুতরাং হৃদয়ে যতক্ষণ 'অহং' জ্ঞান বিদ্যমান, তখনকার মধ্যে মুক্তি চিন্তা আর কিছুতেই হইতে পারে না। যিনি অহংজ্ঞান লইয়া মুক্তির সন্ধান করেন, জন্মান্ধ ব্যক্তির চিত্রদর্শনের প্রয়াসবৎ তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াই যায়। যিনি বাস্তব পক্ষে জড় নহেন, অথচ দেহের সচলতা এবং অচলতা যাহাতে ঘটিতে পারে, এই উভয়বিধ কার্য্যেই যদীয় চিত্ত পাষাণ হেন জড়াকারে অবস্থান করে, জানিও,—তাঁহার তথাবিধ চিত্তাবস্থিতিই জরা-মরণাদি-বর্জ্জিত নির্ব্বাণ-পদবী। যে সকল জ্ঞানী জনের লৌকিক ভোগলিপ্সা নাই, তাঁহারা যেমন আপনার জ্ঞানিত্ব আপনিই অনুভব করেন, অন্যের সেরূপ অনুভব যেমন হইবার নহে, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও নির্ব্বাণপদ যে কি, তাহা নিজে নিজেই অনুভব করিয়া থাকেন। উহা অন্যের বুঝিবার শক্তি হয় না। ঐ নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণময়; উহা একমাত্র ব্রহ্মময়তা বৈ আর কিছুই নয়। উহাতে আমিত্ব নাই, তুমিত্ব নাই, বা আমিত্ব-তুমিত্বের ভিন্নতা নাই, অথবা অন্য কোন প্রকারত্বও নাই। বুধগণের মতে চৈতন্য-ময় আত্মার জ্ঞেয় জ্ঞানই চৈতন্য; উহাই সংসার এবং উহাই অনন্ত দুঃখের মূল-বন্ধন। যাহা জ্ঞেয় বস্তু, তাহার অনববোধই অচেতনতা, এবং উহাই শান্ত অব্যয় পরম মোক্ষপদ। আত্মা পরম শান্তিময়; তাঁহাতে দিক্ ও কালাদি-কৃত ব্যবচ্ছেদ থাকে না, না থাকিলেই জ্ঞেয় বস্তুরও অসম্ভাবনা। অতএব সে কালে আর কাহার কোন্ বস্তুজ্ঞান হইবে বল?

হে সভাস্থ ভূপালগণ! স্বপ্নে যে জগদ্দর্শন হয়, তাহাতে জ্ঞানান্তর্গত বাসনানুরূপ সঙ্কল্প জ্ঞানময় হইলেও তাহা যেমন স্বীয় জ্ঞানময়তার পরিহারে অন্যথা প্রতীত হইয়া থাকে, এই যে বহির্জগৎ দেখিতেছ, ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ফলতঃ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া যত কিছু আছে, সমস্তই জ্ঞানমাত্রেরই অনুস্যূত; কাজেই জ্ঞানময় হইলেও

বাহ্য জ্ঞানবশে জড়প্রায় বিভিন্ন বস্তুরূপেই প্রতীত। এই যিনি অন্তরে বাহিরে সতত সমানভাবে বিরাজিত, যিনি একমাত্র বিমল চৈতন্যমূর্ত্তি, যাহাতে অণুমাত্র ভেদ কল্পনা নাই, তথাবিধ আত্মীয় ভেদজ্ঞান যে কি অনর্থনিদান, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এরূপ অবশ্য মনে করিও না যে, যাহাতে কোনওরূপ দৃশ্য পদার্থই প্রতীত হয় না, তাদৃশ শুদ্ধ জ্ঞানে এবং শূন্যে ভেদ কিছুই নাই। ভেদ আছে,. তবে তাহা বুধগণেরই পরিজ্ঞেয়; অপিচ বাক্যাতীত। মনে কর, একটা স্থান গভীর অন্ধকারময়; সেই অন্ধকারের মধ্যে চক্ষুর প্রযত্নক্রমে যেরূপ অনির্দ্দেশ্য সদসৎ-রূপাভাস পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সেই সুবিমল ব্রহ্মেও এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইতেছে। শুন রাম! আমি যেমন বাসনারে বর্জ্জন করিয়া 'আমিই এই সেই চিদাকাশময়' এরূপ জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি, তেমনি তুমিও যদি বাসনারে বিসর্জ্জন দিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, তুমিও চিদাকাশরূপে বিরাজ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। বাসনা-বিরহিত হইয়া অন্তরে এইরূপ যিনি স্থির করিয়া লইতে পারেন যে, আমিই সেই চিদাকাশ; তিনি হউন না ব্যবহারতঃ অজ্ঞপ্রায় বা অবিদ্যান, তথাচ চিন্ময় ও অবিদ্যমানপ্রায় হইয়াই সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অজ্ঞানপবন দ্বারা জীব-নিবহের অবিদ্যাবহ্নি প্রজ্বলিত হইলেও যখন জ্ঞান হয় যে, আমিই ব্রহ্ম, তখনই উহা প্রশমিত হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে অজড় হইলেও বাহ্য বিষয়ে সংসারমুক্ত ব্যক্তিবর্গের যে জড়প্রায় অনববোধ, তাহাই অক্ষয় অবিকার পরম পদ; ইহাই বিবুধগণের অভিমত। মানব আপনার জ্ঞান দ্বারাই আপন জ্ঞানিত্ব অনুভব করিতে করিতে মুনি হইয়া থাকে। আর স্বীয় অজ্ঞতার জন্যই সবিশেষ অজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদি ভাব লাভ করে। এই আমি, এই ব্রহ্ম, এই জগৎ ইত্যাদি প্রকাশ্য জ্ঞান অবিদ্যাজন্য অলীক ভ্রম বৈ আর কিছুই নহে। দীপালোক বিচ্ছুরিত হইলে আর যেমন অন্ধকার দেখা যায় না, তেমনি জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইলেও এই জগৎ আর পরিলক্ষিত হয় না। যিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প পরিহারপূর্ব্বক শান্তমতি জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়

সুসম্পন্ন রহিলেও তিনি অন্তরে বাহিরে কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। সুষুপ্তি অবস্থায় সমাধিকালে যখন আত্মজ্ঞানোদয় হয়, তখন স্বপ্ন দৃশ্যবৎ সমস্ত বাহ্য দৃশ্যেরই বিলয় ঘটে। সমাধি ভঙ্গ হইলে পুনর্ব্বার যাহা প্রত্যক্ষ হয়, সে সকলই আত্মরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। গগন-গাত্রে নীলিমাদি যেমন ভ্রান্তিমাত্র, তেমনি ব্রহ্মেও ক্ষিতি প্রভৃতি বোধ ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েরই তুল্যত্ব বলা যায়। যিনি বুঝিয়াছেন যে, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই অসত্য, তিনি সর্ব্ব বাসনায় অন্বিত হইলেও জানিবে,—তাঁহার বাসনা নাই, তিনি একেবারেই বাসনাহীন।

হে বিজ্ঞ! জানিবে,—স্বপ্নে, মায়াবিস্তারে এবং ইন্দ্রজালাদি ব্যাপারে যেমন অলীক অদ্ভুত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি মাত্র সঙ্কল্প-কল্পনাতেই এই অপূর্ব্ব সংসারজাল প্রকট হইতেছে। অতএব উহা প্রত্যক্ষগোচর হইলেও উহাতে আর আস্থার বিষয় কি আছে? প্রকৃত কথা এই যে, কি সুখ-দুঃখ, কি পাপপুণ্য কিছুই কোথাও নাই; সমস্তই অলীক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই ঐ সমুদায়ের কর্ত্তা বা ভোক্তা কেহই নাই এবং কাহারও যে কিছু নষ্ট হয়, এরূপও নহে। সমস্তই শূন্যময় এবং সমস্তই নিরাধার। মমতা বা প্রত্যয় প্রভৃতি করিয়া যে কিছু উক্ত হয়, তৎসমস্তই নেত্রদোষজনিত দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অথবা স্বপ্ন-সংদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় একান্তই অসত্য। অহঙ্কার হইতে মমত্বাদির উৎপত্তি; কিন্তু ঐ অহঙ্কারও কিছুই নহে। মানব সর্ব্ববিধ দ্বৈতজ্ঞান হইতে বর্জ্জিত হউক, তত্ত্বজ্ঞগণের ন্যায় ব্যবহার-দশাতেই থাকুক, অথবা কাষ্ঠ কিম্বা পাষাণাদির ন্যায় অচল, অটল ও মৌনভাবে সমাধিনিষ্ঠ হইয়াই বিরাজ করুক, সে সর্ব্বপ্রকারেই ব্রহ্মত্ব উপগত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও অবিকার, তিনি নানাকারে প্রকট হইলেও তদীয় নৈশ্চল্য, সর্ব্বচিত্ত-ময়ত্ব, নানারূপত্ব ও সাবয়বত্ব কি প্রকারে যে সুসিদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ণিত যুক্তি ব্যতীত যুক্ত্যন্তর অবিদ্যমান। তবে কি বলা যাইবে যে, ব্রহ্মের স্বভাবই ঐরূপ বিচিত্র; না—তাহাও নহে। কেন না, তিনি নির্ম্মল ও সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত, সুতরাং পদার্থান্তরের

সহযোগিতায় কিরূপে তাঁহার তাদৃশ স্বভাবের সম্ভাবনা হইবে? অপিচ ব্রহ্ম যখন সর্ব্বময়, তখন তদীয় স্বীয় স্বভাবসত্তার ঐরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে সর্ব্ব পদার্থই ঐরূপ বিচিত্র-স্বভাব হইত। নাস্তিকদিগের কুতর্কপূর্ণ বাক্যচ্ছটায় জ্ঞানময় আত্মায় জ্ঞানের অসদ্ভাব বলা অযুক্তি-সঙ্গত। কেন না, সেরূপ বলিলে দৃষ্টির গ্রাহ্য বা গ্রাহক কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই তাহাতে যে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব, একথা বলাই বাহুল্য। তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন! পরম পদ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সমভাবাপন্ন; তিনি নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা নিয়ত তাঁহারই সেবায় নিরত; তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইবার শক্তি কাহারও নাই। তাঁহার কখন ক্ষয়োদয় নাই। সেই যে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি তদভিন্নরূপেই বিরাজ করিতে থাক এবং স্বচ্ছন্দ বিহার ও পান-ভোজনাদি সুখ-সম্ভোগ-পরায়ণ হও। দেখিবে,—তোমার ভববন্ধন আর কিছুতেই থাকিবে না। তাহার কারণ এই যে, তোমার সত্তা তো ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতই পৃথক্ নহে।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যাহা অহম্ভাবনা, তাহাই পরম অবিদ্যা; তাহাই মুক্তির পরিপন্থী; সুতরাং যে সকল অজ্ঞানান্ধ লোক অহংজ্ঞান লইয়া মুক্তির সন্ধান করিতে থাকেন, তাঁহাদের কার্য্য উন্মত্ত-চেষ্টিত বলিয়াই অবধারিত। অজ্ঞানতা হইতে উপপন্ন অহংজ্ঞানই অজ্ঞতা। যাহার চিত্ত প্রশান্ত এবং যিনি তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, 'আমি' বা 'আমার' এরূপ জ্ঞান, তাঁহার নাই। যিনি জ্ঞানী জীবন্মুক্ত, তিনি অহম্ভাবরূপ মল প্রক্ষালিত করিয়া নির্ব্বাণ পদে আরোহণ করেন। সেই

অবস্থায় সদেহ বা বিদেহ যেরূপ হইয়াই হউক, সতত তিনি সমস্ত ক্লেশ-জাল হইতে পরিমুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। শরৎকালের আকাশ অপেক্ষা জ্ঞানীর হৃদয় স্বচ্ছ; তাঁহার স্তিমিত নিশ্চল ভাবের সহিত সমুদ্রও তুলিত নহে এবং তাঁহার যেমন কান্তিময় শীতল ভাব, বুঝি বা সুধাংশুমণ্ডলের অভ্যন্তরেও সেরূপ নাই। চিত্র-ন্যস্ত যোদ্ধৃমণ্ডলীর মানসিক ক্ষুব্ধ ভাব চিত্রে ফুটিয়া বাহির হইলেও সত্য সত্যই তাহারা যেমন ক্ষুব্ধ নহে, তেমনি জ্ঞানী জন কর্ত্তব্য কার্য্যে লিপ্ত রহিলেও তাঁহাদের নিশ্চলতা নিশ্চিতই। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তির পথে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের যে কিছু বাসনার ভাব লক্ষিত হয়, উহা বাসনার মধ্যেই গণ্য করা যায় না;—যেমন দগ্ধ পটের তন্তুসন্তান; উহা একটা দৃশ্য মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। মহাসাগর কত অনন্ত তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হয়; ঐ তরঙ্গস্তোম সাগর হইতে ভিন্না-কারে লক্ষিত হইলেও কি সাগর, কি সাগরতরঙ্গ, উভয়ই যেমন জলানতি-রিক্ত বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই জাগতিক নিখিল বস্তু বিভিন্নাকারে প্রত্যক্ষ হইলেও তৎসমস্তকে একমাত্র ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই বলা যায় না। যাঁহার চিত্ত শান্তির পথে উপনীত হইয়া বাহ্যতঃ সংসার-কল্লোলে ক্ষুব্ধবৎ প্রতীত, অথচ সাগরবৎ অন্তরে অন্তরে বাস্তবিকই অক্ষুব্ধ—সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন, মনীষিগণের মতে তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ। সাগর সলিলময়; তাহাতে একমাত্র সলিলই যেমন নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি পরব্রহ্ম জ্ঞানময়; তাঁহাতে একাদ্বয় জ্ঞানই অহম্ভাবরূপে ও দৃশ্যমান বিবিধাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে নানাপ্রকারতা নাই। যেমন গগন-তলব্যাপ্ত ধূমজালের গজ-রথাদি আকৃতি পরিস্ফুট হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা যেমন ধূমাতিরিক্ত আর কিছুই নহে, তেমনি এই নিখিল দৃশ্য পদার্থ ব্রহ্মে বিভিন্নভাবে লক্ষিত হইলেও তিনি একই মাত্র।

হে সভাগত বিজ্ঞ সভ্যবৃন্দ! আপনারা এতকাল যাবৎ আমার নিকট তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলেন। ইহাতে নিশ্চয়ই আপনাদের জ্ঞান জন্মিয়াছে; সুতরাং সংসার-ক্লেশভয়ে উদ্বিগ্ন হইবার এখন আর কোনই বিষয় নাই। আপনারা এক্ষণে এইমাত্র বিচার করিয়া দেখুন যে, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভ্রান্তি-বিলসিত। বিচারে এইরূপ জানিয়া

আপনারা সেই ভ্রান্তি-বর্জ্জিত হইয়া জয়যুক্ত হউন। অঙ্কুর যেমন বৃক্ষ, পত্র ও ফলাকারে আপন অন্তরে স্ফুরিত হয়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবও তেমনি অহম্ভাবের অভ্যন্তরেই বিচিত্র জগদাকারে বিকাশ পাইতেছে। জ্বলৎ-কাষ্ঠাদি ঘূর্ণন করাইলে ভ্রান্তিবশে তাহার শিখানলে যেমন দণ্ড-চক্রাদি প্রতীয়মান হয়, তেমনি বাহ্যতঃ দৃশ্য বস্তুর সত্তা ও অন্তরে মনঃসত্তা সত্য-রূপে প্রতীত হইলেও কামুকজন-কল্পিত কামিনীর ন্যায় প্রকৃতই সে সকল অলীক বস্তু।

তাই বলিতেছি, হে শ্রোতৃগণ! যেরূপে এ জগতের ক্ষয়োদয়, যেরূপে ইহা সচেষ্ট, যেরূপে ইহাতে সুখ-দুঃখানুভূতি এবং যেরূপে ইহার দেশ-কাল-বিভাগ, সেই সেই বিষয় মদুক্ত বহু যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ,—দেখিয়া উহার সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম করত নিশ্চিন্তমনে শান্ত হইয়া অবস্থান কর। যে জ্ঞানী ব্যক্তি শবপ্রায় শান্তচিত্ত, তিনি ইষ্ট কিম্বা অনিষ্টবিষয়ক যথাযথ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও অন্তরে তাঁহার ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই অনুভূত হয় না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সদেহ বা বিদেহ যাহাই হউন, যেরূপেই থাকুন, তাঁহাদের বাসনা-বর্জ্জিত যে অহম্ভাব জগদ্দর্শক এবং তাঁহাদের যে জীবচৈতন্য, তদুভয়ই এক-মাত্র জ্ঞানময় ভিন্ন আর কিছুই নয়; উহাতে জড়ত্বলেশ নাই। জানিবে, —উহাই প্রকৃত পরম পদ। জড়ভাবই সংসার-নিগড়াবদ্ধ মানবগণের অপার ক্লেশভারবহনের কারণ। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—সাগরে জলভাবই শৃঙ্খলিত অর্ণবপোতের ক্লেশবহুল ভার-বহনের হেতু। স্বর্গ-ভোগাদি মানবের মরণান্তেই প্রাপ্তব্য; কিন্তু সে সকল ভোগ যেমন জীবিতাবস্থায় কাহাকেও আসিয়া আশ্রয় করে না, তেমনি মুক্তিও অজ্ঞতারূপ অপরাধের জন্যই যেন অজ্ঞ জনকে আশ্রয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। যে কিছু স্বর্গাদি ফল, সকলই সঙ্কল্পসিদ্ধ; আবার সঙ্কল্পের বশেই তৎ-সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব যাহাতে সঙ্কল্পের অভাব, তাহাই হইল সত্য অক্ষয় মোক্ষপদ।

রামচন্দ্র! আমি ব্রহ্মাই; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহি। তুমি অন্তরে এইরূপ ধারণা করিয়াই নির্ভয় হও। যে মূর্খ, তাহার অজ্ঞতার ফলে

অমৃতও বিষের ন্যায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞ জনের নিকট তাহা আদৃতই হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বলিতেছি যে, আমার বচন-রচনা অজ্ঞের নিকট হেয় হইতে পারে, কিন্তু যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট ইহা অবশ্যই উপাদেয় সুসঙ্গত সত্য বস্তু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। এই দেহাদি চিত্ত পর্য্যন্ত সমগ্র শরীরই জড়; ইহাই যখন বিচারসিদ্ধ হয়, আর অহংজ্ঞান যখন চলিয়া যায়, তখন এইরূপ সত্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে যে, আমি ব্রহ্ম; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহি। যখন বিচারালোচনা করিতে করিতে নিখিল ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়, তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের ভেদ-জ্ঞানের প্রশমন হয়, তাঁহারাই মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই যে মুক্ত ভাব, তাহাতে মাত্র অহংজ্ঞানেরই বিনাশ হয়। তদ্ভিন্ন অপর কিছুরই বাস্তব বিনাশ ঘটে না। বিষয়-ভোগ-লালসা-পরিবর্জ্জন, তত্ত্ববস্তুর বিচার, আর মনের নিগ্রহ, এই তিনটী ব্যাপারই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। এই সকল ব্যতীত উপযুক্ত উপায় আর কিছুই নাই।

তাই বলিতেছি,—হে অজ্ঞ মুমুক্ষুগণ! তোমরা তত্ত্ববিচার করিতে করিতে ভ্রমজাল ছেদন কর এবং স্বীয় ব্রহ্মময় আত্মারই আশ্রয় লও। বুধগণ বলিয়াছেন,—সর্ব্ব-বাসনা-বর্জ্জিত মানসিক ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। ঐ মোক্ষপ্রাপ্তি তত্ত্বজ্ঞান না হইলে অন্য কিছুতেই হইবার নহে। জ্ঞানময় আত্মায় যখন সকৃৎ জগদ্‌ভ্রম সমুদিত হয়, তখন এ প্রকার বিশ্বাস কিছুতেই জন্মে না যে, এই জগৎ অকিঞ্চিৎ, সমস্তই ব্রহ্মময়; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই জন্যই অনন্তকালের তরে ভববন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়। এই জগৎ কি? কিছুই নহে, আমিও কিছুই নহি, এই প্রকার অবধারণ করিয়া জীব যে কালে এই স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধন, সম্পদ ও কলেবরের প্রতি আস্থা পরিহারপূর্ব্বক চৈতন্যময় হইয়া উঠে, তখনই সে মুক্ত পুরুষ হয়; নচেৎ মুক্তির সম্ভাবনা কিছুতেই নাই।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অলীক বস্তু বা অবস্তু অন্তরে যাহাই অনুভব করা যায়, চিদাভাসে তাহারই অনুভব হয়। অপিচ প্রথম হইতে অভ্যাস থাকে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অনুভবজন্য তাহাই বাহ্য পদার্থাকারে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে নিদর্শনস্বরূপ স্বানুভূত স্বপ্নবৃত্তান্তের উল্লেখ করা যায়। ফল কথা, এই যত কিছু বস্তু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এতৎসমস্তই চিৎস্বরূপ। গগন অপেক্ষাও এই চিতের স্বচ্ছতা যখন দেখা যায়, এই একাদ্বয় চিৎই যখন জগদ্বেশ ধারণ করেন, তখন কোথাও অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই; সমস্তই যে চিন্ময়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। বাস্তব পক্ষে বুঝিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, না জন্ম, না মৃত্যু, না নাশ, না শূন্যতা বা না নানাত্বাদি কিছুই কোন পদার্থেরই নাই। সর্ব্বপদার্থই সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতীত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে জগৎ ও অহম্ভাবাদির বিনাশ হয়, তখনও বাস্তব পক্ষে কিছুরই অপায় ঘটে না। স্বপ্নাদি অলীক বস্তু, তাহার ধ্বংস হইলে যেমন কোন পদার্থেরই বাস্তব ধ্বংস হয় না, তেমনি অসত্য অহম্ভাবাদির বিলোপ ঘটিলেই বা অন্য কাহার বিলোপ ঘটিবে? সঙ্কল্প-কল্পিত নগরাদি মিথ্যা বলিয়াই প্রতীয়মান, তাহার আবার নশ্বরতা কি? তাহা নষ্ট হওয়া যেমন অসম্ভব কথা, তেমনি মিথ্যা অহম্ভাবাদিরও বস্তুতঃ নাশাভাব। অহম্ভাবাদি বস্তুর যখন মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন, তখন বুঝিয়া রাখিবে,—উহার নাশ হওয়াটাই অসম্ভব কথা। এখন এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, অলীক আকাশ-কুসুমের অপবাদ বিনির্ণয়ের ন্যায় জগতের অসত্যতা নিবন্ধন তাহার কোন প্রকার অপবাদও নির্ণয় সম্ভবিতে পারে কিরূপে? ফলে অলীক পদার্থের নির্ণয় করা, সে আবার কিরূপ কথা? এরূপ প্রশ্নের সমাধানে বলা যায়, শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যদি নানাবিধ ভাবনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া না যায়, তবেই পাষাণের ন্যায় যে একটা অচলপ্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়ে, আর আপন ব্রহ্মত্বসিদ্ধির নিমিত্তই

এ জগৎ অসৎ হইলেও ইহাকে সৎ বলিয়া কল্পনান্তে ইহার অপবাদ দ্বারা যে বৈরাগ্যাদি উৎপাদনের উপায় কল্পনা করা হয়, জানিবে,—তাহারই নাম নির্ণয়। কেন না, তোমার সাংসারিক পুরুষার্থময় সঙ্কল্পাত্মক জগৎ ক্ষণমধ্যেই নিঃশেষরূপে উপশম প্রাপ্ত হওয়ায় সর্গাদি ভ্রমবিষয়ে নির্ণয় তো এইরূপই। প্রলয় প্রভৃতি কালে জগৎ যখন আপনা হইতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা কি আছে? এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়; কেন না, ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে যে সৃষ্টি-বিলোপ সংঘটিত হয়, তাহা চিরদিনের তরেই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রলয়াদি কালে যে সৃষ্টিবিলোপ ঘটে, তাহা সেরূপ বিলোপ নহে।—প্রলয়ে জগতের বীজ থাকিয়া যায়; তাহা উন্মূলিত হয় না। জগতের যে কার্য্য, তাহাই কেবল সে কালে থাকে না। কেন না, সমস্ত কার্য্যই সঙ্কল্পমূলক; কাজেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উহার মূলোচ্ছেদ না হয়, তবে পুনরায় চিরকালের তরে সৃষ্টিনাশ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার তাহার আবির্ভাব ঘটিবেই ঘটিবে। এইজন্যই জানিতে হইবে,—প্রলয়-কালাদিতেও কার্য্যসকলের সত্তা বিদ্যমান। ফলতঃ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষবৎ যে সকল অসত্য পুরুষ এই জগৎসৃষ্টি দেখেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের দৃষ্ট সৃষ্টিসমষ্টি মরুমরীচিকা সলিলের তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় বাস্তব পক্ষে কেবল ভ্রান্তিময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফলে, যেমন বন্ধ্যানন্দন, তেমনি উহা একেবারেই মিথ্যা মাত্র। এই জগদ্‌বস্তু-পরম্পরা যাহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাদের সেই সত্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে আমরা সম্পূর্ণই অপারগ। যাঁহাদের দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি জ্ঞান নাই, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞগণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দপূর্ণতা সর্ব্বদাই বিরাজমান। সে পূর্ণতা—পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায়। তত্ত্বজ্ঞগণ কোন কার্য্য করুন আর নাই করুন, বিশাল ভূধরের ন্যায় এবং নির্ব্বাত প্রদেশস্থ নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তাঁহারা নিস্পন্দ ও সমভাবে বিরাজিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বস্থচিত্তে অবস্থিত। পরিপূর্ণ অম্বুনিধির ন্যায় অভাবনীয় আনন্দপূর্ণতা ও অচিন্তনীয় শীতলতা তাঁহাদের অন্তরে পরিস্ফুট বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। অজ্ঞ পুরুষেরাই এ সংসারে বাসনাবদ্ধ; পরন্তু ঐ বাসনারে কেহই দেখে না।

ঐ বাসনা হইতেই এ সংসারের উৎপত্তি। আলোক না থাকিলে যাহা দেখা যায়, আলোক উদ্ভাসিত হইলে তাহা আর থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্থলে বিবিধ বিস্ময়জনক যক্ষাদির কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব বুঝিয়া দেখ, অজ্ঞানের বশে যে জগৎ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানোদয় হইলেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। দেহে মাংসপ্রভৃতি করিয়া যত কিছু বস্তু; সকলই ক্ষিতিপ্রভৃতি মহাভূতপঞ্চকের সমষ্টি এবং অসত্য ভ্রান্তি-বিলসিত পদার্থ মাত্র। বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এ সকল ঐ মহাভূত-পঞ্চকের বিকার বৈ আর কিছুই নয়। অতএব জানিবে,—বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের ভূতাদিময়তা-জ্ঞান বর্জ্জন করিয়া মাত্র চিন্ময়স্বরূপে যে অচল অবস্থিতি, তাহারই নাম মুক্ততা। আত্মচিৎ যখন লিঙ্গোপাধি সহ সম্মিলিত হন, তখনই চেত্যোন্মুখতা বশতঃ বাসনার অভ্যুদয় হয়; অন্যথা যখন মুক্ততার অভ্যুদয় ঘটে, তখন আর কিমাকৃতি বাসনার কোথা হইতে সমুদিত হইবার সম্ভাবনা? এই অসত্য সংসারভ্রম যাহার সমুদিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিলেই তাহাঁর দৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণাজলবৎ সেই অলীক সংসার আর পতিত হয় না। সে কালে সংসার কি আকার? কাহার? কোথা হইতে তাহার আবির্ভাব? এ সকল জ্ঞান কিছুই আর তাহার থাকে না। পূর্ব্বে যে জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, ঐরূপ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইলেও চিত্তের যে বিষয়স্মৃতি, তাহাই পুনর্ব্বার সংসারাকারে বিকাশ পায়। সুতরাং সাংসারিক সর্ব্ব বিষয় পরিহারপূর্ব্বক আকাশ হেন নির্লেপভাবে বিরাজ করিতে থাক। যদি সংসারক্লেশ শান্তি করিতে চাও, তবে জানিবে,—বিষয়সমূহের বিস্মৃতিই পরম মঙ্গলকর; এইজন্যই বলা যায়, যাহাতে সর্ব্ববিষয়ের বিস্মৃতি ঘটে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করা সমুচিত। বাস্তব পক্ষে বুঝিয়া দেখিবে, এ জগতে দ্রষ্টা বা ভোক্তা কেহই নাই। অধিক কি এই যে সংসার, ইহারও অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নাই। সেই যে একাদ্বয় শান্তিময় পরম পদ, তাঁহাতেই সমস্ত অবস্থিত। জলনিধির ন্যায় নিরন্তর কেবল তাঁহারই স্পন্দন হইতেছে। যখন এই প্রকার জ্ঞানোদয় হয় যে, এই সমগ্র দৃশ্য বিশ্বই অদ্বিতীয় সৎব্রহ্ম, চিদাভাস ও উপাধি এই উভয়ের বিলয় তখনই ঘটিয়া থাকে। জলরাশি শুষ্ক হওয়ায় সাগরাভ্যন্তর যেমন প্রকট

হয়, তেমনি তখনই সেই শিবময় ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশমান হইতে থাকেন। যদীয় চিত্ত পরমতত্ত্বে বিশ্রান্ত হইয়াছে, যিনি সমদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি সমাধিনিষ্ঠই থাকুন, আর অন্য কোন প্রকার কাজই করুন, সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই তাঁহার রাগদ্বেষাদির অভাব পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে সেই মুক্তপুরুষ একমাত্র শান্তভাবেই অবস্থান করেন, তাঁহার তখন কেবল শান্তভাবই অবশিষ্ট থাকে; তাই তাঁহার রাগদ্বেষাদি কিছুতেই লক্ষিত হয় না। ফলতঃ যে মুনি বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সাধারণ লোকের ন্যায় কিরূপে তিনি রাগাদির বশতাপন্ন হইয়া ব্যবহারনিষ্ঠ হইবেন? যে পর্য্যন্ত না সপ্তভূমিকায় তাঁহার ব্রহ্মৈকনিষ্ঠা সমধিষ্ঠিত হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই তিনি রাগদ্বেষাদি-বিরহিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। যিনি সপ্তভূমিকায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তথাবিধ শান্তমনা মুনি রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি পরিহারপূর্ব্বক বাস্তব পক্ষে অপ্রস্তর হইয়াও প্রস্তরবৎ নিয়ত অবস্থান করেন। পদ্মবীজের মধ্যে যেমন পূর্ণাবয়ব পদ্মলতা বিদ্যমান, জানিবে—এই অপূর্ব্ব স্বপ্নপ্রায় জগদ্ভ্রম তেমনি আত্মাতেই বিরাজমান। এই জগদ্ভ্রম কোনওরূপ বাহ্য বস্তুমধ্যেই গণ্য নহে। সেই পরম বস্তুর যে বাহ্যরূপে ভাবনা, তাহাতেই বাহ্য বস্তু প্রতীয়মান, আর আত্মরূপে ভাবনা হইতেই তিনি আত্মাকারে প্রকাশমান। জানিবে—সেই পরম পদের ভাবনা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। অন্তরের স্বপ্নাদি ভ্রমও তাঁহারই বাহ্য ভাব বৈ আর কিছুই নয়। উভয় পাত্রে অবস্থিত দুগ্ধের যেমন পার্থক্য নাই, তেমনি সেই পরম বস্তুরও একটুকু মাত্র ভেদভিন্নতা নাই। জল ও জলোর্ম্মিমালার আধারাধেয়ভাব যেমন ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়, তেমনি জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ-পরম্পরার যে স্থিরত্ব এবং স্বপ্ন-সংদৃষ্ট বস্তু-নিচয়ের যে অস্থিরত্ব, এ উভয়ও ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। ভিন্নতাজ্ঞান হইতেই স্বপ্নাদি কালে আত্মার ভিন্নতা বোধ হয়। পরন্তু ভিন্নতাবোধের বিলোপঘটনায় তাঁহার আর ভেদ-ভিন্নতা কিছুই থাকে না। আত্মার যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পাদি-বর্জ্জিত শান্তরূপ, তাহাই ব্রহ্মভাবনায় ব্রহ্মাকারে পরিস্ফুরিত হয়। আর, যখন ব্রহ্মভাবনা থাকে না, তখনই ব্রহ্মময়ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। যে কালে স্বপ্নাদি বোধের প্রশমন ঘটে,

তখন আত্মার বিশুদ্ধরূপ বিকাশ পায়; সে রূপের সত্তা ও অসত্তা-কিছুই নাই; উহা বাক্যাতীত। আত্যন্তিক ভ্রমের অপগমে যিনি ব্রহ্মতন্ময়তা লাভ করেন, তথাবিধ মুক্ত ব্যক্তিই স্বস্বরূপ অধিগত হইয়া থাকেন। অন্যথা যিনি যত বড় বিদ্বান্‌ই হউন, তাঁহার উহা উপদেশ্য হইবার নহে।

এই জন্যই বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! যাঁহাতে ভয় নাই, মান নাই, বিষাদ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, দেহ নাই, মনন নাই, ইন্দ্রিয় নাই, চিত্ত নাই, বা জড়তাদি নাই; অহম্ভাব পরিহারপূর্ব্বক সেই শান্ত, অজ, অক্ষয় অখিল ভেদ-বর্জ্জিত, অদ্বিতীয় নির্ব্বাণ ব্রহ্মময় হইয়া সকলেরই সমাধি-অবস্থায় অবস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যেমন স্পন্দ হইতে বায়ুর প্রসার হয়, তেমনি চিৎপ্রসার বা চিদ্‌ব্যাপ্তি কালেই অসৎ অহম্ভাব ও জগদ্‌বিস্তার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু হউক না জগদ্‌-ভ্রমের অভ্যুদয়, তথাচ যখন ব্রহ্মরূপতা জ্ঞান হয়, তখন আর ক্লেশের কারণ কিছুই থাকে না। জগদ্‌ভাবনাই বিষম অনর্থের মূল। যেমন চক্ষুর বিস্তারে রূপানুভূতি হয়, কূটস্থ চৈতন্যের প্রসার বা পরিব্যাপ্তি হইতেও জগদ্‌ভ্রমের উদয় তেমনি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ চিতের প্রসার ব্যর্থ; কেন না, চেত্য বস্তু যখন বাস্তব পক্ষে নাই, তখন চেত্যে চিতের প্রসার একান্তই ভ্রান্তি নিদান। বন্ধ্যানন্দনের নর্ত্তন যেমন অসঙ্গত, তেমনি অসৎপ্রসারও নিতান্তই অসৎ বৈ আর কি? বালকের যেমন যক্ষাকৃতি জ্ঞান, তেমনি ঐ চিৎপ্রসরণ অবিদ্যার বশে বৃথাই জগৎ জ্ঞান করে। কিন্তু যখন প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানোদয় হয়, তখন আর তাদৃশ জ্ঞান থাকে না। 'অহং' মিত্যাকারে যে চিৎপ্রসার, তাহা হইতেই অহম্ভাবের আবির্ভাব। এই অহংজ্ঞান হইতেই দারুণ ভববন্ধনক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু

যখন অহম্ভাব অপসারিত হইয়া যায়, তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বলা যায়, কি ভববন্ধন, কি মুক্তিলাভ, এ উভয় নিজেরই আয়ত্ত। কাষ্ঠ-পাষাণাদি নিশ্চল জড় বস্তুর ন্যায় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির যে অবস্থিতি; উহারই নাম ব্রহ্মভাবনা; ঐ ব্রহ্মভাবনাই ব্রহ্মসমাধি বা মুক্তিপ্রাপ্তি; উহাতেই চিরশান্তি এবং উহাতেই সংসারক্লেশের চির-নিবৃত্তি।

হে সভ্য বুধবৃন্দ! যে বাক্যসন্দর্ভ দ্বৈতাদি বিবিধ বিকল্প-কল্পনায় জটিলতাময়, তাহার দ্বারা সংশয়িত হইয়া অজ্ঞ জনের ন্যায় বৃথা তোমরা অশেষ ক্লেশ ও তালুশোষাদি বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া রহিও না। দেখ, জীব দৃঢ় বাসনায় অন্বিত হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পময় স্বপ্নপ্রায় অসত্য রূপাদি দর্শনের ন্যায় প্রতিনিয়ত অসত্য দুঃখপরম্পরাও অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার বাসনার লেশ মাত্র নাই, তিনি সর্ব্বদা নিদ্রানিমগ্নবৎ অবস্থিত হইয়া সঙ্কল্প-কল্পিত রূপাদি দর্শনের ন্যায় প্রকৃত দুঃখেরও অধীনতায় আবদ্ধ হন না। এতাবতা বুঝিতে হইবে, বাসনার অবসান হইলেই মুক্তি-প্রাপ্তি। দেশ, কাল ও ক্রিয়া-কলাপের যোগাযোগেই ক্রমশঃ বাসনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়; অবশেষে নিজ হইতেই তাহার বিলয় ঘটিয়া থাকে। গগন-পটে মেঘমালার উদয় হয়, পরে তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে ভবিষ্যতে যেমন পরমাণুপ্রায় হইয়া সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি প্রবলতর বাসনাও ক্রমশঃ অতি ক্ষীণ হইতে হইতে পরিণামে একেবারেই সত্তাশূন্য হইয়া পড়ে। যদি জ্ঞানী জনের সংসর্গ মিলে, আর ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে মূঢ়তাও যেমন ক্রমশঃ পাণ্ডিত্যে গিয়া পরিণত হয়, তেমনি 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন বাসনা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে মুক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, এই যুক্তি অনুসারে জীবিত বা স্বর্গত ব্যক্তির হৃদয়ে 'আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আমি অন্য কিছুই নহি' এই প্রকার যে শান্তিময় নিশ্চয়, এই নিশ্চয়ই মুক্তিযোগ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান। মরুতে যেমন দ্রব্য এবং ক্রিয়া, এই উভয়রূপতার প্রতীতি, তেমনি এক-মাত্র ব্রহ্মপদার্থেই জীব ও জগৎ এই রূপদ্বয়ের পরিব্যক্তি। কে আমি? এ সকলই বা কি প্রকার? এইরূপ বিচারালোচনার ফলেই উক্ত জীব

ও জগদ্‌ভ্রম নিরস্ত হইয়া যায়। নিজের অকিঞ্চনত্ব জ্ঞানই নির্ব্বাণ; এ বিষয়ে মূঢ়তার উদয় কেন? যদি সাধুসঙ্গে বিচারপরায়ণ হওয়া যায়, তাহা হইলেই ত্বরায় এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। আলোকচ্ছটায় তিমিরের এবং দিবসোদয়ে যামিনীর যেমন অবসান হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ-জনের সংসর্গ ঘটিলেও অহম্ভাববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞ জনের সহ-যোগে আজীবন এইরূপ বিচারালোচনা করা উচিত যে, আমি কে? এই যে দৃশ্যসমূহ, ইহারাই বা কে? কিরূপে কোথা হইতে ইহারা আসিল? জীব কে? আর জীবনই বা কি? তত্ত্বজ্ঞরূপ প্রভাকরের প্রভায় যৎ-কালে এই অখিল বিশ্ব উজ্জীবিতবৎ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, 'অহং'জ্ঞানরূপ তিমিরস্তোম অপসৃত হইয়া যায় ও ক্ষণেকের তরে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া উঠে, তখন আর অন্যের উপাসনা ছাড়িয়া অগ্রে সেই তত্ত্বজ্ঞরূপ প্রভাকরেরই আরাধনা করিতে থাক। কে যথার্থ জ্ঞানী, তাহা যদি নির্ণয় করিতে অক্ষম হও, তবে যাহাকে যাহাকে তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ বলিয়া বুঝিবে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিবে। কেন না, যদি এককালে সকলকেই আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তাঁহাদের কথাপ্রসঙ্গে একটা তর্করূপ যক্ষোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। যখন তর্ক-যক্ষের প্রকাশ হয়, তখন বালকবৎ জ্ঞানী জনেরও 'অহং'মিত্যাকার ভ্রমকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, যিনি বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজিজ্ঞাসু; তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক জ্ঞানী জনেরই নির্জ্জনে সেবা করিবেন। এককালে অধিকসংখ্যক জ্ঞানীর আরাধনা করিতে গেলে মন্দ ফলই ফলিয়া থাকে।

অনন্তর নিজের ধীশক্তিকে উত্তেজিত করিতে হয়। সে জন্য নিজ বুদ্ধি-অনুসারে জ্ঞানীদিগের বর্ণিত বিষয়গুলি আপন চিত্তপটে মিলাইয়া বিচার করিতে থাকিবে। সেইরূপ করিলেই সেই যিনি সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত নিত্য বস্তু পরব্রহ্ম, তাঁহাতেই তন্ময়তা লাভ করিতে পারিবে।

হে রাঘব! বিজ্ঞগণের সংসর্গ নিবন্ধন নিজের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিয়া লও, পরে তাহারই দ্বারা 'অজ্ঞানবল্লীকে ছিন্ন করিয়া ফেলো। মদুক্ত মুক্তির উপায়ই যুক্তিবলে সম্ভাব্য এবং ইহা আত্মানুভবেই সুসিদ্ধ। অতএব

আমার বক্তব্য এই যে, তুমি এরূপ কখনই মনে করিও না যে, মাদৃশ ব্যক্তি অসম্বদ্ধভাষী বালক মাত্র। ফল কথা, এ বিষয়ে আমাদিগকে তুমি বিচক্ষণ বলিয়াই মনে করিও। মেঘাদির উদয় হইলে মহাকাশের এবং তরঙ্গ-ততির আস্ফালনে মহাসমুদ্রের যেমন কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার নহে, তেমনি যিনি মননবিহীন হইয়াছেন, তথাবিধ জীবন্মুক্ত জনেরও কোন কিছুতেই ইষ্ট বা অনিষ্টপাত নাই। যিনি সর্ব্বগত নিশ্চল নিরাময় ব্রহ্ম, এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই অসত্যরূপে বিজৃম্ভিত। 'অহং' পদার্থ অকিঞ্চিৎ, ইহা বিচার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। অতএব কিরূপে কোথা হইতে সঙ্কল্পাদির সম্ভাবনা ?

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে পুরুষ নিজ বুদ্ধিকে পুরুষকার ও সাধুসঙ্গযোগে মার্জ্জিত করিয়া অভিজ্ঞতালাভে অকৃতকার্য্য হন, তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই বলিলেও হয়। দেখ, বিষ মরণের কারণ বটে; কিন্তু তাহাতে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে স্বীয় বিষত্ব পরিহারপূর্ব্বক অমৃতবৎ কার্য্যকর হইয়া থাকে। এইরূপে বলা যায়, অখিল দৃশ্যবস্তুই ভববন্ধনের কারণ হইলেও শাস্ত্রীয় প্রতিকার কল্পনার প্রভাবে তাহারা বন্ধনকারণত্ব পরিহার করিয়া মুক্তির উপযোগী হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না কল্পনার অবসান ঘটে, তাবৎ কাল ঐরূপ প্রতিকার কল্পনা বিধেয়। কল্পনার বিরতিই মুক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিষয়ভোগের পরিহারেই কল্পনার শান্তি হয়, তা ভিন্ন আর উপায়। কি বাক্য, কি মন, কিছুতেই যিনি শব্দার্থ চিন্তা করেন না, কল্পনাশান্তি তাঁহারই ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া থাকে। অহংজ্ঞান ব্যতীত অন্য অবিদ্যা নাই। ঐ অহংজ্ঞানের উপশম ঘটনায় যে পদার্থচিন্তার তিরোধান হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ বস্তুকে মোক্ষ বলা হয় না। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার

প্রাপ্ত হইয়াও যদি প্রাক্তন জন্মানুভূত জীব-জগতে একটুকু মাত্র অনুরক্ত হও, আর দেহাদি অহম্ভাব কিয়ৎপরিমাণেও অবলম্বন কর, তাহা হইলেও আবার তুমি এতই দুঃখে পতিত হইবে যে, সে দুঃখ অপার—অনন্ত। আর যদি ঐ অহম্ভাবকে চির বিসর্জ্জন দিতে পার, তবেই তোমার চিরশান্তি এবং চিরসিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

রাম! এই যে অখিল দৃশ্য বিশ্ব বাস্তব পক্ষে অসৎ হইয়াও সদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, জানিবে,—ইহার মূল সেই পরম তত্ত্বের অপরিজ্ঞান। বাহ্যজ্ঞান নাই বলিয়া যিনি প্রস্তরবৎ স্থিরভাবে বিরাজমান, যাঁহার অসৎ জ্ঞান সম্পূর্ণই দূরীভূত হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মাকে আমাদের নমস্কার। যিনি পাষাণবৎ বাহ্যজ্ঞান-হীন হইয়া নিয়ত পরব্রহ্মেই নিবিষ্ট,—সেই অবস্থায় কেবল সেই চিন্ময়ের ভাবনাতেই বিভোর, তাঁহার সেই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি বশতঃ বহির্দৃষ্টির অভাবে এই সমস্ত দৃশ্যই বিলীন হয়। এই দৃশ্য বস্তু-নিবহের সত্তা থাকে থাকুক, না থাকে, না থাকুক, যদি অন্তরে দেখা যায়, তবেই উহা দুঃখভোগের হেতু হইয়া উঠে। আর যদি অন্তরে না দেখা যায়, তবেই সুখবুদ্ধি হয়। যখন বাহ্য জ্ঞানের অভাব হইয়া যায়, তখন আর উহা দেখা যায় না। ইহকাল এবং পরকাল এই দুইটীই দেহিগণের বিষম রোগ। ঐ দুইটী রোগের জন্যই দেহীদিগের ঘোর দুঃখভোগ হয়। বিষয়ভোগরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেহিগণ আজীবন ইহ-কালরূপ রোগের চিকিৎসাতেই তৎপর; আর যে একটা পরকালরোগ আছে, তাহার চিকিৎসায় সম্পূর্ণই বিমুখ। সৎপ্রকৃতি পুরুষেরাই পর-লোকরূপ বিষম রোগের চিকিৎসায় যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এই কার্য্যে তাঁহারা শান্তি, সৎসঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতোপম ঔষধসমূহেরই সাহায্য গ্রহণ করেন। পরলোক-রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য যাঁহারা সাব-ধানতা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের যে শান্তি হয়, সেই শান্তি হইতেই মুক্তি-পথের শীতল ছায়ায় তাঁহারা বিশ্রাম করিতে পারেন। এই জীবনেই নরক-রোগের চিকিৎসা করিতে হয়; যিনি তাহা না করেন, তিনি রোগাক্রান্ত-দেহে পরলোকে যাইয়া কি করিবেন? সেখানে তো ঔষধ মিলিবে না। তাই বলিতেছি, হে মূর্খ মানবগণ! বৃথা ভোগরূপ ঐহিক রোগের

চিকিৎসায় অকারণ তোমরা আয়ুক্ষয় করিও না। আত্মজ্ঞানরূপ মহৌষধের সেবা কর; পরলোকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও। পবন-পরিচালিত ছিন্ন পত্রোপরি যে জলবিন্দু বিরাজিত, তাহার ন্যায় জীবন একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব যত্ন করিয়া অবিলম্বে পরলোকরূপ মহারোগের চিকিৎসা করিতে থাক। বিশেষ যত্নের সহিত সত্বর যদি পরলোক-রোগের চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই ইহলোক-রোগ প্রশমিত হইতে পারে। বিদ্বদ্‌গণের ধারণা এই যে, নিখিল প্রাণীই ব্রহ্মচৈতন্য মাত্র। এই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসরণই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই নিমিত্ত একটী মাত্র পরমাণুর অভ্যন্তরেও শত শত শৈলসঙ্কুল জগৎ অবস্থান করিতেছে। জানিবে,—ঐ যে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসার, উহাই রূপাদি বাহ্যিক বস্তু এবং উহাই মনঃপ্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পদার্থসমষ্টি। অতএব একমাত্র চিদাকাশেই অখিল পদার্থ অনুভূত; কাজেই জগদ্‌ভ্রম সম্পূর্ণই অসত্য। যদি সহস্র সহস্রবার প্রলয় হয়, তথাচ এই দৃশ্য বিশ্বভ্রম নিরস্ত হইবার নহে। উহা যেমন প্রলয়ে, তেমনি সৃষ্টিপ্রারম্ভে। প্রকৃত কথা এই যে, উহা যখন মিথ্যা ভ্রমময়, তখন প্রলয়েও উহার বিনাশ নাই এবং সৃষ্টিকালেও উহার উৎপত্তি নাই। আত্মা বিষয়ভোগরূপ পঙ্কপয়োধিমধ্যে নিমগ্ন হইলে, তাঁহাকে যদি পুরুষকার বলে পরিত্রাণ করা না যায়, তবে আর উপায় তো কিছুই নাই। ভোগ-পঙ্কমগ্ন মূঢ় মানব আপৎসমূহের আশ্রয় হইয়া থাকে। বাল্য যেমন জীবনের আদ্যাবস্থা, বিষয়ানুরাগের শান্তিজনক বিষয়ভোগ-পরিহারও নির্ব্বাণের তেমনি প্রথম ক্রম। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবননদী চঞ্চল হইলেও চিত্র-নিহিত নীরস নদীর ন্যায় নিশ্চলাকার এবং সমভাবেই প্রবহমাণ। কিন্তু যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের জীবন-নদী ভীষণ নিনাদ-সঙ্কুল, আবর্ত্ত-বহুল এবং তরঙ্গভঙ্গিমায় সমাকুল। অজ্ঞ জীবনিবহের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল নদীর উৎপত্তি। এই যাহা কিছু বাহ্য সূক্ষ্ম বস্তু অনুভব করিয়া থাক, সকলই ব্রহ্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি-লেশ বৈ আর কিছুই নহে। নেত্রদোষ হইতে যেমন চন্দ্রদ্বয়, বালকের দৃষ্টিতে যেমন বেতাল, এবং মরুস্থলীতে যেমন মরীচিকা ও নিদ্রায় যেমন স্বপ্ন-দর্শন, তেমনি উহারাও একান্তই ভ্রান্তিসঙ্কুল। তাই সহস্র সহস্র সৃষ্ট বস্তু

ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সলিলরাশির তরঙ্গস্তোমরূপে প্রতিভাত হইয়া সতত দৃষ্টি-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি যথাযথ বিচার করিয়া দেখা যায়, তবেই ও-সকল অসত্য হইয়া পড়ে। যদি ভ্রান্তিময় দৃষ্টি লইয়া দেখা যায়, তবে উহারা সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। চৈতন্যের প্রসারক্রমে ভ্রান্তির বশেই আকাশতলেও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির বিদ্যমানতা অনুভূতিগোচর হয়। পরন্তু বাস্তব পক্ষে উহারা অসত্য বৈ আর কিছুই নয়। এই যে প্রত্যক্ষ জগৎ, ইহার সম্বন্ধেও সেই কথা। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ যেন জল; এই সৃষ্টিবিভ্রম সেই জলেরই বুদ্বুদস্বরূপ। অহঙ্কারাদি বিকৃত ভাব উহার আকৃতি। চৈতন্যের যে নির্ব্বাণ, তাহাই জগতের প্রলয় এবং চৈতন্যের যে উন্মেষণ, তাহাই বটে জগৎ; ফলে অন্তরে বাহিরে কোথাও জগৎ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বস্তু-পরম্পরা না সত্য, না অসত্য, কোন কিছুই নয়। ফলে ইহারা কেবল ব্রহ্মই। ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল, ভাবাভাব-হীন, অব্যয়, অব্যক্ত, অনাদি, অদ্বিতীয় ও চিন্ময়স্বরূপ; জীব স্বয়ং এ হেন ব্রহ্মবস্তুকেই নানাকারে অবলোকন করেন, পবন-স্পন্দনের কারণ যেমন অনির্দ্দেশ্য, তেমনি স্বভাববিরহিত ব্রহ্মেরও নিজ হইতে যে সৃষ্টিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, যুক্তি দ্বারা তাহারও মূল কারণ বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। এই সৃষ্টিপরম্পরা যেন ব্রহ্মাম্বুধির লহরীলীলা; ইহারা স্বপ্নানুভূত পদার্থপরম্পরার ন্যায় কেবলই ভ্রান্তিময়। প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্মে স্বপ্নভ্রম বা সৃষ্টি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চই নিশ্চিন্ত, নিরাভাস, সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, চিন্ময় ব্রহ্ম। তাঁহার নাই দ্বিতীয়, নাই ক্ষয়; তিনি না সৎ, না অসৎ; সদসৎ উভয়রূপ-সম্পন্ন বলিয়াও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ফল কথা, তাঁহার স্বরূপ অনির্ণেয়। যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবেই বিরাজ করেন, বাহ্য বিষয়ের অনুভবরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রসার যাঁহার প্রশমিত হইয়া গিয়াছে, মনীষিগণ তাঁহাকে মুনিনামে নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাঁহার জীবন থাকিতেও মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় অবস্থা; 'অহং' জ্ঞানের সহিত নিখিল জগদ্ভ্রম যিনি দূরীভূত করিয়া-ছেন, তিনিই, সর্ব্বসাধারণের নিকট মুনিসত্তম আখ্যায় পরিচিত। সঙ্কল্পের অভাব ঘটিলেই সঙ্কল্প-নগরের যেমন তিরোধান হয়, তেমনি এই যে

ভ্রমজ্ঞান জন্য 'অহং' জ্ঞানময় দৃশ্য বিশ্ব, ইহাও বাহ্য জ্ঞানের তিরোধানেই ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া যায়। নামরূপাদি-রূপ সমস্ত শব্দার্থেরই একটা না একটা হেতু আছে, একমাত্র স্বভাবরূপিণী মূলাবিদ্যার তাহা নাই। পরন্তু স্বভাবের হেতু যে কি, তাহা যদি একবার পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, জাগতিক কোন পদার্থেরই কোনরূপ স্বভাব নাই; যাহা আছে, তাহা অবিদ্যা বৈ আর কিছুই নয়। জানিবে—যত প্রকার অনুভব, সকলই সেই ব্রহ্মসলিলের দ্রবতাস্বরূপ। পদার্থপরম্পরার যত কিছু অনুভব হয়, বুঝিবে,—সকলই সেই মহাচিদাকার পবনের স্পন্দন-স্বরূপ এবং মহাচিন্ময় ব্রহ্মাকাশের শূন্যতামাত্র। পবন ও পবনস্পন্দন যেমন অস্বতন্ত্র, তেমনি ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। স্বপ্নে যেমন নিজ মরণ অনুভূত হয়, তেমনি ভ্রমের বশেই উহার মিথ্যাভেদ উপলব্ধ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না বিশদভাবে তত্ত্ব বিচার করিতে পারা যায়, তাবৎপর্য্যন্তই ঐ প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কালে যথাযথ বিচারশক্তি সমুদিত হয়, তখন ঐ যে ভ্রান্তি—উহাও ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। ভ্রান্তি একটা মিথ্যা পদার্থ; সুতরাং যখন তত্ত্ববোধ হয়, তখন অসত্য শশশৃঙ্গের ন্যায় উহার অস্তিত্ব লক্ষীভূত হয় না। কাজেই তখন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই অবশিস্ট থাকেন,—তিনি নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল এবং পর হইতেও পরতর।

এইজন্যই বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, যিনি নিরতিশয় নির্ম্মলস্বভাব; যিনি নিত্য সমভাবাপন্ন, পরম মঙ্গলময়, নিত্য ও অদ্বিতীয় বস্তু, তুমি সকল প্রকার জরা, মোহ ও বিকারাদি-বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সেই সৎ ব্রহ্মাকাশেরই স্বরূপত্ব সমধিগত হও।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সুখ কিম্বা দুঃখ যাহাই উপস্থিত হউক, তাহাতেই যিনি অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহারই নিয়ত নাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সুখে বা দুঃখে যাহার নাশ নাই, তিনিই প্রকৃত অবিনশ্বর; কদাচ তাঁহার নাশের সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছাপ্রভৃতিকে সুখদুঃখাদির কারণ বলা যায়। কাজেই যাহার এই ইচ্ছা প্রভৃতি আছে, সুখাদি ঘটনা তাহারই অবশ্য সম্ভবপর। তুমি যদি এই সুখদুঃখাদির চিকিৎসা করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া অগ্রে ইচ্ছাপ্রভৃতিকে দূরে পরিহার কর। আমি এবং এ জগৎ এরূপ ভ্রান্তি সেই পরমপদে নাই। এই যে কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সকলই সেই শান্ত, নিরালম্ব, নির্ব্বাণ, অব্যয়, একাদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বময় ও সুবিমল; কে তাঁহাতে অহং, ব্রহ্ম ও জগৎ, এই এইরূপ ভ্রান্তিময় শব্দ বিন্যাস করিল, তাহা আমাদের অবিদিত। কি 'অহং' কি 'জগৎ' কিছুই সেই ব্রহ্মাকাশে নাই। বলিতে কি, এমন যে ব্রহ্মাদি শব্দ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে অপ্রযোজ্য। সেই ব্রহ্মাদি শব্দের যিনি প্রতিপাদ্য, তিনি শান্ত অদ্বিতীয়, বাক্য এবং মনের অগোচরীভূত; তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুরূপে সর্ব্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান; সুতরাং এ সংসারে কাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব হইবার সম্ভাবনা?

বৎস! সকলই যখন অসত্য, তখন উপদেশাদি সমস্ত ব্যাপারও অসত্য বৈ আর কি? অতএব ব্রহ্মোপদেশের উপায় তো কিছুই নাই। এ স্থলে এরূপ যদি তুমি মনে কর, তবে তাহা সুষ্ঠু হইবে না। কেন না, অসত্য অখিল বস্তুর অসত্যতা প্রতিপাদন করিলেও যিনি অবশিষ্ট থাকেন,—তিনি সেই উপদেশ্য সত্য সনাতন ব্রহ্মই। এইজন্য সর্ব্ব পদার্থেরই অপহ্নব করা হয়। যে পুরুষের ভ্রান্তি নাই, সে যেমন ভ্রান্ত পুরুষের সম্মুখস্থ পিশাচাদির ভয়াবহ কার্য্য দর্শন করে না এবং যে দুই পুরুষ একই শয্যায় শয়ান, তাহার মধ্যে একের অনুভূত স্বাপ্ন মেঘধ্বনি যেমন অপরে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি যিনি জগদ্‌ভ্রান্তি হইতে দূরে আছেন,—জগদ্‌ভ্রম

যাঁহার একেবারেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আর এই ভ্রান্তিদৃষ্ট জগৎদর্শন করিতে হয় না। কাজেই তাঁহার নিকট সমস্ত দৃশ্য বস্তুনিচয়েরই তিরোধান ঘটিয়া থাকে। নিজের জ্ঞানে যাহা অবস্থিত, অনুভূতিগোচর হইতে তাহাই সকলের হইয়া থাকে। স্বভাবপ্রসিদ্ধি এইরূপই বটে। এই নিমিত্ত নিজজ্ঞানে পিশাচাদির কার্য্য সর্ব্বদা সকলের থাকে না বলিয়াই যখন তখন সকলে তাহা লক্ষ্যীভূত করিতে পারে না; জ্ঞান উদয় হইলেই লক্ষ্য হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞান কি? উহা আত্মস্বরূপ; সকলই যখন ঐ জ্ঞানের বিকার, তখন 'অহং' জ্ঞানই বলি, আর অন্য অখিল জগতের কথাই বলি, সকলই যে সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, এ কথা বলাই বাহুল্য। কি সঙ্কল্প, কি স্বপ্ন, উভয় অবস্থার ন্যায় সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই একমাত্র নিরবয়ব জল যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ অবয়বযুত বীচিমালারূপে বিরাজিত, তেমনি নিরবয়ব হইয়াও একমাত্র নিজ জ্ঞানই বিবিধাবয়ব-যুত জগদাকারে পরিস্ফুট। ভ্রমের বশে জগদ্‌জ্ঞান সমুদিত হওয়ায় একমাত্র আত্মাই যেন নানাকারে বিকাশমান। পরন্তু বাস্তব পক্ষে ঐ জগদ্‌জ্ঞান অবস্তু; তাই তত্ত্বদৃষ্টিযোগে পরিদৃষ্ট হইলেও উহা উপলব্ধ হইবার নহে। কোন নিরবয়ব জীব যেমন স্বপ্নাদি কালে নিজ অবয়ব কল্পনা করিতে করিতে নিজেকে সর্ব্বাবয়বান্বিত বলিয়া মনে করে, তেমনি সেই যে নিত্য নিরবয়ব অদ্বিতীয় অবিচল ব্রহ্ম; তিনিই এই নানাবয়বযুত জগদাকারে বিকাশ পাইতেছেন। চিৎ যেন কুলালকামিনী; সেই চিৎকুলালীই অন্তরে লক্ষ লক্ষ মৃৎপাত্রবৎ বিবিধ বস্তুর সৃজনকর্ত্রী। এই জগৎ প্রভৃতি যে কোন বস্তুই সেই চিৎ-কুলালীর মনে সমুদিত হয়; এতৎসমস্তই তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। নিজের দ্রবরূপতা হেতু সাগর যেমন আপনাকে তরঙ্গাদি বিবিধরূপে জ্ঞান করে, তেমনি সেই একাদ্বয় ব্রহ্মই স্বীয় চিদাকারতা হেতু নিজেকেই জগদাকারে উপলব্ধ করিতেছেন। তিনি নিজে নীরূপ হইয়াও অন্তরে যেরূপ জ্ঞান করেন, সেইরূপেই নিজেকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর নহে, তাহা তিনি দর্শন করেন না। কি চেতন, কি অচেতন, সকলই মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের মায়ারূপ দেহে অবস্থান করিতেছে। আমি এক্ষণে কেবল উপদেশের জন্যই চেতন ও

অচেতনাদি ভেদের কথা কহিলাম, বস্তুতঃ উহা অসমীচীন। ফলে, কিন্তু এ জগতের সত্তা অসত্তা কিছুই নাই। আত্মা চিন্ময়, তিনি যেরূপ ভাবনা করেন, সেই অনুসারে সেই রূপই প্রকট হয়। তদীয় ভাবনা ভিন্ন কিছুরই প্রকাশ ঘটে না। অতএব এ সম্বন্ধে চেতনাচেতনের অর্থগ্রহ আমাদের আর কিরূপ হওয়া সম্ভবপর? বিভিন্ন বস্তুরূপে অনুভব ও অননুভবই চেতন ও অচেতন-পদবাচ্য। ঐ চেতনাচেতন আত্মার স্পন্দাস্পন্দস্বরূপ। অচল অমল স্ফটিকমণির অন্তরালে যে বিম্বসমূহ দেখা যায়, তাহাদের স্পন্দাস্পন্দ যেমন তাহাদের নিজের যত্নাদিকৃত বা আয়ত্ত নয়, আত্মার স্পন্দাস্পন্দ-স্বরূপ চেতনাচেতনও তাঁহার পক্ষে সেইরূপই। তত্ত্বদর্শনে যদীয় অস্তিত্ব, আধার বা কারণ কিছুই লক্ষ্যীভূত হয় না, তাদৃশ 'অহং'-জ্ঞানরূপ যক্ষ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া প্রকাশ পায়? 'অহং'-জ্ঞানরূপ যক্ষ প্রকৃত পক্ষেই সত্তাবৰ্জ্জিত; অথচ কি বিস্ময়ের বিষয়, সকলেই আমরা সেই যক্ষের বশতাপন্ন। কেশোণ্ডুক বস্তুগত্যা অম্বর হইতে অপৃথক্ হইলেও পৃথগ্‌বৎ প্রতীত হইয়া যেমন দিগ্‌ভ্রান্তিকালে অম্বরতলে প্রতিভাত হয়, তেমনি বস্তুতঃ অভিন্ন—ভ্রান্তিময় আকস্মিক অহম্ভাবও এক-মাত্র ব্রহ্মপদেই প্রকাশমান। 'এই আমি' 'এই সমগ্র জগৎ' সকলই সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম। সুতরাং ইহাদের আবার উদ্ভব-নিরোধ কি? এ জগতে যে হর্ষ বা বিষাদবিলাস দেখা যায়, ইহাদেরই বা কিরূপ কারণ হওয়া সম্ভবপর? ব্রহ্মপদের সর্ব্বশক্তিমত্তা চিরপ্রসিদ্ধ; তাই তদীয় ভাবনানুরূপ এ জগতের পরিস্ফুরণ। তিনি যদি জগদ্‌ভাবনা না করেন, তাহা হইলে এ জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই তোমায় বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি জগদ্ভাবনা হইতে বিরত হও,—তোমার সে ভাবনা দূরীভূত হউক। এ জগৎ চিদ্রূপময়; তাই স্বপ্ন-সংদৃষ্ট বস্তু ও সঙ্কল্প-নগরের ন্যায় একমাত্র সেই ব্রহ্মাকাশই জগদাকারে প্রকট হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে এ জগৎকে কিরূপে পৃথক্ বলিয়া বর্ণন করা যায়? যে জলরাশি নিশ্চল আছে, যাহাতে তরঙ্গোদয় হয় নাই, তাহাতে যেমন ভাবী তরঙ্গাদি, ভবিষ্যতে সমুৎকিরণ-যোগ্য বৃক্ষে বা কাষ্ঠে যেমন পুত্তলিকা এবং মৃত্তিকায় যেমন ভাবী ঘটাদি বস্তু অপ্রকটরূপে বিদ্যমান, জানিবে—

সেই ব্রহ্মপদেও এ জগতের অবস্থিতি সেইরূপই। ব্রহ্ম নিরাকার, নিরাধার ও নির্ম্মল; তাহাতে যাহা অনুভূতিগোচর হয়, যুক্তিক্রমে তাহা সেই ব্রহ্মই। তাই বলিতেছি, আমি ও জগৎ সেই ব্রহ্ম বস্তু হইতে সর্ব্বদাই অভিন্ন। পবনের বিবিধ স্পন্দ বিভিন্নরূপে উপলভ্যমান হইলেও তাহা যেমন বায়ু মাত্র বৈ আর কিছুই নয়, জানিবে,—এই যে অহমাদি ও জগদাদি, এই সমস্তই তেমনি সেই স্বভাববর্জ্জিত একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই। ব্রহ্ম—নিরাকার নিরাধার; মেঘের অন্তরালে বৃক্ষ, গজ, অশ্ব ও মৃগাদির আকারের ন্যায় তাঁহাতেই অহম্ভাব ও জগৎ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম শিবময়; তাঁহাতে নিখিল বস্তুই অবয়বাকারে বিরাজমান। বীজাদি কারণ-স্বরূপ; তাহার মধ্যে যেমন কার্য্যরূপ বৃক্ষপত্রাদি অবয়বাকারে পরিস্ফুরিত, জানিবে,—ব্রহ্মে জগৎ ও অহম্ভাবস্থিতির উপমাও তাহাই।

রামচন্দ্র! ব্রহ্ম হইতে এই জগতের পার্থক্য অসম্ভব; অতএব তুমি মৎপ্রদর্শিত যুক্তির অনুক্রমে অন্তরে আকাশবৎ সতত সমভাবে অবস্থিত হও। ঐ অবস্থায় তুমি নিশ্চল হও, নিরায়াস হও, নিরূপাধি হও, ভ্রান্তিবিহীন হও। তুমি বস্তুসত্যা বিচারযোগে জানিও,—তোমরা, আমরা, জগৎপরম্পরা বা আকাশাদি, এ সকলের কিছুই কিছু নহে। সমস্তই সেই একমাত্র অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম; তিনিই একমাত্র সর্ব্বত্র বিরাজিত। তুমি অখিল পদার্থেই বিশেষ বোধ বর্জ্জন কর; এবং মোক্ষলক্ষ্মী-লাভের নিমিত্ত 'আমিই সেই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য-বিরহিত সত্য চিৎস্বরূপ' এইরূপ বিবেচনা করিতে থাক। জানিবে,—পার্থক্যবোধই বন্ধন এবং অপার্থক্য বোধই মোক্ষ। জ্ঞানীদিগের নিয়মাদি অনুকরণপূর্ব্বক তুমি ভেদজ্ঞান বর্জ্জন কর এবং শান্তভাবে অবস্থান করিতে থাক। দ্রষ্টা কখন দৃশ্যতা লাভ করে না এবং জ্ঞান কখনই জ্ঞেয়তা-উপগত হয় না; অতএব জ্ঞেয় বস্তুর অভাবে এ জগতেরও অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না, কাজেই কাহার কিরূপে কীদৃশ জ্ঞান সম্ভবপর? দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, সেই হেতু সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন বাহ্য জ্ঞানের অনস্তিত্ব, জানিবে,—জাগ্রদবস্থাতেও সেই-রূপই। তুমি এই প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত হও। পবনস্পন্দন ও পবন যেমন পরস্পর বিভিন্নতাহীন,

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের চিদাকারতাও তেমনি একই পদার্থ। সমস্ত বস্তুতে চিদ্‌জ্ঞানের অভাবেই জগৎপ্রকাশ আর সর্ব্ববস্তুতে চিদ্‌জ্ঞানেই মোক্ষ-পদ। ব্রহ্মরূপ পবনের স্পন্দন হইতেই এই জগদ্দর্শন হয়। ঐ চিৎস্পন্দনের অভাবই মনীষিগণের মতে মুক্তি। বীজ যেমন তদীয় আত্মাভ্যন্তরে পল্লবাদি আত্মরূপ পরিদর্শন করে, তেমনি সেই যিনি মহাচিৎ,—তিনিই আত্মস্থ আত্মরূপ সৃষ্টি অনুভব করেন। পত্রাদি অবয়ব ভাবনা করিতে করিতে বীজ যেমন নিজ পত্রাদির আকারে প্রকাশ পায়, তেমনি জগদ্‌ভাবনা করিতে করিতে সেই মহাচিৎও জগদাকারে প্রকট হইয়া থাকেন। বীজের যেমন বৃক্ষাদি বিবিধ বিকার ক্রমশঃ প্রকাশমান হয়, এই যে সৃষ্টি-পরম্পরা, জানিবে,—ইহাও তেমনি সেই এক চিতেরই নানা বিকারমাত্র। বীজের বিকার বলিয়া বৃক্ষাদি যেমন বীজস্বরূপ, এই জগৎও চিদাকার বলিয়া চিৎস্বরূপ। যিনি নির্ব্বিকার নিরাময়, অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম, এই সমগ্র জগৎই তন্ময়; ইহাই জানিবে নিশ্চয়। জগতের এই দ্বৈত ও অদ্বৈত বিকার সঙ্কল্পনগরের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্পবশেই সমুদ্ভূত হয় এবং স্বীয় সঙ্কল্প-বশেই ক্ষীণ হইয়া থাকে। আকাশ এবং শূন্যত্ব এই উভয়ের ভেদ যেমন তুমি অবগত হইয়াছ, জানিবে,—জগৎ ও ব্রহ্মবস্তুর তেমনই মিথ্যা ভিন্নতা। আমি তুমি ইত্যাদি বস্তু আর অন্য কিছুই নহে; এ সকল কেবল সেই পরব্রহ্মের মহাচিৎস্বরূপিণী নিশ্চল সত্তা মাত্র। 'আমি মানব' এই প্রকার ধারণা কেবল নিজ অজ্ঞানবশেই হয়। ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ; জলে যেমন তরঙ্গ, তেমনি তাঁহাতে কোন বস্তু উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা অনুৎপন্ন এবং তাহা বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অবিনিষ্ট। অবয়বে অবয়বীর ন্যায়, আকাশে আকাশের ন্যায় এবং জলে জলের ন্যায় একমাত্র ব্রহ্মই বস্তুব্রহ্মরূপে আপনাতেই আপনি বিরাজমান। অর্দ্ধ নিমেষ কালের অন্তরালে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিতে হইলে যেটুকু সময় লব্ধ হয়, ঐ সময়ের মধ্যে জীবচৈতন্যের যে নির্ব্বিষয় নির্ম্মল রূপের প্রকাশ, তাহাই বটে ব্রহ্মভাব; এইরূপ ব্রহ্মভাবেরই উপাসনা করিতে থাক।

রামচন্দ্র! যাহারা শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে চৈতন্য-

ময় ব্রহ্ম ক্ষুব্ধ ও অক্ষুব্ধ এই দ্বিবিধ রূপসম্পন্ন বলিয়াই উল্লিখিত। ব্রহ্মের ক্ষুব্ধ রূপ বলিলে বুঝা যায় যে, তাহা অজ্ঞজনগণের অনুভূতি-সিদ্ধ বিবর্ত্তময় আর অক্ষুব্ধরূপে তিনি বিবর্ত্তহীন কূটস্থ পূর্ণানন্দময়। ব্রহ্মের এই দুই প্রকার রূপের মধ্যে যে রূপটী নিজের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে কর, তাহাতেই একাগ্রচিত্তে অবস্থিত হও। অনর্থক বিবেক-বর্জ্জিত হইয়া থাকিও না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! নিমেষার্দ্ধ মধ্যে একদেশ হইতে দেশান্তরে গমনকালে পূর্ব্বস্থান পরিহারপূর্ব্বক অন্য স্থান প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবচৈতন্যের যে নির্ব্বিষয় নিখিল রূপের প্রকাশ, তাহাই আত্মার পরম রূপ; আমি এই আত্মরূপের কথা পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি। তুমি গমন কর, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর, আঘ্রাণ লও, অথবা হাস্যাদিই কর, সকল প্রকার অবস্থাতেই স্থিরশান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সেই আত্মরূপ-ময় হইয়াই অবস্থিত হও। যে কার্য্য জীবন্মুক্তগণের যোগ্য এবং যাহা তোমার কুলাচারসম্মত, তথাভূত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও যদি তুমি জীবা-ভাস-বিরহিত নির্ব্বাসন সত্য আত্মনিষ্ঠায় চিরপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পার, তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হও, তাহা হইলেই তোমার সেই আত্ম-নিষ্ঠতারূপিণী বিদ্যা সুমেরুশৈলবৎ চিরতরে অচল অটল রহিবে। যাহার নাম অবিদ্যা, তাহা আর থাকিবে না; তাহার রূপ এতই তুচ্ছ যে, একবার মাত্র তত্ত্বদৃষ্টি নিপাতিত করিলেই তাহার সত্তা আর উপলব্ধিগোচর হইবে না। তত্ত্বদৃষ্টি লইয়া দেখিলে যাহার সত্তা প্রমাণিত হয়, জানিও,—তাহাই সেই পরম বিদ্যার রূপ। অনুভূত আর অনুভূতি, এই দুইয়ের উৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত রূপ অবিদ্যার সত্তা হইতেই হয়। নচেৎ বিচার করিয়া দেখিলে,

দেখিতে পাইবে, কাহার কোথায় কীদৃশ বস্তুর কি রূপ অনুভব করিবার সম্ভাবনা? দেখিবে,—তখন আপনা হইতেই অন্তরে শান্তি আসিবে। ফলে, ব্রহ্ম ও জগৎ উভয় একই বস্তু; অবিদ্যার বশে সেই এক বস্তুই অনেকবৎ প্রকাশমান। তিনি ব্রহ্ম একাদ্বয়; তিনিই সর্ব্বগময় অথচ অসর্ব্ব এবং নির্ম্মল অথচ মলিনবৎ এই ভাবেই তিনি বিরাজমান। ব্রহ্ম অশূন্য অথচ শূন্যপ্রায়, শূন্যপ্রায় অথচ অশূন্যপ্রায়, ব্যাপক অথচ অব্যাপকপ্রায় এবং অব্যাপকপ্রায় অথচ ব্যাপকপ্রায়, এইরূপেই তিনি অনুভূত হইয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কোনই বিকার নাই অথচ তিনি অবিদ্যার বশে বিকারশালী। তিনি সর্ব্বদা সমভাবসম্পন্ন এবং নিশ্চল; অপিচ নিশ্চল হইয়াও অনিশ্চল। তিনি সৎ অথচ অসদ্‌বস্তুর ন্যায় অদৃশ্য এবং অদৃশ্য হইয়াও যেন দৃশ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত। তাঁহার বিভাগ নাই, জড়তা নাই, অথচ তিনি বিভাগবৎ ও জড়বৎ হইয়া অনুভূয়মান। তিনি প্রকৃত জ্ঞানলভ্য নহেন, অথচ তিনি যেন জ্ঞানগম্য এবং তাঁহার অবয়ব না থাকিলেও তিনি যেন অবয়বসম্পন্নরূপে সুশোভিত। তাঁহার অহংজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে নাই; না থাকিলেও তাঁহাকে অহংজ্ঞানবান্ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বিকাশ কিছুই নাই, না থাকিলেও তিনি যেন বিকাশশীল; কোনওরূপ কলঙ্ক তাঁহার নাই, না থাকিলেও তিনি যেন কলঙ্কব্যাপ্ত; অপিচ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচরতা নাই, না থাকিলেও তিনি যেন ইন্দ্রিয়গোচরবৎ অনুভূয়মান। তিনি সম্পূর্ণ আলোক-পরিপূর্ণ অথচ যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন; তিনি চিরপুরাতন অথচ যেন নবীন; তাঁহার সূক্ষ্মতা পরমাণু অপেক্ষাও অত্যধিক অথচ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহারই অভ্যন্তরে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বগময় হইলেও ক্লেশসাধ্য দান-যজ্ঞাদি ও শ্রবণ মননাদি দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাঁহাকে সমস্ত দৃশ্য পদার্থের অতীত বলিয়াই প্রতীত হয়। এই জটিল সংসারজালে তিনি জড়িত নহেন; অথচ তাঁহাকে অবিদ্যার বশে তাহাতে জড়িত বলিয়াই অনুভূত হয়। তিনি অনেকধা বিরাজিত, অথচ তিনি অদ্বিতীয়।

রামচন্দ্র! মহাসাগর যেমন সলিলরাশির আধার, সেই একাদ্বয় ব্রহ্মও তেমনি জ্ঞানসমূহের আকর। জানিও,—সেই ব্রহ্ম মায়া-বিরহিত

হইলেও মায়াংশুমালার প্রকাশকর্ত্তা সুবিমল ভাস্করাকারে বিরাজমান। তিনি তূলক হইতেও লঘু অথচ নিখিল জগৎরত্নের তিনি মহাভাণ্ড; অপিচ তিনি দৃষ্টিলভ্য নহেন অথচ মায়ারূপ মরীচিমালাময় চন্দ্রমাস্বরূপে তিনি বিরাজমান। তিনি অপার—অনন্ত, অথচ কোথাও তাঁহার অবস্থান নাই। তিনি আকাশে অশেষ বনরাজিবিরাজিত, অশেষ শৈল-সমলঙ্কৃত জগজ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্থূলাদপি স্থূল, গুরু হইতেও গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার কর্ত্তা কেহই নাই; তিনি নিজেও কিছুই করেন না, তাঁহার করণ বা কারণ কিছুরই সম্ভাব নাই। তিনি শূন্যপ্রায় অথচ তদীয় অন্তর নিরন্তরই পরিপূর্ণাকার। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার তিনিই; অথচ তিনি সতত শূন্য অরণ্যপ্রায়। তিনি অনন্ত শৈলশ্রেণীর ন্যায় কঠিনকায় অথচ আকাশখণ্ডাপেক্ষাও তাঁহার কোমলতা। তিনি সর্ব্বকালেই সর্ব্ববস্তুরূপে প্রকাশমান; তিনি কোমল অপেক্ষাও কোমলতম এবং তিনি চিরপুরাণ অথচ নিয়ত নবীনভাবময়। তিনি প্রভাপুঞ্জময় অথচ তমস্তোমস্বরূপ। তিনি তিমিররাশিময় অথচ সর্ব্বব্যাপী আলোকস্বরূপ। তিনি প্রত্যক্ষ অথচ অক্ষির অগোচর; তিনি সম্মুখস্থিত অথচ চক্ষুর অত্যন্ত অতীত বস্তু। তিনি চিন্ময় হইয়াও জড় এবং জড় হইয়াও চিন্ময়। তাঁহাতে প্রকৃত পক্ষে অহম্ভাব নাই অথচ তিনি অহম্ভাবময়। অপিচ অহম্ভাবময় হইয়াও বস্তুতঃ তিনি নিরহম্ভাব। অহংজ্ঞান ব্রহ্ম, তথাচ তিনি অন্য পদার্থস্বরূপ এবং অন্যাকার হইয়াও তৎস্বরূপ। সেই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ অর্ণবস্বরূপ; এই ভুবনরূপিণী ঊর্ম্মি-মালা তাঁহারই অভ্যন্তরে পরিস্ফুরিত। তুষার যেমন শুক্লতা ধারণ করে, তেমনি একমাত্র তিনিই আপন অঙ্গস্থিত অখিল পদার্থকে ধারণ করেন। অপিচ তুষার হইতে যেমন শুক্লতার প্রকাশ হয়, তেমনি তাঁহা হইতেই এই সমগ্র সৃষ্টি প্রকট হইতেছে। তাঁহাতে দেশ, কাল বা অবয়বাদি বিভাগ নাই, তথাচ জল যেমন তরঙ্গতত্তির বিস্তারক, তেমনি সেই ব্রহ্মদেব নিয়ত এই অসত্যময় জগৎপ্রপঞ্চের প্রকাশক। এই জগৎসমূহ যেন জীর্ণ মঞ্জরীপুঞ্জ; ইহারা এই শূন্যময় বিশাল কাননে পঞ্চভূতময় পঞ্চ পল্লবে পরিবৃত আছে। সেই পরমাত্মা অতীব নির্ম্মলমূর্ত্তি; তিনি নিজেই

নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্যই যেন মুকুরাকার ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মের কোন পরিচ্ছেদ নাই; তিনি একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাতেই এই গগনপাদপের ফলোপম প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত; এই ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ যেন স্বেচ্ছাকল্পিত ত্রৈলোক্য। ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেদীপ্যমান হইতেছে। এই চন্দ্র-সূর্য্যাদি হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় উৎপন্ন হইয়া জীবের দর্শনাদি ব্যাপারে চিত্ত চমৎকৃতি জন্মাইতেছে। অভ্যন্তরগত বাসনাময় প্রপঞ্চ এবং বহিঃস্থিত ভুবনাকারে সেই পরমাত্মাই অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি জাগ্রদবস্থায় নানারূপে এবং সুষুপ্তিদশায় অনানারূপে ভাবাভাবময় হইয়া সর্ব্বদাই সপ্রকাশ। রসনার নিজের রূপ মুখবিবর; তাহাতে যেমন সে নিজের রসাস্বাদনপূর্ব্বক নিজেই চমৎকৃত হইয়া থাকে, তেমনি এই সকল ব্রহ্মরূপিণী পদার্থলক্ষ্মী ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের নিমিত্তই ব্রহ্মপদার্থে বিস্ময়োৎপাদন করে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই ব্রহ্মজলের দ্রবতাস্বরূপ। ভূলোকাদি নিখিল লোক উহার জলভ্রম এবং রূপ-রসাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; যিনি জীবরূপী ব্রহ্ম, তিনিই রূপাদিরে স্বাদুজ্ঞানে সমাদর করেন। ঐ যে উজ্জ্বল সূর্য্য-চন্দ্রাদি, উহাদের সমস্ত রূপাদি সৌন্দর্য্য প্রলয়ে সেই চিরোজ্জ্বল ব্রহ্ম-পদেই প্রলীন হয়। যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি অবস্থায় তেজোরূপী আলোক তেজ হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি ব্রহ্মাভিন্ন রূপাদি সৌন্দর্য্যও ঐ ব্রহ্ম হইতেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। তুহিনস্তোমের মধ্যে যেমন শুভ্রতা, তেমনি চিদাকার পরব্রহ্মেই এই নিখিল দৃশ্য বিশ্ব বিভাত। এই যে সকল পদার্থশোভা দেখা যাইতেছে, চন্দ্র হইতে অংশুপুঞ্জের ন্যায় ইহা সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত। ব্রহ্ম নিরবয়ব, তিনি যেন রঞ্জনদ্রব্য, সেই দ্রব্য হইতেই এই জগচ্চিত্র যখন উৎপন্ন, তখন বস্তুগত্যা ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংসাদি বিকার নাই বলিয়াই প্রতিপন্ন; অতএব জানিবে,—এ জগৎ নিশ্চল ব্রহ্মময় বৈ আর কিছুই নয়। সেই ব্রহ্মরূপ বনপাদপ হইতে ঐ গগনাঙ্গনে ব্রহ্মময় দৃশ্য বস্তুরূপ শাখা সকল বিস্তার পাইতেছে। এই সমস্ত শাখা জগজ্জালরূপ গুস্থমালায় মণ্ডিত। ব্রহ্মরূপ অচল প্রদেশের মধ্য দিয়া এই ক্ষয়বৃদ্ধিময়ী দৃশ্যনদী সতত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী

নানাস্বরূপ অনন্ত কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। এই ব্যোমদেশ যেন একটা রঙ্গালয়; হেথায় নিয়তিরূপিণী নর্ত্তকী নিয়তই জগৎনাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া নর্ত্তন করিতেছে। মায়াপ্রপঞ্চময় রঙ্গালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ নিয়তি-নর্ত্তকী কালরূপ শিশুকে বারম্বার প্রসব করিয়া নানাভিনয় দেখাইতেছে। এই জগদ্বৃন্দের যে কোটি কোটি মহাকল্প ও খণ্ড কল্প, এই সমস্তই ঐ কালশিশুর নয়নের উন্মেষ-নিমেষ। উদরাভ্যন্তরে শত শত প্রতিবিম্ব থাকিলেও দর্পণের যেমন ইচ্ছাদি বিকার কিছুমাত্রই নাই, তেমনি ঐ কালে নিয়ত শত শত জগৎ প্রকট হইলেও কাল নির্ব্বিকার নিশ্চলভাবেই বিরাজমান। ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতপঞ্চক যেমন পাঞ্চভৌতিক বস্তুর কারণ, জানিবে,—ঐ কালই তেমনি ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান সৃষ্টিসমষ্টির আদ্য কারণ। কালের উন্মেষণেই জগৎসৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় এবং কালের নিমেষণেই উহার বিলয় ঘটিয়া থাকে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় যে, ঐ কালের উন্মেষ বা নিমেষ বাস্তব পক্ষে নাই। উহা সর্ব্বদা সমানভাবে আত্মাতেই বিরাজমান। যে সমস্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পদার্থপুঞ্জ, তৎসমুদায়ের এই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—জনন-মরণাদি নানাবস্থা, এতৎ-সমস্তই স্পন্দনের একমাত্র পরম স্বরূপতার ন্যায় সেই অনন্ত চিদাকাশময়; তুমি এইরূপ তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চলরূপে অবস্থান করিতে থাক।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এ জগতে যত কিছু পদার্থপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিতেছ, এ সকলই জলে জলভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাকারে প্রকটিত হয়; পরে চিত্ত-চমৎকৃতি উদ্ভাবন করিয়া পরিণামে রাগদ্বেষাদি বিষম অনর্থপরম্পরার সৃষ্টি করে। জলের তরঙ্গ বাস্তবিক জল হইতে অভিন্ন, তথাচ তাহা যেমন ভিন্নাকারেই জলোপরি প্রকট, তেমনি এই যে

নিখিল বস্তু, এ সকল একমাত্র ব্রহ্ম হইলেও বিভিন্নাকারে প্রতিভাত। যাহা মহাকাশতা, তাহাই এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ; এবং তাহাই বিভিন্নরূপ সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর সারস্বরূপ। যদি সমাধিরূপ পরম উপশম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারাই উহার সম্যক্ স্বরূপ সমধিগম্য হয়। বালকেরা মনে মনে আকাশে যক্ষাদি কল্পনা করে, সেই সকল যক্ষাদি-ভূত—বালকদিগেরই নয়নপথে নিপতিত হয়; কিন্তু আমাদিগের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির নেত্রে যেমন তাহা অকিঞ্চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তেমনি এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও তত্ত্বদর্শনে অকিঞ্চিৎ হইয়া যায়। ফলে তত্ত্বালোচনায় এ বিশ্ব নিশ্চিতই কিছুই নয়। কিন্তু যাহারা শিশু বা শিশুর ন্যায় অজ্ঞতাসম্পন্ন, তাহাদের চিত্তেই এ বিশ্ব সত্য বলিয়া বিবেচিত। যেমন আকাশ বা পুত্তলিকাময় সৈন্যশ্রেণী, তেমনি এ বিশ্ব বাস্তব পক্ষে রূপ ও মননাদিহীন। তবে যে আকাশ ও পুত্তলিকাদির ন্যায় উহার রূপ-মননাদি প্রকাশিত হয়, তাহা একমাত্র অজ্ঞদৃষ্টিরই ফল। অতএব এ বিশ্বের বিশ্বত্ব আবার কি আছে? রূপাদির সারাংশ লাভ করিতে যাও, দেখিবে—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই লভ্য হইবে না। কাজেই উহাতে বিশ্বত্ব কিছু আছে কি? পক্ষান্তরে বিশ্বত্ব ব্যোমবৎ অলীক বস্তুমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। জগদ্‌বিষয়ক উদ্‌বোধনই পুরুষের জগদ্‌ভ্রম, আর তদ্‌বিষয়ক অনুদ্‌বোধনই অভ্রম। তুমি বুঝিয়া দেখ, স্মৃতি ও অস্মৃতির ন্যায় ঐ উদ্‌বোধকতা ও অনু-দ্‌বোধকতা উভয়ই তোমার আয়ত্ত। চিদাকাশময় বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম মহাকাশ-স্বরূপ; সুতরাং কদাচ কোনরূপ স্বভাবব্যত্যয় সম্ভবপর নহে। যদিও জ্ঞান-দৃষ্টিতে বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তথাচ এই ব্রহ্মময় বিশ্বের স্বভাব-বিকার যখন কোন ক্রমেই লক্ষ্য হইবার নহে, তখন আর কিরূপে তাহা সংঘটিত হইতে পারে? কি তুমি, কি আমি, সকলই একমাত্র চিদাকাশ; তাঁহাতে বিকারাদির সম্পূর্ণ অভাব; সুতরাং আমি তো ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই কোথাও দেখি না। সকলই একমাত্র পরম কল্যাণময় পরম ব্রহ্ম; তিনি নিশ্চল এবং নির্ম্মল, সুতরাং আমার দৃষ্টিতে কোথাও তো স্বমহত্ত্বাবাদি ভ্রম পতিত হইতেছে না। আমি যে সকল বাক্য বলিলাম, এ সমুদায়কে তুমি সেই চিদাকাশরূপ শূন্যত্ব বলিয়াই জানিও। কেন না,

এ সকল তোমারও চিদাকাশময় আত্মায় অবস্থিত। যে পুরুষ প্রস্তরময় বা চিত্রন্যস্ত, তাঁহার ন্যায় ইচ্ছাদিবর্জ্জিত হইয়া যে অবস্থিতি, মনীষিগণ বলেন, তাহাই নিত্য পরম পদ। যাহার ইচ্ছাদি অণুমাত্র নাই, এ হেন কাষ্ঠময় মানবের ন্যায় যিনি অব্যাকুলিত-চিত্তে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তিনি যথার্থ প্রশান্তমনা মৌনী পুরুষ। জীবিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জীবন বেণুদণ্ডবৎ অন্তরে বাহিরে শূন্যস্বরূপ; সে জীবনে কোনরূপ রস বা বাসনার সঞ্চার নাই। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ মনে করেন,—এই নিখিল বিশ্বই উল্লিখিত বেণুদণ্ডের ন্যায় অন্তর্বহিঃশূন্য ও বিরস। এই দৃশ্য বা অদৃশ্য কিছুই যাঁহার প্রীতিকর নহে, কি বাহিরে, কি অন্তরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার চিরশান্তি বিরাজিত, জানিবে,—তিনি সংসার-পারাবারের পর পারেই উপনীত।

রামচন্দ্র! যাহাতে মাত্র প্রারব্ধ শেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ বক্তব্য বাক্যই বলিবে; তদতিরিক্ত বাক্য ব্যবহার পরিহার করিবে। দেহাদিতে তোমার যেন অহংমমত্বাদি সম্বন্ধ থাকে না, তুমি বংশীর ন্যায় নির্ব্বাসন-মনে মধুরভাবে বক্তব্য বাক্যাবলী ব্যক্ত করিবে। কোনরূপ বাসনা, ইচ্ছা বা মননাদি যেন তোমার থাকে না; বারবনিতাপ্রভৃতির কূটাগারের ন্যায় সে সকল বর্জ্জন করিবে। এই অবস্থায় তুমি অক্ষুব্ধচিত্তে যথাপ্রাপ্ত স্পর্শনীয় বিষয় স্পর্শ করিবে। ভয়, অনুরাগ বা অভিমানাদি তোমার হৃদয়ে যেন স্থান প্রাপ্ত হয় না; তদবস্থায় তুমি আস্বাদযোগ্য ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদ লইবে; বাসনা, অনুরাগ, মান ও গর্ব্বাদি পরিহার কর,—করিয়া বিচিত্র নেত্রবৎ দৃশ্য বস্তু সকল বারম্বার দেখিতে থাক। ঐরূপেই তুমি সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে দূরে থাকিয়া বনবায়ুর ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়-গত পুষ্পগন্ধাদির আঘ্রাণ লইবে।

বৎস! এইরূপে যে যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় অনুল্লিখিত রহিল, তত্তদ্-বিষয়েও পূর্ব্বের ন্যায় তুচ্ছতা জ্ঞান করিয়া যদি তুমি বিষয়ভোগ-রোগের চিকিৎসায় না প্রবৃত্ত হও,—যদি ঐ রোগের চিকিৎসা করিয়া উঠিতে না পার, তবে শান্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; সেরূপ কথার উত্থাপনাই তো হইতে পারে না। বিষয়ভোগ যেন বিষ; সে বিষের আস্বাদ

লইয়া দিন দিন যাহার অনুরাগ তাহাতে উপচিত হয়, সে স্বীয় দেহে জ্বলদনলে রাশি রাশি তৃণগুচ্ছই অর্পণ করিয়া থাকে। এই জন্য বেদবাদিগণ বলিয়া থাকেন,—ইচ্ছাত্যাগই শান্তিলাভের মুখ্য উপায়। এ কথা প্রকৃতই যে, মন নিরিচ্ছ হইলে যেরূপ শান্তি প্রাপ্ত হয়, শত শত উপদেশ দ্বারাও সেরূপ শান্তির সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছার উদ্রেক যেমন দুঃখনিদান, ইচ্ছার শান্তিও তেমনি সুখজনক। ইচ্ছার উদ্রেক হইলে যেরূপ দুঃখানুভব হয়, সেরূপ দুঃখ নরকেও নাই। আবার ইচ্ছার উপশম ঘটিলে যাদৃশ সুখোদয় হয়, বুঝি বা ব্রহ্মলোকেও সেরূপ সুখানুভবের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—ইচ্ছামাত্রই চিত্ত এবং ইচ্ছার শান্তিই মোক্ষ। শাস্ত্রসমূহের সমালোচনা, তপস্যা, নিয়ম বা যম, যাহার কথাই বল, সকলেই ইচ্ছার উপশমে মোক্ষফল প্রসব করে। প্রাণীদিগের ইচ্ছার উদয় যাবৎ পরিমাণে হয়, তত পরিমাণ দুঃখবীজই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অপিচ বিবেকবলে ঐ ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ক্ষীণ হয়, দুঃখচিন্তারূপিণী বিসূচিকারও সেই পরিমাণেই উপশম ঘটিয়া থাকে। বিষয়ানুরক্তির প্রাবল্য বশতঃ লোকের ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ঘন হইয়া উঠে, দুঃখচিন্তাময়ী বিষয়োর্ম্মিমালাও তত পরিমাণে উপচিত হইয়া থাকে। নিজের প্রযত্নরূপ ঔষধ দ্বারা যদি ইচ্ছা-ব্যাধির চিকিৎসা করা না হয়, তবে এ ব্যাধির আর কোন বিশিষ্ট ঔষধ মিলিবে বলিয়া মনে হয় না। যদি কেহ সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার শান্তি করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উহার শান্তি করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। দেখ, একবার যদি সৎপথে পদার্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না। যে জন ইচ্ছা-ব্যাধির প্রশমনবিষয়ে প্রযত্ন প্রকাশ না করে, তাহাকে নিতান্তই নরাধম বলা হয়। সে তাহার আত্মাকে নিয়ত অন্ধকূপেই প্রেরণ করে। এই সংসার-লতা অশেষ দুঃখফলযুতা; একমাত্র ইচ্ছাই এ লতার বীজ। যদি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নিঃশেষরূপে তাহাকে দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলেই আর কখনই উহার অঙ্কুর জন্মিতে পারে না। জানিবে,—ইচ্ছা মাত্রই সংসার এবং ইচ্ছার যে অভাব, তাহারই

নাম নির্ব্বাণ। এই নিমিত্ত বলা যায়, যাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক না হয়, সে পক্ষে চেষ্টা কর; এ বিষয়ে ভ্রান্তিময় যত্ন করিতে গেলে কিছুই ফলোদয় হইবে না। আমার এই কথায় কি তোমার সংশয় আছে? যদি থাকে, তবে বলিব, শাস্ত্রের উপদেশ এবং শাস্ত্রোপদেশক-দিগকে নিশ্চিতই তুমি অশ্রদ্ধা কর। যাহা হউক, আর এক কথা বলি, যদি তুমি মনে কর যে, ইচ্ছা দমন করিবার শক্তি তোমার নাই, তাহা হইলে চিত্ত সমাধি অবলম্বনই বা তুমি করিতেছ না কেন? যদি সমাধি অবলম্বন করিতে সমর্থ হও, তাহাতেও সুফল ফলিবে; কেন না, এইরূপ হইলেও ইচ্ছা লোপ পাইবে, তাহার সন্ধান আর মিলিবে না। বিবেক দ্বারা ইচ্ছা জয়ের শক্তি যাহার না হয়, কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রাদি চর্চ্চা, সকলই তাহার বৃথা হইয়া যায়। যে জঙ্গলে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস, তথায় হরিণীর জন্ম যেমন মৃত্যুরই কারণ হয়, জানিবে,—এই ইচ্ছাদি বিষ-বিকারময় অপার দুঃখমূলক সংসারে মানবগণের জন্মও তেমনি মরণের নিমিত্তই বটে। ইচ্ছার উদ্রেকে মানব যদি বালকবৎ চপল হইয়া না উঠে, তাহা হইলেই আত্মজ্ঞানার্থ যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস হইয়া থাকে। অন্যথা কিছুতেই তাহা হইবার নহে। তাই বলিতেছি, অগ্রে ইচ্ছাকেই বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা কর। এইরূপ করিতে করিতেই আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভবপর হইবে। জানিবে,—নিরিচ্ছভাবই নির্ব্বাণ আর ইচ্ছাবশতাই বন্ধন। অতএব ইচ্ছা জয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিও না। তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ, জানিবে,—এ ব্যাপারে দুষ্করতা কিছুই বোধ হইবে না। জানিবে—ইচ্ছাই জনন-মরণ-জরাদিরূপ করঞ্জপুঞ্জের বীজ। অতএব অন্তরে শমরূপ অনল প্রজ্বালিত কর,—করিয়া তাহাতেই সতত ইচ্ছাবীজ দগ্ধ করিতে থাক। যে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ইচ্ছা নাশ হইতে পারে, সেই সেই উপায়যোগেই মুক্তি লাভ হয়। যে যে উপায়ে বিবেক-বৈরাগ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়াই তুমি হৃদয়োদ্গত ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছার আবির্ভাব যে যে উপায়ে হয়, সেই সেই উপায়যোগেই ভববন্ধনের পাশ প্রোদ্ভূত হইয়া থাকে। এই যে পাপ-পুণ্যময় বন্ধনপাশ, ইহাই অশেষ

দুঃখের উৎপাদক। সাধু পুরুষ ইচ্ছার বিলোপ সাধন ব্যতীত যদি ক্ষণ-পরিমিত কালও অযথা কর্ত্তন করেন, তবে দস্যুদল যাহার সর্ব্বস্ব হরিয়া লয়, তথাভূত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও আর্ত্তনাদ করাই উচিত হয়। সাধু-ব্যক্তির অন্তর হইতে যত পরিমাণে ইচ্ছার উপশম ঘটে, তাঁহার মুক্তি নিমিত্ত কল্যাণ সেই পরিমাণেই উপচিত হয়। এই সংসার যেন একটা বিষবৃক্ষ; অবিবেকী আত্মার ইচ্ছাপূরণই উহার সলিলসিঞ্চন। হৃদয়-পাদপের অভ্যন্তরে ভীষণ অগ্নিশিখার আবির্ভাব হইলে তাহা পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান জন্য শক্ররাবশেই যেন জীবপশুকে পাতিত করে,—করিয়া সুখ-দুঃখরূপ কুবীজ শেষ দগ্ধ করিয়া ফেলে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বিষ-বিকারের ন্যায় ইচ্ছাকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত তুমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানযোগের বিষয় শ্রবণ কর। ইহাতে তোমার ভ্রম বিনষ্ট হইবে। হে রঘুনন্দন! যদি আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তুমি সে বস্তু ইচ্ছা করিতে পার, আর যদি তাহার অভাবই নিশ্চিত হয়, তবে আর আত্মাতিরিক্ত কোন্ বস্তু ইচ্ছা করিবে? ব্রহ্ম চিন্ময়, তাঁহার যে কোন অংশ বা অবয়ব আছে, তাহা কিছুই নাই। তিনি আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম শূন্য বস্তু; আমি এবং এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ, তাঁহারই প্রতিভাস মাত্র বৈ আর কিছুই নহি। কাজেই তোমার আর ইচ্ছার বিষয় কি হইতে পারে? ব্রহ্ম ব্যোম-স্বরূপ; তিনিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপে প্রকাশমান; এই নিখিল জগৎ তাঁহারই স্বরূপ। সমস্তই সেই ব্যোম ব্রহ্মময়। কাজেই ইচ্ছার বিষয় আর কি থাকিবার সম্ভাবনা? কে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য? আর কেই বা

তাহার গ্রাহক? অতএব কিরূপে তাহাদের সম্বন্ধ-সংযোগ সম্ভবপর? আমরা শান্তচিত্ত, আমাদের সে সম্বন্ধজ্ঞান নাই। অপিচ যাহাদের সেরূপ জ্ঞান বিদ্যমান, এ প্রকার লোক কেহ আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। গ্রাহ্য ও গ্রাহকসম্বন্ধ স্বনিষ্ঠ; কিন্তু তাহা হইলেও তত্ত্বদর্শনে উহার অস্তিত্ব তো কৈ প্রত্যক্ষ হয় না। ফল কথা, যেমন কৃষ্ণকান্তি-বিশিষ্ট চন্দ্রমা অলীক পদার্থ, তেমনি ঐরূপ সম্বন্ধও অসত্য; সুতরাং তাহার উপলব্ধি হইবে কিরূপে? বস্তুতঃ মাত্র অজ্ঞানই গ্রাহ্য-গ্রাহকাদির সত্তা; অজ্ঞের দৃষ্টিতেই উহাদের সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন ঐ গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি যে কোথায় লুকাইয়া যায়, তাহার কোনই সন্ধান মিলে না। তত্ত্বদৃষ্টির এইরূপই স্বভাব যে, তাহার যখন উদয় হয়, তখন অসত্য অহম্ভাব আত্মাতেই বিলয় পাইয়া যায়। যখন অহম্ভাবের বিলোপ ঘটে, তখনই সমস্ত দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়। সেই অবস্থাই নির্ব্বাণ-পদ। ঐ প্রকার শান্তি-পূর্ণ নির্ব্বাণ পদে দৃশ্যাদি জ্ঞান কিছু মাত্রই নাই। যথায় দৃশ্যাদি জ্ঞানের সদ্ভাব, তথায় শান্তিরও সম্পূর্ণ অভাব। ছায়া ও আতপ যেমন যুগপৎ অনুভূত হয় না, তেমনি দৃশ্যাদি ও শান্তি এই উভয়েরও এককালীন অনুভব হইবার নহে। যদি একই সময়ে উভয়কে অনুভব করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধতা হেতু উভয়ই নিশ্চয় অসত্য হওয়ায় শান্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারিত কি? নির্ব্বাণ সর্ব্বদুঃখ-বর্জ্জিত, জরামরণাদি-ক্লেশ-লেশ-বিরহিত, পরম শান্তিময়। এ তত্ত্ব জ্ঞানি-মাত্রেরই অনুভূত। যাবতীয় দৃশ্যাদি বস্তুই অসত্য ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। উহারা কখনই সুখজনক হইতে পারে না। সুতরাং দৃশ্যাদির ভাবনা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদে আরোহণ কর। জ্ঞাননেত্রে দেখিলে উহাদের সত্তা যখন উপলভ্য হয় না, তখন জানিবে,—উহারা সত্য সত্যই ভ্রান্তি-বিলসিত শুক্তিকারৌপ্যবৎ অলীক বৈ আর কিছুই নহে। এ কথা সত্যই বলিতেছি যে, দৃশ্যাদি পদার্থপরম্পরার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রকৃত পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম। সুতরাং উহাতে আর কৌতুকের বিষয় কি? ঐ সকল দৃশ্যাদি পদার্থকে যদি সৎ বলিয়া বোধ করা যায়,

তাহা হইলেই দারুণ দুঃখ জন্মে; আর অসৎ বোধ করিলেই পরম সুখোদয় হয়। উপদেশাদি হইতে ঐ সকল দৃশ্য পদার্থের যে অসত্তাবোধ হয়, তাহা প্রথমতঃ মনন ও পরে নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে।

তাই বলিতেছি, হে অজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ! যিনি সর্ব্ববিধ বিকারবিহীন পরম বস্তু, তিনি এক্ষণে শাস্ত্রোপদেশাদি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রকট হইলেও কেন তোমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতেছ না? অনর্থক আত্মবন্ধন ঘটাইবার নিমিত্তই কি তোমরা দৃশ্য কৌতুক পরিহারে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যে কিছু কার্য্য-কারণাদি ভাব, সকলই যখন সেই ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়, তখন এই বিশ্বব্যাপক দৃশ্যসমূহে যে একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপতাই বিরাজিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহাবসর কি আছে? ব্রহ্ম ব্যোমাকার, সর্ব্বময় ও অদ্বিতীয়; তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণাকারে বিরাজমান। এ তত্ত্ব অবগত হইয়াও যাহারা কার্য্য-কারণ-ভাবের আলোচনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়, তাদৃশ পশুপ্রায় শিষ্যগণ দ্বারা আমাদের প্রয়োজন কিছুই দেখি না। বলিতে কি, এ বিষয়ে যে একটা কার্য্য-কারণতাদি বোধক বাক্য, তাহারই ব্যবহার ক্রম আমি জানি না। যদি হেতু নির্ণয়ের একান্তই আবশ্যক হয়, তবে পবনের স্পন্দনে, জলের দ্রবত্বে, ও আকাশের শূন্যত্বে যে হেতু, চিদাত্মা ব্রহ্মের দৃশ্যাদিরূপতায় সেই হেতুই জানিবে। ফলে ঐ হেতু—অবিদ্যা বৈ আর কিছুই নহে। অবিদ্যা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। কার্য্যত্ব বা কারণত্বাদি সকলই যখন একমাত্র ব্রহ্ম, তখন তাঁহাতে সৃষ্টির কারণতা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া কেবল নির্লজ্জতারই পরিচয় ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? এই সমস্ত বিশ্বই শান্ত শিবময় ব্রহ্ম; এখানে সুখ নাই, দুঃখ নাই, ইহা সেই চিন্ময়েরই চিন্মাত্র। কাজেই এ বিশ্ববিষয়ে ইচ্ছার উদ্রেক হইবে কিরূপে? মৃণ্ময় পুত্তলিকা যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইলেও তাহা যেমন মৃণ্ময়তাই, তেমনি এই যে নিখিল দৃশ্য বিশ্ব ও অহন্তাবাদি, এ সকল কেবল ব্রহ্মই; ব্রহ্মেতর অপর কোন সত্তাই ইহাতে নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, এ তত্ত্ব যদি

এইরূপই হয়, তাহা হইলে কোন বিষয়ে ইচ্ছার উদ্রেক বা অনুদ্রেক, যাহাই কেন হউক না, তাহাতে তো ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই দেখি না। কেন না, তাহাও তো ব্রহ্মই; সুতরাং ইচ্ছা বিষয়ে বিধি-নিষেধের আবশ্যকতা কি আছে?

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য; বিধি-নিষেধের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা যথার্থই। কিন্তু এ কথাটা বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, ঐ ইচ্ছা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতীত হয় কখন? যখন প্রবোধোদয় হয়, তখনই উহা হইয়া থাকে। সে কালে আর ঐ ইচ্ছাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই বলা যায়, ঐরূপ প্রতীতি হইবার পূর্ব্বে ইচ্ছা যে অনর্থকরী হইবে, সে পক্ষে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিরূপে মানবকে প্রবোধশালী বলিয়া জানা যাইবে? প্রবোধ-সম্পন্ন পুরুষের লক্ষণ কি? সে বিষয়ে এক্ষণে আমি যথাযথ বলিতেছি,—তুমি শ্রবণ কর। রবির উদয়ে যামিনীর যেমন অবসান হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই ইচ্ছার বিলয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। জ্ঞানোদয়ে ইচ্ছাদির একবার যদি বিলয় ঘটে, তাহা হইলে উহা আর প্রকাশ পাইতে পারে না। সে কালে দ্বৈতবোধ ও বাসনা থাকে না, কাজেই ইচ্ছার উদয় হইবে কিরূপে? সমগ্র দৃশ্য পদার্থেই নীরসতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় কোন কিছুতেই যাঁহার ইচ্ছার উদ্রেক হয় না, অবিদ্যার উপশম তাঁহারই হয় এবং তাঁহারই সুনির্ম্মল মুক্তভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সে কালে দৃশ্য পদার্থে তাঁহার বিরাগ বা অনুরাগ অণুমাত্রও থাকে না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি স্বভাবতই তাঁহার নিকট শোভা পায় না। পরের প্রেরণাবশে তথাবিধ জীবন্মুক্ত পুরুষের যদি কখন কোনও বিষয়ে কাকতালীয় ন্যায়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উদ্রেক হয়, তথাচ তাঁহার সেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যে ব্রহ্মস্বরূপ বৈ আর কিছুই নয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রকৃত কথা এই যে, যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, কোন অভিনব ভোগ্য ব্যাপারে তাঁহার ইচ্ছার উদ্রেক হয়ই না, পূর্ব্বাভ্যাস-ক্রমে যদিও কখন কিঞ্চিৎ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তথাচ তাহা একান্তই অস্থির। উত্তম তত্ত্বজ্ঞান যদি একবার জীবের জন্মে, তবে তাহার ইচ্ছা বিলোপ একেবারেই ঘটিয়া যায়। কেন না, যেমন আলোক ও অন্ধকার

একত্র থাকে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান ও ইচ্ছার একত্রাবস্থান সম্ভবে না। তত্ত্বজ্ঞানী জন কোনওরূপ বিধি-নিষেধেরই কখন বশীভূত নহেন। তদীয় ইচ্ছা পূর্ণভাবেই প্রশমিত হইয়া যায়। কোন বিষয়েরই গবেষণা তিনি করেন না। কাজেই কে আর তাঁহাকে কোন্ প্রকার বিধি পালনের জন্য বলিবে? ইচ্ছার একান্ত অভাব ঘটিবে এবং অভয় প্রদানে সর্ব্ব জীবের সন্তোষ সাধন করা হইবে, ইহাই হইল তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। অথবা 'তত্ত্বজ্ঞানী' বলিয়া যে সর্ব্ব সাধারণের অনুভব হয়, সেই অনুভবই উহার চিহ্ন। যে কালে দৃশ্য বস্তু কখনই বিরস-জ্ঞানে রুচিকর হয় না, তখনই প্রকৃত ইচ্ছার উদ্রেক হওয়া আর সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সেই কালেই জীবন্মুক্ত-ভাব আসিয়া সমুদিত হয়। বোধের উদয় হওয়ায় যাহার দ্বৈত বা অদ্বৈত জ্ঞান থাকে না, যিনি তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাদি সর্ব্ববিধ মানসিক ভাবই ব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহার দ্বৈত বা অদ্বৈত জ্ঞান নাই, ঐক্য বা অনৈক্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, এইজন্য যিনি সর্ব্ববিষয়েই অব্যগ্র থাকিয়া নির্ম্মল-চিত্তে নিশ্চল-ভাবে আত্মাতেই অবস্থান করেন, এ সংসারে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান তিনি করুন আর নাই করুন, তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুতেই কিছু নাই। ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সৎ, অসৎ, আত্ম, পর, জীবন, মরণ, তৎপক্ষে সমস্তই সমান। তাঁহার লাভ বা অলাভ কোন কিছুতেই নাই। কোন প্রাণী হইতে তাঁহার কোনরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির আবশ্যকতা আছে, এরূপ আশা তিনি মোটেই পোষণ করেন না। ঐ প্রকার জীবন্মুক্ত জ্ঞানী জনের ইচ্ছা কোন কিছুতেই সমুদিত হইবার নহে। যদি বা কখনও সমুদিত হয়, তবে জানিতে হইবে,—সেই ইচ্ছাও সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ বৈ আর কিছুই নয়। সুখ-দুঃখ কিছুই নাই। এই সমগ্র বিশ্বই শান্ত শিবস্বরূপ। এই প্রকার জ্ঞান যিনি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া শিলার ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন, বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন,—তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যিনি পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে জগৎরহস্য নিরূপণ করিয়া বিষকে পীযূষপ্রায়, দুঃখকেই সুখস্বরূপে ভাবিতে পারেন, তিনিই ধীরস্বভাব এবং তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। জানিবে,—ব্রহ্মে যে জগৎস্থিতি, উহা ব্রহ্মেই ব্রহ্ম, আকাশেই আকাশ,

সতেই সৎ এবং শূন্যেই শূন্যের অবস্থান। যিনি জ্ঞানাকাশময়; যাঁহার বিষয় জ্ঞান মাত্রেই নাই; যিনি সর্ব্বদাই সমভাব-সম্পন্ন; অবিচল, সৌম্য; বিশ্বব্যাপী; অথচ প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাদি যাঁহাতে নাই, তথাভূত একমাত্র ব্রহ্মই যখন বিরাজিত, তখন অহং জ্ঞান যে একান্তই বিনশ্বর ও ভ্রান্তি-নিদান, তাহাতে আর সন্দেহের অবসর কিছুই নাই। এই যে চরাচরময় জগৎ দেখিতেছ, ইহা সম্পূর্ণতই অন্য-চিত্ত-কল্পিত নগরোপম একান্তই অলীক পদার্থ; নির্ম্মল চিদাকাশ ব্যতীত উহা আর কিছুই নহে। অপরের চিন্তা হইতে একটা নগর উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে তুমি যখন অনায়াসেই যাতায়ত করিতে পার, তথায় প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গমে তোমায় যেমন কেহই বাধা প্রদান করে না, তেমনি তোমার অন্তরেও এই যে ভ্রান্তিময় জগৎ অবস্থিত আছে, ইহাতেও বাস্তব পক্ষে কাহার কোন চেষ্টায় বাধা প্রদান করিবার কেহই নাই। শ্রম-তৃষ্ণাকুল দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় যেমন শূন্য দেশে আপনা হইতেই মৃগতৃষ্ণাজলোর্ম্মিময় সাগরাকারে প্রতিভাসিত হয়, তেমনি আত্মা শূন্যতর,—তাঁহাতেও নিজ অন্তঃকরণই সমুদ্র, আকাশ, পৃথ্বী, নদী ও পর্ব্বতাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই দৃশ্য জগৎ স্বপ্নময় নগর ও বালকাবলোকিত বেতালাদির ন্যায় একান্তই অলীক; ইহাতে অসত্যতা ব্যতীত আর কি আছে? 'অহং' পদার্থ অসত্য; তথাচ ভ্রান্তির বশে সত্যের ন্যায় প্রকাশমান। পরন্তু প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্তিমান্ কেহই নাই; না থাকিলেও ভ্রান্তি পরিস্ফুরিত হয়; হইলেও,—উহা নিতান্তই অসত্য বলিয়া বিদিত হইবে। এই ভ্রান্তি সৎ অসৎ বা সদসৎ কিছুই নহে। উহা গন্ধর্ব্বনগরাদি নানাকারাকারিত আকাশবৎ এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুতাকারে প্রকাশমান। যাঁহার বিষয় জ্ঞান নাই, যিনি তত্ত্বাভিজ্ঞ পুরুষ, তদীয় ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই যদিও তুল্য, তথাচ মদীয় বিবেচনায় ইচ্ছার উদ্রেক না হওয়াই মঙ্গলাবহ। পবন যেমন অকারণ স্পন্দিত হয়, তেমনি কারণাভাবেই চিদাকাশময় আত্মার 'অহং'মিত্যাকার জ্ঞান চিদাকাশে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ঐ আত্মার চেত্য পদার্থে উন্মুখতার নামই চিত্ত। ঐ চিত্তই সংসার এবং ঐ সংসারের নামই ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি যে বিমুখতা, তাহাই জানিবে—মুক্তি।

বৎস! এই যাহা বলিলাম, তুমি এইরূপ যুক্তি হৃদয়ঙ্গম কর, এবং বিষয়াসঙ্গ বর্জ্জন কর। এ জগতে আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন কি ইচ্ছা, কি অনিচ্ছা, কি সৃষ্টি, কি সংহার, কোন কিছুতেই তো কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তত্ত্বজ্ঞ যেন চিদাকাশ, তাঁহাতে না ইচ্ছা, না অনিচ্ছা, না সদসৎ, না ভাবাভাব, না সুখদুঃখ, কোন কল্পনারই সম্ভাবনা নাই। বিবেক-শান্তির অভ্যুদয়ে চিত্ত পরিতৃপ্ত হওয়ায় যদীয় ইচ্ছা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যায়, মনিষিগণের মতে তিনিই বটে মোক্ষভাজন। ইচ্ছারূপ ক্ষুরধারে যে হৃদয় নির্ভিন্ন হয়, শোকাদি শূলবেদনা তাহাতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যেরূপ মণি, মন্ত্র বা ঔষধিই প্রয়োগ কর, কিছুতেই ঐ বেদনা প্রশমিত হইবার নহে। প্রাণিবর্গের দুঃখ দূরীকরণের জন্য বিধাতা মণি, মন্ত্র বা ঔষধি প্রভৃতি যত কিছু উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদীয় হৃদয়ে মিথ্যা ভ্রম অতি প্রবল, তাহার পক্ষে তৎসমুদায়ের কোনটীই ফলোপধায়ক নহে। ইহা আমার বহুবার বহু যত্নেই পরীক্ষিত হইয়াছে। ফলে ভ্রান্তিবিলসিত অসত্য পদার্থ দ্বারা ভবদুঃখ-রোগের চিকিৎসা হইবার নহে। যদি হয়, তবে কল্পনায় বদন ব্যাদান করিয়া অন্যের চিত্ত-কল্পিত পর্ব্বত কবলিত করিতে পারা যায় না কি? তত্ত্ববোধ সমুদিত হইবার পরে আর যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তথাবিধ ভ্রান্তিজনক মিথ্যা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যদি পর দুঃখ প্রশমিত করা যায়, তবে শশবিষাণ দ্বারা গগনতল আচ্ছাদিত না করা যাইবে কেন? একমাত্র চিদাকাশই অহম্ভাবনার বশে জড়তাময় হয় বলিয়া ক্ষণমধ্যেই জলের শিলাকারতা প্রাপ্তির ন্যায় মনন নিমিত্ত দেহাদির আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব আপনার চিদাকারতা বশতই স্বপ্নাবস্থায় নিজ মরণের ন্যায় এই মিথ্যা দেহভাব অনুভব করে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, চিৎশক্তি সর্ব্বদাই অক্ষত। আকাশে নীলিমা দেখা যায়, ঐ নীলিমা বাস্তব পক্ষে কোন বস্তু মধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়া বস্তুগত্যা মিথ্যা হইয়াও ভ্রমজ্ঞানে সত্যরূপেই প্রতীত। এই দৃষ্টান্তে বুঝিবে, ঈশ্বরেও বিশ্বসৃষ্টি না সৎ, না অসৎস্বরূপ। যেমন শূন্যত্ব ও আকাশ এবং স্পন্দন ও পবন, তেমনি সৃষ্ট পদার্থ ও ব্রহ্মও

অভেদমাত্র। ফল কথা, উভয়ই এক পদার্থ। এ সংসারে যে জগদাদি, ইহাদের কোন কিছুই উৎপন্ন বা বিনষ্ট নহে। যেমন নিদ্রানিমগ্ন ব্যক্তির স্বপ্ন, তেমনি উহা কেবলই প্রতিভাস মাত্র। ক্ষিতি প্রভৃতি সকলই যখন ব্রহ্মপ্রতিভাস বৈ আর কিছুই নয়, তখন উহাদের অবিদ্যমানতা সত্য সত্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং সৃষ্ট বস্তুনিচয় যখন চিদাকাশময়, তখন তাহাদের আদান-প্রদানে আবার অভিনব অভি-নিবেশের কথা কি? দেহই বল, বা ক্ষিতি প্রভৃতিই বল, সকলই ব্রহ্মের প্রতিভাস; সুতরাং তাহাদের আদান-প্রদানে সম্পূর্ণই কারণাভাব। নিজে এবং অন্যান্য অখিল বস্তুপরম্পরায় একমাত্র ব্রহ্মচিৎসত্তাই বিরাজ-মান। বুদ্ধিপ্রভৃতির অসম্ভাবনা এবং বুদ্ধিপ্রভৃতির প্রতিভাসক ব্রহ্মচৈতন্য-ভেদাভেদের অসম্ভবতা; কাজেই 'এ ইহা করিতেছে' এই প্রকার কারণ-তারও অসত্তা। তবে সম্ভাবনা কাহার? সেই যিনি কেবল একাদ্বয় পরম বস্তু, তাঁহারই সত্তা ও সত্যত্ব সম্ভবপর। স্বপ্নে ক্ষণমধ্যেই যেমন জনন-মরণাদি নানাবস্থা অনুভূত হয়, তেমনি কোনরূপ হেতু বা ক্রম না থাকিলেও কল্প ও কল্প-কার্য্যাদি সকল ব্রহ্মেতেই প্রকাশমান হইতেছে। চিদাকাশ আপনিই আপনাতে জগদনুভব করেন; সুতরাং কি পৃথ্বী, কি পর্ব্বত, কি লোক, কি স্পন্দনাদি, সকলই একমাত্র সেই চিদাকাশ মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। ব্যোম যেন ভিত্তিভূমি; তাহাতে এই জগচ্চিত্র চিন্ময় রঞ্জনদ্রব্যে চিত্রিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কাজেই এ জগৎকে প্রকৃত পক্ষে না উৎপন্ন, না বিনষ্ট, না উপশমিত, বা না ক্লিষ্ট কিছুই বলা যায় না। ফলে চিদ্রূপ জল জগদাকার উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় সমাকুল; হেথায় কবে কিরূপে কোন বস্তু উদিত বা অপহত হইবে? দৃশ্যাদি যাবতীয় বস্তুরই যখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে অসম্ভাবনা, তখন এ জগৎ যে শূন্যময়, ইহা যে একটা অলীক পদার্থ, উহার অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণই বিলুপ্ত, ইহা তো নিশ্চিতই। অতএব সেই মহাচিদাকাশেরই বা জগদাকারে অস্তোদয় সম্ভবিতে পারে কিরূপে? ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপারে বিচিত্র বাসনা-নুসারে সঙ্কল্পের বশে ক্বচিৎ শৈলশ্রেণীও আকাশবৎ এবং কদাচিৎ আকাশও শৈলবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই যোগিগণ

সম্বিৎরূপ সিদ্ধৌষধ-চূর্ণ ধারণ করেন এবং তাহারই সাহায্যে অর্দ্ধনিমেষ মধ্যেই এ জগৎকে আকাশ এবং আকাশকে ত্রিজগদাকারে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সিদ্ধসমূহের সঙ্কল্প-সম্ভূত অগণিত নগর যেমন মহাকাশমধ্যে বিকাশ পায়, তেমনি ব্রহ্মেই সহস্র সহস্র জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। পরন্তু জানিয়া রাখিবে,—সেই সকল জগৎই চিদাকাশ মাত্র। মহাজলধির জলাবর্ত্ত সকল পরস্পর মিশিয়া গেলেও তাহারা যেমন বিভিন্নরূপে অবস্থিত বলিয়াই প্রতীত, পরন্তু সে সকল যেমন জলাতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়, তেমনি সেই যে মহাচিন্ময় ব্রহ্ম—তাঁহাতেই মহাসৃষ্টি-সকল পরস্পরযুক্ত একবস্তু হইয়া ভিন্ন ভিন্নাকারে প্রতিভাসমান। যদি জ্ঞানের চক্ষে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, উহারা সেই চিদাকাশ ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছুই নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত এই যে, সিদ্ধ যোগী পুরুষেরা যেমন এক লোক হইতে দূরস্থিত লোকান্তরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন, লোকান্তর দর্শন সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। যেমন আকাশ-দেশে শূন্যময় বিবিধ বস্তু বিলোকিত হয়, তেমনি সেই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্মেই জগৎ ও ভূতবৃন্দ অবস্থিত দেখা যায়। চিদাকাশের যে জগদ্ভ্রান্তি, তাহা সহজ নিজ আমোদ-স্বরূপ; সুতরাং জানিবে,—স্ফটিকোপলের মধ্যে যেমন রেখাপ্রতীতি হয়, সেই রেখার ন্যায় উহা অলীক পদার্থ। সেইজন্য বলা যায়, এই ভূতবৃন্দ না উদিত, না অস্তমিত, কিছুই কখন হয় না। নানাজাতীয় পুষ্প-সৌরভ যেমন পরস্পর মিলিত রহিলেও অমিলিতের ন্যায় প্রতীয়মান, তেমনি ব্যোমময় জগৎপরম্পরা পরস্পর মিলিত হইলেও সিদ্ধ ভূমিবৎ যেন অমিলিতরূপেই অনুভূয়মান হয়। এই সমগ্র বিশ্বই সঙ্কল্পাকাশ; সুতরাং যে যে ভাবেই কেন অনুভব করুন না, সেইরূপেই তাহার অবস্থিতি হয়। কাজেই যাঁহাদের সঙ্কল্প ও মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল যোগী যে এ জগতের সূক্ষ্মতমত্ব উল্লেখ করেন, তাঁহাদের তাদৃশ উল্লেখ সত্যই বটে। পরন্তু হে শ্রোতৃগণ! আপনারা জানিবেন,—যাহা বাস্তব বিজ্ঞানমাত্র পরমার্থবাদ এবং দুঃখজনক দৃশ্য দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থবাদ, তাহাও অসত্য। আপনাদের স্ব স্ব সঙ্কল্পানুসারেই কেবল ঐরূপ অনুভবের সাফল্য। বৎস রাম! তোমার অন্তরে যে চিদ্‌ব্রহ্মের

প্রকাশনশক্তি নিহিত আছে, তাহাই জগদাকারে প্রকট হইতেছে। সুতরাং জল ও জলতারল্যবৎ এই জগৎ ও ব্রহ্মে কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ-ভিন্নতা নাই।

রামচন্দ্র! কি কাল, কি ব্রহ্মাণ্ড, কি চতুর্দ্দশ ভুবন, কি আমি, কি তুমি, কি ইন্দ্রিয়বর্গ, কি শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় এবং কি ভোগ্য বস্তুনিচয়ের উপভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া যে কিছু আছে, সকলই সেই অজ, অব্যয়, চিদাকাশময় ঈশ। অতএব কিরূপে উল্লিখিত বিষয়-রাগাদির সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? উহারা তো বাস্তবিক কিছুই নহে।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যে নয়ন ঐন্দ্রজালিক মায়াঞ্জন দ্বারা লিপ্ত হয়, সে যেমন আকাশে মহাগিরি ও গিরিমধ্যস্থ দরীপ্রভৃতি অবলোকন করে, তেমনি সেই চিদ্‌ব্রহ্মই নিজের মিথ্যা ভ্রমে বিবোধিত হইয়া জগৎ দর্শন করেন। এই বাহ্য ব্রহ্মজগৎ ভ্রান্তি-কল্পিত; ইহা এবং চিত্তবৃত্তির অনুসারী চিত্রিত জগৎ, এই উভয়ই প্রকৃত পক্ষে পরমার্থস্বরূপ। এই নিমিত্ত উক্ত উভয়কেই সমান বলিয়া বিদিত হইবে। ভিত্তিরূপ পটোপরি যে চিত্রময় জগৎ অঙ্কিত, তাহা যেমন বাস্তব পক্ষে ভিত্তি হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিময় অনুভব দ্বারা ভিন্নরূপেই বিবেচিত হয়, তেমনি এই বাহ্য জগৎও বস্তুগত্যা জ্ঞানময়, তাই জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিময়ী অনুভূতিবশতই জ্ঞানবহির্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। জ্ঞান সত্যস্বরূপ; কাজেই জগতের যে জ্ঞান-বহির্ভূততা, তাহাও যে জ্ঞানময় বলিয়া সত্যস্বরূপ, ইহাই নিশ্চয় বিজ্ঞেয়। এ জগতের সকলই জ্ঞানরূপ; কোনরূপ অসদ্বস্তুরই সত্তা কদাচ উপলব্ধ হইবার নহে;

সুতরাং অস্মদীয় মতের সহিত বিজ্ঞানবাদ ও বাহ্যার্থবাদের ঐক্য যথার্থই বিদ্যমান। আকাশ, অনল, অনিল, জল ও ক্ষিতি ইহারা ভ্রান্তিজ্ঞানে ক্ষুব্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও চিদাকারে বস্তুগত্যা অক্ষুব্ধ ও শান্তিময়; ঐ সকল আকাশাদিরূপে একমাত্র শূন্যময় ব্রহ্মসত্তাই সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। সেই সত্য সনাতন ব্রহ্মই সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী। যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, তৎসমস্তই তিনি; তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাঁহা হইতেই সকলের সমুদ্ভব; সুতরাং একমাত্র সেই সর্ব্বময় ব্রহ্মকেই নমস্কার করি। নিজের চিন্ময়তা নিমিত্ত দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তু যখন একত্ব উপগত হয়, দ্রষ্টৃচিৎ তখনই দৃশ্য বস্তুকে অনুভব করিয়া থাকেন। দৃশ্য চিন্ময় বলিয়াই চিৎ তাহার পরিজ্ঞানে সমর্থ; অন্যথা সেরূপ সম্ভাবনা হইত না। কেন না, চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ কখনই সম্ভাব্য নহে। দ্রস্টা, দৃশ্য, দর্শক সকলই যখন চিন্মাত্র-রূপময়, তখন নিখিল জগতের অনুভব-সাফল্য পরমার্থরূপেই নিশ্চিত। যদি ভ্রমের বশে বাস্তব চিদাত্মক দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক বলিয়া না প্রতীত হয়, উক্ত উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান যদি থাকিয়া যায়, তবেই অজ্ঞ দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তুসমূহের দর্শনাদি করিয়াও তৎসমুদায়ের যথাযথ রস গ্রহণে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এক খণ্ড প্রস্তরে ইক্ষুদণ্ড দর্শন ও মর্দ্দন করিলেও সে তাহার রসাস্বাদে অভিজ্ঞ হইতে পারে কি? জল জলরাশিতে নিমগ্ন হয়,—হইয়া যেমন তাহাতেই মিশিয়া যায়, তেমনি দৃশ্য বস্তুও দ্রষ্টার চিন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া উভয়েই একত্ব প্রাপ্ত হয়; তাই তাহার অনুভব হইয়া থাকে। নতুবা পরস্পরের সন্নিকটস্থ কাষ্ঠদ্বয়বৎ কাহারই কাহাকে অনুভব করিবার শক্তি থাকিত না। উভয় কাষ্ঠখণ্ডের কাষ্ঠত্বরূপে ঐক্য আছে; কিন্তু চিদংশে ঐক্য না থাকায় সে যেমন অন্য কাষ্ঠখণ্ডকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি যদি দৃশ্য পদার্থও চিংশ-বিরহিত সম্পূর্ণ জড় হইত, তবে চিদাকার দ্রষ্টা কদাচ তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইত না। কথা হইতে পারে, উভয় কাষ্ঠ খণ্ড হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের জড়ত্ব-বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে; তাই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে কাহারই কাহাকে অনুভব করিবার শক্তি নাই। এরূপ অবশ্য তুমি মনে করিও না; কেন না,

একথা সকলেরই বিদিত আছে যে, কাষ্ঠ যেমন অচেতন জড় পদার্থ, অন্য অচেতন পদার্থও অবিকল তাহারই তুল্য। উহাদের তারতম্য আছে বলিয়া কেহই বিদিত নহে। অতএব সমগ্র দৃশ্য বস্তুই চিদাকার দর্শকসহ তুল্য চিদাত্মক বলিয়া দর্শক তাহা দেখিতে পায় না।

এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই যখন তুল্য চিদাত্মক, তখন দৃশ্যান্তঃপাতী জল ও অনিল প্রভৃতি এবং পাঞ্চভৌতিক দেহস্থিত বুদ্ধি ও প্রাণাদি সকলই যে সেই মহাচিৎ ব্রহ্মস্বরূপ, সে বিষয়ে আর সন্দেহাবসর কি আছে? প্রাণাদিরূপে ভাবনা করা হয় বলিয়াই প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির সত্তা; পরন্তু উক্ত ভাবনাও চিত্তের চমৎকৃতি বৈ আর কিছুই নয়। ঐ চিচ্চমৎকারিতার উদয় কোথা হইতে? উহা স্বতই সমুদিত হইয়া থাকে। এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিময় জগদাকারে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই বিরাজমান। জানিবে,—যেমন শুক্র ও বটাদি বীজ, তেমনি আত্মাও প্রসবশক্তি যোগে সমাক্রান্ত। সুতরাং যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সকলই সেই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। অতএব বস্তু-পরম্পরার যে যে কিছু ভেদকল্পনা করা হয়, তাহা সম্পূর্ণই অসত্য। বটাদি নিখিল বীজের অভ্যন্তরে যে যে সারস্বরূপ সূক্ষ্মতম অংশ নিহিত আছে, তাহারই কাণ্ড শাখা প্রভৃতি হইতে পুনরায় সেই সেই বীজ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল সারাংশের অবস্থান কোথায়? জানিবে—উহারা একমাত্র ব্রহ্মেতেই অবস্থিত। যে অংশ যে অংশ হইতে সূক্ষ্ম, তাহাই সেই স্থূলাংশের কারণ আর যাহা স্থূলাংশ, তাহাই কার্য্যরূপে প্রথিত। ঐ যে কারণরূপে নির্ণীত সূক্ষ্মাংশ, উহাই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মময়াত্মা। উহা হইতেই সেই সেই স্থূল পদার্থের আবির্ভাব। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই যে নিখিল পদার্থাকারে বিরাজমান, এ কথা নিশ্চিতই। এই জগৎ যে যেভাবেই দেখুক, ইহা সেই একাদ্বয় ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়। সুবর্ণ শত শতাকারে সুগঠিত হউক, সেই সেই আকারে যেমন সুবর্ণত্ব ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তেমনি তুমি আমি ইত্যাদি নিখিল জগদ্বস্তুই ব্রহ্মময়; ইহাতে ব্রহ্মত্ব ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্তা নাই। তোমার পার্শ্বস্থ নিদ্রানিমগ্ন ব্যক্তি যেমন স্বপ্নাবস্থায় জলদবৃন্দ অবলোকন

করে ; পরন্তু সেই অন্যাবলোকিত জলদবৃন্দ সহ তোমার যেমন কোনই সম্বন্ধ থাকিবার নয়, জানিবে—তেমনি ব্রহ্মরূপ আমি—আমারও শূন্য-স্বরূপ সৃষ্টি-প্রলয়াদির সহিত কোনই সংস্রব নাই। বিশদ কথা, ব্রহ্ম সর্ব্বময় বটেন ; কিন্তু বিবর্ত্তের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণই নির্লিপ্ততা। আকাশে মালিন্য ও গান্ধর্ব্বী সেনা, এই উভয়ই যেমন কল্পনা, কল্পনা ভিন্ন উহাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না, ফলে সকলই যেমন আকাশময়, তেমনি এই জগতে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মাকাশ। পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তু-পরম্পরা কেবলই কল্পনা মাত্র। ভূগর্ভ-গত বট-বীজ যেমন জলসিক্ত হইয়া প্রকাণ্ড বট-বিটপিরূপে প্রকট হয়, তেমনি অন্তরে ভ্রান্তিময় সঙ্কল্প পুষ্পাকারে অবস্থানপূর্ব্বক পশ্চাৎ সুবিশাল জগৎ-ফলাকার পরিগ্রহ করে। যিনি অহংজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সহ ঐক্য লাভ করিয়াছেন, তথাবিধ ব্রহ্মানন্দময় জ্ঞানীর চক্ষে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ পদার্থ। এই ত্রিলোক মধ্যে এমন তো কোনই পদার্থ দেখি না, যাহা মহাত্মা ব্যক্তির লোভোৎপাদনে সক্ষম হয়। তাঁহার নিকট এই সমগ্র বিশ্বই একগাছী সূক্ষ্ম লোমাংশের ন্যায়ই অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানী জন যথায় তথায় থাকুন, যেখানে সেখানেই গমন করুন, তাঁহাদের দ্বৈত সঙ্কল্প সকল কোথাও সমুদিত হইবার নহে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই যদীয় জ্ঞানে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান, তথাবিধ ব্রহ্মতন্ময়তা-মগ্ন মহাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি কোথা হইতে কিরূপে আর প্রাদুর্ভূত হইবে? যাঁহার নিশ্চেষ্টতা সকল বিষয়েই আছে ; কোন কিছুতেই ইতরবিশেষ জ্ঞান যিনি করেন না, ঐশ্বর্য্য এবং দারিদ্র্য, উভয়ই যাঁহার নিকট তুল্য মূল্য, তথাভূত মহাত্মার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারে, এমন সামর্থ্যই বা কাহার আছে? যিনি সর্ব্বত্র সমানদর্শী ; নির্ম্মল জ্ঞানাকাশই যাঁহার স্বরূপ, তাদৃশ মহাপুরুষের আত্মীয় স্বজনাদির মরণ কোনরূপ কারণেই হয় না। অথবা কোনরূপ জীবন-কারণেই কাহারও জীবন সম্ভবে না। অর্থাৎ তদীয় আত্মীয় জনের মরণ হউক, বা জীবন-প্রাপ্তি হউক, কোন কিছুতেই তাঁহার বিষাদ বা হর্ষোদয় পরিদৃষ্ট হয় না। অজ্ঞ জনের হৃদয় ভ্রান্তিময় ; ভ্রান্তির বশেই তাহাতে মৃগতৃষ্ণাময় উভয়

নদীকূলের ন্যায় অলীক জনন-মরণাদির উপলব্ধি হয়। যে কালে আমরা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করি, তখনই আমাদের ভ্রম বিঘটিত হয়। আমরা তখনই বুঝিতে পারি যে, এ জগতে বাস্তব পক্ষে পরীক্ষক কেহই নাই। এখানে জনন কিম্বা মরণ একান্তই ভ্রান্তি-নিদান; সকলই সেই একাদ্বয় অবিনশ্বর ব্রহ্মময়। যিনি সর্ব্ব দৃশ্য হইতে উপরত হইয়াছেন, পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মারাম মহাপুরুষ; সেই মহা-পুরুষই ভবসাগরের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি থাকিয়াও না থাকারই মত। যদীয় মনোবেগ অপগত এবং যিনি পরম শান্তি প্রাপ্ত, সেই ব্রহ্মানন্দময় নির্ম্মলমনা সাধু ব্যক্তিই মনীষিগণের মতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত। এই নিখিল দৃশ্য বিশ্ব যদীয় প্রীতি উদ্ভাবনে সমর্থ নহে, যিনি আকাশের ন্যায় নিশ্চলাকার, সাধু-পুরুষেরা বলেন,—তিনিই প্রকৃত মুক্ত পুরুষ। ফল কথা এই যে, বিচার না থাকিলেই অহংপদার্থের সদ্ভাব আর যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেই ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যে, এই 'অহং' পদার্থ অকিঞ্চিৎকর; উহা কিছুই নহে। যদি বিচার করিতে করিতে 'অহং' বস্তুর অভাব-ঘটনা হইয়া যায়, তবে তো জগৎ বা সংসার এ সকলও কিছুই কিছু নয়। চিদাকাশ নিজ চৈতন্যের অন্যবিধ অনুভব করিতে থাকেন; তাই একমাত্র তিনিই বুদ্ধি প্রভৃতি আকারসম্পন্ন হইয়া এই দৃশ্যাদি বিবিধ বস্তুময় জগৎ অনুভব করেন। তোমার মন সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে বিরত হউক, সমস্তই তুমি আত্মময়রূপে অবলোকন করিতে পারিবে। তখন এইরূপ হইবে যে, তুমি নিয়ত যাহা কিছুর অনুষ্ঠান করিবে, সে সকলই তোমার কাছে কল্যাণময় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

রামচন্দ্র! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, কিম্বা যাহা কিছু তপস্যা কর, জানিবে,—সকলই সেই অব্যয় শিব-ময়। বাস্তব পক্ষে বলিতে কি, তুমি, আমি, দিক্, কাল, ক্রিয়া, আকাশ বা লোকালোকাদি যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হয়, সমস্তই সেই শিবময় চিদাকাশ-ব্যাপ্ত। অধিক কি, দৃশ্য বস্তুসমূহের দর্শনই বল, মননই বল, ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক কথাই বল, অথবা

জরামরণাদিরই উল্লেখ কর, সকলই শিবময় মহাচিদাকাশ বৈ আর কিছুই নয়।

হে রঘুবর! তুমি সংশয়, অভিপ্রায়, ইচ্ছা বা মননাদি পরিত্যাগ কর। তোমার অহংজ্ঞান অপগত হইয়া যাউক। তুমি নির্ব্বাণপদে অধিরূঢ় হইয়া মুনি হও। সেই অবস্থায় যেভাবে থাকিতে হয়, থাক। তোমার যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাতে যেন ইচ্ছা বা মননাদি কিছুই থাকে না। তুমি তোমার অন্তঃকরণকে সে সমুদায় হইতে শূন্য রাখিবে। এইরূপ করিলেই পবন যেমন স্পন্দাস্পন্দ যোগে যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মলেপ হইতে পরিমুক্ত, তুমিও তেমনি কর্ম্মলেপ-হীন হইতে পারিবে। যন্ত্র দ্বারা খোদিত করা গেল, কাষ্ঠময়ী প্রতিমা প্রস্তুত হইল। সেই প্রতিমার যেমন বাসনাদি কিছুই থাকিবার নয়, তেমনি তোমার চেষ্টাও শাস্ত্রোপায়ে সংশোধিত হইয়া বাসনাদি হইতে বর্জ্জিত হউক। তুমি বাসনাদিশূন্য-মনে তোমার সেই চেষ্টার অনুরূপ কার্য্য করিয়া যাও। পিতা মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে বাহ্যতঃ তুমি দর্শন করিতে থাক; কিন্তু সেই দর্শনে তোমার যেন অনুরক্তি বা অননু-রক্তি কিছুই থাকে না। চিত্র-ন্যস্ত দীপের ন্যায় এরূপ ভাবে তুমি থাকিবে, যেন তোমার স্বজনাবলোকনের সত্তা বা অসত্তা কেহই নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারে না। বর্ত্তমান বিষয় ভোগে যাঁহার অনুরাগ নাই, ভাবী বিষয়ভোগেও যাঁহার নিশ্চেষ্টতা, তথাবিধ বাসনা-বিরহিত সাধু পুরুষের সুখবিশ্রাম-হেতু সৎশাস্ত্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাই বলিতেছি, যিনি ব্যবহার-কার্য্য-জনিত কোনই অভিসন্ধি রাখেন না, যাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল হইয়াছে, তথাবিধ সাধু পুরুষ সৎশাস্ত্রেরই অনুসরণ করিবেন। এইরূপ সৎশাস্ত্রানুশীলনই তাঁহার সাধুতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হওয়ায় যদীয় সংসারভ্রম নিরস্ত হইয়াছে, তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবহারে নিরত রহিলেও তাহাতে তাঁহার কোনই সঙ্কল্প থাকে না। কেন না, তিনি সঙ্কল্পকেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এই জন্য বলা যায়, তাঁহার সঙ্কল্পসত্তা কিছুমাত্রই নাই। মুকুরে যেমন শ্বাসজন্য মালিন্য জন্মে, তেমনি ভ্রান্ত লোকেরই ভ্রান্তি জন্য অহম্ভাবরূপ মালিন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, কোনরূপ উপায়ের সংস্থান বিনাই তাঁহার 'অহং' জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। যদি বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করা হয়, তথাচ তাহার উপলব্ধি হইবার নহে। যদীয় চিত্তাবরণ লয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ সর্ব্ববিষয়ক চেষ্টাবর্জ্জিত পুরুষের আত্মা সর্ব্বদাই ব্রহ্মরূপ পীযূষরসে পরিব্যাপ্ত। নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দই তাঁহার রূপ; সেই রূপেই তিনি বিরাজ করিতে থাকেন। যদীয় অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, প্রবল পবনের ন্যায় সমস্ত সন্দেহরূপ অন্ধকারময় মিহিকাজাল যিনি ছেদন করিয়াছেন, পূর্ণচন্দ্র যেমন গগনতল উদ্ভাসিত করে, তেমনি তাঁহা দ্বারাও তদধিষ্ঠিত প্রদেশ প্রদ্যোতিত হয়। যাঁহার সংসার নাশ পাইয়াছে, সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে, কোনও রূপ চিত্তাবরণই যাঁহার নাই, যিনি ব্রাহ্ম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত শারদাকাশবৎ নির্ম্মল হইয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানী জনকে সকলেই সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া অবগত হন। ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত সমীরণের ন্যায় সেই সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত শান্ত শীতল-চিত্ত জ্ঞানী পুরুষ স্পর্শ দ্বারা সকলকেই পূত করিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বন্ধ্যার পুত্র দর্শন হয়, তেমনি অসদ্‌জ্ঞানের ফলেই স্বর্গাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জগৎ বাস্তব পক্ষে অসত্য; তথাচ ইহার যে অনুভব, তাহা মাত্র অসদ্ভ্রম-জ্ঞানেরই স্বভাব বৈ আর কিছুই নয়। এই সংসার অসত্য; এখানে বাস্তব পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন্ সত্য বস্তুর সম্ভাবনা? ফলে তিনিই সত্য; তিনিই নিত্য বিরাজিত। জগৎ কি? মুক্তিই বা কি? এই দুই শব্দই তো

বন্ধ্যাপুত্রবৎ একান্ত অলীক পদার্থ। এ জগতের সত্যত্ব ব্রহ্মরূপেই জানিতে হইবে। এই জগৎকে কেহই নির্ম্মাণ করে নাই। ইহা চিন্তা-বিষয়ের অতীত ও আধারবর্জ্জিত। এ জগৎ যদি ব্রহ্মরূপ না হইত, তবে কেই বা আমি? আর কিরূপেই বা এই জগতের উপলব্ধি? সদাত্মরূপে বিশ্রান্তি হইলে ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহাতে 'অহং'বোধ, জগৎ ও দুঃখাদি সকলই অন্তর্হিত হয়। তখন কেবল একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই প্রকাশমান হইতে থাকেন। বুধগণ বলিয়া থাকেন, চক্ষুর সাহায্যে ক্ষণমধ্যে লক্ষ যোজন দূরে গমনকালীন পথে যে বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের সুবিমল চিন্ময় রূপ প্রকাশ পায়, যাহার আকার নিস্পন্দ পবনপ্রায়, যাহা অনন্ত আকাশ-কোশ-সদৃশ, বুদ্ধির অগোচর, শান্ত প্রকাশময় ও সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ, তাহাই সদ্‌ব্রহ্মের স্বভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যাহার চিত্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে, তথাবিধ বিবেকশালী ব্যক্তিগণের জগদ্‌ভ্রম গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন বোধ থাকে না এবং স্বপ্নাবস্থা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সুষুপ্তি বোধ অবিদ্যমান, এ কথা সর্ব্বজনেরই সুবিদিত আছে। সুষুপ্তি ও স্বপ্নকালে যেমন সুষুপ্তি ও স্বপ্নবোধের বিপর্য্যয় ঘটনা সম্ভবে না, সৃষ্টি ও নির্ব্বাণভ্রমও সেইরূপই। ফল কথা এই যে, যাহার জগদ্‌জ্ঞান আছে, তাহার নির্ব্বাণ জ্ঞান হইবার নহে আর যিনি নির্ব্বাণপদে সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারও জগদ্‌জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা এই, স্বপ্ন বল, সুষুপ্তি বল, সৃষ্টি বল, আর নির্ব্বাণ বল, কিছুই কিছু নয়। উহাদের স্বরূপ কেবলই ভ্রমস্বভাব। ফলে সকলই সেই একাদ্বয় সত্য সনাতন শান্ত ব্রহ্ম মাত্র। যাহা ভ্রান্তি, তাহা একান্তই অসত্য বস্তু; কেন না, যদি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করা যায়, তাহা হইলেই উহা আর উপলব্ধিগোচর হয় না। বস্তুতঃ যাহা শুক্তিকা-রজতবৎ অলীক বস্তু, তাহার প্রাপ্তি কিরূপেই বা সম্ভবপর? যাহা নাই, যাহার প্রাপ্তি অসম্ভাব্য, সেই ভ্রান্তির সদ্ভাব কিরূপেই বা হইবে? এ কথা সত্যই যে, যদি প্রকৃতরূপে দেখা যায়, তবে ভ্রান্তিরও অনুভূতি হয় না। যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাই অনুভূত হয়; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব লভ্য হইবার নহে।

রাম! ব্রহ্মরূপ বস্তুর স্বভাব একইরূপ; জানিবে,—তাহা নানাকার না হইয়াও নানাকারে বিকাশমান। যাহা হউক, এ ব্যাপারে অনর্থক তর্ক বিতর্ক করিয়া ফল কিছুই নাই। যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, সকলই সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাব মাত্র; যদি এইরূপই বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই পরম শান্তি, অন্যথা ঘোর সংসার-ক্লেশ অনিবার্য্য। তুমি আপন বুদ্ধিতে অন্তরে এইরূপ বিচার কর,—করিয়া যাহা ভাল বুঝ;—কর। পণ্ডিতমণ্ডলীর এই কথাই প্রশস্ত যে, যেমন সূক্ষ্ম বীজের অভ্যন্তরে স্থূলতম বৃক্ষ বিরাজিত, অমূর্ত্ত ব্রহ্মে মূর্ত্ত জগতের অবস্থিতি সেইরূপই। জানিবে—জলে যেমন দ্রবত্ব থাকে, তেমনি ব্রহ্মেতেই রূপ, আলোক, মনন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। প্রকৃত কথা এই যে, রূপাদি সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাকাশময় বৈ আর কিছুই নয়। যেমন মূর্ত্ত পদার্থ স্ব স্বরূপ অবয়বনিবহ দ্বারা নানা ক্রিয়া করে, তেমনি চিদাকাশও স্বস্বরূপ ভূতবৃন্দের সহযোগে বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন। পরন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কোন কিছুরই তিনি কর্ত্তা নহেন। বাদ্যযন্ত্র জড় পদার্থ, তাহা বাদক ব্যক্তির চেষ্টা-চালিত হইলেই তাহা হইতে যেমন শব্দ নিঃসৃত হয়, তেমনি তুমি আমি প্রভৃতি জড় হইয়াও চিদাত্মাধিষ্ঠিত বলিয়াই অর্থভাবাদিময় অহমিত্যাদি শব্দ আমাদেরও উচ্চারিত হইয়া থাকে। আপাততঃ প্রকাশ পাইতে থাকিলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে যাহার সত্তার অভাব হইয়া পড়ে, তাহার সত্তা কোন কালেই নাই। অতএব এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ইহাকে আর ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না; কাজেই এই নিখিল বিশ্বই যে ব্রহ্মময়, সে পক্ষে আর সন্দেহাবসর নাই। একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মে বিরাজমান। যাহারা জগৎস্বপ্ন দেখে, তথাবিধ স্বাপ্ন পুরুষদিগের কদাচ আত্মায় অস্তিত্ব নাই। অতএব জানিবে,—অস্মদাদির ব্রহ্মভূত আত্মায় আকাশকুসুমের ন্যায় কোনরূপেই তাহাদের অবস্থান নাই। পবনে যেমন স্পন্দন, তেমনি ঐ সমস্ত স্বপ্ন পুরুষ অবশ্য স্বস্বরূপ স্বস্বব্যবহার সহকারে অস্মদাদিগত চিৎপ্রদেশেই অবস্থিত, তাহাদের অস্তিত্ব আকাশকুসুমের ন্যায় মাত্র জড়াংশেই নাই; ইহাই বটে সুনিশ্চয়। কেন না,

তাহারা এবং তাহাদের স্ব স্ব ব্যবহার সকলই সেই শান্ত ব্রহ্মাকাশস্বরূপ। অতএব প্রত্যগাত্মস্বরূপ আত্মায় ব্রহ্মের সত্তা নিশ্চিতই। ঐ সকল স্বপ্নপ্রায় পুরুষেরা স্বপ্নপ্রায় ভ্রমে পড়িয়া আমাকেও বশিষ্ঠরূপে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন সত্য পদার্থ বলিয়াই জ্ঞান করে। কিন্তু আমি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা স্পষ্টই দেখিতেছি, সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নপ্রায় ঐ সকল পুরুষেরা একান্তই অসত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন তাহাদের অন্য সত্তার সম্পূর্ণই অভাব। আমি তাহাদের মধ্যে যে কার্য্য ব্যবহার করি, জানিবে,—তাহা ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মাবস্থান। ফল কথা এই যে, সেই সকল পুরুষ, আমি এবং আমার বা তাহাদের কার্য্য ব্যবহার, সকলই সেই ব্রহ্মময়। ঐ স্বপ্ন-পুরুষেরা জগৎ যে ভাবেই দেখে, দেখুক, তাহাতে উপচয় অপচয় কিছুই আমার নাই। আমি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্মে আমার বশিষ্ঠরূপ সত্তা নাই। এই সমগ্র জগদ্‌বিস্তারই ব্রহ্মসত্তা। বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্র প্রভৃতির স্বতন্ত্র সত্তা একান্তই অসম্ভব কথা;—ইহা নিতান্তই ভ্রমের খেলা। আমি তোমায় বশিষ্ঠরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছি বটে ; কিন্তু উহা কিছুই নহে। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, মদীয় বশিষ্ঠরূপতা এবং আমার এই উপদেশগর্ভ বাক্য-পরম্পরা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র। ফলে, তোমারই উপকার হইবে বলিয়াই, উহা যেন ব্রহ্ম হইতে পৃথগাকারে প্রকট হইতেছে। দুঃখাদি যত কিছু বিরুদ্ধ বস্তু আছে, তৎসমুদায়কেই যিনি অবিরুদ্ধ বলিয়া ধারণা করেন, আত্মা যাঁহার শুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের হৃদয়ে ভোগ বা মোক্ষের ইচ্ছা মোটেই প্রকাশ পায় না। মানবেরা ভববন্ধনরূপ কদর্থনা প্রাপ্ত হয় ; তাহাদের মোক্ষলাভার্থ ক্রমিক অভ্যাসরূপ ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়া দেখ, ঐরূপ কদর্থনা বা ক্লেশ-ভোগাদিও ব্রহ্মস্বরূপ বৈ আর অন্য কিছুই নহে। তবে যে তোমার নিকট ঐ সকল বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহা তোমার মোহেরই প্রভাব। গোষ্পদে মহাসাগরের ভ্রমের ন্যায় তোমার ঐ ভ্রম একান্তই মিথ্যা মাত্র। মোক্ষ-ব্যাপার সংসার-দুঃখের শান্তিজনক এবং স্বীয় ব্রহ্মভাবের সাধক ; অপার ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধবাদি অথবা যাগ-যজ্ঞাদি কোন কিছুই ঐ বিষয়ে কোন উপকার-ক্ষম নহে। জলে তৈলবিন্দু পড়িলে তাহা যেমন নানাবর্ণময়

চক্রবৎ ধারণ করে, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই চেত্য পদার্থের সঙ্কল্প-কল্পনায় সত্বর জগদাকারে প্রকাশমান হয়। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ হইলে, উহা যেমন হাস্যজনক মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, বিবেকী ব্যক্তির নিকট অহম্ভাব বা জগৎপরম্পরাও সেইরূপই। ঐ জগৎ সকল পূর্ব্বোল্লিখিত ভূমিকাভ্যাসের যোগে এরূপভাবে লয় প্রাপ্ত হয় যে, সে কালে আর 'অহং'ভাব বা সংসার—কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। অবশেষে থাকিতে কেবল মাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মভাব যেন বিভাকর; যেরূপে উহার উদয় হয়, ভোগান্ধকার সেইরূপেই অপগত হইয়া যায়। সে কালে কোনওরূপ অসৎ পদার্থেরই অনুভব হয় না।

এইভাবে ভোগ-বাসনারূপ তিমিরস্তোম যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখন বুদ্ধিপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গও মোহবিহীন হয় এবং স্থূল দেহাদির অধ্যাস-শূন্য হইয়া পড়ে। তৎকালে উহারা উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানে এরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় যে, প্রদ্যোতিত প্রদীপ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের ন্যায় সর্ব্বদেশ ব্যাপ্ত করতঃ ব্রহ্মভাবে অতীব দীপ্তি পাইতে থাকে।

উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মনীষিগণ বিদিত আছেন,—রূপ-জ্ঞান, মনোবৃত্তি, ভাবনা ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানই এই কৃত্রিম বাহ্যাভ্যন্তর সমস্ত বস্তুর স্বরূপ। অপরিচ্ছিন্ন অকৃত্রিম জ্ঞান যখন স্বীয় সত্তার তিরোধায়ক অবিদ্যা-রূপ দেহে পরিচ্ছিন্নাকারে প্রকট হন, এই সৃষ্টিবিস্তার সেই কালেই ভ্রান্তি-বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অপিচ যে কালে তিনি পরিচ্ছিন্নভাব দূরে পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় শান্তিময় স্বভাবে অবস্থান করেন, সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নপ্রায় এই জগৎরূপ দৃশ্য তখনই প্রশমিত হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! বিষয়ভোগই সংসারে বিষম রোগ, বন্ধুবর্গই কঠোর বন্ধন

এবং অর্থ কেবল অনর্থেরই মূলীভূত ; এইরূপে তুমি আপনা হইতে বিচার-পরায়ণ হও,—হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাও। আত্মার যাহা অস্বাভাবিকী দশা, তাহারই নাম সৃষ্টি ; আর যাহা স্বাভাবিকী দশা, তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। বৎস ! তোমায় বলি, তুমি তাঁহার স্বাভাবিকী দশাতেই উপনীত হইয়া পরম আকাশরূপে বিরাজ করিতে থাক ; যাহা প্রকৃত শান্তি, তাহাই লাভ কর। অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিও না। তুমি অন্তরে অন্তরে এইরূপই ভাবিতে থাক যে, আমি আপনাকেও বুঝি না ; এই দৃশ্যমান জগদ্‌ভ্রমও দেখিতেছি না ; যিনি সেই শান্তিময় পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁহাতেই প্রবেশ করিতেছি। অধিক কি, সেই নিরাময় ব্রহ্ম আমিই। হে রাঘব ! তোমার দৃষ্টিতে সমস্তই তুমি ; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সকলই শান্তিময়—সকলই কেবল পরমাকাশ ; ইহাতে 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ভেদ-ভিন্নতা নাই। পবনে যেমন স্পন্দধর্ম্ম, তেমনি তুমি এই রূপ-রসাদি মনোময় বিভ্রমসমূহ—সেই পরমাকাশময় ব্রহ্মেই বিলোকন করিতেছ। ঐ বিভ্রম সকল তোমার নিকট যথাযথ বলিয়াই বোধ হইতেছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা কিছুই নহে। যিনি নিজেকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝেন, এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ তিনি অনুভব করেন না। যিনি ভাবেন,—আমি নিজেই সৃষ্টিময়, ব্রহ্মবস্তু যে কি, তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সুষুপ্তিদশায় উপনীত হইয়াছে, সে আর তখন স্বপ্ন দর্শন করিতে পারে না ; আর যে ব্যক্তি সুপ্ত মাত্র, তাহার পক্ষেও সুষুপ্তির অবস্থা অনুভব করা অসম্ভব। যাহার বুদ্ধি প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি স্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্ম এবং জগতের স্বরূপ একই মাত্র প্রকাশরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তিনি সকলই একমাত্র আত্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন। শরতের মেঘমালা যেমন ক্রমশঃ গগনগাত্রে লীন হয়, তেমনি বিশুদ্ধাত্মা যোগী পুরুষ ক্রমে ক্রমে শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। মনে কর, একটা যুদ্ধঘটনা স্মৃতি বা কল্পনার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, উহা উদ্দীপনার বস্তু হইলেও ফলে যেমন অকিঞ্চিৎকর ভ্রম মাত্র বৈ আর কিছুই নয় ; তেমনি তুমি আমি ইত্যাদি করিয়া যাবতীয় জাগতিক ঘটনাপরম্পরাও ভ্রান্তি মাত্র,

ইহাই নিশ্চয় বুঝিও। এই যে মহতী মায়া পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহা আত্মপদে অবস্থিত নহে। ইহার যে কেহ দ্রষ্টা আছে, তাহাও নহে; ইহা না শূন্য, না অশূন্য, কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভ্রান্তি মাত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আত্মার অস্বাভাবিকী অবস্থা—'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি প্রকার। এই অবস্থাকে তুমি তদীয় স্বাভাবিকী অবস্থা—শুদ্ধ চৈতন্যে উপনীত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাও। এই অবস্থাকে নির্ব্বাণ-দশায় উপনীত করা প্রবুদ্ধবুদ্ধিরই কর্ত্তব্য। কেন না, যথায় প্রবুদ্ধবুদ্ধি, সেইখানেই বিষয়বৈরাগ্য;—যেখানে দিবাকর, সেইখানেই আলোকচ্ছটা। বিষয়বৈরাগ্য হইতেই আত্মার অস্বাভাবিকী দশার নিবৃত্তি হয়। এই জগৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার; ইহার না আছে আধার, না আছে কর্ত্তা, না আছে উপকরণ, না আছে কারণ, না আছে দ্রষ্টা, না আছে দৃশ্যরূপ, অথচ এ জগৎ আপনা হইতেই প্রতীয়মান। পরব্রহ্ম অনাময়, অব্যয়; তিনি শান্তিময় স্বীয় সত্তাতেই বিরাজমান। জীবগণ চিদ্‌বৈচিত্র্যরূপ; তাহাদের কল্পনারূপ নৃত্যমণ্ডপ—আকাশে কত যে জগৎরূপ চিত্তপুত্তলি নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। ঐ আকাশরূপ জগৎ-চিত্ত-পুত্তলিকাগুলি পরমাণুসদৃশ আকাশে নানাবিধ রসভাব-বিকার প্রদর্শন করিয়া নিত্য নবীনভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। ঐ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার গ্রীবাদেশ—ব্রহ্মলোক; উহার ভুজবল্লী· দিঙ্মণ্ডল; চরণ—পাতালতল; শিরোভূষণ—ঋতুকালীন কুসুমস্তবক; চঞ্চল চক্ষু—সদা ঘূর্ণমান চন্দ্র সূর্য্য; গাত্ররোম—নক্ষত্ররাজি, দেহবল্লী—সপ্তলোক; বসন—বিমল অম্বর; বলয়—সাগরবেষ্টন; লোকালোক—কাঞ্চীদাম; এই যে জীবনিবহ

ভৌতিক দেহ রক্ষার জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে, ইহারা উহার নিশ্বাস-মারুত; উহার হার ও কেয়ূর ভূষণ—বন-উপবন; উহার বাক্য সকল—বেদ-পুরাণ; এবং সদসৎ কর্ম্মের ফলভূত যে সুখ-দুঃখ, তাহাই উহার বিলাস-বিভ্রম। এই যে জগৎ-চিত্ত-পুত্তলিকার নৃত্য সম্মুখে দেখা যাইতেছে, ইহা ব্রহ্মরূপ জলপ্রবাহের দ্রবাংশ। নিদ্রাকালে সুষুপ্তি অবস্থার অনুপস্থিতি যেমন স্বপ্ন-কারণ, তেমনি অস্বাভাবিকী অবস্থায় অবস্থিত চিৎই ঐ জগৎ-চিত্র-পুত্তলিকার নৃত্যের কারণ; ইহাই শ্রুতির উপদেশ।

এই জন্যই বলিতেছি,—রামচন্দ্র! চিতের যাহা প্রকৃত স্বভাব, তুমি তাহাই চিন্তা করিতে থাক। জাগ্রদবস্থায় অজ্ঞানের বিনাশ-ঘটনায় এবং সমস্ত দ্বৈতভাবের উপশমে অসুষুপ্ত ও সুষুপ্ত হইয়া অনাকুলভাবে অবস্থিত হও। এই ভ্রমজনক স্বপ্ন আর কখনই অবলোকন করিও না। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জাগ্রদবস্থাতেও যে বাসনাবর্জ্জিত ও বিষয়ানুরাগ-বিরহিত হইয়া সুষুপ্ত জনবৎ অবস্থিতি, তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাই আত্মার স্বভাব। এই স্বভাবের নামই আত্মমুক্তি। যদি এইরূপ স্বভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে পারা যায়, তবেই জগদাকার-বিরাজিত ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ কেবলরূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ হইবে। তখন মনে হইবে, সেই ব্রহ্ম—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, রূপ, আলোক ও অনলাদি ভাব হইতে শূন্য বিশুদ্ধ—স্বরূপ। তাঁহাতে দ্বিত্ব, একত্ব নাই; তিনি পরিপূর্ণ কমনীয় বিশুদ্ধ; তথাভূত ব্রহ্মেই দ্বিত্বৈকত্ব-হীন পূর্ণ কমনীয় ব্রহ্ম অখণ্ডাকারে বিরাজিত। যে সত্য বস্তু সৃষ্টিস্বরূপে অবস্থিত, তিনি অধুনা আত্মস্বরূপেই বিভাত। ঐ আত্মা পাষাণবৎ অতি কঠোর, আকাশ-বিবরবৎ প্রকাশময় ও রত্নের অভ্যন্তরদেশের ন্যায় নিবিড় হইলেও উহাকে আকাশবৎ আকাশময় বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। তিনি জলাদিগত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ববৎ জগদ্ভাবের পরিণামে ক্ষুব্ধ হইয়াও অক্ষুব্ধ এবং অসৎ বা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও সৎ বা নিত্য পদার্থ। চিত্ত যখন তাঁহাতে মিশিয়া যাইবে, ঐ জগৎ তখন কল্পনার সামগ্রী বলিয়াই অনুভূত হইবে। সঙ্কল্পজনিত নগর যেমন সঙ্কল্প হইতে অভিন্ন, তেমনি এই জগৎস্বরূপ আভাসও পরমার্থ ব্রহ্ম হইতে

অপৃথক্। যেমন চতুরস্র কনকপীঠ, তেমনি এ জগৎ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও সুবিস্তৃত। ইহাকে এইভাবে দেখা গেলেও ইহা যে প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে, একথা নিশ্চিতই। যদি যথাযথভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা যে অব্যয় শান্তিময় পরব্রহ্ম, এইরূপেই লক্ষিত হয়। যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, যিনি অজর, অনাময়, একরূপ,—সেই ব্রহ্মই নিয়ত উৎপত্তি-নাশময় নানা কল্পনা-কলিত জগদাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখন এই সমস্ত প্রপঞ্চই লয় পাইয়া যায়। সে কালে মাত্র ব্রহ্মই স্বীয় কেবল-স্বভাব উপগত হইয়া প্রশান্ত ঘন চিদাকাশাকারে উপলভ্যমান হইতে থাকেন।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আত্মা শান্তিময় কূটস্থ; তাঁহাতে সৃষ্টির উপক্রমে যে চিত্তভাবের স্ফুরণ হয়, তাহা ঐ স্বপ্রকাশ চিদাত্মা হইতে অভিন্ন। কেন না, তাহাতে নাম, রূপ বা উপাধি কিছুরই সদ্ভাব নাই। তাহা পর-ব্রহ্মাকার নির্ম্মল; সুতরাং এই চিত্তাধীন জগৎও ঐ চিৎ হইতে অপৃথক্। কাজেই সৃষ্টি প্রভৃতির সম্ভাবনা কোথায়? চিত্ত-সূর্য্য অস্তগত হওয়ায় ঐ যে কূটস্থ প্রত্যক্ আকাশে রূপাদি বাহ্য সম্বিৎ মৃগতৃষ্ণাভ্রমবৎ স্ফুরিত হইতেছে, উহা চিত্ত-সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তমিত হইয়া যায়। যাবৎ চিত্ত, তাবৎ এই জগৎ; কাজেই চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এই জগৎও যে ব্রহ্ম, তাহা মানিতেই হইবে। কাহারও সাহায্য নাই, অথচ বায়ুর স্পন্দ আপনা হইতেই হয়; আরও দেখ, সূর্য্যাদির প্রভা-পুঞ্জ কাহারও সাহায্যাপেক্ষা করে না, না করিয়া আপনা আপনিই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; এইরূপে সেই জগৎও স্বতই পরব্রহ্মে

পরিজ্ঞায়মান হইতেছে। জলের দ্রবত্ব,. আকাশের শূন্যত্ব এবং পবনের স্পন্দবৎ এ জগৎ আত্মারই এক অপূর্ব্ব বিবর্ত্তমাত্র। অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যাকার অপরিচ্ছিন্ন আকাশে এই যে জগৎপ্রতীতি হইতেছে, উহা মণির নির্ম্মলতা সদৃশ চৈতন্যেরই চৈতন্যভাবের স্ফুরণ মাত্র। যেমন জলে দ্রবভাব, আকাশে শূন্যভাব এবং পবনে স্পন্দভাব, মহাচৈতন্যে এই জগৎ সেইরূপই। পবন যেমন নিজ স্পন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া মনে করে, ঐ চিৎ তেমনি এ জগৎকেও আপন স্বরূপ বলিয়াই প্রত্যয় করিয়া থাকেন। ইহাতে না আছে একত্ব, না আছে দ্বিত্ব, কোন পার্থক্যই নাই। যে কালে বিবেক-বিকাশ থাকে না, তখন এই জগৎ অতি বড় জাঁকজমকের সহিতই প্রাদুর্ভূত হয় আর যখন বিবেক-বিকাশ ঘটে, তখন উহা নশ্বর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুপগমে এই জগৎসত্তা কিছুই থাকিবার নয়; তখন থাকে, একমাত্র সেই অবিনশ্বর আত্মসত্তা। ইহা বিশেষ বিচার করিয়াই দেখা হইয়াছে যে, মহাচৈতন্যই যাহার স্বরূপ, যাহা অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ, সেই জ্ঞান ভিন্ন তখন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ঐ যে মহাচৈতন্য, উহাকেই কেহ বলেন,—শান্ত, শিব; কেহ বলেন,—শাশ্বত ব্রহ্ম; কেহ বলেন,—শূন্য; এবং কেহ বলেন,—জ্ঞপ্তিস্বরূপ। উনিই নিজেকে চেত্যাকারে ভাবনা করেন;—করিয়া স্বস্বভাবে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞ-জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্ত হন। এই যে কিছু অধ্যস্ত বস্তু দেখা যায়, কেবল চৈতন্যবলেই ইহাদের পরিস্ফুরণ। এই নিমিত্ত বলা যায়, ইহাদের চিৎসত্তাই আছে, তদিতর সত্তা কিছুই নাই। পবন বিনা স্পন্দের যেমন কারণান্তর নাই, তেমনি চিৎসত্তা ভিন্ন চিত্তের চিত্ততাও অসম্ভব। সৃষ্টি-বিভ্রমে যে সত্তাপ্রত্যয় হয়, তাহা ঐ ব্রহ্মসত্তারই আয়ত্ত। পরব্রহ্মের যে সত্তা, তাহাতেই এই জগদ্‌ভ্রমের সত্তা, আর তদীয় সত্তা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই ইহার অসত্তা। এই জন্য শাস্ত্রেও এই জগদ্‌ভ্রম সদসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি চিত্তের সত্তায় চিতের একত্ব ও জড়ের দ্বিত্ব স্বতই স্ফুরিত না হইত, তবে যাহা কূটস্থ অদ্বয় চিদাকাশ,—তাহাতে একত্ব-দ্বিত্বের কল্পনা কে করিতে যাইত? জড় বস্তুর মধ্যে এরূপ কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যাহা দ্বারা ঐ প্রকার একত্ব দ্বিত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে?

বিশদ কথা এই যে, বিশ্ব ও পরমাকাশ-চৈতন্যের বাস্তবিক ভেদ নাই। মাত্র স্পন্দ ও পবন এই দুই শব্দভেদেই যেমন স্পন্দ ও পবনের ভিন্নতা; পরন্তু অর্থানুসারে উহারা একই; তেমনি এই যে বিশ্ব, আর যে সেই বিশ্বনাথ পরমাত্মা, এ উভয়ের বাস্তব প্রভেদ না থাকায় ইহারা একমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। সৎ বলিতে সেই এক ব্রহ্মচৈতন্যই; তাঁহাতে দ্বিতীয়ভাবের সম্পূর্ণই অভাব। ঐ মহাচৈতন্যই বিশ্ববৎ প্রতিভাত; পরন্তু বিশ্বনামে পদার্থান্তর নাই। সুবর্ণকটকে কটকভাবের পার্থক্য যেমন কদাচ কোথাও গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি দেশ-কালের অনুরোধে পরব্রহ্মে কখনই বিশ্বের পার্থক্য স্বীকার্য্য নহে। অতএব যখন জগৎ ও পরব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈত ভাব অসম্ভবপর, তখন উহাতে কার্য্য-কারণভাবের সম্ভাবনা হইবে কিরূপে? যদিই বা কার্য্য-কারণ ভাব থাকে, তবে তাহাকে কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আকাশের শূন্যত্ব ও জলের দ্রবত্ব, এ উভয় যেমন আকাশ ও জল হইতে অভিন্ন, তেমনি ঐ যে কার্য্য-কারণ ভাব, উহাও পরব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র। যেমন ব্রহ্ম, তেমনি জগৎ, ইহাতে দ্বিত্ব, একত্ব ভেদ কোথাও নাই। যেমন আকাশের নীলিমা, তেমনি ব্রহ্মের জগদ্ভাব; চিদাকাশ সর্ব্বময় ও সুবিস্তৃত, এই সমগ্র প্রপঞ্চই তাঁহাতে শূন্যময়। পাষাণপ্রতিমায় পাষাণত্বের ন্যায় এই জগৎপ্রপঞ্চেই চিদ্ভাব অবস্থিত। উক্ত উভয়ের কার্য্য-কারণভাবের বৈচিত্র্য সর্ব্বথা অসম্ভাবিত। আকাশে অনাকাশত্ব কদাচ সম্ভবপর নহে। এই জড়সৃষ্টি ভ্রমের বশেই মহাচৈতন্য প্রতিভাত হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা ইহা অসত্য বৈ সত্য নহে। পাষাণের উপর পুত্তলিকা খোদিত করা হয়, বিচারে উহা যেমন পাষাণ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি এই বিশ্বকে যদি যথাবস্থিত ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হওয়া যায়, তবে বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়। নয়ন মুদ্রিত কর; তাহাতে বাহ্য বস্তু কিছুই দেখা যাইবে না। এইরূপে বুঝিয়া দেখ, যখন কাষ্ঠ ও পাষাণবৎ নিশ্চেস্টভাবে সমাধিমগ্ন হওয়া যাইবে, তখন বোধ হইবে,—এই সংসারভাব বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্ম নিজ স্বভাবেই অবস্থিত আছেন। যে বস্তু স্বপ্নকালে সংদৃষ্ট হয়, তাহা যেমন জাগ্রদবস্থায় অলীক হইয়া পড়ে, যাহা চক্ষু বুজিয়া ভাবিয়া দেখা যায়, চক্ষু মেলিলে তাহা যেমন

সম্মুখে দেখা যায় না,—অলীক বলিয়াই অবধারিত হয়, তেমনি এই সকল বাহ্য প্রপঞ্চও অলীক বলিয়াই ভাবনা কর; পরে সেই ভাবনাকেও পরিহার করিয়া অচলবৎ অচল হইয়া থাক। এই অবস্থায় অন্তরে তুমি চিদেকরস হও—স্ব স্বভাবে সমভাবে বিরাজ কর।

এইরূপে ক্রমে পরমেশ আত্মাকে তুমি পূজা করিবে। এই আত্ম-পূজায় বিবেককে উপহার-স্বরূপ অর্পণ করিতে হইবে এবং যেরূপ উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাহাই উৎসর্গ করিয়া দিবে। যদি বিবেকরূপ উপহার দ্বারা স্বীয় আত্মাকে পূজা করা যায়, তবে আত্মা প্রসন্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-বর অর্পণ করিয়া থাকেন। এই আত্মদেবতার পূজা এতই উৎকৃষ্ট যে, ইহার নিকট মহাদেব ও মহেন্দ্রাদির পূজাও জীর্ণ তৃণকণাবৎ একান্তই তুচ্ছ।

হে সাধুশীল! নিজের আত্মাই পরমেশ্বর; তদ্ভিন্ন অন্য পরমেশ্বর নাই। যদি বিবেক, সাধুসঙ্গ ও শমরূপ পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া এই আত্মরূপী পরমেশ্বরকে পূজা করা যায়, তাহা হইলে ইনি সদ্য সদ্যই মোক্ষ-ফল অর্পণ করিয়া থাকেন। যাহা যথার্থ পদার্থ, তাহাকে যদি দেখা যায় বা চেনা যায়, তবেই ঐ আত্মদেবতার অর্চ্চনা করা হয়। সেইরূপ অর্চ্চনা করিলেই ইনি সর্ব্বোত্তম ফল প্রদান করেন। যথায় আত্মদেব বিরাজ করিতেছেন, এমন মূঢ় কে আছে, তথায় দেবান্তরের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে চায়? সাধুসঙ্গ, সন্তোষ ও শান্তিদ্বারা যিনি আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট বিষধরের বিষবহ্নি কিম্বা অস্ত্র, এই সকল ভীষণ বস্তুও শিরীষকুসুমবৎ কোমল হইয়া থাকে। ফলে ঐ সকল হইতে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা নাই। দেবার্চ্চনা, তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য দানাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেও যাহাদের বিবেক নাই, তাহাদের ঐ সকল কর্ম্ম ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। যদি বিবেকবান্ হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করা যায়, তবেই উহা সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তাই বলিতে হয়, যাহা যথার্থ বস্তু, তাহা অবগত হইয়া—বাসনারে ক্ষীণ করিয়া লোকে বিবেকের আশ্রয় লইতে কুণ্ঠা বোধ করে কেন? বাস্তবিকই এ মোহ অপূর্ব্ব!

এক্ষণে কথা এই, সেই বিবেক কিসে হয়? যদি নিষ্কামভাবে যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া চিত্তপ্রসাদ উৎপাদন করা যায়, তবেই বিবেকনামক সত্ত্ব-পুরুষ স্বতই সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। যখন অন্তরে বিবেকোদয় হয়, তখন শান্তিরূপিণী সুধা দ্বারা সেই উদিত বিবেককে বর্দ্ধিত করিতে হয়। বাহ্য ভোগ-বিলাসের প্রলোভন উপস্থিত হইলে সেই উদীয়মান বিবেক যাহাতে শুকাইয়া না যায়, সে পক্ষে সাবধান হইতে হইবে। পরমার্থ বস্তুর সাক্ষাৎ পাইলে তখন এই দেহের সত্তায় আস্থা রাখিবে না। একমাত্র আত্মারই সত্তা,—তাহাতেই আস্থাবান্ হইবে। কি লজ্জা, কি ভয়, কি বিষাদ, কি ঈর্ষা, কি সুখ-দুঃখ, এককালে সকলকেই জয় করিবে। দেহের সত্তায় আস্থাহীন হওয়া প্রয়োজন; সেরূপ হইলে অগ্রে এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, এই তো জগদাদি ও দেহাদি দৃশ্য পদার্থ; ইহারা যখন আদিতেও ছিল না, তখন অদ্য আবার ইহাদের উপস্থিতি হইবে কোথা হইতে? কার্য্যমাত্রেই কারণ আছে, এই সিদ্ধ বাক্যের অনুসারে ব্রহ্ম—কারণ আর জগৎ তাহার কার্য্য; এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও জগৎ-কার্য্য ব্রহ্ম কারণ হইতে কিছুমাত্রই ভিন্ন নহে। ঐ জগৎ সেই নির্ম্মল ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র। যেমন ঘটাদি পদার্থ জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌ভাবে অজ্ঞায়মান অবস্থায় অসৎ হইয়া পড়ে, তেমনি এই জগৎও যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্-হওয়ায় অপ্রকাশিত হয়, তখন অসৎ হইয়া যায়। অতএব এই নিখিল জগৎই সেই চিদাভাস মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এই চিদাভাসকেও প্রকৃত বিশুদ্ধ চৈতন্য বলা যায় না; ইহা সেই আত্মতত্ত্বেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। যখন শুদ্ধ প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন ইহাও প্রশান্ত হইয়া থাকে।

এইরূপে যখন জ্ঞেয় বস্তুর অভাবঘটনা হয়, তখন প্রতিবিম্ব হইতে পৃথক্কৃত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ চিৎই বিরাজ করেন। সেই যাহা বিশুদ্ধ চিৎ, তাহাই অখণ্ড নিত্য পদার্থ। এই নিত্য পদার্থের শরীরাদি কোন কিছুই নাই। ইনি পরম শান্তিময়; ইহাঁতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞপ্তি নাই। ইনি পাষাণ হেন অচল অটল।

হে সভাসদ্‌গণ! সকলেই তোমরা শান্ত ও স্বচ্ছ হইয়া সেই শুদ্ধ

চিৎস্বরূপে অবস্থান কর। পাষাণ-প্রস্তুত পুত্তলিকা যেমন নিশ্চল, তেমনি তোমরাও ঐ অবস্থায় অবিচল হইয়া থাক। তবে যদি তোমাদিগকে কেহ চালায়, তখন চলিও; নচেৎ একই ভাবে রহিও। তোমাদের যে জ্ঞানময় সত্যাকৃতি, অন্যের তাহা অপরিজ্ঞেয় হউক। সৎ ও অসৎ এই উভয়ের সারস্বরূপে তোমরা অবস্থিত হও। এই সংসারভূমি স্পর্শ না করিয়া তোমরা আকাশ-কোষবৎ নির্ম্মল হইয়া থাক। যাঁহারা সত্য সত্যই জ্ঞানবান্, তাঁহারা এইরূপই হন। যাহা আবশ্যকীয় নিত্য কর্ম্ম, তাহাই মাত্র তাঁহারা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কোথাও যান না বা কোথাও থাকেন না। নিজের অবশ্যকর্ত্তব্য যে কার্য্য যখন উপস্থিত হয়, কেবল তাহারই অনুরোধে যেটুকু গতিবিধি করা উচিত, মাত্র তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন।

অথবা হে সভ্যবৃন্দ! তোমরা সব পরিত্যাগ কর,—করিয়া প্রশান্তমনে নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন অবস্থায় চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে থাক। কি সমাধি অবস্থা, কি ব্যবহারদশা, যখনই হউক, পুরুষ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিলেই তাহার নিকট এ জগৎ স্বপ্ন বা সঙ্কল্প-নগরবৎ প্রতীয়মান হয় এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণই অস্তমিত হইয়া যায়। অনন্তর যোগী যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির জ্ঞানের ন্যায় তিনি প্রত্যক্ষতই পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। অজ্ঞ লোক কয়েকটা মোক্ষোপযোগী বাক্য শুনে, আর মূঢ় লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায় যে, আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি। এই বলিয়া সে তাহাদের নিকট মোক্ষের কথা বর্ণন করিতে থাকে। তাহার ঐ মোক্ষ-বিষয়ক কথা অন্ধ-কৃত রূপবর্ণনের ন্যায়ই হয় এবং অন্তরে সে মান ও অপমানাদি ভোগ করিতে থাকে। তাহার ভাগ্যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় শান্তিসুখ লাভ কদাচ ঘটে না। এমনও কোন কোন অজ্ঞ লোক আছে, সে তাহারই উপদেশকে জ্ঞানগর্ভ মনে করিয়া তাহাতেই কৃতার্থম্মন্য হয়। বস্তুগত্যা সে কৃতার্থ হয় না; কিন্তু মূর্খতার বশেই মনে করে যে, আমি বুঝি কৃতার্থ হইলাম। পরে এমন হয় যে, কিয়ৎকাল অতীত হইলেই সে ঐ অজ্ঞলোকের উপদেশানুযায়ী ফল না পাইয়া নিজে যে যথার্থ কৃতার্থ

হইতে পারে নাই, তাহাই তখন বুঝিতে পারে। বস্তুতঃ মূর্খ লোকেরা যে উপদেশ দেয়, তাহাতে লোকে কৃতার্থই বা হইবে কেন? তাহাদের উপদেশ কল্পিত বস্তু মাত্র; যাহা কল্পিত, বুধগণ তাহাকে উপায় মধ্যেই গণনা করেন না। কেন না, তাহাতে ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, নিমেষের মধ্যে ভাবাভাব ভ্রম-জনিত দুঃখ আরও বাড়িয়া যায়। এই জগৎকে ভ্রম বলিয়া জ্ঞান করিয়া সমস্ত বিষয়-বাসনা বর্জ্জনপূর্ব্বক সমাহিতভাবে যে অবস্থিতি, বুধগণের মতে তাহারই নাম নির্ব্বাণ।

রামচন্দ্র! আমি তোমাকে এতকাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম, এ সকল যদি তুমি উপকথার ন্যায় কল্পিত বোধ কর, তবে চিৎ-সলিলের সন্ধানই পাইবে না; সম্মুখে কেবল দেখিবে,—অনন্ত বিস্তৃত জগৎ-মরীচিকাই বিরাজমান। যদি একাগ্রতার সহিত মৎপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক যথার্থবোধে প্রত্যক্-দৃষ্টিযোগে অজ্ঞেয় অনাবিল জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পার, তবে তোমার সম্যক্ নির্ব্বাণ লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে কেবল পরোপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু ঐ জ্ঞান জ্ঞানই নহে। কেন না, যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু, তাহা যদি পরোক্ষরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে তাহাকে জ্ঞান না বলিয়া ভ্রান্তিই বলিতে হয়। অতএব তুমি সেই প্রকার জ্ঞানে হতাদর হইয়া যেরূপে সেই অব্যয় পরম পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার, তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। যাহা সেই অনাদি অনন্ত, উদ্ভব-নিরোধ-বর্জ্জিত জ্ঞান, তুমি নিজেই সেই জ্ঞানস্বরূপ হও। এই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যখন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন কি জগৎ, কি অহম্ভাব, কি সমস্ত ভোগ্য বস্তু, সকলই অসত্য হইয়া

পড়ে। মূঢ় লোকেরা ভোক্তা এবং ভোগ্য এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অনুভব করে,—করিয়া মোহের বশে যে ভোক্তা, তাহাকেই অনুভব-কর্ত্তৃরূপে আত্মা বলিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানে উহা আত্মা হইতে পারে না। কেন না, ভোক্তা আত্মা নহেন; পরন্তু ব্রহ্মই আত্মা। যখন বুঝিবে, ভোগবারি তৃপ্তিকর হইতেছে না, তখনই জানিবে—তোমার অজ্ঞানজ্বর বিরাম পাইয়াছে; জ্ঞানের উদয়ে অন্তঃকরণ শীতল হইয়াছে। বাচ্য-বাচক-ভ্রমের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে ফল কিছুই নাই। যাহা প্রকৃতই নির্ব্বাণ, তাহাতে 'অহং'জ্ঞানের সম্পূর্ণই অভাব। সুতরাং বাচ্য-বাচক ছাড়িয়া সেই নির্ব্বাণেরই ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল বস্তু স্বপ্নে দেখা যায়, তাহা স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলে যেমন আনন্দদায়ক হইতে পারে না, অধিক কি, তাহার অস্তিত্বই যেমন থাকে না, তেমনি পরমার্থ-স্বরূপের পরিজ্ঞান হইলেও এই 'অহং'জ্ঞান ও জগৎ আর রুচিজনক হয় না, উহা অসত্য বস্তু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মায়াবী যক্ষ যেমন স্বাধিষ্ঠান বৃক্ষোপরি মায়ার প্রভাবে অসত্য আত্মীয় স্বজন ও ভবনাদি দর্শন করে, জীবের এই সংসার দর্শন সেইরূপই। যক্ষ ও যক্ষপুরী ভ্রান্তি দ্বারাই কল্পিত; সুতরাং কল্পনাকারীর নিকট সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও উহারা বস্তুগত্যা মিথ্যা মাত্র। এইরূপে এই জগৎ ও অহম্ভাবও অসত্য। তিমিরময় নিরাবরণ প্রান্তরে ভ্রান্তির বশেই যক্ষাকৃতি লক্ষিত হয়। এইরূপে অজ্ঞানবশেই আবরণ-বিরহিত অনন্ত বিস্তৃত পরম পদে চতুর্দ্দশ ভুবনগত চতুর্দ্দশবিধ জীব প্রতিভাত হইতে থাকে। ভ্রান্তির প্রভাবেই যক্ষাকার লক্ষিত হয়। এ তত্ত্ব যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন আর যক্ষ লক্ষ্য হয় না, তাহা অলীক বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যাইতে পারে, যে কালে 'অহং'জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন চিত্তও সেই যথাযথ চিৎস্বরূপে পরিণত হয়।

রামচন্দ্র! তুমি কল্পনারে পরিহার কর; সমস্ত ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হও, আদান ও বিসর্জ্জন বোধ পরিত্যাগ কর; এইরূপে সেই শান্ত চিৎ-স্বরূপে অবস্থিত হও। যদি সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে সমস্ত দৃশ্যই অলীক হইয়া পড়ে। মূঢ় লোকের ধারণায় যাহা দৃশ্য,

তাহা অবশ্য দ্রষ্টা নহে; কেন না, দ্রষ্টা সেই একমাত্র নির্ম্মল চৈতন্য; সুতরাং অনর্থক কেন একটা অলীক দৃশ্য পদার্থকে জোর করিয়া সিদ্ধান্তের পথে উপনীত করিতেছ? ফলতঃ দৃশ্য পদার্থের সম্পূর্ণই অভাব। যেমন বসন্তকালের সরসভাবই তাৎকালিক ফল, পুষ্প ও পল্লব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি একমাত্র স্বস্বভাব পরিপূর্ণ চিৎই সৃষ্টিভাবে উপনীত হইয়া থাকে। এই জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রভাসিত হইতেছে, ইহা মাত্র সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভব। ইহাতে আবার দ্বিত্ব একত্ব কি? তুমি এই সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি দিও না; কেবল নির্ব্বাণ হইয়াই বিরাজ কর। নির্ব্বাণ পরমানন্দদায়ী নন্দনকানন-স্বরূপ, তুমি সেই আনন্দ-কাননে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে থাক।

আর হে নরমৃগগণ! তোমাদিগকেও বলি, তোমরাই বা কেন এই শূন্য সংসার-কাননে পরিভ্রমণ করিতেছ? অলীক আশার আশ্বাসনায় তোমাদের চিত্ত যেন দূষিত হয় না, আর সেই অবস্থায় তোমরা যেন এই ত্রিলোক-মরীচিকা-জলের তরে প্রতারিত হইও না; কিম্বা অন্ধবৎ ব্যাকুল-ভাবে পথে পথে ভ্রমণ করিও না। রে হরিণপ্রায় মুগ্ধ মানব সকল! বিষয়ভোগ যেন অলীক মরীচিকাজল; এ জল পান করিয়া অনর্থক আয়ুঃ-ক্ষয় তোমরা করিও না। জগৎ গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় অসত্য বস্তু; ইহার অধিকার লাভ করিয়া অনুচিত গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া থাকিও না। তোমরা যাহা সুখ বলিয়া বুঝিতেছ, তাহা তো সুখ নয়;—তাহা বাস্তবিকই দুঃখ। কেন না, একবার বুঝিয়া দেখ, সেই সুখেই অধঃপাতে যাইতেছ। এই জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ মহাকাশের নালিকা-স্বরূপ; ইহাকে তোমরা আকাশে ভ্রান্তির বশে প্রতীত কেশগুচ্ছবৎ অবধারণ করিও। ইহাকে সত্য বস্তু বলিয়া কখনই মনে স্থান দিও না। এই সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; না করিয়া যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহাতেই পরিণত হও।

হে মানববৃন্দ! এ সংসার যেন গর্ভশয়ন; এখানে তোমরা শয়ন করিও না। কেন না, এই গর্ভশয়নে যাহারা শয়ান আছে, সেই সকল মানবদেহ সমীর-চালনায় পত্রপতিত নীহারবিন্দুর ন্যায় ক্ষণবিনাশী হইয়াই রহিয়াছে। অতএব দেখিও, তোমরাও যেন ভ্রমে পড়িয়া ঐরূপ দশা

উপগত হইও না। সেই যাহা অনাদি অনন্ত অখণ্ডস্বভাব, তাহাতেই তোমরা অবস্থান করিতে থাক। অস্বাভাবিক দৃশ্য দ্রষ্টৃ-দশায় পতিত হইও না। সংসার অজ্ঞ লোকের নিকটই প্রতীয়মান; বস্তুগত্যা উহা অসৎ বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সংসারের সকলই অবিদ্যমান; যাহা অবশেষে বিদ্যমান, তাহা নাম-রূপ-হীন।

হে রাঘব! প্রবল পরাক্রমশালী সিংহের ন্যায় তৃষ্ণারূপ লৌহ-শৃঙ্খল তুমি ছেদন করিয়া ফেলো এবং সংসার-পিঞ্জর ভেদ করিয়া স্বচ্ছন্দে সর্ব্বোপরি বিচরণ করিতে থাক। 'অহং' 'মম' এই প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তিই মুক্তি নামে নিরূপিত। ঐ মুক্তিই যোগীর আত্মসত্তা। উহাই চরম বাসনাবিরতি। যে ব্যক্তি সংসারপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, উহা তাহারই বিশ্রামাবাস। ঐ আবাসে প্রবেশ করিলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপক্লেশ আর কখনই ভোগ করিতে হয় না। এই জগদ্বস্তু বড়ই আশ্চর্য্যময়; এখানে মূর্খ লোকে যাহা পায়, জ্ঞানী তাহা পান না। ফলে মূর্খের প্রাপ্য দুঃখরাশি, জ্ঞানীর প্রাপ্য নয় আবার জ্ঞানী যাহা লাভ করেন, মূর্খ তাহা পাইতে পারে না।—জ্ঞানীর লভ্য পরমানন্দ, মূর্খের গম্য নয়। গঙ্গা ও গোদাবরী প্রভৃতি বিবিধ জলময়ী-মূর্ত্তি নদী যখন মহাসমুদ্রে মিলিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাদের পার্থক্য যেমন উপলব্ধি হয় না, তেমনি ভ্রমের যখন নিবৃত্তি ঘটে, তখন এই জগদ্ভাবও পরম ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হয়, আর সে ভাব লাভ করা যায় না। দহন-দগ্ধ তৃণভস্ম যেমন বাতাসে মিশিয়া অদৃশ্য হয়, তেমনি যিনি নিজ স্বভাবে লব্ধবিশ্রাম সাধু পুরুষ, তাঁহার নিকট এই জগৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহা নির্ব্বিকল্প, স্বপ্রকাশ ও নিরতিশয় আনন্দ, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। এই পরিবর্ত্তনস্বভাব জগৎকে উহার মুখ্য অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না। জগৎশব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা ঐ ব্রহ্মশব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা কোনক্রমেই সমুচিত হয় না। কেন না, যাহা গতি ও পরিবর্ত্তন-স্বভাব, জগৎশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ তাহাই। যাহা সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই ব্রহ্মশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ। উহা সেই নিরতিশয় আনন্দই; তদ্ব্যতীত আর কিছুই

নহে। এই প্রপঞ্চ একান্ত অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট যেভাবে অনুভূত হয়,—তাহার নিকট যেমন এ জগতের আত্মপর ভেদাভেদ কিছুই উপলব্ধি হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের নিকট এই জগৎপ্রপঞ্চের উপলব্ধি সেইরূপই হইয়া থাকে। তিনিও শিশু-জনবৎ সমস্তই সমান দেখেন। যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, তাহাতে সংযমী জাগ্রৎ থাকেন, আর যাহাতে সর্ব্বভূত জাগ্রৎ, আত্মজ্ঞ জনের তাহাই বটে রাত্রি। ফলে অজ্ঞের নিকট আত্মতত্ত্ব অজ্ঞানান্ধকারাবৃত; অজ্ঞ তাহাতে সুষুপ্তবৎ অবস্থিত। কিন্তু যোগিগণ সেই আত্মতত্ত্বেই জাগ্রদ্‌ভাবে বিরাজিত। মূঢ়দিগের নিকট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সকল জাগ্রৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ; যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার নিকট ঐ সমস্ত চিত্রিত বস্তুবৎ বিরাজিত রহিলেও তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। জন্মান্ধ জনের নিকট চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকল যে ভাবে অনুভূত হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর সমীপে এ জগৎ তেমনই উপলব্ধি হইয়া থাকে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া সে সকল ভ্রমের ন্যায় অসৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ জগৎ অজ্ঞদিগেরই; তাহাদেরই ইহা দুঃখদায়ক বলিয়া বিখ্যাত। যিনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহার সহিত ইহার কোনই সংশ্রব নাই। স্বপ্নে যে সুখভোগ দেখা যায়, তাহা স্বপ্নরূপে জ্ঞান হইলে আর যেমন সুখের বিষয় বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি এ জগৎও প্রবুদ্ধ লোকের প্রীতিজনক নহে। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বিভাগজ্ঞান নাই, কোথাও বিরোধ নাই। তদীয় অন্তর সর্ব্বদাই শান্তিসুখে তৃপ্তিসম্পন্ন। তত্ত্ব-বোধশালী ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ভোগের দিকে সমাকৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই ধ্যান বিনাও সমভাবে অবস্থিত হইতে পারে। দেখ, জলের গতি যেমন নিম্নাভিমুখেই থাকে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তগতি পরব্রহ্মের দিকেই সমাকৃষ্ট রহে; পরব্রহ্মেরই ধ্যানে নিরত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী যদি নিজের চিত্তগতি প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া পুনরায় ছাড়িয়া দেন, তবে তাহা পর-ব্রহ্মেরই ধ্যানের দিকে স্বতঃ সমাকৃষ্ট হয়। এখানে এরূপ একটা পূর্ব্ব-পক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে বাহ্য বস্তু-জ্ঞানেরই বাধঘটনা হয়, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয় ক্রিয়াই নিরুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর; মন অন্তরিন্দ্রিয়—তাহার ক্রিয়া নিরোধ হইবে কিরূপে? এ কথার উত্তর

বাক্য এই যে, ঐ মনও বাহ্য বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেন না, মনের সত্তা বাহ্য বস্তু লইয়াই; তাহাতেই মনের রঞ্জন; মনই বাহ্য বস্তু বলিয়া বিদিত। সমুদ্র হইতে সাধারণ জলাশয়টী পর্য্যন্ত সমগ্র জলাধারের জল যদি এক হইয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সমস্তই যেমন একই জলস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি কি বাহ্য, কি আভ্যন্তর, সকল বস্তুই এক সেই মনোরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তুর আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে—একমাত্র মনই। জল ও জলতরঙ্গ এই দুইয়ের যেমন বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই, তেমনি কি বাহ্য বস্তু, কি আন্তর বস্তু, মন তৎসমস্ত হইতে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নহে। পবন ও স্পন্দ এতদুভয়ের মধ্যে যদি একের শান্তি হয়, তবে তৎসঙ্গে অন্যটীরও যেমন স্বতই শান্তি হইয়া যায়, তেমনি ঐ মন ও বাহ্য বস্তু এই উভয়ের একের অভাবে অপরের অভাব আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। ঐ মন পরমার্থ বস্তুর নিকট অতীব অসার; উহার এবং বাহ্য বস্তুর মধ্যে একের যদি শান্তি হইল, তবে অন্যের শান্তি নিমিত্ত কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করিতে হয় না। ফল কথা, দৃশ্য বস্তু ও মন একই; তাই একের অপায়ে অন্যের অপায় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যখন নষ্ট হইবার হয়, তখন উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্কল্পময় অর্থের বাসনা কখনই করিবেন না; এবং সে নিমিত্ত কোন যত্নও করিবেন না। যখন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন ঐ অর্থ এবং মন স্বতই নাশ পায়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র-বিনাশ, তেমনি ঐ অর্থ এবং মনোনাশও অনষ্ট বস্তুরই বিনাশ বৈ আর কিছুই নয়। বিশদার্থ এই যে, আদৌ যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার নাশ তো ত্রৈকালিক সিদ্ধ। তবে যে মধ্যে মধ্যে তাহার অস্তিত্ব, সেটা কেবল ভ্রান্তি মাত্র। মনে কর, অন্ধকার রাত্রি; পথের পার্শ্বে একটা মৃণ্ময় পুত্তলিকা অবস্থিত। এই সময় একজন লোক সেই পথ দিয়া চলিয়াছে। পথে যে পুত্তলিকা আছে, সে তাহা কখনই জানে না, সে ভাবিল,—ঐ বুঝি একটা দস্যু দাঁড়াইয়া আছে। এই ভাবিয়াই তাহার ভয় হইল। পরে সাহস করিয়া দস্যুবোধে তাহাকে প্রহার করিতে ছুটিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সেই লোক বুঝিল যে, উহা একটা মৃণ্ময়ী

পুত্তলিকা মাত্র, তখন আর তৎপ্রতি তাহার শত্রুতা বা ভয় রহিল না। ঐ মৃন্ময়ী পুত্তলিকা তাহার সমীপে যেন যথার্থরূপেই প্রকাশ পাইল। এইরূপ ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া বলা যায়, এই যে বাহ্য প্রপঞ্চ ও মন, ইহারা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে যথাযথ ব্রহ্মস্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই নিখিল প্রপঞ্চের ভোক্তা বলিতে একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিকেই বলা যায়। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার নিকট ইহা পরমার্থ চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত। মনে কর, এক গৃহস্থিত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন জাগ্রৎ, অন্য জন সুপ্ত। তন্মধ্যে সুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিলে জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন সে স্বপ্ন দেখিতে পায় না, কিম্বা বালকের নিকট প্রতীয়মান যক্ষ যেমন তাহারই সম্মুখস্থ প্রবীণ ব্যক্তির চক্ষে পড়ে না, তেমনি অজ্ঞের বোধে পরিজ্ঞায়মান এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট অলীক বলিয়াই অবধারিত হয়। অজ্ঞ লোক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলিয়া মনে করে; কিন্তু তাহাদের সেই মূর্খতামূলক ধারণা বন্ধ্যার সন্তানসন্ততি-ভাবনার ন্যায় একান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন,—সমস্তই জ্ঞান-স্বরূপ। সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে অনাদি অনন্ত নির্ব্বিকার জ্ঞান, তাহাকেই তাঁহারা সত্য বলিয়া বুঝেন। ঐ জ্ঞানের অভ্যন্তরে কোন মনঃকল্পিত পদার্থ নাই, কোন বিভাগ বা অন্ত নাই। মন ও বুদ্ধিরূপ তরঙ্গের তাড়নায় নির্ম্মল জ্ঞানজলই আকুল হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বাহ্য প্রপঞ্চ ও মন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বলিতে কি, ইহার যে কোথাও সত্তা আছে, এরূপও তখন মনে হয় না। বৃথা এই জগদ্ভ্রম; ইহার অর্থ কিছুই নাই। শরতের সুবিশুদ্ধ সুনির্ম্মল জ্যোতি নির্ম্মল অম্বর ব্যাপিয়াই বিরাজ করে, তোমায় বলি, তুমিও ঐরূপ স্বচ্ছস্বভাব পরম চিদাকাশকেই অবলম্বন করিয়া থাক।

রামচন্দ্র! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই নিখিল জ্ঞেয় প্রপঞ্চ বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি ঐ সকল বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রপঞ্চ পরিহারপূর্ব্বক ভুজগাধ্যাস-বর্জ্জিত রজ্জুবৎ আপন অনাময় স্বভাবেই বিরাজ কর। জানিও,—একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই নিখিল বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রপঞ্চভাব ধারণ করে। এই ব্যাপারের সহিত

একটীমাত্র ক্ষুদ্র বীজের শাখা-ফলাদিময় বিশাল বৃক্ষভাব ধারণের উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মন ও প্রপঞ্চের স্বতন্ত্র সত্তা কোথায় বল দেখি? জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব বস্তুতই যখন অলীক, তখন একমাত্র জ্ঞানই অনন্ত পদ, ইহাই সত্য। ঐ অনন্ত পদই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। উহা ভেদপ্রপঞ্চের অতীত। মনোবৃত্তিই বাহ্য প্রপঞ্চাকারে প্রতীত। কিন্তু ঐ যে প্রতীতি, উহা ব্রহ্মতত্ত্বের অভাবজ্ঞানরূপ ভ্রম মাত্র। বাস্তবিক মনই বাহ্য বস্তুরূপে পর্য্যবসিত হয়। যিনি সর্ব্বময় চিদাত্মা, মন তাঁহারই অভাবাত্মক ভ্রম। মনের বাস্তব কারণ কিছুই নাই। এই নিখিল বাহ্য প্রপঞ্চ অসত্য বটে; কিন্তু ভ্রমের এমনই প্রভাব যে, তাহারই জন্য ঐ সকল সত্তাশালী বলিয়া বোধ হয়। মন বাহ্য প্রপঞ্চাকারে পরিস্ফুরিত; ইহারও স্ফুরণ বিনা কারণেই হয়। যেমন বিদ্যুদ্‌বিকাশ, তেমনি ঐ মন ক্ষণস্থির। এই মনঃস্বরূপেই তুমিও এ সংসারে ভ্রমণ করিতেছ। নিজের প্রকৃত স্বভাব কি, তাহা যদি একবার অবগত হইতে পার, তবে আর এখানে ভ্রমণ করিতে হইবে না; তোমার সংসারভ্রমও থাকিবে না। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই মনঃকল্পিত সংসার বিলয় পাইয়া যাইবে। শুক্তিকায় রজতভ্রান্তিবৎ বৃথা ভ্রমে পড়িয়াই লোকে অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিলে, ঐ ভ্রম আর তিষ্ঠিতে পারে না। তৎকালে এই সংসারের অস্তিত্বও ঘুচিয়া যায়। নির্ব্বাণ ব্রহ্ম হইতে 'আমি' ইত্যাকার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করাই ভ্রম; এই ভ্রম কেবল দুঃখেরই নিমিত্ত হয়। কেন না, জীব অহংজ্ঞান-রূপ মৃগতৃষ্ণাজলে বঞ্চিত হইয়া অশেষ ক্লেশে পতিত হইয়া থাকে। নিজ ভ্রমের জন্যই জীব এইরূপ কষ্ট ভোগ করে। যখন আত্মজ্ঞান হয়, তখন আর 'অহং' জ্ঞান থাকে না। কেন না, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম নিজেকে সৃজ্য বস্তুরূপে জ্ঞান করেন,—করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভরূপে স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত বাহ্যাভ্যন্তর প্রপঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বস্বরূপের হানি কিছুই ঘটে নাই। তিনি যেমন, তেমনই আছেন। জলের তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় তিনি এই জগদ্ভাব উপগত হইয়াছেন, আমূলশাখা সমস্ত বৃক্ষের সত্তা যেমন এক, ফলে বৃক্ষের মূলশাখাদি ভিন্ন

ভিন্ন অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা যেমন স্বীকার করা হয় না, তেমনি একই সত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়াত্মক; এই একমাত্র সত্তাই এ জগতে নির্ব্বিকার-ভাবে বিরাজিত। ঐ সত্তা মাত্র জ্ঞানেরই সত্তা। একই আকাশ যেমন লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী হইয়া প্রকাশ পায়, তেমনি একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডাকারে বিরাজ করিতেছে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানই একইভাবে নির্ম্মলাকারে প্রকাশমান। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব পদার্থ যেমন ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যই চেত্যভাব উপগত হইয়া নিজেকে চিত্তাকারে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। দেশ-কালাদি উপস্থিত না থাকিলেও নিজ বোধস্বরূপ তত্ত্বের অজ্ঞানতা-বশতই ঐ আত্মা চেত্যভাব লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যদি শ্রুতি-প্রদর্শিত যুক্তির আলোচনা করা যায়, তবে ঐ আত্মা যে একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপেই বিরাজমান, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। চিদাত্মা অতীব বিশুদ্ধ। তাঁহাতে অজ্ঞানস্থিতি কোনরূপেই সম্ভবে না; ইহা ধ্রুব সত্য; কিন্তু তথাপি মূঢ়দিগকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহাতে অজ্ঞান-কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয়। এই নিমিত্ত বলা যায়, যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখন মহাত্মা যোগী পুরুষেরা অজ্ঞানের লয়ে স্বীয় আত্মাতেই গলিত হইয়া যান। ফলে তাঁহারা নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের ভ্রান্তি বিগত হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা সমাধি-নিষ্ঠ হইয়াই কালাতিপাত করেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।
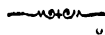
রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনীন্দ্র! কিরূপে সমাধি-পাদপের প্রাদুর্ভাব, কিরূপে তাহার পত্র কাণ্ড ও শাখা-পুষ্পাদির প্রসার দ্বারা পরিবৃদ্ধি, কিরূপে তৎকর্তৃক বিবেকীজনের উপজীবনরূপ ফল ধারণ এবং কিরূপেই বা সে

চিত্ত-মৃগকে ছায়া দান করিয়া তদীয় শ্রমাপনয়নে সক্ষম, তাহা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি সমাধি-পাদপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ঐ পাদপের আশ্রয় লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। উহা অতীব উন্নত এবং পুষ্প ফলাদি দ্বারা পরিশোভিত। উহার ছায়ায় বসিতে পারিলে, সকল শ্রান্তির অবসান হয়। বিবেকবান্ মানবমণ্ডলীরূপ অরণ্যই ঐ সমাধি-পাদপের উদ্ভবস্থান। এক্ষণে ঐ পাদপসম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

এই সংসার-কানন নানা ক্লেশের আকর; এখানে বহুকষ্ট ভোগ করিয়া করিয়া, ইহার প্রতি কাহারও কাহারও বিরাগ উৎপন্ন হয়, অথবা প্রাক্তন শুভাদৃষ্টের ফলে স্বতই এতৎপ্রতি কেহ কেহ বিরাগবান্ হইয়া থাকে। সংসারের প্রতি বিরাগকেই বুধগণ সমাধি-পাদপের বীজ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহা প্রাক্তন শুভকর্ম্মরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত, সুকৃতরূপ সলিলযোগে সদা সিক্ত এবং নিশ্বাস-মারুতের অবাধ সঞ্চারে সুপরিস্কৃত, এ হেন উন্মুক্ত চিত্তকেই মনীষিগণ ঐ সমাধি-পাদপের উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংসার-বৈরাগ্যই সমাধিবীজ; উহা বিবেকি-জনরূপ কাননমধ্যস্থ পবিত্র চিত্তক্ষেত্রে গিয়া নিজ হইতেই নিপতিত হয়। বিবেকীর চিত্ত-ক্ষেত্রে যৎকালে ঐ সমাধি-বীজ পতিত হইবে, তখন তিনি উহাতে অখিন্নভাবে যত্নের সহিত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুধাসম মধুর শীতল সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনারূপ জল সেক করিতে থাকিবেন। ঐ জলই সংসার-ব্যাধির শান্তিকর, সুধাকরের সুধাসম সুশীতল এবং অতীব উপাদেয় বস্তু। উহা দ্বারা পরিষেক না করিলে, সমাধি-বীজের অঙ্কুর হওয়া অসম্ভব। সংসার-বিরতিরূপ ধ্যানবীজ যদি চিত্তক্ষেত্রে পতিত হয়, তবে যাহাতে তাহা নষ্ট হইয়া না যায়, অতি যত্নের সহিত সেই ভাবেই রক্ষা করিতে হয়; সেকালে দেবদ্বিজ ও গুরুগণের পূজা করিতে হয়, দান করিতে হয়, ক্রোধ-লোভাদি বর্জ্জন করিতে হয়, তীর্থপর্য্যটন করিতে হয়, ইত্যাদি

সমস্ত সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ উপায় দ্বারা ঐ বীজের অঙ্কুর জন্মিবে। তখন সেই অঙ্কুর রক্ষা করিবার নিমিত্ত সন্তোষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। সন্তোষ মুদিতা নাম্নী প্রিয়ার সহচর হইয়া থাকিবে। ঐ মুদিতা-সহচর সন্তোষই সেই অঙ্কুররক্ষায় সক্ষম হইবে। অনন্তর আশা, পুত্র-কলত্রাদির প্রতি অনুরক্তি এবং কাম ক্রোধ ও লোভাদি এই সকল যাহাতে বিহঙ্গমকুলের ন্যায় আপতিত হইয়া ঐ অঙ্কুর না নষ্ট করিয়া দেয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। ফল কথা, সন্তোষ রক্ষক হইয়া ঐ আশাপ্রভৃতি বিহঙ্গদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। প্রাণায়ামাদি সৎক্রিয়ারূপ সম্মার্জ্জনী লইয়া ঐ ক্ষেত্রের রজোমার্জ্জনা করিতে হইবে। বিবেকরূপ আতপ অভাবনীয় আলোকজনক; তাহাকে আনয়ন করিয়া সেই সমাধিক্ষেত্রের তমঃ কিম্বা অজ্ঞানরূপ ছায়া অপসারিত করিতে হয়। দুষ্কৃতরাশি যেন মেঘবৃন্দ; তাহা হইতে উহাতে সম্পত্তি ও প্রমদারূপ অশনি-সম্পাত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রণবার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, দয়া এবং জপ-তপস্যাদি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ সকল উপদ্রব উপশমিত করা বিধেয়।

এইরূপে যদি সমাধিবীজ সংরক্ষিত হয়, তবে তাহা হইতে বিবেকাভিধেয় অতি সুন্দর নবাঙ্কুরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিবেকাঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হইলে ক্রমশঃ চিত্তভূমি সুশোভিত হয় এবং পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে আকাশবৎ শোভা ধারণ করে। অনন্তর সেই অঙ্কুর হইতে দুইটী পত্র সমুদ্গত হয়। তাহার একটী পত্রের নাম অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমালোচনা এবং অন্যটীর নাম সাধু-সঙ্গতি। ঐ দুইটী পত্রশালী অঙ্কুর ক্রমশঃ বৈরাগ্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাণ্ডভাব ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। উহার উপর একটা ত্বগাবরণ পতিত হয়; তাহার নাম সন্তোষ। অতঃপর যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপ বর্ষাকালের আবির্ভাব হয়, তখন তাহা ঘন ঘন বৈরাগ্য-সলিলে পরিষিক্ত হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এইভাবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুজন-সঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ সলিল সেক দ্বারা যৎকালে ঐ সমাধিপাদপ সুপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে,

তখন বিষয়াসঙ্গ ও ক্রোধরূপ কপির পরিচালনায় উহা কিয়ন্মাত্রও কম্পিত হয় না। পরে ঐ বিজ্ঞান-বিমণ্ডিত ধ্যান-পাদপ হইতে বক্ষ্যমাণ সরস সুবিস্তৃত শাখা সকল বহির্গত হইতে থাকে; যথা—আত্মতত্ত্বের স্ফুটীভাব, একাদ্বয় আত্মতত্ত্বেরই সত্যতাবোধ, আত্মতত্ত্বস্বরূপে অবস্থান, নিশ্চলীভাব, নির্ব্বিকল্পভাব, সমতা, শান্তি, মৈত্রী, করুণা, কীর্ত্তি ও উদারতা। এই সকলই ঐ সমাধিতরুর শাখারূপে প্রকট হইয়া থাকে। যখন ঐ সকল শমাদি গুণরূপ পত্র ও যশোরূপ কুসুমসমূহ-সমুল্লসিত শাখাজালে জড়িত হয়, তখন ঐ সমাধি-পাদপ যোগী জনসমীপে পারিজাত-পাদপবৎ পরিশোভিত হইয়া থাকে।

এইরূপে ঐ সমাধি-পাদপ শাখা, পত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা অন্বিত হইয়া অহরহ উপচিত হয় এবং সাধক ব্যক্তিকে জ্ঞান-ফল অর্পণ করিয়া থাকে। যশ, শমাদি গুণ ও প্রজ্ঞা এই সকল যথাক্রমে ঐ সমাধি-পাদপের পুষ্প-গুচ্ছ, পল্লব ও মঞ্জরী। বৈরাগ্যরূপ সলিল সেক করিলেই ঐ পাদপ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন বর্ষার বারিধর, তেমনি উহা সর্ব্বদিক্ শীতল করিয়া দেয়। সুধাকর যেমন স্বীয় শীতল কর বিতরণ করিয়া লোকের দৈনিক আতপ-তাপ নিরাকৃত করেন, ঐ সমাধি-পাদপ তেমনি সংসারতাপ প্রশমিত করিয়া থাকে এবং মেঘের ন্যায় সকলকেই উহা শান্তিরূপ ছায়া দান করে। বায়ু আকাশগত মেঘজাল বিতাড়িত করিয়া আকাশকে যেমন স্বচ্ছ করিয়া তুলে, তেমনি ঐ সমাধি-পাদপ-দত্ত শান্তিচ্ছায়া মনোমল নিরাকৃত করত মনের নৈর্ম্মল্য সাধন করে। কুলাচল যেমন সুদৃঢ়াবস্থানে অবিচল হইয়া থাকে, ঐ পাদপ তেমনি নিজেই পরিবর্দ্ধিত ও নিজেই বদ্ধমূল হইয়া সুদৃঢ়রূপে অবস্থিত হয়। সেকালে তাহাকে উন্মূলন করা কাহারও শক্তিসাধ্য হয় না। বিবেকরূপ কল্পবৃক্ষ আপন মস্তকোপরি মুক্তিফলের স্তবক ধরিয়া আছে। উহা যখন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে; তখন যোগী পুরুষের হৃদয়-কানন ছায়াচ্ছন্ন হইয়া শীতলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ঐ ছায়ায়, সমস্ত হৃদয়তাপ দূরে যায়; হৃদয় শীতল হইয়া উঠে। তৎকালে তুষারশীত বুদ্ধিরূপ সুরম্য শাখা প্রসারিত হয়। সংসার-প্রান্তরে চির পরিশ্রান্ত চিত্তমৃগ

সমাধি-পাদপের শান্তিচ্ছায়ায় বিশ্রাম করত সুখ অনুভব করিতে থাকে। চিত্তমৃগ আজন্ম সংসার-কাননে পর্য্যটন করে; তাই সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে। পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ মৃগ যদি কখন সুপথ প্রাপ্ত হয়, তবে বাদীদিগের কোলাহল শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া অমনি সে পথ হারাইয়া বিপথে পদার্পণ করে। চিত্তমৃগের দেহচর্ম্ম খুলিয়া লইবার জন্য কামাদি ব্যাধগণ যখন উহার অন্বেষণ করে, তখন ঐ দুর্ব্বোধ চিত্ত-মৃগ দেহরূপ কণ্টকময় অসার গহনে লুকাইতে গিয়া কণ্টক-ক্ষত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। অহংজ্ঞানরূপ মরীচিকা-নদী সংসার-কাননের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বাসনারূপ সমীরবেগে উহা চঞ্চল হইতেছে। ঐ চিত্ত-মৃগ সেই নদীর অভিমুখেই ধাবিত হইয়া বিস-বিদগ্ধবৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। ঐ চিত্তমৃগ ভোগব্যাপারে একান্তই আসক্ত; তাই শষ্প-সম নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া অবশেষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। পুত্র-পৌত্রাদির পরিপালন করিতে গিয়া ত্রিবিধ তাপে তাপিত হইতে হয়। চিত্ত-মৃগ ঐ ত্রিতাপ-দাবানলে তাপিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং অনর্থরূপ গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়। ঐ মৃগ অনেক সময় সম্পত্তিরূপ লতাজালে জড়াইয়া পড়ে; তখন দস্যু-তস্করাদিবৎ কিরাতেরা তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। চিত্তমৃগ তৃষ্ণাতটিনীর তটপ্রান্তে যায়, সেখানে গিয়া তরঙ্গাহত হয়। ব্যাধিরূপ দুষ্ট ব্যাধবর্গ উহাকে তাড়না করে। তাহাতে দেখা যায়, ঐ মৃগ অনেক সময় পলাইতেছে। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে অনেক সময় দৈববিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞতার ফলে ঐ চিত্তমৃগ তাহা বুঝিতে পারে না;—না বুঝিয়া হঠাৎ একটা অকার্য্য-কুকার্য্য করিয়া ফেলে, আর পরিশেষে তাহার প্রতিকূল ফল প্রাপ্ত হয়। এমন কি, আপনার যে সকল ভোগের বস্তু, তৎসমস্ত হইতেও অনেক সময় বিপদাপন্ন হইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়ে। বুঝি বা কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিল, এরূপ ভয়েও ঐ চিত্তমৃগকে সতত ব্যাকুল হইতে হয়। উহার গাত্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে অনেক প্রহার-ক্ষত হইয়াছে, সময় সময় তাহাও লক্ষিত হয়। ফল কথা, চিত্তে পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সংস্কার থাকিয়া যায়। ঐ চিত্তমৃগ কখন কখন নতোন্নত [illegible] পড়িয়া দিশা-

ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কাম-ক্রোধাদি বিকার যেন প্রস্তরখণ্ড সকল; সেই সমুদায় দ্বারা ঐ চিত্তমৃগ প্রায়শই আহত হয়। তৃষ্ণা যেন কণ্টকময় লতাগহন; তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ মৃগ কখন কখন ক্ষত-বিক্ষতদেহে বহির্গত হইয়া থাকে। উহার নিজের যেরূপ বুদ্ধি, সেই অনুসারেই ঐ মৃগ যথেচ্ছ আচরণ করে। পরের কপট ব্যবহার বুঝিবার অভিজ্ঞতা উহার কিছুমাত্র নাই। ঐ মৃগ ইন্দ্রিয়গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেখানে আসিয়াও উহাকে পলায়ন করিতে হয়। কাম অতি বড় দুর্জ্জয় হস্তী; তাহার পদতলে পড়িয়া কতবার ঐ চিত্তমৃগ পিষ্ট হইয়া থাকে। বিষয় বড় বিষম বিষধর; তাহার বিষময় ফুৎকার-বাতে ঐ চিত্তমৃগ একেবারেই মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। কখন কখন চিত্তমৃগ কামুক হইয়া আসক্তির বশে কামিনীরূপ শঙ্কুময় দেশে প্রোথিত হইয়া থাকে। ক্রোধ ভীষণ দাবদহন; তাহার প্রভাবে কতবার উহার পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়। ঐ চিত্তমৃগ বিষয়ের দিকে সতত সমাকৃষ্ট হইয়া কখন কখন অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে। উহার গাত্রোপরি অভিলাষরূপ দংশ মশক আসিয়া উপবেশন করে এবং উহাকে দংশন করিয়া ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলে। বিষয়ভোগ হইতে যে একটা আমোদ উৎপন্ন হয়, সেই আমোদরূপ জম্বুকের নিকট হইতেও কখন কখন ঐ চিত্ত-মৃগ তাড়িত হইয়া পলায়ন করে। স্বীয় কুকর্ম্মের পরিপাকে কখন কখন দারিদ্র্যরূপ শার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐ মৃগ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসঙ্গ একরূপ মোহ; সেই মোহে অন্ধপ্রায় হইয়া ঐ চিত্তমৃগ যত্র তত্র ছুটিয়া বেড়ায়, আর গর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়া থাকে। মনরূপ সিংহের গর্জ্জন শ্রবণে ঐ চিত্ত-মৃগ ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মৃত্যু যেন ব্যাঘ্র; সে উহাকে নিজ নখচ্ছেদ্য পুষ্পবৎ জ্ঞান করে। গর্ব্বরূপ অজগর উহাকে গলাধঃ-করণ করিবার অভিপ্রায়ে নির্জ্জন মহারণ্যে উহার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এখানে চিত্তপক্ষে ভাবার্থ এই যে, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক যথায় নাই, তাদৃশ জনহীন স্থানেই মূর্খ লোকের গর্ব্ব প্রকাশ পাইবার সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ চিত্ত-মৃগ বড়ই লোভী; আহারের জন্য উহার মুখ সর্ব্বদাই বিবৃত। কামিনী-সম্ভোগে শক্তি জন্মায় বলিয়া যৌবন স

চিত্তমৃগ সম্বন্ধ বন্ধন করে। পরন্তু সেই যৌবনবন্ধু চিরদিনের জন্য উহার সহচর হইয়া থাকে না; সে উহাকে কিঞ্চিৎকালের জন্য আলিঙ্গন দিয়া পরেই পরিত্যাগ করিয়া যায়। ইন্দ্রিয়রূপ ঝঞ্ঝানিল কোপ করিয়া যেন উহাকে কদর্য্য কান্তার-পথে ফেলিয়া দেয়।

হে রঘুরাজ রাম! ভাবিয়া দেখ, শীতকালের রাত্রিযোগে শীতার্ত্ত ব্যক্তিগণ প্রাতে সৌরালোকে যেমন নির্ব্বৃতি-সুখ অনুভব করে, তেমনি ঐ পূর্ব্বোক্ত চিত্তমৃগও যদি সমাধি-পাদপের আশ্রয় লাভ করিতে পারে, তবে তাহার শান্তিলাভ হয়; সে যথার্থ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে শ্রোতৃবৃন্দ! তোমাদিগকে বলি, মূর্খ লোকেরা তাল, তমাল ও বকুলাদি তরুর ছায়ার ন্যায় সুরম্য প্রাসাদতলে থাকিয়া ভোগ-বিলাসের চরিতার্থতা সাধনপূর্ব্বক যে সুখের লেশ মাত্রও লাভ করিয়া উঠিতে পারে না, তোমাদের চিত্তমৃগ যদি সমাধি-পাদপের ছায়ার আশ্রয় লয়, তবে সেই সুখ অক্লেশেই লাভ করিতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অরিন্দম! ঐ যে চিত্তমৃগের কথা কহিলাম, ঐ মৃগ বিশ্রাম লাভের কামনায় সমাধি-পাদপের ছায়া প্রাপ্ত হইলে, তথায় বিশ্রাম-সুখ অনুভব করে,—করিয়া সেই স্থানেই চিরাবস্থান করিতে থাকে। তথা হইতে অন্য কোথাও আর যাইতে ইচ্ছা করে না। অনন্তর সেই সমাধি-পাদপ ক্রমে ক্রমে উপচিত হয়,—হইয়া স্বীয় পুষ্পাস্তবকের অভ্যন্তর হইতে ধীরে ধীরে পরমার্থ-ফল প্রকাশ করিতে থাকে। ঐ পাদপের নিম্নস্থ চিত্তমৃগ যখন শাখাগ্রে ঐ সুপূত ফল দেখিতে পায়, তখন সে মনুষ্যাকার ধারণপূর্ব্বক তাহার আস্বাদ লইবার জন্য ক্রমশঃ সেই পাদপোপরি আরোহণ করিতে থাকে। তাহার অন্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যক্ত

হয়; সে তখন ঐকান্তিক যত্নের সহিত সেই ফল গ্রহণ করিবার নিমিত্তই ব্যগ্র হইয়া পড়ে। ঐ ব্যক্তি আরোহণকালে সমাধি-পাদপের উপরি-ভাগে এক পদ অর্পণ করে, পরে ভূতলস্থিত অন্য পদ দ্বারাও ভূস্পর্শ অর্থাৎ 'অহং' 'মম' ইত্যাদি ভাব পরিহারপূর্ব্বক ক্রমশঃ উপরি উপরি আরোহণ করিতে থাকে। একবার যদি ঊর্দ্ধে উঠিল, তবে আর নিম্নের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। সমাধি-পাদপে উঠিয়া তদীয় পরমার্থ-ফল ভোজন করিয়া সর্পকৃত পুরাতন কঞ্চুক-পরিহারের ন্যায় সে তাহার প্রাক্তন সংস্কার সকল বিসর্জ্জন দেয়। ফলে পূর্ব্বে কি কি ঘটিয়াছিল, বা না ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না; মধুর পরমার্থ ফলের আস্বাদে সে একেবারেই আত্মহারা হইয়া যায়। যদি পূর্ব্বের ঘটনা কখন তাহার মনে হয়, তবে সে তাহার উচ্চ পদারূঢ় আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক এই বলিয়া স্বীয় পূর্ব্বাবস্থাকে উপাহাস করে যে, আহা এতদিন আমি কতই না মোহাপন্ন ছিলাম! ঐ ব্যক্তি লোভরূপ হিংস্র জন্তুর ভয় হইতে মুক্ত হয়,—হইয়া সেই সমাধি-পাদপের কারুণ্যাদি বিবিধ শাখায় বিচরণ-পূর্ব্বক সম্রাট্ হেন পূর্ণকাম হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। ক্রমশঃ তদীয় তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়া যায়। ঐ তৃষ্ণা সদ্বুদ্ধিরূপ সুধাকরের অমানিশা এবং দুঃখরূপ নিশাকরের তিমির-রোগ। তৃষ্ণা লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় প্রাণিবর্গের বন্ধন-ভূত। উহা অহরহ সমাধি-পাদপারূঢ় ব্যক্তিকে পরিহার করিতে থাকে। সে কালে তিনি প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সকল প্রকার অবস্থাতেই তদীয় অন্তঃকরণ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া শীতলভাব ধারণ করে। তাঁহার অন্তর কোন কিছুতেই পরিতপ্ত হয় না। শাস্ত্রে যে শমদমাদি গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল গুণ যেন পল্লবদল; সমাধি-পাদপারূঢ় সাধু জন সেই পল্লব-দলোপরি অবস্থিত হইয়া অধোবর্ত্তিনী উন্নত অবনত জাগতী গতি অবলোকন করিতে থাকেন। এতকাল তিনি বিষবল্লীর বিষময় পুষ্প-পরিকীর্ণ বিষম পথে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহা স্মরণপূর্ব্বক অন্তরে অন্তরে সেই দীন দশার প্রতি উপহাস করেন। ক্রমে সেই সাধু সমাধি-পাদপের উচ্চতর শাখায় আরোহণ করেন, আর স্বচ্ছন্দে সেই পাদপে

বিচরণ করিতে করিতে রাজার ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহার যে স্ত্রীপুত্রাদি ও ধন-মিত্রাদির সহিত সমাগম ঘটিয়াছিল, তখন সেই সকল সম্মিলন-সমাগম তাঁহার মনে জন্মান্তরের বা স্বপ্নদশার ঘটনা বলিয়াই ধারণা হয়। তদীয় মন সে কালে শান্তিময় ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, নটের অভিনয়কালীন হাব-ভাবাদির ন্যায় লৌকিক ব্যবহারে তাঁহার কৃত্রিম রাগ, দ্বেষ, ভয় ও মোহাদি বৃত্তিগুলি মর্ম্মতলস্পর্শী হয় না; কেবল বাহিরেই লক্ষিত হয় মাত্র। তিনি এই সম্মুখস্থ সংসার-নদীর তরঙ্গভঙ্গীময়ী গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আর উহাকে উন্মত্ত ব্যক্তির ব্যবহারবৎ মনে করিয়া অন্তরে উপহাস করিতে থাকেন। সেই সাধু তখন অনির্ব্বচনীয় পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিয়া জীবিতাবস্থাতেও মৃত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন। ফল কথা, বাহ্য পুত্র কলত্র বিত্ত প্রভৃতি বিষয় সকলের কিছুই তদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হয় না; তিনি তৎকালে কেবল সেই সুবিশুদ্ধ জ্ঞানময় ফলের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন এবং পঞ্চম যোগভূমিকারূপ অতীব উন্নত প্রদেশে আরোহণ করিতে থাকেন। যদি কখন কখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সাংসারিক দুর্ঘটনা সকল মানসে সমুদিত হয়, তবে তিনি সন্তোষরূপ পীযূষ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তিনি সন্তোষ দ্বারাই স্বচ্ছভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। যখন অর্থ দ্বারা অনর্থ নষ্ট হয়, তখনই তিনি অত্যধিক সন্তোষ লাভ করেন। তিনি সমাধিনিষ্ঠ হইলে বাহ্য বিষয়ভোগের ন্যায় কেহ যদি তাঁহাকে ব্যবহার-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে, তবে তাঁহার বড়ই বিরক্তি হয়। সে বিরক্তি— নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ব্যাঘাত জন্মাইলে যেমন, তেমনই হইয়া থাকে। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত পদব্রজে পথ পরিভ্রমণ করিবার পর যদি একটুকু বিশ্রাম লাভের অবসর পাওয়া যায়, তবে আর সহজে যেমন পরিশ্রমে প্রবৃত্তি হয় না, সর্ব্বদাই বিশ্রামেচ্ছা হয়, তেমনি উল্লিখিত যোগী পুরুষ এত দিন মোহের মহিমায় সাংসারিক ব্যাপারে পরিশ্রান্ত ছিলেন বলিয়া এক্ষণে সেই সমাধিবৃক্ষে বিশ্রাম পাইয়া পূর্ব্ববৎ আর পরিশ্রম করিতে চাহেন না, ঐ প্রকার বিশ্রাম লাভ করিয়া নিয়তই অবস্থান করিতে চাহেন। যেমন বায়ু দ্বারা বিচালিত হইলেও নিরিন্ধন বহ্নি বেশী ক্ষণ প্রদীপ্ত হইতে

পারে না, এক একটু করিয়া ক্রমশঃ আপনা-আপনিই নিবিয়া যায়, তেমনি সেই যোগী বাহ্যতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যবৎ পরিলক্ষিত হইলেও অন্তরে 'অহং'জ্ঞানের বিলোপ ঘটনায় আপনিই পূর্ণতায় শান্ত হইয়া যান। ক্রমিক অভ্যাসের বশে বাহ্য পদার্থের উপর সেই যোগীর যে একটা বিরক্তির সঞ্চার হয়, সে বিরক্তি তাঁহার কিছুতেই অপসারিত করিতে পারে না। যোগীর অবলম্বিত সেই পথই পরমার্থ ফলপ্রসূ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ পথে পদার্পণ করিয়া তিনি যে ভূমিকায় উপনীত হন, তাহা বর্ণনাতীত; বুদ্ধিমান্ পান্থ যেমন মরুস্থলীর দিকে যাইতে চাহে না, তেমনি সেই যোগী আপনার যে একটা ভোগের চেষ্টা, তাহা মোটেই করেন না। যদি অন্যে চেষ্টা করিয়া কোন কিছু ভোগসামগ্রী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করে, তবে তিনি তাহাতে বিরক্তই থাকেন; সে ভোগের দিকে এক পদও অগ্রসর হন না। ঐ যোগী অন্তরে পূর্ণমনা হইয়া সংসারব্যাপারে সম্পূর্ণই নিদ্রিত থাকেন। তিনি মদ-বিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদাই আনন্দময় হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে কি এক অভূতপূর্ব্ব স্থিতি লাভ করেন। বিহঙ্গ যেমন বিনা ক্লেশেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে পারে, ঐ যোগী তেমনি তাদৃশ দশায় উপনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই পরমার্থ-ফলের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকেন। তখন সর্ব্বপ্রকার বাসনাবুদ্ধি তাঁহার বিলুপ্ত হয়। তিনি আকাশবৎ নির্ম্মল হইয়া কেবল সেই পরমার্থ-ফলেরই রসাস্বাদ করিতে থাকেন; তাহাতে তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি হয়। এই পরমার্থ-ফলের রসাস্বাদে পরমা পরিতৃপ্তির অর্থ—সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থান। যে কালে ভেদজ্ঞান থাকে না, সর্ব্বত্র কেবল অভেদই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, বুধগণের মতে সেই অভেদই অনাদি অনন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহারা পুত্র-কলত্র ধন জন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই পরম পদ পরব্রহ্মেই বিশ্রাম লইয়া থাকেন। শোধিত দ্রষ্টৃ-তত্ত্ব—পরমার্থ ও চিৎ, এই উভয় যখন অখণ্ড একত্বরূপ পরমানন্দে পর্য্যবসিত হয়, তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না; তাপযোগে তুষারবিন্দুবৎ তাহা তখন বিলয় পাইয়া যায়। 'জ্যা-যুক্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দাও, সে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই থাকিবে; তাহার আকর্ষণ-জন্য বক্রভাব

আর থাকিবে না, এইরূপে দেখা যায়, যোগী পুরুষও তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেন,—করিয়া কখন যদি আবার সাংসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন, তবে সেই বিক্ষেপ-বিগমে পুনর্ব্বার তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐ অবস্থায় কোমল কুসুমদামের ন্যায় তাঁহাকে যে ভাবে ইচ্ছা, সরল বা বক্র কোনভাবেই রাখা সম্ভবপর হয় না। স্তম্ভের গাত্রে পুত্তলিকা অঙ্কিত হয়; উহা যেমন *স্তম্ভের স্বতন্ত্র সত্তায় অসত্য* এবং স্তম্ভের সত্তায় সত্য হয়, তেমনি এই যে বিশ্ব দেখা যায়, ইহাও পর-ব্রহ্মে সত্যাসত্য উভয়ই বলা যায়। কাজেই ব্রহ্মে সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ এই উভয় বিশেষণই সঙ্গত বলা যাইতে পারে; পরন্তু জ্ঞান হইতে—সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই হয়। যাহা নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাব, তাহার জ্ঞান হয় না; কাজেই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া উঠা যায় না। যে কালে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াই অবস্থিত হন। সে কালে ধ্যান করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যাহার বাহ্য দৃশ্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, অপ্রবুদ্ধ জনের আদরের সামগ্রী—দৃশ্য পদার্থের পরিত্যাগই তাহা দ্বারা হইতে পারে। তদ্ব্যতীত সে আর কাহার চিন্তা করিবে? সুতরাং চিন্তাকেই সমাধি-শব্দের অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সাক্ষি-চৈতন্যরূপে দৃশ্য পদার্থের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই যথাস্বরূপে সমাহিত করার নাম সমাধি। সাক্ষিচৈতন্য ও দৃশ্য এই উভয়ের একত্ববিধায়ক জ্ঞান যখন মনোমধ্যে সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন জীব সেই জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইলে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। চিদানন্দসত্তাই তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাব। সাধুগণ বলেন,—দৃশ্য প্রপঞ্চের যে সত্তাস্ফূর্ত্তি, তাহাই অতত্ত্বজ্ঞানীর ধর্ম্ম। অতত্ত্বজ্ঞ লোকেরই বাহ্য বিষয় রুচিকর হইয়া থাকে। যিনি তত্ত্ব-জ্ঞানী, তাঁহার তাহা হয় না। যিনি সুধাপান করেন, তাঁহার কি কটু পেয় কখন তৃপ্তিকর হয়? যদি বল, স্বস্বরূপের যে বারম্বার অনুসন্ধান, তাহারই নাম ধ্যান,—তাহাই ধ্যানশব্দের অর্থ; তবে বলা যায় যে, উহা-তত্ত্বজ্ঞানীরই স্বভাবসিদ্ধ। কেন না, তিনি ত্রিবিধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হইয়া আছেন; সর্ব্বদাই আত্মনিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা না করুন, তথাচ উল্লিখিত ধ্যান তাঁহার আপনা-

আপনিই হয়। স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ধ্যান; কিন্তু তৃষ্ণাদি কারণে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। তৃষ্ণা যাহার একেবারেই অপগত হইয়াছে, স্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক তাহার আর থাকিবার স্থান কৈ? সে তো সর্ব্বক্ষণই স্বরূপে অবস্থিত। অথবা যে জ্ঞানী ব্যক্তির বাহ্য প্রপঞ্চে তৃষ্ণামাত্র নাই, তাঁহার পুনরুদিত তৃষ্ণা, অনন্ত—অপরিচ্ছেদ-যোগ্য। কেন না, তিনি নিজেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মস্বরূপে সমুদিত। এই যে কিছু বাহ্য প্রপঞ্চ, এ সকল তোমাদেরই ধ্যেয় বিষয়, এই বিষয়সম্পর্কীয় তোমাদের সমস্ত জ্ঞানটুকু তোমরা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির ব্যবহারে লইয়া গিয়া দেখ, ইহাতে তদীয় তৃষ্ণাপূর্ত্তি কোন প্রকারেই হইবে না। এই নিমিত্তই তিনি বাহ্য বিষয়ের তৃষ্ণা রাখেন না; তাহাতে বিতৃষ্ণার কারণ এই যে, বাহ্যবিষয়ক তৃষ্ণা সামান্য; আর যোগীর তৃষ্ণা অপরিচ্ছিন্ন এবং সে তৃষ্ণার বিষয়ই আত্যধিক। ফলে অশেষ তৃষ্ণাবিষয় পরিহারপূর্ব্বক কে আর সামান্য তৃষ্ণাবিষয় লইতে প্রয়াসী হয়? বস্তুতঃ বহু প্রাপ্তির আশা থাকিলে কেই বা অল্পের জন্য লালায়িত হয়? কাজেই বাহ্য তৃষ্ণার বিক্ষেপ-বিরহে লূনপক্ষ পর্ব্বতবৎ একত্রাবস্থিত যোগীর ধ্যান বা নিজস্বরূপের ভাবন স্বতই হইতে হয়। সে পর্য্যন্ত না ঐ প্রকার বিশুদ্ধ বোধের উদয় হয়, ততদিন সমাধি-সাধনার্থ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। যৎকালে শুদ্ধ বোধরূপী আত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আর সমাধিসাধনার জন্য প্রযত্ন করিবার প্রয়োজন হয় না। কেন না, তৎকালে সমাধিচেষ্টা থাকাই অসম্ভব। ফলে প্রবল তেজে প্রজ্বলিত জ্বলনে ঘৃতকণা তিষ্ঠিতে পারে না, সেইক্ষণেই পুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। বিষয়ের প্রতি ঐকান্তিক বৈরাগ্যই সমাধি; যিনি তাদৃশ বৈরাগ্য লাভে সক্ষম হইয়াছেন, মানবসমাজে তিনি ব্রহ্মা; তাঁহাকে আমার নমস্কার। যখন বিষয়বৈরাগ্য সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন কি ইন্দ্রাদি দেব, কি অসুরগণ, কাহারাই যোগীর কোন অনিষ্টাচরণে সক্ষম নহে। বিষয়ের সম্পূর্ণ নিস্পৃহতাই বড় [illegible] সুদৃঢ় ধ্যান; যাহাতে এই প্রকার ধ্যান বা সমাধি লাভে সক্ষম হও [illegible] পক্ষে চেষ্টা কর। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে যৎকালে ভেদবুদ্ধি তিরোহি[illegible] হইয়া যায়, তখন আর কোন ধ্যানেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। [illegible]

বিশ্বশব্দকে সার্থক বলিয়া মনে করে; কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট ইহা তুচ্ছ জ্ঞানেরও বিষয়ীভূত নহে; বলিতে কি, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরই হয় না।

হে বুধমণ্ডলী! বিবেকীদিগের জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞ ও অজ্ঞ, বিশ্ব ও বিশ্বপতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সকলই এক হইয়া প্রকাশ পায়। তোমরা যাহাতে বিবেকীদিগের তাদৃশ জ্ঞানমার্গে উপনীত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিতে পার, তদ্বিষয়েই সচেষ্ট হও। এই জ্ঞানমার্গ কেবল আত্মাই; ইহাতে আত্মাতিরিক্ত সত্তা, অসত্তা, দ্বিত্ব বা একত্ব নির্ণয়ে সামর্থ্য কাহারও নাই। নির্ব্বাণ লাভের প্রথম পথ শাস্ত্রালোচনা; দ্বিতীয় সাধু সঙ্গতি এবং তৃতীয় ধ্যান বা সমাধি; এই ত্রিবিধ পথের মধ্যে উত্তরোত্তর নির্দ্দিষ্ট পথ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পথাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরিচ্ছিন্নাকৃতি অপরোক্ষ ব্রহ্মচৈতন্যের জীবাখ্য স্বীয় প্রতিবিম্বের আদর্শ অন্তঃকরণ; এই অন্তঃকরণস্বরূপ উপাধির বশে উল্লিখিত ব্রহ্মচৈতন্য বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। স্ব স্ব কর্ম্মবৈচিত্র্যের অনুপাতে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সম বিষম সর্ব্বশরীরেই ঐ ব্রহ্মচৈতন্য সমুদিত হইয়া থাকেন। এতন্মধ্যে যদীয় ভাগ্য উত্তম, তিনিই জ্ঞানানুরূপ বিশুদ্ধ জন্ম লাভ করিয়া শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গাদি উপায় দ্বারা এই জগদাকার কন্দুকলীলার পূর্ব্বাপর নিখিল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন। তিনি জ্ঞানসিদ্ধি বা বৈরাগ্যসিদ্ধি যাহাই লাভ করুন, তাহাতে তাঁহার উক্ত উভয় সিদ্ধি সংঘটিত হয়। ইহা তখন জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া এই জগত্তুলা পরপর বুদ্ধিবায়ুর প্রেরণায় উড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মেই গিয়া বিলীন হয়। এই জগদ্ভ্রান্তি অমূলক; তথাচ যাহার নিকট না ইহা বিলয় পায়, চিত্রিত চিত্রভানুর ন্যায় তদীয় তত্ত্বজ্ঞান জড়তাপনয়নে অক্ষম। অজ্ঞ ব্যক্তি জগদ্ভাবেই অভিনিবিষ্ট; তাই তাঁহার জগদ্জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যায়। কিন্তু যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাঁহার নিকট ঐ জগদ্জ্ঞান স্ফুরিতই হয় না। এই জগদ্জ্ঞান অজ্ঞের নিকটই যথার্থ প্রতীয়মান; কিন্তু ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট চিত্রিত বস্তুবৎ অকিঞ্চিৎরূপেই প্রতীত। সুতরাং ইহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানী কোনই বিপদাশঙ্কা করেন না। ঐ জগৎ তাঁহার চিত্তে শূন্যময়, অথবা নিদ্রিতাবস্থায় যে বস্তু দেখা

যায়, তাহারই ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি যৎকালে পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট কি অহম্ভাব, কি জগৎ, কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না। তৎকালে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব তদীয় হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যিনি অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ তত্ত্বলাভে যাঁহার অধিকার হয় নাই, যেমন অর্দ্ধ শুষ্ক ও অর্দ্ধ আর্দ্র কাষ্ঠ, তাঁহার চিত্তও তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়াত্মক হইয়া পরিস্ফুরিত। এ জগৎ তত্ত্বজ্ঞানে একই বলিয়া অবধারিত হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে, ততদিন ইহা বিভিন্নাকারেই পরিজ্ঞায়মান হয়। অজ্ঞানের স্থিতিকাল পর্য্যন্তই লোকে বাদ বিবাদ করিয়া থাকে; কিন্তু যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন সকলের সহিতই সকলে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে; কেহই কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় না। যদীয় তত্ত্বজ্ঞান পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ জগতের সত্তা বা অসত্তা কিছুই তিনি বুঝিতে পারেন না। কেন না, সর্ব্বদাই তিনি তন্ময়; সেই ভাবেই তাঁহার অবস্থান। যিনি সপ্তম যোগভূমিকায় অবস্থান করেন, তিনি যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কোনই ভেদ দেখেন না, সমস্তই একইরূপ দেখিতে পান, তেমনি যোগী পুরুষও এ জগতের সত্তা অসত্তা কোন কিছুরই স্বাতন্ত্র্য অনুভব করেন না। চিত্তমৃগ সমাধি-পাদপে আরোহণ করিয়া পরমার্থ ফল প্রাপ্ত হইল, এই কথার প্রস্তাব ক্রমে তোমার নিকট যে চিত্তনাশের কথা কীর্ত্তন করিলাম, তুমি বুঝিয়া রাখ,—যে চিত্ত বাসনা বৈ আর কিছুই নয়। কেন না, বাসনাই বিনাশ পাইল। আত্মা বাসনানিগড়ে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাধি-পাদপে আরোহণ করিলেন; তৎপশ্চাৎ তদীয় বাসনাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়া তিনি মোক্ষ পাইলেন।

এইরূপে সমাধি-পাদপ বৃদ্ধি পায়, পরে বহুকাল অতীত হইলে তাহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুমুক্ষুর চিত্তমৃগ সেই জ্ঞানময় সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ লইতে লইতে পরে বাসনারূপ নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যখন পরমার্থ-ফল-রস ঐরূপে প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হয়, তখন উহা ক্রমশঃ মুক্তিস্বরূপে পর্য্যবসিত এবং উহার সাক্ষাৎকারাত্মক যে চিত্তবৃত্তি, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। সে কালে চিত্তমৃগ পরমার্থ-স্বরূপ হইয়া উঠে। তদীয় মৃগত্ব স্নেহ-বিরহিত প্রদীপবৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যাহা পারমার্থিক অবস্থা, তাহাই তাহার তখন বিরাজ করে। ঐ অবস্থায় সতত কেবল অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ভাবই স্ফূর্ত্তি পায়। মন যে কালে সমাধি-পাদপের ফল পাইয়া স্বীয় বোধস্বরূপ হয়, তখন সে ছিন্নপক্ষ অচলবৎ দৃঢ়া স্থিতি লাভ করে। সে কালে তদীয় মনের ভাব কোথায় কোন্ অজ্ঞাতদেশে চলিয়া যায়। যাহা নিরাবাধ, নির্ব্বিভাগ, সর্ব্বময়, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই কেবল তখন বিরাজ করিতে থাকে। সে কালে চিত্তসত্তার সুপবিত্রতা হয়,—হইয়া জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কোন বাসনা বা সঙ্কল্প থাকে না; যাহা অনাদি, অনন্ত, অনায়াস, ধ্যান, তাহাই কেবল অবশেষে বিরাজ করে। যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে—পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্তই মন বিষয়ান্বেষণ করিতে থাকে; সে আর সমাধি বা ধ্যান-লাভে সক্ষম হয় না। পরমার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মন কোথায় চলিয়া যায় এবং বাসনা, কর্ম্ম, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি কোথায় তখন অন্তর্হিত হয়, তাহা কাহারই বিজ্ঞেয় বিষয় নয়। যোগী ব্যক্তি একমাত্র সমাধিতেই মগ্ন হইয়া থাকেন। তদবস্থায় পক্ষ-বিরহিত পর্ব্বতবৎ তাঁহার দৃঢ়াবস্থান হয়।

যোগী ব্যক্তি ঐরূপে পরমাত্মাতেই আরাম করিতে থাকেন। তাঁহার সর্ব্বভোগ বিদূরিত হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই প্রশান্ত হইয়া যায়। সমস্ত দৃশ্য বস্তুই নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তদীয় বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ প্রশমন ঘটে; সুতরাং তৎকালে তিনি অনায়াসে পরম পদে বিশ্রাম লাভ করেন। উদারহৃদয় পুরুষেরা চিত্রার্পিত ব্যক্তিবৎ যে পর্য্যন্ত না ভোগরাশিকে বিদূরিত করিতে পারেন, বিষয়বৈরাগ্য ভাবনা সেই পর্য্যন্তই করিতে থাকেন। তিনি যখন বাসনারে বর্জ্জন করিয়া আত্ম-

সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন আর জগৎ-পদার্থ সকল তদীয় দৃষ্টিগোচর হয় না। সে কালে কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া বজ্রসম সুদৃঢ় সমাধি আনিয়া দেয়। ফলতঃ সে নিমিত্ত ক্লেশ কিছুই করিতে হয় না। যেমন বর্ষাকালের নদীপ্রবাহ, তেমনি যখন সমাধি আসিয়া সবলে তদীয় চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে, তখন মন সেই সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুতেই আর টলে না। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে বিষয়ে যে বৈরাগ্য আইসে, তাহাই সমাধি নামে নিরূপিত হয়। তদিতর অন্য কিছুই সমাধি-বাচ্য নহে। অবিচল বিষয়বৈরাগ্যই ধ্যানাখ্যায় অভিহিত। ঐ বৈরাগ্য যখন ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া উঠে, তখন সে বজ্রবৎ সুদৃঢ় হয়। এই বিষয়-বৈরাগ্যকেই অঙ্কুরিতাবস্থা প্রাপ্ত ধ্যান বলা যায়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-বৃত্তিতে আবির্ভূত হইলে অবিদ্যার উচ্ছেদ হওয়ায় সেই ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপে, সর্ব্ব-বাসনার উচ্ছেদ ঘটনায় তিনিই ধ্যানস্বরূপে এবং সর্ব্বদুঃখের অবসান হওয়ায় তিনিই আনন্দময় নির্ব্বাণরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। যদি ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, তবে আর ধ্যানের প্রয়োজন কিছুই নাই। যদি ভোগবিতৃষ্ণা জন্মে, তবে ধ্যানের ফল কি আছে? যিনি সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, দৃশ্য পদার্থের রসাস্বাদ যিনি মোটেই করেন না, সর্ব্বদাই তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে থাকে। জগতের দৃশ্য বস্তু মাত্রেই যাঁহার অরুচিকর, তাঁহার নাম বুদ্ধ। ভোগসমূহের প্রতি যে কালেই বিরাগ জন্মে, সেই সময়েই সম্যক্ জ্ঞান অভ্যুদিত হইয়া থাকে। যাহার স্বস্বভাবে বিশ্রান্তি লাভ ঘটিয়াছে, তিনি আর ভোগের আবশ্যকতা মনে করেন না। স্বস্বভাবে অনবস্থানই ভোগকারণ, তাহার বৈপরীত্যে আর ভোগের কথা কি? অগ্রে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে হয়, পরে জপোপাসনায় নিরত হইতে হয়। এই সমুদায়ের পর সমাধিমগ্ন হওয়া বিধেয়। যৎ-কালে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিবে, শাস্ত্রালোচনা ও জপোপাসনাদি করা তখনও কর্ত্তব্য। সর্ব্ব শঙ্কা দূরে পরিহার করিবে, সর্ব্ব কষ্ট উপেক্ষা করিবে এবং শরতের নীরধরবৎ সুনির্ম্মল, সুষুপ্ত, শান্ত ও সম হইয়া নির্ব্বাণরূপে অবস্থান করিবে।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যাহারা সংসার-ভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, এবং সেই অবস্থায় মরণাদি সঙ্কটে দেহ-পাত করিয়াও বিশ্রান্তি বাসনা করেন, তাঁহাদের গুণপ্রকর্ষ-প্রাপ্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্রে সংসারে বৈরাগ্য জন্মিলে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির অনুষ্ঠানে কিম্বা প্রাক্তন পুণ্যপ্রভাবে নিজ হৃদয়ে সেইক্ষণেই বিবেকলেশ সমুদিত হয়; তখনই আতপ-তপ্ত ব্যক্তির বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয়ের ন্যায় জীবগণ শান্তিহর সর্ব্বোত্তম গুণরাশির আশ্রয় লইয়া থাকে। পথিক যেমন যজ্ঞযূপ বর্জ্জন করিয়া চলে, তিনিও তেমনি অজ্ঞ লোকদিগকে পরিহার করিয়া থাকেন। তিনি দেবতার প্রতি একান্ত আসক্ত হন এবং স্নান, দান ও যজ্ঞাদি তপস্যাচরণ করেন। চন্দ্রমণ্ডল-কৃত সুধা-ধারণের ন্যায় তিনিও তখন লোচনলোভনীয় আহ্লাদ-জনক কোমল ব্যবহার ধারণ করেন। তিনি সুশীলস্বভাব হন, পরের চিন্তানুসরণ করিয়া চলেন, পরের প্রয়োজন সাধন করেন, সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত থাকেন বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ করেন। তিনি নবনীত-গণ্ডবৎ নির্ম্মল হইয়া থাকেন। সেই সাধুর শীত সুকোমল মনোহর ভাব নব-সঙ্গতি-সমুৎসুক ব্যক্তিকে নিতান্ত সুখিত করিয়া থাকে। কেন না, বিবেকীর ব্যবহার সুধাকর-করবৎ অতি শীতল ও অতি পবিত্র; তাই তাহা সর্ব্বসাধারণেরই সুখ-শীতল। সাধু-সমাগমে যেরূপ অনাবিল অবিশঙ্ক বিশ্রাম ঘটে, মনোরম কুসুমসমূহ-সমাকীর্ণ বহুল উদ্যানমধ্যেও সেরূপ বিশ্রামসুখ লাভের সম্ভাবনা করা যায় না। সাধুসঙ্গতি স্বর্গমন্দাকিনীর শুদ্ধ সলিলবৎ পাপতাপ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্রতা বিধান করে। যিনি বিষয়-বিরক্ত হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার ইচ্ছা করেন, তাদৃশ বিবেকী জনের সম্পর্কবশতঃ মানবের চিত্ত হিম-সঙ্গবৎ শীতল হইয়া উঠে। বিবেকী জনের যেমন অমরত্ব-প্রতিষ্ঠা, এরূপ আর অন্য কোন স্বর্গীয় জীবেই নাই।

হে রাঘব! ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে বুদ্ধিবৈশদ্য ঘটিয়া থাকে। যেমন সন্নিহিত ভূমিভাগ দর্পণে প্রতিবিম্বচ্ছলে প্রবেশ করে, তেমনি গুরু-মুখ-পরিব্যক্ত সমস্ত শাস্ত্রার্থই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন মহারণ্যস্থলীর কদলী মূল ও প্ররোহাদির বিস্তারক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সৎপ্রজ্ঞাও তেমনি বিবেকীজন সমীপেই আশ্রয় পাইয়া শাস্ত্রার্থরূপ রসযোগে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাশালী বিবেকীর হৃদয় অতীব সুনির্ম্মল; উহা দর্পণের ন্যায় স্বস্বরূপে প্রতিবিম্বিত নিখিল বস্তুই সর্ব্বভাবে অনুভব করিয়া থাকে। সাধু-জনের সংসর্গ ও শাস্ত্রার্থের অবধারণ, এই দুইটী কার্য্যে যদীয় আত্মশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সেই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি অগ্নি-সহযোগে সুনির্ম্মল সুবর্ণবৎ কমনীয় হইয়া থাকেন। সৌরালোকে ত্রিভুবন যেমন প্রকাশমান হয়, বিবেকী জন তেমনি স্বীয় আত্মপ্রকাশিনী অন্তরালোকচ্ছটাতেই সতত সমুদ্ভাসিত হইতে থাকেন। যেরূপ করিলে শাস্ত্ররহস্য ও সাধুসঙ্গতির ফল সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন, বিবেকী ব্যক্তি তেমনি অভ্যাস ও সেবাদি করিয়া থাকেন। বিবেকী জন পূর্ণ শাস্ত্রার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সজ্জন-পদে সমাসীন হন, ভোগ-সামগ্রীসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং পঞ্জর-নির্ম্মুক্ত মৃগাদির ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তদীয় ভোগাভিমুখীন দৌর্ভাগ্য প্রত্যহ পরিহৃত হওয়ায় তিনি তাঁহার স্ববংশকে সমুজ্জ্বল করেন। ভোগসম্পর্কের অভাবে বিবেকীর মুখমণ্ডল তখন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। দেবগণের নিকট স্বর্গীয় কল্পদ্রুমের ন্যায় তিনিও তখন জ্ঞানী সমাজের একান্ত প্রশংসার্হ হইয়া থাকেন। তাঁহার অন্তরে দ্বেষলেশ না থাকিলেও প্রাপ্ত ভোগের প্রতি তিনি দ্বেষ করিয়া নিজেই অন্তরে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু যখন ভোগ-সাধনের অভাব হয়, তখন সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে তিনি যে চঞ্চল-প্রকৃতি নারীকে সম্ভোগ করিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান বিবেকদশায় তিনি তাহাকে স্মরণ করিয়াও অনুতপ্ত হন এবং সহাস্য-আস্যে তৎপ্রতি উপহাস করিতে থাকেন। ভূতলোদিত সুধাকরের ন্যায় সেই মহাত্মাকে প্রণয়-বশে দেখিবার জন্য অন্যান্য সিদ্ধ-পুরুষেরা আগমন করেন। তিনি স্বীয়

সমুচিত বুদ্ধিযোগে নিয়তই ভোগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকট যদি সিদ্ধি প্রভৃতি ভোগলাভের সম্ভাবনা হয়, তথাচ তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। সেই আত্মজ্ঞানশালী বিবেকীর প্রথমতঃ বৈরাগ্যোদয় হয়। অনন্তর শৈত্য প্রকাশের পূর্ব্বেই যেমন শারদ পাদপের নীরসতা হয় এবং স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তি যেমন ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তেমনি তিনি পরিণামে মঙ্গল হইবে ভাবিয়া নিজেই সাধু সজ্জন সহ সম্পর্ক রাখেন। সেই মহাত্মার মতি তাহাতেই মার্জ্জিত হয়। স্বচ্ছ সরোবর-গত মহাগজের ন্যায় তিনি শাস্ত্রসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! সাধুব্যক্তি বিপন্ন জনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। রবি যেমন আপন প্রভাপুঞ্জ মধ্যেই সকলকে প্রবেশিত করিয়া লয়েন, তিনিও তেমনি সমুদায়কে সম্পদের দিকেই নিযুক্ত করেন। বিবেকী জনের প্রথমেই পরস্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখতা হয়। তাঁহার নিজের বস্তু সামান্য হইলেও তাহা দ্বারাই তিনি মহাসন্তুষ্ট থাকেন। পরস্ব-প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখতা ও সদাসন্তুষ্টতা এই দুইটী ভাব হইতে ক্রমে তাঁহার নিস্পৃহতা আইসে; তাহাতে স্বার্থমাত্রেই উপেক্ষা করিতে সমুদ্যত হন। সামান্য শাকের কণামাত্রও তিনি যাচকদিগকে অর্পণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না; ঐরূপ অভ্যাসের গুণে পরিণামে স্বীয় দেহমাংস পর্য্যন্ত দান করিতে তাঁহার কুণ্ঠা হয় না। ধনাঢ্য ব্যক্তি গোষ্পদ-পরিমিত স্থান অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন। এইরূপে যাঁহারা বিবেকানুসরণে আপন চিত্ত আয়ত্ত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মূর্খতা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। সাধুজন পরস্ব গ্রহণ হইতে নিবৃত্তি অতি যত্নসহকারে অভ্যাস করিবেন। ঐরূপ করিয়া স্বীয় বৈরাগ্য বশতঃ অবশেষে নিজস্ব বিষয়ে বিরক্ত-ভাব সঞ্চয় করিয়া লইবেন। অনন্তর ভোগপরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবেন। যিনি কৃতী, তিনি পরম বিশ্রান্তি-লাভের জন্যই এইরূপ ক্রমিক উপায় অবলম্বন করেন। আজীবন অর্থোপার্জ্জনের প্রয়াস করায় যে ঐহিক পারত্রিক দুঃখরাশি সমুদ্ভূত হয়, এ সংসারের অসংখ্য নরকমধ্যেও সেরূপ দুঃখ অনুভূত হয় না। সত্য বটে, পারলৌকিক-দুঃখ মূঢ়দিগের স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না; কিন্তু কি শয়ন, কি উপবেশন,

কি গমন, কি ভ্রমণ, কি রমণাদি ক্রম, সমস্ত কার্য্যেই তাহারা যাতনায় এবং মনোবেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদাই অন্তরে দুঃখরাশি ভোগ করিতে থাকে।

হে রাঘব! অর্থ অনর্থময়; কেন না, রাজা, চোর এবং আরও কত লোক হইতে উহাতে অনর্থসম্ভাবনা হইয়া থাকে। সম্পদ সর্ব্বদাই আপৎ-পরিবৃত। সংসারের সমগ্র ভোগ মহারোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মূঢ় লোকেরা বুঝে না, তাই মোহের বশেই ঐ সকলকে তাহারা অন্য প্রকার বলিয়া অবধারণ করে। হে রঘুপ্রবর! যতক্ষণ পুরুষ অনর্থময় অর্থের আশা পোষণ না করেন, সংসারের বৈষয়িক চিন্তাজাল তাঁহাকে সে পর্য্যন্ত কোনই সন্তাপ প্রদান করিতে পারে না। মুক্তিরূপ পরমার্থ যাঁহার অভিমত, তিনি অর্থকে সংসার-তৃণের শিখারূপেই দর্শন করুন এবং স্বয়ং শান্তি লাভ করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন। বৎস! ঐ যে অর্থের কথা উত্থাপন করিলাম, ঐ অর্থ কেবল শোক-মোহাদি বিকার-জনিত জরা-মরণাদি কর্ম্মের ও দৈন্য দৌরাত্ম্যাদি অপ্রিয় ভাবেরই সমষ্টি মাত্র; তদ্ভিন্ন উহাকে আর অন্য কিছুই বলা যায় না। এ সংসারের জীবনিবহ জরা-মরণ-ধর্ম্মী; একমাত্র সন্তোষই তাহাদের জরা-মরণ-হর সর্ব্বদুঃখনাশক মহৌষধি। সন্তোষরূপ পীযূষের উপমা নাই। বসন্ত ঋতু, পূর্ণচন্দ্র, নন্দনবন ও অপ্সরাগণ এই সমুদায় একত্র সম্মিলিত হইলেও একমাত্র সন্তোষ-সুধাই উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। বর্ষাসমাগমে সরোবরের ন্যায় সন্তোষযোগেই সাধু হৃদয়ের পূর্ণতা হয়। যেমন বসন্তাগমে সমস্ত বৃক্ষ পুষ্পপ্রকরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি সাধুজন সন্তোষের আশ্রয়েই হৃদয়-হারিণী সুরস-প্রসাদময়ী তেজস্বিতা প্রাপ্ত হইয়া সমধিক শোভাসম্পদে পরিপূরিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সতত অসন্তুস্ট হইয়া অর্থাকাঙ্ক্ষা করে, পাদুকা-পিষ্ট কীটবৎ দুর্ব্বলচিত্তে কেবল তাহার চেষ্টা মাত্রই করা হয়। সে সর্ব্বদা এক দুঃখের অবসানে দুঃখান্তর ভোগ করিতে থাকে। যে জন উদ্বেল সাগরবক্ষে পতিত ও তরঙ্গ-তাড়নায় বিবশীকৃত হইয়া পড়ে, তাহার ন্যায় সেই ধনার্থী ব্যক্তির কুত্রাপি সুখাবস্থিতির সম্ভাবনা নাই

বৎস! এ সংসারে প্রমদা-সম্পত্তি একান্তই ভয়ঙ্করী। অজগরের ফণাচ্ছায়ার ন্যায় প্রকৃত পণ্ডিত কখনই প্রমদায় সমাসক্ত নহেন। যে মূঢ় ব্যক্তি অর্থার্জ্জন ও অর্থসংরক্ষণ-ব্যাপারে অনর্থাপত্তি বুঝিয়াও অর্থাকাঙ্ক্ষা করে, তাদৃশ নরাকার পশুকে স্পর্শ করাও অকর্ত্তব্য। যে জন বৈতৃষ্ণ্য-রূপ অস্ত্রের সাহায্যে মনের বাহ্যাভ্যন্তর উদ্যমরূপ দ্রুমরাজি ছেদন করে, তাহারই জ্ঞানরূপের উদ্ভবস্থান হৃদয়ক্ষেত্র প্রকাশমান হইয়া থাকে। তদীয় হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠে। অগ্রে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যস্থাপন, তৎপরে সাধুসঙ্গতি ও সৎশাস্ত্রের সমালোচনা, অনন্তর শাস্ত্রার্থসমূহের সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে ভোগরাশির বর্জ্জনপূর্ব্বক বাসনাহীন হইতে হয়; এইরূপে বিবেকী ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সাধুর হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইবার পর তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে শাস্ত্রাভিপ্রায় বিদিত হইয়া থাকেন। ভোগের প্রতি তাঁহার স্পৃহা থাকে না। তিনি নিস্পৃহ হইয়া সজ্জনপদে সমুপনীত হন। তদীয় হৃদয় স্বতঃ প্রকাশমান হইয়া পরম-পদাভিমুখে উপস্থিত হয়। ধন রত্নাদি যে কিছু বস্তু, সকলই তিনি তুচ্ছ বোধ করেন; তৎপ্রতি তাঁহার আর কোনই বাসনা থাকে না। যেমন উচ্ছিষ্ট বস্তু ও শুষ্ক পত্রাদি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, তেমনি অর্থের সঙ্গ মাত্রই তিনি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেমন ভারাবহী পান্থ নিজের শক্তি ও দ্রব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া ভারদ্রব্যের এক একটী ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকে, বিবেকশালী ব্যক্তিও সেইরূপ স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনাদি প্রভৃতি ভারভূত বলিয়া মনে করেন এবং যথাকালে স্বীয় শক্তির অনুপাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংসর্গ পরিহার করিতে

থাকেন। তাঁহার চিত্ত শান্তিময় হয়; তাই তিনি ভোগমাত্রেরই বর্জ্জন করেন; কোনরূপ ভোগানুভবই করেন না। বলিতে কি, বিবেকীরা না নির্জ্জনে, না দিগন্তরে, না সরোবরে, না অরণ্যে, না উদ্যানে, না কোন পুণ্যতীর্থে, না স্বীয় গৃহে, না সুহৃদ্‌বর্গের কেলিবিলাসে, না অরণ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজে, না শাস্ত্রীয় বিচারবিতর্কে, এ সমুদায়ের কোথাও তিনি স্থিরচিত্তে অবস্থান করেন না। সেই বিজ্ঞানবাদী জ্ঞানী জন তৎকালে শম দমাদি গুণে অন্বিত হইয়া থাকেন; মৌনভাবে আত্মাতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং যাহা সেই দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহারই অন্বেষণ করিতে থাকেন। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে বিবেকী ব্যক্তি অনায়াসেই পরম পদে বিশ্রাম লাভ করেন। একমাত্র আত্মবোধই আছে, তদ্ব্যতীত কিছুই নাই বা অন্য অর্থাববোধ নাই; এইরূপ স্বানুভবময় পরম পদ অন্তরেই বিরাজিত। ইহাই পণ্ডিতগণের মত। নিখিল বস্তু সহ অভেদজ্ঞানে ঐকান্তিক সম্বন্ধে পরিণতি হওয়ায় যদীয় বোধতা বা শূন্যতা একেবারেই নাই; জানিবে,—তাহারই নাম পরম পদ। যাঁহারা স্বীয় সম্বিন্মাত্রেই বিশ্রাম করেন, তথাবিধ নির্ম্মনস্ক সজ্জনগণের বিষয়ভাব কদাচ বিম্বিত হয় না। বস্তুতঃ অচেতন প্রস্তরের ক্ষীরস্রাব কখন হয় কি? সাধু আত্মপরায়ণ হইয়া বিষয়বিরোধী পদে উপস্থিত হন,—হইয়া মনোবিহীন ভাবে মৌনাবলম্বনে চিত্রার্পিতবৎ স্বস্বভাবেই অবস্থান করেন। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মন সর্ব্বার্থ-সম্পন্ন হইলেও নিরর্থক, অতি মহান্ হইলেও পরমাণুপ্রায় এবং পূর্ণ হইলেও শূন্যস্বরূপ হয়। কাজেই তিনি তখন মনোবিহীন হইয়া থাকেন। তুমি, আমি, দিক্ ও কালাদি জ্ঞান তাঁহার চিন্মাত্ররূপে আছে বটে,—থাকিলেও তাঁহাতে স্বস্বরূপে নাই বলিয়া দীপ-কৃত অন্ধকার-দূরীকরণের ন্যায় তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার এবং বাহ্য রাগ, দ্বেষ, ভয়াদি দূরীভূত করিয়া দেন।' সুতরাং যথায় রজোগুণের লেশ স্পর্শ নাই, যাহাতে তপঃপ্রকাশের একান্তই অসম্ভাবনা, অপিচ সত্ত্বগুণের পরপারে যিনি বিরাজমান, তাদৃশ ত্রিগুণাতিবর্ত্তী ব্রহ্মস্বরূপী নর-দিনকরকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ভেদবুদ্ধির বিলয়ে যদীয় চিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়,

তাদৃশ জ্ঞানীর তদানীন্তন অবস্থা বাক্যাতীত। হে মহামতে! জানিয়া রাখ, যদি ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশকে রাত্রিদিন উপাসনা করা যায়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্ত ব্যক্তিকে এইরূপই নির্ব্বাণ পদ অর্পণ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী; আপনার অপরিজ্ঞাত কোন তত্ত্বই নাই। তাই জিজ্ঞাসিতেছি, কে ঈশ্বর? কিরূপ ভক্তিযোগে কিরূপেই বা তাঁহাকে প্রসাদিত করা যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মতিমন্! ঈশ্বর তোমার সন্নিধানেই বিদ্যমান; অনায়াসেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎস! নিজের যে মহাজ্ঞান-ময় আত্মা, তাহাই পরমেশ বলিয়া অভিহিত। সেই পরমেশ হইতেই সকল, তাঁহাতেই সকল, তিনিই সকল; তাঁহারই সর্ব্বত্র অবস্থিতি। তিনি সর্ব্বান্তরে বিরাজমান; তিনিই সর্ব্বময়। সেই সর্ব্বস্বরূপ বিভুকে নমস্কার। পবন হইতে যেমন গমনাদি শক্তি, তেমনি সেই কারণ পুরুষ হইতেই এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিকারাদি প্রকাশমান। এই চরাচর নিখিল সংসার নিরন্তর তাঁহার পূজায় তৎপর। ভক্ত ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিলেই তিনি প্রসন্ন হন। জীবের বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলেই সেই চিন্ময় বিভু পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য তৎসমীপে নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ দূত প্রেরণ করেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! সেই পরম প্রভু পূত আত্মা তাঁহার ভক্ত সমীপে কাহাকে দূতরূপে পাঠাইয়া দেন এবং কিরূপেই বা সেই দূত আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান উদ্বোধিত করিয়া দেয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! পরমাত্মা পরমেশ ভক্ত সমীপে যে দূত প্রেরণ করেন, ঐ দূতের নাম বিবেক। আকাশে যেমন চন্দ্রমা বিরাজ করেন, তেমনি ঐ বিবেকই জীবের হৃদ্গুহায় আসিয়া সানন্দে অবস্থান করেন। জীব বাসনায় আবদ্ধ হইয়া থাকে। বিবেক আসিয়াই তাহার বোধ জন্মায় এবং এই দুস্তর ভবাব্ধি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেয়। জ্ঞানাত্মাই অন্তরাত্মা; তিনিই পরাৎপর পরমেশ্বর। তাঁহারই নামান্তর

ওঙ্কার; এই নামই তাঁহার বেদ-বিহিত নাম। কি দেব, কি দানব, কি নাগ, কি নর, সকলেই জপ-তপ, হোম-দান, বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিয়ত তাঁহারই প্রসন্নতা বিধানে তৎপর। তাঁহার যে বৈশ্বানররূপ, স্বর্গই সে রূপের মস্তক, পৃথ্বী তাঁহার চরণদ্বয়, নক্ষত্র-নিকর—রোমরাজি, জীবনিবহ—অস্থিপুঞ্জ এবং আকাশ তাঁহার হৃদয়। পরমেশ চিদাত্মা; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই গমন করিতেছেন, নিরন্তর জাগ্রৎ রহিয়াছেন এবং সমস্তই সন্দর্শন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সেই বিশ্বরূপের কর-চরণ ও চক্ষু কর্ণাদি সতত সকল দিকেই কার্য্য-তৎপর। বিভু আত্মা বিবেক-নামক দূতকে উদ্বোধিত করেন,—করিয়া জীবের চিত্ত-পিশাচের বিনাশ সাধন করেন। অনন্তর জীবকে তিনি বাক্যাতীত আত্মপদে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, আত্মা আপন সামর্থ্যে সর্ব্ব বিকল্প ও সর্ব্ববিকার পরিহারপূর্ব্বক আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কেন না, এই সংসার যেন রাত্রি, উহা কাম-ক্রোধাদিরূপ জলদজালে সমাচ্ছন্ন; ঐ সংসাররূপ রাত্রির অজ্ঞানান্ধকারে মনোরূপ দুষ্ট পিশাচ সততই বিচরণ করিতেছে। ঐ রাত্রির অন্ধকারে একমাত্র স্বীয় জ্ঞানময় আত্মাই পূর্ণচন্দ্রবৎ বিরাজমান। এ সংসার যেন দুস্তর সাগর; বাসনাতরঙ্গ দ্বারা উহা পরিব্যাপ্ত, মনোরূপ প্রবল পবনে পরিচালিত, মরণনামক গভীর জলভ্রমে ঘূর্ণিত, ইন্দ্রিয়রূপ দুর্ব্বৃত্ত দলের আশ্রয়স্থান এবং জড়াকার জলরাশির অধিষ্ঠান; এই সংসারসাগরের পরপারে উপনীত হইবার প্রধান সাধন বিবেক-নৌকা। পরমাত্মা অগ্রে যদি অভিমত অর্চ্চনাদি লাভে প্রসন্ন হইয়া উঠেন, তবেই এ সংসারে বিবেক-দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভাবনপূর্ব্বক অমল অদ্বয় পরম পদে জীবকে উপনীত করিয়া থাকেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়া বিবেকের যাঁহারা পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বাচ্য মাহাত্ম্যই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সম্পত্তি ও জীব-জাতি সেই মহাপুরুষদিগের ঔদার্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী মতিকে কোনই প্রলোভন প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। এই যে সংসার দেখা যাইতেছে, উহা চিত্তেরই ভ্রম মাত্র, এইরূপ বিশ্বাস যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই বহিরন্তরচারী চক্ষু, কর্ণ ও মনঃপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ হিংস্র জন্তু এবং তন্মূলক অজ্ঞান অপগত হইয়া যায়। আকাশে যেমন দ্বিচন্দ্র, মরুস্থলীতে যেমন জল এবং অন্তরীক্ষে যেমন গন্ধর্ব্ব নগর, তেমনি এই সমগ্র জগৎই যখন একান্ত ভ্রমাত্মক, তখন আর বাসনার স্থান কোথায়? বস্তুতঃ কোথাও কোনরূপে বাসনার অবকাশ নাই। বাসনা যদি নাই রহিল, তবে থাকিল একমাত্র আকাশ। পরন্তু এই যে বাসনা-বিহীন অবস্থা, ইহা মনের সত্তার অভাবেই হইয়া থাকে। বিবেকী ব্যক্তি উক্ত অবস্থার পরিহার কিছুতেই করিতে পারেন না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাই প্রসিদ্ধ; এই অবস্থাত্রয়ের অসংস্পৃষ্ট বা অতীত যে অবস্থা তাহা পরমাবস্থা।

রামচন্দ্র! ঐরূপ পরম অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই নানাত্মক জগৎ বিচিত্র রত্নরাজির প্রভাপটলবৎ আভাস মাত্র। যেমন আকাশে বিবিধ রত্নরাজির প্রভাপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয়, এ জগতের রূপ-দর্শনও তেমনি শূন্যমাত্ররূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই ভূতপ্রপঞ্চ—জগতের সত্যতা কিছুই নাই। ইহা ব্রহ্মাখ্য মহারত্নের প্রভাপটলরূপেই প্রকাশমান। সৃষ্টি ব্যাপার নাই, কাজেই নানাত্ব ও প্রলয় কিছুই নাই। অতএব বিনাশের অসম্ভাবনা; মাত্র রূপ-পরিবর্জ্জিত, কল্পনাময় গৌরাংশু-পুঞ্জই ঘনীভূতভাবে প্রতিভাসমান। সঙ্কল্প দেহের ঘন পিণ্ডভাব নাই,

তাই কল্পনাময় আকাশে অদ্ভুত ব্যাপারাদিবৎ মনোরাজ্যে কেবল শূন্যতারই অববোধ হয়। এই সকল কারণে বলা যাইতে পারে যে, শূন্যতা যদি কোন বস্তু হইয়াই না দাঁড়াইল, তবে তথাবিধ শূন্যাধারে রাগ-দ্বেষাদি ভাবের অবস্থিতি কোন প্রকারে সম্ভব হয় কি? কোন বিহঙ্গম কি ভবিষ্যৎ কল্পনাময় আকাশ-পাদপে বিশ্রাম লইতে পারে? এইরূপেই বুঝা যায় যে, এই চরাচরাত্মক জগতের ঘন পিণ্ডভাব নাই, অপিচ ইহার শূন্যতারও অসদ্ভাব। একমাত্র সৎই অবশেষে বিরাজমান। তাঁহার অবিচলত্ব চিরপ্রতিষ্ঠ। যিনি সম্যক্ জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার ভাসমান নানাত্ব মাত্র সন্মাত্রেই প্রলীন; তাই উহা সুবর্ণপিণ্ড মধ্যে অবস্থিত কটক-কেয়ূরাদি নানাকারবৎ নানা হইলেও অনানাবৎ প্রতিভাত।

বৎস! লোকের বুদ্ধি সাধারণতঃ সতত উত্তমাধম বিষয়ের দিকেই ধাবিত, তাই সর্ব্বথা তাহার স্থিরত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব; অতএব তথাবিধ বুদ্ধি সত্যস্বরূপের লাভ-লালসায় প্রধাবিত হইয়াও নিয়ত কেবল ক্লেশই ভোগ করে। এ অবস্থায় ঐ সত্যস্বরূপের প্রাপ্তির পথ কি? একমাত্র অভ্যাস যোগই উহার প্রাপ্তির উপায়। যিনি এই ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তিকে বিশেষ বিচারনার সহিত স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাতীত সন্মাত্র অখণ্ড বোধরূপে প্রত্যয় করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। তথাবিধ দ্বৈতভাব-বিরহিত আত্মজ্ঞ অধিকারীর নিকট হইতে এই সংসারপ্রপঞ্চ অসৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন।

রামচন্দ্র! এই সমস্ত উপদেশই তত্ত্বজ্ঞ জনের আপনা হইতে অনুভূত। তাঁহার নিকট ভূতপ্রপঞ্চের পিণ্ডতা বা প্রত্যক্ষাদির শূন্যতা নাই; কাজেই এতদুভয়াশ্রয়ী মনেরও তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব। যিনি কেবল সন্মাত্র পারমার্থিকরূপে অবশিষ্ট এবং অন্তরে চেতন, ঈদৃশ পরমাত্মার চেত্যবিষয়ক উন্মুখতাই চৈতন্য বা সংসারভাবের জ্ঞান; পরন্তু এইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হওয়াই একান্ত অনর্থজনক এবং উহার যে অপ্রকাশ, তাহাই বটে কল্যাণকর। কেন না, জল যেমন অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিলে তদীয় জড়ত্ব নিবন্ধন স্থূল করকাদির আকার ধারণ করে, তেমনি ঐ জ্ঞানের উদয় ঘটিলে উহা প্রথমতঃ বাহ্য ভাব উপগত হইয়া

স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। চিদাত্মা যখন স্বীয় অজ্ঞান সহ সম্মিলিত হন, তখনই স্বপ্নানুভূত বিষয়বৎ স্থূলভাব লাভ করেন। চিত্ত উহার জ্ঞাপক হয়। চিদাত্মা বাস্তব পক্ষে কোন অবস্থাতেই রূপান্তরিত হন না, তবে যে তাঁহার ভেদ লক্ষ্য হয়, তাহা মাত্র বিভিন্ন শব্দের কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। স্বপ্ন দর্শনে মন বহিরন্তরভাবে জড়িত হইয়া বিকৃত হয়, বোধাত্মার তাহা হয় না; তিনি অন্তরে বাহিরে বস্তু দর্শনে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার বিকৃতি কিছুই ঘটে না। কেন না, বোধাত্মা আকাশ, তাই তাঁহার রূপ আকাশ মাত্র; কালাদির ন্যায় তদীয় বিকৃতি কখনই হয় না। কাজেই স্বপ্নবৎ ঐ আকাশেরও অর্থস্বরূপে পরিণতি হওয়া অসম্ভব। যাহা বোধত্ব, তাহা কখনই একান্ত বিসদৃশ জড়রূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উক্ত বাহ্য বিষয় কদাচিৎ বোধের বশে অন্তর্ভাব উপগত হয়। বোধাত্মা কদাচ দৃশ্য দশায় উপনীত হন না; যদিও কদাচিৎ তদবস্থাপন্ন হন, তথাচ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃতই থাকেন। যৎকালে একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞান-পরিণত আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান হইয়া উঠেন, তখন বোধ ও অবোধ এই উভয়ার্থক বেদ-বাক্যেরও বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং নিজের দৃঢ়তর ভাবনাবশেই আতিবাহিক দেহী মনেরও মহাভূতান্তর্ভাবে স্থিতিজ্ঞান হয়। পরন্তু অভিনেতৃগণ যেমন স্বীয় রূপে অসত্য কল্পিত পিশাচত্ব প্রকটিত করে, তেমনি আকাশবৎ সুনির্ম্মল আতিবাহিক চিত্ত তৎকালে অসত্য আধি-ভৌতিক ভাবের কল্পনা করে। আমি উন্মত্ত নহি, এইরূপ জ্ঞানের উদয় ঘটিলে যেমন উন্মত্ততা উপগত হয়, তেমনি ভ্রান্তি যখন স্বস্বরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখনই উহার উপশম ঘটিয়া থাকে। ভ্রান্তির যখন স্বস্বরূপে সম্যক্ পরিজ্ঞান হয়, তখন বাসনারও উচ্ছেদ হইয়া যায়। যদি স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়াই অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কিঞ্চিৎ ভাবনার বিষয় থাকে কি? উল্লিখিত বাসনার বিলয় হইলে তখন সংসার-ভাবেরও উপশম ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বাসনারে দুষ্টস্বভাবা পিশাচী বলিয়াই মনে করেন এবং সেইরূপ মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিয়া থাকেন। অজ্ঞান-সম্ভূত উন্মত্ততা যেমন অভ্যাসের বশেই সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তেমনি জ্ঞানাভ্যাসের নৈরন্তর্য্যেই কালক্রমে ঐ উন্মত্ততার

উপশম ঘটিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন জ্ঞানাভ্যাসের প্রসাদে আতিবাহিক দেহকে আধিভৌতিকতায় উপনীত করেন, তেমনি আতিবাহিক দেহই জীবস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং সুদৃঢ় জ্ঞানাভ্যাসের ফলে ব্রহ্মসারূপ্যে উপস্থিত হয়।

হে রাঘব! পরমেশ জগৎকারণ; তাঁহার স্বরূপবোধের একত্ব অবগত হইয়া যাবৎ না অখণ্ড বৃত্তির সম্যক্ পরিণতি বুঝিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত অখণ্ড অদ্বয় ভাব বিদিত হইবে। চিত্তের যখন বাহ্য আভ্যন্তর উপশান্ত হয়, তখনই স্বস্বরূপতার প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি, যাহা আকাশ সদৃশ সুশীতল স্বস্বরূপ, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শান্তিময় হও। জ্ঞানী জন জ্ঞানযজ্ঞে ব্রতী হইয়া সংসার জয় করেন এবং তাহাতে সর্ব্বত্যাগরূপ দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞাবসানে ধ্যানরূপ যূপ নিখাত করেন। এইরূপ করিলে তাঁহার সর্ব্বোত্তম পদে অবস্থান হয়। প্রতপ্ত অঙ্গারবৃষ্টি হউক, প্রবল প্রভঞ্জন প্রবাহিত হউক, অথবা ভূকম্পই হইতে থাকুক, কোন কিছুতেই জ্ঞানী জনের শান্তিভঙ্গ হয় না; জ্ঞানী সর্ব্বদা আত্মাতেই শান্তিলাভ করিতে থাকেন। কদাচ তাঁহার আত্মবিচ্যুতি ঘটে না। জ্ঞানীর মন সে কালে বাসনা-বর্জ্জিত হয়। তিনি যথাযথরূপে প্রাণাদির নিরোধ সাধনপূর্ব্বক অসাধারণ পদে অবস্থান করেন।

রামচন্দ্র! যদি বাহ্য বিষয়ে একান্ত বাসনা-বিরহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে চিত্ত অনায়াসেই উপশান্ত হইয়া থাকে। বলিতে কি, শাস্ত্রানুশীলন, গুরূপদেশ, তপস্যা বা দমাদি উপায়যোগেও ঐরূপ চিত্তোপশম ঘটিবার নহে। জ্ঞানী যখন মনে করেন যে, সম্পদ সকল একান্তই বিপদের আস্পদ, তখন তাঁহার মন তৃণরাশির স্থান অধিকার করে, তাহাতে বিষয়বৈতৃষ্ণ্যরূপ অগ্নি সংযুক্ত হয়, আর সর্ব্বত্যাগরূপ পবনের যোগে সে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। সে কালে বাহ্যিক আভ্যন্তরিক অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার ব্রহ্মাণ্ডের ভূতভৌতিকরূপ পিণ্ডভাব এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, এই সমস্তই সেই অদ্বয় চিদাত্মরূপে প্রতিভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মণির নিজাবয়বে যে বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তাহা যেমন তদীয় আত্মস্বরূপেই প্রকট হয়, চিদাত্মাও ঐ সকল

প্রতিবিম্ব সেইরূপই মাত্র ধারণ করিতেছেন; বাস্তব পক্ষে উঁহারা চিদাত্মা হইতে অভিন্ন। আকাশে ধূমই যেমন মেঘের আকারে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি সুর, অসুর, নর, নাগ, গৃহ, গিরিগহ্বর ইত্যাদি বিভিন্নরূপে একমাত্র সেই অখণ্ড চিৎই প্রতিভাত হইতেছেন। এই জড়পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু আছে, সকলই সেই চিদ্‌বিবর্ত্তের নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী প্রাণের সম্পর্কে রসবাহিনী; উহাতে চিদাকাশরূপ জল আছে; সে জলে জীবনিবহরূপ শফরীকুল বিচরণ করিতেছে; ঐ সকল জীবশফরী নিয়তই অজ্ঞানজালে আবদ্ধ হইতেছে। এইরূপে জালবদ্ধ হইয়াই তাহারা স্বস্বরূপ স্থিতি ভুলিয়া যাইতেছে। স্বরূপলক্ষণ আকাশপ্রাঙ্গণে ঘনীভূত মেঘের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক ঐ চিত্তই ক্ষিতিপ্রভৃতি নানারূপে আপনাতেই বিলসিত হইতেছে।

রামচন্দ্র! বাসনা ব্যতিরেকে অন্যান্য সর্ব্বাংশেই সমুদয় জীব সমান স্বভাবশালী; মাত্র বাসনার বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই তাহারা শুষ্ক পত্র-পুঞ্জের ন্যায় উড্ডীন হইয়া স্বর্গ-নরকাদি বিবিধ স্থানে পতিত হয়। জড়া-কৃতি বংশী যেমন অঙ্গুলি-সন্নিবেশে বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ধ্বনি প্রকাশ করে, তেমনি উঁহারা সকলেও জড়ত্ব নিবন্ধন বাসনার বশেই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বৎস! তুমি প্রথমতঃ শ্রবণ-মননাদি উপায়চতুষ্টয়ে অন্বিত হও; প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যানবিঘ্ন জড়তাদিরে দূরে পরিহার কর। সত্বর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ উপায় দ্বারা বাসনাজালময় সংসার-রূপ দৃঢ় পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলো এবং যাহা পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতেই সমুদিত হইয়া থাক; সংসারাসক্ত অজ্ঞের ন্যায় কদাচ তুমি ব্যবহার-পরায়ণ হইও না।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই যে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও নরাদি জীব সকল পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এই সমুদায় জীবের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্ন-জাগর, কেহ কেহ সঙ্কল্পজাগর, কেহ কেহ কেবলই জাগ্রদাবস্থাপন্ন, অন্য কেহ কেহ চির-জাগ্রত, অনেকে ঘন জাগ্রতে স্থিত, কেহ কেহ জাগ্রৎস্বপ্ন এবং অপর কেহ কেহ ক্ষীণ-জাগর। জীবগণের এই সপ্তবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভিন্ন ভিন্ন সাগরে যেমন ক্ষীর-লবণাদি বিভিন্ন জল, তেমনি এই সপ্তবিধ জীবভেদ বিদ্যমান। মদীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আপনি উহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! বহু প্রাচীন কল্পে কোন ভুবনে যে সকল জীব জীবিতাবস্থায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, এ জগৎ তাহাদের নিকট স্বপ্নভাবেই প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল জীব স্বপ্ন-জাগর নামে নিরূপিত। পক্ষান্তরে জীব সকল কোথাও বা সুপ্ত আছে, তাহাদের স্বয়ং সমুদিত স্বপ্ন প্রপঞ্চ আমাদের গোচর হইলে আমরাই তাহাদের স্বপ্ন-নর হইব। তাঁহারা স্বপ্ন-জাগর জীব হইবেন। আমরা যে স্বপ্ন-নর, তাহার কারণ এই যে, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত। তাই বাসনারূপে সদাই আমরা স্বপ্নবান্-দিগের অন্তরে বিদ্যমান্।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্বোক্ত জীবগণ যে সকল কল্পে জন্মিয়াছিল, যদি সে সকল কল্পের কল্পনাবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান কল্পে তাহাদের অবস্থিতি হইতে পারে কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস। স্বপ্নভ্রম ভঙ্গ হইবার পর লোকে যেমন অনিদ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তেমনি জীব সঙ্কল্পের বশে স্বীয় সংস্কারক্রমে দেহান্তর আশ্রয় করে এবং অন্য কল্পিত কল্পের জগৎও অবলোকন করিয়া থাকে। কল্পনাময় আকাশ নিরাবাধ ও সুগম; সুতরাং কল্পিত জগৎ

দর্শনের ব্যাঘাত কিছুই নাই। পূর্ব্বে স্বপ্ন-জাগর জীবগণের কথা বলা হইয়াছে, জানিবে,—তাহারা এই সঙ্কল্পময় জগৎরূপ পক্বোড়ুম্বরের কীট-স্থানীয়। অধুনা শ্রবণ কর, সঙ্কল্প-জাগর জীবগণের কথা কহিতেছি। কোন পূর্ব্বকল্পীয় কোন জগতের কোনস্থানে সঙ্কল্প-তৎপর জীবেরা বিনিদ্র-ভাবে বিরাজ করিতেছিল, ঐ সকল জীবই সঙ্কল্প-জাগর। পক্ষান্তরে যিনি নিজের ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় মনোরাজ্যের অধীন হইয়া পড়েন, পূর্ব্বাবস্থার অনুধ্যান বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া সঙ্কল্পেরই পরিপুষ্টি সাধন করেন, অপিচ সঙ্কল্পই যাঁহাদের চির জাগরাভিমানের বস্তু বলিয়া যাবতীয় মানসিক ব্যাপার সঙ্কল্পেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, সেই সকল জীবই সঙ্কল্প-জাগর নামে নিরূপিত। উহাদের যখন স্বসঙ্কল্পের বিরাম হয়, তখন প্রাক্তন ব্যবহারকেই উঁহারা অবলম্বন করেন। ঐ সকল সঙ্কল্প-জাগর জীব দেখেন যে, আমরা সকলেই সঙ্কল্পবৎ সমুৎপন্ন; সুতরাং সঙ্কল্প-পুরুষরূপেই প্রতীত। ঐ সকল জীবই সঙ্কল্প-জাগর নামে নির্দ্দিস্ট। সঙ্কল্পেই ইঁহারা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমি তুমি ইত্যাদি করিয়া যত কিছু লোক, সকলই সঙ্কল্পময় জীবনে প্রবিষ্ট। এক্ষণে শ্রবণ কর,—কেবল জাগরদিগের কথা কহিতেছি। সেই সকল জীব এই কল্পে পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া দেহধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের কোনরূপ উৎপত্তি ছিল না; সুতরাং তৎস্বরূপ স্বপ্নেরও সম্পূর্ণই অভাব। অতএব তাঁহারাই কেবল জাগর-জীব। এই জীবগণই যখন উত্তরোত্তর জন্মপরম্পরায় জাগর-কার্য্যের নিদানভূত সুষুপ্তিভাবে সঞ্চরণ করিয়া উৎকর্ষ লাভ করেন, তখন চিরজাগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ সকল চির-জাগর জীবই স্ব স্ব দুরদৃস্টবশতঃ জাগ্রদবস্থায় যৎকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জড়ভাব অবলম্বন করে, তখনই ঘন-জাগ্রদাখ্যা প্রাপ্ত পঞ্চম বদ্ধ জীব নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহারা শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গাদি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিশিষ্টরূপ প্রবোধ প্রাপ্ত হন, এবং সেই অবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদবস্থাকে অবলোকন করেন, তথাভূত জীবগণই জাগ্রৎস্বপ্ন নামে নির্দ্দিস্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সপ্তমভূমিকায় আরোহণপূর্ব্বক পরম পদে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহাদিগের নাম ক্ষীণ-জাগ্রজ্জীব।

বৎস! সাগরের যেমন সপ্তবিধ ভেদ, তেমনি তোমার নিকট জীবগণের এই ভেদ বর্ণন করিলাম। তুমি সম্যক্‌রূপে অবধারণ কর,—করিয়া কল্যাণ-ভাজন হও। এ জগতের বস্তু-বিচারণারূপ ভ্রম তুমি পরিহার কর; কেন না, বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান ঘনভাব তোমায় আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে; সুতরাং তুমি সন্মাত্র মুক্ত দেহই প্রাপ্ত হইয়াছ।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কিরূপে সেই পরব্রহ্ম হইতে অহেতুক কেবল জাগর-ভাবের বিকাশ হয়? ইহা আকাশ-গত বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আপনি এ সম্বন্ধে বিশদ করিয়া ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ধীমন্! শ্রবণ কর। যে কার্য্যই হউক, কারণ বিনা কাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কাজেই এ সংসারে কেবল জাগর-ভাব সম্ভবপর নহে। তাহার অসম্ভবতা-বশে অন্য অখিল জীব-ব্যাপ্ত সংসারভাব অকারণ হওয়া অসম্ভব। এই ত অখিল ভ্রান্ত দৃশ্য-জাল; ইহাতে কিছুই জন্মে না বা কিছুই নাশ পাইতেছে না। তবে যে শব্দাদির আড়ম্বর, তাহা কেবল উপদেশ্যের উদ্দেশে উপদেশের নিমিত্তই জানিতে হইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো। কোন্ পুরুষ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া মূর্ত্ত দেহ চেতন করিয়া সম্পাদন করিতেছে? তাহা এক্ষণে ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! এ দেহের বিধানকর্ত্তা কেহই কখন নাই, প্রাণীদিগকে কখন কেহ মোহিত করিয়াও রাখে না; একমাত্র জল যেমন জলভ্রম ও তরঙ্গাদি নানাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি যিনি অনাদি অনন্ত বোধাত্মা, তিনিই বাহ্য বস্তুর আকারে প্রতিভাত হইতেছেন।

যেমন ভূগর্ভস্থিত বীজ বাহিরে বিশাল বৃক্ষরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি অন্তরের বোধ-হৃদয়ই বাহ্য বস্তুসমূহরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পক্ষান্তরে স্তম্ভের পুত্তলিকাদি খোদিত থাকে; কিন্তু তাহারা স্তম্ভ হইতে যেমন পৃথক্ নহে, তেমনি এই যে অখিল সংসার, ইহা সেই বোধাত্মার অভ্যন্তরেই তৎস্বরূপে বিরাজমান। যদি বাস্তব পক্ষে অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ঐ বোধাত্মার বাহ্যাভ্যন্তর কিছুই নাই; উনি দেশ-কালাদি-ক্রমে অনন্তস্বরূপ। কুসুমাদির আমোদবৎ উঁহাকেই বাহ্য আভ্যন্তর দ্বিবিধ জগৎ কল্পনা করা কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধি আছে বটে যে, ব্রহ্ম-লোকাদি বহুদূরে বিদ্যমান। কিন্তু ঐরূপ প্রসিদ্ধি বাসনার বশেই সংঘটিত হয়। কাজেই যখন বিজ্ঞদিগের বাসনার বিলোপ ঘটিয়া যায়, তখন তাহাদের কোন বাসনাই দূরস্থিত ব্রহ্মলোকাদিতে যায় না। তৎকালে এই নিখিল বিশ্বই স্বস্বরূপে একান্ত সন্নিহিতভাবে থাকে। একমাত্র বোধাত্মাই দেশকালাদির প্রতিপাদ্য; তাই যদিও তিনি দেশ, কাল, ক্রিয়া, লোক, রূপ, চিত্ত ও আত্মা এই সকল স্বস্ব গ্রাহক শব্দার্থ হইতে বর্জ্জিত হন, তথাচ সর্ব্বপদার্থই অশূন্য; অশূন্য বলিয়াই ঐ সকল পদে দৃশ্যদর্শন-হীন দ্রষ্টাদিগেরই জ্ঞানের প্রসার ঘটে। ইহা অসাধারণ লোকের কথা; কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা সম্ভবে না। কেন না যাহারা অস্থির 'অহং'ভাবরূপ গভীর গহ্বরে পড়িয়া আছে, তাহারা কদাচ সেই অখণ্ড লোক অবলোকনে সক্ষম নহে। এই বিশ্ব-বিরচন-ব্যাপারে চতুর্দ্দশবিধ ভূতগ্রাম আছে। তত্ত্বজ্ঞানী উহাদিগকে স্বদেহের অবয়ব বলিয়াই অবধারণ করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার নয়নে নিপতিত হয় না।

রামচন্দ্র! কারণের অভাব নিবন্ধন সৃষ্টির উদয়াস্ত নাই। ব্যবহার-দৃষ্টিতে বলা যায় যে, যেরূপ কারণ, কার্য্যও সেইরূপই হইয়া থাকে। প্রশান্ত পয়োধির অভ্যন্তরে যেমন জলতরঙ্গ ও জলভ্রমাদি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, তেমনি সেই অচঞ্চল ব্রহ্মপদেও জগৎ, চিত্ত, ইত্যাদি পদার্থ-পুঞ্জ বিরাজমান। মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে নানাবিধ ভাণ্ডাদি থাকিলেও তাহা যেমন একই এবং কনকপিণ্ড যেমন কটক-কেয়ূরাদি নানারূপে অন্বিত হইলেও এক বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি সেই অমল ব্রহ্ম এই সমগ্র বিশ্বের

আধার হইয়াও এক অখণ্ড-স্বরূপ। ঘট যেমন পিণ্ডাবস্থায় পিণ্ডাকার এবং ঘটাবস্থায় ঘটাকার হয়, তেমনি সাধারণতঃ এক দৃষ্টিতে স্বপ্নকালে এই প্রপঞ্চের জাগ্রদবস্থাও স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবস্থাও জাগর হয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপেই এই জগৎকে অবগত হইয়া থাকেন। জাগ্রদবস্থাতেও জাগ্রৎ যখন চিত্তমাত্ররূপে বিবেচিত হয়, তখন উহা মৃগতৃষ্ণাজলবৎ অবস্থিতি করে; আর উহাকে যদি বিচারবলে আয়ত্ত করা যায়, তবে উহা স্বপ্ন সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন বর্ষাকাল চলিয়া যায়, তখন মেঘদল যেমন ঘন-তুষারাংশ মোচন করে, তেমনি সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ভূতবৃন্দও জ্ঞানীর দেহাভিমান সহ মূর্ত্তভাব পরিহার করে। মেঘ যেমন বারি মোক্ষণপূর্ব্বক অবশেষে আকাশত্ব উপগত হয়, তেমনি সত্যের যখন যাথার্থ্য জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানীর পক্ষে এই পিণ্ডিত জগৎ অহম্ভাব সহ ক্রমশঃ উপশম প্রাপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে শরতের নীরধরের ন্যায় জ্ঞানীর নিকট দৃশ্যতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃগতৃষ্ণাজলবৎ অসৎ হইয়া পড়ে; তাহাতেই জ্ঞানযোগে উহা দূরোৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! প্রজ্বলিত অনলে স্বর্ণ, ঘৃত বা কাষ্ঠ নিক্ষিপ্ত হইলে সে সকল যেমন অগ্নিসহ একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইলেই সংসার ও চিত্ত উক্ত বোধ সহকারেই সরূপতা লাভ করে। শিশুর শৈশবাপগমে যখন বাহ্য-বিষয়ক জ্ঞানোদয় হয়, তখন যেমন গৃহাভ্যন্তরেও তদীয় পূর্ব্বানুভূত পিশাচভয় অপগত হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হওয়ায় এই ত্রিভুবনে মূর্ত্তাদি আকার কল্পনাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ বোধাত্মা অনন্ত ও নিরাকার; তৎসমীপে এই জগৎ, চিত্ত ও তন্মূলক অজ্ঞান এই তিনটীই কারণাভাবে পরিস্ফুরিত হয়। কাজেই এরূপ বোধে স্থূলত্বগ্রহের সম্ভাবনাই থাকে না। বিশেষত এ জগৎ বোধাত্মায় অবোধ হইতে চিত্তবৎ প্রকট হয়। যদি সম্যক্ বোধের সম্পর্কগুণে ঐ অবোধ অপগত হইয়া যায়, তবে আর স্থূলত্ব কল্পনার অস্তিত্ব থাকিবে কিরূপে? অগ্নিযোগে সুবর্ণ গলিয়া গেলে, তাহা যেমন কোমল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তেমনি স্বপ্নাববোধে জাগ্রৎই মূর্ত্তাদি আকারকল্পনারূপ স্থূল প্রপঞ্চ বর্জ্জন করে।

এইরূপ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় জাগরাবস্থা যখন বিচারে তুচ্ছ জ্ঞানে অবজ্ঞাত হয়, শারদাপগমে সলিলের ন্যায় ভোগানুরাগাদি তখন নিতান্তই ক্ষয় পাইয়া যায়। এই দৃশ্য সম্পদ সকল যখন স্বপ্নবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন ইহারা একান্তই হেয় হইয়া পড়ে। তৎকালে এ সকল থাকিলেও বিবেকী ব্যক্তিকে নিজাস্বাদানার্থ বাধ্য করিতে অক্ষম। কেন না আত্মসুখ-সুতৃপ্ত জ্ঞানী জন বিষয়াস্বাদ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন। যদি বিবেকী-দিগেরও বিষয়াস্বাদে উন্মুখতা সম্ভবপর হয়, তবে জাগ্রতে সুষুপ্তে একত্ব সম্ভবে এবং ভ্রান্তে ও জ্ঞানীতেও অভিন্নতা অসম্ভব নহে। এই ভ্রমরূপ সংসার যদি চিত্তরূপে পর্য্যবসিত হইয়া স্বপ্নস্বরূপে অবস্থান করে, তবে হাস্য কিম্বা রোদনাদি বস্তু হইতে সত্যতা জ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ মৃগতৃষ্ণাজলবৎ একান্ত অসত্য এই দৃশ্যজাত কোন ক্রমেই বিবেকীর আস্বাদযোগ্য বস্তু বলিয়া গণ্য হইবার নহে।

হে রাঘব! জগতের প্রতি শান্তমতি জ্ঞানীর যখন সত্যতাজ্ঞানের অভাব হয়, তখন গবাক্ষ-বিবর-পতিত দীপকিরণপুঞ্জবৎ জগৎকে তিনি নিরাকার আকাশরূপে অবলোকন করেন। এই নিমিত্তই জাগর জীব চিত্ত-ভ্রমাত্মক স্রক্‌চন্দনাদির ভ্রান্তিময়ী আস্বাদ-কল্পনাকে পরমার্থ পক্ষে শূন্যাকারেই বুঝেন—বুঝিয়াই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাহা সম্পূর্ণই অবস্তু, সে বিষয়ে কোনরূপ গ্রাহ্যতাই তো অসম্ভব। ফলতঃ স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলে কেহ কি কখন স্বপ্নদৃষ্ট কনকের প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় প্রধাবিত হয়? এই দৃশ্য বস্তু সকল যৎকালে স্বপ্নবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আর ইহাতে কিছুতেই অনুরাগ সঞ্চার হয় না। দৃশ্য দশারূপ দোষের মূলগ্রন্থি ছিন্ন হইলে অহঙ্কার ও মন বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সে কালে আর আত্মীয় স্বজনাদিতে স্নেহবন্ধন থাকে না। জ্ঞানী ব্যক্তি তখন নীরাগ ও নিরায়াস হইয়া শান্তি লাভ করেন।

রামচন্দ্র! যেমন শিখার অপায়ে দীপালোক থাকে না, তেমনি অনুরাগবন্ধন ছিন্ন হইলে বাসনারও বিলোপ ঘটে। অজ্ঞানাবস্থায় এই সমস্ত সংসারই গন্ধর্ব্বনগরবৎ ভ্রান্তিময়; পরন্তু যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন ইহা প্রদীপের প্রভাপটলবৎ প্রকাশস্বভাব শূন্যাকাশ মাত্র লক্ষিত হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি আত্মাতে নাই, আকাশে নাই বা শূন্যে নাই; কেন না, তিনি চরমোন্নতি—সপ্তম যোগভূমিকায় অবস্থানপূর্ব্বক কেবল সেই পরম পদই অবলোকন করেন। তথায় আত্মা নাই, তাহা শূন্য বা জগৎ-কল্পনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহে; অপিচ সেখানে চিত্ত বা দৃশ্য দর্শন বোধ উপনীত হয় না; সকলই মাত্র যথাযথরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। এই ক্ষিতিপ্রভৃতি সমস্ত বস্তু অজ্ঞের নিকটই মূর্ত্তিমৎ বলিয়া অবধারিত হয়। পরন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হইলে ঐ ক্ষিতি প্রভৃতির আকার থাকিয়াও থাকে না।

রামচন্দ্র! যিনি অখণ্ড উপাধিস্বরূপে আকাশবৎ নির্ম্মলভাবে বিরাজ করেন, তিনি অসঙ্গরূপে না থাকিয়াও সদাই অবস্থান করিতেছেন। তিনি নিত্য মৌনী মহাশয়; তাঁহার মন অস্তমিত হইয়াছে; তাই তিনি কর্ম্মবন্ধন উচ্ছেদপূর্ব্বক সংসার-সাগরের পরপারে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। বৎস! কি স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ শরীর, কি তদাধার ভুবনাভোগ, কি তদাধার আকাশদেশ, কি নিখিল ধরাধর, কি অপরাপর সাধনসমূহ, সকলেরই—সকল দৃশ্য বস্তুনিচয়েরই মূল উপাদান কারণ একমাত্র অজ্ঞান। সুতরাং যখন জ্ঞানের অভ্যুদয়ে মূল অজ্ঞানের উপশম ঘটে, তখন এই সকল দৃশ্য বস্তুপরম্পরা থাকিয়াও অসদাকারেই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর হৃদয়ে বিকল্প-বিকাশ নাই; তাই তাহা শান্তিময় হইয়া থাকে। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি তৎকালে স্বস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত হন এবং নির্ব্বাধভাবে বিরাজ করিতে থাকেন।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! পূর্ব্বে যে বোধাত্মার কথা বলিলেন, তিনি যেরূপ ক্রমে জগদাকারে পরিস্ফুরিত হন, আপনি ভেদবোধ খণ্ডন-পূর্ব্বক সেই ক্রম আমায় পুনরায় বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মূল, স্কন্ধ, পত্র ও পল্লবাদিময় পাদপের

ন্যায় অজ্ঞ আত্মা জগৎরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দর্শন সম্পর্কের সদ্ভাবে স্বীয় চিত্তে তাহার ঐরূপই প্রসিদ্ধি। কিন্তু যাহা দৃষ্টি-বহির্ভূত, তাহা বুদ্ধির স্মরণাতীত বলিয়া অপ্রসিদ্ধ। যিনি বিদ্বান্, তিনি পূর্ব্বাপর শাস্ত্রসম্মত বস্তুই দেখেন। পরন্তু যাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াও অশাস্ত্রীয়, তাহা বিজ্ঞ জন ভোগ্য বলিয়া দেখেন না, তাহা করেনও না। অতএব আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমি শাস্ত্র-সম্মতভাবেই বলিব। আমার প্রদত্ত এই শ্রুতি-মনোহর উপদেশ সকল তুমি শাস্ত্রনিষ্ঠ ও শুদ্ধবুদ্ধি হইয়াই শ্রবণ করিতে থাক।

বৎস! মরুদেশীয় কল্পিত নদীর জল যেমন অবাস্তবিক, তেমনি এই জগৎও অবস্তু; সুতরাং এই দৃশ্যপরম্পরারূপ ভ্রম অবিদ্যা বলিয়াই কীর্ত্তিত। নিদাঘ-নদীর জলের ন্যায় বস্তুতঃ এই অবিদ্যা নাই; তথাচ উপদেশ্য বিষয়ের উপদেশ নিমিত্ত তুমি ইহা মদুপরোধে ক্ষণেকের তরে সত্য বলিয়া আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় বাক্য শ্রবণ কর। যখন তোমার সদুপদেশ জন্য ফল-সিদ্ধি ঘটিবে, তখন তুমি এই অবিদ্যাতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। ইহা কোথা হইতে কি নিমিত্ত হয়, সে বিষয়ের সন্দেহ মাত্র তখন আর তোমার থাকিবে না। বস্তুতঃ অবিদ্যার সত্তা নাই; উহা একটা কিছুই নহে, এইরূপ জ্ঞানের বিকাশই তখন তোমার হইবে।

রামচন্দ্র! এই চরাচর যে কিছু সংসার লক্ষিত হইতেছে, যখন মহাপ্রলয় আসিবে, তখন এই সমস্তই সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঘটমধ্যস্থ জল বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত হইলে তাহা যেমন ক্ষয় পাইয়া যায়, তেমনি ক্ষিতি প্রভৃতি অবয়বের বিশ্লেষণ ঘটাইলে এ জগতেরও ধ্বংস হয়। যেমন শাখাদি-সর্ব্বাবয়ব নষ্ট হইলে বৃক্ষ বিনাশ হয়, তেমনি এই প্রকারে জগদবয়ব বস্তুর ক্ষয় হইলে জগদবয়বী ব্রহ্মেরই অনন্তত্ব ও অস্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। এমন কি, তাঁহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। এতদ্দর্শনে আমরা চার্ব্বাকবৎ মহদশক্তিকে মদিরাবয়ব তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশের ন্যায় জ্ঞানকেই ব্রহ্মাবয়ব বলিতে পারি না। কেন না, অস্মাদৃশ আস্তিক ব্যক্তির ধারণায় বিজ্ঞানাধীন দেহ স্বাপ্ন দেহবৎ কখনই যথার্থ হইতে পারে না। জগৎ ক্ষয়ে জগদবয়বী ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকিবার পক্ষে কারণ এই যে, দৃশ্যশ্রী

বারম্বার প্রকট হইয়াও প্রবিলীন হইয়া যায়। ইহা কেবল সেই অনির্দ্দেশ্যা অবিদ্যারই কার্য্য। যে যায়, সে-ই যে পুনরায় ফিরিয়া আইসে, তাহা বলিতে পারা যায় না; সেইরূপে অপর কেহই আসিতেছে, ইহাই বটে নিশ্চিত। যাহা হউক, আমরা পরমার্থস্বরূপ বস্তু লইয়া বিবাদবিতর্কের প্রয়োজন মনে করি না। তিনি নিত্য সৎ জানিবে,—এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এ সমস্তই অনাদি, অনন্ত, শান্ত বোধস্বরূপ চিন্ময়াকাশ। অনুভূতি-প্রমাণে ইহাই বটে স্থির সিদ্ধান্ত। অধুনা এই সকল বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও যেরূপে অনুভূতিগোচর হয় না এবং যে প্রকারে ইহা ব্রহ্মাভিন্ন ভাবে সিদ্ধ হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

রামচন্দ্র! মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না; সামান্য তৃণ গাছটী হইতে মহাদেব পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য বুদ্ধি কিম্বা মনের কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না। সেই অনাদি কালে আকাশও উপশান্ত হইয়া যায়। তৎকালে ক্রমশঃ জল, বায়ু, তেজ ও তিমির একেবারেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এইভাবে যখন সমস্ত শাব্দ বিষয় একান্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সৎশব্দ-প্রতিপাদ্য একমাত্র শান্ত বোধাত্মাই অবশেষে বিরাজ করেন। তাই তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি চিরন্তন অব্যয় পুরুষ; তিনি ইন্দ্রিয়গোচর নহেন; কোন বাক্য দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং কোনরূপ নাম-নিরুক্তিই নাই। তিনি অখিল জীবের অন্তরাত্মা; তথাচ তিনি স্বয়ং শূন্যস্বরূপ। সেই ইনিই সদসৎ-নির্ব্বাচ্য পরম পদ। অতএব ইনিই না বায়ু, না আকাশ, না বুদ্ধি, না মন, না শূন্য কিছুই নহেন। যিনি ইহাঁকে যথাযথরূপে বিদিত হইয়া ইহাঁর পদে অবস্থান করেন,—করিয়াও এতদ্বিরহিত হন, তিনিই ইহাঁকে সমীচীনরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ কেবল শাস্ত্রানুসারেই ইহার এইরূপে বর্ণন করেন যে, ইনি না কাল, না মন, না আত্মা, না সৎ, না অসৎ, না দেশ, না দিক্, এতৎ-সমুদায়ের কিছুই নহেন অথবা ইনি দেশ-কালের অন্তঃপাতী নহেন। যাঁহারা জ্ঞানের উন্নত সীমায় উপনীত হইয়াছেন, সংসারভাবের উপশমে সংসারের পরপারে যাঁহারা পৌঁছিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষেরাই

ইঁহাকে অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনস-গোচর স্বচ্ছ স্বরূপে অবগত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! সেই বোধাত্মায় শ্রুতিপ্রভৃতির নির্দ্দেশ ক্রমে যে ভাব-সমষ্টি নিষিদ্ধ আছে, আমি স্বীয় বুদ্ধিযোগে সাগরগত তরঙ্গরাজির ন্যায় তৎ-সমুদায়ের নির্ণয় করিয়াছি। স্তম্ভোপরি খোদিত হয় নাই, তথাচ বিবিধ কৃত্রিম পুত্তলিকা যেমন সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান, তেমনি সেই বোধাত্মায় নিখিল জাগতিক ভাবসমষ্টিই সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই ভাবে নিখিল জাগতিক ব্যাপারের সত্তা তাঁহাতে থাকিলেও জ্ঞানদশায় কোন কিছুর সত্তাই তাঁহাতে নাই। যোগী জনেরা দেখেন, বোধাত্মায় কোন ভাবই নাই, তথাচ স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহাতে সর্ব্বভাবের পরিণতি পরিদর্শন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সেই সর্ব্বস্বরূপ পদ সর্ব্বভাবে পরিপূরিত হইয়াও সর্ব্বার্থ-বিরহিতভাবে পরিলক্ষিত হয়।

হে প্রশস্তমতে! জানিয়া রাখ, যে পর্য্যন্ত না সমাধিকাল আসিবে, সর্ব্বভাবে শান্তিলক্ষণ সম্যক্ জ্ঞান ততক্ষণে তোমার প্রাদুর্ভূত হইবে না। কেন না, আত্মসন্দেহই তৎকালে তোমার জ্ঞান জন্মিবার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে।

রামচন্দ্র! যিনি দৃশ্যনিচয়ের আভাসবর্জ্জিত চরম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তথাবিধ অমলমতি শান্তিময় মানবই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মভাব দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সরূপ এবম্বিধ হইলেও ইহাতে যে 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপে ত্রৈকালিক জগদ্‌ভ্রান্তি লক্ষিত হয়, উহা কেবল কল্পনার সাহায্যেই সম্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই কল্পিত জগতের ভেদ-ভিন্নতা লাভ অসম্ভব। বৎস! সেই বোধাত্মা বিশ্ব হইতে একান্তই ভিন্নভূত; তাই তিনি জগৎ—দ্বৈতভাবে অন্বিত রহিয়াছেন। কাজেই যাহা দেশাদি শব্দসমূহের নিমিত্তীভূত,—জাতি গুণ-ক্রিয়াদির সহিত অসম্পর্কিত, তথাভূত দেশ-কাল-ক্রিয়ার স্বরূপসমষ্টি তাঁহাতে পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে সে সকল অকিঞ্চন বা কিছুই নহে। চিত্রকর চিত্রাভ্যন্তরে যেমন অসত্য তরঙ্গভঙ্গময়ী তরঙ্গিণীকে চিত্রিত করে, তেমনি কল্পনাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মে জগৎকল্পনা করিয়া

থাকে। মৃৎপিণ্ডে যেমন ভাবী রচনাযোগ্য বাহু ভাণ্ড নিহিত, তেমনি পর-ব্রহ্মেও এই জগদ্ভাব অবস্থিত। অতএব এ সংসার তাঁহাতে প্রকৃত পক্ষে না রহিলেও রহিয়াছে এবং তাঁহা হইতে অপৃথক্ হইলেও স্বভাবতই তাঁহা হইতে পৃথগ্ভূত। নিত্য নির্ম্মল একমাত্র পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞানের সম্পর্ক-বশতঃ কেবল শান্তস্বরূপেই অবস্থিত। এই ত্রিভুবন যেন কৃত্রিম পুত্তলিকা; ইহা ব্রহ্মরূপ দারুতে অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেই বিরাজমান। অথবা এই সকল সৃষ্টিব্যাপার অধিকারী আত্মাতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিরতিশয় আনন্দ-জলে পরিপূর্ণ চিন্ময় সরোবরে চিদ্ঘন-বিনিঃসৃত অমৃত-বৃষ্টির ন্যায় এই সৃষ্টিদর্শন অবিভাগ ও অবিকার আত্মার বিভাগদশায় বিকৃত হইয়াও অপ্রকাশে প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি পরমাণুতে এই সংসার সকল সুদৃঢ় ভাবে সংসক্ত রহিলেও কিছুই কোন প্রকারে স্ফুরিত হয় না।

হে রাঘব! কাল, আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় সেই অশরীরী আত্মার অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আরোপ একান্তই মিথ্যা। কেন না, উহাদের কোনই অবয়ব নাই। সেই আত্মতত্ত্ব অবিনশ্বর; উহা সমস্ত ভাববিকার হইতে পরিবর্জ্জিত হইলেও শ্রুতিসমূহের নির্দ্দেশ এই যে, উহাই বটে সর্ব্বস্বরূপ।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! যেরূপে কালে কালত্ব, আকাশে আকাশত্ব, জড়ে জড়ত্ব, বায়ুতে বায়ুত্ব, ভূতে ভূতত্ব, ভবিষ্যতে ভবিষ্যদ্ভাব, স্পন্দস্বরূপে স্পন্দতা, মূর্ত্তস্বরূপে মূর্ত্তস্বরূপা, পৃথগ্‌বিষয়ে পার্থক্য, অনন্তে অনন্তত্ব, এমন কি এই সমস্ত দৃশ্যে দৃশ্যত্ব ও সৃষ্টিমাত্রেই সৃষ্টিত্ব এবং সমস্ত স্মৃতিবিষয়ে তত্তদ্ভাব বিদ্যমান, আপনি তাহা ব্যক্ত করুন। হে বক্তৃবর। পূর্ব্বাপর বর্ণন করিলে যেরূপে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাও সহজে

অবগত হইতে পারে, আপনি ঐ সকল বস্তুর অসাধারণ ভাবসমূহের অবস্থিতি বিষয় সদুপায় ক্রমে সেইরূপই নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসিলে, সে সম্বন্ধে কথা এই যে, কেবল অনন্ত চিদাকাশ ব্রহ্মই বিকাশমান; তিনি ব্যতীত কিছুই কিছু নহে। তিনি চিৎস্বরূপ অজ্ঞেয় শান্তিময় আত্মা; তিনিই অদ্বৈত-ভাবে বিরাজমান। বস্তু ভাবের অধ্যাস তাঁহাতেই হইতেছে।

হে রঘুনাথ! যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির সহিত সমস্ত নামরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। সে কালে যে শুদ্ধ সত্ত্ব অবশেষে বিরাজ করেন, তিনিই পদার্থসমষ্টির ভাব স্থষ্টিকারণরূপে নিশ্চিত। মায়া, মোহ ও ভ্রমাদি কোন কিছুই সেই সদাত্মায় নাই। অতএব তাঁহার লয় হওয়া অসম্ভব কথা। তিনি নিত্য শান্ত, সুনির্ম্মল; তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, সেই সন্মাত্রই অবশেষে বিরাজমান। যৎকালে তিনি চিন্ময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তখন এরূপ উক্তি কিছুতেই করা যায় না যে, তিনি নাই; অপিচ নির্ম্মলরূপে তাঁহার প্রতীতি হয় বলিয়া তিনি যে আছেন, এরূপ উক্তিও অযুক্তিসিদ্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মসম্বিদ্ নিমেষ মধ্যে শতযোজন স্থান উপগত হইলে তাহার তাৎকালিক যে নির্ব্বিষয় রূপ, জানিবে,—তাহাই তৎপদস্বরূপ। এইরূপে আরও জানিবে,—যাঁহার বিষয়মোহ নাই বা যদীয় বাহ্য আভ্যন্তর বাসনাজাল ছিন্ন হইয়াছে, তাদৃশ শ্রেষ্ঠ যোগী নিশীথকালে জাগরিত হইয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে সমাধি অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক যাদৃশ রূপ অনুভব করেন, তাহাই তৎপদ-স্বরূপ। অথবা যিনি সুখে দুঃখে অসংস্পৃষ্ট, তাদৃশ জ্ঞানী জনের যে শান্তিময় অচঞ্চল চিত্তাকৃতি, তাহাই তৎপদ-স্বরূপ; কিম্বা তৃণ-গুল্ম-লতাদির উৎপত্তিব্যাপারে তদনুগত সামান্য সত্তার যে বিকাশভাব, তাহাই তৎপদস্বরূপ; এবং তাহাই বস্তুমাত্রের সত্তা। সেই সামান্য সত্তারূপ ঘট-পটাদির আকৃতিতে এই জগৎস্বরূপ সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হইলেও আগন্তুকতা বশতঃ উহা সকারণবৎ ও নানাকারে ভীষণবৎ প্রতিভাত হয়। বাস্তব পক্ষে সকলই মিথ্যা; কাজেই কারণাভাবে সমস্তই অনুৎ-পন্ন এবং সমস্তই সম্পূর্ণ সত্তাহীন; কেন না, যাহার কারণাভাব,

তাহার সত্তা নিশ্চিতই অসম্ভব। প্রত্যক্ষাদি যোগে ইহা সকলেই সতত উপলব্ধি করিতেছে। কাজেই ইহা গোপনে রাখিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এ জগতের কারণ বলিয়া শূন্যকে কখনই উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে শূন্যের আদি অন্ত অসৎ বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইতে পারিত। ব্রহ্ম মূর্ত্তি-বিরহিত; সুতরাং এই মূর্ত্তিমৎ অব্রহ্ম জগতের কারণ হওয়া তাঁহার পক্ষেও কোনক্রমে সম্ভব নহে। অতএব নিরাকার ব্রহ্মে যে জগৎস্বরূপের প্রতিভান, তাহাও ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়। সেই চিদাকাশ ব্রহ্ম নিজেই দৃশ্যাকারে প্রতি-ভাসমান। এখন কথা এই, সেই চিদ্‌ব্রহ্ম-ভাব হইতে এ জগতের যে পৃথক্ দৃশ্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, উহা কি?—উহা একান্তই ভ্রমস্বরূপ। সুতরাং এই যত কিছু বস্তু, সমস্তই সেই অনাময় অজ, ব্রহ্ম; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এ বিষয়ে শ্রুতির বাক্য এই যে, পূর্ণ হইতেই পূর্ণের বিকাশ; পূর্ণেই পূর্ণ বিরাজমান; পূর্ণেই পূর্ণের উদয় ও পূর্ণেই পূর্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

রামচন্দ্র! যাহার ক্ষয় নাই, উদয় নাই; কোনরূপ আকার নাই, যিনি স্বচ্ছ, শান্ত অদ্বয় চিদাকাশরূপে সদসৎ উভয়ত্রই একরূপে সমুদীয়মান এবং যিনি সতত সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত, তিনিই উত্তম জ্ঞানময় ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই মাত্র অবশিষ্ট। তিনিই আদি, তিনিই নির্ব্বাণ, তিনিই আছেন; তিনি ব্যতীত বস্তু ভাবাদি অপর কিছুই নাই।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! প্রসিদ্ধি আছে যে, এ জগৎ আকাশ-বৎ সুনির্ম্মল। এখানে বস্তুর ভাবাত্মক ব্রহ্মই মাত্র অবস্থিত; তাই ঘটপটাদি বস্তু স্বরূপ চিদাকাশই আকাশে প্রকাশমান। অতএব যাহা জগৎশব্দের অর্থ, তাহাও কার্য্য-কারণ-বিরহিত অজ ব্রহ্মস্বরূপ। 'তুমি'

'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি শব্দার্থ-স্বরূপ শান্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মেই অভিন্নভাবে প্রতিভাত হইতেছেন; পরন্তু ভিন্নভাবে নহেন। সাগর, শৈল, জলদ ও তরঙ্গাদি যে কিছু দৃশ্য আছে, এতৎসমুদায়-স্বরূপ জগৎ অবিচল কাষ্ঠ-বৎ ব্রহ্মরূপেই বিরাজমান।

রাম! দ্রষ্টা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন,—করিয়া প্রকৃতির অধীন হইয়াই দৃশ্য-দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। ঐরূপে কর্ত্তাও কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। পরন্তু কার্য্য-কারণের অভাববশেই জগতে জ্ঞত্ব, জড়ত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, শূন্যত্ব বা বস্তুত্ব প্রভৃতি নাই। অদ্বয় ব্রহ্মই কেবল সর্ব্বত্রে বিস্তৃত আছেন; তিনি সত্য, চিদ্ঘন, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বস্বরূপ, শান্ত এবং বিধি কিম্বা নিষেধে সমভাবাপন্ন। সুতরাং জীবন-মরণ, সত্য-অসত্য, শুভাশুভ, এতৎসমুদায়ের জ্ঞান আকাশ-তরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গময় জল-কল্লোলবৎ একান্তই ভ্রমস্বরূপ। ব্রহ্মই সত্য; জানিবে—তিনিই সর্ব্বস্বরূপ। স্বপ্নাবস্থায় জীব যেমন ব্যবহারিক নগরাদিতে অসংস্পৃষ্ট থাকে,—থাকিয়া প্রাতিভাসিক গৃহাদিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি বুঝিতে হইবে, একমাত্র ব্রহ্মই জীবভাবে বিভক্ত হন—হইয়া দৃশ্যত্ব ও দর্শকত্ব লাভ করেন। এই যাহা বলিলাম, ইহা একটা কল্পনামাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এই যে স্বপ্নানুভূত গৃহাদিবৎ চিদাকাশে জগৎ বিদ্যমান আছে, ইহা কেবল নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়। এই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই জীবাত্মাসহ বিভক্ত হইয়া জগদ্ভাবে বিরাজমান। অতএব এই যে সর্ব্বময় জগৎ, ইহা অগ্রে যেরূপে দৃশ্য-বিরহিত ছিল, এখনও সেই সৎস্বরূপে বিদ্যমান। বৃক্ষান্তরাল হইতে চন্দ্রদর্শী ব্যক্তির নিকট চন্দ্রের একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতির ব্যবহিত স্থানের অনির্দ্দেশবৎ প্রমাতার নিকটও জগতের পরিচ্ছেদ জ্ঞান অসম্ভব। জলাবর্ত্ত ও জলতরঙ্গাদির আকারে জলই যেমন সতত লক্ষিত হয়, তেমনি চিদাকাশে জগৎস্বরূপও চিদাকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এই সৃষ্টিব্যাপারের কারণ কিছুই নাই। ইহার কারণ শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক পদার্থ; এইজন্য বিশেষ যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিলে উহার কারণ কিছুই মিলে না। বৎস! যাহার কারণ নাই; বলিতে হইবে, তাহার বিকাশ একান্তই ভ্রমাত্মক; যাহা মিথ্যা ভ্রম, তাহার সত্যস্বরূপতা

কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। যদি বিশেষ কারণ না থাকে, তবে কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না। অপুত্রক ব্যক্তির পুত্রদর্শন যেমন ভ্রমাত্মক, ঐ কার্য্যও তেমনি ভ্রমমাত্র বৈ কিছুই নহে; ঐ কার্য্যে সদ্রূপত্ব কিছুই নাই। বিশেষতঃ কারণ-বিরহিত হইয়া যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা সর্ব্বথা সঙ্কল্প-কল্পিত গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দ্রষ্টৃস্বভাবেরই বিকাশ মাত্র। অপিচ এরূপও নিশ্চিত আছে যে, বোধাত্মাই বস্তুস্বরূপে বিকাশ পাইয়া থাকেন। পরন্তু সেই বোধাত্মা অতীব সূক্ষ্ম; চিদাকাশ হইতেও তদীয় সূক্ষ্মতা সুপরিব্যক্ত; এ বিষয়ে স্বপ্ন-দৃষ্ট সঙ্কল্প-কল্পিত পর্ব্বতই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ্য ও অনুভূতি-লভ্য।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ক্ষুদ্র বীজের অভ্যন্তরে যেমন ভাবী বিশাল বৃক্ষ নিহিত, তেমনি এই বিশাল জড় সৃষ্টি ক্ষুদ্র পরমাণুমধ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে না কেন? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবর! বীজ যেখানে নিহিত আছে, তথায় শাখা-পল্লবাদিময় ভাবী বিশাল বৃক্ষ রহিয়াছে; এ কথা সত্য; পরন্তু জানিতে হইবে—ঐ বৃক্ষ ক্ষিতি ও জলাদিরূপ সহকারী কারণগুণেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে কথা এই, মহাপ্রলয়ে সর্ব্ববস্তু যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন এই জগৎ সৃষ্টির কারণীভূত কোন প্রকার সাকার বীজেরই সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহা হইতে জগৎসৃষ্টিব্যাপারে কোন-রূপ সহকারী কারণও যে থাকিবে, তাহারও অসম্ভাবনা সম্পূর্ণই। তবে কি পরব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা যাইবে? না—তাহাও নহে; কেন না, তাহার আকারকল্পনা হইতেই পারে না; অধিক কি তাঁহাতে পরমাণু-সম্পর্কও নাই। কাজেই কিরূপে তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে? ফলে তাঁহাতে জগৎ-কারণতা নাই। এই সকল কারণেই বলা যায়, এই যে সত্যাসত্যস্বরূপ জগৎ আছে, ইহার কারণাত্মক বীজের একান্তই অসম্ভাবনা; সুতরাং কেহই কোথাও কোন প্রকার জগৎ-সত্তা উপগত হয় না। বিশেষতঃ পরমাণু অতীব ক্ষুদ্র; তন্মধ্যে বিশাল সংসার বিদ্যমান। এরূপ উক্তিও একান্তই অসঙ্গত। উপমাস্থলে বলা যায়, ক্ষুদ্র সর্ষপকণার অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড সুমেরু বিদ্যমান; ফলে অজ্ঞদিগের এরূপ

কল্পনা সম্পূর্ণই অসম্ভব। যদি বীজ থাকে, তবেই কার্য্য-কারণ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু জগৎ নিরাকার; কাজেই বীজও অসম্ভব; সুতরাং জন্য-জনকরূপ যে একটা কার্য্য-কারণ ভাব, তাহাও নাই। অতএব এ কথা নিশ্চয়ই, যাহা পরম পদার্থ, সেই ব্রহ্মই মাত্র জগতে পর্য্যবসিত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুরই বিকাশ বা কিছুরই ধ্বংস হইতেছে না। তবে এই যে কিছু দেখা যাইতেছে, এতৎসমস্তই চিদাকাশ; চিদাকাশই এ সকল ভ্রান্ত জগদাকারে লক্ষিত এবং অশুদ্ধে অশুদ্ধ ও শুদ্ধে শুদ্ধবৎ পরিদৃষ্ট হয়। পবনে স্পন্দবৎ তদীয় আকাশরূপ প্রতিভাসমান; কাজেই এ বিষয়ে কোনরূপ সৃষ্টিশব্দের বিষয়-বিকল্পনা থাকিবার নয়। যেমন আকাশে শূন্যত্ব ও জলে দ্রবত্ব, তেমনি আত্মায় স্ববিবর্ত্ত-স্বরূপ বিশুদ্ধ পার্থক্যই সৃষ্টিরূপে সমবেত। উহাতে বাস্তব ভিন্নতা কিছুই নাই। ভাসমান ব্রহ্মই আমাদিগের নিকট জগদাকারে বিতত; তাঁহার আদি-অন্ত নাই; কাজেই নিত্য সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উদয় বা বিলয় কিছুই নাই। প্রমাতার দেহ ক্ষণমধ্যে দেশান্তরে গমন করে। তাহার ঐরূপ গগনে সে দেহ যেমন শূন্যাত্মক বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়, তেমনি এই জগৎও শূন্য আকাশস্বরূপেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন পবনে স্পন্দন, জলে দ্রবত্ব, ও আকাশে শূন্যত্ব স্বধর্ম্মরূপে সংযুক্ত আছে, এই জগৎও তেমনি বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক-বিরহিত হইয়া আত্মাতেই অভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছে।

বৎস! এ জগৎ পরমার্থ-স্বভাবে অবস্থিত; ইহা সম্বিদাকাশ। ইহার অস্ত কিম্বা উদয় নাই। ইহাতে সৌরকর সম্পর্কের অভাব বলিয়া ইহা শূন্যাকাশ নামের যোগ্য বটে; তথাচ ঐরূপ আকাশ একান্তই অপ্রসিদ্ধ। কেন না, সমস্ত দৃশ্যপরম্পরার চিৎস্বভাব তথাবিধ আকাশের অঙ্গ হইতে পারে কিরূপে? অতএব তোমায় বলি, তুমি সমস্ত দৃশ্য-পরম্পরা পরিহারপূর্ব্বক চিদাকাশরূপে অবস্থিত হও।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস রাম! এ জগতের ব্রহ্মাদ্বৈতই যখন প্রতিপন্ন হইল, তখন জানিবে,—কারণ বিনা সৃষ্টিব্যাপারে ভাবাভাবের স্বীকার-পরিহার-রূপ স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর বিশ্ব পূর্ব্ব হইতেই অনুৎপন্ন। মূর্ত্তিমান্ বৃক্ষাদির যেমন কারণীভূত বীজ, তেমনি নিরাকার আত্মা কখনই সৃষ্টিব্যাপারের কারণ নহেন; ঐরূপ কারণ তিনি কোন ক্রমেই হইতে পারেন না। পূর্ব্বে এ কথা অনেকবার বিশেষ করিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব যিনি অনুভবসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি এই কল্পনাময় সংসারকে চিৎস্বরূপেই বিদিত হইয়া সর্ব্বদা স্বাত্মায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ ভাবনা করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফলই অধিগত হইয়া থাকে। মদিরা-সম্পর্কে আত্মার ক্ষুব্ধতা হয়, তদনুসারে সে যেমন মত্ততাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞ আত্মা চিদ্‌বিধাতার ভাবনানুরূপ যে সৃষ্টি-ব্যাপার, তাহারই অনুগামী হইয়া থাকেন।

রাম! এইরূপে উৎপত্তি-বর্জ্জিত বলিয়া সমস্তই যখন অকিঞ্চিৎরূপে দেখিতে পাইতেছ, তখন তুমি একমাত্র সেই শান্ত ব্রহ্মকেই বিদিত হও। সলিলে যেমন সলিল দ্রব, তেমনি এক সেই চিদাকাশেই চিদাকাশ এবং সেই চিন্ময়তা বশতই জগদ্‌বিকাশ। এই কারণ প্রবাদ এইরূপই চলিয়া আসিতেছে যে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদাকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফল কথা, এ জগৎ স্বপ্নাবস্থার ন্যায়ই অনুভূত হইতেছে অথবা কাচাবৃত চক্ষু দ্বারা চাহিয়া দেখিলে আকাশের যেমন বৈরূপ্য দেখা যায়, তেমনি সৃষ্টিস্বরূপে ভাবিত চিদাকাশে এই বিচিত্র জগৎ বিকাশ পাইতেছে। অতএব এ জগৎ কাচাবরণে দর্শনের ন্যায় কিম্বা স্বপ্নানুভূতির ন্যায় অজ্ঞের নিকট প্রতিভাসমান হইতেছে। যদি বস্তুগত্যা বুঝিতে হয়, তবে বুঝিবে, —চিদাকাশই কেবল বিরাজ করিতেছে।

বৎস! সেই আদি সৃষ্টির প্রারম্ভে নদীতরঙ্গ সকল যেভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, অদ্যাপি তেমনি ভাবে প্রবাহিত হইয়া

আসিতেছে। এইরূপে বুঝিয়া দেখ, নিখিল পদার্থরচনাই সৃষ্টি-বিষয়িণী। আরও দেখ, নদীর তরঙ্গশ্রী যেমন জলসত্তার অনতিরিক্ত, তেমনি এই জগতেরও চিদাকাশে চিৎসত্তার অতিরিক্ত সৃষ্টি-ব্যাপারের সম্পূর্ণ অভাব। অপিচ মৃত্যু দেখিয়াই বা একান্ত নাশ স্বীকার করা যাইবে কিরূপে? এই অস্বীকারের প্রতি কারণ—উহা তো সুষুপ্তিদশার পরমানন্দরূপ সুখ-বিশেষ বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপে দেহাদিস্বরূপে পুনরায় যে সংসারোদয় দেখিতেছ, উহাও তো নূতন সংসার-সুখ মাত্র। অতএব জননে এবং মরণেও তো সুখাতিরিক্ত সত্তা নাই; কাজেই কোনওরূপ ভয়েরও কারণ নাই। যদি বল, সমস্ত কুকর্ম্মই মৃত ব্যক্তির নরক-সম্পাদক; সুতরাং তাহা হইতে তো ভয়ের সম্ভাবনা আছে। এ কথার উত্তরে বলা যায়, ঐ ভয় জীবিত এবং মৃত উভয়ের পক্ষেই সমান; কেন না, নরকাদির যে সত্তা, তাহাও ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বীকার্য্য নহে। যাহা দুঃখ, তাহাও সুখরূপে অবস্থিত, এ অবস্থায় পৃথক্ ভয় কিরূপে থাকা সম্ভবপর?

রামচন্দ্র! জীবন ও মরণ, এতদুভয়ের স্থিতিরূপিণী যে সত্তা, তাহাও ব্রহ্মসুখাত্মিকা; ইহা অবগত হইয়া যদীয় চিত্ত চিরবিশ্রাম লাভ করে, তাঁহারই অন্তরাত্মা শীতল হইয়া থাকে। তাঁহার সমস্ত দৃশ্য দর্শন বিলুপ্ত হওয়ায় যেরূপ সম্বিদ্ প্রকাশ পায়, তিনি সেই সম্বিন্ময় হইয়াই থাকেন; তাই তখন তাঁহার মুক্ত নাম প্রখ্যাত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দৃশ্য-পরম্পরার অত্যন্তাভাব নিশ্চিত বলিয়া যে কোনরূপ সম্ভাবনে সৃষ্টি-কার্য্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সত্ত্বেও দৃশ্যনিচয়ের যে নির্ব্বিষয় জ্ঞান, তাহাই মুমুক্ষুর মুক্তত্ব-সাধক।

হে রাঘব! যাহা অচেত্য, তাহা চিতিক্রিয়ার রূপ হইতে পারে না; অতএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা চিন্তাবের সহিত একত্ব লাভ করিয়া ব্যবহারে বিরত হইয়া থাকেন। চিদাকার কাচের অসকৃৎ বিস্ফুরণই জগৎসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কেন না, পরমাকাশ অতি বিমল; তাহাতে বন্ধন বা মুক্তির সম্পর্ক থাকা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। চিদাকাশের যে স্পন্দন বা সঙ্কল্প, তাহাই জগতের স্বরূপ; উহাকে কখনই ক্ষিতি

প্রভৃতি পৃথক্ ভূতময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, আকাশ, এ সকল কিছুই নাই, না থাকিলেও সকলই প্রতিভাসমাত্রে সতের ন্যায় বিলসিত হইতেছে। এরূপ হইলেও প্রকৃত অনুসন্ধানের ফলে সমস্তই একান্ত অসৎ। পরমার্থ পক্ষে এতৎসমস্তই চিদ্‌ঘন স্ফুরণ। ইহারা অশূন্য হইয়াও শূন্য এবং আকাশাপেক্ষাও সমধিক সুনির্ম্মল। ইহাদের আকার প্রত্যক্ষ হইলেও ইহারা নিরাকার এবং অসৎ হইয়াও অতীব দীপ্তিশালী। তবে ইহা কি? ইহা আর্ত্ত শুদ্ধ একমাত্র চিৎস্বরূপ।

রামচন্দ্র! চিদাকাশের কলুষরূপই জগৎ, আর তাহার যে অকলুষ স্বচ্ছরূপ, তাহাই পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাণাখ্যায় অভিহিত। ঐ স্বচ্ছরূপ সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। আকাশে যেমন শূন্যত্ব, এবং সাগরে যেমন দ্রবত্ব, তেমনি ঐ জগৎ উহাতে অভিন্ন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৫

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আকাশে শূন্যত্বের ন্যায় চিদাকাশে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বচ্ছভাবেই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার যেরূপ স্বচ্ছতা, তাহা দূর করিবার শক্তি দৃশ্যশ্রীর নাই। যেখানে চিৎশক্তি আছে, তথায় সৃষ্টিব্যাপার সত্ত্বেও পদার্থ-সমষ্টির চিন্ময়তা নিবন্ধন কোথাও অচিদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। স্বপ্ন-দর্শন-কালীন শৈলাদি পদার্থ-সমষ্টি চিদাকারেই পরিলক্ষিত হয়; এইরূপে জাগরণকালেও পদার্থ ব্যক্তি অদ্বয় চিন্ময় পরমাকাশরূপেই অনুভবলভ্য হয়। বৎস! এ বিষয়ে তোমার নিকট পাষাণোপাখ্যান বলিতেছি। এই উপাখ্যান সমস্ত ভ্রান্তিরোগের ঔষধিস্বরূপ। পূর্ব্বে আমিই ঐ উপাখ্যানের প্রকৃত চিত্র দেখিয়াছিলাম, যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

একদা আমি সর্ব্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া পূর্ণকাম হইলে এই ভ্রান্তিময় লোক-ব্যবহার পরিহার করিবার আমার বাসনা জন্মিল। আমি চির-বিশ্রান্তি লাভের জন্য বিজনে কোন দেবমন্দিরে বসিলাম এবং সংসারভাব পরিহারপূর্ব্বক ধ্যানে তন্ময় হইলাম। তখন আমার অন্তরে এইরূপ চিন্তা সমুদিত হইল। ভাবিলাম,—এই সকল সংসার ভাব একান্তই বিনশ্বর; আর এই যে আপাত মনোহারিণী লোকস্থিতি, ইহারও পরিণাম একান্তই দুঃখাবহ। এমন কোন দেশ বা কাল নাই, যেখানে ইহা কোন প্রকারেই সুখজনক হইতে পারে। বিশেষ কথা এই যে, এই সকল দৃশ্য দর্শনের ফল ইষ্টানিষ্ট উভয়াত্মকরূপেই উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে উদ্বেগও উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল কি? আমি এ কি দেখিতেছি? এই নিখিল সংসারই সেই অনাদি চিদাকাশ; এ সমস্তই সেই চিন্ময় আত্মায় বিরাজমান। অতএব আমি এই সিদ্ধ-বিদ্যাধর-দৈত্য-দানব-সঙ্কুল অতীব দুর্গম দেশ পরিহারপূর্ব্বক ইহা অপেক্ষা কোন এক উত্তম স্থানে উপনীত হই। এই আমার নিজের দেহ আমি অন্তর্দ্ধানাদি উপায় দ্বারা গোপনে রাখি এবং সর্ব্বভূতের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে সেই সম সুনির্ম্মল শান্তিময় পরমপদে গমনপূর্ব্বক বেদনা-বিহীনভাবে অবস্থান করি। কিন্তু অধুনা তাদৃশ একান্ত শূন্য দেশ কোথায় পাইব,—যথায় যাইলে ভূতপঞ্চকের সম্পর্ক জন্য বেদনা আমার আর অনুভূত হইবে না? ঐ অদূরে পর্ব্বত, উহাকেই আমি কি সমাধিস্থান করিব? না,—তাহা হইবে না; কেন না, নানা শব্দসঙ্কুল অরণ্য আছে, জল আছে, মেঘ আছে, বিবিধ প্রাণী আছে, এই সকল দ্বারা একান্ত সমাকুল বলিয়া ঐ পর্ব্বত আমার নিকট বড়ই চঞ্চল; বিশেষতঃ পর্ব্বত সকল নিজেরাই যে কেবল চঞ্চল, তাহা নহে; তাহারা অপরকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। অতএব পর্ব্বত আমার অনুকূল নহে; তাহারা আমার শত্রুস্থানীয়। পর্ব্বতের উপত্যকাদেশও সমাধিযোগ্য নহে; কেন না, সে সকল দেশে কিরাত প্রভৃতি নীচ জাতির বাস; সুতরাং তাহাও সমাধির প্রতিকূল। জনপদের তো কথাই নাই; তাহা বিষয়রূপ বিষধরগণে নিত্য সমাকুল। অতএব জনপদ আমার নিকট বিষময়রূপেই প্রতীয়মান। নগরনিচয়

নানা নাগরিক জনে পরিপূর্ণ বলিয়া আমার নিকট যেমন পরিত্যাজ্য, তেমনি সাগরের অভ্যন্তরভাগও প্রতিকূল বোধে আমি পরিত্যাগ-যোগ্য বলিয়া মনে করি; কেন না, উহাও নানা জাতীয় অসংখ্য জীবনিবহে পরিপূর্ণ। সাগরের তীরভূমিও আমার সমাধিস্থান নহে; কারণ ঐ সকল প্রদেশ লোকপালদিগের আবাসস্থল। কি পাতালগর্ভ, কি গিরিশৃঙ্গনিচয়, এ সকলও আমার পরিত্যাজ্য, কেন না, এই সমস্ত স্থানেও অসংখ্য প্রাণি-পুঞ্জের বাস। গিরিগুহা নির্জ্জন বটে, স্বীকার করি; কিন্তু সেখানেও সিংহ আছে অথবা সর্পাদি খলস্বভাব জীব বাস করিতেছে। আরও এক অন্তরায় এই যে, তথাকার লতাজাল পবন নিঃস্বনচ্ছলে প্রায়শই গান করিয়া থাকে। অপিচ তাহারা কুসুমরাগ হাস্যচ্ছটা প্রকাশ করিয়া কিসলয়রূপ করনিকর প্রসারিত করত অবিরত নৃত্য করিতে থাকে। অতএব তাহাও সমাধির প্রতিকূল ভূমি। সত্য বটে, দক্ষিণাপথে অনেক সরোবর আছে; সেই সকল সরোবরতীর সমাধিস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সমুদায় স্থানে বিঘ্ন আছে। মৎস্যাদির পুচ্ছাঘাতে এবং স্নানমগ্ন মুনিগণের করস্পর্শে তত্রত্য কমলগণ যখন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন জলভ্রমর উপস্থিত হইয়া সমাধি-বিঘ্নকর বিবিধ শব্দ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেকালে আমি মৌনী রহিব, কাজেই সেই শব্দ নিবারণে অক্ষমতা নিবন্ধন ঐ স্থান আমার কোনরূপেই মনোনীত হইতেছে না। দেখিতেছি, নির্ঝরভূমিও আমার সমাধির অযোগ্য স্থান; কেন না, তাহাও বায়ু-বিতাড়িত চঞ্চল তৃণবল্লী ও ধূলিরাজি দ্বারা সমাকুল হইয়া বায়ু-রবচ্ছলে শব্দ করে। সুতরাং সে স্থান আমি সমাধির প্রতিকূল বলিয়াই মনে করি। এখন দেখিতেছি, আকাশই আমার মতে সমাধির যোগ্যস্থান; উহাতে কোনরূপ বিক্ষেপক কারণ নাই; সুতরাং উহারই কোন দূরস্থ দেশবিশেষে আমি সুখাবহ যোগোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিব।

রামচন্দ্র! আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবিমল আকাশ দেশেই গমন করিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সমস্ত আকাশদেশই সহস্র সহস্র বিক্ষেপ-কারণে পরিব্যাপ্ত আছে। তাহার কোথাও সিদ্ধসমূহ ভ্রমণ করিতেছেন, কোথাও জলদবৃন্দ গর্জ্জন করিতেছে, কোন কোন

স্থান বিদ্যাধরগণের আবাসভবনে পরিবৃত রহিয়াছে; কোথাও যক্ষগণ গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন কোন স্থানে প্রধান প্রধান পুরী বিরাজ করিতেছে; কোথাও উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও যোগিনীগণ উন্মত্ত নৃত্য করিতেছে; কোথাও দৈত্যভবনের সন্নিকটে দেবভবনান্বিত গন্ধর্ব্ব-নগর সুশোভিত হইতেছে। কোথাও গ্রহগণ ভ্রমণ করিতেছে, কোনস্থান নক্ষত্রমালায় মণ্ডিত রহিয়াছে, কোথাও খেচরেরা বিচরণ করিতেছে, কোথাও পবনদেব কুপিত হইয়া প্রবলভাবে বহিতেছেন, কোন স্থান বিবিধ উৎপাতসমূহে সমাকুল রহিয়াছে এবং কোন কোন প্রদেশ মেঘমণ্ডলে মণ্ডিত আছে। কোথাও কোথাও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পিশাচদল বিচরণ করিতেছে; কোন কোন স্থানে অগণিত নগর-নিচয় সন্নিবিষ্ট আছে, কোথাও সূর্য্যরথ দেখা যাইতেছে, অসহ্য সূর্য্যসন্তাপে কোন কোন স্থানে জীবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; কোথাও সুশীতল সুধাকর-কিরণ বিকাশ পাইতেছে; কোন কোন স্থান ভূত-প্রেতাদি দেবযোনি-বিশেষে সমাকুল বলিয়া ভীষণ হইয়াছে; কোন প্রদেশ ভয়ঙ্কর অগ্নি সংযোগে দুর্গম হইয়াছে; কোথাও বেতালদল নৃত্য করিতেছে; কোন স্থানে পক্ষিরাজ গরুড় বিরাজ করিতেছে; কোথাও মহাপ্রলয়-কালীন বারিদবৃন্দ বিরাজমান এবং কোন কোন স্থানে প্রলয়ের প্রভঞ্জন প্রবহমাণ।

আমি ক্রমে ক্রমে এই সকল দেশ অতিক্রম করিলাম এবং ক্রমশঃ অতিদূরে উপনীত হইলাম। অনন্তর সেখানে আমি এক শূন্যময় সুবিশাল নির্জ্জন প্রদেশ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তথায় মন্দমন্দ বায়ু বহিতেছে। তথায় স্বপ্নাবস্থায়ও কোন প্রাণীরই সমাগম-সম্ভাবনা নাই এবং কোন প্রকার শুভাশুভ চিহ্নও তথায় নাই দেখিয়া, সেই প্রদেশটী সংসারের পক্ষে একান্ত অনভিগম্য বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

অনন্তর তৎকালে কল্পনা দ্বারা আমি তথায় এক অতি বিস্তৃত কুটীর নির্ম্মাণ করিলাম। সেই কুটীর কমল-কলিকার আবরণে বড়ই সুন্দর হইয়া উঠিল; তাহা দেখিবামাত্র মনে হইল, যেন পূর্ণচন্দ্রের অভ্যন্তরভাগ ঘুণ-কীটে ক্ষত হইয়া আছে। তথায় কুমুদ কহ্লার ও মন্দারাদি কুসুমকলিকা সকল একান্ত সুশোভিত হইতে লাগিল। সে কালে আমি মনে মনে ঐ

প্রদেশকে সর্ব্বপ্রাণীর অগম্য বলিয়া বুঝিলাম এবং সেই স্থানেই বদ্ধ-পদ্মাসনে একান্ত মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শত বর্ষান্তে পুনর্ব্বার আত্মাভ্যুত্থান স্থির করত নিদ্রাসুখ-মগ্নের ন্যায় শান্তমনে নির্ব্বিকল্প সমাধি-নিষ্ঠ হইয়া উপবেশন করিলাম। আমি সুনির্ম্মল আকাশে খোদিত প্রতিমার ন্যায় নিশ্চলভাবেই রহিলাম।

রামচন্দ্র! চিত্ত বহুক্ষণ ধরিয়া যাহার অনুসন্ধান করে, সে তাহাই দেখিয়া থাকে। অতএব সমাধিতে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে আমি যে শত বর্ষ যাবৎ মদীয় সমাধিকাল নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস-মারুতবৎ বোধবীজ মদীয় হৃদয়ে বিস্তৃত রহিলেও কেমন একপ্রকার আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অধুনা হৃদয়ক্ষেত্রে তদীয় বিকাশকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার বোধবীজ প্রবুদ্ধ হইল। শীত-সম্পর্কে পাদপ শুষ্যমাণ হয়, আবার বসন্তাগমে তাহার রসোদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে সেই বোধবীজেরও তখন বেদনানুভব হইতে লাগিল। সেই শতবর্ষ কাল আমার পক্ষে তখন নিমেষবৎ অতীত হইয়া গেল। কারণ এই যে, একাগ্রমনা ব্যক্তির নিকট অতি দীর্ঘকালও অল্পক্ষণবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। বসন্তাগমে বৃক্ষের অন্তর্গত রস যেমন বাহিরে পুষ্পরূপে প্রকট হয়, তেমনি মদীয় বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কার্য্য সকলও বাহ্য বিকাশ লাভ করিল। তখন আমাতে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ও ইন্দ্রিয়নিচয় সমাগত হইল। আমি জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ইহা দেখিয়া কোথা হইতে অহঙ্কার-পিশাচ আসিয়া আমায় স্পর্শ করিল। ঐ পিশাচ ইচ্ছারূপিণী পিশাচী কর্ত্তৃক প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইল; মনে হইল যেন একটা অত্যুন্নত বৃক্ষকে প্রবল বায়ু আসিয়া অতর্কিতভাবে অবনামিত করিয়া ফেলিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! নির্ব্বাণ জ্ঞানের মূলীভূত; সেই নির্ব্বাণ আপনার উদিত হইল, অথচ অহঙ্কার-পিশাচ আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করিল, এ কিরূপ কথা? এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাকরণার্থ যথাযথ বাক্য বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জ্ঞানীই হউক, আর অজ্ঞই হউক, অহঙ্কার ভিন্ন কাহারই দেহ তিষ্ঠিতে পারে না। কেন না, যাহা আধেয়, তাহার কখনই আধার ভিন্ন থাকা সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে যে বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে অহঙ্কারপিশাচ প্রশমিত হইবে। অহম্ভাবরূপ পিশাচের অস্তিত্ব না থাকিলেও অজ্ঞান-বালক উহাকে অন্তরে কল্পনা করিয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের ফলেই উহা হৃদয়মধ্যে বাস করে। পরন্তু প্রদীপধারী পুরুষের নিকট যেমন অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর নিকট ঐ অজ্ঞানের অবস্থান কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। কেন না, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলেও যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার অস্তিত্ব কোথায় আছে? যতই বিচার করিয়া দেখা যাইবে, ততই ক্রমে ক্রমে ঐ অজ্ঞতারূপিণী পিশাচীর লয় ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইবে না। যক্ষী প্রভৃতির আকার কিছুই নাই; না থাকিলেও রাত্রিতে যেমন তাহাদের বিলাস হইয়া থাকে, তেমনি প্রথমে অবিদ্যার বিকাশ হয়, তাহাতেই নিত্য অজ্ঞতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন দ্বিতীয় চন্দ্রের অস্তিত্ব থাকিলেই দ্বিতীয় মৃগ-কলঙ্ক সম্ভবপর হয়, তেমনি সৃষ্টিব্যাপার সত্ত্বেই ঐ অবিদ্যা আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা উহার উৎপত্তি কোথাও নাই। এই যে সৃষ্টিব্যাপারের কথা উত্থাপন করিলাম, ইহাও অজ্ঞজনের জ্ঞানগোচর হইলেও অনুৎপন্ন; সুতরাং উহার অস্তিত্বাভাব। কোনই কারণ নাই, কাজেই আকাশপাদপের ন্যায় পূর্ব্বেও

ইহার উৎপত্তি হয় নাই। শূন্যরূপিণী আদি সৃষ্টি যখন পরমাকাশ মধ্যে বিদ্যমান, তখন ক্ষিতিপ্রভৃতির জ্ঞান বিষয়ে আর কারণ সম্ভাবনা কি প্রকার? বিশেষ কথা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন নিরাকার; সুতরাং সাকার ঘটপটাদি বস্তুর কারণ হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

হে রাঘব! বীজ কারণস্বরূপ, তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি নিশ্চিতই; পরন্তু যেখানে বীজ নাই, সেখানে অঙ্কুর থাকা সম্ভবপর হইবে কেমনে? ফলে কারণ ব্যতিরিক্ত কোনরূপ কার্য্যোৎপত্তি কখনই হইবার নহে। আকাশে একটা বৃক্ষ ভাসিতেছে, এরূপ ব্যাপার কি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে? তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, অনেক সময় কল্পনার প্রসাদে আকাশে বৃক্ষাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে বস্তুর বস্তুভাব থাকে না; কাজেই উহা সঙ্কল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপে জানিবে, সৃষ্টিব্যাপারে যে অব্যাহতা সৃষ্টির অনুভূতি, তাহা আকাশে শূন্য বৃক্ষাদিবৎ সঙ্কল্পময়ই। অপিচ যে অবিকৃত চিদাকাশ ঐ সৃষ্টিস্বরূপে আত্মায় প্রকাশমান; উহা চিন্ময়; এ নিমিত্ত উহা ঈশ্বরেরই স্বভাব। আমরা অহরহ স্বপ্নাবস্থায় যে গিরিনগরাদির অনুভব করি, এ বিষয়ে স্বপ্নসৃষ্টিই অটুট দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। স্বপ্ন চিৎস্বভাব, তাহাতে সৃষ্টিব্যাপার উপস্থিত হয়—হইয়া যেমন অসৃষ্টিতে সৃষ্টিবৎ প্রতিভাত হয়, তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাকাশে এক অজ্ঞেয় শুদ্ধ অব্যয় অজ ব্রহ্ম প্রতিভাসের ন্যায় সৃষ্টি-কালেও আমাদিগের নিকট তথাবিধ সৃষ্টিই প্রকট হইয়া থাকে। পরন্তু হে তাত! এ বিষয়ে নাই সৃষ্টি, নাই ক্ষিতিপ্রভৃতির সংস্রব; সকলই সেই শান্ত নিরাধার ব্রহ্ম,—ব্রহ্মেই ব্রহ্ম অবস্থিত। এই সর্ব্বশক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রকার নির্ম্মলরূপ প্রকাশ করেন, সেইরূপই তাহা হইয়া থাকে। জীব স্বপ্নে যে গৃহনগরাদি অনুভব করে, তাহা যেমন চিন্মাত্রের স্ফুরণ বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি আদি সৃষ্টিকালে যে সৃষ্টিব্যাপার, তাহাও শুদ্ধ চিন্মাত্রেরই বিলসিত ব্যতীত কিছুই নয়। নির্ম্মল চিদাকাশে যে চিদাকাশ বিদ্যমান, তাহাই ব্রহ্মস্বভাবরূপ সৃষ্টিব্যাপার; এই অবস্থায় কোথায় সৃষ্টি, কোথায় বিদ্যা এবং কোথায়ই বা অজ্ঞতা ও অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠান? ফলে সকলই শান্তিময় ঘন ব্রহ্মস্বরূপ।

রামচন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট অহম্ভাব-প্রশমের কথা কহিলাম। সম্যক্ বিচারনেত্রে যদি এই অহম্ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে উহা কল্পিত পিশাচবৎ লয় প্রাপ্ত হয়। আমি যে মুহূর্ত্তে ঐ অহম্ভাবকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিলাম, সেই ক্ষণেই তাহা শারদীয় মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। চিত্রন্যস্ত অগ্নিদাহ যেমন দাহ্য পদার্থে কার্য্যকারী হয় না, তেমনি অহম্ভাব ও সৃষ্টিব্যাপার যদি যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে ঐ সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে।

হে রাঘব! সমাধি অবস্থায় অহম্ভাবের পরিহার ও ব্যবহার-দশায় তদ্বিষয়ক অনুরাগ এই বিষয়ে আমার যখন সমভাব বিদ্যমান, তখন জানিবে,—সৃষ্টিব্যাপারে ও তদ্‌ব্যতিরিক্ত বিষয়ে আকাশবৎ আমি সমভাবেই রহিয়াছি। বিশেষ কথা এই যে, অহম্ভাবের আমি কেহই নই এবং অহম্ভাবও আমার কেহই নয়। অতএব জানিবে,—এই যে সংসারপ্রপঞ্চ, ইহা কেবল অত্যন্ত ঘন চিদাকারই। আমার যেমন চিত্রার্পিত অগ্নিতে অগ্নিবোধবৎ কদাচ এরূপ অজ্ঞান-জনিত ভ্রম নাই, তেমনি অন্যান্য জ্ঞানী-দিগেরও নাই। না আমি, না অন্য কেহ, কেহই নাই; অধিক কি, সমস্তেরই অভাব; সিদ্ধান্ত যদি এইরূপই হইল, তবে, তুমি প্রকৃত ব্যবহার-নিষ্ঠ হও,—হইয়া মৌনভাবে শিলা হেন অবস্থান কর।

রামচন্দ্র! তুমি আকাশকোষবৎ স্বচ্ছাশয় হও, শিলার ন্যায় নিশ্চল হও এবং সর্ব্বভাব পরিহার করিয়া চিরতরে অবস্থান কর। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এবং অদ্য এই সৃষ্টিকালে সকলই চিন্ময়ভাবে বিদ্যমান; কোনরূপ দৃশ্যই কোথাও নাই, অতএব ব্রহ্মস্বরূপে সমস্তই মঙ্গলময় বলিয়া পরিজ্ঞাত হও।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মদীয় কল্যাণার্থই আপনি অতি বিমল বিতত উদার ভূয়োদর্শনের কথা কহিলেন। ইহা অতি বিস্ময়াবহ হইয়াই দাঁড়াইল। সত্য বটে, সকল পদার্থই সতত সকল স্থানে সকল প্রকারে আত্মানুভবে সম সদাকারে অবস্থিত; পরন্তু প্রভো! আমার একটা সন্দেহ আছে। পূর্ব্বে যে পাষাণোপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া ভূমিকা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইল কিরূপে? তদ্বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থ সর্ব্ব-স্থানে বিদ্যমান; ইহা সমর্থন করিবার নিমিত্তই দৃষ্টান্তস্বরূপে পাষাণোপাখ্যানের আমি উল্লেখ করিতেছি। তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া যাও। বুঝিয়া দেখ, যে পাষাণ অতি নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র, তাহার অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া সমস্ত জগতেরই সংস্থান সম্ভব হয়। প্রস্তুত কথার অবতারণা করিয়া এই বিষয়টীই প্রদর্শন করিতেছি। অথবা প্রস্তুত প্রসঙ্গে ইহাই বলিতেছি যে, আকাশবৎ নিতান্ত শূন্য মহান্ চিদাকাশে সর্ব্বসৃষ্টিই বিদ্যমান। অপিচ প্রস্তুত বর্ণনা দ্বারা ইহাই দেখান হইতেছে যে, তরু, গুল্ম, লতা ও বীজাদির এবং প্রাণী, বায়ু, জল ও তেজ প্রভৃতির অভ্যন্তরেও সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারই বিরাজমান।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে উদারহৃদয়! ঘটপটাদির অভ্যন্তরেও সৃষ্টি-ব্যাপার বিদ্যমান। আপনার উক্তি যদি এইরূপই হইল, তবে শুদ্ধ চিদাকাশে ঐ সৃষ্টিসমষ্টি দৃষ্ট হইবে না কেন? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তোমার নিকট আমি ইহা সত্য-স্বরূপেই বর্ণন করিলাম। এই যে সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা চিদাকাশ—চিদাকাশেই ইহা বিরাজমান। বাস্তব দৃষ্টিতে ঐ সৃষ্টি আদৌ হয় নাই, অদ্যাপি বিদ্যমান নহে, তবে যে দৃশ্য প্রকাশ হইতেছে, জানিবে,—তাহাও

ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মেতেই অবস্থিত। পরন্তু আরোপিত দৃষ্টিতে এ প্রকার অণুমাত্র স্থানও নাই, যাহা অপূর্ণ—অথচ সৃষ্টি কুত্রাপি নাই; সমস্তই চিদাকাশরূপী ব্রহ্ম। এইরূপে তেজের অণুমাত্রও সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণ রহিলেও সৃষ্টিসম্পর্ক কুত্রাপি নাই; সমস্তই চিদাকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। বায়ুরও অণুপরিমিত আকার সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও সৃষ্টি কোথাও নাই, সকলই চিদাকাশময় ব্রহ্ম। এরূপ অণুপরিমিত আকাশও কোথাও নাই, যাহা সৃষ্টিকার্য্যে অপূর্ণ—অথচ কুত্রাপি সৃষ্টিসম্পর্ক নাই; সমস্তই চিদাকাশময় ব্রহ্ম। অপিচ এমন পঞ্চ মহাভূতও নাই, যাহা সৃষ্টিব্যাপারে অব্যাপ্ত—অথচ কুত্রাপি সৃষ্টিসমাবেশ নাই; সমস্তই সেই চিদাকাশময় ব্রহ্ম। সমুদায় পর্ব্বত আছে; তাহাদেরও এমন অণু পরিমাণ ভাগ নাই, যাহা সৃষ্টি-সম্পর্কে না ঘন রহিয়াছে; অথচ সৃষ্টিব্যাপার কুত্রাপি নাই; সকলই সেই চিদাকার ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপে ব্রহ্মানুমানের কথাও ভাবিয়া দেখ। উহা সৃষ্টি-সম্পর্ক-হীন না হইলেও উহার কুত্রাপি সৃষ্টি-সম্পর্ক নাই; সমস্তই চিদাকাশ ব্রহ্ম মাত্র। তার পর সৃষ্টিব্যাপারের কথা বলি, তাহারও এমন কোন অংশ নাই, যাহা সতত ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত নহে। অতএব ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি এই দুই বস্তু কথায়ই ভিন্ন মাত্র; বাস্তব পক্ষে উক্ত উভয়ের পার্থক্য কিছুই নাই।

রামচন্দ্র! এই সৃষ্টি-সমষ্টিই পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মই সৃষ্টির কার্য্য; যেমন সূর্য্যতাপ এবং অগ্নিতাপ—তাপাংশে একই, তেমনি ঐ উভয়ও সম্পূর্ণ অভিন্ন। উহাদের পরস্পর ভেদ-ভিন্নতা না থাকিলেও সৃষ্টি ও ব্রহ্ম এই দুই বস্তুর যে ভিন্নরূপে প্রতীতি হয়, তাহা কেবল কুঠারাহত কাষ্ঠের উত্তরোত্তর উৎপাদ্যমান শব্দবৎ অভিন্নার্থ হইয়াও অবাস্তব ভিন্ন বিলাস মাত্র। অজ্ঞ জনের ব্যবহারে ঐ উভয়ের দ্বৈতভাব সত্ত্বেও উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রকাশ কিরূপে হইবে? আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহার নিকট উক্ত উভয়ের একত্ব থাকায় ঐ ব্রহ্ম ও সৃষ্টি-শব্দদ্বয়ের অর্থ কিরূপে কাহার ন্যায়ই বা প্রকাশ পাইবে?

বৎস! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহার-দশাতেও এই দৃশ্যপরম্পরা আকাশ-রূপেই প্রতীয়মান হয়। ঐ আকাশরূপ অনাদি, অনন্ত, শান্তিময় ও স্বচ্ছ।

অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, এই তুমি, এই আমি, ঐ পর্ব্বতবৃন্দ, আর সেই দেব, দানব, ইত্যাদি নিখিল দৃশ্যপরম্পরাই চিদাকাশময় নির্ব্বাণ মাত্র। স্বপ্ন-সংদৃষ্ট ব্যবহার সকল জাগরণকালে যেরূপে জীবের চিত্তে স্মৃতিবিষয় হইয়াও অবশেষে স্বস্বরূপে অবস্থান করে, এই জগদ্ব্যাপারকে তুমিও তেমনি আত্মস্বরূপে অবলোকন কর।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি আকাশের কোণে সঙ্কল্পময় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় যখন শত বর্ষান্তে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তখন কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সমাধি-ভঙ্গে আমি যখন প্রবুদ্ধ হইলাম, তখন সেখানে এক অস্ফুট মধুর শব্দ মাত্র শুনিতে পাইলাম। পরন্তু সেই শব্দের অর্থ যে কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তথাচ তাহার কোমল ও মধুরভাবে প্রতীয়মান হইল যেন ঐ শব্দ কামিনী-কণ্ঠ নিঃসৃত এবং সেই জন্যই বোধ হয় নাতি উচ্চ বলিয়া দূর হইতে তাহা সুস্পষ্ট শুনা গেল না। ঐ শব্দ ভ্রমরঝঙ্কারবৎ মনোহর এবং বীণা-ধ্বনিবৎ অনুরক্তি-কর। উহা বালকের রোদনধ্বনি অথবা যুবকের অধ্যয়ন-স্বর বলিয়া বোধ হইল না। আমি সেই শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, দশ-দিক্ অবলোকন করিলাম, অবশেষে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, লক্ষ যোজন-পরিমিত শূন্য স্থান সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণের সঞ্চারবিহীন; আকাশের যে অংশে আমি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা ঐ শূন্য স্থান অতিক্রম করিয়াই অবস্থিত। সুতরাং এ স্থান সম্পূর্ণরূপেই শূন্য; এ হেন শূন্য দেশে কিরূপে এরূপ শব্দ সম্ভবিতে পারে? আমি বিশেষভাবে অনু-সন্ধান করিতেছি, তথাচ এ শব্দের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার সম্মুখে এই যে আকাশদেশ আছে, ইহা অনন্ত, অতি স্বচ্ছ ও একান্ত শূন্য।

অতএব এখানে বিশেষ নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কোন প্রাণি-সমাগমের সম্ভাবনা দেখি না।

আমি যখন বারম্বার এইরূপ চিন্তা করিতেছি, আর বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও শব্দকারী ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন আমার মনে আর এক প্রকার চিন্তার উদয় হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—প্রথমে উপাধি-পরিহারদশায় আমি আকাশ হইয়া আকাশের সহিত যে একত্ব পাইয়াছিলাম, তাহারই জন্য আকাশগর্ভে বর্ত্তমান আকাশ-গুণ শব্দ ও শব্দার্থ আমা দ্বারাই করা হইতেছে। অধুনা আমি আমার এই বর্ত্তমান দেহাকাশকে এইস্থানে রাখি এবং জলবিন্দু যেমন প্রভূত জল সহ একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমি চিদাকাশ হইয়া আকাশ সহ একত্ব উপগত হইয়া যাই।

আমি এইরূপ চিন্তা করিলাম;—করিয়া পদ্মাসনে সমাসীন হইলাম এবং পুনর্ব্বার দেহ-ত্যাগার্থ সমাহিত হইবার জন্য নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলাম। অনন্তর ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বাহ্য বিষয়-সম্পর্ক এবং মননাদি উপায় দ্বারা অন্তঃকরণবিষয়ক মন্তব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্বিৎ-স্পন্দময় চিত্তাকাশ হইয়া পড়িলাম। ক্রমে ক্রমে সে ভাবও পরিত্যাগ করিলাম,—করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হইলাম। অনন্তর সে ভাবও পরিহারপূর্ব্বক বাস্তব চিদাকাশে অবস্থান করিলাম। সেই অবস্থায় আমি জগদাকার প্রতিবিম্বের এক দর্পণস্বরূপ হইয়া উঠিলাম। এই সময় আমি সেই স্বভাবের সহিত আকাশরূপেই উপনীত হইলাম। যেমন সামান্য জল সাগরজল সহ এবং গন্ধ গন্ধ সহ মিলিত হয়, আমারও তখন আকাশ-রূপে সেইরূপই মিলন ঘটিল। সে কালে আমি নিরাকার হইলাম, নিরাকার হইলেও মহাকাশ ব্যাপিয়া অনন্ত সর্ব্বব্যাপী রূপ ধারণ করিলাম। তখন আমি নিজে নিরাধার হইয়াও সর্ব্বজগতের আধার হইলাম। দেখিলাম,—তথায় অসংখ্য ত্রৈলোক্য, বহু শত সংসার ও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। ঐ সকল পরস্পর দর্শনে আকাশ হেন শূন্যাত্মা বৈ আর কিছুই নয়। যুগপৎ প্রসুপ্ত ব্যক্তিবর্গের স্বপ্নস্বরূপের ন্যায় ঐ সকল জগৎ পরস্পর ব্যবহারদৃষ্টিতে মহাব্যাপার হইয়া উঠিলেও অপর দৃষ্টিতে

অসম্পৃক্ত—সুতরাং শূন্য অথচ অশূন্যরূপেই প্রতিভাত। ঐ জগৎ-পরম্পরা জন্মিতেছে, লয় পাইতেছে এবং বারবার উপচিত হইতেছে। কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, সর্ব্বদা সর্ব্বকালেই উহাদের উদ্ভব হইতেছে এবং উহারা সাধার হইয়াও যেন নিরাধার হইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, যেন জন সাধারণ মনের সঙ্কল্প-কল্পনায় বহু রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে। উহাদের কতকগুলি রাজ্য নিরাবরণ-স্বরূপ অথচ ঐকমাত্র আবরণে আবৃত আছে। উহারা আবার পাঁচটি তন্মাত্র আবরণে মিলিত ও ষড়াবরণে জড়িত।

রামচন্দ্র! সাংখ্যকল্পনায় পঞ্চীকৃতের পঞ্চ, অপঞ্চীকৃতের পঞ্চ, সমুদায়ে এই দশাবরণ চিত্ত; এই চিত্ত সহ তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি এই চারিটির মিশ্রণে সমষ্টিতে দশাবরণ। তত্ত্বগণনায় এই সকল আবরণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। কাহারও মত এই যে, আবরণ ষট্‌ত্রিংশৎ-প্রকার। এই সকল অসংখ্য জীবসঙ্কুল ও পঞ্চভূতময় হইয়াও শূন্যস্বরূপ এবং ইহাদের কতকগুলি ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ে অন্বিত। অন্য অনেকে ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতত্রয়ে পরিবৃত এবং অপর কতকগুলি ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতদ্বয়ে অধিগত। এইরূপে দিক্ ও কাল সহ সপ্ত মহাভূতই এক-স্বভাব; তথাচ কোথাও ভবাদৃশ জনের অনুভবস্থলে উহার মধ্যস্থ জীবাদির সূক্ষ্মতামান ও বৈচিত্র্যাদি ভেদ একান্তই দুরধিগম্য। ঐ সমুদায়ে সূর্য্যাদি প্রকাশকর বস্তু নাই; তাই উহারা নিত্যান্ধকার-পরিপূর্ণ এবং সুষুপ্তিবৎ সর্ব্বদা একমাত্র হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক নিত্যাধিষ্ঠিত হইলেও কোথাও কোথাও বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট প্রজাপতিবর্গের অংশভূত দেবগণের বিবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ এবং শাস্ত্রীয় সম্পর্ক না থাকিলেও কোথাও বৈরাগ্যজনক শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহে সমাকীর্ণ ও ক্ষুদ্র কীটবৎ ব্যবহারপরায়ণ দেবাদি প্রাণি-পুঞ্জে পরিবৃত। কলির প্রবেশ বশতঃ কোথাও বেদ বিলুপ্ত হইয়াছে; তাই পুরুষপরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণাদির আচার মাত্র রহিয়াছে। কোন স্থানে প্রজ্বলিত পাবকে পরিব্যাপ্ত আছে; কোন কোন স্থান বা আপনা হইতেই নিত্য প্রকাশ পাইতেছে। উল্লিখিত চিদাকাশের কোন কোন অংশ জল দ্বারা পরিপূরিত এবং কোন কোন অংশ বা একমাত্র পবনদ্বারাই

পরিব্যাপ্ত। উহার অংশবিশেষ নিশ্চল, কোন অংশ বা চঞ্চল, এবং কোন কোন অংশ প্রকাশমান ও পরিবর্দ্ধমান। কোন স্থান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; তাহার চারিদিক্ সর্ব্ববিধ ভোগ্যসমূহে পরিপূর্ণ হইলেও উহা নিয়ত অন্য দিকে প্রধাবমান। ঐ চিদাকাশের কোন অংশ কেবল দেব-সৃষ্টি দ্বারাই পরিপূর্ণ, কদাচিৎ কেবল মনুষ্য এবং কোন অংশ মাত্র দানব-দলে পরিব্যাপ্ত। উহার কোন অংশ বা কীটবৃন্দে নিবিড়তর। ঐ চিদভ্যন্তরে কদলীদলের নিবিড়তার ন্যায় পরমাণুমধ্যেও অন্তরের অন্তর এবং তাহারও অন্তর আবির্ভূত হইয়াছে এবং হইতেছে। যেমন সুপ্ত সৈনিকবর্গের স্বপ্নপরম্পরা পরস্পরের অদৃষ্ট, তেমনি ঐ সকল মহাভূত থাকিয়াও সমুদায়েরই দৃষ্টিপথের অতীত। উহারা পরস্পরের অনুভূতি-বিষয় নয়। অপিচ উহারা নানা রূপশালী হইলেও সুনির্ম্মল অনন্ত আকাশ-স্বরূপ এবং পরস্পর সমাবস্থ হইয়াও বিভিন্ন ব্যবহার-পরায়ণ। উহাদের কোথাও কোথাও বিভিন্ন শাস্ত্রানুশীলন দৃষ্ট হয়, কোন কোন স্থান পরস্পর পৃথক্ হইলেও একান্ত মিশ্রিতবৎ সন্নিহিত বলিয়াই ধারণা হয়। যাহারা এক-স্থানবাসী, তাহারা মরণের পর ভিন্ন স্থানে যায় বলিয়া পরস্পরের অন্তর্ধান-শক্তি থাকায় সমস্তই সিদ্ধগণবৎ প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন মহাভূত ও বিভিন্ন ধরাধর বিদ্যমান। সর্ব্বস্থানই পুরোবর্ত্তী; অথচ ভবদ্বিধ ব্যক্তির চেষ্টা ও যত্নের অবয়বীভূত বলিয়া অস্মাদৃশ লোকের নির্ণয়ক্রমে জানিবে,—উহারা একান্তই বিষম। এমনও কতকগুলি স্থান আছে, যাহা মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর কুণ্ডলোপম নির্ম্মলাকাশে কিরণপুঞ্জবৎ পরিশোভ-মান। কোথাও সৌরমণ্ডলের সূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায় চিৎশোভা দেদীপ্য-মান। এরূপ কতকগুলি স্থান আছে, তাহারা বরাবর পূর্ব্বরূপেই জায়মান এবং কতকগুলি স্থান বিসদৃশ হইলেও পরস্পর সদৃশের ন্যায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতকগুলি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সদৃশ, পরেই আবার বিসদৃশ; অথবা উহারা পরমার্থ-তরুর অনন্ত ফলস্বরূপ; তাই উহাদের পরস্পর ভেদ-কল্পনা। উহাদের অনেকগুলি অল্পকালস্থায়ী এবং কতকগুলি বা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী। এমনও কতকগুলি স্থান আছে, যাহা কাল, দেশ, ও স্বভাবের নিয়মাধীন থাকিয়াও বহু পরিমাণ এবং কতকগুলি বা সেরূপ নিয়মের

বাধ্য না হইয়াও বহু সংখ্যাময়। কতকগুলি স্থানে সূর্য্যাদি নাই; কাজেই কাল-নির্ণয়ের সম্পূর্ণ অভাব। উহারা আপন ইচ্ছায় জন্মে, বৃদ্ধি পায় ও স্থিরভাবে থাকে। উহারা শূন্যময় পরমাকাশে কোন্ কালে জন্মিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল স্থান—আকাশ, আদিত্য ও সুমেরু প্রভৃতি মহীধরনিকরে পরিপূর্ণ হইয়া চিত্ত-বিস্ময়াবহ চিদাকাশে স্বপ্নসমূহবৎ শোভমান। এই যে ক্ষিতিপ্রভৃতি পদার্থ, ইহাদের এই এই প্রকার অনুভব একান্তই ভ্রমময়। ইহাদের প্রকাশব্যাপারে কারণ কিছুই নাই। অতএব এই সমস্ত জগৎ অধিষ্ঠানরূপে থাকিলেও বাস্তব পক্ষে অবিদ্যমান। অনুভূতি জ্ঞানে যদিও ইহারা সত্যাকারে প্রতীয়মান, তথাচ মরুমরীচিকা-জলবৎ এবং চন্দ্রদ্বয় ও আকাশবর্ণবৎ একান্তই মিথ্যাময়।

রামচন্দ্র! চিদাকাশে কল্পনাবলে ঐ সকল জগৎ বহুল পরিমাণে সমুদ্ভাসিত এবং বাসনা-বায়ুর প্রবাহে পরিচালিত হইয়া স্বস্ব ব্যবহারে প্রথিত। ব্রহ্ম যেন উডুম্বর বৃক্ষ; তাহাতে সুর, অসুর, নাগ, নর, সকলই মশকবৎ প্রতিভাত এবং ভোগ-সুখাদি রস-পরিপ্লুত তদীয় ফলীভূত ব্রহ্মাণ্ড সকল চিন্ময়-পবনে পরিঘূর্ণিত। অথবা এই সকল নগর চিত্তত্ব-লক্ষণ বালকেরই কল্পনাময় হইয়া চিদাকাশে উৎপদ্যমান। যেমন সৌরকিরণ-সম্পর্কবশেই পঙ্কময় ক্রীড়ন দ্রব্য প্রকাশমান হয়, তেমনি ঐ সকলও 'ত্বং' 'অহং' ইত্যাদিরূপ অভিমানবোধেই সুদৃঢ়ভাবে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। অথবা বসন্তকালের রসযোগে কাননরাজি যেমন নানাবিধ কটু-কষায় ফলপরম্পরায় পরিপূর্ণ হয়, তেমনি যাহা সেই নিত্য তৃপ্তিময়ী অনুরাগবতী অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা, তাহা দ্বারাই এ সকল এইরূপে প্রকট হইতেছে। যে সকল শ্রুতি-বাক্য সৃষ্টি প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেই সমুদায় বাক্যের আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, উহাদের এক কর্ত্তা আছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ; আর যে বাক্য অনাদিত্বের পরিচায়ক, তথাবিধ শ্রুতি-শাসনে জানা যায়, উহাদের কেহই কর্ত্তা নাই। কাজেই উহারা আপনা হইতেই চিদাকাশে এইরূপে সমুৎপন্ন। এই নিখিল জগৎই অবাস্তবাকারে প্রকাশমান। তথাচ ইহারা পরমার্থ-স্বরূপ। অতএব এ সকল লাভের বস্তু হইলেও অলাভ এবং সৎ হইলেও অসৎ। চতুর্দ্দশ ভুবন,—দশবিধ দেবযোনি এবং

এক মনুষ্যজাতি যাহার মধ্যে বিকাশমান, সেই জগদভ্যন্তরেও তাদৃশ জগদাকার বিরাজমান। স্বর্গ, নরক, পাতাল, বন্ধু, মিত্র ইত্যাদির সম্পর্ক-বশে উহারা নানাবিধ চেষ্টাশালী হইলেও বস্তুগত্যা শূন্য বৈ আর কিছুই নয়। এই সমস্ত জগৎ আনন্দরূপ সাগরহিল্লোলে পুলকিত হইয়া পুনঃপুন প্রকাশ ও বিলয় দ্বারা আপনাদের নশ্বরত্ব নিবেদন করিতেছে এবং সৌর-কিরণবৎ আভাসমাত্ররূপী সমস্ত জগৎ পবন-স্পন্দবৎ আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তিরা যেমন অসৎস্বরূপ দর্শন করে, তেমনি বুদ্ধি, অহঙ্কার, বা চিত্তরূপ পত্র-পরিব্যাপ্ত কল্পনাময় বৃক্ষরূপ এই জগৎ সকল সাধারণের নিকট অসত্যস্বরূপেই বর্ত্তমান। বেদ-পুরাণাদি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলের কল্পনাই যেন নিদ্রা; তাদৃশ নিদ্রাবেশে সকলেই এখানে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়া শবপ্রায় রহিয়াছে। পরব্রহ্ম যেন অতি নিবিড় দুর্গম কানন; এই জগৎ সকল যেন চিদাকাশের গন্ধর্ব্ব-নির্ম্মিত গৃহরাজি; ইহারা রবিরূপ দীপপ্রভায় সদাই সমুজ্জ্বল।

বৎস! আমি সমাধিকালে সেই সকল জগৎ ভ্রমের প্রভাবেই দেখিয়াছিলাম। তাহারা চিদাকাশে অকারণে সমুৎপন্ন এবং অকারণেই বিনশ্বর; যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষুর নিকট কেশরাশি-দর্শন মিথ্যা, তেমনি সেই সকল জগৎ মিথ্যাভূত বৈ আর কিছুই নয়।

ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই যে শব্দের কথা কহিয়াছি, পরে আমি তাহার উৎপত্তিকারণ অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর বহুকাল পরে অসীম চিদাকাশরূপ প্রাপ্ত হইলাম। তখন সেই শব্দ বীণাধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রমে উহার বর্ণ পদ সকলই সুস্পষ্ট হইল। অনন্তর বোধ

হইল যেন সেই শব্দ আর্য্যাচ্ছন্দে পঠিত হইতে লাগিল। আমি সেই শব্দের অনুসরণক্রমে সেই প্রদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, এক রমণী প্রভাপটল বিস্তারপূর্ব্বক আকাশদেশ উদ্ভাসিত করত মদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। পবন-হিল্লোলে তাহার মাল্য ও বস্ত্র কাঁপিতে লাগিল; তদীয় নয়নযুগলে কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে এবং কেশবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। সেই নারী কাঞ্চনবৎ গৌরবর্ণা ও নব যৌবনযুতা, বনদেবীর ন্যায় তদীয় সুন্দর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব সৌরভ নির্গত হইতেছে। তাহার বদন পূর্ণ চন্দ্রসদৃশ; তাহা যৌবন-সমাগমে সবিশেষ প্রফুল্ল হইয়া পুষ্পরাজিরূপ হাস্যচ্ছটা ধারণ করিতেছে। চন্দ্রবৎ কান্তিশালিনী সেই আকাশচারিণী সুন্দরী মুক্তাহারের সম্পর্কগুণে একান্তই কমনীয়কান্তি হইয়াছে।

তৎকালে সেই সুন্দরী আমার অনুসরণ করিল, পার্শ্বে আসিল এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া মধুরস্বরে এই আর্য্যা-শ্লোকটী পাঠ করিল। তাহার অর্থ—হে মুনিবর! ভবদীয় চৈতন্য খল ব্যক্তিবর্গের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদি-দোষে দূষিত নহে। এই সংসারসাগরে যে সকল ব্যক্তি ভাসমান হইতেছে, তটোৎপন্ন তরুর ন্যায় আপনিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন বস্তু। অতএব আপনাকেই আমি বারম্বার প্রণাম করিতেছি।

আমি সেই বাক্য শুনিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, নিকটে এক রমণী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান; দেখিয়া অপ্রয়োজনবোধে তৎপ্রতি আদর প্রদর্শন না করিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলাম। পরে জগৎস্বরূপিণী মায়ার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া একান্ত বিস্মিতভাবে চিদাকাশে বিহারার্থ ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। তৎকালে অন্য কোন চিন্তাকেই আমি হৃদয়ে স্থান দিলাম না; কেবল সেই আকাশস্থিতা জগন্মায়াকে বিশেষভাবে অনুভব করিবার নিমিত্তই চিদাকাশস্বরূপ হইলাম। সে কালে দেখিলাম, পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত জগৎ শূন্যাকাশেই বিরাজিত। উহারা শূন্যময় বলিয়াই কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দেখে বা শুনিয়া থাকে; বস্তুত কিন্তু কিছুই দেখে না বা শুনেও না। অতএব কল্প, মহাকল্প ও সৃষ্টিব্যাপার সর্ব্বদাই ঐ সমুদায়ের অভিন্ন ভাব।

কল্পান্তকালে পুষ্করাবর্ত্ত প্রভৃতি বারিদবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া বর্ষণ করে। ঔৎপাতিক পবন প্রবলভাবে বহিতে থাকে, হিমালয় স্বভাবতই বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহার ঘোররবে ব্রহ্মমণ্ডপও কম্পিত হইয়া উঠে। প্রজ্বলিত পাবকের সংস্রবে কুবেরাবাস পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয়। ঐ সময়ে দ্বাদশ কুন্দবৎ দ্বাদশ দিবাকর আকাশে ভ্রমণ করেন; পতনোন্মুখ দেব-নিকেতনের ভয়ঙ্কর পতনশব্দ দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে; সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যদেশ ত্রুটিত হয়; তাহারা ঘোররবে পতিত হইতে থাকে। প্রলয়াগ্নির সম্পর্কবশে বংশাদি দহ্যমান হয়; তাহাদের স্ফোটন হেতু অব্যক্ত পটপটাধ্বনি সমুত্থিত হইয়া থাকে।

তৎকালে আকাশরূপ সাগর আত্মার স্বরূপভ্রমেই ক্ষুব্ধ দেবগণরূপ জলজন্তুসমূহে একান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠে। দেব, দানব, নাগ, নর, এই সকলের গৃহোত্থিত ভীষণ রোদনশব্দে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। সপ্ত সাগরের সলিল-প্রবাহে স্বর্গ পর্য্যন্ত পরিপ্লাবিত হয়, তাহাতে সূর্য্য-মণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত জগৎপরম্পরা এবম্বিধ কল্পান্তকাল সম্যক্ অবগত হইতে পারে না।

রামচন্দ্র! আমি দেখিলাম,—সেই সকল জগতে সহস্র রুদ্র, শত কোটি ব্রহ্মা, লক্ষ বিষ্ণু ও অগণিত কল্প বিরাজ করিতেছে। সেই জগদ্বৃন্দের কোন কোন স্থান সূর্য্য-বিরহিত; তাই সেখানে দিবারাত্রির বিভাগ কিছুই নাই এবং কি কল্প, কি যুগবর্ষ, এতৎসমুদায়েরও সীমা নির্দ্দেশ নাই। অতএব সেখানকার ক্ষয়োদয় যুক্তিদ্বারা অনির্ণেয়। সমস্তই চিৎ-শক্তিতে বিদ্যমান, তাহা হইতেই সকলের আবির্ভাব। ঐ সমস্তই চিন্ময়, সমস্ত হইতেই চিদ্বিকাশ এবং চিৎই সৎ ও সর্ব্বস্বরূপিণী। আমি সেখানে ইহাই অবলোকন করিলাম।

বৎস! তুমি যখন ঘটপটাদি যে কিছু বিষয় বাক্য দ্বারা চিন্তা করিয়া নির্দ্দেশ করিবে, তখন তোমার সেই কথনীয় নাম-রূপাত্মক চিৎস্বরূপেরই আবির্ভাব হইবে এবং সেই সেই বাস্তব নামরূপ যে কালে আকাশাপেক্ষাও শূন্যাকারে পরিজ্ঞাত হইবে, জানিবে,—তখন নামরূপ-নির্ব্বাচনাত্মক চিত্তেরই নাশ হইতেছে। এইরূপে আকাশ শব্দরূপী; তাই নাম-রূপ-

কল্পনায় নির্ণীত জগৎশব্দে আকাশই পরিস্ফুরিত এবং ক্রমে ক্রমে সেই শব্দাত্মা আকাশ চিদাকাশেই পর্য্যবসিত।

হে রাঘব! তৎকালে আমি সমস্ত দৃশ্য দর্শনকে আকাশোৎপন্ন পাদপের মঞ্জরীবৎ ভ্রম মাত্র বলিয়াই অবগত হইলাম এবং অবশিষ্ট চিদাকাশ আনন্দময়রূপে বিদিত হইয়া সেখানে অনুভব করিতে লাগিলাম। তৎকালে পরম পুরুষ-সাক্ষাৎকাররূপ যে পরম চিদাকাশ, তাহাতে আমি অসীমভাবে তৎসারূপ্য লাভ করিলাম এবং তাদৃশ সমাধি অবস্থায় এই এই প্রকার সঙ্কল্পভাবের অনুভূতি করিতে লাগিলাম যে, এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত দিক্ সকল, তদন্তরবর্ত্তী দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, এতৎসমস্তই সেই ব্রহ্মরূপ চিদাকাশে বিরাজিত। সেই সেই সঙ্কল্প-কল্পিত নিখিল সংসারে বশিষ্ঠনামধেয় বহু জ্ঞানবান্ ব্রহ্মনন্দন মুনিবর-দিগকেই দেখিলাম। শ্রীরামাবতার সহ দ্বাসপ্ততিসংখ্যক ত্রেতাযুগ ভেদ, শতসংখ্যক সত্যযুগ ও শতসংখ্যক দ্বাপর যুগ, এই সকল আমার দৃষ্টি-গোচর হইল। বিভিন্ন বাসনার বিকাশভেদেই এই সকল আমি অবলোকন করিলাম। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম, ব্রহ্মস্বরূপ চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সমস্ত দৃশ্যই সেই অনাদি অনন্ত অজ ব্রহ্মপদ।

রামচন্দ্র! নাম কিম্বা রূপ কিছুই কাহারও নাই। বিপুল পাষাণ-সম সকলই অচেতন মৌন-সম্পন্ন। অতএব যাহা কিছু দীপ্তি পাইতেছে,—স্ফুরিত হইতেছে, সকলই সেই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি নিরাকারা চিতিশক্তি, তিনিই স্বপ্নানুভূত বিষয়ের ন্যায় বাস্তব চেত্যাভাবেও আত্মসত্তাকে নিরাকার আকাশে কল্পনাময় চেত্য জগদাকারে পরিস্ফুরিত করিতেছেন। আলোক—প্রকাশকারী অথচ নিজের অতিরিক্ত কোন প্রকাশভাবের অসদ্ভাবে অপ্রকাশকারী হয়। এইরূপে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও তদিতর প্রকাশস্বরূপ হইতেছে। নিখিল জগৎই চিদাকাশময়; তাই কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডবাসী লোক সকল চন্দ্রবিম্ব সন্তাপকর ও সূর্য্যবিম্ব সুশীতল অবলোকন করে। পেচকেরা অন্ধকারেই যেমন দর্শন করিয়া থাকে, পরন্তু আলোকবিস্তারে তাহারা দেখিতে পায় না, জানিবে—ঐ ব্রহ্মাণ্ডবাসী লোকদিগেরও তেমনি বিপরীত দর্শনাদি

ব্যবহার হইতেছে। অপিচ কেহ পুণ্যাচরণ করিয়াও স্বর্গভ্রষ্ট হইতেছে, কেহ বা পাপাচরণ করিয়াও স্বর্গধামে উপনীত হইতেছে, কেহ কেহ বিষপান করিয়াও জীবিত আছে, এবং কেহ কেহ বা পীযূষপান করিয়াও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। এ ব্যাপারে যিনি যাহা হিতাহিত বলিয়া বুঝিতেছেন, যাঁহার জ্ঞানে যেরূপে যাহা আপনা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার নিকট অদৃষ্টবশে সেইরূপেই তাহা সৎ বা অসদ্ভাবে সত্বর সুব্যক্ত হইতেছে। এই সংসার-কানন চিদাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখানে কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ভিত্তিগত চঞ্চল পুত্তলিকা সকল দেবাঙ্গনাগণের সহিত গান গাহিতেছে; জীব নিবহ বিস্তৃত বসনবৎ সুবিশাল মেঘরাজি পরিধান করিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডভেদে সমস্ত পাদপে প্রতিবৎসর নব নব ফল প্রাদুর্ভূত হইতেছে; কত প্রকার প্রাণীর কত অবয়ব অস্থানে নিবিষ্ট রহিয়াছে; ঐ সকল প্রাণী মস্তক দ্বারা ভূতলে যাতায়াত করিতেছে; কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মাচার দৃষ্ট হইতেছে; কোন কোন অধোলোক মাত্র পশু প্রভৃতি জীবনিবহেই সমাকীর্ণ রহিয়াছে; কোন কোন জগদ্বাসীদিগের কামবিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা নাই; তাই সেখানে স্ত্রীজন হইতে কেহই জন্ম লয় না বলিয়া তথাকার প্রাণিপুঞ্জের হৃদয় পাষাণবৎ নীরস-নিঠুর; কোথাও কোথাও বহু সর্প বিসর্পিত এবং তত্রত্য লোক সকল লোষ্ট্রে-রত্নে সমবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া ধনাদির ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কাজেই তাহাদের না আছে লোভ, না আছে গর্ব্ব, কিছুই নাই। অহম্ভাবের তাদাত্ম্য-বশতঃ কোথাও কোথাও সর্ব্বদেহেই একাত্ম দর্শন ঘটিতেছে। সুতরাং ঐ সকল জগৎ স্বেদজ অণ্ডজাদিভেদে বহুল প্রাণিপুঞ্জে পরিবৃত হইলেও একবিধ জীবেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জীব পৃথগাধারে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বভূতে আত্মবৎ অবধারণ করিয়াই বিভিন্ন জীবেরও একত্ব নিশ্চয় করে। কোথাও বাসনার লেশমাত্র নাই; তাই অনন্ত অপার শূন্য মাত্রই বিদ্যমান। সেখানে চিৎশক্তিই সংস্কার-ব্যাপারের অবতারণা করিয়া শূন্যরূপের অপায়ে পুনর্ব্বার জগদ্রূপই উপগত হইতেছেন। যাহারা ব্রহ্মস্বভাবদর্শী, তাঁহাদের নিকট এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত অলীকবৎ অবধারিত হইয়া থাকে। এইজন্য তদিতর দর্শনে নিখিল প্রাণিপুঞ্জই কাষ্ঠ-

মর যন্ত্র সদৃশ চেতনাকারেই পরিলক্ষিত হয়। কোন জগতে নক্ষত্র জ্যোতিঃপদার্থের মণ্ডলাভাবে সময় নিরূপণ অসম্ভব হইতেছে; কোথাও জীবনিবহের শ্রবণশক্তি না থাকায় তথায় পশুসমূহের ন্যায় করচরণাদির সঙ্কেতমাত্রেই পরস্পর ব্যবহারকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। কোথাও জীবগণের দর্শনেন্দ্রিয় নাই; তাই সেখানে চাক্ষুষ জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। কাজেই তাহাদিগের নিকট সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থপুঞ্জ একান্তই অফলোদয়। কোথাও জীবগণ ঘ্রাণশক্তিহীন, তাই তাহাদের নিকট সকল সুগন্ধ বস্তুর সৌরভই বৃথা হইয়া যাইতেছে। কোন কোন জীব বাক্‌শক্তিবিহীন, তাই তাহারা পরস্পর মূকভাবে সঙ্কেত মত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছে। কোন কোন জীবের ত্বগিন্দ্রিয় নাই; তাই তাহারা প্রস্তরবৎ স্পর্শশক্তিবিহীন হইয়াছে। কতিপয় স্থান মনোরাজ্যের বিলসিত বলিয়াই প্রতীত হইল। কোন কোন জগতের অধিবাসী জীবগণ ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিয়াও পিশাচাদিবৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া আছে। কোন কোন স্থান রাশীকৃত মৃত্তিকাস্তূপময়, কতকগুলি স্থান জলরাশিময় এবং কোন কোন স্থান বা অগ্নিজ্বালাময় অবলোকন করিলাম। এইরূপে কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড বায়ুসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং কোন কোন স্থল বা সর্ব্বকার্য্যদক্ষ সর্ব্ববিধ বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ।

বৎস রামচন্দ্র! সেই চিদাকাশের নিখিল জগৎই চিদাকাশময়; তথাচ বিশিষ্ট সিদ্ধিসম্পন্ন মদীয় মানসের কল্পনাক্ষেত্রে তৎকালে ঐ ঐরূপই বিকাশ পাইতে লাগিল। যে ব্রহ্মাণ্ড কেবল মৃত্তিকাস্তূপেই পরিপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তথায় দেহিগণ ভূগর্ভস্থ ভেকবৃন্দের ন্যায়ই অবস্থিত। কোন জগৎ একেবারে জল দ্বারাই পরিপ্লাবিত; তদীয় গিরি-কাননাদি বিবিধ স্থানেই চঞ্চল জলচরবৎ প্রাণিপুঞ্জ নিয়তই পরিভ্রমণ করি-তেছে এবং যে জগৎ কেবল অগ্নি দ্বারাই পরিপূরিত, তত্রত্য জীবনিবহ জলবিরহিত-ভাবে অগ্নিময় অঙ্গারবৎ প্রদীপ্ত হইতেছে। যে সকল প্রদেশ বায়ুমাত্রে পরিপূর্ণ আছে, তথাকার জীবনিবহ বায়ুময় সর্ব্বাবয়ব ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনাখ্য বায়ুযোগবৎ বিরাজ করিতেছে। যে আকাশ ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ, সেখানে প্রাণিগণ আকাশরূপে রহিয়াও সৃষ্টিব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

হে রাঘব! সেই চিদাকাশের দিগ্‌বিভাগে যে সকল অম্বরস্থ ও পাতালাভিমুখী এবং যে সকল চঞ্চল অথচ সুস্থির জগৎ অবস্থান করিতেছে; সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরায় এমন কিছুই বিদ্যমান নাই, যাহা তৎকালে আমি দেখিতে পাই নাই।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! যে সকল প্রাণাখ্য জীব জলে জলবেগবৎ চিদাকাশে চিৎস্বভাবশালী হইয়া বাসনার সম্পর্কে উদ্‌ভাসমান, তাহারাই সঙ্কল্প যোগে মন নামে নির্ণীত হইয়া থাকে। আকাশবৎ বিশদাশয় সকলই স্বান্তঃপাতী বাসনার বিকাশিতায় অনন্ত জগদাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! যখন মহাপ্রলয়ের অবসানে সর্ব্বভূতের মোক্ষ হয়, তখন সংসারের বীজীভূত অজ্ঞানাদির অসদ্ভাবে কিরূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! যখন মহাপ্রলয়ের পর্য্যবসানে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই সকল ভূতপঞ্চকের ধ্বংস হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কীট পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবজগৎই মুক্তি পাইয়া থাকে। সে কালে যেরূপে এই জগদনুভূতি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ যাহাকে ব্রহ্মচিন্মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তৎকালে সেই চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি অনির্দ্দেশ্য—তাঁহাকে কোন ক্রমেই নির্দ্দেশ করা যায় না। এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা তাঁহারই হৃদয়; তাই তাঁহা হইতে ইহা অভিন্ন। কৌতুকের বশে সেই পরব্রহ্ম স্বীয় হৃদয়কে বদ্ধ দৃষ্টিযোগে জগদাকারে অনুভব করেন, আবার মুক্ত দৃষ্টিযোগে সেরূপে তিনি অনুভব করেন না। অস্মাদৃশ ব্যক্তিরাও এ জগতের

কোন বাস্তব সত্তা যথাযথ অনুসন্ধানে পায় না। অতএব এ জগতের নাশ বা উৎপত্তি কোথায় কেমনেই বা হয়? এইরূপে পরম কারণের নিত্যত্ব স্থির সিদ্ধান্ত; সুতরাং তাহার হৃদয়স্বরূপ জগৎও অবিনশ্বর। তবে এই মহাকল্পাদি কি? ইহারা তাঁহারই অবয়বমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এরূপে কল্পভেদ অবিনশ্বর; ইহা সৃষ্টি-বিকাশাদিরূপে অবয়বের সহিত নিত্য জড়িত। কাজেই বারম্বার কল্পাবসান হইয়া যায়। তাহাতে উক্তমরূপ পর্য্যালোচনা করিলেও সৃষ্টিভেদরূপ বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

রঘুবীর! জানিও, পূর্ব্বোল্লিখিত কারণের গুণেই কখন কাহার কিছু নস্ট বা উৎপন্ন হয় না। সেই যিনি একমাত্র শাশ্বত ব্রহ্মবস্তু, তিনিই আছেন এবং তিনিই দৃশ্যরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। চরম বিশাল আকাশ দেশে এবং অতীব ক্ষুদ্র পরমাণুর সহস্র ভাগের একতম ভাগে যে শুদ্ধ চিন্মাত্রের সত্তা বিদ্যমান, এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা সেই মহাচিতেরই অবয়বস্বরূপ। অতএব সেই সত্তার যদি নাশ না হয়, তবে জগতের নাশসম্ভাবনা হইবে কিরূপে? কিন্তু ঐ সত্তার তো কখনই নাশ নাই। স্বপ্নাবস্থায় সম্বিদের হৃদয় যেমন জগদাকারে প্রকাশ পায়, তেমনি আদি সৃষ্টির সম্পর্কে চিদাকাশই বিকাশমান হইতেছেন। কেন না, সৃষ্টিব্যাপারই চিদাকাশের অবয়ব। ফলে সকলই তো চিদাকাশ; এ ক্ষেত্রে কাহার প্রকাশ, কাহারই বা ধ্বংস সম্ভবপর? যাহা পরমার্থসম্বিৎ, তাহা কখনই ছিন্ন, দাহ্য, বা শোষ্য হইবার নহে। উহা কদাচ অজ্ঞদিগের দৃষ্টিবিষয়ীভূত হয় না; উহার হৃদয় যেরূপে দেখা যায়, উহা সেইরূপই বটে। ঐ সম্বিদের যখন নাশ নাই, তখন তাহার অন্তঃপাতী -জগদাদির অনুভূতিও হইতেছে না, তাহা নাশও পাইতেছে না। কেবল স্মরণ ও বিস্মরণরূপ স্বভাবের বশেই অনুভূতি ও অননুভূতিরূপ সুখদুঃখের কল্পনা। কেন না, যে যে বস্তু যৎস্বরূপ, সেই সেই বস্তু তদভাব ব্যতীত অভাবাপন্ন হয় না। অতএব জানিবে—সমস্ত দৃশ্যই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য বলিয়াই অবিনশ্বর। ব্রহ্ম মহাকালরূপী; মহাপ্রলয়াদি সকলই তাঁহার অবয়ব। চিন্ময় পরমাকাশে উৎপত্তি-নিরোধ কিরূপেই বা সম্ভবপর? কিরূপেই বা

নিরাকার আকাশে প্রলয়াদিভাবের বিকার সম্ভাবনা করা যায়? অতএব এই যে মহাপ্রলয়াদি ভাবসমষ্টি, এতদাত্মক জগৎপরম্পরা সম্বিদাকার ব্রহ্মে সম্বিৎস্বরূপেই বিরাজিত। মানস-সঙ্কল্প-সম্ভূত যক্ষাদির ন্যায় সঙ্কল্প-সমুৎপাদিত জগৎও নির্ম্মল নিরাকার চিদ্‌ব্যতীত আর কিছুই নহে। জানিবে,—বৃক্ষের যেমন শাখা, পল্লব, ফল, পুষ্প—অবয়ব; ব্রহ্মেরও তেমনি প্রলয়, মহাপ্রলয়, নাশ, উদ্ভব, ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, সাবয়বত্ব, নিরবয়বত্ব, অবয়বীভূত। ব্রহ্মরূপ অবয়বীর যেমন অপায় নাই, তেমনি উহার অবয়বেরও নাশাভাব। এই যে অবয়ব ও অবয়বীভূত দৃশ্য সকল, এতৎসমস্তও ব্রহ্ম; দৃশ্য ও ব্রহ্ম, এতদুভয়ের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া কদাচ কোন পার্থক্যও নাই। বৃক্ষের সত্তাই যেমন বৃক্ষমূল, পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মেরও মূল তেমনি সম্বিদই। অতএব উক্ত উভয়ের সারূপ্য সত্তায় কোথাও ঐ পরমার্থ-বৃক্ষের সৃষ্টিরূপ স্তম্ভ, কোথাও লোকান্তররূপ স্থূল স্কন্ধ, কোথাও জম্বুদ্বীপাদির সংস্থানরূপ শাখা, কোথাও নদী-নগাদিরূপ পল্লবদল, কোথাও চান্দ্র ও সৌরালোকরূপ কুসুমসমূহ, কোথাও অন্ধকাররূপ পত্ররাজির শ্যামলতা, কোথাও আকাশরূপ কোটর, কোথাও প্রলয়রূপ গুল্মজাল, কোথাও মহাপ্রলয়রূপ ব্রততিরাজি, কোথাও হরিহরাদি দেবরূপ গুচ্ছ সকল এবং কোথাও বা জাড্যরূপ ত্বগাবরণ; এইরূপে নিরাকার চিদাকাশই আকৃতিভেদে সম্বিদাকার ব্রহ্মপদে ব্রহ্ম তুল্য ভাব হইতে অভিন্ন হইয়াই বিরাজমান। অতএব ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান পদার্থ, সৃষ্টি কিম্বা ধ্বংস, এতৎসমস্তই স্বভাবরূপ আত্মা; ব্রহ্মাই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত। এবম্বিধ পরব্রহ্মরূপ চিদাকাশে সৃষ্টি লয়াদি-স্বরূপ কোনও প্রকার রঞ্জনভাবই নাই। কেন না, বিমল পরমাকাশে ভাবাভাব প্রসর কৈ? কোথায় তদীয় আদি-অন্ত-মধ্য-কল্পনা এবং কিরূপেই বা তাহাতে লোকবিশেষের বিলাস-সম্ভাবনা? অবশ্য এ বিষয়ে একটী দোষ আছে, তাহার নাম ভ্রম। যদি আত্মপ্রবণ বুদ্ধিদ্বারা উহাকে সম্যক্ পরিদর্শন করা যায়, তবেই উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। অগ্নি বায়ু হইতে প্রজ্বলিত হয়, সেই বায়ুর সম্পর্কেই তাহার যেমন নির্ব্বাণ ঘটে,* তেমনি দৃশ্য দর্শনে অজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া দৃশ্যেরই অবাস্তব রূপ

দর্শনে নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ কথা, অজ্ঞান যখন স্বস্বরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন উহা অকিঞ্চিৎ বলিয়াই জ্ঞান হয়। তৎকালে বন্ধ ও মোক্ষ এতদুভয়ের অসংস্পৃষ্ট একমাত্র ব্রহ্মই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! আমি আত্মবোধানুসারেই মুক্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানাদি উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যিনি সতত বিচারপরায়ণ অধিকারী, তিনিই এই সকল উপায় লাভ করিয়া থাকেন। এ কথা নিশ্চিতই। অপিচ তৎকালে তিনি দেখেন, এই অনাদি জগৎ কখন হয় নাই, একমাত্র ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপ পদার্থই প্রতিভাসিত হইতেছে। এইরূপ দেখিয়া বিকারবতী দৃষ্টি দ্বারা অণিমাদি অষ্টগুণসম্পন্ন ঐশ্বর ভাব তৃণপ্রায় বিবেচনা করেন এবং 'আমিই সেই আনন্দময় ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক আত্মাতেই পূর্ণকামভাবে বিরাজ করেন।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন ঐ সকল দেখিয়াছিলেন, তখন কি অসীম চিদাকাশস্বরূপ হইয়াছিলেন? অথবা চিদাকাশের অংশবিশেষে বিহঙ্গের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতেই ঐ সমস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি সেই সময়ে সর্ব্বব্যাপী অসীম চিদাকাশস্বরূপই হইয়াছিলাম। আমার তাৎকালিক সেই পূর্ণাবস্থায় কোনরূপ যাতায়াত-ঘটনাই ঘটিতে পারে নাই। আমি বহুস্থানে ছিলাম, থাকিয়াও সে কালে কোনরূপ গতিবিশিষ্ট হই নাই। অতএব আমিই সব; আমাতেই সকল দেখিয়াছিলাম, যেমন এই দেহাত্মস্বরূপে আপাদমস্তক সমস্তই সন্দর্শন করিয়া থাকি, তেমনি তখন চিন্ময়কলেবরে চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিরহিত হইয়াও চিন্ময় চক্ষেই ঐ সকল আমি প্রত্যক্ষ করিয়া-

ছিলাম। তখন আমার সমাধি-অবস্থা গিয়াছে। সেই সমাধি কালে আমি নিরাকার হইয়া শুদ্ধ সুবিমল চিদাকাশরূপেই বিরাজ করিতেছিলাম। সে সময়ে সমুদায় জগৎ আমার নিকট এইরূপভাবে প্রতিভাত হইতেছিল, যেন তাহাতে বাস্তবিকতা নাই,—না থাকিলেও বাস্তবিকতার নাশ তাহাতে হয় নাই। ফলে আমি যাহা দেখিলাম, তাহার দৃষ্টান্তরূপে স্বপ্নদৃষ্ট জগদ্-ব্যাপারকেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্নে অনেক দৃশ্য দর্শন হয়, পরন্তু উহারা যেমন শূন্য বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি আমার ঐ দৃষ্ট মাত্র সামগ্রীও কেবল আকাশই। বৃক্ষদেহী জীবের নিজ পত্র-পুষ্প-পল্লবাদি পরিদর্শনের ন্যায় আমিও আত্মজ্ঞানময় নেত্রে ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলাম। অথবা যেমন অসীম অনন্ত বারিধি নিখিল জলজন্তু ও বীচি-বুদ্বুদ-ফেন-সমষ্টিকে স্বস্বরূপেই পরিজ্ঞাত হয়, আমিও তেমনি ঐ সকল অবগত হইলাম। অপিচ অবয়বী মাত্রেই অবয়বসমূহকে যেমন স্বস্বরূপে বিদিত হয়, আমিও তখন সেই সেই সৃষ্টিসমষ্টিকে আমারই বলিয়া অবগত হইলাম।

হে রাঘব! দেহে, আকাশে, জলে, স্থলে সর্ব্বস্থানেই এখনও আমি জ্ঞানময় হইয়াই সেই সকল সৃষ্টিসমষ্টিকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং জ্ঞানময় হইয়াই পুরোবর্ত্তী বিশ্বাভ্যন্তর ও তদ্বহির্দ্দেশ জাগতী ক্রিয়ায় পরিপূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। রসভাবকে যেমন জলাধিদেবতা, শীতলতাকে যেমন হিমাধিদেবতা এবং স্পন্দকে যেমন পবনাধিদেবতা আপনার বলিয়া বুঝেন, তেমনি শুদ্ধ বোধময় আত্মা সমুদায়কেই স্বস্বরূপে পরিজ্ঞাত হন। অধিক বলা বাহুল্য, যিনি বিবেকবান্ হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানসহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসহ আমারও একত্ব ঘটিয়াছে। কেন না, আমি তো তথাবিধ আত্মাকেই অনুভবগোচর করিতেছি। বিবেকীরা সম্যগ্দর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞান সহ সারূপ্য লাভ করিয়াছেন, এই জন্যই কি জ্ঞাতা, কি জ্ঞেয়, কি বিষয়জ্ঞান, এই বিষয়ত্রয়ময়ী বুদ্ধি তাঁহাদের কোন-রূপেই ঘটে না। দিব্য দৃষ্টিশালী ব্যক্তির নিকট লোকে যেমন কোটি যোজন পথের বহিরন্তর্গত সমস্ত দিব্য ভৌমাদি ভাব অনায়াসেই অবগত হইতে পারে, আমিও তখন তেমনই বুঝিয়াছিলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যখন আপনার সেই বর্ণিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন সেই আর্য্যাশ্লোক-পাঠিকা অঙ্গনা কি করিয়াছিল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই অঙ্গনা তখন আর্য্যা পাঠ করিয়া একান্ত বিনীতভাবে আকাশে আকাশরূপে মৎসমীপে অবস্থান করিতে লাগিল। সে কালে আমি যেমন আকাশদেহ ধারণ করিয়াছিলাম, সেই রমণীও সেইরূপ আকাশ-কলেবর হইয়াছিল। সমাধি অবলম্বনের পূর্ব্বে আমি আর কদাচ সেই রমণীকে অবলোকন করি নাই। সমাধিভঙ্গের পর দেখিলাম,—সেখানে আকাশ-কলেবর আমি, সেই আকাশদেহী রমণী আর সেই চিদাকাশরূপ জগৎসমূহই ছিল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে উচ্চাশয়! জিহ্বা ও তালু প্রভৃতি দেহাবয়বের প্রযত্নবশেই প্রাণবায়ু হইতে বর্ণোচ্চারণ হয়; বর্ণই বাক্য প্রকাশ করে, এ অবস্থায় সেই আকাশময়ী নারীর বাক্যোচ্চারণ সম্ভবপর হইল কিরূপে? আর কি প্রকারেই বা আপনার রূপদর্শনব্যাপার ঘটিল? এ বিষয়ে যাহা নিশ্চিত তথ্য, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! স্বপ্নে যেমন রূপদর্শনাদি ও শব্দোচ্চারণাদি ব্যাপার প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে সেই চিদাকাশে সেই সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখনকার সেই সকল দৃশ্য প্রকৃত পক্ষে আকাশরূপেই অবস্থিত ছিল। সে কালে আমার চক্ষে সেই যে সকল দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহারাই যে কেবল আকাশাত্মক, তাহা নহে; এই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত নিখিল জগজ্জালই আকাশস্বরূপ। হে রাঘব! চিৎস্বভাবের যে চিন্ময় দেহ, তাহা জগদ্বাসনায় সমাবৃত রহিলেও তাহাতে জ্ঞেয় সম্পর্ক নাই, তাহা পরমার্থস্বরূপে মহাধাতুশালী হইয়াই নিশ্চিত বিলসিত এবং চিন্ময়দেহে ইন্দ্রিয়বর্গের সত্তা বিষয়েও ভ্রমাত্মক জ্ঞান বিরাজিত আছে। অতএব জানিবে,—স্বপ্নে যেমন দেহাদির অবস্থিতি, মদীয় চিৎশরীরেও তেমনই। স্বপ্নাবস্থায় অসদ্বস্তু যেমন সদাকারে এবং সদ্বস্তু যেমন অসদাকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অপিচ স্বপ্নাবস্থায় আকাশই যেমন ফালকৃষ্ট নতোন্নত পথগমনাদির বিষয়ীভূত হয়, তেমনি কি তুমি,

কি আমি, কি সে, সকলই চিদাকাশমাত্র। মানবদিগের স্বপ্নাবস্থায় যে যুদ্ধ-কোলাহলাদি-ব্যাপার, তাহা মিথ্যাভূত হইলেও যেমন অনুভূতি-গোচর হয়, সমাধিদশায় আমারও রূপদর্শনাদি ব্যাপার তেমনই হইয়াছিল। কথা হইতে পারে, স্বপ্নাবস্থায় যে দৃশ্যদর্শনাদি ব্যাপার, তাহা কিরূপ কারণ হইতে ঘটে? এরূপ কথা একান্তই অসঙ্গত বৈ কিছুই নহে। কেন না, এ ব্যাপারে স্বীয় অনুভবই তো কারণ; তদ্ব্যতীত কারণান্তর নাই। এইরূপে দেখ, এই জগৎস্বপ্নদর্শনও অবিদ্যাবৃত চিদাত্মারই স্বভাবমাত্র। তুমি প্রশ্ন করিতে পার, স্বপ্ন কি নিমিত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহার উত্তর ইহাই প্রকৃত যে, তুমি দর্শন করিতেছ, এই দর্শনই স্বপ্ন সন্দর্শনের কারণ।

রামচন্দ্র! তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই স্বপ্ন শব্দের উপমা তুলিয়া জগৎশব্দের ব্যবহার করিতেছি মাত্র; ফলতঃ এ দৃশ্য না সৎ, না অসৎ, না স্বপ্ন, কিছুই নয়; ইহা কেবলই ব্রহ্ম।

হে রঘুনন্দন! সেই যে রমণী আর্য্যাশ্লোক পাঠ করিয়াছিল, আমি তখন তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্যই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিতে কি, হে বৎস! আমার এই জিজ্ঞাসা-ব্যাপারে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না; কেন না, যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বপদৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-পরিচয় হয়, সেই রমণীর সহিত আমারও তেমনি প্রশ্নাদি ব্যবহার চলিয়াছিল। জানিও,—স্বপ্নকালীন ব্যবহারপরম্পরা যেমন শুদ্ধ আকাশই, সেইরূপ আমার সমাধিকালের প্রশ্ন, আমি ও এই জগৎ—এ সকলও আকাশমাত্রই। যেমন স্বপ্ন জগতের রূপ, তেমনি এই জগৎও আকাশ বৈ আর কিছুই নয়। সৃষ্টির প্রাক্কালেও যে জগদুৎপত্তি, তাহাও স্বপ্নমাত্র। এই জগদ্ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায়; অথবা উহা অন্য কিছুই নহে; উহা কেবল নির্ম্মল বোধরূপ সন্মাত্রই বিদ্যমান। তবে কথা এই যে, তোমরা স্বপ্নের দ্রষ্টা;—আকৃতিসম্পন্ন হইয়া আছ; আর এই জগৎস্বপ্নের দ্রষ্টা একমাত্র চিদাকাশই। এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা যেমন অমল আকাশ মাত্র, তেমনি সেই স্বপ্ন জগতে অমল আকাশই জগদাকারে বিদ্যমান। চিদাকাশের হৃদয় নিরাকার; তাহাতে যে স্বপ্ন স্বভাবতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়,

তাহার আবার উৎপত্তি কোথায়? কাজেই কিরূপে তাহার আকার-ঘটনা সম্ভবপর? তোমাদের স্বপ্ন জগৎ যখন নির্ম্মল আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন চিদাকাশরূপী নিরাকার ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন আকাশ না হইবে কেন? অতএব চিদাকাশের কোন কারণ নাই, আধার নাই। উহা জগৎস্বপ্ন প্রণয়ন করে—করিয়াও অকৃতবৎ অবলোকন করিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রাহ্মণ চিদাকাশরূপিণী মৃত্তিকা লইয়া ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রাকার গবাক্ষময় দেহাদিরূপ গৃহ বিরচন করিয়াও করেন নাই।

বৎস রাম! এ সংসারে না কর্ত্তৃত্ব, না ভোক্তৃত্ব, না জগজ্জাল, কিছুই নাই। তুমি এইরূপে সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানী হও—হইয়া অন্তরে পাষাণ হেন মৌনভাবে আর বাহিরে প্রবাহানুসারে বিচরণ করিতে থাক। এইরূপ ভাবে থাকিলে যখন তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় পাইবে, তখন দেহ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই ঘটিবে না।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ভবদীয় কলেবর তো তখন কল্পনা-মাত্রে পর্য্যবসিত, সুতরাং অবয়বাদি-বিরহিত; এ ক্ষেত্রে সেই রমণীর সহিত আপনার কায়িক সম্বন্ধ ঘটিল কিরূপে? আর দেহের সম্বন্ধ যদি নাই রহিল, তবে ক চ ট ত প ইত্যাদি বর্ণসমষ্টিই বা সমুচ্চারিত হইল কি প্রকারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বর্ণসমষ্টি সমুচ্চারিত হইবার পক্ষে দেহ কখনই কারণ নহে। কেন না, ইহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, শবদেহ কোন ক্রমেই শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না। এইরূপে বলা যায়, বর্ণোচ্চারণ কেহই করে না বা উহার উৎপত্তিও নাই। তত্ত্বজ্ঞদিগের অভিমত ইহাই।

আর যদি সত্য সত্যই বর্ণোচ্চারণ হইত, তবে স্বপ্নকালে যে বর্ণোচ্চারণ হয়, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার পার্শ্বস্থ জাগ্রৎ ব্যক্তির শ্রবণগোচর হয় না কেন? অতএব জানিবে—স্বপ্নে যেমন কিছুই থাকিবার নয়, কেবল মাত্র সত্য জ্ঞানই বিদ্যমান, অন্য সকলই মিথ্যা ভ্রমমাত্র; তেমনি সেই যে পরমাকাশ—তাহাতেও কেবল চিদাকাশই দীপ্যমান। আকাশে যে চিদাকাশের বিকাশ, তাহাই বটে স্বাভাবিক; অতএব যাহার নেত্রে তিমিররোগ জন্মিয়াছে, তাহার নিকট চন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণতা যেমন উপলব্ধ হয়, মূঢ় জনসাধারণের নিকট আকাশের নীলাভ মূর্ত্তি যেমন প্রকাশ পায়, শিলা সঙ্গীতালাপ করে, স্থানবিশেষে ইহাও যেমন ভ্রমক্রমে প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিদাকাশই ভ্রমপ্রতীত দেহ উপগত হইয়া বিভিন্নভাবে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় দেহে যে শব্দাদি বিষয় জ্ঞান, তাহাও চিদাকাশই। আকাশের সাকারভাবে প্রকাশ যেমন আকাশমাত্র, তেমনি স্বপ্নে যে চিদাকাশ-বিকাশ জগৎস্বরূপ আশ্রয় করে, তুমি বুঝিবে,—সেই জগৎস্বরূপ ঐ চিদাকাশই। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়কে যখন একই বলিয়া স্থির নিশ্চয় করা হইল, তখন সমাধিকালে যাহা দেখা যায়, বা সাধারণতঃ সম্মুখে যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, সমস্তই সেই একাদ্বয় চিদাকাশ; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! সত্যই যদি এ জগৎ স্বপ্ন, তবে ইহা জাগ্রৎ হইল কিরূপে? স্বপ্ন অসত্য; জাগ্রৎ সত্য; সুতরাং যাহা একেবারেই অসত্য, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? আমাকে এ তত্ত্ব বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! জগৎ যেরূপে স্বপ্নময় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্বপ্নে যে পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা হইতে অভিন্ন এবং না সত্য বা না স্থির, তেমনি এই জগৎও আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। ইহা স্বতন্ত্রভাবে না সত্য, না স্থির, কিছুই নহে। এইরূপে বীজসমষ্টির মধ্যে যেমন বীজ, তেমনি আকাশাভ্যন্তরে সমান অসমান আরও জগৎ অনুভূত হয়। অপিচ এরূপও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে যে, প্রতি জগতের অভ্যন্তরেই নানাবিধ জগৎপরম্পরা পরস্পর

অদৃশ্যভাবে অবস্থিত আছে। সেই সমুদায় জগৎপরম্পার মধ্যে কেহই তাহাকে অবলোকন করিতে পারে না। কুসূলাভ্যন্তরে রাশীকৃত বীজ থাকিলে তন্মধ্য হইতে দুই একটা যেমন গলিত হইয়া পড়ে, তেমনি ঐ জগৎপরম্পরাও যে জগতের অভ্যন্তরে অবলোকিত হয়, সেই জগৎ হইতেই গলিয়া পড়িয়া যায়; পড়িলেও উত্তপ্ত ভূপতিত জলবিন্দুবৎ উহা চেতন-স্বরূপ বলিয়া সম্পূর্ণই শূন্য হইয়া থাকে। অস্মাদৃশ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় কেহই কাহাকে পরস্পর পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সকল জগৎ অজ্ঞানাবৃত চেতনস্বরূপ; তাই সতত যেন সুপ্তভাবে কেবল স্বপ্নই সন্দর্শন করিতে থাকে। এ জগতে জীবনিবহ রাত্রিকালে সুপ্ত থাকে, আর এক স্বপ্নময় জগতে অবস্থান করে এবং দিবসকল্পনা করিয়া দিবসব্যাপার সমাধা করিতে থাকে। দৈত্যগণ দেবগণের হস্তে নিহত হয়,—হইয়া স্বপ্ন জগতেই অবস্থান করে। ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য, নতুবা উপায় তো কিছুই নাই। কারণ তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয় না,—না হইয়াই সহসা নিহত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদের ভাগ্যে মুক্তিলাভও ঘটে না। অন্য দিকে চিদাভাসরূপী বলিয়া তাহারা জড়ভাবও লাভ করে না; জাগ্রদবস্থায় তাহাদের দৃশ্য দেহও অসম্ভব হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের অবস্থিতি-স্থান স্বপ্ন-জগৎ ব্যতীত আর কোথায় হইতে পারে বল? বলা বাহুল্য, নিখিল জীবই সুপ্ত বাসনার আকারে স্বপ্নজগতেই অবস্থান করিতেছে। যদি অন্যের হস্তে নিহত হয়, তবে ইহারাও পূর্ব্বোক্ত দানবাদির ন্যায় স্বপ্ন জগতেই অবস্থান করিতে থাকে। কেন না, জ্ঞানাভাব নিবন্ধন তাহাদের মুক্তিলাভ সহজে সঙ্ঘটিত হয় না। সহসা মরণে দেহের অবিদ্যমানতায় জাগ্রৎ জগতে অবস্থিতি লাভও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সুতরাং বাসনাময় চৈতন্যস্বরূপে স্বপ্ন জগৎই তাহাদের বাসস্থান; তদ্ব্যতীত আর কোথায় তাহারা থাকিবে? এইরূপে রাক্ষসেরাও দেবগণের হস্তে নিহত হইলে স্বপ্নজগতে গিয়া বাস করে। নিহত জীবেরা নিতান্তই অজ্ঞ; তাই মুক্তিলাভ তাহাদের ভাগ্যে কদাচ ঘটিয়া উঠে না। তাহারা সচেতন, তাই পাষাণবৎ জড়াবস্থানও তাহাদের হইতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নকল্পনার ন্যায় জগৎ-কল্পনাপূর্ব্বক সেই কল্পিত জগতে অবস্থিতি ব্যতীত তাহারা আর

কি করিবে, বল দেখি? এই তো শৈলসাগরাদিময় দৃশ্য প্রপঞ্চ, আমরা এ সকল যেমন চিরকাল ধরিয়া সত্যস্বরূপে অনুভব করিয়া আসিতেছি, ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত অসুরবৃন্দও তেমনি কল্পিত স্বপ্ন দৃশ্য সকল অনুভূতিগোচর করিয়া থাকে। যেরূপ পরিপাটীক্রমে অস্মদীয় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে, ঐ অসুরাদি জীবনিবহের কল্পিত স্বপ্ন-জগতেও তেমনি ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, এই জগৎকে ও আমাদিগকে যদি উহারা দেখে, তবে আমরা ও এই জগৎ এই সকলই উহাদের নিকট স্বপ্ন বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বাপ্ন পুরুষ নিজানুভবেও যে প্রকার, অন্যের অনুভবেও তেমনি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কাজেই অনুভবের প্রভাবে উহার সত্যতা বিচিত্র কথা নহে; কেন না, সত্যতার কারণ অধিষ্ঠানচৈতন্য; তাহা সর্ব্বগ ও সর্ব্বত্রই বিরাজিত। সুতরাং নিখিল স্বাপ্নপুরুষের সত্যতার ন্যায় প্রত্যেক স্বপ্নে আমরা যে সকল পুরুষ দেখিতেছি, তাহাদেরও সত্যতা। স্বপ্নাবস্থায় তুমি যে সকল পুরুষ দেখিতেছ, তাহারাও সত্য বৈ আর কিছুই নহে। কেন না, সর্ব্বময় ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান। সেই যে ব্রহ্ম, তাঁহার সত্তায় সকলেরই সত্তা বিদ্যমান। স্বাপ্ন-পদার্থ অদৃশ্য হইয়া গেল, ইহা যেমন জাগ্রদবস্থায় অনুভূত হয়, স্বপ্নকালেও তেমনি আবার তৎসমস্তের সত্তানুভব হইয়া থাকে; সুতরাং অনুভবেও তাহার সত্যতা পরিহার্য্য নহে। যদি ব্রহ্মসত্তা স্বীকার করা যায়, তবে আর কোন কথান্তর হওয়া অসম্ভব; কেন না, ব্রহ্মসত্তায় কিছুই হওয়া অসম্ভব নহে। যখন নিখিল জগৎ আকাশেরই কার্য্য; তখন সকলই আকাশ; সর্ব্বময় আকাশ সদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কোথাও তাহার অপায় নাই। এই আকাশই অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম। ইহাঁর উদয়াস্ত কিছুই নাই। এই যিনি পরমাকাশস্বরূপ পরম ব্রহ্ম, ইহাঁতে অসংখ্য চিত্ত; এই অসংখ্য চিত্তে সংখ্যাতীত জগৎ বিরাজিত। সেই সকল সংখ্যাবর্জ্জিত জগতের প্রতি জগতে, প্রতি সূক্ষ্ম আকাশদেশে, প্রতি লোকে, প্রতি দ্বীপে, প্রতি পর্ব্বতে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক বর্ষে, যত সংখ্যক জীব মৃত্যুর পর মুক্তি পাইতে পারে না, ততসংখ্যক জীবেরই

৩৩

প্রত্যেকতঃ এক একটী স্বাপ্ন সংসার স্বতন্ত্রভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল সংসারের প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে অসংখ্য মানব বিদ্যমান; ঐ মানবসমুদায়ের অভ্যন্তরে আবার প্রত্যেকের মনের মধ্যে জগৎ আছে; সেই জগদভ্যন্তরে আবার মনুষ্য আছে; সেই সেই মনুষ্যের মনের অভ্যন্তরে আবার জগৎ আছে। এইরূপে এই দৃশ্য জাগতী ভ্রান্তির আর সীমা নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি তো ইহার সীমা একেবারেই প্রাপ্ত হইবেন না; কেন না, তিনি অবগত আছেন,—সমস্তই ব্রহ্মময়।

রামচন্দ্র! জল, স্থল, আকাশ, শিলা বা ভিত্তি, সর্ব্বত্রই চিৎস্বরূপ বিরাজমান। সেই চিৎস্বরূপই এই নিখিল বিশ্ব বা জগৎ। এই নিমিত্ত কত জগৎ যে কত স্থানে প্রতীত হয়, তাহার সংখ্যা হওয়া সম্ভব নহে। তত্ত্ববিদের নিকট সকলই একমাত্র ব্রহ্ম। পরন্তু অজ্ঞদিগের চিত্তেই কেবল এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রতিভাত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই রমণী কমলদলবৎ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া মধুকরান্দোলিত মালতী-মালার ন্যায় চঞ্চলনেত্রে মৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসিলাম,—হে কমলোদর-কান্তি! কে তুমি? আমার সমীপে তোমার কি জন্য এক্ষণে আগমন হইল? তুমি কাহার প্রণয়িনী? আমার কাছেই বা তোমার প্রার্থনা কি? কোথায় তোমার বাসস্থান?

তখন সেই বিদ্যাধরী কহিল,—ভগবন্! আমি বিপদে পড়িয়া ভবদীয় করুণালাভার্থ আগমন করিয়াছি; আপনি আমায় অবাধে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমিও ভবৎসমীপে নিখিল বৃত্তান্ত

নিঃশঙ্কচিত্তে বলিব; শ্রবণ করুন। অসীম অনন্ত পরমাকাশ; তাহার কোণদেশে জগৎনামে একটী গৃহ বিদ্যমান। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই তিনটী তাহার প্রকোষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভ মায়ার প্রভাবে সেই গৃহাভ্যন্তরে কল্পনানাম্নী কোন এক কামিনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ গৃহের পাটলাভ ভূভাগ দ্বীপ ও সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যেন জগৎলক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠবৎ প্রতীত হইতেছে। সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সাগরের বহিশ্চতুর্দ্দিকে দশ সহস্র যোজনব্যাপিনী এক সুবিশাল স্বর্ণময়ী ভূমি বিরাজমানা। ঐ ভূমি দিবারাত্র সমানভাবে আপনা হইতেই সমুজ্জ্বলপ্রভায় দেদীপ্যমান। ঐ ভূমির উপরি-ভাগ চিন্তামণি দ্বারা গ্রথিত। উহা আকাশবৎ সুনির্ম্মল; উহাতে রজোভাগ কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই। ঐ ভূমি নিজ কান্তিচ্ছটায় স্বর্গাদি অন্যান্য সমস্ত লোক জয় করিয়াছে। সুরসুন্দরীদিগের সহিত সুর ও সিদ্ধসম্প্রদায় ঐ স্থানে সতত বিহার করিয়া থাকেন। সঙ্কল্পমাত্রেই ঐ ভূমিতে সর্ব্ববিধ ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হয়। ঐ ভূমিভাগের বহিঃপ্রান্তে এক পর্ব্বত আছে। তাহার নাম লোকালোক। তত্রত্য ভূভাগ জগৎ-লক্ষ্মীর প্রকোষ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান। মূর্খ ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় ঐ লোকালোকাচলের অর্দ্ধাংশ সতত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং উহার অপরার্দ্ধ সত্ত্বগুণময় লোকদিগের চিত্তবৎ সর্ব্বদা প্রকাশস্বভাব। ঐ লোকা-লোকের কোন অংশ সাধুজন-সমাগমবৎ আহ্লাদকর, আর কোন অংশ মূর্খজন-সমাগমবৎ উদ্বেগজনক। বুদ্ধিমানের চিত্তে যেমন সর্ব্ব বিষয় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, তেমনি উহার স্থানবিশেষের আলোকময়তা নিবন্ধন তত্রত্য সর্ব্ববস্তু প্রকাশমান হইতেছে। বেদবেদী পণ্ডিতজনের চিত্তের ন্যায় উহার কোন স্থান অতি গভীর। উহার কোথাও চন্দ্রকর সম্পূর্ণ-রূপে প্রবেশ করে না এবং কোথাও বা সৌরালোক একেবারেই প্রবিষ্ট হয় না। কোথাও লোকে লোকারণ্য; কোথাও বা কিছুই নাই,—সব শূন্য। কোথাও দেবনিবাস, কোথাও দৈত্যাবাস; কোন স্থান পাতালবৎ গম্ভীর; কোথাও বা সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদ্যমান; তদ্দর্শনে নিশ্চয় প্রতীতি হয়, যেন লোকালোক মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। উহার কোথাও কেবল অসংখ্য গর্ত্ত আর সেই সেই গর্ত্তমধ্যে পেচকাদি বিবিধ পক্ষীর বাস;

উহার কোথাও মনোজ্ঞ সানুদেশ। কোথাও ঐ পর্ব্বতের সমুন্নত শৃঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে,—হইয়া যেন বিধাতৃপুরী স্পর্শ করিতেছে। উহার কোথাও কেবল শূন্য মহারণ্য; সেই মহারণ্যে নিরন্তর কেবল প্রবল বায়ু প্রবহমাণ; কোথাও রমণীয় কুসুম-কানন বিদ্যমান, আর সেই কাননমধ্যে বিদ্যাধরীবৃন্দ সঙ্গীতচর্চ্চায় তৎপর; উহার কোন স্থানে পাতালবৎ গভীর গুহা পরিদৃশ্যমান; আর সেই গুহাভ্যন্তরে কুষ্মাণ্ডনামক এক প্রকার ভীষণ পিশাচজাতির বাস। কোন স্থানে নন্দনকাননবৎ মনোজ্ঞ ঋষি-জনাশ্রম; কোথাও বা নীরদমালা সতত অবস্থানপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে গর্জ্জন-শীল, কোথাও মেঘসঞ্চার একেবারেই নাই; কোন স্থানে কেবলই গুহা বিদ্যমান; সেই জন্য সেস্থান অতীব ভীষণ। কোথাও জনপদ সকল ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তত্রত্য লোক সকল স্বস্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া ভূতপ্রেত প্রভৃতির আবাসস্থান ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কোন কোন স্থানের অধিবাসীদিগের এতই সৌজন্য যে, তাহাতে দেবগণও বশীভূত হইতেছেন। কোথাও প্রবল প্রভঞ্জন সর্ব্বদাই প্রবহমাণ; সে প্রভঞ্জনের এতই বেগ যে, সেখানে সেজন্য চরাচর কোন প্রাণীই তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। কোথাও চরাচর জীবজাতি নিরুপদ্রবভাবে চিরস্থির হইয়া বিরাজমান। কোথাও ভীষণ মরুস্থলী বিদ্যমান;—সোঁ সোঁ শব্দে কেবলই প্রখর বায়ু প্রবহমাণ। কোথাও কমল-কাননের অভ্যন্তরে সার-সাখ্য বিহঙ্গমকুল সুমধুর কূজন-পরায়ণ; কোথাও জলতরঙ্গ বা মেঘবৃন্দের গম্ভীর আরাব কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোথাও অপ্সরাসকল মত্ত হইয়া দোলারোহণে দোল খাইতেছে। তদ্দর্শনে দর্শকবৃন্দ স্মর-শরে জর্জ্জরিত হইতেছে। ঐ অচলের নানাস্থান কুষ্মাণ্ড নামক পিশাচনিবহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; কোথাও নদীতীরে উপবেশনপূর্ব্বক বিদ্যাধরী সহ সিদ্ধগণ নৃত্যগীতে তন্ময় রহিয়াছে; কোথাও মেঘবৃন্দ বারিবর্ষণ করিতেছে; তাহাদের প্রবল বারিধারা নদীর প্রবাহাকারে বাহু বিস্তার করিয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে; কোথাও বা সমীরণ নানাস্থান হইতে নানাবিধ বারিদরূপ বস্ত্র-খণ্ড আনিয়া স্তূপীকৃত করিতেছে; কোথাও বা মুদ্রিত কমলের অভ্যন্তরে ভ্রমর অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহাতে মনে হয়, কমলিনী যেন নেত্র

মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছে। কোথাও সুরসুন্দরী অপ্সরা ও সিদ্ধ-কামিনীরা তাম্বূলদল চর্ব্বণপূর্ব্বক স্বস্ববদনসৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ঐ লোকালোক শৈলের অর্দ্ধাংশে তপনদেব তাপ বিস্তার করেন; সেখানে প্রাণী সকলের ব্যবহারকার্য্য অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে; উহার অপরার্দ্ধে ভীষণ নৈশ অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা জনমানবের সমাগম একেবারেই নাই; কেবল মাত্র পিশাচেরা মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। কোথাও সর্ব্বদাই বিপ্লব-বিপত্তি চলিতেছে; তাহাতে লোকসকল ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতেছে। কোথাও সুব্যবস্থা-সম্পন্ন সুসমৃদ্ধ রাজ্য-বিস্তার আছে। সে রাজ্যের অধিবাসীরা উন্নত-ভাবে স্ব স্ব সুখময় জীবন যাপন করিতেছে। উহার কোন কোন স্থান একেবারেই শূন্যতাময়; এবং কোন কোন স্থল বা বহু জনসমূহের আবাস-ভূমি। কোথাও গভীর গহ্বর; কোন স্থান পাতালবৎ অতি ভীষণ; কোন স্থানে বৃহদাকার কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান। কোথাও বা জলের বিন্দুমাত্র নাই। সেখানে প্রাণিগণ জলাভাবে হাহাকার করিয়া কাল কাটাইতেছে। কোথাও বৃহৎ বৃহৎ হস্তী আছে। কোথাও মত্ত মৃগেন্দ্র বাস করিতেছে। কোথাও জনপ্রাণীর সংস্রব একেবারেই নাই; অথচ তরুলতা প্রচুর-পরিমাণে বিদ্যমান। কোথাও উন্মত্ত পিশাচদল বাস করিতেছে। কোথাও করঞ্জবন এবং কোথাও বা ঘন ঘন তালতরুবন বিরাজ করিতেছে। কোন স্থানে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ সলিলময় সরোবর আছে এবং কোথাও বা দীর্ঘ দীর্ঘ মরুভূমি বিদ্যমান আছে। কোথাও অনর্গল ধূলি-জাল সমুত্থিত হইতেছে; কোথাও বা লতা-পত্রাদি পদার্থ কিছুই নাই। কোন কোন স্থানে সকল ঋতুর সকল প্রকার শোভা বিকাশ পাইতেছে। ঐ লোকালোকশৈলের শিখরদেশে অসংখ্য শিলা বিদ্যমান। ঐ সকল শিলা আকাশবৎ সুনির্ম্মল রত্নরাজিময়। উহাদের প্রত্যেকটীই এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতবৎ পরিশোভমান। ঐ সকল শিলাখণ্ডের উপরিভাগে কল্পান্তকালীন বারিদবৃন্দ স্থিরভাবে বিরাজমান। উহারা দুগ্ধের ন্যায়, জলের ন্যায় অথবা ভাস্করের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। উহাদের উপরিভাগে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসকল পুত্রপৌত্রাদি পরিবারবর্গ সহ অবাধে বাস

করিতেছে। এ সকল শিলাখণ্ডের উত্তরদিকে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত কোন এক শিলাখণ্ডের মধ্যে আমি বাস করিয়া থাকি। যাহার অভ্যন্তরে আমার বসতি, তাহা বজ্রবৎ কঠিনাবয়ব কোন এক সাধারণ যন্ত্রবিশেষ। স্বয়ং বিধাতা পুরুষই আমাকে তন্মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমি তথায় থাকিয়া বহু যুগযুগান্তর যাপন করিয়াছি। সেখানে কেবল যে আমিই আছি, তাহা নহে; আমার যিনি স্বামী, তিনিও সায়ংকালে কমল-মুকুরে মধুকরের ন্যায় তন্মধ্যে আবদ্ধ আছেন। আমি তাঁহার সহিত সেই সঙ্কীর্ণ শিলাকোটরে থাকিয়া বহু কাল কাটাইয়া দিয়াছি। এখনও আমি আমার একটী মাত্র দোষের জন্য মুক্তি পাইতে পারিতেছি না; সে দোষের নাম কামনা। আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই মমতায় জড়িত হইয়া চিরকাল বাস করিতেছি। বলিতে কি, সেই যে আমাদের পাষাণ-সঙ্কট, তন্মধ্যে কেবল যে আমরা উভয়েই বদ্ধ আছি, তাহা নহে; আমাদের নিখিল পরিবারবর্গও তন্মধ্যে আবদ্ধ আছে। আমার পতি সেই পুরাণ-পুরুষ দ্বিজাত্মা সেইখানে বরাবর আবদ্ধ আছেন। তিনি সেই স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন না; সেইখানে থাকিয়াই শত যুগ যাবৎ জীবন ধারণ করিতেছেন। পতি আমার আবাল্য ব্রহ্মচারী, সতত বেদপাঠে নিরত এবং অলসবৎ একাকীই বিজনে অবস্থিত। তিনি বড় সরলপ্রকৃতির লোক; ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র তাঁহার নাই। হে বেদবিদ্‌গণের বরেণ্য! আমি তাঁহারই পত্নী; কিন্তু হইলে কি হইবে, আমি বিষয়ের প্রতি একান্তই অনুরক্তা। আমার স্বামীর বিচ্ছেদে আমি নিমেষমাত্র কালও জীবন ধারণে অক্ষমা।

হে ব্রহ্মন্! এখন শ্রবণ করুন, আমি তাঁহার ভার্য্যা হইলেও তিনি কিরূপে আমায় উদ্ভাবন করিলেন এবং কিরূপেই বা আমাদের পরস্পর প্রগাঢ় প্রেম উপচিত হইল?" আমার পতি শৈশব অবস্থায় যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন, তখন একদা সুনির্ম্মল আত্মভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক আপনাপনি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন যে, আমি যেরূপ স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তি, আমার তদনুরূপ পত্নীসৃষ্টি কিরূপে হওয়া সম্ভবপর? হে নলিননয়ন! আমার ভাবী স্বামী বিধাতা তখন এইরূপ চিন্তা করিয়াই

মনে মনে এক অনিন্দ্যাঙ্গী কামিনীকে সৃষ্টি করিলেন। বোধ হইল, চন্দ্র যেন নির্ম্মল কৌমুদী বিস্তার করিলেন। তাঁহার সেই মানসী কামিনীর কবরীতে মন্দারকুসুম শোভা পাইতে লাগিল। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সেই কামিনী আমিই। আমি অনন্তর বসন্তকালের কুসুমমঞ্জরীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম। আকাশের ন্যায় সহজ অম্বর আমার পরিধানে ছিল। ক্রমে আমি পূর্ণেন্দুমুখী সুন্দরী হইয়া মনোহারিণী হইয়া উঠিলাম। কুসুমকোরকবৎ মদীয় পয়োধরযুগল উন্নত হইয়া উঠিল। আমি করপল্লবে সুশোভিতা হইলাম ও সমগ্র গুণে অন্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলাম। তদবস্থায় উদ্যানগত বনলতার ন্যায় আমার শোভা হইয়া উঠিল। হরিণীর যেমন নয়নদ্বয়—তেমনি আমার নেত্রযুগল সুশোভন হইল। ক্রমে আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলাম। তখন আমা দ্বারা নিখিল লোকের মদনোন্মাদনা হইতে লাগিল; সৌন্দর্য্যে আমি সকলেরই মনোহরণ করিতে লাগিলাম। আমার হাব ভাব বিলাস ও সকটাক্ষ দৃষ্টি-পাত সকলেরই সমালোচ্য হইল। আমি সর্ব্বদা গীতবাদ্যে সমাসক্ত হইয়া উঠিলাম। ক্রমশঃ সেই ব্যাপারে আমার এতই আসক্তি হইল যে, আমি আর কিছুতেই তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আমি নিজে সৌভাগ্যশালিনী; আমাকে যিনি কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সমদর্শী ব্যক্তি; তাই আমি সর্ব্বত্রেই সমদৃষ্টিশালী হইলাম। আমার দৃষ্টিতে সৌভাগ্য-দৌর্ভাগ্য একইরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমি কোন মোহজালে জড়িত হইয়া থাকিতাম না; কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল দশাতেই অখিন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমি যে এক্ষণে কেবল স্বামীর গৃহই রক্ষা করিতেছি, তাহা নহে; এই যে ত্রৈলোক্যরূপ গৃহ দেখা যাইতেছে, এই বিশাল গৃহই আমা দ্বারা ধারিত হইতেছে। আমি আমার স্বামীর কুলরক্ষিণী ভার্য্যা হইয়াছি। তাঁহারও আত্মরক্ষা আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি তদীয় পোষ্য-পরিজনবর্গের প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই বিরাট ত্রৈলোক্য-গৃহের সমস্ত আসবাব পত্র আমি একাকিনী বহন করিতেছি। আমি ক্রমশ যখন পূর্ণ যুবতী হইয়া উঠিলাম, মদীয় পয়োধরযুগল একান্ত সমুন্নত হইল। তখন ফল-কুসুম-শালিনী

লতার ন্যায় আমার শোভা হইতে লাগিল। আমার পতি স্বাধ্যায় ও তপস্যাকার্য্যে সতত নিরত এবং সর্ব্বদা দীর্ঘসূত্রীর ন্যায় অবস্থিত। এই জন্য এবং আরও একটা সুগূঢ় কারণ বশতঃ আমার সেই স্বামী তখনও আমাকে উদ্বাহ করিতে পারেন নাই। আমার একান্তই ইচ্ছা যে, তৎসহ মদীয় যৌবনোচিত ভোগবিলাস চরিতার্থ করি। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে বাসনা আমার কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না; এই নিমিত্ত পাবকপতিত নলিনীর ন্যায় তদীয় বিরহে আমি নিয়তই অতি দগ্ধ হইতেছি। আমি যদি শীতল-সমীর-সঞ্চালিত কমলদলের উপরিভাগেও উপবেশন করি, তথাচ জ্বলদঙ্গারে উপবেশন জন্য ক্লেশই আমার অনুভূত হইয়া থাকে। আমার দেহ যেন সেই অবস্থাতেও দগ্ধ হইয়া যায়। যে উদ্যানভূমি সতত নানাজাতীয় কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত, আমার নিকট তাহাও উত্তপ্ত সৈকত-স্থলী অথবা মরুভূমি বলিয়াই ধারণা হয়। যাহার সকল দিকে সকল স্থানে বিবিধ কমল-কহ্লার ফুটিয়া আছে, যথায় মন্দ মন্দ সমীরসঞ্চালনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গশ্রেণী খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং যেখানে সারস-পক্ষীরা মনোজ্ঞ কূজন করিতেছে, এ হেন সুরম্য সরোবর মৎসমীপে নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আমি মন্দার, কমল ও কুমুদ কুসুমের মালা গলে পরিধান করি, তখন আমার মনে হয়, যেন অঙ্গ আমার কণ্টকাচিত হইয়াছে,—গাত্রে যেন কে জলদঙ্গার ফেলিয়া দিয়াছে। গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য কখন কখন আমি কমল, কহ্লার, কুমুদ ও কদলী পত্রদ্বারা শয্যা প্রস্তুত করি; পরন্তু আমার সেই শয্যার সহিত আমার গাত্রস্পর্শ হইতে না হইতেই সেই শীতল সরস শয্যা শুষ্ক ও ভস্মপ্রায় হইয়া যায়। কোনরূপ রম্য মনোজ্ঞ বিচিত্র বস্তু দর্শনে মদীয় মনে দারুণ যন্ত্রণার সঞ্চার হয়। সে কালে অশ্রুজলে আমার নেত্রদ্বয় প্লাবিত হইয়া যায়। মদীয় দু'নয়ন হইতে দরদরিত-ধারে অবিরল তপ্ত বাষ্পবিন্দু গলিত হইতে থাকে এবং তাহা আমার গল-বিলম্বিত কমল বা উৎপলমালার উপরিভাগে পতিত হইয়া উত্তাপবশে কমল-উৎপল শুষ্ক করিয়া পরে আপনিও শুকাইয়া যায়। যখন সন্তাপ আমার বৃদ্ধি পায়, তখন আমি উদ্যানমধ্যে যাই, সেখানে গিয়া কদলীকাণ্ডের উপরিস্থিত

পল্লবময় দোলায় দুলিতে থাকি, আর লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া নিরন্তর রোদন করি। আমি যদি তুষারনিকরাকীর্ণ কদলীদলময় ভবনমধ্যেও বাস করি, তথাচ তাহা আমার নিকট উত্তপ্ত খদিরকাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যখন দেখি, পদ্মিনীনালে উপবেশন করিয়া সারস-সারসী খেলিতেছে, তখন সে দৃশ্য দর্শনে আমার মনে বড়ই ক্লেশের উদ্রেক হয়। তখন আমি মুখ অবনত করিয়া কেবল নিজের যৌবনেরই নিন্দা করিতে থাকি। যদি কোন রম্য বস্তু অবলোকন করি, তবে তাহাতেও আমার দারুণ কষ্ট হয়। সে কালে আর অশ্রুপাত না করিয়া পারি না। যাহা রমণীয় নয়, বা অরমণীয়ও নয়, এমন বস্তু দেখিলে আমার মনে তত ক্লেশের সঞ্চার হয় না অথবা কোন শোক বা হর্ষোদয়ও ঘটে না। আমি যদি কোন মন্দ বস্তু দেখি, তবেই আমার অন্তরে আনন্দ সঞ্চার হয়। যখন বড় কষ্ট হয়, তখন মূর্চ্ছাকেই আমি সাদরে আহ্বান করিতে থাকি। কেন না, মূর্চ্ছাকালে আমার শোক-দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না। যখন মন্দার, কুন্দ বা কুমুদকুসুম অবলোকন করি, তখন আমার মনে হয়, যেন কামাগ্নিদগ্ধ বিরহীদিগের গাত্রভস্মই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। কহ্লার, কুমুদ, উৎপল, মৃণাল, মালতী ও কদলীপত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত শীতল শয্যা আমার উত্তপ্ত গাত্রস্পর্শে ভস্ম হইয়া যায়। এইরূপে বিরহতাপে জর্জ্জরিত হইয়া মদীয় যৌবনকাল আমি বৃথাই যাপন করিতেছি।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী বলিলেন,—অতঃপর কিয়ৎকাল অতীত হইল। আমার যে কিছু অনুরাগ ছিল, সকলই ক্রমশঃ বৈরাগ্যে পর্য্যবসিত হইল। বুঝিলাম, —যেন শরতের অবসানে তরুপল্লব নীরস হইয়া শুকাইয়া গেল। আমার বৃদ্ধ স্বামী বড়ই সরলচেতা; তিনি যদি একাকী নির্জ্জনে থাকিতে

পারেন, তবেই তাঁহার নিকট ভাল বোধ হয়। আমার প্রতি তাঁহার তেমন স্নেহ নাই ; তিনি অরসিক—সতত মৌনাবলম্বনেই অবস্থান করিতে-ছেন। কাজেই আমার এ জীবন বৃথা বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ স্বামী অরসিক হওয়া অপেক্ষা বিধবা হওয়া, মরিয়া যাওয়া, ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া অথবা অন্য কোনওরূপে বিপন্ন হওয়াও আমি সহস্রগুণে ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। রমণীজনের স্বামী যদি যুবক, সুরসিক ও মধুরপ্রকৃতি হয়, তবেই রমণীর সৌভাগ্য আর তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক হইয়া থাকে। স্বামী যাহার রসিক নহে, তাহার ন্যায় হতভাগিনী আর নাই। ফলে যাহার বুদ্ধি সংস্কার-সম্পন্ন নয়, তাহার সে বুদ্ধি বৃথাই হইয়া থাকে। অপিচ দুষ্ট লোকের ভোগ্য সম্পত্তি নিষ্ফল, আর যাহার জাতি, কুল, লজ্জা, সকলই বারবনিতার কুহকে বিতাড়িত হইয়া যায়, তথাবিধ অধন্য পুরুষও বৃথা। যে সম্পত্তি সাধু-জনের হস্তে থাকে, তাহাই বটে সম্পত্তি ; যাহাতে শম-দমাদি গুণগ্রাম আছে, তাদৃশ সরল বুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি ; যাহা সমদর্শিতা, তাহারই নাম সাধুতা। উল্লিখিত গুণগ্রামশালী সাধু স্বামী যে রমণীর বশীভূত, তথাবিধ রমণীই প্রকৃত সৌভাগ্যবতী। দম্পতিদ্বয় যদি পরস্পর অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে, আধি, ব্যাধি, আপদ, বা ঈতিভয় কিছুতেই মনে ক্লেশোদয় হয় না। যত প্রকার ক্লেশই আসিয়া উপস্থিত হউক, তাহাতেই তাহারা মনের সুখে কাল কর্ত্তন করে। যাহাদের স্বামী বিধবা অথবা যাহাদের স্বামী দুষ্টস্বভাবশালী, সেই হতভাগিনী কামিনীদিগের নিকট প্রফুল্ল পুষ্পবন, এমন কি নন্দনবনও মরুস্থলী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পতি যদি মন্দ হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। কেন না, শাস্ত্রীয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, এ জগতে যে কিছু বস্তু আছে, সমস্তই মনের অননুকূল হইলে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ; পরন্তু রমণীজন কোন ক্রমেই পতি-পরিত্যাগ করিতে পারে না।

হে মুনীন্দ্র ! আমি এই বিধি-লঙ্ঘন-ভয়েই এত দিন পর্য্যন্ত এত দুঃখ ভোগ করিতেছি। পতি আমার বিরক্ত, তথাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে আমি অশক্ত। সুতরাং আমার দুর্ভাগ্য যে কত, তাহা আপনি একবার আলোচনা করিয়া বুঝুন। নীহারপুঞ্জ পতিত হইলে নলিনীর রস ক্রমশঃ

শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে আমারও অনুরাগ এতদিনে পতিসঙ্গ বিনা ক্রমশঃ বৈরাগ্যে পরিণতি পাইয়াছে। অধুনা আমার বৈরাগ্যবাসনা জন্মিয়াছে। তথাচ বিষয়বাসনা একেবারে অপগত হইয়া যায় নাই। অতএব হে মুনিবর! অধুনা আপনার উপদেশ মত বিষয়ানুরাগ-বর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বাণ-লাভে অভিলাষী হইয়াছি। যাহারা সংসারের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে নাই, এ দিকে মুক্তির পথেও উপনীত হয় নাই, তাদৃশ জীবনিবহ মৃত্যুপ্রবাহেই ভাসিয়া বেড়ায়। তাহাদের যে জীবন, তাহা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। এক রাজা যেমন অন্য রাজার সহায়তায় শত্রুপক্ষীয় রাজাকে জয় করেন, তেমনি মদীয় স্বামী অধুনা কিরূপে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহারই জন্য রাত্রিদিন সচেষ্ট হইয়া একমাত্র মনের সাহায্য লইয়াই মনকে জয় করিবার চেষ্টায় আছেন।

হে ব্রহ্মন্! আমার সেই স্বামীর এবং আমার যাহাতে অজ্ঞান অপগত হয়, আপনি তাহারই নিমিত্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা আমাদের উভয়ের আত্মজ্ঞান উদ্‌বোধিত করিয়া দিন। আমরা আত্ম-বস্তুকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আপনি তাঁহাকে চিনাইয়া দিন। আমার স্বামী যে দিন হইতে আমার অপেক্ষা না রাখিয়া আত্মনির্ভরভাবে অবস্থান করিতেছেন, আমিও সেই দিন হইতেই এ জগৎ নীরস বলিয়া বুঝিয়াছি। সেই হইতেই সংসার-বাসনার প্রতি আমার আর আবেগ নাই। আমি বিয়দ্‌বিহারের হেতুভূত কঠোর খেচরীবিদ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত আছি। তাদৃশ খেচরীবিদ্যার প্রভাবেই আমি আকাশপথে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আকাশপথে পরিভ্রমণ করিবার যে একটা শক্তি, তাহা আমার বিলক্ষণই আয়ত্ত হইয়াছে। এই শক্তিদ্বারা সিদ্ধগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমি সমর্থ হইয়াছি। যাহা হউক, এই ব্যাপারের পর আমি ভাবনার প্রভাবে আপন আবাসভূমি ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বপশ্চাৎ সকলই সন্দর্শন করিতে লাগিলাম এবং তাদৃশ ভাবনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইলাম। অনন্তর সেই ভাবনাশক্তিও আমার সিদ্ধ হইয়া গেল। ফলে এখন এমন হইয়াছে যে, আমি ভাবনার বশে নিখিল জগৎই করতল-গত আমলকফলবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অতঃপর জগতের মধ্যভাগ

আমি সকলই দেখিলাম এবং পরে তাহার বহির্ভাগে তাকাইলাম; দেখিলাম,—লোকালোকাচলের সেই বৃহতী শিলা বিদ্যমান। সেই শিলার বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মুনিবর! এতকাল গিয়াছে; ইহার মধ্যে আমার বা আমার স্বামীর কখন ব্রহ্মাণ্ড-পরিদর্শনের স্পৃহা হয় নাই; অদ্য তাহা হইয়াছে। আমার সেই স্বামী সতত কেবল বেদার্থ-চিন্তনেই নিমগ্ন; তাঁহার কোন বিষয়েই একটা ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। কি ভূত, কি ভাবী, কি বর্ত্তমান কোন ঘটনাই তিনি জানেন না। এই নিমিত্ত আমার স্বামী একজন অতি বড় বিদ্বান্ হইয়াও পরম পদ-লাভে সমর্থ হন নাই। অদ্য আমরা উভয়েই পরম পদ লাভে অভিলাষী হইয়াছি।

হে ভগবন্! আপনার নিকট আমার পরম পদ-লাভেরই প্রার্থনা। আমার এই প্রার্থনা অদ্য আপনাকে সফল করিয়া দিতে হইবে। এ কথা সত্যই যে, মহৎ ব্যক্তির নিকট প্রার্থিভাবে উপস্থিত হইয়া কেহই কখন বিফলমনোরথ হয় না। হে মানদ! আমি এ সম্বন্ধে সিদ্ধগণের মধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, আপনি ভিন্ন আমাদের এ অজ্ঞান দূরীভূত করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। বস্তুতঃ কারণ বিনাই সাধুগণ প্রার্থিবর্গের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়া দেন। হে করুণাসাগর! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিদ্যাধরী ব্রহ্মাণ্ড-গগনের কল্পিতাসনে সমাসীনা ছিল। তাহার এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া আমিও সেই আকাশতলের কল্পিতাসনে উপবেশনপূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—অয়ি

বালে! দেখিতেছি, তোমার মূর্ত্তি আছে। কিন্তু তুমি যে পাষাণবিবরের কথা উত্থাপন করিলে, তাহাতে তো এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে অতি সূক্ষ্ম কেশাগ্রও অবস্থান করিতে পারে? সুতরাং সেই শিলার মধ্যে তুমি অবস্থান কর কিরূপে? এবং কি নিমিত্তই বা তোমার সেই-খানে অবস্থিতি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

বিদ্যাধরী বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! এই যে আপনাদের জগৎ আছে, ইহা যেরূপ বৃহৎ, সেই শিলার অভ্যন্তরে আমাদেরও এমনই বৃহৎ জগৎ বিরাজ করিতেছে। সেখানেও পাতাল আছে। সেই পাতালে নাগবর্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় পৃথ্বী আছে, পর্ব্বত আছে, জল আছে, আকাশে বায়ু বহিতেছে। জলধি আছে, তাহাতে অগাধ জলরাশি অবস্থান করিতেছে। সেখানে প্রকৃতিমণ্ডলী সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেছে। তথায় প্রাণিগণ সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। পবন প্রবাহিত হইতেছে, জলতরঙ্গ ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে আকাশদেশে দেবগণ বিরাজমান রহিয়াছেন। তত্রত্য বনে বৃক্ষ আছে। অন্তরীক্ষে নক্ষত্রনিকর শোভা পাইতেছে; রাজন্যগণ পৃথ্বীপালনে ব্যাপৃত আছেন। নদীনিচয় বরাবর সমুদ্রের দিকেই যেমন প্রধাবিত হয়, তেমনি সেখানে দেব, দানব বা মানবগণের আচার-ব্যবহার আকল্প একইভাবে চলিয়া আসি-তেছে। তত্রত্য ভূর্লোক যেন সরোবর; মেঘমালা যেন সেই সরোবরের চঞ্চল তরঙ্গশ্রেণী; সেই সকল তরঙ্গসঙ্কুল দিবসরূপ কমলকুল সতত সর্ব্বস্থানেই বিকাশমান। চন্দ্রিকারূপ চন্দন দ্বারা সেখানেও চন্দ্র যেন চারিদিক্ লেপনপূর্ব্বক রজনী ও রোহিণীর হৃদয়গত তমোভাব অপনীত করিতেছেন। সেখানেও আকাশে সূর্য্যরূপ প্রদীপ আছে। উহা বায়ু-যন্ত্রযোগে পরিচালিত হইয়াই ভূতল ও গগনতলরূপ গৃহের শোভা বিস্তার করিতেছে। আকাশতল ও ভূতল সেই স্থানেও ঘরট্টযন্ত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আকাশে সতত নক্ষত্রচক্র ভ্রমণ করিতেছে; উহা ঘরট্টযন্ত্রের উপরিস্থ ঘূর্ণমান পাষাণ-খণ্ডবৎ প্রতিভাত হইতেছে। বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা ঐ যন্ত্র আবদ্ধ আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা সঙ্কল্পপ্রভাবে ঐ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ধ্রুব-নক্ষত্র ঐ যন্ত্রের মধ্যগত কীলকস্থান অধিকার

করিয়াছে। সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত উহা নিয়তির প্রভাবে ঘূর্ণমান হইতেছে। প্রাণিবৃন্দ-রূপ তণ্ডুলসকল ঐ যন্ত্র দ্বারা পিষ্ট হইতেছে। জলধর সকল ঐ আকাশতল ও ভূতলের কপাটস্বরূপ; উহাদের গর্জ্জনই ঐ ঘরট্টযন্ত্রের ঘর্ঘর-রব। সেই জগতে যে ভূমণ্ডল আছে, তাহাও সাগর-দ্বীপ ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ; এবং সেখানকার আকাশতল বিমানরূপ নগরীসমূহে সমলঙ্কৃত। সেখানকার ভূমণ্ডল চঞ্চলস্বভাবা ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর মণিময় কুণ্ডলবৎ সুশোভন। চরাচর নিখিল জীবজাতি বুদ্ধিবৃত্তি-বিরহিত বাহ্য পরিস্পন্দবৎ সেখানেও সূক্ষ্ম প্রাণরূপ স্পন্দসম্বিৎ লইয়া জন্মিতেছে। ঋষি-মনীষিগণ সেখানে থাকিয়াও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। তত্রত্য পৃথ্বী যথাস্থানে জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ আছে। পবনপ্রবাহ বানরীচপলতা প্রকাশ করিতেছে। আকাশ আকাশ দ্বারাই অন্বিত আছে। তেজ নিজের দীপ্তিক্রিয়া সমাধা করিতেছে। ভূচর, জলচর, খেচর ও বনেচর প্রাণিগণ সে স্থানেও জন্মিতেছে; মরিতেছে। সেখানে কালকল্প-যুগ ও বৎসরাদি—সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বাদি প্রজাপুঞ্জের পরিপালন করিতেছে। অগাধ অনন্ত গভীর কালসাগরে সেই প্রজাপুঞ্জও আবর্ত্তবৎ পুনঃপুন উত্থিত ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দশবিধ জীবরূপ ধূলিজাল বায়ু-বিচালিত হইয়া আকাশে বিলয় পাইতেছে। স্বর্গদেবী নক্ষত্রনিকররূপ ভূষণ ও অম্বরবসন পরিধান করিয়া চান্দ্র ও সৌর কিরণরূপ চামর বীজনপূর্ব্বক প্রসুপ্ত জগৎকে প্রবোধযুক্ত করিয়া দিতেছেন। বাত্যা, ভূমিকম্প ও মেঘাড়ম্বরাদি-জনিত ক্লেশ—দিক্‌সকল স্বস্থানে থাকিয়াই সহ্য করত যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে। সেখানেও ভূকম্প আছে, উল্কাপাত আছে, অনাবৃষ্টি আছে এবং বাত্যাপ্রভৃতির উপদ্রব আছে। সেখানে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ আছেন, তাঁহারা সে সকল উপদ্রবের সূচনার কথা পূর্ব্ব হইতেই লোকসকলকে জানাইয়া দিতেছেন। কল্পসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কাল যেমন ভূতনিবহকে গ্রাস করিতেছে, বাড়বাগ্নিও তেমনি সেখানে প্রদীপ্ত হইয়া সপ্তসমুদ্রের সমগ্র জল পান করিতেছে। তোমরা যে জগতে অবস্থান করিতেছ, এই জগতে—যেমন পাতালে পাতালবাসীরা, গগনে গগনচারীরা এবং ভূতলে ভূতলবাসীরা

বাস করিতেছে, সেই জগতেও সংস্থানসন্নিবেশ ঐরূপই। পবনের গতি অনুসারে সে জগতেও পর্ব্বত, মহাসাগর ও দ্বীপপুঞ্জের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী কহিল,—মুনিবর! দয়া করিয়া আপনি একবার অস্মদীয় জগতে আগমন করুন। আমার বিলক্ষণ জানা আছে যে, মহৎ ব্যক্তিরা অপূর্ব্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কুতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন।

বিদ্যাধরী আমাকে এই কথা কহিবার পর আমি শূন্যরূপে সেই শূন্যরূপিণী বিদ্যাধরীর সহিত শূন্যাকাশে প্রস্থান করিতে লাগিলাম, আমার সেই প্রস্থান—নিরাকার গন্ধলেশের বাত্যা সহ অলক্ষ্যে শূন্যে সমুত্থিতির ন্যায় হইল। অতঃপর আমি সেই বিদ্যাধরীর সহিত চলিতে চলিতে আকাশপথ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমশঃ নভশ্চর দেবাদির রম্য নিকেতনে উপস্থিত হইলাম। পরে সে সকল স্থানও অতিক্রম করিলাম। অনেক ক্ষণ অতীত হইয়া গেল। অনন্তর শ্বেত নীরদ-শোভিত লোকালোক-শৈলের শিখরাকাশে গিয়া উপনীত হইলাম। পূর্ব্বে বিদ্যাধরীর নিকট শুনিয়াছিলাম, ঐ শৈলের উত্তর দিকের পূর্ব্বাংশে চন্দ্রবৎ শুভ্র মেঘজাল হইতে নির্গত এক তপ্তকাঞ্চন-কল্পিত শিলাতল অবস্থিত আছে। আমি বিদ্যাধরীর সহিত এক্ষণে সেই শ্রুতপূর্ব্ব শিলাসমীপে উপগত হইলাম। তথাগত হইয়া দেখিলাম—সেখানে কেবল রজতময় শুভ্র পাষাণই অবস্থিত আছে; আর তাহাই নিরন্তর অনলব্যাপ্ত অচলতটবৎ সুশোভিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই সেখানে নাই। পরে আমি সেখানে এক জগৎদর্শন করিলাম এবং সেই বিদ্যাধরীর নিকট জিজ্ঞাসিলাম—অয়ি বালে! ইতিপূর্ব্বে তুমি আমার নিকট এক জগতের কথা কহিয়াছিলে, সেই জগৎ কোথায় আছে? সূর্য্য, চন্দ্র, অনল, রুদ্র ও নক্ষত্রাদির কথাও তোমার

নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহারাই বা কোথায় রহিয়াছে? সেই সপ্ত লোকই বা কৈ? সাগর, আকাশ ও দিক্‌চক্রবালেরই বা অবস্থিতি আছে কোথায়? কোথায় প্রাণিবর্গের জনন-মরণ? কোথায় সেই প্রকাণ্ড মেঘাড়ম্বর? নক্ষত্রনিকর-বিমণ্ডিত আকাশস্থলীই বা এস্থানে কোথায় আছে? কোথায় সেই সকল শৈলমালা রহিয়াছে? কৈ সেই মহাসমুদ্র সকল? কোথায় সেই সপ্তদ্বীপ? তপ্ত কাঞ্চনময় ভূবিভাগই বা কোথায়? কালের ক্রিয়া, ভূত ও জগদ্‌বিভ্রম, বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্ব-দেব-দানব-নর-মুনি ঋষি বা রাজা, এ সকলই বা কোথায় আছে? সুনীতি-দুর্নীতি, পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক, এ সকলেরই বা অবস্থান কোথায় রহিল? দিন-যামিনী প্রহর-মুহূর্ত্ত ইত্যাদি কালবিভাগই বা এখানে দেখিতে পাইতেছি কৈ? সুরাসুরের শত্রুতা, অন্য জীবনিবহের পরস্পর স্নেহসৌহৃদ্য বা বিদ্বেষ-বৈরভাব এখানে কোথায়? ফল কথা, তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে যে বিষয় বর্ণন করিয়াছিলে, সে সকলের তো কোন কিছুই এখানে দেখিতে পাইতেছি না। আমার এই সকল কথায় সেই বরবর্ণিনী বিস্মিত হইল এবং সেই শিলার দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিল,—আমি ভবৎসমীপে যে যে বিষয় বর্ণন করিয়াছিলাম, মুকুর-বিম্বিতের ন্যায় তৎসমস্তই তো আমি দেখিতে পাইতেছি। আমি যে এখনও ইহা দেখিতেছি, এতৎপ্রতি নিত্যানুভবই কারণ। আপনি ইহা অনুভব করেন নাই, এ জগতের ছায়াপাত আপনার হৃদয়ে হয় নাই; কাজেই আপনি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না। বিশেষ কথা, আমরা বহুদিন ধরিয়া অদ্বৈতবিষয়ের আলোচনায় তৎপর রহিয়াছি; এই নিমিত্ত বাহ্য বিষয়ের গ্রহণযোগ্য আতিবাহিক দেহ যে কি, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এই জগৎ আমার নিজস্ব; অনেক দিন হইতেই আমি ইহাকে অভ্যাস করিয়া আসিতেছি; তথাচ আমারও নিকট ইহা আকাশ হইয়া গিয়াছে। আমিও ইহাকে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে আমি এ জগৎ স্পষ্টতই দেখিতাম; তাই বোধ হয়, এখনও আদর্শগত প্রতিবিম্ববৎ অস্পষ্টভাবেও দেখিতে পাইতেছি। আপনার তো পূর্ব্বে কখনই ইহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই, আজ সহসা ইহা দর্শন করিবেন কিরূপে?

হে ভগবন্! কথায়-বার্ত্তায় অনেক কাল কাটাইয়া দিয়াছি, তাই শুদ্ধ আতিবাহিক স্বরূপের সহিত যে দেহাত্মভাব—যাহাতে অনন্ত বিশুদ্ধ ভাব বিরাজমান, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি। পুনঃপুন শুদ্ধ চিদাকাশের আস্বাদ লইয়া অন্তরে যে একটা দৃঢ় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণও অবিকল তন্ময় হইয়া থাকে। ইহা যে কোন ব্যক্তিবিশেষের হয়, তাহা নহে; ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। অভ্যাসের গুণে সকলই সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহার অভ্যাস নাই, তাঁহার সৎশাস্ত্র-শ্রবণাদি সকলই বৃথা হইয়া যায়। আপন জগতের অনুভবরূপ ভ্রমে আমি পতিত রহিলেও আপনার জগতে গিয়াছি, আপনার সহিত কথোপ-কথন করিয়াছি, সেই কথোপকথনরূপ ভ্রম আমায় আকর্ষণ করিয়াছে। ফলে ভবৎসহ বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাই অধুনা তাহাই আমার হৃদয়ে সংস্কারাকারে জাগ্রৎ রহিয়াছে। এই কারণে আমার নিজ জগতের যে একটা সংস্কারানুভব, তাহা অধুনা প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ হইবারই তো কথা; কেন না, অতীত ও বর্ত্তমান, এতদুভয়ের মধ্যে বর্ত্তমানেরই প্রভাব সমধিক।

হে মুনে! যাহারা স্ব স্ব অভীষ্ট সাধনে সমুৎসুক, তাহারা যদি বিজ্ঞ লোকদিগের উপদিষ্ট উপয়ানুসারে তাহার জন্য পুনঃপুন চেষ্টা না করে, তবে কিছুতেই ফললাভে সমর্থ হয় না। 'অহং' ইত্যাকার অজ্ঞান ভ্রম আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপেই সুসম্বদ্ধ ছিল; কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে, তাহা অধুনা আমার বিলোপ পাইয়াছে। এখন আলোচনা করিয়া দেখুন যে, অভ্যাসের মহিমা কত দূর। ফলে অভ্যাসেই অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। আমি অবলা নারী—আপনার একজন শিষ্যস্থানীয়া; এই জগৎ আমি দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু আপনি প্রবীণ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ; অথচ আপনার দৃষ্টিতে এ জগৎ পতিত হইতেছে না। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ—একমাত্র অভ্যাস। ফলে আমার অভ্যাস ছিল, তাই দেখিতেছি, আর আপনার অভ্যাস নাই, তাই দেখিতে পাইতেছেন না। অভ্যাসের এমনই গুণ যে, তাহাতে অজ্ঞ—বিজ্ঞ হইয়া পড়ে, পর্ব্বতকেও চূর্ণ করিবার শক্তি হয় এবং দূরস্থ লক্ষ্যও বাণবিদ্ধ করিতে পারা যায়। ফলে অভ্যাসের

মহিমায় সকলই সম্ভব হয়। অসত্যজ্ঞানরূপিণী বিসূচিকা বৃদ্ধি পাইয়া সত্যাকারে সুদৃঢ় হইয়া উঠে; কিন্তু বিচারের অভ্যাসক্রমে তাহাও আবার বিলয় পাইয়া যায়। হে মুনে! অভ্যাসের গুণে যে দ্রব্য কটু, তাহাও মিষ্টাস্বাদ হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনা সম্ভবতঃ আপনার অপ্রত্যক্ষ নাই যে, কোন কোন ব্যক্তির নিকট নিম্ব ভাল লাগে এবং কাহারও কাহারও নিকট মধু রুচিকর হইয়া থাকে। ফলে এ ভাব কেবল অভ্যাসের বশেই হয়। সতত সন্নিধিরূপ অভ্যাসের জন্য অনাত্মীয় ব্যক্তিও আত্মীয় বন্ধু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অন্যদিকে আবার সতত দূরে অবস্থানহেতু প্রিয়বন্ধু জনও অল্প প্রীতিভাজন হয়। জানিবেন,—বিশুদ্ধ আতিবাহিক দেহ বলিয়া ধারণা হইতে হইতে ক্রমশঃ যে আধিভৌতিক জ্ঞান সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তাহাও অভ্যাসের মাহাত্ম্যেই ঘটে। ধারণা-অভ্যাসের গুণে ঐ আধিভৌতিক দেহই আবার বিহঙ্গের ন্যায় আকাশদেশে উত্থিত হইয়া থাকে। এখন দেখুন, একবার বিচার করিয়া—অভ্যাসের কি অভূতপূর্ব্ব মহিমা! পুণ্য বিফল হয়, অষ্টবিধ যোগসিদ্ধিও ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শুভাদৃষ্টও দুরদৃষ্টে পরিণত হইতে পারে; পরন্তু অভ্যাস কদাচ অফল-প্রসূ হয় না। অভ্যাসের গুণে অতি বড় দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া উঠে, শত্রুতাও মিত্রত্বে পর্য্যবসিত হইতে পারে এবং বিষও অমৃত হইয়া যায়। অভীপ্সিত কার্য্যে—অভ্যাসের আবশ্যক। যিনি অভ্যাস ত্যাগ করেন, তিনি অধম পুরুষ। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়া যেমন অসম্ভব কথা, তেমনি তাঁহারও কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভাবনীয়। যে সকল লৌকিক সৎকর্ম্ম বহুবার অভ্যাসের ফলে নিজাভিমত প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়, তৎসমস্ত কর্ম্ম সহসা পরিহার করা বিধেয় নহে। তবে কথা এই যে, যোগিগণ পুনঃপুন বৈরাগ্য অভ্যাসপূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া যেমন আমরণ স্বীয় জীবন রক্ষা করেন এবং মৃত্যু সময় আসিলে তাঁহারা যেমন যোগবলে জীবন ত্যাগ করেন, তেমনি ভাবে ক্রমশ যুক্তিদ্বারাই ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানই অভীপ্সিত বস্তু; যে ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে বারম্বার প্রযত্ন প্রকাশ না করে, সে তো নরাধমমধ্যেই পরিগণিত। তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বদা অনিষ্ট কার্য্যের

নিমিত্তই যত্নশীল হয় এবং সেইরূপে বারম্বার যত্ন করিয়া অনিষ্ট ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ভাগ্যে ঘোর নরক-নিপাতে নিশ্চিতই। যাঁহারা আত্মবিচার বিষয়ে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত থাকেন, এ সংসারকে অসার জ্ঞান তাঁহারাই করেন,—করিয়া গভীরা মায়ানদীর পরপারে উপনীত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি অন্ধকাররজনীতে ঘটদর্শনে সমুৎসুক হয়, প্রদীপের রশ্মিই যেমন তাহাকে অবাধে সেই ঘট দেখাইয়া দেয়, তেমনি একমাত্র অভ্যাসই অভিমত বস্তু প্রকাশ করে,—করিয়া অভ্যাসশীল ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া থাকে। যেমন কল্পতরু এবং চিন্তামণি যাচক ব্যক্তিকে অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং শরৎকাল যেমন শস্যসম্পত্তি অর্পণ করে, একমাত্র অভ্যাসও তেমনি অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। অভীপ্সিত বস্তুর বারম্বার অভ্যাসই যেন দিবাকর; সেই দিবাকরের করে লোকের অন্তঃকরণ এমনই ভাবে উদ্ভাসিত হয় যে, তাহাদিগকে কদাচ আর দেহক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াখ্য মোহনিদ্রা-জননী রজনীর মুখ অবলোকন করিতে হয় না। অভ্যাসরূপ দিবসকরই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার পদার্থ প্রকাশিত করিয়া দেয়। চতুর্দ্দশবিধ জীবজাতির মধ্যে কেহই অভ্যাস-ব্যতিরিক্ত কোন কর্ম্ম সাধনে সমর্থ নহে। এক কার্য্য বারম্বার করার নামই অভ্যাস; সেই অভ্যাসকেই পুরুষার্থ বলা হয়। এই পুরুষার্থ না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবার নহে। স্বীয় বিবেকবোধে যাহা অভিমত বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহা সাধন করিতে হইলে দৃঢ়াভ্যাসেরই প্রয়োজন। অন্যথা অভীষ্ট লাভ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, তাঁহার অন্তরে যদি সতত অভ্যাসসূর্য্য অভ্যুদিত থাকে, তাহা হইলে এমন তো কোন কার্য্যই নাই, যাহা তিনি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। অতি বড় ভীরু লোকও বিষম সাহসিকতার সহিত হিংস্র জন্তুময় ভীষণ অরণ্যে এবং পর্ব্বতের গভীর গহ্বরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে; ইহা তাহার অভ্যাসের গুণেই হয়।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বিদ্যাধরী কহিল,—হে মুনীন্দ্র! আমরা যদি এখন সমাধিরূপ সুদৃঢ় অভ্যাস না করি, তবে দেহাদিতে আমাদের আধিভৌতিক বুদ্ধি নিবৃত্তি পাইবে না। যাহা আতিবাহিক ভাব, তাহাও অভ্যুদিত হইবে না। তাহা যদি না হয়, তবে সাক্ষিরূপে অপর জগতের যে প্রত্যক্ষ দর্শন, তাহাও ঘটিবে না। অতএব অধুনা সমাধিরূপ ধারণার বলেই আতিবাহিক ভাবের অভ্যাস করিতে থাকি। এইরূপ করিলেই শিলান্তর্গত জগতের প্রকাশ ঘটিবে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিদ্যাধরীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম এবং পরে সেই শৈলভূমির অধিত্যকায় পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধি অভ্যাস আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমার নিখিল বাহ্যার্থ-ভাবনা পরিত্যক্ত হইল। আমি একমাত্র চিৎস্বরূপেই ভাবিত হইলাম। অনন্তর পূর্ব্বকথিত আধিভৌতিক ভাবনা-জন্য আধিভৌতিক সংস্কার-মল ক্রমশ আমি সেই ভাবনার বলে পরিহার করিলাম। যেমন শরদাগমে আকাশ নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তেমনি তখন আমি নির্ম্মল ভাব অবলম্বন করিলাম এবং চিদাকাশ ভাব লাভ করিয়া পরাদৃষ্টি অধিগত হইলাম। অনন্তর সেই চিন্ময়ী ভাবনা সত্যরূপে সুদৃঢ় অভ্যস্ত হইয়া গেল। এই জন্য আমার দেহের উপর যে একটা আধিভৌতিক ভ্রম ছিল, তাহা সম্পূর্ণ অস্তমিত হইয়া গেল। যাহা কেবল স্বচ্ছ মহাচিদাকাশ ভাব, তাহাই তখন আমার ভাবনাস্থলে প্রকট হইল। সেই যে মহাচিদাকাশ-ভাব, তাহাতে অস্তোদয় কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হইল না। সে ভাব সতত স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরে স্বীয় সাক্ষিস্বরূপের সুবিমল তেজে দেখিতে পাইলাম,—সম্মুখে আকাশ কিম্বা শিলা কিছুমাত্র নাই,—আছে কেবল পরম তত্ত্বই প্রকাশমান। তখন সেই যে পরমার্থ-ঘন পরম তত্ত্ব, বুঝিলাম,—তাহাই আমার আত্মা। সেই আত্মাই পাষাণময়ী ভাবনার গুণে পাষাণ দর্শন করিল। স্বপ্নাবস্থায়

গৃহমধ্যে যেমন কখন কখন বৃহতী শিলার অস্তিত্ব দেখা যায়, তেমনি সেই যে শুদ্ধ সুবিমল চিদাকাশ, তাহাই ঐ শিলাভাবে পর্য্যবসিত হইল। এই যে শিলাভাব দর্শন, ইহা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা যে জাগ্রদবস্থার ব্যবহার, তাহা অনুভব করা যাইবে কিরূপে? এ কথার উত্তর এই যে, এরূপও তো দেখা গিয়া থাকে যে, স্বপ্নাবস্থাতেও লোকে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে। তাহারা দেখে, এক্ষণে আমি প্রবুদ্ধ আছি। অন্য সুপ্ত পুরুষের স্বাপ্ন পুরুষ হইয়াছি। এইরূপ স্বপ্ন সন্দর্শনের পর মনে করে, আমি স্বয়ং প্রবুদ্ধ আছি, যাহা যাহা দেখিতেছি বা করিতেছি, এ সকল আমার জাগ্রদবস্থারই কার্য্য। এইরূপ দৃষ্টান্তানুসারে বলা যায়, ঐ যে শিলাভাব দর্শনরূপ স্বপ্ন, উহাও দীর্ঘকালব্যাপী হইলে জাগ্রৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যাহারা নিহত হয়, সেই স্বপ্নেই তাহাদের জাগ্রৎসংসারের কার্য্য হইয়া উঠে। কেন না, তাহারা তো আর জাগ্রৎ হইতে পারে না; তাহারা স্বপ্ন দর্শন করিতে করিতেই মরণযন্ত্রণা অনুভবপূর্ব্বক প্রাণ পরিহার করে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে সেই স্বপ্নই তাহাদের জাগ্রদ্ভাবের পরিণতি। ইহা অস্বীকার করিবার কারণ কিছুই নাই। এই সকল দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলীভূত যে অজ্ঞাননিদ্রা, তাহার উচ্ছেদ ঘটিলেই তাহাই প্রকৃত জাগ্রৎ, ইহাই বলা বিধেয়। এইরূপ জাগ্রদ্ভাব মোহাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যে বহুদিনে বহু প্রয়াসের ফলেই ঘটে। ব্রহ্মতত্ত্বই অক্ষয় বস্তু; তদ্ভিন্ন আর যখন কিছুই নাই, তখন তোমাদের যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এতৎসমস্তই বিশুদ্ধ ব্রহ্মাকাশ বৈ আর কি? আমি যে তখন সেই শিলা সন্দর্শন করিলাম, তাহা সেই শুদ্ধ চিদ্‌ঘন ব্রহ্মাকাশই। ক্ষিতি-প্রভৃতি নামে তথায় যে বাস্তব কোন পদার্থ আছে, ইহা আমি তখন দেখিলাম না। ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বে যে পারমার্থিক আকার থাকে, তাহাই তত্ত্ববেদিগণের ধ্যানলভ্য হয়। পরব্রহ্মের আকারই নিখিল প্রাণীর পরমার্থিক রূপ; সেই রূপই ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য ও সঙ্কল্প আখ্যায় পরিণত হইয়া মূঢ় মানবমণ্ডলীর নিকট জগৎ আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম মায়া-শবলিত হইলে তাঁহার যে জগৎ সংস্কারময় সত্তা, তাহাই অতিবাহিক দেহনামে নিরূপিত হয়।

এই দেহ প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মই, ইহা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণতঃ অভিন্ন। যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ শুদ্ধ চিদংশ, তাহাই আতিবাহিক দেহরূপে প্রকাশমান। ব্রহ্মের যে সত্তাকে আতিবাহিক দেহ নামে উল্লেখ করা হইল, উহা সৃষ্টির আদিতে চিদাভাসময় জীবের আদি আতিবাহিক দেহ। প্রথম অবস্থায় উহা সমষ্টিরূপেই অবস্থিত। ঐ দেহের নামান্তর হিরণ্যগর্ভ; উহা দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে স্বীয় সমষ্টিভাব ভুলিয়া গিয়া যখন ব্যষ্টিভাবে পরিণত হয়, তখন সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ মনোনাম গ্রহণ করে। যাঁহারা যোগী পুরুষ, তাঁহাদিগরই উহা কেবল সমষ্টিভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উহার যাহা ব্যষ্টিভাব, সে ভাবে সকলেরই উহা প্রত্যক্ষগোচর হয়। বস্তুগত্যা উহা সেই একইমাত্র চিদাকার; উহার যে ভিন্নভাব পরিগ্রহ, তাহা বৃথা।

রামচন্দ্র! জানিও—যোগীদিগের যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। অহো কি অপূর্ব্ব মায়াবিলাস!—অগ্রে যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, অধুনা তাহাই সম্পূর্ণ পরোক্ষ হইয়া গেল। আর যাহা কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, তাহাই অধুনা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সেই আতিবাহিক দেহ—যাহা অগ্রে উত্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তুমি জানিও—তাহাই সত্য এবং তাহাই সর্ব্বব্যাপী। আর যাহা এই আধিভৌতিক দেহ, তাহা কেবলই মায়ার খেলা! কনকে কটকভাব অনুভূত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তাহার যেমন প্রকৃতই অভাব, তেমনি যাহা আতিবাহিক, তাহাতে আধিভৌতিকভাব কিছুই নাই। বিচার বা বিবেকশক্তি নাই বলিয়াই জীব ভ্রমকে অভ্রম এবং অভ্রমকে ভ্রম বলিয়া অনুভব করে। অহো মোহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! যদি বিচার করিয়া দেখ, তবে আধিভৌতিক দেহের অস্তিত্ব কোথাও মিলিবে না। কিন্তু কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই আতিবাহিক দেহের অক্ষয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। যেমন মরুস্থলীতে অসত্য জলবুদ্ধি হয়, তেমনি আতিবাহিক দেহে বৃথা আধিভৌতিক ভাবনা বদ্ধমূল হইয়া থাকে। স্থাণুতে যেমন পুরুষভ্রম, তেমনি আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক জ্ঞান ভ্রমমাত্র। ভ্রমের বশেই শুক্তিকায় রজতভাবের, মরীচিকায় জলের এবং চন্দ্রে দ্বিচন্দ্রভাবের জ্ঞান হয়। আতিবাহিক দেহে যে আধিভৌতিক ভাবের জ্ঞান, তাহাও ঐরূপ

কায়বশেই ঘটিয়া থাকে। অবিবেক হইতে যে একটা মোহ উৎপন্ন হয়, তাহার এমনই অপূর্ব্ব মহিমা!—তাহাতে যাহা মিথ্যা, তাহা সত্য হইয়াছে আর যাহা সত্য, তাহা অসত্য হইয়াছে। যে ব্যক্তি যোগ প্রত্যক্ষ পরিহার-পূর্ব্বক অসত্য বিষয়কে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে, সে স্বীয় মোহনেত্র-যোগে প্রত্যক্ষীকৃত মৃগতৃষ্ণা-জল পান করত পরম সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কিন্তু যাহা ভোগসুখ, তাহা তত্ত্ববিদ্গণের মতে দুঃখ বলিয়াই প্রতিপন্ন। ঐ সুখ যে ক্ষণ-বিনশ্বর, তাহাই তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে তাহাই প্রকৃত সুখ—যাহা অকৃত্রিম এবং যাহা অনাদি ও অনন্ত। এতাবতা প্রকৃত প্রত্যক্ষই বিচার্য্য। যাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ, তাহাই সাক্ষিস্বরূপ চিৎসত্তা; সেই সত্তাকেই তুমি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন কর। লোকত্রয়ের অনুভূতি যাহাতে হয়, সেই প্রত্যক্ষ পরিহারপূর্ব্বক যে ব্যক্তি মায়াময় ঐহিক প্রত্যক্ষ অঙ্গীকার করিয়া লয়, সে তো অতিমূঢ়। তাই বলিতেছি, সর্ব্বভূতের যে আতিবাহিক আকার, তাহাই সত্য; পরন্তু আধিভৌতিক জ্ঞান পিশাচদর্শনবৎ অলীক পদার্থ। বস্তুতঃ যাহা অসত্য সঙ্কল্পময়, তাহার প্রত্যক্ষতা বা সত্যতা হইবে কিরূপে? যাহা আপনা হইতেই অসত্য, তাহার ফলোপধায়কত্ব কিরূপ কথা? যে বস্তু অসিদ্ধ বস্তু দ্বারা সাধিত, কোথায় তাহার সত্যতা হওয়া সম্ভবপর? এখন কথা এই যে, আধিভৌতিকের প্রত্যক্ষ যখন সিদ্ধ নহে, তখন অনুমানাদির সত্যতা সিদ্ধি কিরূপে হইবে? ফলে প্রমাণসিদ্ধ দৃশ্য বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। যাহা আছে; তাহা সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মপদার্থ বৈ আর কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির গৃহাকাশেই যেমন পর্ব্বত প্রত্যয় হয়, অন্যত্র হয় না, তেমনি আমরা শিলাভাবনাময় হইয়াছিলাম বলিয়া আমাদের চিৎই শিলা হইয়াছিল। এই পর্ব্বত, এই আকাশ, এই জগৎ, ইত্যাকার ভাবনাময় হইয়াছিলাম বলিয়াই আকাশ তখন তথাবিধ ভাববৈচিত্র্য পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরই এ রহস্য বুঝিবার শক্তি আছে; পরন্তু যিনি অপ্রবুদ্ধ, তাঁহার ইহা বুঝিবার শক্তি নাই। যে শ্রোতা, সে-ই কথার অর্থ অবধারণ করে; পরন্তু যে শ্রোতা নহে, সে কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিবে? যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ, তাহার নিকট

এই ভ্রম সত্যাকারে প্রতীত। দেখ, বৃক্ষ বা পর্ব্বত যদি দাঁড়াইয়াও থাকে, তথাচ উন্মত্ত ব্যক্তির নিকট সে সকল যেন নর্ত্তনতৎপর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা প্রত্যক্ষ পূর্ণানন্দ স্বরূপ বুঝিতে পারেন, অথচ অন্য চাক্ষুষাদি তুচ্ছ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা তৃণপ্রায় অকিঞ্চিৎ—অসার।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ব্রহ্মই শিলাদি দৃশ্য পদার্থরূপে প্রতীত হন। যদি জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করা যায়, তবে এই জগৎপরম্পরা তাঁহারই অঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তিনি অদৃশ্য—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কনিচয়ের অবিষয় ও নিরাময়। সেই ব্রহ্মরূপ সুবিশাল দর্পণ-বিম্বে গিরিনদী প্রভৃতি নিখিল ভ্রম প্রতিবিম্ববৎ প্রত্যয়-যোগ্য হয়। যাহা হউক, সেই যে বিদ্যাধরীর কথা কহিতেছিলাম, তিনি তখন সেই শিলান্তঃ-পাতী জগতে প্রবেশ করিলেন। আমিও তৎসমভিব্যাহারে সঙ্কল্পরূপে তথায় প্রবেশ করিলাম। সেই সুন্দরী বিদ্যাধরযুবতী ক্রমে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া ব্রহ্মার সম্মুখে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! এই যাঁহাকে দেখিতেছেন, ইনি আমার স্বামী। ইনি আমাকে বিবাহ করিবেন বলিয়াই সঙ্কল্পবলে সৃষ্টি করি-য়াছেন। এতকাল ইনি আমার ভরণপোষণে তৎপর ছিলেন। এখন ইঁহাকে জরা আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে; ইনি অতি পুরাণ পুরুষ হইয়াছেন। অধুনা আমারও দেহ জরাক্রান্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ইনি এক্ষণে আমার আর পাণিপীড়ন করিলেন না। কাজেই আমিও বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছি। আর ইনি এক্ষণে সেই পরমপদেই প্রবেশোৎসুক হইয়াছেন—যথায় দ্রষ্টৃ, দৃশ্য বা শূন্যভাব কিছুই বিদ্যমান নাই।

রামচন্দ্র! সেই রমণী যৎকালে আমাকে এইরূপ কথা কহিতে-

ছিলেন, তখন জগতে মহাপ্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইতে চলিল। অনন্তর সেই বিদ্যাধরবালা পুনর্ব্বার আমায় বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! এক্ষণে ইনি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ নিশ্চলভাবে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, হে মুনীন্দ্র! আপনি তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া ইঁহাকে এবং আমাকে প্রবোধিত করুন এবং যিনি সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের মূল কারণ ব্রহ্মাখ্য পরম পদ, আপনি সেই পদেই ইঁহাকে উপস্থাপিত করুন।

বিদ্যাধরী এই বাক্য বলিয়াই ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মার প্রবোধ প্রতিপাদনার্থ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—প্রভো! এই মুনীন্দ্র অদ্য আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। আর এক জগতে আর এক ব্রহ্মা আছেন, এই মুনিবর তাঁহার পুত্র। ইনি এক্ষণে গৃহাগত অতিথি। অতিথি আসিলে তাঁহার সৎকার গৃহস্থ ব্যক্তির যেরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য, ইঁহারও সেইরূপ সৎকার করাই আপনার এখন উচিত হইতেছে। অতএব পাদ্য এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা এই মুনিবরের আপনি সৎকার বিধান করুন। আমি জানি, সুকৃতসঞ্চয়ের জন্য ভবাদৃশ মহাত্মারাই সাধুসেবায় সমুৎসুক হইয়া থাকেন।

বিদ্যাধরবালা এই কথা কহিয়া বিরত হইল। অনন্তর মহামতি ব্রহ্মা স্বীয় জ্ঞানময়স্বরূপ হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন। বোধ হইল, যেন জলময় সমুদ্রে আবর্ত্তোদয় হইল। সেই নীতিজ্ঞ ব্রহ্মা তখন ধীরে ধীরে নয়নযুগল উন্মীলিত করিলেন। মনে হইল যেন, শিশিরাবসানে বসন্ত ঋতু ভূতলে স্বীয় কুসুমনয়ন উন্মেষিত করিল। এইবার তাঁহার অঙ্গসমূহ শনৈঃ শনৈঃ বাহ্য চৈতন্য প্রকাশ করিল; বোধ হইল, বসন্তের নবীন লতাপল্লব সকল যেন আপনাতে নবীনরসের সঞ্চার করিয়া দিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ চারিদিক্ হইতে সেইস্থানে আগমন করিলেন। মনে হইল, প্রভাতে হংসাদি বিহঙ্গেরা যেন ফুল্ল-পদ্মময় সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনন্তর বিধাতা সম্মুখ ভাগে আমাকে এবং সেই বিলাসিনী বিদ্যাধরীকে দেখিলেন,—দেখিয়া প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক মধুর স্বরে বলিতে

লাগিলেন,—হে মহান্ জ্ঞানামৃতসিন্ধো! এ সংসার অসার বস্তু; ইহার মধ্যে সার একমাত্র আত্মা। আপনি করগত আমলকফলবৎ সেই আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছেন। হে মুনে! আপনার শুভ হউক। আপনি বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রান্তিবোধ হইয়াছে। সুতরাং এই আসন পরিগ্রহ করুন এবং ইহাতে উপবেশনান্তে শ্রমাপনয়ন করুন। বিধাতা এই কথা কহিয়া নয়নভঙ্গিমায় আমায় আসন প্রদর্শন করিলেন। আমি বলিলাম—ভগবন্! আপনাকে আমি প্রণাম করি। এই বলিয়া তত্রত্য মণিমণ্ডিত পীঠাসনে সমাসীন হইলাম। সেখানে যে সকল দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও বিদ্যাধর সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিধাতাকে যথোচিত স্তব ও প্রণাম করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেরই প্রণামব্যাপার পরিসমাপ্ত হইল। তখন আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে নিখিল ভূত-ভব্য জগৎপ্রপঞ্চের অধীশ্বর! এই রমণী মৎসমীপে উপস্থিত হইয়া আমায় যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতে সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন, এইরূপ অনুরোধের কারণ কি? হে প্রভো! আপনি ভূতসমূহের অধীশ্বর এবং নিখিল জ্ঞানাম্বুধির পারগ; আপনার আবার উপদেশ লাভের প্রয়োজন কি? আমি তো ইহার কোনই প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। অতএব হে জগৎস্বামিন্। ইনি কি নিমিত্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় আমায় এইরূপ উপদেশ প্রদানে অনুরোধ করিলেন? আর এক কথা,—হে দেব! আপনি এই রমণীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন, অথচ ইঁহাকে বিবাহ করিলেন না কেন? ইঁহাকে এইরূপ দুঃখাভিভূত করিয়া রাখিলেন কি নিমিত্ত? এই সকল ব্যাপারের যাহা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন।

আমি এই প্রকার প্রশ্ন করিলে সেই ভিন্ন জগতের ব্রহ্মা, তৎশ্রবণে আমায় বলিলেন,—মুনিবর! শ্রবণ করিতে থাকুন, আপনার নিকট আমূল ঘটনা বিশদভাবে ব্যক্ত করিতেছি। আপনারা সাধু ব্যক্তি; আপনাদের নিকট কোন বিষয়ই গোপনে রাখা কর্ত্তব্য নহে। শুনুন তবে বলিতেছি। —একমাত্র সদ্বস্তু সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জন্ম-জরা নাই।

তিনি একই ভাবে চিরকাল বিদ্যমান আছেন। আমি সেই সদ্বস্তু বা চিৎপ্রকাশ হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকি। সর্ব্বদা আকাশরূপে আত্মাতেই আমার অবস্থান। ভবিষ্যতে যে সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আমি স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত হইব। প্রকৃত কথা এই যে, আমি অজ; আমি কিছুই দেখি না, অনাবৃত চিদাকাশদেহে চিদাকাশেই বিরাজ করি। এই আপনি আমার সম্মুখে আছেন, আমি আপনার সম্মুখে আছি; আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এই সকলই যেন তরঙ্গে তরঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। ফলে এই সমস্তই অজ, অজর, শান্তিময় ব্রহ্ম। আমি কালক্রমে স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া যাই, তাহাতে আমার যখন মালিন্য সঞ্চার হয়, তখন সাগর হইতে যেমন তরঙ্গভাবের আবির্ভাব, তেমনি আমি চিদাকাশময়—আমার অন্তরে 'অহং' 'মম' ইত্যাকার বাসনার অভ্যুদয় হয়। সেই বাসনাই এই সুন্দরী কুমারী। তুমি বা তোমার ন্যায় অপর ব্যক্তির নিকট এই বাসনা পৃথগাকারে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইলেও আমার নিকট ইহা স্বীয় চৈতন্যরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয় না। অপরের জ্ঞানে ইহা উৎপন্ন হইলেও আমার বোধে এ বাসনা অনুৎপন্নই বটে। আমি অবিনাশস্বভাব সত্তাস্বরূপ, আমার ক্ষয়োদয় কিছুই নাই। ইহা আমি অবগত আছি। বস্তুতঃ আমিই আত্মস্বরূপ; সেই আত্মস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত হইয়া আত্মাতেই আমি অবস্থিত আছি। আমার নিজ স্বরূপে আমি পরমানন্দে তন্ময় হইয়া রহিয়াছি। আমি স্বয়ম্প্রভু; আমার উপর আর প্রভুত্ব কাহারও নাই। 'অহ'মিত্যাকার ভ্রমরূপিণী বাসনা হইতেই এই রমণী উৎপন্না হইয়াছে। ইহাকে বাসনার অধিদেবতা বলিয়া অবগত হইতে হইবে। বাস্তব পক্ষে এ রমণী আমার গৃহিণী নয় এবং ইহাকে গৃহিণী করিবার অভিপ্রায়ে আমি সৃষ্টিও করি নাই। এ রমণীর এইরূপ একটা বাসনা হইয়াছিল যে, আমি ব্রহ্মার গৃহিণী; এই বাসনার আবেশেই নিজেকে গৃহিণী ভাবনা করিয়া নিজের দোষেই অকারণ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অধুনা আমার সঙ্কল্পকল্পিত জীবিতকালের পরিমাণ শেষ হইয়া গিয়াছে; তাই যাহা চিদ্‌বিবর্ত্ত—চিদাকাশস্বরূপ, তাহা হইতে আমি অন্য আকাশস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি। এই নিমিত্তই এই জগতে মহাপ্রলয়-কাণ্ডের সূচনা হইয়াছে। হে মুনিবর! প্রলয়কাল উপস্থিত-প্রায় দেখিয়া ঐ রমণীকে আমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। সেই নিমিত্তই রমণী ঐরূপ বিরসভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। চিত্তাকাশভাব পরিহারপূর্ব্বক যখনই আমি ব্রহ্মাকাশ হই, তখনই জগতে মহাপ্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয় এবং বাসনারও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। কাজেই ঐ বাসনাদেবতা বিরস ভাব উপগত হইয়া মদীয় পথানুবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ফলে, উদারধী ব্যক্তিমাত্রেই নির্ম্মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

অদ্য কলিযুগের শেষ দিবস; আজই যুগচতুষ্টয়ের বিপর্য্যয় ঘটিবে। অদ্য এ যুগের মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অন্যান্য প্রজাগণ সকলেরই অবসান হইবে। অদ্যই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিলয় পাইবে। অদ্যই মহাপ্রলয় ঘটিবে। অদ্যই মদীয় বাসনার পর্য্যবসান এবং অদ্যই আমার আকাশ-কলেবরের বিনাশ হইবে। হে ব্রহ্মন্! এই বাসনাদেবী এই নিমিত্তই ক্ষীণ হইতেছেন। বস্তুতঃ যদি কমলকুসুম শুষ্ক হইয়া যায়, তবে আর তাহার গন্ধলেশ থাকিবে কোথায়? সাগর জড় বস্তু; তাহা হইতে যেমন তরঙ্গভঙ্গী উত্থিত হয়, তেমনি এই জড় বাসনা হইতে অকারণে অনর্থকই ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে। এই বাসনা দেহাভিমানবতী হইলে স্বতই ইহার আত্মদর্শনে ঔৎসুক্য হয়। এই দেবী বাসনা ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাসযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে করিতে বিবিধ প্রজাপুঞ্জ-পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছে; ঐ ব্রহ্মাণ্ডেই আপনি অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ রমণী-রূপিণী বাসনাই আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে শৈলোপরি শিলা সন্দর্শন করিয়াছে। পরন্তু আমরা ঐ শিলাকে আকাশাকারেই দেখিয়া থাকি। এই যে দেখিতেছ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডনিচয় আছে; ইহার অভ্যন্তরেও অন্য

বহু জগৎ বিদ্যমান। কিন্তু ব্যুত্থান দশায় সে সকল আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। আমরা সমাধিসামর্থ্যে যৎকালে জ্ঞানময় হইয়া উঠি, তখন যোগনেত্রে সেই সকল জগৎ অবলোকন করিতে পারি। আমরা দেখি,—ঘটে, পটে, অনলে, অনিলে, জলে, স্থলে, শৈলে, সর্ব্বত্রই সংখ্যাতীত জগৎ বিরাজমান। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা অলীক ভ্রম মাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগরী, তেমনি ইহা যত্রতত্রই হইতে পারে। এই জাগতী মায়াও মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। একমাত্র অধিষ্ঠান-চৈতন্যেরই সত্তা, নতুবা আর কিছুরই সত্তা নাই। যাহারা এই জগদ্‌ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন,—পারিয়া নিজেকে চিদাকাশের সহিত অভিন্ন বোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আর ভ্রমের ঘোরে পতিত হন না।

মুনিবর! এই দেবী বাসনা নিজের ইষ্টসিদ্ধি করিবার জন্য ধ্যান-ধারণাদির দৃঢ়াভ্যাস করিয়াছেন। সেই জন্য আপনি অন্তর্ধানগত হইলেও আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছেন। বিনা গুরূপদেশে আত্মজ্ঞান লব্ধ হয় না বলিয়াই ইনি আপনার নিকট গিয়াছিলেন। এই বাসনাই অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট মায়িক উপাধির অনুসরণপূর্ব্বক জীবের চিৎশক্তিরূপে প্রকাশমানা। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট ইনি আদি-অন্ত-হীন ব্রহ্মচৈতন্যরূপেই পরিস্ফুরিত হন। তত্ত্বজ্ঞানী অবগত আছেন, এ জগতে কোন কার্য্যই হয় না বা নাশ পায় না, কেবল এক সেই চিৎশক্তিই দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। জানিবেন,—কি দেশ, কি কাল, কি ক্রিয়া, কি দ্রব্য, কি মন, কি বুদ্ধি,—সকলই উল্লিখিত চিৎস্বরূপ শিলার অবয়বমাত্র। এ নিমিত্ত ইহার অস্তোদয় নাই; ইহা সর্ব্বদাই একইভাবে বিরাজমান। একমাত্র চৈতন্যই শিলাকারে অবস্থিত। বায়ুর অঙ্গ যেমন স্পন্দ, তেমনি এই জগৎপরম্পরাও চৈতন্যেরই অঙ্গীভূত। বিজ্ঞানঘন আত্মাই মূঢ়ের জ্ঞানে জগৎরূপে প্রতিভাত। ঐ চৈতন্য অনাদি এবং অনন্ত; তথাচ সাদি ও সান্ত হইয়া পরিচ্ছিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকেন। চৈতন্যশিলার আদি নাই, অন্ত নাই, উহা ভ্রমজ্ঞানেই আদি ও অন্তশালী হইয়া থাকে। উহা নিরাকার হইয়াও সাকার হয়। এ জগৎ উহারই অঙ্গস্বরূপ।

স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যই স্বীয় আকাশময় রূপকে গৃহনগরাদিরূপে জ্ঞান করে এবং চৈতন্যই নিজ স্বরূপকে পাষাণ ও জগৎ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকে। চিদাকাশই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বত্র কেবল একই ভাবে বিরাজমান। ইহাতে নাই নদীপ্রবাহ, নাই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন, বা নাই কোন বস্তুবিপর্য্যয়-ঘটনা;—সমস্তই চিদাকাশরূপে প্রকাশমান। যেমন জলমধ্যে জলের পৃথক্ অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি এই চিদাকাশে জগৎ ও প্রলয়াদির পৃথক্‌ভাবে থাকা সম্ভব নহে। অতএব অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে দেখা যাইবে, সর্ব্বত্রই অনন্ত অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। আর যাহা অপবাদদৃষ্টি, তাহাতে দেখা যাইবে,—একমাত্র সর্ব্বময় শান্ত চৈতন্যই সর্ব্বস্থানে বিরাজিত। ঐ দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই। যেমন মহাকাশের সত্তাতেই ঘটাকাশাদি মহাকাশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান, তদিতর অন্য কোন পৃথক্ সত্তা উহার নাই, তেমনি এই নিখিল জগৎ শূন্যস্বরূপ হইলেও একমাত্র চিৎসত্তাতেই সত্য হওয়া সম্ভবপর।

হে মুনে! তুমি অধুনা স্বীয় জগতে গমন কর এবং স্বীয় কল্পিত সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিসুখ উপভোগ করিতে থাক। আমার কল্পিত এই নিখিল জগৎও এক্ষণে পরম পদে বিলীন হইয়া যাউক। আমরাও অনন্ত ব্রহ্মপদেই প্রয়াণ করি।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিভু ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া সমগ্র ব্রহ্মলোক-বাসীদিগের সহিত পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক একান্তে সমাধিনিষ্ঠ হইলেন। তিনি প্রণবের শেষ অর্দ্ধমাত্রাত্মক নাদবিন্দুর শান্তনামধেয় অংশে স্বীয় চিত্ত বিলীন করিয়া বাসনারে দমন করিলেন। তাঁহার বাসনা শান্ত হইল। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে

অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই বাসনাদেবীও শান্ত আকাশময় হইয়া গেলেন। পিতামহ এইরূপে সর্ব্বসঙ্কল্প শূন্য হইয়া ক্রমশঃ যখন ক্ষীণভাব ধারণ করিলেন, তখন আমি সর্ব্বগামী অনন্ত চিদাকাশরূপে বিরাজ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—ক্ষণেকের মধ্যেই তদীয় সর্ব্বকল্পনা নিঃশেষিত হইতে লাগিল। শৈল, সাগর ও দ্বীপমালামণ্ডিত পৃথ্বী ও পৃথ্বীর তৃণাদি-উৎপাদিকা শক্তি, সকলই ক্রমশ লয় পাইতে লাগিল। সেই ব্রহ্মা বিরাট-দেহ; পৃথ্বী তদীয় দেহের একাংশ মাত্র। সুতরাং চৈতন্য লুপ্ত হইলে দেহীর দেহ যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, ব্রহ্মার যখন চৈতন্য লুপ্ত হইল, তখন পৃথ্বীও সেইরূপ চেতনা-বিরহিত ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া বিকৃতভাবে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল। হেমন্তকালের অবসান ঘটিলে তরুলতা প্রভৃতি যেরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সেই পৃথ্বীও তৎকালে তেমনি বিগতশ্রী হইল। যখন চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, তখন আমাদের অঙ্গসমূহ যেমন বিরসভাব উপগত হয়, তেমনি সেই বিরিঞ্চির যখন চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখন ধরাতলেরও ভ্রষ্টশ্রীকতার সূচনা হইল। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার উৎপাত-উপদ্রব প্রাদুর্ভূত হইল। মানবেরা পাপানলে দগ্ধ হইয়া নরকের পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি প্রকট হইল। দস্যুতস্করেরা সহসা উপদ্রব করিতে লাগিল। রাজন্যগণের অত্যাচারে, রোগে, শোকে ও দৈন্য-দারিদ্র্যাদি বিবিধ বিপত্তিজালে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কামিনীরা দুশ্চরিত্র হইল। মানবেরা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অকার্য্য-কুকার্য্যে লিপ্ত হইতে লাগিল। ধূলি ও নীহারনিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবসকর ধূসরবর্ণ পরিগ্রহ করিলেন। রোগ, শোক ও শীতাতপাদি ক্লেশ ভোগ করিয়া-করিয়া লোকসকল মহাব্যাকুল হইয়া পড়িল। অগ্নিকাণ্ড, জলপ্লাবন ও যুদ্ধ, এই সকল ভীষণ ব্যাপারে গ্রাম-নগর-রাজ্য উৎসন্ন হইতে বসিল। বৃষ্টি একেবারেই রহিত হইল। জনগণ অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে লাগিল। আকস্মিক বাত্যাদি বিবিধ উৎপাতে পর্ব্বত, পত্তন, সকলই বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কোথাও কোথাও কত লোক পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে লাগিল, কোথাও আনুষ্ঠানিক বৈদিক ব্রাহ্মণের আকস্মিক মরণে কেহ বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কোন কোন স্থানে সর্ব্বজনহিতৈষী মুনিঋষি প্রভৃতি সাধু সজ্জনের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে জনসাধারণ কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিষম জলাভাবে পড়িয়া মানবগণ যত্রতত্র অকুতোভয়ে কূপাদি খনন করিতে লাগিল। রাজা এবং প্রজাসাধারণ কেহই জাতিবিচার না করিয়া যাহার তাহার কন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাহাতে কত স্থানে কত বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব জগতে প্রায় রহিল না। জনগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্ন বিক্রয় করিয়া জীবিকা যাপন করিতে লাগিল। কেহ কেহ চতুষ্পথাদি স্থানে দেবপ্রতিমা প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক তদুপার্জ্জিত অর্থদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিল। রমণীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা যাপন করিতে লাগিল। লোকের জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠিল। প্রজাপুঞ্জ অনবরত কেবল ক্লেশই ভোগ করিতে লাগিল। রমণীগণের মতি কেবল অধর্ম্মের পথেই নিবিষ্ট হইল। যাঁহারা জনসমাজের শ্রেষ্ঠপ্রভু বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বিষম অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। জগতের সর্ব্বত্রই কেবল অধার্ম্মিক লোক দেখা যাইতে লাগিল। জনগণ বেদাদি-শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়া কেবল কুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। দুষ্ট লোকই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা সাধু পুরুষ, তাঁহারাই অবনতির পথে পতিত হইতে লাগিলেন। ভূপালগণ অসাধুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিকট অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। পৃথিবীতে কেবল লোভ, দ্বেষ, বিষয়ানুরাগ, ক্রোধ ও অজ্ঞান বৃদ্ধি পাইল। অনর্থে অনর্থে সর্ব্বস্থান পূর্ণ হইয়া গেল। লোক সকল স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া পরধর্ম্মে অনুরক্ত হইতে লাগিল। পাষণ্ড-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উৎপাত-উপদ্রব ও অত্যাচার করিতে লাগিল। ভীষণপ্রকৃতি পামরগণ দুর্ব্বলের প্রতি সর্ব্বদাই পীড়ন করিতে লাগিল। দেব ও দ্বিজগণাধিষ্ঠিত গ্রামনগর সমস্তই দস্যুতস্কর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎসন্নপ্রায় হইয়া গেল। বিবেক-বুদ্ধি বিহীন মানবেরা আপাত-মনোরম কার্য্যসমূহে লিপ্ত হইয়া অবশেষে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে লোক সকল অত্যন্ত অলস হইয়া পড়িল। সকল প্রকার বিপত্তি আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। পুর, গ্রাম, সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া

গেল। যে নগর দুই দিন পূর্ব্বে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে জনশূন্য হইয়া পড়িল। নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র সশব্দে ভস্মস্তূপময় বাত্যা বহিতে লাগিল। হতভাগ্য প্রজামণ্ডলী বিপদাপন্ন হইয়া গগনভেদী হাহাকাররবে দিক্‌সকল মুখরিত করিতে লাগিল। অন্নাভাব বশতঃ প্রায় সকলেই তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তাহারা লোকদিগকে পীড়ন করিয়া স্ব স্ব উদর পূরণ করিতে লাগিল। সমস্ত দেশ নীরস হইয়া শুকাইয়া গেল। বসন্তাদি ঋতুর শোভাসমৃদ্ধি কোথাও আর দৃষ্ট হইতে লাগিল না।

রাম! সেই ব্রহ্মা যখন বাহ্য চৈতন্য উপসংহারপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন হইলেন, তখন পৃথিবীতলে উল্লিখিত প্রকার অনর্থ সকল সংঘটিত হইতে লাগিল। মহাপ্রলয় আসন্নপ্রায় হইল। সকলেই তখন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল। বিধাতা জলাংশ হইতে স্বীয় সম্বিৎ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। এই নিমিত্ত সাগর, সকল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উদ্বেল হইয়া পড়িল। মহাসমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হইয়া তীরাভিমুখে প্রধাবিত হইল। সাগরসমূহের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহারা উন্মত্তবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে তীরগত বনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের তরঙ্গশ্রেণী তীরোপরি উত্থিত হইয়া আবর্ত্তবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অগণিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হইল—হইয়া নভস্তল আক্রমণপূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ মেঘাকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তরঙ্গরাজির গভীর গর্জ্জন ও আবর্ত্তসমূহের উচ্চধ্বনি গিরিগুহায় গিয়া আহত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে মেঘবৃন্দ ঘন ঘন বারিবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে গিরিসমূহ সমাবৃত করিয়া ফেলিল। মকর-কুম্ভীরাদি দুর্দ্দান্ত জলজন্তু সকল বেগ-বিধূত তরঙ্গরাজির উপরিভাগে যেন বীরদর্পে বিচরণ করিতে লাগিল। মকরাদি জলজন্তুগণ যখন তরঙ্গমালার উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন অরণ্যমধ্যগত বিশাল বনশ্রেণীর ন্যায় তাহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল। সিংহাধিষ্ঠিত গুহাভ্যন্তরে সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে ক্রুদ্ধ সিংহগণ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখাগত জলজন্তুসমূহের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। তরঙ্গবেগে কত শত

রত্নরাজি আকাশোপরি উৎক্ষিপ্ত হইয়া নক্ষত্রশ্রেণীবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। সাগরগর্ভস্থ জলজন্তুগণও উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠিয়া সম্মুখস্থ মেঘদলোপরি ক্রীড়া করিতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল ঝঞ্ঝানিল বহিল; সাগরের তরঙ্গমালা পরস্পর আহত হইতে লাগিল; তাহাতে ভীষণ শব্দ সকল মুহুর্মুহু সমুত্থিত হইতে লাগিল। হস্তিসকল জলমগ্ন হইয়া বিষম তরঙ্গ প্রহারে মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল আর মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার করিয়া দিক্ বিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ উর্ম্মিশ্রেণী প্রবল পবনবেগে অত্যুচ্চ গগনপথে প্রধাবিত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডল ধৌত করিতে লাগিল। উচ্ছলিত সাগরসলিলের প্রখর স্রোতে সন্নিহিত পর্ব্বতবৃন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের উন্মত্ত জলপ্রবাহ গর্জ্জন করিতে করিতে গিরিগুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সমুদ্র যেন স্বীয় তরঙ্গ-কর প্রসারিত করিয়া তটগত পর্ব্বত সকল অপহরণ করিতে লাগিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গময় সাগরসলিল তীরস্থ কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য দাবানল প্রশমিত করিয়া দিল। মনে হইল, ভূপতিগণ যেন শত্রুনগর আক্রমণপূর্ব্বক শত্রুসংহার করিল। তরঙ্গ সকল গভীর গর্জ্জনপুরঃসর আকাশপথে সমুত্থিত হইয়া নভশ্চরদিগের আলয়ও আক্রমণ করিল। সেই সকল তরঙ্গাঘাতে নভশ্চরেরা উৎপীড়িত হইয়া স্ব স্ব আবাস হইতে পলাইতে লাগিল। সাগরের সলিলস্রোতে তীরগত কাননাবলীর তরুলতাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং তরঙ্গমালার সহিত আকাশে উত্থিত হইয়া আকাশকেও অরণ্যময় করিয়া তুলিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি আকাশকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাশব্দ-জনক মারুতের আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গস্তোম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানাদিকে চালিত হইতে লাগিল। সাগরতীরস্থ অসংখ্য পর্ব্বত গৈরিকাদি ধাতুর প্রভাপুঞ্জে তীরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল, তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড তরঙ্গাঘাতে জলমধ্যে পতিত হওয়ায় কত শত গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। মকরাদি জলজন্তু সকল ঘোরাবর্ত্তে পতিত হইয়া তরঙ্গতাড়নায় নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পর্ব্বতবৃন্দ তীর হইতে নিপতিত হইয়া অতল জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া গেল। জলমগ্ন গিরিশ্রেণীর

গুহাভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত তরঙ্গসংঘর্ষ হইতে লাগিল, তাহাতে গুহামধ্য হইতে স্ফটিকাদি শুভ্র মণিগণ নিক্রান্ত হইয়া যেন সহাস্য-বদন সাগরের দন্তাবলীর প্রভার ন্যায় পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। যে সকল পর্ব্বত জলমগ্ন হইয়া গেল, তাহাদের উচ্চ শৃঙ্গ ও গুহাগর্ত্ত আশ্রয় করিয়া তরঙ্গ-তাড়িত জলজন্তু সকল প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। তীরসন্নিহিত জলপ্রবাহে যে সকল পাদপ পতিত হইল, সামুদ্রিক কচ্ছপকুল তাহাদের শাখাকুঞ্জ-মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া বাস করিতে লাগিল। সমুদ্রগর্ভে পর্ব্বত সকল অনবরত পতিত হইতে লাগিল। যমের মহিষ, ইন্দ্রের ঐরাবত ও দিগ্-গজগণ সেই পতনশব্দে ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িল। জলপতিত মগ্নোমগ্ন শৈলসকলের উপরিভাগে মীনরাজি উত্থিত হইয়া খেলিতে লাগিল। কাননরাজি ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। তাহার মধ্যে মধ্যে সাগর-সলিল প্রবেশপূর্ব্বক সে সে স্থান অত্যন্ত শীতল করিয়া তুলিল। সমুদ্র-গর্ভে বাড়বাগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বন্য বৃক্ষরাজি সমুদ্রজলে পতিত হওয়ায় দাহ্যাভাবে বনবহ্নি প্রশমিত হইয়া গেল। জলমগ্ন পর্ব্ব-তোপরি উত্থিত হইয়া জলহস্তিগণ অন্যান্য জলহস্তীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। সমুদ্রগণ যেন উত্তাল তরঙ্গভঙ্গিমা সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বিশাল শৈলরাজির অত্যুচ্চ শিখরে যে সকল বনভূমি বিদ্যমান, প্রাণিগণ তথায় গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গশ্রেণী যেন পাতালতলগত অসুর-সমূহের ন্যায় উদ্ভটভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

অনন্তর দিগ্‌গজগণ সেই বিক্ষুব্ধ সাগরগর্ভে পতিত হইল এবং স্ব স্ব শুণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক গগনভেদী বিশাল বৃংহণধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাদের অতি গভীর চীৎকাররবে পাতালরূপ তালু বিদীর্ণ হইয়া গেল। দিগ্‌গজেরা পৃথ্বীধারণরূপ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগরে পতিত হইল। তখন পৃথিবীর সুমেরুপ্রভৃতিরূপ স্তম্ভসকল উচ্চলিত হইয়া গেল। স্বস্থানচ্যুত পৃথ্বী ক্ষণকাল মধ্যেই অবগাঢ় হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুদ্র-প্রবাহ আসিয়া পৃথিবীর উপর উত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে পৃথ্বীদেবী সাগরোপরি শৈবালবল্লীর ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন পুষ্করা-বর্ত্তাদি প্রলয়কালীন নীরদবৃন্দ নভোমণ্ডলে গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেই সকল গর্জ্জনধ্বনি চতুর্দ্দিকে যখন প্রতিধ্বনিত হইল, তখন গগন যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধূমকেতু সকল আকাশ হইতে আবর্ত্তাকারে পতিত হইতে লাগিল। পতনকালে তাহাদিগকে যেন সিন্দূরাভ ভুজঙ্গাবলীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কেবল ধূমকেতু নয়,—উজ্জ্বল শিখাপটল বিস্তার-পূর্ব্বক আরও কত শত বিবিধ উৎপাত চারিদিক্ দগ্ধ করিয়া আকাশ, দিক ও ভূতল হইতে আবির্ভূত হইতে লাগিল। বিধাতা স্বীয় সঙ্কল্প পরিহার-পূর্ব্বক এইরূপে উপেক্ষা করিলে, তখন পৃথ্বী প্রভৃতি ভূতবৃন্দ ও অসুরাদি প্রাণিবৃন্দ একান্ত বিক্ষোভিত হইয়া পড়িল। চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, ইন্দ্র, অগ্নি ও যম ইহাঁদের প্রভাপুঞ্জ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার শরীরসহ একীভাব প্রাপ্ত হইল। তখন চন্দ্রাদি সুরসমূহ পরস্পর কোলাহলপূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিলেন। ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে বৃক্ষাবলী কটকটধ্বনিসহকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ভূকম্প তখন এমনই হইল যে, পর্ব্বত সকল ভূতলে থাকিয়াও দোলাধিরোহণ জন্য আন্দোলন অনুভব করিতে লাগিল। কৈলাস, মেরু ও মন্দরাদি প্রধান প্রধান পর্ব্বতবৃন্দও সে কম্পনে স্থানচ্যুত হইয়া গেল। রক্তবর্ণ পুষ্পস্তবক সকল কল্পতরু হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। শৈল, সাগর, নগর ও কাননাদি সকলই জীর্ণ শীর্ণ এবং প্রখর উৎপাত বাত্যাভিহত জনপ্রাণীর কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া মহেশ্বরের নয়নানল-পতিত ত্রিপুরাসুরবৎ অনুভূত হইতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই বিরাটকলেবর ব্রহ্মা যখন প্রাণ-পবন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বাতস্কন্ধাবস্থিত বায়ু গ্রহনক্ষত্রাদির ধারণ-স্থিতি পরিহার করিল। কেন না, প্রবহাদি বায়ুই বাতস্কন্ধাদিরূপে অবস্থিত এবং তাহাই ঐ স্বয়ম্ভুর প্রাণস্বরূপ। ঐ প্রাণবায়ু যখন তিনি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সামর্থ্য যে, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতিকে

ধারণ করিতে সক্ষম হয়? বস্তুতঃ ব্রহ্মার প্রাণপবন—সেই বাতস্কন্ধ তৎ-কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া তৎকালে গ্রহনক্ষত্রাদির ধারণশক্তি পরিহার-পূর্ব্বক সমভাব লাভ করিল এবং বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে জ্বলন্ত অঙ্গার সকল যেমন একবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার অধোদিকে পড়িয়া যায়, তেমনি আকাশের নক্ষত্রগুলি নিরাধার হইয়া বৃক্ষবিচ্যুত পুষ্পরাশির ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পবনাধার প্রশান্ত হইল। তখন সুকৃতরূপ ফলের ভোগস্থান—বিমানশ্রেণী কর্ম্মক্ষয়ে যথাকালে ভূপতিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার সঙ্কল্পরূপ ইন্ধনরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তাহাতে খেচরদিগের গতিরূপিণী দীপ্ত বহ্নিশিখা প্রশমিত হইয়া গেল। খেচরগণের স্ব স্ব শক্তি যখন লোপ পাইল, তখন প্রলয়ের প্রভঞ্জনভরে তূলরাশির ন্যায় আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তাহারা ভূপতিত হইতে লাগিল। সুমেরুর শৃঙ্গশ্রেণী, ইন্দ্রাদি সুরগণের আবাসভূমি এবং স্বর্গীয় কল্পবৃক্ষাবলী সকলই ভূকম্পে বিকম্পিত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভবদীয় উপদেশের মর্ম্ম ইহাই বুঝিলাম যে, ব্রহ্মা চিৎসঙ্কল্পময় মনঃস্বরূপ হইয়াই ব্রহ্মাণ্ডদেহে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরন্তু ইহাতে আমার মনে একটা বড়ই সন্দেহ হইতেছে। সেই সন্দেহের বিষয় এই যে, এই তো ভূর্লোকাদি দেখা যাইতেছে, ইহা কি ঐ চিৎসঙ্কল্পাত্মক চতুর্ম্মুখের অঙ্গ? আমি তো মনে করি যে, উহা তাঁহার অঙ্গ হওয়া অসম্ভব; কেন না, তিনি হইলেন, অমূর্ত্ত মনোময়; আর এই যে ভূর্লোকাদি, ইহা হইল মূর্ত্তিবিশিষ্ট; সুতরাং অমূর্ত্তের অঙ্গ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে কি? ধরিয়া লইলাম,—যদি তাহাই হয়, তবে উহা তাঁহার কোন্ অঙ্গ? স্বর্গ, পাতাল, ইত্যাদি-সকল তদীয় কোন্ কোন্ অঙ্গমধ্যে গণনীয়? আর কিরূপেই বা উহারা সঙ্কল্পময় ব্রহ্মার অঙ্গীভূত হইল? অপিচ তিনি যদি বিরাটদেহেই বিরাজমান, তবে তাঁহারই দেহস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে—সত্যলোকে তিনি অবস্থান করিলেন কিরূপে? আমি তো স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, এই ব্রহ্মা সঙ্কল্পময় নিরাকার, আর এই দৃশ্য জগৎ আকৃতিবিশিষ্ট। আমার এই

ধারণা আছে বলিয়াই ঐরূপ সন্দেহোদ্রেক হইয়াছে। যদি ইহা আমার এই ধারণার বিপরীত অন্য কোনপ্রকার হয়, তবে আপনি তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আদিতে ইহা না সৎ, না অসৎ, কিছুই ছিল না; —ছিল কেবল একমাত্র সর্ব্বব্যাপক চিৎস্বরূপ পরমাকাশ। ঐ পরমাকাশই আপন আকাশভাবকে এই দৃশ্যাকারে ভাবনা করিলেন। তিনি চিন্ময়; তাই আপন স্বরূপ পরিহার না করিয়াই চেতন হইলেন। বৎস! সেই যে চেতন, তিনিই ক্রমে ক্রমে ঘনীভাব উপগত হইয়া জীব ও মনোরূপে পরিণতি লাভ করিলেন। এইরূপে সকলই যখন চিদাকাশে অভ্যাসবশে আবির্ভূত, তখন কিছুরই সাকারত্ব হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই বিশুদ্ধ চিদাকাশ অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ স্বস্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ উল্লিখিত শান্তিময় চিদাকাশ হইতে সম্পূর্ণই অভিন্ন। সেই যে অক্ষয় অব্যয় আকাশ, তাহাই সঙ্কল্পাত্মকরূপে অহম্ভাবনা করিতে করিতে মনোরূপ ধারণ করে। পরে 'অহ'মিত্যাকারে ভাবিত হইয়া সেই সঙ্কল্পময় চিদাভাস সতত আকাশে আকাশাকারে থাকিয়াও ক্রমশঃ এই অসত্য জগৎপ্রপঞ্চ অনুভব করিতে থাকে। সেই যে আকার দর্শন হয়, তাহা ভাবনার উৎকর্ষেই হইয়া থাকে। এই জন্য জানিবে,—ঐ আকারও সঙ্কল্পাত্মক শূন্য বৈ আর কিছুই নহে। তোমার নিকট যেমন শূন্যই সঙ্কল্পবলে নগরাকারে ভাবিত হয়, তেমনি সেই অনাদি চিদাকাশও আকাশে আকাশকেই দেহরূপে অনুভব করেন। চৈতন্য নির্ম্মলস্বরূপ; তাই যে পর্য্যন্ত তাঁহার ঐরূপ ভাবনার স্থিতি, ততদিনই তিনি দেহাদি অনুভব করেন, আবার স্বীয় ইচ্ছাক্রমে ভাবনার অবসান করিয়া আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া যান। তোমার যখন আমাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইবে, তখন এ সংসার শূন্যস্বরূপেই তোমার অনুভূতিগোচর হইবে। যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে বাসনা শান্ত হইয়া যায়। তখন অহঙ্কার-পরিহীন অদ্বৈত পরব্রহ্মই মোক্ষাকারে অবশিষ্ট হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! এইরূপে বুঝিয়া দেখ, যিনি ব্রহ্মা, তিনিই জগৎ;

এইরূপেই এ জগৎ বিরাটদেহ ব্রহ্মার দেহ হইতেছে। সঙ্কল্পময় চিদাকাশের ভ্রমই জগৎ এবং উহাই ব্রহ্মাণ্ড আখ্যায় অভিহিত। এই সঙ্কল্পময় যত কিছু বস্তু দেখিতে পাইতেছ, এতৎসকলই সেই চিদাকাশ মাত্র। এই চিদাকাশেই জগৎ; তুমি বা আমি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ফলতঃ নির্ম্মল চিন্ময় আকাশ, তাহাতে জগতের স্থিতি কিপ্রকার? আর কিরূপেই বা উহার উৎপত্তি? এ বিষয়ে কাহাকে সহকারী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়? অতএব যাহাকে জগদাকারে দেখিতেছ, তাহা অলীক বস্তু, আর যাহার আস্বাদ লইতেছ, যাহা মুখরোচক হইতেছে এবং যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ, সে সকলই অলীক এবং শূন্য মাত্র। ফল কথা, একমাত্র চৈতন্যই আপনা হইতে অজ্ঞ জন সমীপে জগদাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বায়ুর যেমন স্পন্দাকারে অনুভূতি, তেমনি সেই আত্মারও দ্বৈতরূপেই অনুভব। যদি দ্বৈতভাব বর্জ্জন করা যায়, তবেই এই প্রপঞ্চকে যৎকিঞ্চিৎ সত্য বলিয়া বর্ণন করা যাইতে পারে। দ্বৈতের অবর্জ্জনে—দ্বৈতভাবের স্বীকারে এই সমস্তই অসত্য—অকিঞ্চিৎ। ফলে তুমি জানিও,—স্বচ্ছ নিরাময় শূন্য চিদাকাশই জগৎ।

হে রঘুনন্দন! যেমন আমি, তেমনি তুমিও যথাযথ জ্ঞানে সৎ আর অযথা জ্ঞানে অসৎ। অতএব এ সকল দেহাদির প্রতি মমতা-বিরহিত হইয়া তুমি অবস্থান করিতে থাক। তুমি বাসনারে বর্জ্জন কর; শান্তচিত্ত হও; অধৈর্য্যভাব দূরে বর্জ্জন কর এবং মৌনী হইয়া যথাপ্রাপ্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক। অথবা একেবারেই কর্ম্ম করিও না। যদি কর্ম্ম কর, তবে যাহাতে আসক্তি না হয়, তাহাই করিও। যাঁহার আদি নাই, যিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, এই সকল দৃশ্যাকারে প্রতীয়মান হইতে তিনিই হইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত দৃশ্য বস্তু বলিয়া অন্য একটা বস্তুবিশেষ নাই। যখন সেই অনাদি অনন্ত নিত্য বস্তুর প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান হয়, তখনই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অন্যথা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নিত্য হৃদয়ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্রহ্মস্বরূপের যে অজ্ঞান, তাহাই এই প্রপঞ্চবিস্তারের মূল।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭২॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার নিকট উপদেশ পাইয়া আমি অধুনা ইহাই বুঝিলাম যে, বন্ধন, মুক্তি এবং জগৎ, এ সমুদায় অসৎ নহে এবং ইহাদিগকে সৎও বলা যায় না। ফলে আত্মসত্তার অঙ্গীকারে ইহারা সৎ হইয়া পড়ে এবং স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে অসৎ হইয়া উঠে। অপিচ আরও বুঝিয়াছি,—যিনি সর্ব্বাদি আত্মবস্তু, তিনি অনির্ব্বচনীয়; না অস্ত, না উদয়, কিছুই তাঁহার নাই। তথাচ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুনরপি আমার নিকট ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। প্রভো! আপনার উপদেশ-বাক্য অমৃতোপম; উহা বারম্বার শুনিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ যতই শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না। আমি বুঝিয়াছি,—সৃষ্টিব্যাপারাদি সত্যাসত্য কিছুই নহে। তবে যাহা সত্য, তাহা আমার বুঝা হইয়াছে। তথাচ সৃষ্টির অনুভব কি প্রকার, তাহা আরও একবার বর্ণনপূর্ব্বক আমার উক্ত বোধ সুদৃঢ় করিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই যে কিছু দেশ-কাল-ক্রিয়াদিময় চরাচরাত্মক দৃশ্যজাত দেখা যাইতেছে, এ সমুদায়ের মহাধ্বংস—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও ইন্দ্র-চন্দ্রাদির চরম অবস্থাবিপর্য্যয়ই মহাপ্রলয় নামে নির্দ্দিষ্ট। এইরূপ মহাপ্রলয়ের পর অবশেষে যাহার অবস্থিতি, তাহাই শান্ত, স্বচ্ছ, অজ, অনাদি, ব্রহ্মপদ। এই ব্রহ্মবস্তু বাক্যাতীত। ইহাঁর স্বরূপ কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। সর্ষপের নিকট সুমেরু গিরি যেমন অতি সূক্ষ্ম, তেমনি তাঁহার নিকটও ঐ শূন্যাকাশ অতি স্থূল। ফলে তিনি আকাশাপেক্ষাও শূন্য। ত্রসরেণু আমাদের বিবেচনায় পর্ব্বতাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু; এইরূপে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতম। মহাপ্রলয় হইয়া গেলে অনুভবস্বরূপ আদ্য শান্ত মহান্ চিদাকাশ পরমাকাশে অবস্থান করেন। তিনি দিক্ ও কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কল্পশূন্য। সেই অবস্থায় অতীত জগতের একটা দৃঢ় সংস্কার স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার যেন পরমাণুভাবে অনুভূত হয়। তিনি স্বীয় অভ্যন্তরে

স্বপ্নবৎ ঐ অসত্য পরমাণুভাবের পর্য্যালোচনা ও শব্দব্রহ্মের বিরাট চিদাকারার্থ ভাবনা করিতে থাকেন। চিন্ময়তা নিবন্ধন ঐ চিৎস্বরূপই অন্তরে আপন চিদণুভাব আলোচনা করেন। অনন্তর তাদৃশ আলোচনার নৈরন্তর্য্যে তিনি তখন দ্রষ্টার ন্যায় হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় লোকে যেমন নিজেকে নিজেই মৃতাবস্থায় দেখে, তেমনি ঐ অণুপরিমিত চৈতন্য তখন আপনাতেই আপনি দ্রষ্টা হইয়া উঠেন। তিনি চিৎস্বরূপে যদিও এক, তথাচ আপনাতে দ্বিত্ব দর্শনপূর্ব্বক আপনাতেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়রূপে তখন অবস্থান করিতে থাকেন। উল্লিখিত চৈতন্য শূন্যস্বরূপ—নিরাকার; তিনি স্বীয় অণুপরিমিত দেহ দর্শন করিতে করিতে অবশেষে দৃশ্যাকারে অভ্যুদিত হইয়া উঠেন। অপিচ সেই যে সূক্ষ্ম দৃশ্য দেহ, তাহার তিনি দ্রষ্টৃপদেও সমাসীন হন। অনন্তর তিনি ঐ অণুপরিমিত নিজাকারকে প্রকাশরূপে দর্শন করেন এবং আপন অনুভববলে অঙ্কুরিত বীজবৎ ক্রমশঃ স্ফীতভাব উপলব্ধি করিতে থাকেন। ঐরূপ স্ফীততানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দ্রষ্টা ও দর্শন তখন প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না; বাক্যাদি-ব্যবহারের অনাবির্ভাব-নিবন্ধন ঐ দেশকালাদি তখন অনভিব্যক্তভাবে অবস্থান করে। অণুপরিমিত চৈতন্যের প্রকাশস্থানই দেশাখ্যায় অভিহিত। ঐ দেশ যে ক্ষণে প্রকাশ পায়, সেই ক্ষণের নাম কাল আর ঐ প্রকাশের নাম ক্রিয়া; ঐ প্রকাশ ক্রিয়া দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম দ্রব্য; ঐ যে উপলব্ধি, উহাই দর্শন। এইরূপে পরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত উচ্ছূনভাবে ক্রমশ আকাশেই অসত্য দেশকালাদি অভ্যুদিত হইয়া থাকে। যে ছিদ্র দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপ জীবের প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়, সেই ছিদ্র দেহবর্ত্তী হইলে চক্ষুরাখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয়। এই ইন্দ্রিয়পঞ্চকের বহু বিষয়; সেই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথমে যেটীর উৎপত্তি হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ নামনিরুক্তি না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহা তন্মাত্রনামেই পরিচিত থাকে। ঐ অনাখ্য বিষয় আকাশাকার—অতীব সূক্ষ্ম। এইরূপে ঐ চিদণুর প্রকাশরূপ আকাশই ক্রমশঃ ঘনীভাব উপগত হইয়া পুষ্টদেহ হয়। সেই দেহই আতিবাহিক দেহ; উহা রূপাদির

অনুসন্ধান করিতে করিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভব করিতে থাকে। উল্লিখিত চিদণু এইরূপে ক্রমশ দৃশ্য শব্দাদি বিষয়ের পুনঃপুন অনুভব করিতে করিতে পরিপুষ্ট হয়। সেই যে পরিপুষ্ট দশা, তাহা গৃহীত বিষয়সমূহের স্মরণ-দশায় জ্ঞান বা চিত্ত নামে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নিশ্চায়ক অবস্থার নাম বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প-বিকল্পদশায় উহাই মনোনামে নিরূপিত হয়। অনন্তর ঐ মন যখন অহঙ্কারপদে অধিরূঢ় হয়, তখন সে আপনা হইতেই আপন দেশ-কাল-কৃত পরিচ্ছিন্ন ভাব পরিগ্রহ করিয়া লয়। প্রথমে যখন ঐ চিদণুর শব্দাদি বিষয় জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, পরবর্ত্তী জ্ঞানকালে অতীত কাল তখন পূর্ব্ব নামেই নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐ চিদণু এমনই ভাবে ক্রমশঃ দিক্সমূহের নাম নিরূপণ করিয়া লয়েন। উনি আকাশবৎ বিশদাকার হইলেও আপনিই দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও শব্দার্থ জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ চিদণু আকাশস্বরূপ; উনি আপন আকাশস্বরূপেই উল্লিখিত প্রকার অনুভব করিতে করিতে আতিবাহিক দেহে পরিণত হন। আতিবাহিক দেহাবস্থায় উনি বহুকাল ভাবনা করিতে থাকেন; সেই বহু ভাবনার ফলেই অবশেষে আপনাকে আধিভৌতিক বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লয়েন।

এইরূপে এখন ভাবিয়া দেখ, নির্ম্মল আকাশে আকাশই এইপ্রকার বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে; ফলে এ বিভ্রম মরীচিকায় জলের ন্যায় একান্তই অলীক বা অসৎ বস্তু। অনন্তর ঐ আকাশময় চিদণু স্বীয় দেহের কোথাও মস্তক, কোথাও চরণ এবং কোথাও বা বক্ষ কল্পনা করে। এইরূপে সমস্ত অবয়বকল্পনার পর ভাব, অভাব, আদান, উৎসর্গ, এই সমুদায়—ভেদজ্ঞানের আধারভূত দেশকালাদি-নিয়ন্ত্রিত পুষ্টাকার কল্পনাবলে নির্ণয় করিয়া লয়। ক্রমে উহার ঐ আকার ইন্দ্রিয়সমূহে পরিচালিত হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়। অতঃপর ঐ চিদণু আত্মকল্পিত করচরণাদি-বিশিষ্ট আকার অবলোকন করে। এইরূপে সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হয়; ওদিকে কৃমিকীটও হইয়া থাকে। ফলে আবার কিছুই হয় না;—যেমন, তেমনই থাকিয়া যায়; শূন্যে শূন্য—জ্ঞানে জ্ঞান বিরাজ করে। ব্যষ্টিভূত কল্পিত চিদণুর সমষ্টিভূত চিদণু—ব্রহ্মা; তিনি ব্যষ্টিভূত দেহের

আধারস্বরূপ এবং ত্রিলোকরূপ লতার বীজভূত। মুক্তিদ্বারে সৃষ্টি-অর্গল তিনিই প্রদান করেন। এই সংসাররূপ বারিধারার মেঘস্বরূপ তিনিই। তিনিই সর্ব্বকার্য্যের মূল, কাল-ক্রিয়াদির নেতা এবং সমুদায়েরই আদি পুরুষ। তিনি বস্তুগত্যা অনুৎপন্নই, তথাচ উৎপন্ন বলিয়াই প্রতীত। তাঁহার নাই কোন ভৌতিক দেহ,—নাই দেহে অস্থিসঞ্চয়। কেহ যে তাঁহাকে মুষ্টিগ্রাহ্য করিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। সুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যেমন মেঘের, সাগরের বা সিংহাদির গর্জ্জন শ্রবণ করে—করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বস্তুতঃ নীরবেই অবস্থান করিতে থাকে, তেমনি তিনি যদিও বিরাটদেহ, তথাচ আপন নিষ্প্রপঞ্চ সূক্ষ্ম দেহেই নিত্যাবস্থান করেন। স্বপ্নে যে সকল যোদ্ধৃ পুরুষ দেখা যায়, জাগরিতাবস্থায় তাহাদের কোলাহল স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায় তাহা যেমন অসৎ বোধ হয় না এবং সৎ বলিয়াও প্রতীত হইতে পারে না, তেমনি এই জগৎপ্রপঞ্চ তৎসমীপে সৎ বা অসৎ কিছুই নহে। তাঁহার বিশাল দেহের পরিমাণ বহু লক্ষ যোজন এবং তাঁহার রোমকূপ মধ্যেই এই ত্রিজগৎ বিরাজমান, তথাচ প্রকৃত দৃষ্টিতে তিনি পরমাণুমধ্যেও বিরাজিত। সকল কুলাচলরূপ গুণ-রাজি-বদ্ধ জগদ্‌-বৃন্দই তাঁহার স্বরূপ; তথাচ তিনি এতই সূক্ষ্ম যে, যাহা বটবীজ-মিত সূক্ষ্ম ছিদ্র, তাহাও পূর্ণ করিতে অক্ষম। তিনি শত শত কোটি জগদাকারে বিস্তার পাইতেছেন; তথাচ তাঁহার যে অণুপ্রমাণতা—তাহাই আছে। ফল কথা, স্বপ্নাবলোকিত পর্ব্বতবৎ তিনি যে কোন কোন স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থিত, সেরূপও নহেন। তাঁহারই নাম স্বয়ম্ভু; তিনিই বিরাট-আখ্যায় অভিহিত। তাঁহাকেই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। অথচ বস্তুগত্যা বুঝা যাইবে—তিনি নির্ম্মল আকাশময়। তিনিই রুদ্র, তিনিই সনাতন। ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বায়ু ও বারিধি ইত্যাদি নাম তাঁহারই। অগ্রে তিনি অণুপরিমিত সূক্ষ্ম চৈতন্য, তৎপরে তিনি তেজোময় চিত্তস্বরূপ। অনন্তর তিনি বিরাট কলেবর পরিগ্রহ করিয়া 'এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই আমি' এইরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি স্পন্দসঙ্কল্পে স্পন্দানুভব করেন। তদীয় অনুভূতিলব্ধ স্পন্দ পবন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বাতস্কন্ধাদি সপ্তবিধ বায়ুচক্রাকারে অবস্থিত আছে। ঐ বাতস্কন্ধকেই তাঁহার প্রাণ ও

অপান বায়ুর স্পন্দ বলা হয়। তিনি সঙ্কল্পগুণে প্রথমেই উহা স্পন্দাকারে অনুভব করেন। বালকের যেমন পিশাচকল্পনা, তেমনি তাঁহার চিত্তে মিথ্যা তেজঃকণার কল্পনা হয়। সেই কল্পিত তেজঃকণাই ঐ আকাশের রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল। তদীয় জঠরকোটর হইতে প্রাণাপান পবন প্রবাহিত হয়, তাহারই গতাগতিরূপ দোলা ঐ বাতকন্ধ। তাঁহার সুবিশাল বক্ষস্থল—জগৎ। প্রতি জীবগত বাসনাগুণে যে বিভিন্ন ব্যষ্টিভূত দেহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং আপ্রলয় যাহা হইয়া আসিতেছে, এতৎসমুদায়েরই আদ্য বীজ তিনিই। তিনিই সমগ্র ব্যষ্টি জীবের বাসনা; এই নিমিত্ত তাঁহা হইতেই সমুদায় বাসনাময় ব্যষ্টিদেহের উৎপত্তি এবং তাঁহারই অভ্যন্তরে অবস্থিতি। তিনি আদি বীজ; তাঁহার চৈতন্য আদি বীজেও যেমন ছিল, এখনও প্রত্যেক জীবে তেমনি রহিয়াছে। সেই দেব হিরণ্যগর্ভ; তাঁহার ইস্ট চৈতন্য সর্ব্বত্রই একভাবে বিরাজিত। তাঁহার শ্লেষ্মা—চন্দ্র, পিত্ত—সূর্য্য, বায়ু—দেহপবন, গ্রহনক্ষত্র—নিষ্ঠীবনবিন্দু, পর্ব্বতরাজি—অস্থি, মেঘবৃন্দ—মেদোমাংস, ব্রহ্মাণ্ডকটাহের উর্দ্ধভাগ—মস্তক এবং অধোগত কপাল তাঁহার চরণ। দূরে—অতিদূরে—আমাদের চক্ষুর অগোচরে এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ অবস্থিত; সেই আবরণই তাঁহার দেহত্বক্।

রামচন্দ্র! জানিবে, এই জগৎ ঐ বিরাটাকৃতি ব্রহ্মারই কল্পনাময় দেহ। অতএব কি আকাশ, কি শৈল, কি সাগর, কি মেদিনীতল, সকলই বিশদাকার এবং শান্ত শিব।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ব্রহ্মার কল্পনায় সেই পাষাণাভ্যন্তরে যে জগৎ দর্শন করিয়াছিলাম, সেই জগৎস্বরূপ ব্রহ্মাদেহের অবয়ব-সংস্থানের ব্যবস্থাবৈশিষ্ট্য কি প্রকার? তাহা এখন বিশেষভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা পরম চিদাকাশাখ্যায় অভিহিত, তাহাই সেই বিরাট ব্রহ্মার দেহ।

এ দেহের না আদি, না মধ্য, না অন্ত, কিছুই নাই। এই যে জগদাকার দেহ, ইহা তাঁহার চিদাকাশ দেহের নিকট অতি তুচ্ছ। স্বীয় কল্পনা জন্য ব্রহ্মাণ্ড-দেহের বহির্ভাগে ঐ ব্রহ্মাই সঙ্কল্পশূন্য ভাবে সাক্ষী চিদাকাশরূপে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় কল্পনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করেন। তিনি প্রথমে তৈজসাকার ধারণ করিয়া পরিপুষ্ট হন, পরে স্বীয় সঙ্কল্পময় তৈজসাণ্ডকে বিহঙ্গাণ্ডবৎ দ্বিধাভিন্ন করিয়া দেন। ঐ অণ্ডের এক আকাশময় ভাগকে তিনি ঊর্দ্ধভাগ এবং নিম্নগত পৃথিবীরূপ ভাগকে অধোভাগ বলিয়া কল্পনা করেন। ঐ ঊর্দ্ধাধঃ ভাগদ্বয়ই তাঁহার স্ব-স্বরূপ। উক্ত ভাগদ্বয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধ ভাগই তাঁহার মস্তক এবং অধোভাগই তাঁহার চরণ। যে ভাগ মধ্য-স্থিত, তাহা ঐ ব্রহ্মার নিতম্ব। ঊর্দ্ধাধোভাগের যে মধ্যভাগ, লোকে তাহা অনন্ত বিস্তৃত শ্যামবর্ণ আকাশাকারে দর্শন করে। ব্রহ্মার তালুদেশ—স্বর্গ, নক্ষত্র নিকর—শোণিতবিন্দু, এবং দেব-দানব-নর তদীয় দেহগত বুদ্ধি ও প্রাণপবনের ক্ষুদ্র বৃত্তি। ভূত, প্রেত ও পিচাশদল তাঁহার দেহমধ্যগত কৃমিকুল। চন্দ্র ও সূর্য্য লোক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ সকল উহার দেহের ছিদ্রসমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের অধোগত খণ্ডের যে তলদেশ, তাহা উহার চরণ-তল। পৃথ্বীর অধঃস্থিত যে পাতালকোটর, তাহা উহার জানুসন্ধি। জলগতি চঞ্চল সাগর ও দ্বীপরূপ কাঞ্চীদাম-জড়িত ভূমণ্ডল তদীয় দেহমধ্যগত জঘন ও নিতম্ববিম্ব। কলকলনাদিনী নদীসকল তাঁহার দেহাভ্যন্তরচারিণী শিরাসন্ততি। সেই সকল নদীর সলিলই ঐ শিরাসমূহের মধ্যাবস্থিত রস। জম্বুদ্বীপ ব্রহ্মার হৃদয়পদ্ম, সুমেরু সে পদ্মের কর্ণিকা, শূন্য দিঙ্‌নিচয় উহার উদর, শৈলকুল তদীয় দেহমধ্যগত যকৃৎ ও প্লীহাপ্রভৃতি। ঐ যে কোমল মেঘমণ্ডল, উহাই তাঁহার মেদোমাংস, চন্দ্র এবং সূর্য্য এই দুইটী উঁহার নয়নযুগ্ম, ব্রহ্মলোক উঁহার মুখ, সোমরস—শুক্র, হিমাচল—শ্লেষ্মা, অগ্নি-লোক এবং বাড়বাগ্নি—পিত্তরাশি, আবহ-নিবহাদি যে সকল মহাবায়ু বাত-স্কন্ধ আখ্যায় অভিহিত, উহারা তাঁহার হৃদয়গত প্রাণাপানাদি বায়ু। কল্প-তরু-বন, অন্য কানন, উপবন ও সরীসৃপাদি তির্য্যক্‌গণ তদীয় দেহের লোম-রাজি, ঊর্দ্ধগত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তাঁহার প্রকাণ্ড মুণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ খণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত যে প্রদীপ্ত জ্যোতি, তাহাই তদীয় মস্তকশিখা। ইনি

স্বয়ংই মন; তাই ইঁহার ভিন্ন মনঃকল্পনা নাই। ইনিই কল্পিত মন; এই মনই নিখিল বিষয়ের ভোক্তা। আত্মা কোথাও কিছুর ভোক্তা নহেন। ইনি আপনিই ইন্দ্রিয়বর্গ; তদিতর পৃথক্ ইন্দ্রিয় ইঁহার নাই। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহারই কল্পনা; মন ও ইন্দ্রিয় একই কথা। অবয়ব-অবয়বীর ন্যায় মনে ইন্দ্রিয়ে পার্থক্য কিছুই নাই। স্বপ্নেও দেখা যায়, একমাত্র মনই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয় নিচয় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। তখন একমাত্র মনই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকার ধারণপূর্ব্বক কল্পিত বস্তু অবলোকন করে। জাগতিক নিখিল লোককার্য্যই তাঁহার কার্য্য; তদীয় সঙ্কল্পই সকল পুরুষের বেশে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে। পরন্তু আমাদের জনম-মরণে তাঁহার জনম-মরণ নাই। জীবসমষ্টিভূত জগতের যে জনন-মরণ, তাহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু নামে নিরূপিত। তদ্ব্যতীত জনন মরণান্তর তাঁহার আর নাই। কেন না, এই যে জীবসমষ্টিরূপ জগৎ, ইহাই আমাদের সেই সঙ্কল্পস্বরূপ ব্রহ্মা বৈ আর কেহই নহেন। তদীয় সত্তাযোগেই জগৎসত্তা, আর তাঁহার মরণেই জগতের মরণ। বায়ু ও বায়বীয় স্পন্দের সত্তা যেমন অভিন্ন, এই জগৎ ও ব্রহ্মার সত্তাও তেমনি পৃথক্ নহে—একই। জগতে ও বিরাট ব্রহ্মায় ভেদ নাই। সেই বিরাটই এই জগৎ। জগৎ, ব্রহ্মা ও বিরাট, এই শব্দত্রয় একার্থবাচক। যাহা বিশুদ্ধ চিদাকাশ, তাহারই উহা সঙ্কল্পমাত্র।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বুঝিলাম—সেই বিরাট ব্রহ্মা সঙ্কল্পস্বরূপ হইয়াও সঙ্কল্পের বশেই সাকার হইতে সক্ষম হন। পরন্তু তিনি স্বীয় দেহাভ্যন্তরে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিলেন কিরূপে? এই বিষয়টী আমি এখনও ধারণা করিতে পারি নাই। ইহা আর একবার আমায় বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রামচন্দ্র! ধ্যানাবস্থায় তুমি যেমন নিজ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত হও, আমাদের সেই যিনি সঙ্কল্পরূপী পিতামহ, তিনিও তেমনি দেহমধ্যেই বিরাজ করেন। যাঁহাদের বিবেক আছে, তাঁহারা স্পষ্টই অনুভব সহকারে দেখেন যে, দেহাভ্যন্তরে এ দেহের প্রতিবিম্ববৎ আর একটা দেহ অবস্থান করিতেছে। সেই দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, তুমিও যখন নিজ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে পার,

তখন অস্মদীয় পিতামহ সেই সঙ্কল্পময় ব্রহ্মা স্বীয় দেহাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিবেন কেন? স্থাবর জীব স্বীয় বীজ—দেহমধ্যে থাকিতে পারে, আর ব্রহ্মা তাঁহার কল্পনাত্মক চেতন দেহে থাকিবেন, এ পক্ষে আশ্চর্য্য আছে কি? ব্রহ্মাণ্ডাকারে ব্রহ্মা সাকার আর আকাশাকারে নিরাকার, যাহাই হউন, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান। তিনি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডাকারে বাহিরে এবং 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ব্যষ্টি-সমষ্টি ভৌতিকাকারে অন্তরে। তিনি আত্মস্বরূপে আত্মারাম, কাষ্ঠবৎ মৌনী এবং পাষাণবৎ জড়াকারে অবস্থিত। এইরূপে কেবল যে ব্রহ্মারই অবস্থান, তাহা নহে; যিনিই তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই এভাবে অবস্থান করেন। তত্ত্বজ্ঞ বড়ই অপরাধ-সহিষ্ণু; কেহ তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেও তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবেই অবস্থান করেন। তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র কোপোদ্রেক হয় না। কেহ যদি তাঁহাকে রুদ্ধ করে বা তদীয় অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া দেয়, তথাচ তিনি যেমন—তেমনই ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। নানা কার্য্যে জড়িত থাকিলেও অন্তরে তিনি পাষাণবৎ অটল অচলভাবেই অবস্থান করেন। হর্ষ, ক্রোধ বা বিষাদ কোন কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিকৃতি কখনই হয় না।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি ব্রহ্মলোকের সম্মুখে থাকিয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—পশ্চাৎদিক হইতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অপর এক প্রখর সূর্য্য সমুদিত হইতেছেন, মনে হইল—যেন দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইয়াছে, যেন গিরিকাননে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়াছে, যেন বহ্নিলোক আকাশপথে আসিয়াছে, অথবা যেন সমুদ্রবক্ষে বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতঃপর আরও দেখিলাম—নৈঋত ভাগে আরও একটা সূর্য্যের অভ্যুদয় হইতেছে। ক্রমশঃ

দক্ষিণে, অগ্নিকোণে, পূর্ব্বদিকে, ঈশান কোণে, উত্তরদিকে, বায়ুকোণে, পশ্চিমদিকে, এইরূপে সর্ব্বদিকেই সূর্য্যোদয় দেখিলাম—দেখিয়া অতীব বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইতে লাগিলাম। অনন্তর এই সকল দুর্দ্দৈবের বিষয় আলোচনা করিতেছি, ইতি মধ্যে সমুদ্র হইতে বড়বাগ্নিবৎ ভূতল হইতে আরও একটা সূর্য্য অভ্যুদিত হইল। পরে দিঙ্মণ্ডলের অন্তরাল হইতেও উল্লিখিত সূর্য্যসমূহের প্রতিবিম্ববৎ আরও তিনটি সূর্য্যের অভ্যুত্থান অবলোকন করিলাম। সমস্ত সূর্য্যের মধ্যভাগে যে তিনটি সূর্য্য দেখিলাম, ঐ সূর্য্যত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই দেবত্রয়াত্মক রুদ্রেরই আকৃতি বলিয়া অবধারণ করিলাম। সেই সূর্য্যসমষ্টিস্বরূপ রুদ্রাবয়বের তিনটী নয়ন দেদীপ্যমান। উহা দ্বাদশ দিবাকররূপে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। যেমন দাবদহনে শুষ্ক বন দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যেন দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। জগতের সমস্ত রসাংশ শুষ্ক হইয়া গেল। দারুণ নিদাঘ-তাপ উপস্থিত হইল। নাই অগ্নি—নাই আধার, তথাচ সহসা অগ্নিদাহ হইতে লাগিল। সেই অগ্নিদাহবৎ রবিকরনিকর-তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ তাপিত হইলে মনে হইল, যেন দাবানলেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম। অনন্তর সেই স্থান পরিহারপূর্ব্বক সবেগে ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইলাম। আকাশের অত্যূর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দেখিলাম—প্রখরকর দ্বাদশ দিবাকর দশদিকে উদিত হইয়া অসহ্য কঠোর তাপ বিস্তার করিতেছেন। নভস্তলগত নক্ষত্রনিকর দিঙ্মণ্ডলবিসর্পী বহ্নিশিখার ন্যায় পিণ্ডীভূতভাবে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সপ্ত সমুদ্র গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিখিল জগৎ ও সমগ্র পুর নগর যেন শিখা-সমালীঢ় অঙ্গারস্তূপে আকীর্ণ হইয়া গেল। বহ্নিশিখাসম রক্তাক্ত পটবিস্তারে দিঙ্মণ্ডল সিন্দূরলিপ্তবৎ প্রতিভাত হইল। দিক্পতিগণের প্রজ্বলিত বাসভবনে বিদ্যুৎসকল পটবৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চটচটা-শব্দে গৃহশ্রেণী বহ্নিদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। ভূতলোত্থিত শিলাসম দণ্ডায়মান ধূমস্তোমে সমগ্র জগদ্ভবন যেন অসংখ্য কাচস্তম্ভ দ্বারা বিদ্যোতিত হইল। দহ্যমান জীবগণের গগনভেদী গভীর চিৎকারে চারিদিক্ ভীষণতায় পর্য্যবসিত হইল। দগ্ধদেহ প্রাণিপুঞ্জ চতুর্দ্দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল। দগ্ধাবস্থায় গৃহ, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদির পতনে তদধোবর্ত্তী পদার্থপুঞ্জ

চটচটারবে স্ফুটিত হইতে লাগিল। যে দিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন করি, দেখি—কেবল দহ্যমান জলপ্রবাহই প্রধাবিত হইতেছে। দেখিলাম—ঊর্দ্ধাকাশ হইতে নক্ষত্রনিকর খসিয়া পড়িতেছে; তাহাদের পতনাঘাতে ধরাতলের রত্নরাজি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি মৃত প্রাণী পড়িয়া রহিয়াছে; তাহাদের দেহ সকল চটচটা শব্দে বহ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। মৃতদেহের পূতিগন্ধে সেই সেই স্থান বাসের অযোগ্য হইয়াছে। মহাসমুদ্রের জলরাশি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া টগবগ রবে ফুটিতেছে। দেখিলাম—তাপতপ্ত জলজন্তু সকল ছটফট করিয়া নির্জ্জীব-ভাবে পড়িয়া আছে। সর্ব্বদিগ্‌দাহী বহ্নিদাহে পুরবাসী জনপ্রাণী সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মর্ম্মভেদী চিৎকার ক্রমেই শান্ত হইয়া যাইতেছে। দিগন্তগত পর্ব্বতবৃন্দ পুড়িয়া গিয়াছে। পতিত দিগ্‌গজঘটার দন্তরূপ স্তম্ভোপরি কত অর্দ্ধদগ্ধ পর্ব্বত লম্বিত আছে। পর্ব্বতসমূহের গভীর গহ্বরশ্রেণী হইতে অনর্গল ধূমরাশি কুণ্ডলীকৃতভাবে নির্গত হইতেছে। পতিত পর্ব্বতসমূহের ভারে পুরীশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিগহ্বররাজি পচপচ শব্দে অগ্নি-পাচিত হইতেছে। তাপতপ্ত প্রাণিসমূহের অনবরত পতনে সাগর ও শৈলরাজি যেন জ্বরাভিভূত হইয়া পড়িতেছে। কত দহ্যমানা বিদ্যাধরমহিলা বিদীর্ণবক্ষে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। অমর যোগিগণ পর্য্যন্ত বহ্নিদগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা অনবরত চিৎকার করিয়া পরিশ্রমভরে অবশেষে স্ব স্ব ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত মস্তকমার্গে নির্গমন করিতেছেন। পাতালবিবরেও বহ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতেছে। প্রতপ্ত সমুদ্রগর্ভে থাকিয়া মকরাদি ভয়ঙ্কর জলজন্তু সকল অগ্নিতাপে একেবারে সুসিদ্ধ হইতেছে। তাহাদের আকৃতিরও পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জলরূপ ইন্ধনাভাবে বাড়বাগ্নি সহস্রধা ভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। গগনচারিণী অপ্সরারাও দ্বাদশ দিবাকরের কিরণপুঞ্জে আক্রান্ত হইতেছে। দেখিলাম,—প্রলয়ানল যেন উজ্জ্বল শিখারূপ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে; তাহার গলায় যেন স্ফুলিঙ্গরূপ মাল্য দোদুল্যমান হইতেছে। এই অবস্থায় সে নটের ন্যায়

নৃত্য করিতেছে এবং কখন বা উদ্দাম যোদ্ধৃপুরুষের ন্যায় বিকট চিৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। মনে হইতে লাগিল, সমুদ্গত শিখা-পুঞ্জ যেন উহার ঊর্দ্ধ বায়ু এবং ধূমোদ্গম যেন উহার কেশপাশ। এই জগৎ যেন জীর্ণভবন; এখানে ঐ প্রলয়াগ্নি-নট এমনইভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিখিল বন, জঙ্গল, দ্বীপ, জল, স্থল, পুরী, পত্তন, সকলই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কি ভূবিবর, কি ভূমির ঊর্দ্ধ মহাকাশ, কি দশ দিক্, কি স্বর্গভূমি, সর্ব্বস্থানই অগ্নি-দাহে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। কি পুরী, কি সৌধাবাস, কি রম্য বাণিজ্য স্থান, সকলই জনশূন্য হইয়া পড়িল। সাগর, শৈল, শৈলশৃঙ্গ, এমন কি শৈলশৃঙ্গস্থ সিদ্ধসম্প্রদায় পর্য্যন্ত দহনদগ্ধ হইয়া লয় পাইতে লাগিল। দেব, দানব, নর, নাগ, নদ, নদী, সরোবর অধিক কি শূন্য দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত বহ্নিশিখায় শনশন্ শব্দে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। দিগ্‌বধূগণ বহ্নিশিখারূপ উজ্জ্বল কেশপাশ ধারণ করিল, তাহারা ভীষণ 'ভম্ ভম্' রবে ইতস্ততঃ ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া ধূলিকেলিকারিণী কুরঙ্গিণীবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। যে সকল গুহাময় স্থান ছিল, তাহা হইতে বহ্নিশিখা নিঃসৃত হইতে লাগিল। গুহার অভ্যন্তরগত জন্তুগণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধদেহে নির্গত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল কালানলদাহে হতশ্রী হইয়া গেল। সদ্যোবিনিঃসৃত রুধিরধারার ন্যায় লোহিতাভ বহ্নিশিখা দ্বারা তাহারা তখন স্থলপদ্মের অভ্যন্তরশ্রী ধারণ করিল। বিশ্বব্যাপী বহ্নিশিখা সকল ধক্ ধক্ শব্দ করিয়া রক্তপটবৎ চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল; ধারণা হইল, যেন সান্ধ্য বারিদপটলে নভো-মণ্ডল ঢাকিয়া গেল; অথবা যেন বিকাশপ্রাপ্ত কিংশুকবন উড্ডীন হইয়া আকাশস্থলী আবৃত করিয়া ফেলিল; কিম্বা বাড়বাগ্নি যেন সমুদ্রোপরি উত্থিত হইয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিল। তখন মনে হইতে লাগিল, যেন আকাশবন বিকশিত হইয়া উঠিল; কিম্বা নিখিল জগন্মণ্ডল যেন স্থলপদ্মময় হইয়া গেল। অথবা জগৎ যেন নবোদিত দিবাকরের কর-নিকরে পরিবৃত হইল। দেখিলাম,—হব্যবাহন যেন যুবা পুরুষের ন্যায় উদ্ধতভাবে কাননে বিচরণ করিতেছেন। নানাবর্ণের জ্বলন্ত শিখাজাল ও

ধূমস্তোমে তদীয় অপূর্ব্ব বেশবিরচন হইয়াছে। মনে হইতে লাগিল, অনন্ত দেব যেন সহস্র সহস্র ফণামণি বিস্তার করিয়া উত্থিত হইয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের ইচ্ছা ছিল যে, সূর্য্যের যেন অস্তোদয় না হয়। বাস্তবিক সে কালে তাহারই সেই ইচ্ছা যেন ফলবতী হইল। দক্ষিণ দিকে সহ্যাদ্রির উপরিভাগে যে বনরাজি ছিল, দেখিলাম, তাহাও তখন বহ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া গেল। বহ্নিদগ্ধ বৃক্ষশাখা সকল অঙ্গারস্তূপবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। সহ্যাদ্রির হুতাশনোপদ্রব তৎকালে একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডল সকলই অগ্নিময় হইয়া গেল; মধ্যে মধ্যে ধূমপুঞ্জের কালিমা ও অগ্নির শিখাজাল লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল, আকাশ যেন একটা সরোবর; তাহাতে রক্ত কমল ও কৃষ্ণ ভ্রমর পরিশোভমান। দেখিলাম—মৃত্যুরূপিণী নর্ত্তকীরা যেন বহ্নিশিখারূপ মালা ও ধূমোদ্গমরূপ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ বেশে তাহারা পর্ব্বতের গুহা, শৃঙ্গ ও আকাশ—সর্ব্বত্রই নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। পৃথ্বীর তলভাগে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; সেই অগ্নির উত্তাপে পৃথিবীর উপরিস্থ প্রাণিপুঞ্জ তপ্ত ধান্যবৎ ফুটিয়া ফুটিয়া নানাদিকে পতিত হইতেছে। পৃথ্বী যেন তখন একটা বৃহৎ ভর্জ্জনপাত্রবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। সেই প্রলয়কালে মনে হইল, জগৎলক্ষ্মী যেন স্বীয় বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন। আর পৃথ্বী যেন তদীয় করলগ্ন নানাবর্ণময় মণিমণ্ডিত কঙ্কণচ্ছটারূপে প্রতিভাত হইতেছে। সে কালে হুতাশদগ্ধ শৈল, তরু ও দেশ সকল যথাক্রমে চটচট, কটকট ও হলহল শব্দে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সাগর সকল বহ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া ফেনপুঞ্জ বমন করিতে করিতে স্বীয় সৌরকর-বিম্বিত বদনে তরঙ্গরূপ কর দ্বারা আঘাত দিয়াই যেন রোদন করিতে লাগিল। সাগর সকল দগ্ধ হইয়া নির্জ্জন সমতল দেশে পরিণত হওয়ায় মনে হইল, যেন পর্ব্বতাদি কোন কিছুই নাই; সকলই তাহারা গ্রাস করিয়া লইয়াছে। অথবা মূর্খ লোকেরা ক্রুদ্ধাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারিবার উপায়ান্তর না পাইয়া যেন মৃত্তিকা ও শিলাদি দংশন করিতেছে। মনে হইল, সাগরেরাই যেন আকাশ সকল গ্রাস করিয়াছে। শুনিলাম—পবনসঞ্চারে সাগরসমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তী

গুহাশ্রেণী হইতে অনবরত 'গুহ গুহ' শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। দেখিলাম—অন্তরীক্ষ হইতে সমস্ত লোকপালপুরী বহ্নিদগ্ধ হইয়া পতিত হইতেছে। সেই সকল দগ্ধ পুরীর প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি দ্বারা নানাদিক্ ও তথাকার গিরি-শিখরসমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে ঐ সকল স্থান অতীব ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। সুমেরুশৈলের সুবর্ণ সকল অগ্নির উত্তাপে গলিয়া গিয়াছে; আর সেই সমস্ত গলিত সুবর্ণদ্রবে তথাকার তরুলতা, কন্দর, প্রত্যন্ত পর্ব্বত, সকলই পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তাপবশে সমস্ত সুবর্ণই গলিয়া যাইতেছে। তাহাতে সুমেরু অতি রম্য শোভাই ধারণ করিয়াছে। দেখিলাম—এমন যে সেই তুষারময় হিমাচল, তাহাও তখন অনলতাপে ক্ষণমধ্যেই গলিয়া গিয়াছে। যেমন গলিত লাক্ষা, অবিকল তেমনই হিমাচল লক্ষিত হইল। সেই যে অতি বিষম বিপত্তির দিন, সে দিনও মলয়াচল মনোজ্ঞ সৌরভ ছড়াইতেছিল। বস্তুতঃ যাঁহারা মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁহারা বিপদের দিনেও স্বীয় অনন্যসাধারণ গুণগৌরব পরিহার করেন না। মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়েও মহাত্মারা পরের পরিতোষ জন্মাইয়া থাকেন। তাঁহারা কস্মিন্ কালেও কাহারও দুঃখের কারণ হন না। এই কথার সহিত উপমা দিয়া বলা যায় যে, মলয়াচলের চন্দনতরু সকল দগ্ধ হইয়াও স্ব স্ব সৌরভ বিস্তারে সে কালে জীবনিবহের আনন্দজনক হইয়াছিল। সুবর্ণ প্রলয়ানলে দগ্ধ হইল; কিন্তু নষ্ট হইল না—যেমন, তেমনই রহিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তে সেই চিরন্তন কথারই সত্যতা প্রতিপন্ন হইল যে, উত্তম বস্তু কদাচ অবস্তু বা নষ্ট হয় না। সে কালে সকল বস্তুই নষ্ট হইল; কিন্তু আকাশ ও সুবর্ণের নাশ কিছুতেই হইল না, এইজন্যই আকাশ ও সুবর্ণ শ্লাঘ্য পদার্থ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিল। আকাশ বিভু—সর্ব্বাপেক্ষা বহুস্থানব্যাপী; তাই তাহার বিনাশ অসম্ভব; ফলে যেখানে অন্য কোন বস্তুরই থাকিবার অবকাশ নাই, সেখানেও আকাশ বিরাজমান; আর সুবর্ণ শোধিত হইয়া সর্ব্ববিধ মলাদি দোষ হইতে সম্পূর্ণই বিমুক্ত; সুতরাং তাহারও আর ক্ষয় নাই। এই নিমিত্তই রজ ও তমোগুণ নিকৃষ্ট আর সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা হউক, তখন আরও দেখিলাম—ধূমাচ্ছন্ন শিখাময় সমুজ্জ্বল দহন,

মেঘ-শৈল-সাগর দগ্ধ করিয়া বায়ুবিচালিত বনশ্রেণীবৎ বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্ততঃ অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিলাম,—প্রলয়ানলের তীব্রোত্তাপে চতুর্ব্বিধ জীবজাতি শুষ্ক পত্রবৎ নীরস হইয়া গিয়াছে; অবশেষে একেবারেই দগ্ধ দশায় উপনীত হইয়াছে। ফলে প্রলয়ানলের প্রকোপে সজল জলদজাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল। যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর দোষ দেখা যায় না, তেমনি কোথাও কিছুমাত্র ভস্মাবশেষও দৃষ্ট হইল না। নিম্ন দিকের নিদারুণ বহ্নি জ্বলদাকারে উত্থিত হইতে না হইতেই রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় নয়নানলে কৈলাসশৈল দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা দগ্ধ হইয়া চটচটা শব্দে স্ফুটিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনে মনে হইল, পর্ব্বতগণ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভীষণ বহ্নিজ্বালা সশব্দে পর্ব্বতোপরি আলোড়িত হইলে, দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টিতে যেন পর্ব্বতের শিরোভূষণবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেখিলাম—আকাশ যেন রক্ত কমল বনের বিকাশস্থলী হইয়াছে। তখন আর সে পূর্ব্ব জগৎ নাই, তাহা একেবারেই শূন্য হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন জগৎসন্নিবেশ কেবল স্মৃতি-পটেই অঙ্কিত রহিল। যখন প্রলয়ানলে সমস্তই ভস্মীভূত হইতে লাগিল, মূর্খ লোকেরা জগতের অসারত্ব তখনই প্রত্যক্ষ অনুভব করিল।

এইরূপে ভীষণ বহ্নি যখন লোক সকল ধ্বংস করিয়া জগতের সত্তালোপে প্রবৃত্ত হইল, তখন জগৎ যে অসৎ, এ ধারণা বাস্তবিকই সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। কত প্রাণী বজ্রপাতে প্রাণ হারাইল। প্রলয়ের প্রবল প্রভঞ্জন চারিদিকে জ্বলদঙ্গারপুঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাতে নিম্নস্থল সকল গুল্মময় বলিয়া প্রতীত হইল। সেই ভীষণ প্রভঞ্জনের প্রবাহবেগে দেবগণ পর্য্যন্ত বিদলিত হইতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, উহা যেন বহ্নিমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সমুদায়কে গ্রাস করিতে লাগিল। যে সকল বৃক্ষ বহ্নিসংলগ্ন ছিল, তৎসমস্ত সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। প্রখর পবন আকাশে ভস্মরাশি বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত শূন্যস্থান যেন মেঘময় করিয়া ফেলিল। সে কালে এমন কোন স্থানই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, যথায় অঙ্গারস্তূপময় অগ্নিজ্বালা

দেখা গেল না। দেখিলাম—মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার বহ্নিপুঞ্জ পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। তাহার উপরিভাগে কজ্জলময় শিখাপুঞ্জ শোভা পাইতেছে। তখনকার সেই প্রবল পবনের এতই বেগাধিক্য যে, ক্ষণ মধ্যেই সে বেগে সর্ব্বত্র বহ্নিরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে প্রচণ্ড অগ্নির সহিত প্রচণ্ড পবন আসিয়া যোগদান করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর শৈলকুল কাঁপাইয়া কল্পান্ত-মারুত বহিতে লাগিল। সাগরকল্লোল প্রবলবেগে আকাশপথে সমুত্থিত হইয়া আবর্ত্তবৎ আলোড়িত হইতে লাগিল। সমুদ্রবারি উপরি উত্থিত হইলে, সমুদ্র শূন্যাকারে পরিণত হইল। এতকাল সাগরখাত সলিলধনে ধনাঢ্য ছিল; কিন্তু এখন সে ধনে বঞ্চিত হইয়া পড়িল। সমস্তই জলে জলাকার হইয়া গেল; তাহাতে পৃথিবীর জলাভাব-জনিত ক্লেশ একেবারেই দূরীভূত হইল। দেখিলাম,—ভূমণ্ডল অরাজক হইয়াছে; কোথাও জনপ্রাণী নাই; কালানলের প্রচণ্ড আক্রমণে সমস্তই ভর্জ্জিত হইয়াছে। যাহা রসাতল ছিল, কালবশে তাহাও রসাতলে গিয়াছে। তাহার এখন আর কিঞ্চিন্মাত্রও অস্তিত্ব দেখা যায় না। স্বর্গ কোথায় কিরূপ ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও এখন আর নাই। সৃষ্টিপরম্পরা সমস্তই ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বজগৎ সৌরালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। দিগ্‌বধূগণ যেন শোকসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। তখন পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি বারিদবৃন্দ বলগর্ব্বিত দানবদিগের ন্যায় সবেগে আকাশমণ্ডল আক্রমণপূর্ব্বক অতীব গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুহুর্ম্মুহু তাদৃশ গভীর গর্জ্জন শ্রবণপূর্ব্বক প্রতীত হইল, যেন ব্রহ্মা স্বীয় অণ্ডভিত্তি ভেদ করিয়া ফেলিয়াছেন; তাই এই প্রকার বিকট শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। উদ্ধত সমুদ্রবারির কল্লোলমালা পরস্পর আহত হইয়া যেরূপ গর্জ্জন করিতে

থাকে, তখন মেঘবৃন্দের তেমনই গর্জ্জন পরিশ্রুত হইল। তাৎকালিক মেঘধ্বনি মর্ত্ত্যে ও সাগরগর্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। কুলশৈলকুল দগ্ধ হইতেছিল, তাহাদের ঘোর গভীর চটপটা শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ মেঘধ্বনি আরও ভীষণভাব ধারণ করিল। উহা ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ পরিখার মধ্যভাগ পরিপূরণপূর্ব্বক তদীয় ভিত্তি-ভাগে আহত হইয়া বহির্ভাগে ঘনীভূতভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ ধ্বনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের প্রতিধ্বনি সহ মিলিয়া গিয়া যেন পল্লবিতাকারে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমগ্র দিগ্‌ভিত্তিতেই ঐ ভীষণ ধ্বনি প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সেইস্থান আকর্ষণ করিতে লাগিল। সপ্তসাগর মিশিয়া গিয়াছে; তাহাদের সম্মিশ্রণে যে এক অপূর্ব্ব পানীয় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াই ঐ ধ্বনি যেন চতুর্দ্দিকে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। ধারণা হইল, মহাপ্রলয় যেন সাক্ষাৎ দেবরাজ; তিনি এক্ষণে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার বাহন ঐরাবতই যেন এক্ষণে এইরূপ গর্জ্জন করিতেছে। আরও মনে হইল, বারিধররূপ সাগরসমূহ যেন মহাপ্রলয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া ঘোর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন এরূপও ধারণা হইল, যেন মহাপ্রলয়ক্ষুব্ধ ক্ষীরাব্ধির সমালোড়নে এ হেন মহাশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

তৎকালে আমি ঐরূপ গর্জ্জন শুনিলাম,—মেঘমালার দিকে তাকাইলাম, ভাবিলাম,—এই প্রলয়ানল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, ইহার মধ্যে মেঘ আসিল কোথা হইতে? অনন্তর চারিদিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিলাম—দেখিলাম—মেঘ কোথাও নাই; আকাশ হইতে কেবল অঙ্গারবর্ষণই হইতেছে। আকাশের সর্ব্বত্রই কেবল ভয়াবহ অগ্নিরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই অগ্নির উত্তাপবশেই শত শত কোটি যোজনের দূরস্থিত পদার্থপুঞ্জ ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। অতঃপর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম, মনে মনে অনুভব করিলাম—ঊর্দ্ধদেশের বায়ু শীতল হইয়াছে আর নিম্ন দিকের বায়ু অগ্নিবৎ উত্তপ্ত আছে। শীতল বায়ুর অধিষ্ঠানস্থানের দিকে দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম—প্রলয়ের মেঘমণ্ডলী অবস্থিত আছে। তাহাকে একটুকুমাত্র অগ্নির উত্তাপ স্পর্শিতেছে না। নিম্নে যে সকল লোক

আছে, তাহাদের দৃষ্টিপথে ঐ সমুদায় মেঘ পতিত হইতেছে না। অনন্তর দেখিতে দেখিতে পশ্চিম দিক্ হইতে ভয়ঙ্কর কল্পপবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, মেরু, হিমালয় ও বিন্ধ্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্ব্বত এক একটী তৃণগুচ্ছের ন্যায় সেই প্রবল পবনবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অগ্নিজ্বালারূপ শৈলসকল প্রবল পবন দ্বারা তৎক্ষণাৎ অগ্নি-কোণে পরিচালিত হইল। সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে অঙ্গাররূপ পক্ষিপাল উড্ডীন হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ সেই অঙ্গাররাশির মধ্যে মধ্যে এক একটা অরণ্যখণ্ডবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। অথবা যেন এক একটা পক্ষযুক্ত স্বর্ণশৈলই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ধরা ও ধরাধর সর্ব্বস্থানই অঙ্গারস্তূপে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দ্বাদশ দিবাকরের তেজ একইকালে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সাগরে সলিল নাই; আছে কেবল অগ্নিস্তূপ। যদি বা কোথাও কিঞ্চিৎ জল পাওয়া যায়, তবে তাহাও অগ্নিময় অতীব উত্তপ্ত জল। দেখিলাম, বনমধ্যে একটী মাত্র বৃক্ষপত্রও নাই, সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বৃক্ষেই আগুন ধরিয়াছে। তাহারা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুরী, তথাকার অন্যান্য দেবনিবহ—বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলই অগ্নিদগ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্থান হইতে আকাশে নিপতিত হইতেছেন। পরমাকাশ যেন সরোবর; তাহাতে প্রলয়ানল যেন পদ্মিনী; অঙ্গার উহার বীজ, স্ফুলিঙ্গ উহার কেশরকলাপ এবং জ্বালা উহার পল্লবদল; এইভাবে ঐ পদ্মিনী অপূর্ব্ব শোভায় অন্বিত হইয়াছে। বায়ু এতই প্রবলভাবে বহিতে লাগিল, তাহাতে বড় বড় গজ ও বড় বড় বৃক্ষ ব্যাহত এবং অঙ্গারপঙ্কে পতিত হইয়া পাতাল পর্য্যন্ত অবগাঢ় হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেখিলাম, কজ্জল-শ্যামল প্রলয়মেঘদল ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে ভূতল-সমীপস্থ নভোমণ্ডল প্রান্তে সহসা আসিয়া উপনীত হইল। ঐ মেঘমালার মধ্যে মধ্যে জাজ্বল্যমান বিদ্যুৎপুঞ্জ বিকাশ পাইতে লাগিল। দেখিলাম, ঐ মেঘমালার একটী কোণেই সপ্তসমুদ্রের সলিলরাশি অবাধে অবস্থিত হইয়াছে। রাশি রাশি নীহারপাতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মেঘমালার গভীর গর্জ্জনে সুদূর ব্রহ্মাণ্ডভিত্তি যেন বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে।

উহা দ্বাদশ দিবাকরকে মণ্ডলাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক তড়িৎপুঞ্জ সহ গভীর গর্জ্জনপুরঃসর উত্থিত হইতেছে। দেখিলাম,—এই প্রকার ঘোরতর প্রলয়াবস্থায় সমুদ্র সকল বিক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হইল, শীতকর সুধাকর যেন পূর্ব্বের সেই ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ শীতভাব পরিগ্রহপূর্ব্বক অন্য একরূপ হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মেঘমণ্ডলী সুবর্ণপ্রায় তড়িদ্গুণ-যোগে স্বীয় জলরাশি স্তম্ভিত করতঃ কাষ্ঠ হেন নিশ্চল করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ মেঘমালা হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিদারণক্ষম কঠোর বজ্রনাদ প্রাদুর্ভূত হইয়া নভোমণ্ডল তুমুল করিয়া তুলিল। আকাশ হইতে অনবরত চারিদিকে রাশি রাশি তুষারবৃষ্টি হইতে লাগিল। বনরাজির মধ্যে বিদ্যুদালোক প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল, যেন বনমধ্যে অগ্নিজ্বালা প্রবেশ করিয়াছে। মেঘসমূহের সুগভীর গুড় গুড় শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন দ্বিধা ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ঝম্ ঝম্ শব্দে চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে। সুশীতল তুষারধারা বর্ষিত হওয়ায় আকাশদেশ যেন প্রাচীর-পরিবৃত হইয়া উঠিয়াছে। স্থূলাকার জলধারা পড়িতেছে; তাহা যেন স্বর্গমর্ত্ত্যময় মণ্ডপের বৈদূর্য্যমণিময় স্তম্ভ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই জল-ধারার আঘাতে শৈলাহতবৎ ধরামণ্ডল ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। জ্বলন্ত অঙ্গাররাশিমধ্যে জলধারা-পতনে চটাপট্ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া লোকসকল মূর্চ্ছাগত, ভূপতিত ও ভয়ত্রস্ত হইয়া হাহাকার রব করিতেছে। দেখিলাম,—জলপ্লাবিত নভোমণ্ডলের মধ্যে-মধ্যে তখনও বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; তাহাতে আকাশতল স্থল-কমলমণ্ডিত কাননশ্রী ধারণ করিতেছে। তাৎকালিক বহ্নিশিখার উপরি উপরি জলধরপটল শীতল শীকররূপ পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক স্থল-কমলদলোপরি ভ্রমরনিকরবৎ প্রতিভাত হইতেছে। তৎকালে সেই ভীষণ মেঘ ও চটপট শব্দে দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনী বহ্নিজ্বালা সম্মিলিত হওয়ায় মনে হইল যেন দুর্ব্বার বিপক্ষ পক্ষের পরস্পর অস্ত্রসমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ-পুরঃসর ভয়ঙ্কর প্রবল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তৎকালে পৃথ্বী, জল, তেজ ও পবন, এই ভূত-চতুষ্টয়ের বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহাতে 'এই ত্রৈলোক্যের যেপ্রকার অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিল, তাহা ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশে ভস্মবিলিপ্ত মেঘদল উড্ডীয়মান তমালবনবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। মহাসাগরের মহাবর্ত্তে পতিত হইয়া ধূমরাশি ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। দেখিলাম,—আর্দ্র বস্তুর উপরি উপরি ধূমায়মান অনলশিখা টিম্ টিম্ ইত্যাকার শব্দ তুলিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ধূমময় মেঘদলে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন যে ছম্ ছম্ শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল, তাহা যেন বৃষ্টিধারার জয়ঘোষণাকারী পটহধ্বনিবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। ভস্মবিলিপ্ত মেঘমালায় আকাশ ধূসরাভ হইয়া উঠিল। বৃহৎ বৃহৎ মেঘবৃন্দ চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতে লাগিল, বাষ্পব্যপদেশে ভীষণ মেঘমণ্ডল যেন জলবিন্দু সকল উদ্‌গিরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শন্ শন্ শব্দে সমীর সমুত্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভিত্তিভাগে প্রতিহত হইতে লাগিল, বায়ুভরে বহ্নিজ্বালা উর্দ্ধোত্থিত হইল, তাহাতে নিখিল লোকপাল-পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। জল, অনল ও অনিল, এই ভূতত্রয়ের বিষম সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহাতে পাষাণখণ্ড সকল দীর্য্যমাণ হওয়ায় ঘন ঘন টঙ্কাররবে লোকনিচয়ের কর্ণবিবর বধির হইয়া গেল। আকাশের স্তম্ভদণ্ডবৎ স্থূল স্থূল জলধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহাতে প্রলয়পবন আলোড়িত হওয়ায় ছম্ ছম্ শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। যেন গঙ্গারূপ ক্ষুদ্র তরঙ্গশালিনী তটিনীকুলই ভীষণ মেঘমালারূপে আকাশে উত্থিত হইয়া সমগ্র জগৎ জলে জলাকার করিয়া তুলিল। কল্পান্তকালীন মেঘ-বৃন্দের উপরিভাগে দ্বাদশ দিবাকর প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল; তাহাতে মনে হইতে ছিল, যেন তমালপত্রোপরি প্রস্ফুট পুষ্পগুচ্ছ সকল অবস্থিত হইতে লাগিল। প্রবহমাণ গিরিনদীসলিলে নগ, নগর, দ্বীপ প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ স্থান প্লাবিত হইয়া গেল। প্রলয়ে বিষম বাত্যা ও দারুণ বর্ষাপাত

হইতে লাগিল, তাহাতে ভূধরনিকর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ পরস্পর আহত হইয়া আবর্ত্তাকারে পতিত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল এবং আকাশোড্ডীন অঙ্গাররাশিকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড প্রভঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইলে তৎকর্ত্তৃক সমাহত উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজির সজ্ঘর্ষ বশতঃ জলমধ্যগত পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কল্পান্ত-কালীন জলধর সকল ঘন বিন্দুময় বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সৌর কিরণপুঞ্জ আচ্ছন্ন করিয়া চারিদিক্ অন্ধকারিত করিয়া ফেলিল। সেই গাঢ়ান্ধকারে পথ প্রান্তর সকলই রুদ্ধ হইয়া গেল। ভূমণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। পৃথিবীর চতুষ্পার্শ ভগ্ন হইল—হইয়া জলধিগর্ভে পতিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তীরগত পর্ব্বতবৃন্দও সাগরগর্ভে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহাতে সাগর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। তৎকালে জলগ্রহণের জন্য যে সকল মেঘদল সাগরে আসিয়া মগ্ন হইয়াছিল, তাহারা তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ও চূর্ণ হইতে লাগিল। জলগত মেঘশ্রেণী হইতে অশনিনির্ঘোষ উত্থিত হইতে লাগিল। সাগরের তরঙ্গনাদ সেই অশনিশব্দের সহিত মিশিয়া গিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, তাহাতে দিক্‌কুঞ্জ যেন ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে লাগিল। প্রলয়ের মেঘদল যেন বিশাল বৃক্ষ; তদীয় শাখারূপ ভুজবৃন্দের আস্ফালনে ঘোর নিনাদ উত্থিত হইতেছিল, সেই সঙ্গে এক একটা কটু টঙ্কার-ধ্বনি উদ্ভূত হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডভিত্তির মধ্যস্থল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল, এই স্থানত্রয় বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। সেই মিশ্রিত খণ্ডগুলি আবার মরুভূমি প্রায় শুষ্ক ও নীরস হইয়া আকাশে উড্ডীন হইল এবং আকাশপথ আবৃত করিয়া ফেলিল। দেব ও দানবেরা বায়ুবেগে চালিত হইয়া পথিমধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় পরস্পর প্রহারার্থ অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ প্রলয়াগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, কেহ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল, এবং কেহ কেহ বা দগ্ধদেহে পলায়ন করিল। কল্পান্ত পবনে পরিক্ষিপ্ত ভস্মরাশি আকাশে উড্ডীন হইয়া ঘুরিতে লাগিল। গলিত জীর্ণ পত্ররাশির ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন প্রাণিবৃন্দ

ভস্মমধ্যে উড়িয়া যাইতে লাগিল। যে সকল লোকালয় ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, তাহারা ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত শিলাসঙ্ঘের আঘাতে ভগ্ন ও বিচূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে নিম্নদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। দেখিলাম,—কোথাও চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবল বায়ু আসিতেছে, একত্র মিলিতেছে এবং গুরু গভীর শব্দ করিয়া গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। কোথাও বা লোক-পালগণের পুরী সকল বায়ুবেগে উৎপাটিত হইয়া আকাশপথে আবর্ত্তা-কারে ঘুরিয়া পড়িতেছে। কোথাও অসুরবৃন্দের ন্যায় কটু কর্কশ শব্দ করিয়া প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। কোথাও ঊর্দ্ধোত্থিত বনাবলী বায়ুবেগে পরিচালিত হইয়া গৃহের গবাক্ষশ্রেণীর ন্যায় প্রতীত হইতেছে। দেব, দানব, নাগ, দ্বাদশ দিবাকর ও অগ্নিদগ্ধ পুর গ্রাম, সকলই আকাশে মশকপালের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। দেখিলাম,—প্রবল ঝঞ্ঝানিলে ও বর্ষণে ভগ্ন বিচূর্ণিত গিরিসমূহের বিশালতা হ্রাস পাইয়াছে। দেবমন্দির সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধে জল আছে, নীচে অনল আছে। উপরি প্রবাহিত জল ঘোর গভীর শব্দ করিয়া অধোমুখে ছুটিয়া আসি-তেছে। ঘোরতর বারিপাতে ও ভগ্ন বিচূর্ণিত পর্ব্বতপতনে দিক্পাল-পুরী সকল সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেব-দানব সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-গণের ভবনাবলী পড়িয়া ভূমিসাৎ হইতেছে। অগ্নিদাহে পর্ব্বতসকল অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম,—দেব দানবদিগের রত্নময় গৃহগুলির ভিত্তিভূমি গলিয়া যাইতেছে, পতিত রত্নরাজির ঝন্ ঝন্ শব্দে দিক্সকল মুখরিত হইতেছে। ঊর্দ্ধগত সপ্তলোক হইতে অধোদেশে জলরাশি পতিত হইতেছে। সপ্তলোক হইতে পতিত ভবন ও জনসমবায়ে গগনতল ভরিয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধপথ হইতে পতনোন্মুখ সুরসমূহ সাগরপ্রবাহবৎ আবর্ত্তযুক্ত হইয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে। ঊর্দ্ধ হইতে পতিত অর্দ্ধদগ্ধ পদার্থপুঞ্জ প্রবল বায়ুবিতাড়নে বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুবর্ণ, বৈদূর্য্য ও স্ফটিকমণিময় দেবনিকেতন সকল ঊর্দ্ধ হইতে ঝন্ ঝন্ রবে পতিত হইতেছে। ভস্মধূমময় মেঘরাজি ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতেছে। চারিদিকে বারিধারার প্রবাহ ছুটিতেছে,—তরঙ্গ-মালা বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ভূতল ও ভূধরনিচয় জলে ডুবিয়া যাই-

তেছে। মহদাকার মহীধর সকল প্রবল জলপ্রবাহে ভাঙ্গিয়া গিয়া সাগর-গর্ভপতিত পর্ণপুঞ্জবৎ খণ্ড-খণ্ডাকারে ঘূর্ণমান হইতেছে। নষ্টাবশিষ্ট সুরগণ ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছেন। কোন কোন স্থানে মুমূর্ষু প্রাণিবৃন্দ পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। দেখিলাম—শত শত ধূমকেতু আকাশে উঠিয়া ঘুরিতেছে। দেখিলাম,—জগৎ তখন সম্পূর্ণ ভীষণ দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মৃত ও অর্দ্ধমৃত জনগণ দূর হইতে জীর্ণ পর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং বায়ুবিতাড়নে আকাশে উত্থিত হওয়ায় আকাশতল নিরবকাশ হইয়া গিয়াছে। গিরিশৃঙ্গবৎ স্থূল জলধারা সকল পতিত হইতেছে। ভূতল দিয়া শত শত নদী বহিতেছে। সেই নবসমুদ্ভূত নদী-নিচয়ে আলয় ও অচল সকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলাম,—পূর্ব্বে যে ভীষণ হব্যবাহন সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া ছম্ ছম্ শব্দে জ্বলিতেছিল, দারুণ বর্ষাপাতে অধুনা তাহা একেবারেই শান্ত হইয়া গেল। বৃহৎ বৃহৎ ভূধরনিকরের উপর দিয়া প্রখরতরবেগে সাগরপ্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। তৃণগুচ্ছ যেমন নদীস্রোতে নিপতিত হইয়া খণ্ডখণ্ডাকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি তাৎকালিক ভীষণ সংঘর্ষের ফলে নিখিল জগৎ সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একার্ণবাকারে পরিণত হইল। চিদাকাশের তেজঃপ্রকর্ষে যে জগৎ ক্ষণমধ্যেই নাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ভীষণ প্রলয়ের ফলে তাহার যে একেবারেই বিলয় ঘটিল, ইহা একটা বড় বিস্ময়াবহ ব্যাপার নয়। অজস্র বর্ষাধারাপাতে প্রলয়াগ্নি প্রশান্ত হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকেই ভস্মরাশি উড়িতে লাগিল। সেই ভস্মসহ সুরগণও নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন; জগতের অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইল। জগৎ সে কালে একটা ভূতপূর্ব্ব পদার্থমধ্যে পরিগণিত হইল। হতাবশিষ্ট জীবগণের স্মৃতিপথেই কেবল জগদ্ব্যাপার জাগরূক রহিল। শূন্যময় প্রবলতর প্রভঞ্জন বহিয়া অনবরত কেবল একটা শাঁ শাঁ শব্দই পরিশ্রুত হইতে লাগিল। জগতের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল, কাজেই সমস্ত শান্তিময় হইয়া গেল। এবারে বস্তুতই সৃষ্টিব্যাপার বিলুপ্ত হইল। তখন একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট রহিলেন। তদ্ব্যতীত সৃষ্টি বলিয়া আর যে কোন একটা পদার্থ আছে, তাহা তখন বোধই হইল না। সত্যই বটে, সৃষ্টিনামে

কোন পদার্থসত্তা নাই। এই বিপর্য্যাস ঘটাইবার একমাত্র কারণ পবন। পবনই কোথা হইতে বীজরাশির ন্যায় এই জগদভিধেয় একটা অলীক পদার্থ উড়াইয়া লইয়া আসিয়াছে। আবার নিজের ইচ্ছামাত্র ইহাকে লয় করিয়া ফেলিতেছে। যাহা হউক, তৎপরে আমি আবার দেখিলাম,— আকাশগত অঙ্গাররাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায় স্বর্ণচূর্ণবৎ প্রতিভাত হইল; সুতরাং আকাশমণ্ডল তখন স্বর্ণকুটীরময় হইয়া উঠিল। ভূমণ্ডল নামক বিপুল জগৎখণ্ড তৎকালে অপরাপর দ্বীপ ও অম্বুধিসহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সপ্তম পাতালে গিয়া পড়িল। অন্যান্য পাতালপ্রদেশও তথায় পড়িয়া লুঠিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে সপ্তম পাতাল যাবৎ নিখিল ভূতল-ভূধরাদি সকলই একার্ণবাকারে পরিণত হইয়া প্রলয়ের প্রবল বাত্যায় আকুল হইয়া পড়িল। মূর্খ জনের চিত্তে যেমন ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি তরঙ্গসঙ্কুল সংখ্যাতীত সরিৎপ্রবাহে ঐ একার্ণব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রলয়ের সেই ঘোরতর বারিধারা অগ্রে মুষলবৎ, পরে এক একটা স্তম্ভবৎ, তৎপশ্চাৎ বৃহৎ বৃহৎ তালতরুবৎ, তদনন্তর নদীপ্রবাহবৎ পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে ভয়ঙ্কর মেঘমালা সপ্ত-দ্বীপসমন্বিত সমগ্র ভূমণ্ডল সমাচ্ছাদনপূর্ব্বক অবস্থিত হইল। শাস্ত্রচর্চ্চা ও সৎসংসর্গের ফলে বিপদ যেমন দূরীভূত হইয়া যায়, তেমনি তখন প্রবল বারিবর্ষণে সেই দাহক দহন প্রশমিত হইয়া গেল। ঊর্দ্ধস্থ পদার্থপুঞ্জ অধঃপতিত হইল, আর অধোগত পদার্থ সকল ঊর্দ্ধে উঠিল। বিচূর্ণিত ভূধরনিকর পরস্পর প্রহত হইয়া খন খন রবে জলগর্ভে নিমগ্ন হইল। দুর্ব্বৃত্ত বালকের খেলার বস্তু হইয়া পক্কবিম্ব ফল যেমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলেরও তখন তেমনই দশাবিপর্য্যয় ঘটিল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এইরূপে যখন প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতে লাগিল ও বৃহদাকার করকাখণ্ড সকল পতিত হইতে লাগিল, তখন ধরিত্রীমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কলিকালোদ্ভব ভূপতির ন্যায় সলিলবেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আকাশতরঙ্গিণীর প্রবাহে ও অজস্র বর্ষাজলধারায় তাৎকালিক সেই একার্ণব ক্রমেই স্ফীতভাব ধারণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র সরিৎপ্রবাহ সেই একার্ণবের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। মেরু ও মন্দরাদি মহত্তর পর্ব্বত সকল একার্ণবজলে পতিত হইয়া মজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে লাগিল। মূর্খ মহীপতির ন্যায় সে অর্ণব এখন এতই স্ফীত হইয়া উঠিল যে, তাহার জলহিল্লোলে ভাসমান ভূধরবৃন্দের শৃঙ্গগুলি সৌরমণ্ডল গিয়া স্পর্শ করিল। মেরু মন্দর, বিন্ধ্য ও কৈলাসাদি যে সকল বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত জলাভ্যন্তরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহারা এখন একার্ণবের জলজন্তু বলিয়া প্রতীত হইল। অর্দ্ধদগ্ধ বৃক্ষাবলী জলোপরি ভাসিয়া ভাসিয়া শৈবালবনশ্রেণীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্ত প্রভৃতি ভুজঙ্গরাজগণ ধ্বস্ত গলিত ভূমিবিবরের পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়া কর্দ্দমাক্ত মৃণালদলবৎ অনুমিত হইতে লাগিলেন। দগ্ধ জগতের ভস্মস্তূপে একার্ণব তখন কর্দ্দমকালুষ্য ধারণ করিল। উদীয়মান দ্বাদশ দিবাকর একার্ণবগত কমলদলের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিলেন। সেই সৌরমণ্ডলরূপ কমলের দল হইল নভোমণ্ডল, আর কিরণপুঞ্জ উহার মৃণালনাল। পর্ব্বত সকল জলপ্রবাহে উন্মগ্ন হইয়া ভাসিতে লাগিল। তাহাদের প্রান্তভাগে থাকিয়া মেঘমালা উন্মত্তপ্রায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ও তাহাদের পুরপত্তন সকল উর্দ্ধ হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একার্ণবের প্রবাহোপরি পতিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, এককালে যে সকল দেবদানব প্রতাপান্বিত হইয়া অবস্থিত ছিলেন, এখন তাঁহারা জলপ্রবাহোপরি কাষ্ঠখণ্ডসমূহের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমেই সেই জলধিজল-

প্রবাহ স্ফীত হইল, ঊর্দ্ধে উঠিল এবং সৌরমণ্ডল স্পর্শ করিল। গভীর-গর্জ্জী জলধরনিকরের অতীব স্থূল বারিধারা সকল পতিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত পতিত ধারার প্রবাহে যে দীর্ঘ দীর্ঘ বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইল, দর্শকের চক্ষে সে সকল ভাসমান ভূধরনিকর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। কল্পান্তকালের বারিদমালা নানা দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই বুদ্বুদাবলীর উপর গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, একার্ণব যেন মেঘমণ্ডিত বুদ্বুদলোচন প্রসারিত করিয়া অন্যান্য মেঘ-রাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তৎকালিক মহার্ণবের মহাপ্রবাহ হইতে ভয়ঙ্কর নিনাদ উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ মহাপ্রবাহে আকাশ গ্রাস করিল; কুলাচলকুলও তাহাতে ডুবিয়া গেল। কি একটা ভীষণ ঘর্ঘরধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতে সেই মহা-প্রবাহের মহাস্রোত আরও তুমুল হইয়া উঠিল। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একার্ণবের বিষম প্রবাহবেগে খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া পরিবর্ত্তিত ও উদ্বর্ত্তিত হইতে লাগিল, তাহাতে লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী স্থান চক্রাকারে বিস্তৃত ও ঊর্দ্ধোন্নত হইয়া উঠিল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গকুলের উপরিভাগে পর্ব্বতবৃন্দ তৃণগুচ্ছবৎ ঘূর্ণমান হইতে লাগিল; তাহাতে শিলাখণ্ড-সমূহের সংঘর্ষ বশতঃ সৌর মণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, এই একার্ণব যেন ব্যাধ; সে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কুলায়-গত ভূধরনিকররূপ দ্রোণকাকগুলিকে আপন জলরূপ জালে জড়িত করিতেছে। মৃত, অর্দ্ধমৃত, অগণিত কত প্রাণী সেই মহাজলপ্রবাহে কেবল মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল। সেই সকল প্রাণী উত্তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গের উপরিভাগে মকরাদি জলজন্তুসমূহের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। দেবগণ ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইলেন। তাঁহাদের যাঁহারা মৃতাবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা জলপ্রবাহে সন্তরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ফেনপুঞ্জময় উন্মগ্ন গিরিশিখরের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া মশকবৃন্দের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ঐ যেরূপ অনন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখা যাইতেছে, তাৎকালিক একার্ণব তেমনি ইন্দ্রের সহস্রাক্ষি ধারণবৎ সংখ্যাতীত বিস্তৃত বদ্বুদাবলী ধারণ করিয়াছিল। দূর হইতে মনে হইল, সেই মহাজলপ্রবাহ 'যেন

শরদাকাশবৎ বিশাল বুদ্বুদ-বিলোচন দ্বারা সেই ধারাবাহিণী বিশ্বব্যাপিনী মেঘমালা বিলোকন করিতে লাগিল। পক্ষবান্ পর্ব্বতবৎ সমুত্থিত উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহু বিস্তার করিয়া সেই একার্ণব যেন পুষ্করাবর্ত্তাদি মেঘ-বৃন্দকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য গ্রাসে পরিতৃপ্ত হইয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ বাহুর বিস্তার করতঃ ঘর্ঘরস্বরে একার্ণব যেন গান গাইতে লাগিল, আর নৃত্য করিতে লাগিল। সেই একার্ণবপ্রবাহের উপরিভাগে নদীর ন্যায় ধারাবর্ষিণী মেঘমালা, মধ্যভাগে পর্ব্বত বৃন্দ এবং পঙ্কমধ্যে অবনীমণ্ডলধারী অনন্তাদি ভুজঙ্গমগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বারিধারা-রূপিণী নদী অনবরত গঙ্গাপ্রবাহে পতিত হওয়ায় শৈলশৃঙ্গরূপ বুদ্বুদাবলী যেন কখন মগ্ন এবং কখন উন্মগ্ন হইয়া ভাসিতে লাগিল। স্বর্গপুরী খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া একার্ণবের সেই মহাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল। তখন স্বর্গবাসী নভশ্চরগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। কত শত বিদ্যাধরী সেই জলপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল; দেখিয়া যেন এক একটা পদ্মিনী বলিয়াই ভ্রম হইল। একার্ণবের মহাপ্রবাহে চূর্ণ বিচূর্ণ ত্রৈলোক্য সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হা কি দুঃখ! তখন তরঙ্গমালায় সকলই সমাপ্লুত; কে কাহাকে রক্ষা করিবে? কালের করাল গ্রাসে সে কালে সকলেই পতিত; সুতরাং কেহই পরিত্রাণকর্ত্তা ছিল না। সে কালে না আকাশ, না দিনান্ত, না ঊর্দ্ধ, না সৃষ্টিবিস্তার, না কোন প্রাণী, কিছুই ছিল না; ছিল মাত্র জল—জল—জল, সকলই জলে জলাকার!

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৮॥

ঊনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অতঃপর আমি নভোমণ্ডলে থাকিয়া ব্রহ্মলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম,—নবোদিত দিবাকর-দ্যুতির ন্যায় ব্রহ্মলোক দেদীপ্যমান। তথায় ব্রহ্মা স্বীয় প্রধান প্রধান পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সমাধিব্যাপারে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার

সে মূর্ত্তি যেন পাষাণময়ী বলিয়াই তৎকালে প্রতীয়মান হইল। দেখিলাম,—শুক্র, গুরু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, পবন এবং অন্যান্য সুরমুনিগণ সকলেই তথায় অধ্যাত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমাসীন রহিয়াছেন। সিদ্ধ, সাধ্য ও গন্ধর্ব্বাধিপতিগণ সকলেই সমাধিমগ্ন হইয়া চিত্রলিখিতবৎ নিশ্চলাকারে বিরাজ করিতেছেন। সকলেই বদ্ধপদ্মাসনে নির্জীবভাবে রহিয়াছেন। অনন্তর দেখিতে পাইলাম, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট দ্বাদশ দিবাকর তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারাও বদ্ধপদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। লোকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন আর দেখিতে পায় না, তেমনি আমিও তৎপরে সেখানে আর সেই পদ্মাসনকে দেখিতে পাইলাম না। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বাসনার ন্যায় তখন ব্রহ্মার সেই পারিষদমণ্ডলীও দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মার সেই সঙ্কল্পকল্পিত নগর তখন অরণ্যবৎ শূন্য হইয়া গেল। হঠাৎ বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত নগর যেমন বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তেমনি সেই ব্রহ্মনগরীও তৎকালে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মুনি, ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সকলেই এক এক করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর আমি আকাশে অবস্থিত হইয়া অবহিতচিত্তে অবগত হইতে পারিলাম,—সেই সুরমুনি প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মারই ন্যায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসনা ক্ষয় পাইয়াছে; তাঁহারা আত্মস্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। তাই প্রবুদ্ধ লোকের নিকট যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অদৃশ্য হয়, তেমনি তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই দেহ আকাশাত্মক; বাসনার আবেশেই ইহা দৃশ্য বা প্রস্ফুট হইয়া থাকে। যখন বাসনার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন প্রবুদ্ধ জনের সমীপে স্বাপ্ন বস্তুবৎ উহার আর প্রকাশ থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় আকাশে যেমন দেহ দর্শন হয়, তেমনি বাসনার বশে আকাশেই এ দেহের বিকাশ হইয়া থাকে। বাসনার বিলয়রূপ জাগ্রদবস্থা যখন প্রকট হয়, তখন আর ইহার কিছুই দেখা যায় না। কি আতিবাহিক, কি আধিভৌতিক, বাসনাক্ষয়ে জাগ্রদবস্থাতেও কোন দেহ লক্ষীভূত হয় না। স্বপ্নদর্শনব্যাপারই এই দেহদর্শনসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, বাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহার না ইহা অনুভবগম্য? অপিচ

শাস্ত্রসিদ্ধান্তও এইরূপই। যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াও শঠতাবশে প্রকাশ করে না, স্বপ্নের দেখা বস্তুই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চায়, তাহার নাম অগ্রাহ্য ; সে কোনরূপ উপদেশ পাইবার অযোগ্য, এ হেন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়াও অবৈধ। ফলে যে ব্যক্তি কপট নিদ্রায় অভিভূত, তাঁহাকে কে জাগাইতে পারে? বলিতে পার, এ দেহ তো জনক-জননী হইতে উৎপন্ন, কিন্তু স্বপ্নের দেখা দেহ এরূপ নহে। সে দেহ তো সম্পূর্ণই অসত্য। একথার উত্তরে বলা যায়, সৎকর্ম্মের প্রভাবে স্বর্গ-দেহ লাভ হইয়া থাকে, এ দেহের তো উৎপাদয়িতা কেহই নাই। উহা আপনা-আপনিই আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত মতে তাহা হইলে এই স্বর্গ-দেহও তো মিথ্যা হইয়া যায়। তখন পরলোক বলিয়াই কিছু স্বীকার্য্য হয় না। ফলে, এ মতে নাস্তিক হইয়া পড়িতে হয়। জনক-জননী হইতে উৎপন্ন দেহ ব্যতীত দেহান্তর নাই। একথার অঙ্গীকারে পূর্ব্বকল্পের অবসানে যখন সমস্ত দেহের ক্ষয় হইয়া যায়, তখন পরবর্ত্তী কল্পের প্রারম্ভে যিনি আতিবাহিক দেহ-সমষ্ট্যাত্মক হিরণ্যগর্ভ, তাঁহারও তো অসত্তা হইয়া দাঁড়ায় ; কারণ হিরণ্যগর্ভের অসত্তা অঙ্গীকারে বর্ত্তমান কল্পেরও অস্তিত্ব থাকিত না। অথচ এই কল্প সর্ব্বদাই বিদ্যমান, সকলেরই ইহা প্রত্যক্ষ। স্থূল পদার্থমাত্রেই নাশস্বভাব ; স্থূলপদার্থের অবয়ব আছে। সে অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ ঘটে ; সেই যোগবিয়োগ-বশেই স্থূল বিশ্বের বিনাশ অবশ্য-সম্ভাব্য হইয়া পড়ে। এইজন্য বলা যায়, যাহাদের মতে জগৎ চিরদিনই একভাবে অবস্থিত, কদাচ তাহার ক্ষয় নাই ; তাহাদের ঐ মত যুক্তি-সঙ্গত নহে। অন্য এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, জগতের নাশ কখনই নাই। পরন্তু ক্ষিত্যাদি ভূতসমষ্টি হইতেই এই জড় জীবময় জগৎ প্রতি-ভাত হয়। জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি এই দেহেরই গুণবিশেষ। ক্ষিত্যাদির পরস্পর যোগ জন্যই জ্ঞানোদয় হয়। গুড়তণ্ডুলাদি বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ বশতঃ মাদকতা শক্তি যেমন রাসায়নিক যোগের ফলীভূত, জ্ঞানও অবিকল সেইরূপই ; এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্বরূপে বলা যায়, এই জগৎটা যদি এইরূপই হয়, তবে বেদপুরাণাদি-বর্ণিত প্রলয়-বৃত্তান্ত মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহা হইলে চিরমানিত শাস্ত্রও অসত্যবাদী হইয়া যায়।

আর যদি বল, শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ নহে; তাহা হইলে, শাস্ত্রাপেক্ষা বহু গুণে নিকৃষ্ট তোমাদের ন্যায় লোকের বাক্যই বা প্রমাণসিদ্ধ বলিব কিরূপে? বস্তুতঃ বন্ধ্যা নারী শত পুত্রের জননী হইয়াছে, এইরূপ বাক্যের প্রামাণ্য জ্ঞানের ন্যায় উহা একান্তই অসম্ভাব্য ও উপহাসযোগ্য হইয়া পড়ে না কি? ফলে বেদাদি শাস্ত্র যে সর্ব্বথা প্রামাণ্য, তাহা কোন বুদ্ধিমান্ই অস্বীকার করিবেন না; কেন না, তাহা না করিলে ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ সকলই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে; জগৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল কথার আর উল্লেখ করিলাম না। অধুনা আরও এক প্রকার দোষ দেখাইতেছি, শুনিয়া লও। মাদকতা শক্তির ন্যায় জ্ঞান— জড় সংযোগের ফল, ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে তো যে ব্যক্তি মরিয়াছে, তাহার পিশাচদেহ প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ যেস্থানে মরণ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বহু দূরদেশেও মৃত ব্যক্তির পিশাচত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; তদিতর অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, ঐতিহ্য, ইত্যাদি প্রমাণ বলিয়াই গণ্য নহে। সুতরাং এই মতে পিশাচাদি ভ্রমমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। কারণ, পিশাচাদিকে চক্ষে দেখা যায় না; যাহা চক্ষুর অবিষয় তাহাকে ভ্রম ব্যতীত আর কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিব? বিশেষতঃ পিশাচের ক্রিয়া দেহের উপরই হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া যে সান্নিপাতিক বিকারের কার্য্য নয়, তাহারই বা প্রমাণ কি আছে? এই সকল কথার উত্তরে উক্ত মতবাদী চার্ব্বাককেই আমরা সম্বোধন করিয়া বলি যে, হে চার্ব্বাক! যদি প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রমাণই না থাকিত, তবেই তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে; কিন্তু তাহার তো সম্ভাবনা নাই। প্রত্যক্ষ ছাড়াও তো প্রমাণ রহিয়াছে। অনুমানাদিও প্রমাণ; অনুমানাদিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, তোমার নিজের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। তুমি যাহা কহিতেছ, লোকের তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে কোন্ প্রমাণে? তোমার কথা বিশ্বাসার্হ হইবার পক্ষে কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? লোকে বাক্যার্থই অবগত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অর্থজ্ঞান তো প্রত্যক্ষ

নয়। অর্থজ্ঞানকে যদি অভ্রান্ত বলিতে হয়, তবে অনুমানাদি প্রমাণেরই আশ্রয় লইতে হইবে। নচেৎ অর্থজ্ঞানের অভ্রান্ততা হইতে পারে না, সুতরাং অগত্যা তোমাকেও ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইতে হইবে যে, অনুমানাদিও প্রমাণ মধ্যে পরিগণ্য। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে পরলোক আছে, স্বর্গ আছে, নরক আছে, এ সকল সিদ্ধান্তই সত্য; ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর এক কথা, পরদেহে পিশাচ অবস্থান করে; এই পিশাচস্থিতির সত্যতা যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে মাদক বস্তুর মত্ততাশক্তিতেই বা বিশ্বাস করিবার কি আছে? কেন না, সে শক্তিও তো পরকীয় কলেবর-বিকার-দর্শনেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়; ফলে পিশাচাবিষ্ট বা ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির অমানুষোচিত অনেক কার্য্য দর্শনে মত্ততা দেখিয়া মাদক দ্রব্যের মদশক্তি নিরূপণের ন্যায় পিশাচসত্তা অবশ্যই তোমার স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল। অতএব মৃত ব্যক্তির যে পরলোক আছে, তাহা বিশ্বাস না করিবার হেতু তো কিছুই নাই। কাকতালীয়বৎ হঠাৎ পিশাচাবেশে পরকীয় কার্য্য দর্শনে পিশাচের সত্তা স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তমূলক যে পরলোক, তাহার প্রত্যয়ে সন্দেহের অবকাশ কি আছে? জীবের অন্তরে যেরূপ অনুভব হয়, বাহিরেও সেইরূপ দর্শন হইয়া থাকে। এ কথার দৃষ্টান্তরূপে রজ্জুসর্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, অগ্রে অন্তরে সর্পজ্ঞানের উদয় হয়, বাহিরে রজ্জুতে সত্য সর্পভ্রমের উদয় হইয়া থাকে। আবার যখন রজ্জুতে সর্পাভাব জ্ঞান হয়, তখনই সর্পের অসত্যরূপতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। কাজেই এখন বুঝ, পদার্থের সত্তা বা অসত্তা উভয়ই অভাবমূলক। পরলোকের সত্তা অনুমান প্রমাণ দ্বারাই যখন অবগত হওয়া যায়, তখন উহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। পরলোক আছে, এ কথার সত্যতাসম্বন্ধে বেদই সাক্ষী; পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞান জীবদ্দশায় বেদাদি শাস্ত্র হইতেই সমুদ্ভূত হয়। ঐ জ্ঞানের সংস্কার মৃত্যুর পরও থাকিয়া যায়। সুতরাং এখন বুঝিয়া শুঝিয়া বল দেখি, জীবদ্দশায় যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করা হয়, তাহাকে অসত্য বলিয়া মৃত্যু কখন অগ্রাহ্য করিতে পারে কি? যদি পারে, তাহা হইলে জীবদ্দশায় যাহা অসত্যরূপে অনুভূতিগোচর হয়, তাহাকে

সত্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেই বা মৃত্যুর ক্ষমতা না থাকিবে কেন?

রামচন্দ্র! এতাবতা বুঝিবে, পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ; তিনি আপনা হইতেই নিজ নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানশক্তি অগ্রে অনুভব করেন। অতঃপর বাসনার মূলীভূত যে আতিবাহিক দেহ, তাহাই তিনি অনুভব করিতে করিতে দেহাদি ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া পড়েন। যখন বাসনার ক্ষয় হয়, তখন দ্রষ্টা দৃশ্য, এবং দর্শন নামক ত্রিপুটী ব্যাধি অপসৃত হইয়া যায়। আর যদি বাসনা থাকে, তবেই সংসারনামিকা পিশাচীর প্রকাশ হয়। অগ্রে জগদ্‌বিষয়ে ব্রহ্মের পর্য্যালোচনা, পরে সেই পর্য্যালোচনার মূলীভূত বাসনারই জগদাকারে বিকাশ; সুতরাং বাসনার যে শান্তি, তাহাই নির্ব্বাণ, আর বাসনার যে সত্তা, তাহাই জানিবে সংসার। প্রলয়ে বা প্রাক্‌-সৃষ্টিতে এই বাসনা যে ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়, তাহা নহে। কেন না, ব্রহ্মবস্তু নির্লেপ; তাহাতে বাসনাসম্বন্ধ সম্ভবে না; কাজেই বাসনার যে অভ্যাসসম্বন্ধ, তাহাই পরব্রহ্মে স্বীকার্য্য। অপিচ ঐ যে বাসনা, উহা জ্ঞানোদয় না হওয়া অবধি কারণান্তরোৎপন্ন বলিয়াই মান্য। অবশেষে বাসনার যে পর্য্যবসান, জানিবে—তাহা পরব্রহ্মেই হয়। এতৎ-পর্য্যন্ত জ্ঞানই পণ্ডিতগণের বিবেচনায় নির্ব্বাণমুক্তির মূল। হে রঘুবর! ঐ বিষয়ের যে অপরিজ্ঞান, তাহাই জানিবে,—সংসারবন্ধন। যিনি বিজ্ঞানঘন আত্মা, তিনিই জ্ঞান ও অজ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানরূপে স্ফুরিত হইতে তিনিই নিজে হইয়া থাকেন। আবার অজ্ঞানভাবে তিরোহিত হইতে তিনিই নিজে হন। আত্মা মাত্র চৈতন্যাংশ, তিনি নির্গুণস্বরূপ; তাঁহার যে বন্ধমোক্ষজ্ঞান, তাহাই তাঁহার ক্লেশ। নিজেকে চিনিতে পারিলেই মোক্ষ, সুতরাং মোক্ষ সাধনে পরিশ্রম কিছুই নাই। চৈতন্যরূপ আত্মার বিষয়জ্ঞান হইলেই বন্ধন; আর ঐ বন্ধন যদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, তবেই মুক্তি হইয়া থাকে। এই জগৎ অসত্য, ইহা যে সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে, ইহার মূল তো বিষয়জ্ঞান বৈ আর কিছুই নয়। সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্য যখন সুষুপ্ত হন, তখনই মুক্তিনামে নিরূপিত হইয়া থাকেন, আর যখন তিনি প্রবুদ্ধ হন, তখনই বন্ধপদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই বন্ধ ও মোক্ষ

এতদুভয়ের মধ্যে যাহা তোমার অভীপ্সিত হয়, তুমি তাহারই সম্পাদনে প্রযত্নপর হও।

হে বিশদহৃদয়, রাম! বাসনা, যাতনা, শঙ্কা, একতা ও শূন্যতা, এতৎসমস্ত বর্জ্জনপুরঃসর—যিনি অনাদি অনন্ত, অমল একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপে শান্তভাবে তুমি বিরাজ করিতে থাক।

ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! উল্লিখিতরূপে সেই সকল ব্রহ্মালোকস্থ দেবতা দশাক্ষয়ে প্রদীপবৎ শনৈঃ শনৈঃ নির্ব্বাণ লাভে অদৃশ্য হইলেন। ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির পর সেই দ্বাদশ দিবাকর জ্বলনবৎ জ্বলন্ত কিরণ-মালায় জগৎকে যে ভাবে দগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি ভাবে সেই ব্রহ্মলোককেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মলোক দগ্ধীভূত করিবার পর সেই দ্বাদশাদিত্যও তৎকালে ব্রহ্মার ন্যায় ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন এবং প্রদীপের বর্ত্তিকা ও তৈল দগ্ধ হইয়া গেলে প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তাঁহারাও তখন ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন। পরে সেই ব্রহ্মলোকও একার্ণবাকারে পরিণত হইল। নৈশ ঘনান্ধকার যেমন ভূমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি সেই তরঙ্গভঙ্গীভীষণ একার্ণবও সমগ্র ব্রহ্মলোক জলপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মলোকাবধি নিখিল জগৎ যখন জলময় হইয়া গেল, তখন ইহা একটা সুপক্ব সুরসাল দ্রাক্ষাফলের ন্যায়ই যেন অনুভূয়মান হইতে লাগিল। দেখিলাম—সেই যে কল্পান্তের মেঘমালা অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহারা একার্ণবের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার, জলোপরি ভাসমান ভূধরবৃন্দের এবং মৃত্যুগ্রস্ত দেবশরীর-সমূহের বিষম সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সেই একার্ণব-

জলে বিলয় পাইয়া গেল। তৎকালে আমি আকাশের দিকে দৃষ্টি দিলাম; দেখিলাম,—কল্পান্ত মেঘের ন্যায় এক ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মূর্ত্তি অনন্ত নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। তাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম এবং কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াও পড়িলাম। মনে হইল, আকল্পার্জ্জিত নিখিল নৈশান্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিলাম,—সেই সমুজ্জ্বল শ্যামাভ মূর্ত্তি নবোদিত লক্ষ বাল-সূর্য্যকর-সম দেদীপ্যমান। সেই মূর্ত্তির যে একটা মুখমণ্ডল, তাহা উজ্জ্বল ত্রিনয়ন দ্বারা আরও ভীষণ। দুর হইতে ঐ নয়নত্রয় দেখিয়া অনুমান হয়, যেন অচিরপ্রভা চিরপ্রভারূপে প্রকাশমান! ঐ মূর্ত্তির নয়ন ত্রিসংখ্যক, বদন পঞ্চ এবং বাহু দশটী। উঁহার হস্তে শূলাস্ত্র দেদীপ্যমান। ঐ যে অনন্ত আকাশ, উহা অপেক্ষাও সেই মূর্ত্তি বিস্তৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেখিয়া মনে হইল, বুঝিবা সেই চিন্ময় আত্মাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অবস্থিত। সেই কৃষ্ণকান্তি মূর্ত্তি একার্ণবাকীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের বহিরাকাশ ব্যাপিয়া তৎকালে বিরাজ করিতে লাগিল। তদীয় নাসাবিবর হইতে যে প্রবল পবন বিনিঃসৃত হইল, তাহাতে অনন্ত বিশাল একার্ণব আলোড়িত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে প্রত্যয় হইল, নারায়ণ যেন অমৃতমন্থনে নিজ ভুজ দ্বারা ক্ষীরাব্ধিকে বিলোড়িত করিতে লাগিলেন। সেই মহাপ্রলয়ের অম্বুরাশি যেন পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অভ্যুত্থিত হইল। অহঙ্কারনিকর যেন একত্র সমষ্টিভূত হইয়া সেই কারণপরিবর্জ্জিত কৃষ্ণাভ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অভ্যুদিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ কুলাচল সকল স্ব স্ব পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বাকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া উড্ডীন হইবার উপক্রম করিল। আমি দূর হইতেই স্থির করিলাম, ঐ মূর্ত্তি যখন ত্রিনয়ন ও ত্রিশূলধর, তখন নিশ্চয়ই উনি সেই মহেশ্বর রুদ্রদেব। ইহা স্থির করিয়া আমি তখন তদুদ্দেশে নমস্কার করিলাম।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান্ রুদ্রদেবের আকৃতি ঐরূপ কৃষ্ণকান্তি ও বহুবিস্তৃত হইবার কারণ কি? কেন তিনি পঞ্চমুখশালী? কি নিমিত্তই বা তাঁহার দশটী বাহু? তদীয় নয়ন ত্রিসংখ্যক হইল কেন? তাঁহার আকার এরূপ ভয়ঙ্কর হইবারই বা কারণ কি? মুনিবর! তিনি

কাহার কথায় কোন্ প্রয়োজনে তখন একাকী প্রাদুর্ভূত হইলেন? তিনি আবির্ভূত হইয়া কোন কার্য্যই বা করিলেন? তাঁহার পশ্চাৎ দিকে যে এক মহতী ছায়া দেখা গেল, ঐ ছায়াই বা কাহার ছায়া? এ সকল আমার নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ককুস্থবংশধর! ঐ রুদ্রনাম্নী বিশাল মূর্ত্তি অহঙ্কার হইতেই অভ্যুদিত হইয়াছেন। ঐ অভিমানাত্মক বিষম রুদ্রকে দূর হইতে আমি আকাশবৎ বিশদাকার বলিয়াই অবধারণ করিলাম। সেই ভগবান্ রুদ্রদেব আকাশবৎ উজ্জ্বল বর্ণ; তিনি চিদাকাশ; তাই আকাশাত্মা নামে অভিহিত। তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে বিরাজমান। ঐ রুদ্র সমষ্টিভূত অহঙ্কার-স্বরূপ। তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার দেহগত পঞ্চেন্দ্রিয়ই তদীয় মুখপঞ্চক। তাঁহার দক্ষিণদিকে যে পাঁচটী হস্ত আছে, ঐ হস্তপঞ্চক—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর বামদিকের পঞ্চ হস্ত—বিষয়পঞ্চক। এইরূপ দেখিয়া স্থির করিলাম, তাঁহার হস্ত—সমষ্টিতে দশ। চতুর্ব্বিধ জীবজাতি সহ মায়াশবলিত ব্রহ্মভাবগত চতুরানন যখন ঐ মূর্ত্তি পরিহার করেন, তখন উনি আকাশমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কারণস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। সর্ব্বকার্য্য বিলীন হইয়া গেলে শেষকারণের একাংশরূপেই ঐ রুদ্র অবস্থান করেন। আমার বর্ণিত আকৃতি বস্তুগত্যা মিথ্যা; তবে যে উনি ঐ প্রকার আকৃতিসম্পন্নরূপে দৃষ্ট হন, তাহা কেবল ভ্রান্তিরই প্রভাবে হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা সর্ব্বগত বায়ুর ন্যায় ঐ রুদ্রদেবই অনন্ত চিদাকাশে আছেন, ভূতাকাশে আছেন এবং সকল প্রাণীরই দেহে আছেন। যখন নিজ স্বরূপ হইতে নিখিল ভূতভাব তিরোহিত হইয়াছিল, তখন উনি আকাশরূপ হইয়া ক্ষণমধ্যেই সমস্ত বিক্ষুব্ধ করত ক্রমশ ক্ষীণাকারে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। তখন গুণ-ত্রয়, কালত্রয়, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রণবের অক্ষরত্রয় এবং বেদত্রয় ঐ রুদ্রের ত্রিনয়নাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই ত্রৈলোক্যকে তিনি তখন ত্রিশূলোপরি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ব্যতীত সর্ব্বভূতে যখন অন্য কিছুই নাই, তখন বলিতে হইবে,—তিনিই ভূতসমূহের দেহস্বরূপে অবস্থিত। স্বসৃষ্ট সর্ব্বসত্ত্বের উপলব্ধিস্বরূপ তিনিই মাত্র। তাঁহার

স্বভাবই এই সৃষ্টিবিস্তারের প্রয়োজন। আপনার স্বভাববশেই তিনি নৃত্য করেন। যিনি বাক্যমনের অগোচর, সেই চিদাকাশের প্রেরণা-ক্রমেই তিনি সৃষ্টি বিস্তার করিয়া থাকেন। আবার যখন ঐ চিদাকাশই তাঁহাকে প্রলয়ের জন্য প্রেরণ করেন, তখন তিনি সর্ব্ববিশ্ব গ্রাস করিয়া শিবস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তিনি সেই শিবস্বরূপও পরিহার করেন,—করিয়া আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরমাশান্তি লাভ করেন।

ঐ রুদ্র সর্ব্বশক্তিমান্, উনি নির্ম্মল আকাশস্বরূপ, তাই উঁহার নাম কৃষ্ণ। এই জগৎ নির্ম্মিত হইবার পর স্বীয় ইচ্ছামাত্রেই পুনরায় উনি সমস্ত একার্ণবাকারে পরিণামিত করিয়া পান করেন। পানান্তে অপুনরাবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পরে দেখিলাম,—সেই মহার্ণবকে তিনি নিঃশ্বাস-পবন-যোগে আকর্ষণ করিতে উপক্রান্ত হইয়াছেন। তদীয় নিঃশ্বাসমারুতে সমাকৃষ্যমাণ হইয়া মহাসাগর তাঁহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রুদ্রবদন তখন বাড়বাগ্নির ন্যায় বহ্নিশিখাজালে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। জগৎ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে সাগরে যে বাড়বাগ্নি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহারই মূর্ত্তি বৈ আর কিছুই নহে। অহঙ্কারাত্মক রুদ্রই সাগরে বাড়বানলরূপ ধারণপূর্ব্বক জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিত্য বর্দ্ধনশীল সলিলরাশি পান করিয়া ফেলেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সমস্তই পান করিয়া থাকেন। সে কালে আর কিছুমাত্র জল অবশিষ্ট থাকে না। ফলে দেখিলাম,—ঊর্দ্ধ ভূমিগত জল যেমন সহজেই নিম্ন স্থানে প্রবেশ করে, ভুজঙ্গ যেমন সহজেই গর্ত্তগামী হয়, এবং প্রাণপবন যেমন অনায়াসেই মুখবিবরে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি প্রলয়ে সেই একার্ণবের জলরাশি সবেগে নিঃশেষরূপেই তদীয় বদনবিবরে তখন প্রবেশ করিল। সৎসংসর্গ যেমন দোষরাশি নাশ করে এবং দিবাকর যেমন তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া দেন, তেমনি সেই ঘোর কৃষ্ণকান্তি রুদ্রদেব তখন মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই সমগ্র সলিলরাশি পান করিয়া ফেলিলেন। পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোকাবধি আর কিছুই রহিল না; সকলই শূন্য হইয়া গেল। ধূলি, ধূম, সমুদ্র, সমীর, কোন

বস্তুই আর আকাশে রহিল না। যে কালে চারিটী পদার্থ মাত্র দৃষ্ট হইল। ঐ পদার্থচতুষ্টয়—নির্ম্মল ও নিস্পন্দ। উহাদের বিবরণ এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ চারি পদার্থের মধ্যস্থানে যে পদার্থ আছে, উহা সেই রুদ্রদেব। উনি নিরাধার হইয়া আকাশে অবস্থিত। উঁহার দেহ আকাশবৎ নীলাভ। উনি নিস্পন্দ সৌরভকণার ন্যায় আকাশে বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড-ভবনের একাংশই দ্বিতীয় পদার্থ; উহা দেখিতে ক্ষিত্যাকাশবৎ; —দূরে—অতি দূরে—সপ্তপাতালেরও নিম্নতম দেশে অবস্থিত। উহা আকাশের মালিন্যময় পার্থিবাংশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় প্রথমোক্ত পদার্থ অপেক্ষা স্থূল। তৃতীয় পদার্থ বহুদূরে বিরাজিত। উহা ঊর্দ্ধবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ। ঐ পদার্থ এতদূরে অবস্থিত যে, সে পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তি পৌঁছায়ই না। কাজেই ঐ পদার্থটীকে আমি সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হই নাই। কেবল এই মাত্র দেখিয়াছিলাম যে, উহা আকাশবৎ নীলবর্ণ। ব্রহ্মাণ্ড হইতে বহু দূরগত যে অধঃ ও ঊর্দ্ধ খণ্ডকে আমি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদার্থরূপে নিরূপণ করিয়াছি, তন্মধ্যস্থ অনাদি অনন্ত ব্রহ্মবৎ নির্ম্মল বিতত আকাশই আমার মতে চতুর্থ পদার্থ। সর্ব্ব সমেত এই পদার্থ-চতুষ্টয় ব্যতীত তৎকালে আর কোন কিছুই ছিল না।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তখন ব্রহ্মাণ্ডকটাহের বহির্ভাগে কি বা কি কি আবরণ ছিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই দুই ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের বহির্ভাগে দশ-গুণ জল। উভয় ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের সন্ধিস্থ আকাশের বহির্দ্দিকে ঐ অনন্ত জলরাশি বিস্তৃত বলিয়া বিশ্লিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডখর্পরযুগলের মধ্যে উহা আসিতে পারে নাই। সেই যে দশগুণ জল, তাহার বাহিরে অগ্নিজ্বালামালাময় দশগুণ তেজ; তৎপরে দশগুণ সুনির্ম্মল সমীর; তৎপরে দশগুণ স্বচ্ছ আকাশ, সর্ব্বশেষে অমল অনন্ত ব্রহ্মাকাশ বিরাজমান। মতান্তরে ব্রহ্মাণ্ডের পর মায়াশবল ব্রহ্মের স্বরূপাকাশ; তাহাতে অন্যান্যরূপ আবরণ-কল্পনা; কিন্তু সেরূপ কল্পনা শ্রুতির অনুমোদিত নহে বলিয়া আমাদের অস্বীকার্য্য বিষয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ঐ যে সকল জলাদি আবরণ

ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের উপরে নীচে রহিয়াছে, কে উহা ধরিয়া রাখিয়াছে? কোন আধারে ঐ সমুদায় পদার্থের অবস্থিতি হইতেছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড পার্থিব পদার্থের অংশভূত; উহা যে ভাবে ছিল, তদ্‌বহিঃস্থিত জলাদিও তেমনই ভাবে অবস্থিত। যেমন কপিশাবক তাহার মাতৃজঙ্ঘা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক মাতার সঙ্গে সঙ্গেই লম্ফ দান করে, পূর্ব্বোক্ত জলাদিও তেমনি ব্রহ্মাণ্ডখর্পর অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে অবস্থিত ছিল। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জলাভিমুখে গমনের ন্যায় ঐ বাহ্য জল-তেজঃ প্রভৃতি পদার্থও সন্নিহিত ব্রহ্মাণ্ডাখ্য বিশাল আকৃতির অনুগত। ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ববিশেষের ন্যায় উহারা তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়াই স্বস্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! উল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ড-খর্পরযুগলই বা কি প্রকারে রহিয়াছে? উহার আকৃতি কীদৃশ? কে ঐ খর্পর ধরিয়া রাখিয়াছে? উহা নষ্ট হয় না কি জন্য? তাহা আমার নিকট প্রকটী-কৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই দৃশ্যমান জগৎ একান্তই অলীক পদার্থ; ইহা যেন একটা স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর আকারেই প্রতিভাত। এই কারণে বলা যায়, এ জগতের ধারণকর্ত্তা কেহ না থাকিলেও, ইহা ধৃত। পতনোন্মুখ হইলেও অপতিত এবং নিরাকার হইলেও সাকার; কাজেই ইহা আগাগোড়া সবটাই যখন মিথ্যা, তখন ইহার পতনই বা কি? আর ধারণই বা কি? যিনি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মবস্তু, তাঁহারই স্ফুরণ এই এই ভাবে কৃতাবস্থান। আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ, শূন্যতা ও পবন, তেমনি চিদাকাশে এই জগৎ বিরাজমান। পরমাত্মা চিন্ময়; তাঁহাতে ঐ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা সঙ্কল্প-নগর। আকাশে আকাশ নিরাকার হইলেও আকৃতিমৎ বলিয়াই সতত লক্ষিত হইয়া থাকে। যদি মনে করা যায় যে, ইহা পতিত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে,—অনবরত ইহা পতিতই হইতেছে। এইরূপে ইহাকে গতিশীল বলিয়া বুঝিলে ইহা সতত গতি-সম্পন্ন এবং স্থিতিশীল বলিয়া মনে করিলে ইহা স্থিতিশালী বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। যদি বুঝা যায়, ইহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবে মনে

হইবে, ইহা তাহাই হইতেছে, যদি জ্ঞান করা যায় যে, ইহা আকাশে উৎপন্ন হইতেছে, তবে অনুমান হইবে, ইহা সর্ব্বদা আকাশেই জন্মিতেছে। ফলে ইহাকে যেমন বুঝিবে, যেরূপ জ্ঞান করিবে, এজগৎ তেমনই হইবে। অথবা দর্শনে শরদাকাশোদিত মুক্তানিচয় যেমন ভ্রমের বশে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি আকাশে ভ্রান্তির আবেশে কত যে জগৎ প্রকট হইতেছে, তাহার সংখ্যা করিবার সামর্থ্য কাহার আছে?

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! অনন্তর দেখিতে লাগিলাম, সেই অনন্ত মহাকাশে বিরাটদেহ রুদ্রদেব উন্মত্তবৎ নৃত্যারম্ভ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে অনুমিত হইল, দশদিগ্‌ব্যাপী প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ মহাকাশ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আপনার সর্ব্বব্যাপিত্ব পরিহার করিয়াছে। দেখিলাম, রবি, শশী, অনল, এই তিনটী তাঁহার নেত্র, দিঙ্মণ্ডল তাঁহার বস্ত্র; যেন ঘনপ্রভা বিস্তার করিয়া একটা শ্যামলকান্তিপুঞ্জময় স্তম্ভ বিরাজমান; তদীয় আকৃতিদর্শনে ইহাই তখন প্রতীত হইতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার নয়নত্রয় যেন বাড়বাগ্নিবৎ ধক্ ধক্ জ্বলিত হইতে লাগিল। তদীয় বিলোল ভুজযুগল তরঙ্গমালাপ্রায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সেকালে তাঁহার তদবস্থা দর্শনে ভাবিলাম, সেই একার্ণব হইতে সলিলরাশি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অভ্যুত্থিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তদীয় দেহ হইতে ছায়াপ্রায় একটা মূর্ত্তি যেন নাচিতে নাচিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই মূর্ত্তিটাকে ছায়া বলিয়া অবধারণ করায় অগ্রে আমার মনে এইরূপ একটা সন্দেহোদ্রেক হইল যে, এক্ষণে আকাশে এই নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়ান্ধকার; একে একে সকল কয়টী সূর্য্যই অস্তমিত; এ অন্ধকারে ছায়াসমাগম হইল কিরূপে কোথা হইতে? অনন্তর নিপুণ-

ভাবে নিরীক্ষণ করিলাম; দেখিলাম, সেটা প্রকৃত ছায়া নয়, একটি ত্রিনয়ন-শোভিনী রমণীমূর্ত্তিই তৎসম্মুখে নৃত্যব্যাপারে নিরতা রহিয়াছেন। সেই রমণীর আকার কৃষ্ণবর্ণ, অবয়ব ক্ষীণ এবং সর্ব্বাঙ্গ শিরাসমাকীর্ণ। তাঁহার দেহ অতি বৃহৎ; কিন্তু তাহা জীর্ণ হইয়াছে। তদীয় বদনমণ্ডল হইতে নিয়ত অগ্নিজ্বালা উদ্গীর্ণ হইতেছে। যেমন বসন্তকালের বনরাজি, তেমনি তিনি পুষ্পপল্লবমণ্ডিত সুন্দর শেখর ধারণ করিয়াছেন। সেই অঞ্জনপ্রতিম ঘনান্ধকার; তাহাতে বিভাবরী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তৎকালে ইহাই প্রতীত হইতে লাগিল। আবার মনে হইল, যেন স্বয়ং অন্ধকারলক্ষ্মীই দেহ ধারণ করিয়াছেন। আকাশের যে নীলচ্ছবি, তাহা যেন আকৃতিমান্ হইয়াছে। ঐ রমণী করালবদনা অতি ভীষণা; উনি এতই দীর্ঘাঙ্গী যে, যেন আকাশ মাপিবার জন্যই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তদীয় দীর্ঘ বাহু ও দীর্ঘজানু দর্শনে মনে হয়, যেন সমগ্র দিগ্‌বিভাগের পরিমাণ লইবার নিমিত্তই সে কামিনী দণ্ডায়মানা। তাঁহার আকৃতি অত্যন্ত কৃশ; দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনি বহু দিনের উপবাসিনী। তদীয় বিশাল দেহ কজ্জলবৎ শ্যামল; উহা যেন জলভারনম্র নীরদমালার ন্যায় নত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কলেবরের কৃশত্ব এত অধিক যে, তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও অক্ষমা। এই জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝি তাঁহার বিশীর্ণপ্রায় দীর্ঘ দেহযষ্টিকে পতন হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই সুদীর্ঘ শিরারূপরশ্মি দ্বারা একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি অতি দীর্ঘ—অতীব লম্বমান; সেই জন্য তাঁহার চরণনখর ও বদনমণ্ডল দেখিতে গিয়া ঊর্দ্ধাধোদিকে যাতায়াত করিতে আমাকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। কি মস্তক, কি হস্ত, সর্ব্বাঙ্গই তাঁহার শিরা ও অন্ত্রতন্ত্রী দ্বারা নিবদ্ধ। খদিরাদি কণ্টকবল্লীবৎ তদীয় আমূল শাখা সর্ব্বশরীর সূত্রজড়িত। সূর্য্যাদি দেব ও দানবদিগের নানাবর্ণময় মস্তকাবলী দ্বারা কমলমালার ন্যায় মালা গাঁথিয়া তিনি গলে ধারণ করিয়াছেন। তদীয় বস্ত্রাঞ্চল সমীরসন্ধুক্ষিত দীপ্ত শিখাময় বহ্নিযোগে উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণ-যুগলে ভুজঙ্গ লম্বিত হইতেছিল। তিনি নরমুণ্ডময় কুণ্ডল ধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার স্তনদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ

ও সুবিশাল; উহা সুদীর্ঘ সুবিশুষ্ক অলাবুফলযুগবৎ লম্বমান হইয়া উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দন্তরাজি যেন চন্দ্রশ্রেণী, তাহা হইতে বিমল কিরণরাজি বিনিঃসৃত হইতেছিল। তদীয় খট্বাঙ্গমণ্ডলে ইন্দ্রাদি দেবগণের মস্তকাবলী লম্বিত হইতেছিল। তিনি বিশুষ্ক অলাবুলতার ন্যায় আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। চঞ্চল মারুতহিল্লোলে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ পট পট শব্দে আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি স্বীয় শ্যামশোভা বিস্তার করিয়া অনবরত নৃত্য করিতেছিলেন। সে দৃশ্য দর্শনে মনে হইতেছিল, যেন একার্ণবের তরঙ্গশ্রেণী ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে। দেখিলাম,—তিনি কখন একবাহু, কখন বহুবাহু, এবং কখন অনন্ত বিশাল বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। তদীয় বাহুনিচয়ের উৎক্ষেপণবশে এই সুবিস্তৃত জগদাকার নৃত্যমণ্ডপ কম্পিত হইতেছে। তিনি ক্বচিৎ একবক্ত্র এবং ক্বচিৎ বহুবক্ত্র হইতেছেন, কখন কখন ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছেন আবার কখন সম্পূর্ণরূপে বক্ত্রবিহীন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার কখন একপদে এবং কখন বা বহুপদে অবস্থিতি হইতেছে, আবার কখন বা তিনি অনন্তপদা বা একেবারেই পাদবিহীনা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই সকল অপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে তাঁহাকে আমার কালরাত্রি বলিয়া ধারণা হইল। ভাবিলাম,—তত্ত্বদর্শিগণ ইহাঁকেই বুঝি, ভগবতী কালী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দেখিলাম,—তাঁহার তিনটা উজ্জ্বল নয়ন কোটরগত বহ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান; ললাটফলক জ্বলদ্বহ্নিময় ইন্দ্রনীলমণি-মণ্ডিত শৈলতটের সহিত তুলনীয়। তদীয় বিশাল গণ্ডস্থলযুগল লোকালোক শৈলের গর্ত্তময় প্রদেশপ্রায় মধ্যভাগে নিমগ্ন। প্রবহনাত্মক স্থির সমীররূপ সূত্রদ্বারা তারকানিকর গ্রথিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠগত মুক্তাহারমালার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। দেখিলাম,—নৃত্যকালে আকাশে তিনি বাহুলতা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাই তাঁহার করগত পুষ্পপ্রকর বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তিনি যে কর সঞ্চালন করিতেছিলেন, তাহা হইতে বিনিঃসৃত নখর-কিরণবৎ শুভ্র শুভ্র মেঘখণ্ড চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় বোধ হইল, সে কালে আকাশে যেন শত শত সুধাংশুর অভ্যুদয় হইয়াছে।

তদীয় বাহুমণ্ডল কল্পান্তকালীন মেঘমণ্ডলবৎ ঘুরিতে লাগিল। তাহা হইতে উজ্জ্বল নখপ্রভা বিচ্ছুরিত হইয়া দিঙ্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার কৃষ্ণদ্যুতি বাহুবৃক্ষের বিস্তারে সমগ্র আকাশ যেন অরণ্যময় হইয়া উঠিল। তদীয় নখপ্রভা বাহুবৃক্ষের পুষ্প এবং অঙ্গুলিদল তাহার লতাজালশ্রী ধারণ করিল। তাঁহার বিলোল জঙ্ঘাযুগল দেখিয়া মনে হইল, উহা যেন দগ্ধ খর্জ্জূরাদি মহাবন-বেষ্টিত তমাল-তাল-প্রমিত সমুচ্চ ভূখণ্ড। তাঁহার কেশপাশ অনন্ত মহাকাশের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহাতে মনে হইতেছিল, তিনি যেন আকাশে অন্ধকার-মাতঙ্গের পরিভ্রমণ করাইতেছেন। তদীয় নিশ্বাসমারুত এতই প্রবল যে, তাহাতে সুমেরু পর্য্যন্ত সমুৎপাটিত হইয়া যায়। তাহার তাদৃশ নিঃশ্বাসমারুতের শব্দ দ্বারা সর্ব্বদিক্ সমুদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। তাঁহার যে ঘন ঘন নিঃশ্বাস-মারুত উত্থিত হইতেছিল, তাহার শব্দ অবিকল সুকণ্ঠ নটের উচ্চ সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নৃত্য করিতে করিতে তদীয় সর্ব্বাবয়ব বর্দ্ধিত হইল। আমি সেই অনন্ত গগনাঙ্গনে অবস্থিত হইয়া দেখিলাম,—মেরু, মন্দর, মলয়, সহ্য ও কৈলাসাদি শৈলকুল তদীয় গলদেশে মালার ন্যায় দুলিতেছে। প্রলয়ের জগদ্ব্যাপিনী মেঘমালা তদীয় পরিধেয় বসনবৎ শোভা পাইতেছে। এই সমগ্র ত্রিজগৎই তাঁহার অঙ্গে দর্পণবৎ প্রতিবিম্বাকারে প্রতিভাত হইতেছে। হিমাচল তাঁহার এক কর্ণে রজতকুণ্ডলবৎ শোভা পাইতেছে এবং অপর কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডলের ন্যায় সুমেরুগিরি দুলিতেছে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রাণিবৃন্দের কোলাহল তদীয় মেখলাঝঙ্কারবৎ পরিশ্রুত হইতেছে। কুলাচল সকল তদীয় গলবিলম্বিনী পুষ্পমালা; পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও শৃঙ্গোপরিস্থ সরিৎসাগর-কাননাদি সেই মালার মধ্যগত স্তবকাবলী। জীর্ণ শীর্ণ নগর ও কাননাদি তন্মধ্যস্থ কোমল পল্লববৎ প্রতীয়মান। দেখিলাম, পুর, নগর, ঋতু, মাস, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি জাগতিক সর্ব্বপদার্থ সেই রমণীর অঙ্গেই বিদ্যমান। গঙ্গা যমুনাদি যত কিছু প্রসিদ্ধ-নদী, সকলই তাঁহার মুক্তাহারবৎ দোদুল্যমান। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই দুইটী তাঁহার কর্ণদ্বয়ের অলঙ্কার, আর ঋগ্ যজুঃ প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় তদীয় স্তনচতুষ্টয়রূপে

প্রতীয়মান। তাঁহার ঐ চারিটি স্তন হইতেই নিয়ত ধর্ম্মরূপ ক্ষীরের ক্ষরণ হইতেছে। দেখিলাম, তিনি ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি, শর, মুষ্টি ও তোমরাদি অস্ত্রসমষ্টির মালা করিয়া গলায় পরিয়াছেন। সেই অস্ত্রমালা হইতে অনবরত আরও অসংখ্য অস্ত্রনিচয় নিঃসৃত হইতেছে। চতুর্দ্দশবিধ জীব তদীয় দেহস্থ লোমাবলীবৎ প্রকাশ পাইতেছে। দেখিলাম, তাঁহার দেহমধ্যস্থ গ্রাম, নগর, গিরি প্রভৃতি যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছে এবং আনন্দবশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

এইরূপে চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই তৎকালে তাঁহার দেহরূপ লোকান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। সেই ভগবতী কালী যেন ময়ূরীর ন্যায় এই সমগ্র জগৎরূপ বিষধর সকল গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত ও আনন্দিতচিত্তে মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অনন্ত ও অতি বিস্তৃত; সে দেহে এই সমগ্র জগৎ অবস্থিত হইল এবং দর্পণে যেমন বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব, তেমনি উহা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে সেই কালীই যে তখন নৃত্যপরায়ণা হইয়াছিলেন, সে কথা সত্য নহে; এই শৈল-বনাদি-পরিবৃত নিখিল জগৎই মহাপ্রলয়ের অবসানে বিবিধ বিশাল কলেবর পরিগ্রহপূর্ব্বক নৃত্যব্যাপারে নিরত হইয়াছিল। আমি তাঁহার দেহদর্পণে বহুকাল পর্য্যন্ত এই ভাবে সেই জগতের নৃত্যব্যাপার অবলোকন করিলাম। দেখিলাম, সেই ভূতপূর্ব্ব জগৎই অক্ষতাবয়বে অবিকল অবস্থান করিতেছে। সেই কালীর কলেবরে যে সকল জগৎ নৃত্য করিতেছিল, তাহাদের তরাকারাজি নৃত্যবেগে বিগলিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতবৃন্দ ঘুরিতে লাগিল। দেবদানব সকল মশকবৃন্দবৎ সমীরসঞ্চলনে নানাদিকে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ঘূর্ণায়মান দ্বীপ ও সাগরসমূহে গগনমণ্ডল ভরিয়া গেল। পর্ব্বত সকল তৎকালে তৃণপুঞ্জের ন্যায় আকাশে বায়ুভরে উড়িতে লাগিল। আকাশে নীরদমালা অনবরত বায়ুবেগে আন্দোলিত হওয়ায় কেমন একটা ঘুম ঘুম ধ্বনি পরিশ্রুত হইতে লাগিল। কাষ্ঠ ও অস্থিপুঞ্জাদি পদার্থসমষ্টি ভূতলে সংঘট্টিত হওয়ায় সে সকলের সন্ধিস্থল বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল এবং কেমন এক একটা পটপট শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। জাগতিক পদার্থ-

সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ায় তখন কি যেন একটা বিষম বিভীষিকার ভাব উপস্থিত হইল। দেখিলাম, সুমেরুগিরি নৃত্য করিতে লাগিল। কল্প-বৃক্ষ ঐ গিরির কলেবর; উহা মেঘবসনে সমাবৃত হইল এবং নৃত্যকালে উচ্চ কুলশৈলরূপ বিশাল বাহু উত্তোলন করিল। সেই অবস্থাতেও সমুদ্র সকল স্বীয় মর্য্যাদা পরিহার করিতে পারিল না। দেখিলাম, বৃক্ষাবলী আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, আবার ভূতল হইতে আকাশে উৎপতিত হইল। পুরশ্রেণী ঘর্ঘররবে অধোদিকে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। গৃহ অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূমিসাৎ হইল। ভগবতী কালরাত্রি নাচিতে নাচিতে নানাদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নৃত্য-ব্যাপারে নিরত হইয়া যৎকালে তিনি ইতস্ততঃ হস্ত চঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তখন তদীয় নখরকিরণ নিঃসৃত হইয়া নানাদিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। সেই সকল নখরকিরণের অভ্যন্তরে দিন, যামিনী ও চন্দ্র রজতসূত্রের এবং সূর্য্যাদি পদার্থপুঞ্জ হেমসূত্রের ন্যায় পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন মেঘমুক্ত জলধারা যেন নীল নীরদ-পট-পরিধারিনী নীহারহারশালিনী ভগবতী কালরাত্রির ঘর্ম্মবিন্দুবৎ প্রতি-ভাত হইতে লাগিল। অসীম অনন্ত আকাশ তাঁহার লম্বমান কেশপাশ-স্থান অধিকার করিল, পাতালতল তাঁহার চরণযুগল হইল এবং ভূমণ্ডল তাঁহার উদর ও দিক্‌চতুষ্টয় তদীয় বাহু বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সমুদ্রমধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ তাঁহার ত্রিবলী, পর্ব্বতবৃন্দ পার্শ্ব-ভাগ এবং গগনরূপ অট্টালিকাস্থিত দোলায়মান প্রবহাদি পবন ও প্রাণা-পানাদি বায়ুপঞ্চক তাঁহার দোলারূপে বিভাত হইল। দেখিলাম,—সুমেরুপ্রভৃতি শৈলকুল তদীয় দেহে দুলিতেছে, মহীধররূপ মঞ্জরী-পুঞ্জময় জগৎরূপ মাল্যদাম—সেই ভগবতী পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার নৃত্যকালে সেই সকল মাল্য দুলিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিলাম, বুঝি বা নৃত্যচ্ছলে পুনরপি তিনি জগৎ-প্রলয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, নর, গন্ধর্ব্ব ও নাগাদি জীবজাতি যেন রোমরাজি; সেই সকল রোম-সমূহ দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সমাকীর্ণ। সেই বিশাল কলেবরের নিস্পন্দ অবস্থান অসম্ভব বলিয়াই তিনি যেন চক্রবৎ ঘূর্ণমান হইতেছেন। তাঁহার

গলদেশে একটা যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত আছে। উহার সূত্রত্রয়ের নাম কর্ম্মফল, কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু জ্ঞান ও কর্ম্ম যজ্ঞ। দেখিলাম, সেই দেবী ভগবতী আকাশে অনবরত নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘোরস্বরে বেদঘোষণা করিতেছেন। তাঁহার সেই নৃত্য-ক্রিয়ার ফলে আকাশ ভূতলে এবং ভূতল আকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া যাওয়ায় উহারা পরস্পর সমাবিষ্ট হইয়া গেল। তদ্‌ভিন্ন জগতের আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার ফলে ভূতল—আকাশ এবং আকাশ—ভূতল বলিয়া প্রতীত হইল। তদীয় বিশাল নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রচণ্ডবেগে নিঃশ্বাস-মারুত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি বহুকাল ধরিয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার সেই অবিশ্রান্ত নৃত্য ব্যাপার দেখিলাম,—দেখিয়া দেখিয়া ক্রমে আমি দর্শনে অক্ষম হইয়া পড়িলাম। নৃত্য বশতঃ তাঁহার দেহ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহাতে দেহসংলগ্ন শৈলকুল যন্ত্রবৎ ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। বিমানচর-গণ পতিত হইলেন এবং স্বর্গীয় দেবভবনরাজি পড়িয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। সুমেরু ও মলয় প্রভৃতি শৈলকুল বায়ুবিধূত পত্রবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বস্তু গজভগ্ন কপিত্থবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। বিন্ধ্য ও মহাদ্রি রাজহংসবৎ আকাশে উড়িয়া গিয়া অন্যত্র পতিত হইল। তাঁহার দেহ যেন সরোবর; তাহাতে দ্বীপপুঞ্জ—তৃণ-সমষ্টি, সমুদ্র সকল—বলয়-শ্রেণী এবং দেব-ভবনরাজি কমলকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই কালরাত্রির বিশাল দেহ নীলাভ নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায়, স্বপ্ন-সমবলোকিত কজ্জলময় নগরের ন্যায় এবং একত্র পুঞ্জীভূত সমগ্র সূর্য্যসম্মিশ্র প্রভাপটলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। সেই দেহা-ভ্যন্তরে মহ্য, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, মহেন্দ্র, ক্রৌঞ্চ, মন্দর, গোকর্ণ এবং বিদ্যাধরভবনাদি নিখিল মেদিনীমণ্ডলই যেন জঙ্গম হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সমুদ্র পর্ব্বতোপরি এবং পর্ব্বত অত্যুচ্চ গগনোপরি আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আকাশ রবি-শশীর সহিত একত্র মিলিয়া ভূমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক কোন্ অজ্ঞাত দেশে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরেই দেখিলাম,—চন্দ্র-সূর্য্যাদির অধিষ্ঠিত স্থানে এক

খণ্ড বনভূমি উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। এইরূপে জগৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল এবং সমুদ্রের প্রখর স্রোতে পড়িয়া তৃণরাশির ন্যায় নৃত্যবেগে কোথায় কোন্ দিক্প্রান্তে গিয়া ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে তৃণসমষ্টি যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে উপনীত হইয়া অনবরত ঘুরিতে থাকে, তেমনি সেই কালরাত্রি যখন নৃত্যারম্ভ করিলেন, তখন পর্ব্বত আকাশোপরি উত্থিত হইয়া, সমুদ্র সকল দিক্প্রান্তে প্রয়াণ করিয়া এবং নদ, নদী, সরোবর ও নগর প্রভৃতি নিজ নিজ আধারপ্রদেশ পরিহার-পূর্ব্বক স্থানান্তরে উপনীত হইয়া ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। সে কালে অগাধ জলসঞ্চারী মৎস্যপাল প্রভৃত জলাশয় সহ মরুস্থলীতে নীত হইল এবং সমুদ্রে যেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা যায়, তেমনি তথায় গিয়া মনের আনন্দে বেড়াইতে লাগিল। ভূতলের ন্যায় আকাশে উঠিয়াও নগর-নিচয় স্থিরভাবে অবস্থিত রহিল। পর্ব্বতবৃন্দও আকাশে উত্থিত হইল,—হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। নভস্তল হইতে কত সহস্র সহস্র নক্ষত্র রত্নপুঞ্জবৎ ভূমণ্ডলে পতিত হইল আর সহস্র সহস্র দীপাবলীর ন্যায় ঘূর্ণন করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনে মনে হইতে লাগিল, বুঝি বা দেবগন্ধর্ব্বগণ পরস্পরোপরি পুষ্পবর্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। দেখিলাম,—সৃষ্টি, সংহার, দিবারাত্রি বিভাগ, সকলই সেই কালরাত্রির দেহমধ্যে রজতবিন্দুবৎ বিভাসিত হইতেছে। শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ সকলও তদীয় দেহে প্রকাশ পাইতেছে। চন্দ্র এবং সূর্য্যমণ্ডল তাঁহার অঙ্গের রত্নাভরণরূপে বিরাজ করিতেছে। নিখিল নক্ষত্রনিকর তদীয় কণ্ঠের কমনীয় রত্নহারের স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বচ্ছাম্বরই তাঁহার পরিধেয়াম্বর হইয়াছে। অম্বরের মধ্যে মধ্যে যে উজ্জ্বল বিদ্যুদগ্নির স্ফুরণ, তাহাই তাহার পরি-ধেয়াম্বরের দীপ্ত রেখানিচয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেই ভগবতীর নৃত্যই যেন কল্পান্তকাল; তাহাতে এই ত্রিজগৎই সশব্দে বিলুণ্ঠিত হইলে ভাবিতে লাগিলাম, তদীয় চন্দ্র-সূর্য্যরূপ মণিময় অলঙ্কারনিচয়ের ঝঙ্কারধ্বনি যেন সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার-রাজির প্রভাপুঞ্জ যেন ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তৎকালে বিবসশ্রী শ্যাম শোভা ধারণ করিল। সূর্য্যদেব অধঃপতিত

হওয়ায় তদীয় তেঃপুঞ্জ অন্তর্হিত হইয়া গেল। জনগণ কোলাহল করিয়া ইতস্ততঃ লুঠিত হইতে লাগিল। অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের স্থিরতাবশত তাহারা সুস্থির হইয়াও ঐরূপ অস্থিরতায় আকুল হইল। তখন তাকাইয়া দেখিলাম, সর্ব্বত্রই কেবল নিবিড় অন্ধকার! সেকালে না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না শিব, না ইন্দ্র, না বহ্নি, না রবি, না সোম, কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই বিচ্ছিন্নভাবে বাতবিধূত মশকবৃন্দের ন্যায় অথবা বিদ্যুদ্‌বিলাসের ন্যায় অস্থিরভাবে সর্ব্বদিকে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। জগৎ যখন অব্যাকুল বা সুস্থভাবে থাকে, সৃষ্টি, স্থিতি, নাশ, ক্রিয়া, অক্রিয়া, বিধি, নিষেধ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি ভাবগুলি পরস্পর বিরোধিতাবশত বিভিন্নভাবেই বর্ত্তমান হয়; পরন্তু যখন বিপদ্ সময় আইসে, তখন সকলেই বিরুদ্ধভাব পরিহারপূর্ব্বক এক হইয়া অবস্থান করে। দেখিলাম, সে কালেও তাহাই ঘটিয়াছে। জগতের পরস্পর বিরোধী সর্ব্বভাবই একত্র মিলিয়া গিয়াছে। তদীয় দেহ-চিদাকাশে কত যে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহৃতি প্রভৃতি মিথ্যা ভ্রান্তি প্রতীত হইতে লাগিল, তাহার তখন অন্ত করা গেল না। তাঁহার শরীরে উদ্ভব, নিরোধ, উৎসব, ব্যসন, সমর, সাম, অনুরাগ, বিরাগ, ইত্যাদি কত অনন্ত বিরুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কতিবিধ বিরুদ্ধ সৃষ্টিও তদীয় দেহে দৃষ্ট হইল। সেই ভগবতী কালরাত্রির দেহ পরমার্থদর্শনে চিদাকাশময়; কিন্তু তদ্‌বিপরীত দৃষ্টিতে মায়াবরণে উপলভ্যমান জগতের কত অনন্ত উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহৃতি প্রভৃতি—তিমিররোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে আকাশে কেশগুচ্ছবৎ পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। এ জগৎ নিশ্চল অধিষ্ঠানসত্তায় অবস্থিত; সুতরাং ইহা বাস্তব পক্ষে চঞ্চল না হইলেও দর্পণপ্রতিবিম্বে অচল পর্ব্বতও যেমন চঞ্চল দেখা যায়, তেমনি এ জগৎ চঞ্চলাকার পরিদৃষ্ট হয়। সেই ভগবতী যখন নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই নৃত্যাবেশে মায়ার উদরোদ্ভূত নিখিল জগৎই প্রতিক্ষণে এক স্থিতি ছাড়িয়া স্থিত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে লাগিল। একবার দেখিলাম, তাঁহার দেহে কত জগৎ ক্রিয়াশক্তিযোগে সংগৃহীত হইয়াছে, আবার দেখিলাম, তৎসমস্তই পরক্ষণে আপনা হইতে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ ক্রিয়াশক্তিরূপিণী ভগবতী কখন

লক্ষ্যীভূত এবং কখন বা অলক্ষ্যীভূত হন। তিনি কখন অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হ্রস্বকায়, আবার কখন অসীম আকাশব্যাপিনী অনন্ত মূর্ত্তি। সেই যিনি ভগবতী কালরাত্রি, তিনিই আমাদের জগন্ময়ী সংবিৎশক্তি। তিনি অনন্তা —বিশুদ্ধ পরমাকাশরূপে বিরাজমানা। তিনিই ত্রিকালস্থ ত্রিজগতের অন্তর্গত চিৎস্বরূপা। সুতরাং পূর্ব্বতন বাসনার বশে পুরুষমানসে যে সংসার-ভাব উদ্রিক্ত হয়, তাহার উপাদান ঐ ভগবতী কালরাত্রিই। উনিই অবিদ্যাচ্ছন্ন চিৎস্বরূপে বিরাজিতা। এ নিমিত্ত বলা যায়, এই সংসার-চিত্ররূপে উনিই দেদীপ্যমানা। যৎকালে বিদ্যার গুণে অবিদ্যামালিন্য অপগত হইয়া যায়, তখন উনি প্রশান্ত আকাশাকারেই পরিণত হইয়া থাকেন। এইরূপে উনি বিদ্যা ও অবিদ্যাক্রান্ত দ্বিবিধ রূপই ধারণ করেন। ঐ দেবীর যে অনন্ত চিন্ময় দেহ, তাহাতে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্ফটিকোপলের উপরিতন পদ্মচক্রাদি রেখারাজিবৎ পরিজ্ঞায়মান হয়। ফল কথা এই যে, সমুদ্রের যেমন তরঙ্গমালা, তেমনি ঐ সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেই আকাশরূপিণীর আকাশাকৃতি হইতে অভিন্ন।

রামচন্দ্র! এইরূপে সেই সুবিশালকলেবরা ভীষণাকৃতি দেবী ভগবতী অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া পূর্ব্বোক্ত ভৈরবমূর্ত্তি কল্পান্ত-রুদ্রের পুরোভাগে অবস্থান করত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কল্পান্ত-রুদ্রের ললাটস্থ অনলতাপে সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হইয়া গেল—স্থাণুমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। প্রলয়ের প্রবল প্রভঞ্জনে পরিধুনিত অরণ্যানীর ন্যায় সেই নৃত্যনিরতা দেবী নৃত্যাবেশে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। দেখিলাম, কুদ্দাল, উদূখল, চর্ম্মাসন ও ফল কুম্ভাদি বস্তু সমস্ত তদীয় মাল্যদাম মধ্যে গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি ঐ প্রকার মাল্য ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার ঐ মাল্যদাম হইতে দিকে দিকে কুসুমনিকর প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। দেবীর সেই উদ্ধত উদ্ভট নৃত্যব্যাপারে মাল্যগত পুষ্পাবলী যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি নৃত্য করিতে করিতে আকাশবৎ বিশালদেহে সেই রুদ্রদেবতার পূজা করিতেছেন। সেই কল্পান্ত-রুদ্রও তাঁহারই ন্যায় বিশালকলেবর ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হে সভাস্থ শ্রোতৃগণ! সেই ভগবতী কালরাত্রি গলে মুণ্ডমালা ধারণ

করিতেছেন; তাঁহার মস্তকে বৈনতেয়-পক্ষ-বিনির্ম্মিত শিখা—হস্তে প্রেত-রাজবাহন মহিষের বিশাল শৃঙ্গ; সেই শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে 'ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং' এবম্বিধ তালনাদে তিনি নৃত্যনিরত হইয়াছেন এবং এক এক বার সেই কালভৈরবের প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন। এবম্বিধ কালরাত্রি-বন্দিত ভগবান্ কালরুদ্র তোমাদিগের রক্ষা বিধান করুন।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি প্রথমে যে প্রলয়বর্ণন করেন, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, সকলই নষ্ট হইয়াছে, কুত্রাপি কিছুই বিদ্যমান নাই। এ অবস্থায় সেই ভগবতী কালরাত্রি আবার কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন,—আসিয়া কোথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন? তাঁহার মাল্যের উপাদানভূত যে সকল বস্তুর উল্লেখ করিলেন, সে সকলও তো কিছুই নাই; অথচ তৎসমুদয়-নির্ম্মিত মাল্যই বা তিনি কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? প্রলয়ে এই ত্রিজগৎ লয় পাইয়া গেল; এইরূপ কথাই তো আপনি কহিলেন; তবে আবার উল্লিখিত শূর্পফলাদি বস্তু সেই ভগবতীর গল-বিলম্বিত মাল্যদামে কোথা হইতে আসিল? সমস্তই নির্ব্বাণ—কুত্রাপি কিছুই নাই; এ অবস্থায় সেই দেবী ভগবতীই বা কোথা হইতে আসিয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন? এই ঘটনার নিগূঢ় তত্ত্ব কি, তাহা আমার নিকট বিশদভাবে বিবৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে যে নৃত্যনিরত ব্যক্তির কথা বলিয়াছি, জানিবে,—তিনি না স্ত্রী, না পুরুষ, কিছুই নহেন। তাঁহার ঐ যে নৃত্য-ব্যাপার, সেটাও বস্তুগত্যা অকিঞ্চিৎ। সেই ভৈরব-ভৈরবীও কিছুই নহেন। তাঁহাদের যে আকৃতি-কল্পনা, সেটাও মিথ্যা। যিনি সর্ব্ব-

কারণের কারণ, অনাদি অনন্ত শিবস্বরূপ চিদাকাশ, তিনিই সেই ভৈরবাকারে লক্ষিত হইয়াছিলেন। জগৎপ্রলয়ের পর সেই পরমাকাশরূপ চিদাকাশই ঐ ভাবে অবস্থান করেন। সুবর্ণ যেমন নিরাকারভাবে থাকে না, একটা না একটা আকৃতি তাহার থাকেই, তেমনি উল্লিখিত পরমাকাশের চেতনস্বরূপতা নিবন্ধন ঐ প্রকার স্বভাব—রুদ্র ও কালীমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রুতির নির্দ্দেশও এইরূপই। হে মহামতে! ভাবিয়া দেখ দেখি, চেতন ভিন্ন চৈতন্য তিষ্ঠিতে পারে কি? ফলতঃ তীক্ষ্ণতা ভিন্ন মরীচ, কোন একটা আকৃতি ব্যতীত সুবর্ণ, স্বস্বরূপ-হীন পদার্থ এবং মাধুর্য্যবর্জ্জিত ইক্ষুরস যেমন অসম্ভব, তেমনি চেতন ভিন্ন চৈতন্যও সম্ভবপর নহে। আর যদিই বা সম্ভব হয়, তবে অচেতন চৈতন্য চৈতন্য বলিয়াই নির্দ্দেশ্য নয়। অথচ এ দিকে চিদাকাশের যে নাশ হইবে, তাহাও কখনও সম্ভবপর নহে। এ জগৎ চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; ঐ ব্রহ্মসত্তা হইতে উহার অতিরিক্ত রূপ কখনও হইতে পারে না। তবে ব্রহ্ম আপনাতে আপন অতিরিক্ত বহুল রূপ অঙ্গীকার করিবার অভিপ্রায়েই অগ্রে তিনি আকাশাকারে উৎপন্ন হন,—হইয়া আপনাকে আকাশভিন্ন করেন। সুতরাং সেই চিন্ময় ব্রহ্মের অক্ষুব্ধ সত্তাই—সেই আদ্যন্ত-বর্জ্জিত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সত্তামাত্রই এই ত্রিজগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংস্থিতি। এই যে ভূমি, ঐ যে আকাশ, এই সকল দিক্, আর সেই সেই সংস্থিতি, উৎপত্তি, নামনিরুক্তি, শূন্য, জনন, মরণ, মায়া, মোহ, মন্দতা, বস্তু, অবস্তু, বিবেক, বন্ধ, মোক্ষ, শুভ, অশুভ, বিদ্যা, অবিদ্যা, দেহসম্পন্নতা, ক্ষণ, লব, চিরকাল, চঞ্চলতা, স্থৈর্য্য এবং তুমি, আমি, অন্য, সৎ, অসৎ, মূঢ়তা, পাণ্ডিত্য, দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদি কল্পনা, এতদ্ভিন্ন সেই যে রূপ, আলোক, মন, কর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও অগ্নি, ইত্যাদি নিখিল বস্তুরূপে উল্লিখিত সত্তামাত্রই বিস্তার পাইয়া থাকে। এই যে কিছু দৃশ্য প্রপঞ্চ, এতৎসমস্তই একমাত্র সেই শুদ্ধ নিরাময় চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নয়। ঐ চিদাকাশ নিজের আকাশভাব পরিহার করেন না,—না করিয়াই এই সকল প্রপঞ্চাকারে অবস্থান করেন। ফল কথা, যত কিছু বস্তু, সমস্তই

নির্ম্মল আকাশ মাত্র। এ কথায় সন্দেহাবসর কিছুই নাই। এ বিষয়ের অখণ্ড দৃষ্টান্ত স্থলে স্বপ্নাদিই সবিশেষ উল্লেখ্য। আমি যাঁহাকে চিন্ময় পরমাকাশ নামে উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই শিব এবং তিনিই সত্য সনাতন। তিনিই হরি হন, তিনিই চন্দ্রসূর্য্য-রূপে বিরাজ করেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ; কুবের, অনল, অনিল, এ সকলও তিনিই হইয়া থাকেন। অপিচ তিনিই বারিধর এবং তিনিই সাগররূপে অবস্থান করেন। গত দিবস যে বস্তু ছিল বা ছিল না, সে বস্তুও তিনিই। বস্তুতঃ যে কিছু পরিস্ফুরিত হয়, এতৎসমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সকলই সেই চিন্ময় আকাশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুকণা। অযথা ভাবনার প্রভাবেই সেই চিদাকাশ এবম্বিধ নানানামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। পরন্তু স্বভাব মাত্রের অববোধে তিনি যেরূপ, সেইরূপেই অবস্থান করেন। অজ্ঞদৃষ্টিতে এই জড় জগৎরূপেই তাঁহার অবস্থিতি; পরন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে নিজ বোধস্বরূপেই তিনি অবস্থিত। এতাবতা জানিবে—সমস্তই শান্ত শিব; দ্বিত্বৈকত্ব কিছুই নাই। জীব যতদিন পরস্বভাবে অনভিজ্ঞ থাকে, সেই পর্য্যন্তই সংসারসাগরের ঊর্ম্মিমালায় সমাপ্লুত হয়। কিন্তু যখন স্বস্বভাবে অভিজ্ঞ হইতে পারে, তখন তন্ময়ভাবে সেই নিরাময় পদেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানে সকলই প্রশান্ত; সে কালে সেই এক অনন্ত চিদাকাশই মাত্র বিরাজিত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট চিন্মাত্র পরমাকাশই শিবনামে নিরূপিত; উহাঁকেই আমি শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। উনিই তখন রুদ্ররূপে তাণ্ডব করিয়াছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ! সেই রুদ্রের যেরূপ আকৃতির বিষয় বলিয়াছি, সে আকৃতি বাস্তব পক্ষে আকৃতি নহে। যাহা চিদ্‌ঘন আকাশ, তাহাই তথাবিধাকারে তৎকালে আমার

প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। আমিই তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু অন্যে হইলে কি হইত?—কিছুই বুঝিতে পারিত না। সেই কল্পান্ত, সেই রুদ্র, আর সেই ভৈরবী,—এ সকলই মায়া—মায়া! আমি এ রহস্য বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলাম। যিনি পরম শূন্য চিদাকাশ, তিনিই পূর্ব্বোক্তরূপ আকার-সন্নিবেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ ভৈরবাকারেও তাঁহারই পরিণাম হইয়াছিল। আমি কল্পনার চক্ষে সে কালে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বাচ্য-বাচক কল্পনাদৃষ্টি ভিন্ন বর্ণন করা সম্ভবপর নহে। কাজেই আমার যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপই বর্ণন করা হইল।

হে রাঘব! চিরদিনের অভ্যাসগুণে এ জগতে যে সকল আধিভৌতিক প্রপঞ্চ কল্পনাময় জড়াকারে পরিণত হইয়াছে, ক্ষণমধ্যেই লোকের তাহাতে সত্যতা ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এইরূপ ভ্রান্তি যাহাতে অপগত হইয়া যায়, তাহা করা একান্তই বিধেয়। বস্তুতঃ তিনি ভৈরবী, ভৈরব বা কল্পান্ত, কিছুই নহেন। ফলে সকলই ভ্রমমাত্র; কেবল সেই এক চিদাকাশই বিরাজমান। ঐ চিদাকাশ হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর, সঙ্কল্পকৃত সংগ্রামবেগ, কেবল মাত্র বাগ্‌বিন্যাসে রসানুভব এবং মনঃকল্পিত রাজ্যবিলাস, তেমনি চিদাকাশ হইতেই এই প্রপঞ্চ-প্রকাশ। স্বপ্নে যেমন নগর দেখা যায়, স্বচ্ছাম্বরে ভ্রমবশতঃ যেমন মূর্ত্তি দর্শন ঘটে এবং নীলাকাশে যেমন কেশগুচ্ছ অবলোকিত হয়, তেমনি যিনি সেই চিদ্‌ঘন আত্মা, তাঁহাতেই চিদ্‌-বিরহিত জড় পদার্থের প্রত্যয় হইয়া থাকে। চিন্মাত্র বিশদাকাশ স্বয়ং স্বস্বরূপে দেদীপ্যমান। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রতিভান, জানিবে,—ইহা আত্মারই জগদাকারে পরিস্ফুরণ। স্বাত্মা যেমন চিদাকাশে দেদীপ্যমান, তেমনি পটেও তিনি প্রকাশমান। প্রলয়ের সেই ভীষণ বহ্নির ঘোর তাণ্ডবেও তিনি বিদ্যমান।

রামচন্দ্র! শিব-শিবার আকার নাই, ইহা আমি বিশদভাবেই বুঝাইলাম। এক্ষণে তাঁহার সেই নর্ত্তনব্যাপের তত্ত্ব আমি নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ কর। শুক্তিকাদির যাহা যথার্থ জ্ঞান, সে জ্ঞান যখন

তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে অন্য একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই ধারণা হয়; কিন্তু সেটা কিছুই নয়। এইরূপে বলা যায়, স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইলেই অযথা জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। অবস্তু জ্ঞান ভ্রম ভিন্ন হয় না, এইরূপে চেতন বস্তুর যে চৈতন, তাহাও স্পন্দ বিনা তিষ্ঠিতে পারে না। চেতনের প্রকৃতিই বটে স্পন্দ; নিজের আকার-ঘটনার মহিমায় সুবর্ণ যেমন রজতাকারে বিরাজিত হয়, তেমনি আপন স্পন্দস্বভাবতা নিবন্ধন আত্মাও রুদ্ররূপে বিরাজ করিতে থাকেন। স্বভাব-গুণে চেতনই স্পন্দ-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়; কেন না, স্বভাব হইতেই বস্তুর আকার-সন্নিবেশ হইয়া থাকে। ঐ চিদ্‌ঘন শিবাত্মার স্পন্দই আমাদের সম্মুখে স্ববাসনার আবেশবশে নৃত্যাকারে বিরাজমান হয়। সুতরাং বুঝিয়া দেখ, কল্পান্তে সেই ভীষণ রুদ্রদেবের যে নর্ত্তন, তাহা সেই চিদ্‌ঘনের নিজ স্পন্দ বৈ আর কিছুই নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চের তো অভাবই হইয়া পড়ে। সে পক্ষে আমার জিজ্ঞাসার বিষয় কিছুই নাই। তবে অতত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার নিকট জানিতে চাই—এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষতই প্রত্যয়গোচর হইতেছে, কল্পান্তে ইহা নিঃশেষরূপেই বিনাশ পাইয়া যায়, ইহার কিছুই কুত্রাপি থাকে না। তাদৃশ ভীষণ কল্পান্ত সংঘটিত হইবার পর এই মহাশূন্য পরমাকাশে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই ত্রিপুটীভাব সম্পূর্ণরূপেই বিলীন হইয়া যায়। তৎকালে এই চিদ্‌ঘন চেতনের চেত্যানুভব কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়া থাকে? ফল কথা, আপনি যে সেই রুদ্র ও কালরাত্রিপ্রভৃতির কথা কহিয়াছেন, তাঁহাদের নৃত্য সম্ভাবনা কিরূপে হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তোমার যদি এ সম্বন্ধে সন্দেহোদ্রেক হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। এই আকাশ চিন্মাত্র; ইহাতে চেত্যভাব কিছুমাত্র নাই। চিদাকাশ কদাচ কোন বিষয়ের অনুভব করেন না; তিনি বিজ্ঞানঘন আকাশরূপে সর্ব্বদাই পাষাণবৎ অচল অটলভাবে বিরাজ-মান। আমাদের যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে, এতৎসমস্তই চিতের স্বভাব। এই চিৎস্বভাবই পূর্ব্বোক্ত কালরাত্রিরূপে প্রথিত; ঐ স্বভাব শান্ত—

আপনিই আপন সত্তায় অবস্থিত। ইহার বিপর্য্যয় অণুমাত্রও নাই। স্বপ্নকালে পুরপত্তনাদিরূপে চিৎই অন্তরে প্রকাশিত হয়; কিন্তু বস্তুত তাহা যেমন পুর-পত্তনাদি নয়—বিজ্ঞানময় আকাশই, তেমনি সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে চিদাত্মাই আপনাতে জ্ঞেয় প্রপঞ্চ অনুভব করিতে করিতে স্বয়ম্প্রকাশময় হইয়াই অবস্থান করেন; তদীয় স্বস্বরূপের ব্যতিক্রম কিছুমাত্রই ঘটে না। এই চিৎ স্বস্বভাবরূপ অম্বরোদরে আপনিই প্রকাশমান হন এবং স্বীয় কল্পনাবশে আপনাতেই ক্ষণ, কল্প, জগৎ, ইত্যাকার ভ্রম অবধারণ করিয়া থাকেন। নিজের অন্তরে নিজেই চিদাকাশ স্ফুরিতপ্রভাময়রূপে অবস্থিত হইয়া স্বস্বভাবাকাশে 'আমি' 'তুমি' ইত্যাকার কল্পনাকুল হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, দ্বিত্ব একত্ব কিছুই নাই এবং শূন্যতা, চেতন, অচেতন, মৌন, ইত্যাদিও কিছুমাত্র নাই। কেহ কোথাও চেত্যাকারে কিছু যে অনুভব করিতেছে, তাহাও নহে। সুতরাং কেহ যে অনুভবকর্ত্তা আছে, তাহাও নাই। অবশেষে কেবল মৌনই বিরাজমান। সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত—নির্ব্বিকল্প সমাধিই; সে সমাধির স্বরূপ পাষাণবৎ নিশ্চলীভাব। তাই বলিতেছি, তুমি মৌনিভাবে তাদৃশ নিশ্চলীভাব অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত হও।

রামচন্দ্র! অলৌকিক ঐশ দর্শনের অভ্যাসক্রমে তুমি যথালব্ধ নিজ রাজ্যাদি পালন করিতে থাক,—পরমার্থ দর্শনে নিশ্চল হও,—মদ, মান, মোহ ও শরীরজীবাভিমান পরিহার কর এবং আকাশবৎ স্বচ্ছ শান্তভাবে বিরাজ করিতে থাক।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনীন্দ্র! সেই ভগবতী কালী নৃত্য করেন কেন? আর কেনই বা তিনি তথাবিধ শূর্প-কুদ্দালাদির মাল্য ধারণ করেন? এ রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে যাঁহাকে চিদাকাশ শিব নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই সেই ভৈরব; তাঁহারই মনোময়ী স্পন্দশক্তির নাম ঐ মায়া বা কালী। যেমন পবন ও পবনস্পন্দ অভিন্ন এবং যেমন উষ্ণতা ও অগ্নি একই পদার্থ, তেমনি চিন্ময় শিব ও তাঁহার স্পন্দশক্তি ঐ মায়া বা কালী স্বতত অপৃথগ্‌ভূত; উঁহারা কদাচ ভিন্ন নহেন। স্পন্দ দ্বারা পবনের যেমন অনুমান হয় এবং উষ্ণতায় অনলের যেমন উপলব্ধি হয়, তেমনি ঐ যে শিবাখ্য একান্ত স্বচ্ছ শান্ত চিদাত্মা, তিনিও স্পন্দশক্তি দ্বারাই পরিলক্ষিত হন। ইহা ভিন্ন তদুপলব্ধির উপায়ান্তর নাই। ঐ যে শান্ত শিব চিন্মাত্র, তত্ত্বজ্ঞানীরা অবগত আছেন,—উনিই সেই অবাঙ্মনস-গোচর ব্রহ্ম। তাঁহার ইচ্ছা স্পন্দশক্তি; এই ইচ্ছারূপিণী শক্তিই দৃশ্য প্রকাশ করেন। যেমন সাকার নরের ইচ্ছায় সঙ্কল্প নগর নির্ম্মিত হয়, তেমনি ঐ সাকার শিবের ইচ্ছাক্রমেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই জীবগণের জীবন হয়। এই নিমিত্ত উনি জীবচৈতন্য নামে এবং সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া প্রকৃতি আখ্যায় ও দৃশ্যাভ্যাসানুভূত উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করায় ক্রিয়া নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। যেমন বাড়বানলের শিখা, তেমনি ঐ মায়া দৃশ্যমান সৌরমণ্ডল-তাপে শুষ্ক হওয়ায় শুষ্কা নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। উনি অতীব প্রচণ্ড বা তীক্ষ্ণস্বভাব; তাই উহাঁর নাম চণ্ডিকা। উনিই একমাত্র জয়প্রতিষ্ঠা, তাই উঁহার নাম জয়া। ঐ মায়াই সর্ব্ববিধ সিদ্ধির আশ্রয়ভূতা; তাই উনি সিদ্ধা নামে অভিহিতা। সর্ব্বত্রই উনি বিজয় লাভ করেন, তাই বিজয়া-জয়ন্তী ও জয়া নামে উনি নির্দ্দিষ্টা। কেহই ইহাঁকে পরাজয় করিতে পারে না, তাই ইনি অপরাজিতা নামে নিরূপিতা; ইহাঁর মাহাত্ম্য অবগত হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবে না; তাই ইহাঁর নাম দুর্গা। ইনিই প্রণবের সারাংশ শক্তি, তাই ইঁহার নাম উমা। যাহারা ইঁহার নাম গান করে, তাহাদের ইনি পরমার্থস্বরূপ; তাই ইঁহার নাম গায়ত্রী। নিখিল জগতের প্রসবকারিণী; তাই ইনি সাবিত্রী; ইঁহা হইতেই স্বর্গ-মোক্ষাদি বিষয়ক সর্ব্বোপাসনার জ্ঞানদৃষ্টি-ধারা প্রবাহিত হয়, তাই ইনি সরস্বতী-আখ্যায় অভিহিতা। ইনি গৌরাঙ্গী,

তাই গৌরী, আর যখন শিবসঙ্গিনী, তখনও ইঁহার গৌরী নামে প্রসিদ্ধি। যত কিছু সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ প্রাণী আছে, তাহাদের হৃদয়মন্দিরে অনাহত নাদরূপে অকারাদি মাত্রাত্রয়-বিরহিত শব্দব্রহ্মাখ্য প্রণবের নাদভাগের যে সতত সমুচ্চারণ, তাহা ইহা হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; আর হৃদয়পদ্মের যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ছিদ্র, তাহাতে লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত দহরাখ্য শিবের শিরোভাগস্থ ভূষণবিন্দুরূপা যে ইন্দুকলা, তাহাও ইনিই; তাই ইঁহার নাম উমা। কাল ও কালী, উভয়ই আকাশস্বরূপ; তাই উঁহারা কালবর্ণ। উঁহারা সৃষ্টি-সঙ্কল্পময়ী দৃষ্টি দ্বারা আকাশকেই মাংসময় শ্যাম শরীরাকারে দর্শন করিয়াছিলেন। উঁহারাও বস্তুগত্যা আকাশ বৈ আর কিছুই নহেন। যেমন আকাশেই আকাশের অবস্থিতি, তাহার আর আধারান্তর নাই, তেমনি তাঁহাদের যে কল্পিত কলেবর, তাহাও আকাশেই বিরাজমান। আকাশ যেমন কোনরূপ মূর্ত্তি-বিরহিত, তেমনি তাঁহাদেরও কোনই মূর্ত্তি নাই। যেমন আকাশ স্বচ্ছস্বরূপ, তেমনি তাঁহারা স্বচ্ছকায়। বিশেষভাবে দেখিলে দেখা যায়, তাঁহারা যেন আকাশেরই অগ্রজদ্বয়। এক্ষণে হস্ত, পদ, মস্তক ও মুখভেদে তাঁহাদের বিভিন্ন অবয়ব এবং হল-সূর্পাদি বিবিধ বস্তুর মালা ধারণ কি প্রকার, তাহাই বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। সেই যে পরিস্পন্দরূপিণী ভগবতী কালী, তিনি আদি-অন্ত-বিরহিত চিৎশক্তিরূপিণী হইলেও স্বীয় ইচ্ছানুসারেই নিখিল বেদোদিত ক্রিয়া-স্বরূপ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত স্নান, দান ও অর্চ্চনাদি বেদোক্ত নিখিল ক্রিয়াই তাঁহার কলেবর; এই কারণ তদীয় নানাবিধ সাভিনয় নৃত্য ব্রহ্মার কর্ম্মফল ও সমগ্র প্রাণীর সৃষ্টি-স্থিতি-জরা-মরণাদিরূপে পর্য্যবসিত। তিনি ক্রিয়ারূপিণী; ক্রিয়াও নিরবয়বা নহে; তাই স্বীয় কলেবর মধ্যে কর-চরণাদির অবয়ব তিনি ধারণ করেন, আর সেই সকল অবয়ব স্পন্দিত করত ক্রিয়াকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডধারিণী কালী নিজাঙ্গস্বরূপ এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিলেও তিনি চিন্ময়ী দেবী—তাঁহার আকারসংস্থান কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে শিবত্ব বৈ অন্য কিছুই তাঁহাতে দেখা যাইবে না।

রামচন্দ্র! আকাশের, বায়ুর এবং চন্দ্রিকার অঙ্গ যেমন যথাক্রমে শূন্যতা, স্পন্দ ও কুমুদবিকাশ, তেমনি চিতের অঙ্গ এই দৃশ্যপরম্পরা। এই দৃশ্যপরম্পরাও চিতের স্পন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ বুঝিবে,—সেই চিৎই নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, শান্ত, অব্যয় শিবনামে অভিহিত। স্পন্দ-ধর্ম্ম বা নিশ্চলতাধর্ম্ম, এই উভয়ের কোন কিছুই তাঁহাতে নাই। তবে যে তাঁহার ক্রিয়াস্বরূপতা, জানিবে,—তাহা কেবল অজ্ঞানদশাতেই হয়। চিৎ যে কালে সম্যক্‌বোধে ক্রিয়াস্বভাব হইতে ব্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বাস্তব স্বভাবে অবস্থিত হন, তখন উহঁাকে শিবাখ্যায় অভিহিত করা হয়। যখন অবিদ্যাবশে কূটস্থ চৈতন্যের চিৎশক্তি প্রতিকূল স্পন্দ জড়ভাবে অবস্থান করেন, তখনকার সেই অবস্থার নামই ক্রিয়া বা ভগবতী কালী। এই লোক-সমূহ-সমাকুল সৃষ্টিপরম্পরা—সেই কল্পিত-কলেবরা বিশালাবয়বা চিৎশক্তিরূপিণী কালীরই অঙ্গসঙ্ঘ। এই সপ্তদ্বীপ-শালিনী ধরিত্রী, এবং ইহার অভ্যন্তরে যে সকল বনভূমি ও উপত্যকাদিময় পর্ব্বতভূমি আছে, এ সকলও তাঁহার অঙ্গ। যাহা অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদত্রয় ও আণ্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যাসমষ্টি, যাহাতে বিবিধ বিধিনিষেধ-বিষয় বিরাজমান, যাহা শুভাশুভ কর্ম্মের নির্দ্দেশকর, পুরোডাশাদি হোমীয় বিষয় সকল যাহাতে উল্লিখিত এবং রাজা, উদূখল, বৃষী, শূর্প ও যূপকাষ্ঠাদি দ্বারা যাহা বিশেষিত, এতাদৃশ দক্ষিণাগ্ন্যাদি হোমসম্বন্ধীয় যজ্ঞনিচয়, শূল-শক্তি প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র ও গজাশ্বযোদ্ধৃপুরুষ-পরিবৃত ভীষণোজ্জ্বল রণস্থল, দেবগন্ধর্ব্বাদি চতুর্দ্দশ লোকস্থিত জীবনিবহ, এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দশ মহাসাগর, দ্বীপ ও ভুবনসমূহ,—এই সমস্তই সেই ভগবতী কালীর অঙ্গসমষ্টি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার বর্ণনায় শুনিয়াছিলাম,—প্রলয়কালেও সেই রুদ্রকালীরূপিণী চিৎশক্তির সমক্ষে ভূত ও ভাবী সৃষ্টি সকল বিরাজিত ছিল। এ বর্ণনায় আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তাৎকালিক ঐ সৃষ্টিপরম্পরা কি কার্য্যকারণক্ষম সৎস্বভাবে অবস্থিত ছিল? অথবা অসত্য মরীচিকার ন্যায় অনুভূয়মান হইয়াছিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যিনি সত্য সঙ্কল্পবতী চিৎশক্তি, তাঁহারই দ্বারা বস্তুসঙ্কল্প হয়। সত্যসঙ্কল্প চিৎ হইতেই তাহা সত্যাকারে

প্রতীত হইয়া থাকে। যদি চিদ্‌ভিন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা একান্তই অসত্যরূপে উপলভ্যমান হইয়া থাকে। এইরূপে চিতের সত্তাক্রমেই নিখিল বস্তু সত্য বলিয়া বোধ হয়। যেমন সম্মুখস্থ মুখের সত্তাবশেই মুকুরগত মুখপ্রতিবিম্ব অবিকল মুখেরই ন্যায় সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, তেমনি এই বাহ্য প্রপঞ্চও চিৎসত্তাতেই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহা চিৎস্বরূপের প্রকৃত স্বরূপ, তাহা অজ্ঞাত থাকে বলিয়াই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহাতে সঙ্কল্পনগরবৎ সত্যরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। চিৎ যখন সুদৃঢ় ধারণার প্রভাবে বিশুদ্ধ অবস্থা উপগত হন, তখন আর বাহ্য প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। আমার মতে, মুকুরে, স্বপ্নে বা সঙ্কল্পে যে স্থানেই যাহা প্রত্যয়গম্য হইয়া কার্য্যকারিরূপে বিভাত হইবে, তৎসমুদায়ের কার্য্যকারিত্ব নিবন্ধন তাহাই সত্যরূপে নির্দ্দেশ করা বিধেয়। বলিতে পার, মুকুরাদিতে যে বস্তু প্রতিবিম্ব হয়, তাহার কার্য্যকারিত্ব কোথায়? এতদুত্তরে বলা যায়, মুকুরের মধ্যে যে বস্তু অবস্থিত, তাহা দ্বারা বাহ্যিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? একটা দৃষ্টান্ত দেখাই, তুমি যদি বিদেশে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে তোমা দ্বারা বাড়ীর কোন কার্য্য হইতে পারে কি? যদি পারে, তবে বলিব, তোমার সে দেশান্তরের সত্তা নিশ্চিতই মিথ্যা। যেমন যে দেশে যে গ্রাম থাকে, সেই দেশেরই তাহা কার্য্যোপযোগী হয়, তেমনি মুকুরাদির যে প্রতিবিম্বাদি, তাহাও মুকুরাদিরই কার্য্যোপধায়ক হইয়া থাকে। আরও দেখ, স্বপ্নে যে নগরাদি দেখা যায়, তাহা স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টারই কার্য্যসাধক হয়; এ বিষয়ে সন্দেহাবসর আছে কি? এইরূপে বিশেষ বিশেষ কালে সেই সেই ভাবাপন্ন বস্তুযোগে সকলেরই কার্য্য সাধন হইয়া থাকে। আপনার যাহা প্রকৃত কার্য্যজনক হইবে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া বোধ হইবে; পরন্তু অন্যের নিকট সেরূপ বোধ হইবে না। অন্যের কাছে তাহা অসত্যরূপে প্রতীত হওয়াই সম্ভবপর। সুতরাং চিৎশক্তির অন্তরালে যে সমুদায় সৃষ্টিপরম্পরা অবস্থিত, তাহাকে যিনি আত্মা বা আপন বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন, তাঁহার নিকট উহা সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ প্রকার ধারণা যিনি করেন না, তাঁহার নিকট এই সমস্ত প্রপঞ্চই

অসত্য বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপে এই সঙ্কল্প-কল্পিত সত্যকে ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়েই স্থিতিশীল বলা হয়; নহিলে আত্মার সর্ব্বময়ত্ব অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ সমস্তই যখন অসৎ, তখন তো আত্মাতে সর্ব্বময়তা থাকিতে পারে না। মনে কর, দেশান্তরে গিরি-গ্রামাদি আছে; সে সকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে না, অথচ লোকের কথাগত তাহা যেমন সত্য বলিয়া ধারণা হয় এবং সেখানে গিয়া দেখিলেও যেমন সত্যরূপে বিদিত হওয়া যায়, তেমনি যিনি যোগসিদ্ধ হইয়া আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি যখন সৃষ্টিভাবাপন্নরূপে চিন্তা করিতে থাকেন, তখন এই সৃষ্টিপরম্পরাকে সত্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইতে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি-চলনের ন্যায় সৃষ্টিভাবাপন্ন চিৎশক্তি সৃষ্টিভাব হইতে চালিত হইলে তখন এই জগৎও চলিত হয় বলিয়া মনে হয় বটে; পরন্তু মুকুরপ্রতিবিম্ববৎ বস্তুতঃ তাহা পরিচালিত হয় না। কেন হয় না? তাহার কারণ, এই যে ত্রৈলোক্যরূপ বিরাট ব্যাপার, ইহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুগত্যা অকিঞ্চিৎ ভ্রান্তি মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং যাহা ভ্রান্তি, তাহার আর চলন বা অচলন কি? রাম! স্বপ্নের দেখা নগরী কখন বোধ হয় সত্য, কখন মনে হয় অসত্য, কখন বোধ হয় ভগ্ন-বিচূর্ণ এবং কখন মনে হয় বিদ্যমান, অথচ উহা যেমন সর্ব্বদাই কেবল ভ্রম, এই যে পরিদৃশ্যমান দৃশ্যপ্রপঞ্চ, ইহাও জানিবে সেইরূপই।

হে রাঘব! জানিও,—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অবাস্তব ভ্রান্তিমাত্র। কল্পনাদৃষ্ট বস্তু, মনোনির্ম্মিত রাজ্য, স্বপ্নাবস্থার আলাপপরিচয় এবং ভ্রমলব্ধ বস্তুর অনুভূতির ন্যায়ই এই ত্রৈলোক্যকে অনুভব করিতে হইবে। 'আমি' 'জগৎ' এই প্রকার ভাব চিদভ্যন্তরে একেবারেই নাই; ফলে 'জগৎ' বা 'আমি' সকলই ভ্রম মাত্র; যদি বিশেষরূপে বিদিত হওয়া যায়, তবে আর এই ভ্রান্তির সত্তা থাকিতে পারে না।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই ভগবতী ঐরূপে পরিস্পন্দময় বাহুমণ্ডল বিক্ষিপ্ত করিয়া আকাশকে যেন নিবিড় অরণ্যময় করিলেন এবং স্বীয় ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার তত্ত্ব জানিতে হইলে জানিবে,—তিনি স্বয়ং চিৎশক্তিই—ক্রিয়ারূপ ধরিয়া ঐরূপ নৃত্যব্যাপারে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহার যে সেই শূর্পকুদ্দালাদি নিখিল ভাবাভাব পদার্থ এবং কাল-কল্পাদির ক্রম, এ সকলই তাঁহার অলঙ্কারস্থানীয়। কল্পনায় হৃদয়ানীত নগরীর ন্যায় ঐ চিৎস্পন্দই আপনাতে এই জগৎ ধরিয়া রাখিতেছে। পক্ষান্তরে কল্পনাই যেমন পুরী, তেমনি এই চিৎই স্বয়ং জগৎ। পবনস্পন্দের ন্যায় এই স্পন্দই শিবময় চিত্তের ইচ্ছা-প্রসূত। যেমন পবনস্পন্দ কদাচিৎ শান্ত হইয়া যায়, সর্ব্বদার জন্য থাকে না, তেমনি ঐ শিবময় আত্মেচ্ছারও কোন কোন কালে শান্তি হইয়া থাকে। পবনস্পন্দের মূর্ত্তি নাই, তথাচ সে যেমন আকাশে শব্দাড়ম্বর প্রকটিত করে, তেমনি ঐ শিবময় আত্মার ইচ্ছাও মূর্ত্তি-বিরহিত, তথাচ উহা মূর্ত্তিমান্ জগতের নির্ম্মাণ করিতেছে।

অনন্তর সেই ভগবতী নৃত্য করিতে করিতে কাকতালীয়বৎ সহসা সম্ভ্রমসহকারে আকাশপ্রায় সমীপগত আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক সন্নিহিত শিবাবয়ব স্পর্শ করিলেন। সাগরের ঊর্ম্মিমালা যেমন নাচিয়া নাচিয়া আত্মবিনাশের তরেই বাড়বাগ্নিতে গিয়া লগ্ন হয়, তেমনি সেই নৃত্যনিরতা দেবীও আত্মনাশার্থই সেই শিবাবয়ব স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। আত্ম-নাশার্থ বলিবার কারণ এই যে, শিবস্পর্শ করিবামাত্রই তিনি শনৈঃ শনৈঃ ক্ষীণ হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। তাঁহার যে অনন্তাকার ছিল, তাহা তিনি পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে পর্ব্বতাকার হইলেন। পরে সেই পর্ব্বতাকার পরিহারপূর্ব্বক নগরপ্রমিত আকার ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নগরপ্রমাণ ভাব পরিত্যক্ত হইল। তিনি লতাপ্রমাণ হইলেন। এইরূপে সেই লতাপ্রমাণ ভাব হইতেও ক্রমে তাঁহার আকাশ-

ভাবে পরিণতি ঘটিল। এই আকাশভাবের পরিণামেই তিনি শিবাকারে মিশিয়া গেলেন।—যেন শান্তবেগা নদী মহার্ণবে মিলিয়া গেল। তখন এক শিবস্বরূপ হইল। সেই মহাকাশে সে কালে একমাত্র সংহারকর্ত্তা শিবই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! শিবের যেমন সংস্পর্শ ঘটিল, অমনই সেই পরমেশী শিবা শান্ত হইয়া গেলেন কেন? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই শিবাই পরমেশী প্রকৃতি; তাঁহাকেই লোকে শিবেচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। তিনিই অকৃত্রিমা স্পন্দশক্তি; তাঁহারই নাম জগন্মায়া। অপিচ সেই যে শিবাত্মা, তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পবিত্র পুরুষনামে নিরূপিত। ঐ শারদাকাশবৎ স্বচ্ছ শান্ত পুরুষই শিবরূপ ধারণ করেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিণী চিৎশক্তিই স্পন্দময়ী ও ভ্রমময়ী হইয়া এ সংসারে ভ্রমণশীলা। শিব—নিত্যতৃপ্ত, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত, অদ্বয়, অজর, অনাময়, পুরুষ; তাঁহাকে যে পর্য্যন্ত না চিৎশক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ততক্ষণই এ সংসারে ভ্রমণ করেন। ঐ শক্তি কেবল জ্ঞানধর্ম্মিণী; তাই জ্ঞানময়ীরূপে কাকতালীয়বৎ সহসা সেই জ্ঞানময় শিবের স্পর্শ লাভ করিলেই তন্ময়ী হইয়া পড়েন। পয়োধি মধ্যে পতিত হইলে নদী যেমন তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়, তাহার আর স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না, তেমনি ঐ প্রকৃতিও যখন পুরুষের স্পর্শ লাভ করেন, তখন তন্ময় হইয়া যান—তদীয় প্রকৃতিভাব পরিবর্জ্জন করেন। সাগর জলময়, নদীও জলময়ী; তাই সাগরে মিশিলে নদী যেমন সাগর হইয়াই যায়; অপিচ প্রস্তরঘর্ষণে লৌহের তীক্ষ্ণধার উদ্ভূত হয়, কিন্তু আবার সেই প্রস্তরাঘাতেই তাহা যেমন কুণ্ঠিত হইয়া যায়, তেমনি ঐ শিবেচ্ছা চিন্ময় শিব হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। কোন পুরুষ কোন তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলে তাহার ছায়া যেমন সেই তরুচ্ছায়াতেই মিশিয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি যখন পুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা তাহাতেই বিলয় পাইয়া যায়। চিৎ যখন আপন পুরুষাখ্য সনাতনভাব অবগত হইতে পারেন, তখন আর

এ সংসারে ভ্রমণ করেন না। তিনি তন্ময় বা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। অসাধু চোরের পার্শ্বে সাধুর বাস ততক্ষণই সম্ভবপর, যতদিন না সাধু তাহাকে চোর বলিয়া চিনিতে পারেন; কিন্তু যখন বুঝেন যে, এই ব্যক্তি চোর, তখন আর তিনি যেমন তাঁহার নিকট থাকেন না, তেমনি চিৎও যতদিন না নিজপর-স্বভাব বুঝিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্তই এই অলীক দ্বৈতপ্রপঞ্চে যেন উন্মত্ত হইয়াই সানন্দে সঞ্চরণ করিতে থাকেন; অপিচ যখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন, তখন তন্ময় হইয়াই অবস্থান করিতে থাকেন। চৈতন্যমাত্রই শান্ত নির্ব্বাণ আনন্দমূর্ত্তি; অজ্ঞ চৈতন্য স্বীয় কূটস্থ ভাব লাভ করিয়া তন্ময় হইয়া যায়। এই ভাব তখন নদীর সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রভাবপ্রাপ্তির ন্যায়ই হয়। যতদিন না মোহের বশে চিৎ আপনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, ততদিনই তিনি অনন্ত জনন-মরণ-দশাগ্রস্ত সংসার-বিষয়ে আসিতে থাকেন। যখন তিনি নিজ স্বরূপ দেখিতে পান, তখন সেই পরমানন্দময় নিজ স্বরূপেই নিমগ্ন হইয়া যান। এই আনন্দতন্ময়তা—মধুলোভে মধুকরের মধুপানে আনন্দ-বিহ্বলতার ন্যায়ই হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! জনন-মরণাদি প্রগাঢ় দুঃখরাশি যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তথাবিধ আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া কে তাহা প্রত্যাখ্যাত করে?—একবার সুধার স্বাদ প্রাপ্ত হইলে কে সে সুধা পরিহার করিয়া থাকে?

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত রুদ্র যেরূপে মহাকাশে অবস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রুদ্র নিজের দেহভ্রম পরিত্যাগ করেন; পরে উপশান্ত হইয়া যান। সে কালে আমি স্পষ্টই দেখিলাম,—ঐ রুদ্র আকাশে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। সেই সঙ্গে উভয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডই চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দ হইল। অনন্তর মুহূর্ত্ত

মাত্র রুদ্রদেব তদীয় সূর্য্যরূপ নেত্রদ্বারা সেই দুই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে মুহূর্ত্তমধ্যেই নিশ্বাসবায়ু দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক সেই খণ্ডদ্বয় পাতালবৎ গভীর বদনগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে সেই অনন্ত আকাশে অন্য কিছুই রহিল না। রুদ্রদেব একাই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বদনবিক্ষিপ্ত সেই দুই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। পরে মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি আকাশবৎ লঘু হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার আকার যষ্টিপ্রমাণ হইল। ক্রমে তিনি প্রাদেশপ্রমাণ হইয়া পরে আবার ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তদনন্তর দিব্য দৃষ্টিযোগে দেখিলাম, তিনি অণু অণু ক্রমে পরমাণু হইয়া সম্পূর্ণই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যেমন শরতের মেঘখণ্ড বিলীন হইয়া যায়, দেখিলাম, তেমনি তিনি বিলীন হইয়া গেলেন। রুদ্রদেবের সেই যে অত বড় বিরাট আকার, তাহা দেখিতে দেখিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্ষুধিত হরিণ যেমন বৃক্ষতলবিকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রগুলি ভক্ষণ করে, তেমনি সেই রুদ্র তখন সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। শান্ত সুনির্ম্মল ব্রহ্মভাবেই আকাশ তখন পর্য্যবসিত হইল। দেখিলাম, সেই জগৎমহাভ্রান্তির মহাপ্রলয় হওয়ায় তাহা অনাদি অনন্ত সম্বিদাকাশে পরিণতি পাইয়া গেল। পল্লীবাসী লোক যেমন হঠাৎ রাজধানীতে গিয়া চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া সবিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়, তেমনি আমিও সে কালে সেই রমণীমূর্ত্তি পাষাণমূর্ত্তি ও সেই সেই বিলাস-বিভ্রম অন্তরে অন্তরে স্মরণপূর্ব্বক একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলাম। তৎপরে অন্যত্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলাম,—সেই যে কলধৌতময়ী শিলা, তাহা ভগবতী কালীর দেহে সৃষ্টি-সমষ্টিবৎ প্রতিভাত হইল। কিন্তু জ্ঞান-নয়নে দেখিলে সেরূপ কিছুই প্রতীয়মান হয় না। যদি চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তবে সর্ব্বত্রই সব প্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে। এই যে শিলার কথা কহিলাম, ইহাও দূর হইতে চর্ম্মচক্ষুযোগে দেখিলে একমাত্র শিলা বলিয়াই অনুভূত হইবে। সৃষ্টিপ্রভৃতি কিছুই অনুভবগম্য হইবে না। যাহা হউক, আমি দেখিতে লাগিলাম, সান্ধ্য মেঘবৎ রমণীয়—কেবলই কলধৌতময় নিবিড় শিলা অবস্থিত। অনন্তর আমি বিস্ময় মানিলাম,

বিচার করিতে লাগিলাম; দেখিলাম,—সেই শিলার অংশবিশেষ জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। যেমন দূর হইতে শূন্যে নানারঙ্গরঞ্জিত বিচিত্র পদার্থপুঞ্জ ভ্রমের বশে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হয়, তেমনি আমি অপর আর একটী রম্য স্থান অবলোকন করিলাম। দেখিলাম, সেখানেও জগৎসৃষ্টিব্যাপার বিদ্যমান। এই ভাবে আমি সেই শিলার যে যে অংশ দেখিলাম, দর্পণ-প্রতিবিম্ববৎ সেই সেই অংশই নির্ম্মল জগদাকারে অবলোকন করিলাম। অনন্তর আমার বড়ই কৌতূহল হইল। আমি ভূধরপ্রদেশের নিখিল শিলা, অপরাপর ভূমিখণ্ড এবং তৃণ-গুল্মাদি সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম,—সর্ব্বত্রই তথাবিধ বহু জগৎ বিরাজমান। এই যে সকল জগৎ দেখা গেল, এতৎসমুদায় কেবল বাসনাবিষ্ট জ্ঞানদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমিও সেখানে সেইরূপে বহুজগৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। কোন স্থানে দেখিলাম, সবে মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্র-দিন-যামিনী-ঋতু-বর্ষ প্রভৃতি কেবল মাত্র কল্পনা করিয়াছেন। কোথাও দেখিলাম,—ভূতলোপরি জনগণ কেবল মাত্র বাসস্থাপন করিয়াছে। দেখিতে লাগিলাম,—সমুদ্রের খাত তখনও প্রস্তুত হয় নাই। কোথাও দেখিলাম,—দৈত্যগণ সবে মাত্র জন্মিয়াছে। দেবগণ তখনও জন্ম লাভ করেন নাই। কোথাও সত্যযুগের আচারনিষ্ঠ সাধুসম্প্রদায়ই কেবল বাস করিতেছেন। কোথাও কেবল কলিযুগের আচারনিষ্ঠ দুর্জ্জনগণই অবস্থান করিতেছে। কোথাও দেখিলাম,—অসুর-দলের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে। কোথাও বা গিরিশ্রেণী সমগ্র ভূতল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা কোন কোন জগতের সৃষ্টিকার্য্য তখনও সম্পন্ন হয় নাই, কেবল মাত্র ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। কোথাও দেখিলাম,—সেখানে যে সকল মানব আছে, তাহারা জরা-মরণহীন। কোথাও বা তখনও চন্দ্রের সৃষ্টি হয় নাই; তাই মহাদেবমৌলি চন্দ্রকলাহীন রহিয়াছে। কোথাও দেখিলাম, তখন পর্য্যন্তও ক্ষীরাব্ধির মন্থনকার্য্য হয় নাই; তাই তথাকার সুরগণ মৃত্যুর আয়ত্ত হইতেছেন। অমৃত, উচ্চৈশ্রবা, ঐরাবত, ধন্বন্তরি, কামধেনু, লক্ষ্মী এবং কালকূটের আবির্ভাব সে পর্য্যন্ত হয় নাই। কোথাও শুক্রাচার্য্য

মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী মহাবিদ্যা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন; তাই দেবগণ উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া তদীয় তপোভঙ্গে নিরত আছেন। দেখিলাম, কোথাও দৈত্যজননী গর্ভবতী দিতির গর্ভ-নাশার্থ ইন্দ্র তাঁহার গর্ভে প্রবেশোদ্যত হইয়াছেন। দেখিলাম, কোন কোন স্থানে বর্ণধর্ম্ম তখনও মলিন হয় নাই। সেই সেই স্থানের মানবেরা সকলেই তত্ত্বজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও দেখিলাম, পদার্থপুঞ্জের যে পূর্ব্বাবস্থা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কোন কোন জগতে দেখিলাম, বেদ-শাস্ত্রাদির যথাযথ অনুশীলন হইতেছে। সে সে স্থানে সকলেই বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিতেছে। কোথাও দেখিলাম, যেন মহাপ্রলয় আসিতেছে। এই আশঙ্কায় কোন কোন জগৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলাম, কোন জগতে দৈত্যগণ দলবদ্ধ হইয়া দেবপুরী লুণ্ঠন করিতেছে। কোন কোন জগতের নন্দনবনে কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে। কোন জগতে সুরগণ অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনার্থ পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতেছেন। আমি সেই মহাবিশ্বব্যাপী মায়াশবলিত এইরূপ বহু অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান জগদাড়ম্বর দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—কোন জগতে মহাপ্রলয়ের সূচনা হইয়াছে। পুষ্করাবর্ত্তাদি মেঘবৃন্দ আকাশদেশ আক্রমণ করিয়াছে। কোন জগতে প্রাণিগণ প্রশান্তভাবে বিরাজ করিতেছে। কোথাও দেখিলাম,—সমস্ত সুর, অসুর, নর, সকলেরই মধ্যে কেমন একটা বিক্ষুব্ধ ভাব উপস্থিত হইয়াছে। দেখিলাম, কোন জগতে সূর্য্য নাই; সর্ব্বস্থানই প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। কোন জগতে দেখিলাম, তাহার সর্ব্ব-স্থানই অনলশিখায় সমালীঢ়; অন্ধকার কুত্রাপি নাই; সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে। কোথাও সম্পূর্ণ জগদুৎপত্তি হয় নাই; মধু ও কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় শয়ান রহিয়াছে। কোথাও কমলোদরে কমলযোনি অবস্থান করিতেছেন। কোথাও সমস্ত স্থানই একার্ণবে পরিণত হইয়াছে,—জলে জলাকার হইয়া গিয়াছে। ভাসমান বৃক্ষ-পত্রোপরি শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। অন্য এক জগতে দেখিলাম, কল্পরাত্রি উপস্থিত হইয়াছে; সর্ব্বদিক্ই নিরালোক হইয়া গাঢ়ান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোথাও

শিলাভ্যন্তরবৎ নিস্পন্দ বিশাল আকাশই কেবল অবস্থান করিতেছে। সুষুপ্ত ব্যক্তিবৎ কিছুই পরিজ্ঞাত হইতেছে না। অন্য এক জগতে দেখিলাম, পক্ষযুক্ত পর্ব্বতগণ আকাশে বায়সশ্রেণীবৎ উড়িয়া যাইতেছে; কোথাও পর্ব্বতবৃন্দ বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোন জগতের জলধিসকল জলোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-তাড়নায় তীরগত ভূধর ও ভূমিভাগ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আত্মসাৎ করিতেছে। কোন জগতে দেব ও দানবদলে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। দানবপক্ষে ত্রিপুরাসুর, বৃত্রাসুর, অন্ধকাসুর ও বলি প্রভৃতি যুদ্ধ করিতেছে। দেখিলাম, কোন জগতে দিগ্‌গজগণ উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদের পদভরে বসুধা কম্পিত হইতেছে। কোন জগতে প্রলয়কাল উপস্থিত; বসুন্ধরা বাসুকির মস্তকচ্যুত এবং প্রলয়জলে নিমগ্ন হইয়াছে। কোন জগতে দেখিলাম, রামচন্দ্র শৈশব অবস্থাতেই রাক্ষসপতি রাবণকে সংহার করিতেছেন। কোন জগতে রামপ্রিয়া সীতাকে হরণ করিয়া রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রকে প্রতারিত করিতেছে। সে কালে রাবণের মস্তক সুমেরু-শৈলের উপরিভাগে এবং চরণদ্বয় ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত হইয়াছে; সে এইভাবে বিশাল-কলেবরে বিরাজ করিতেছে। কোন জগতের স্বর্গে গিয়া দেখিলাম, তথায় কালনেমি নামক রাক্ষস রাজত্ব করিতেছে। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন; অসুরেরা মনের সুখে—স্বচ্ছন্দে তথায় বিচরণ করিতেছে। আবার কোন জগতে দেখিলাম, দেবগণ দানবদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই রাজ্যপালন করিতেছেন। কোন জগতে ভারতযুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য করিতেছেন। কুরু-পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এইখানে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। অগ্রে তাহার সদুত্তর প্রদান করুন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বকল্পে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? যদিই বা জন্মিলাম, তবে এই জন্মের এমনই আকারে উৎপন্ন হইলাম কেন? তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সমস্ত পদার্থই বারম্বার বিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যেমন কলস ঘুরিতে থাকিলে তন্মধ্যস্থ মাষকলায় সকল এক দিক হইতে অন্য দিকে গিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তেমনি এই সমস্ত জগৎ পরিবর্ত্তমান হইতেছে। সাগরোর্ম্মির ন্যায় কোন কোন পদার্থ পুনঃপুনঃ পরিস্ফুরিত হইতেছে। 'তুমি' 'আমি' করিয়া সকলেই আমরা বারম্বার যাতায়াত করিতেছি। কিন্তু যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে, এই সমুদায় কিছুই কিছু নহে। যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ—ভিন্ন নয়, তেমনি পরব্রহ্ম হইতেও কোন কিছু পদার্থই পৃথক্ নহে। ফলে কিছুই তো উৎপন্ন হইতেছে না, কেবল ভ্রমের বশেই সমস্ত বস্তু উৎপন্নরূপে অবলোকিত হইতেছে। সংসারভ্রমের প্রবাহে পড়িয়া দেখা যায়, অনন্ত জীব আইসে আর যায়, একবার যাহা যায়, অবিকল তাহাই আবার ফিরিয়া আইসে অথবা কিঞ্চিৎ প্রকারান্তরিত হইয়া আগমন করে। এই জগৎ একটা মহাসাগর; এ সাগরের কণাশ্রেণী বলিয়াই তুমি ভূতবৃন্দকে অবধারিত করিও। এখানে কোন কোন প্রাণী পূর্ব্ববৎ বিদ্যা, বুদ্ধি ও বন্ধু-ধনাদি সমভিব্যাহারেই পুনঃপুন প্রাদুর্ভূত হয়। কোন কোন প্রাণীর পূর্ব্বদেহ সহ অর্দ্ধ সাদৃশ্য থাকে আবার কাহার কাহারও মাত্র একপাদ সাদৃশ্য থাকিয়া যায়। কোন প্রাণীর বা পূর্ব্বের সাদৃশ্য আদৌ থাকে না—সে সর্ব্বথা বিসদৃশ হইয়াই জন্ম লয়। কেহ সমান এবং কেহ কেহ বা অসমান হইয়া উৎপন্ন হয়; এ ভাব কেবল কালবশেই হইয়া থাকে। সাগরের চক্রাকার জলপ্রবাহের ন্যায় এই সংসার-সাগরেও জীবসলিলের প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে। কখন ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে; কচিৎ নিম্নে ছুটিতেছে; কখন বা সমানভাবেই ছুটিয়া যাইতেছে; আবার কখন বা একইরূপে চলিয়া চলিয়া আবার রূপান্তরিত হইয়া চলিতেছে। এইরূপে যাইতে যাইতে কখন বা পরস্পর সংঘর্ষ বশতঃ প্রতিহত হইয়া যাইতেছে, কতই চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কাহার শক্তি আছে?

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎকালে সেই শিলাপ্রভৃতির উপরিভাগে সেই সেই বিচিত্র সৃষ্টিদর্শন আমি করিলাম। আমি অনন্ত চিদাকাশ —সর্ব্বব্যাপী নিরাময় দেহ; তথাচ তৎপরেই আমার সেই দেহেই আবার অঙ্কুরিত সৃষ্টি অবলোকন করিলাম। যেমন সলিলসিক্ত ধান্যবীজের অভ্যন্তরে অঙ্কুর দৃষ্ট হয়, তেমনি স্বদেহেই সেই অঙ্কুরিত সৃষ্টি অবস্থিত দেখিলাম। এ সৃষ্টি আমারই দৃষ্টিতে যে নূতনভাবে উপস্থিত হইল, তাহা বলা যায় না; কেন না, জলসিক্ত স্ফীত বীজ মাত্রেরই অভ্যন্তরে অঙ্কুরস্থিতির ন্যায় কি সাকার, কি নিরাকার, কি চেতন, কি অচেতন, সকল বস্তুর অন্তরালেই জগতের অস্তিত্ব আছে। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় চিন্ময় চৈতন্যে যেমন স্বপ্নদৃশ্যপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হয়, আবার স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সেই চৈতন্যেই যেমন জাগ্রৎপ্রপঞ্চ পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে, তেমনি হৃদভ্যন্তরে যে অনুভূতিরূপ আত্মচৈতন্য আছেন, তাঁহাতেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের অভ্যুদয় হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে পরমাকাশময়! আপনি যদি প্রকৃতই চিদাকাশ, তবে আপনাতেই সৃষ্টিবিকাশ হইল কিরূপে? এ কথা আমায় বুঝাইয়া বলুন। আমার অন্তরে এই যে একটা সন্দেহ আছে, তাহা দূর করিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি স্বয়ম্ভূ হইয়া তৎকালে এই যে স্বপ্নপুরবৎ অসৎ জগৎ স্বশরীরাভ্যন্তরে সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই মহাপ্রলয় কাণ্ড দর্শনানন্তর আমি আকাশাকারে অবস্থিত হইয়াই স্বশরীরের অংশবিশেষে জ্ঞানদৃষ্টি উন্মেষিত করিয়া লইলাম। আমার সেই স্বচ্ছ জ্ঞানদৃষ্টি যখনই উন্মেষিত হইল, তখনই সেই স্থানে আমার চক্ষে আকাশভাব অবলোকিত হইল। তুমি স্বপ্নদশায় যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ কর, তাহা যেমন তোমার আত্মাচৈতন্যেই উপলব্ধ হয়, তোমার আত্মচৈতন্যই যেমন তাহার আধাররূপে বিভাত হইয়া থাকে,

তেমনি আমি যে তৎকালে জগদ্দর্শন করিলাম, তাহারও আধার সেই আত্মচৈতন্য বৈ আর কেহই নহে। আপনাতে স্পন্দ পর্য্যালোচনার ফলে আকাশ চিত্তাকার ধারণ করে। অনন্তর সেই আকাশ 'আমি' ইত্যাকার অনুভূতিবশে অহঙ্কার নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আকাশ যখন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে, তখন উহা বুদ্ধিনামে নির্ব্বাচিত হয়। সেই বুদ্ধির যখন আরও ঘনীভাব হয়, তখন সে মনোনাম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তদনন্তর ঐ মন আপনাতেই শব্দতন্মাত্র ও অপরাপর তন্মাত্র সকল উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে উহা তথাবিধ অনুভবে পরিপুষ্ট হয়—হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়রূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এইভাবে ক্রমে ইন্দ্রিয়সমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। লোক যখন সুষুপ্তাবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হয়, তখন যেমন সে কল্পিত দৃশ্য বস্তুসমূহের দর্শন করিয়া থাকে, তেমনি সৃষ্টির উপক্রমেও নিমেষমধ্যেই এই দুঃখনিদান জগতের যুগপৎ অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ বলেন, জগতের উৎপত্তি আকাশাদিক্রমে হয়, আবার কাহার কাহার মতে সম্পূর্ণ জগদুৎপত্তি একবারেই ঘটে। যাউক সে কথা, আমি তৎকালে কল্পনার সাহায্যে সেই সূক্ষ্ম পরমাণুকণার অভ্যন্তরে স্বচ্ছ চিদাকাশকেই জগদাকারে উপলব্ধি করিলাম। স্বচ্ছাকাশে স্বভাবতঃ সততই যেমন বায়ু প্রবাহ হয়, তেমনি চিত্তের স্বভাবই এই যে, সে সর্ব্বত্রই আকার অবলোকন করে। পরম চিৎশক্তি আপনাতে যেরূপ আকার অনুভব করেন, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার অন্যথা ঘটান সম্ভবপর নহে। অনন্তর আমি যখনই জ্ঞান করিলাম যে, অণু-স্বরূপ হইয়াছি, ভাবনার প্রভাবে তখন আমি সেইরূপই হইয়া পড়িলাম। পরে নিজ রূপকে যখন সূক্ষ্ম তেজঃকণারূপে ভাবিলাম, তখনই দেখিলাম, আমি স্থূল হইয়া পড়িলাম। ইহার পর যে কালে আমার সেই স্থূলরূপ সম্যক্ দর্শনে প্রবৃত্তি হইল, তখনই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

হে রঘূদ্বহ! সে কালে যে যেরূপ হইয়াছিল, তোমরা সাধারণতঃ সেই সমুদয়ের যে যেরূপ নাম নির্ব্বাচন করিয়া থাক, তাহা বলিতেছি,

শুন। আমি তখন যাদৃশ ছিদ্রযোগে দেখিতে লাগিলাম, তাহার নাম চক্ষু, যাহা দেখিলাম, তাহার নাম দৃশ্য, চক্ষু ও দৃশ্য এতদুভয়ের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম দর্শন, যখন দেখিলাম, তখনকার নাম কাল, যেখানে বা যদুপরি দেখিলাম, তাহার নাম আকাশ, যে প্রকারে দেখিলাম, তাহার নাম ক্রম বা প্রবল নিয়তি, এবং যথায় অবস্থিত ছিলাম, তাহার নাম দেশ। যাহা হউক, তৎকালে আমার উল্লিখিত প্রকার কল্পনা প্রগাঢ় হইল। কেবল মাত্র চৈতন্যের উন্মেষবশে তখন আমি তন্মাত্র কারণরূপে অবস্থিত হইলাম। ইহার পরই আমার অল্পমাত্রায় এইরূপ বোধ জন্মিল যে, যেন আমি দেখিতেছি। তদনন্তর ছিদ্রযুগল দ্বারা যাহা আমি দেখিলাম, তাহা আকাশ ব্যতিরিক্ত একটী মূর্ত্ত পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার পর আমার এইরূপ একটা জ্ঞানের উদয় হইল যে, যেন কিছু আমি শুনিতেছি। এইরূপ জ্ঞানোদয় হইবামাত্র একটা হুঙ্কারধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ধ্বনি শঙ্খধ্বনিবৎ আকাশ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইল। যে দুইটা ছিদ্রদ্বারা সেই শব্দ আমি শ্রবণ করিলাম, তাহার নাম এই শ্রবণবিবর। তাহার পরক্ষণেই আমার কিছু স্পর্শজ্ঞান হইল। যাহার সাহায্যে আমার স্পর্শানুভব হইল, তাহাকে ত্বক্ বলিয়া থাকে। সে কালে আমার অনুভূত হইতেছিল—যেন কোন পদার্থ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিল। যৎকর্ত্তৃক অঙ্গস্পৃষ্ট হইল, তাহার নাম সত্য সঙ্কল্পরূপী বায়ু। এই প্রকার অনুভব করিতে করিতে স্পর্শতন্মাত্র আসিল। অনন্তর আমাতে আস্বাদসম্বিদ্ উপস্থিত হইল। তাহাতে রসনেন্দ্রিয়ের আস্বাদে আমার আকাশাত্মক আঘ্রাণসঙ্কল্পে সমাকৃষ্ট প্রাণ হইতে ঘ্রাণতন্মাত্রের অভ্যুদয় ঘটিল। এইরূপে সকলই হইল; কিন্তু কিছুই হইল না। ক্রমে পঞ্চেন্দ্রিয় তন্মাত্র আমাতে অবস্থিত হইলে সেই সেই সকলের অনুভূতিবলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসাদির উদয় হইল। ঐ সমুদিত শব্দাদির বাস্তব পক্ষে কোন আকার নাই, তথাচ উহারা ভ্রমের বশেই প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্তরূপে ভাবনা করিয়া করিয়া আমি যাহার আশ্রয় লইয়া অবস্থিত হইলাম, তোমাদের নিকট তাহা অহঙ্কার-আখ্যায় পরিচিত। ঐ অহঙ্কার

যখন ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিনামে নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐ বুদ্ধির যে ঘনীভাব, তাহারই নাম মন। এইরূপে আমি অন্তঃকরণ-ভাব উপগত হইলাম এবং চিদাকাশরূপ আতিবাহিক দেহে বিরাজ করিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ আমি শূন্যাকার; আমাতে উক্ত অহম্ভাবাদি কিছুই বিদ্যমান নাই। আমি কেবল আকাশস্বরূপেই বিরাজমান। কোনরূপ কল্পিত পদার্থেরই আমি অনুভবকর্ত্তা নহি। এইরূপ ভাবনাময় হইয়া কিৎয়কাল আমি অবস্থিত আছি, ইতিমধ্যে 'আমি দেহী' এই প্রকার একটা জ্ঞান আমার অভ্যুদিত হইতে লাগিল। পুরুষ যেমন স্বপ্নাবস্থায় কোন না কোন শব্দ করিতে থাকে, তেমনি আমিও তখন যদিও শূন্যস্বরূপ ছিলাম, তথাচ উক্ত 'অহং' জ্ঞান প্রভাবে শব্দ করিতে লাগিলাম। সেই শৈশবদশাতেই আমার মুখ দিয়া যে 'ও'মিত্যাকার- শব্দ নির্গত হইল, তাহাই ওঙ্কার বা প্রণবনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তদনন্তর স্বাপ্ন মানবের ন্যায় যাহা কিছু কহিলাম, তাহাই পরে বাক্য বলিয়া বিখ্যাত হইল। এইরূপে ক্রমে আমি ব্রহ্মা হইলাম; পশ্চাৎ মনোময় হইয়া সৃষ্টিকল্পনা করিতে লাগিলাম। এইরূপ ক্রমে একটা উৎপন্ন বস্তু হইলাম বটে; অথচ জন্মিলাম না। ব্রহ্মাণ্ড আমার দৃষ্ট হইল, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত কোথায়, তাহা আমি দেখিতে পাইলাম না। এইভাবে আমার একটা মনোময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল সত্য, কিন্তু হইল না কিছুই; যত কিছু শূন্যাকাশ, তাহাই রহিয়া গেল। যাহা জ্ঞানাত্মক—যাহা কেবলই শূন্যাকাশ, তাহাই রহিল। এ অবস্থায় পৃথ্বীপ্রভৃতি ভাব আদৌ নাই, রহিলও না। এই জগৎস্বরূপ মৃগতৃষ্ণাজলের আকারে আত্মচৈতন্যে আত্মচৈতন্যই পরিস্ফুরিত হইতে লাগিল। বাহ্যাকাশে যে কোন বস্তু রহিবে, তাহাও নাই, কি অভ্যন্তরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই একমাত্র আকাশ—আকাশ! দেখ, মরুস্থলীতে বাস্তব পক্ষে জল নাই; তথাচ ভ্রমাত্মক জ্ঞানে আছে বলিয়াই অনুভূত হয়, এমন কি স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচরই হইয়া থাকে। এইরূপে এই সম্বিদও কারণাভাবেই ক্ষুব্ধ হয় এবং আপনাতে দীর্ঘ জগদ্ভ্রম অবলোকন করিয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে পরব্রহ্মে কিন্তু জগৎ নাই। ভ্রান্তির প্রভাবেই সম্বিদ ঐরূপ দেখিয়া

থাকে। সম্বিৎস্বভাব যখন অজ্ঞানাবৃত হয়, তখনই ঐরূপ ভ্রম সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পিত মনোরাজ্য ও স্বপ্নদৃষ্ট পুরাদির ন্যায় মনোমধ্যেই এই অসৎ জগৎ বিশালাকারে বিরাজমান হয়। পার্শ্বস্থ সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নবিবরণ তাহার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট না হইলে যেমন অবগত হওয়া যায় না, তেমনি চৈতন্যের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে না পারিলে এই জগদ্বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। মুকুরবিম্ববৎ বহির্দিক হইতে দেখিলে উহার যথার্থ তত্ত্ব কিছুই দৃষ্ট হইবে না; সকলই অলীক বলিয়া অনুভূত হইবে। চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখিলে, বাহিরের লোকালোকাচল দেখা যাইবে। ঐ অচলের অন্তরালে যাহা অবস্থিত, তাহার কিছুই দৃষ্ট হইবে না। যদি জ্ঞাননেত্রে দ্বারা নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে এই সৃষ্টি যে নির্ম্মল পরমাত্মাই, তাহাই নিরীক্ষিত হইবে। জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিলে সর্ব্বত্রই সৃষ্টিনির্ম্মাণ—উপশমই লক্ষিত হইবে। কেবল ব্রহ্মাই বিদ্যমান, তিনি বৈ আর কিছুই লক্ষ্যীভূত হইবে না। বিশুদ্ধ বিমল বুদ্ধিযোগে যে দর্শন, তাহাই যুক্তিবিচার নামে নিরূপিত। উহা দ্বারা যাহা দেখা যায়, ত্রিলোচনের তিন চক্ষু বা সহস্রাক্ষের সহস্র চক্ষু দ্বারাও তাহা দৃষ্টিপথারূঢ় হইতে পারে না। যোগীর চক্ষে আকাশ যেমন সৃষ্টিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি তখন আমিও মনে করিতে লাগিলাম, এই ক্ষিতিই সৃষ্টি-ব্যাপ্ত—এইখানেই আমার সৃষ্টির অনুভব হইতে লাগিল। আমি ক্ষিতি ভাবনা করিতে লাগিলাম, ভাবিতে ভাবিতে ক্ষিতিরূপ ধারণ করিলাম। আমি চিদাকাশ দেহ পরিহার করিলাম না—না করিয়াই অচিরকালমধ্যে যেন সম্রাটরূপে বিরাজ করিতে লাগিলাম। পৃথ্বী ভাবনায় পার্থিবাভিমানী জীবের সমান হইয়া উঠিলাম এবং নিজেকে শৈলদ্বীপাদি দেহময়রূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি এই ভূবলয়রূপেই পরিণত হইলাম। সর্ব্ববিধ বনশ্রেণী আমার দেহের রোমরাজিবৎ বিরাজিত হইল। নানা নগরনিচয় মদীয় অলঙ্কারনিকরবৎ উপলব্ধ হইতে লাগিল। আমি নানাবিধ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত হইলাম। গ্রাম ও নিম্নভূমি সকল মদীয় অঙ্গুলিপর্ব্ববৎ অনুভূত হইতে লাগিল। পাতালগহ্বর আমার উদরবৎ প্রতীত হইল। কুলাচল আমার বাহু হইল; যে বাহু

সমুদ্রবলয়ে বেষ্টিত হইল। যতকিছু তৃণগুচ্ছ—সে সকল মদীয় দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমাবলীর ন্যায় দীপ্তি পাইল। শৈলখণ্ড সকল আমার দেহের গুল্ম হইল। এই যে আমার পার্থিব দেহ, ইহা দিগ্‌গজের গণ্ড-স্থলে—অনন্তদেবের সহস্র ফণায় অবস্থান করিতে লাগিল। মহীপতি-গণ যুদ্ধ করিয়া আমার এই পার্থিব দেহ অপহরণ করিতে লাগিলেন। মাংসাশী প্রাণিপুঞ্জ মদঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমারও অবয়ব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল মদীয় স্কন্ধবৎ প্রতীয়মান হইল। সুমেরুকে আমার সুদীর্ঘ গ্রীবাদেশবৎ উপলব্ধ হইল। সুরতরঙ্গিণী মদীয় বক্ষোবিলম্বিনী মুক্তামালার স্থান অধিকার করিল। গুহা, গহন ও জলপ্রায় স্থানসঙ্কুল সমুদ্র, মুকুর-মণ্ডল-বৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মান হইতে লাগিল। মরুস্থলী ও উষরভূমি মদীয় ধবল বসনস্থান অধিকার করিল। ভূতপূর্ব্ব মহাসমুদ্রে মদীয় দেহ পরিব্যাপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহা যেন সেই মহাসমুদ্রের জল হইতে ধৌত হইয়াই বহির্গত হইল। আমার দেহ কুসুমকাননে সমলঙ্কৃত, কৃষকগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য কর্ষিত, কখন শীতত্রস্ত, কখন বায়ুবীজিত, কখন তপন-তাপিত, এবং কখন কখন বর্ষাজালে পরিক্লিন্ন। বহু বিস্তৃত নিরাবরণ প্রান্তর উহার বক্ষঃস্থল, কমলাকর,—চক্ষু, শ্বেত ও নীল মেঘমণ্ডল—মস্তকস্থ উষ্ণীষ, দশদিকের মধ্যস্থান,—বাসগৃহ, লোকলোকাচলের সমীপস্থ মহাখাত—ভীষণ উত্তমাঙ্গ এবং অনন্ত ভূতপরম্পরার স্পন্দ—উহার চৈতন্য। ঐ দেহের ভিতরে বাহিরে কত প্রাণী স্বতন্ত্রভাবে পরিকীর্ণ। ইহার বহির্ভাগে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব এবং অন্তরালে অপরাপর প্রাণি-কীট অবস্থিত। মদীয় এ দেহের পাতালরূপ ইন্দ্রিয়বিবরে অসুর ও নাগগণরূপ কৃমিকুলের বাস। ইহার সপ্ত সমুদ্রকোণে নানাজাতীয় জলচরগণ বিচরণশীল। মদীয় এবম্বিধ দেহমধ্যে নানা জীব জন্তুর বাসস্থান—নদ, নদী, সাগর, দ্বীপ, ভূধর, জঙ্গল, ইত্যাদি প্রদেশ সকল বিরাজমান। ইহার অভ্যন্তরে নানা গিরি ও নানা জন্তু কৃতাবস্থান। তরু-লতা প্রভৃতি দ্বারা ইহা সমাকীর্ণ।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মনুবংশাবতংস! এইরূপে আমি ভূমণ্ডল-স্বরূপ হইলাম এবং স্বীয় দেহেই নদ নদী প্রভৃতি পদার্থপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি স্পষ্টই দেখিলাম, কচিৎ রমণীবৃন্দ আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে। যৌবনমদমত্ত রমণীরা কোথাও মহানন্দে মহোল্লাস প্রকাশ করিতেছে। কোথাও দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় উপবাসকৃশ জনগণ হাহাকার করিতেছে। কোথাও প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। কোথাও দেখিলাম, বসুন্ধরা ধনে ধান্যে সুসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কত স্থানে কপিকুল পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। কোথাও প্রজ্বলিত চিতানলে শবরাশি ভস্মীভূত হইতেছে। কোথাও গ্রাম-নগর সকলই জল-প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। লুণ্ঠনলোলুপ সামন্ত রাজগণ কোথাও পরস্ব অপ-হরণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। উদ্দাম রাক্ষস ও পিশাচকুল কোথাও দৌরাত্ম্য করিতেছে। কোথাও জলপূর্ণ জলাশয়ের উদ্বেলিত জলদ্বারা শস্যক্ষেত্র সিক্ত হইতেছে, তাহাতে শস্যরাশি বৃদ্ধি পাইতেছে। কোথাও গিরিদরী হইতে সবেগ-বিনিঃসৃত বায়ুবশে সন্নিহিত মেঘরাশি বিদূরিত হইতেছে। কোথাও সুখসংবাদে আনন্দিত হইয়া জনসাধারণ পুলকিত হইতেছে। উত্তাল তরঙ্গমালা জলপ্রবাহে খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে জলরাশি স্ফীতো-ন্নত পরিলক্ষিত হইতেছে। গর্ত্তপ্রদেশে কতস্থানে কত শিলাখণ্ড শৃঙ্গবৎ পতিত রহিয়াছে এবং সেই সেই দৃশ্য ভীষণ হইতেছে। কোথাও নাগরি-কেরা সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিতেছে; তাহাতে বসুন্ধরা বিধূত হইতেছে। কোথাও দেখিলাম, সমরে সামন্তগণ সমরশ্রান্ত সৈন্যদিগেরও সংহারসাধন করিতেছে। কোথাও বা সামন্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তমনে সুখে বাস করিতেছে। কোথাও শূন্য অরণ্য; দূর দূরান্তর হইতে কেবল বাতাসেরই সাঁ সাঁ শব্দ বৈ আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। কোথাও দেখিলাম, কৃষককুল ক্ষেত্রে শস্য কাটিয়াছে, কোথাও ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেছে।

কোন কোন স্থানে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি সুশোভিত হইতেছে। কোথাও সরোবরসমূহে হংস-সারসাদি বিহঙ্গম বিচরণ করিতেছে। প্রস্ফুটিত কমলদলে সরোবর সকল সুশোভিত হইতেছে। কোথাও মরুস্থলী দেখা যাইতেছে। সেখানে বাত্যাবেগে ধূলিরাশি ইতস্ততঃ প্রসর্পিত হইতেছে। সমুত্থিত ধূলিজাল কোথাও স্তম্ভের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। কোথাও ঘর্ঘর শব্দ তুলিয়া নদীর প্রবাহ ছুটিতেছে। কোথাও জলসিক্ত উপ্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। কোথাও কোন মানবাধম বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে আর বলিতেছে,—হে বশিষ্ঠদেব! আমায় রক্ষা করুন। কোথাও বটাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভূতলসংলগ্ন দীর্ঘ দীর্ঘ শাখা বিস্তারপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। কোথাও পাদপাবলী আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গে শাখা-সমূহ ধারণ করিতেছে। কোথাও সমুদ্রকূলে ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলকুলবৎ নিবিড় পাদপশ্রেণী দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে, আর সমুদ্রের সমুচ্ছ্বসিত তরঙ্গতাড়নায় আহত ও সঞ্চালিত হইতেছে। কোথাও ভূতল ঘন-সন্নিবিস্ট তরুরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; তাহাতে সৌরকিরণ নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; সূর্য্যদেব যেন সেই জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ সকল তরুর পত্র-রস শুষিয়া লইতেছেন। ইহাতে তত্রত্য পল্লবদল শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। কোথাও গিরিবনচারী মাতঙ্গবৃন্দের দশনাশনি-প্রহারে বৃক্ষাবলী ভূপাতিত হইতেছে। কোথাও সমাধিনিমগ্ন যোগিগণ নেত্র মুদ্রিত করিয়া পরমানন্দস্বাদে তন্ময় রহিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আনন্দজড়তায় আমিও পরম আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম। আমার কলেবর পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম,—কোথাও মশক ও মক্ষিকা প্রভৃতি প্রাণিবৃন্দ অবস্থান করিতেছে। কোথাও কুসুম-কোরক-গত ভৃঙ্গসঙ্ঘ উড়িয়া আসিয়া গজ-গণ্ডোপরি উপবেশন করিতেছে, আর গজগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বপ্রক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইতেছে। কোন স্থান অতীব শীতল; তথায় দারুণ শীতে গাত্রচর্ম্ম শিথিল ও জীর্ণ হইয়া যাইতেছে; জল পাষাণবৎ কঠিন হইতেছে। কোথাও প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বৃক্ষমূলাদি উন্নতমস্তকে স্থির আছে; কোথাও বা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। কোথাও অনুভব করিলাম,—বৃষ্টিপাতে নিজাঙ্গে জল পড়িতেছে; তাহাতে শৈত্যাবেশে মদীয় অঙ্গে

রোমাঞ্চ হইতেছে; আমার কথঞ্চিৎ সুখানুভূতিও হইতেছে। দেখিলাম,—কোথাও বর্ষার জলে অঙ্কুর জন্মাইতেছে এবং কোথাও বা সরোবর-সলিল মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল-চলিত নলিনীদলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই সরোবরজল মদীয় গাত্রে স্পৃষ্ট হওয়ায় আমি কতই না তৃপ্তি পাইতে লাগিলাম।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি জগৎদর্শনে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় পৃথিবীভাবনায় আপনি ভূর্লোক হইয়া পড়িলেন। সেই যে ভূর্লোক, তাহা কি আমাদের দৃশ্যমান এই সত্য ভূর্লোক, না,—উহা আপনার মাত্র মনেরই কল্পনা জন্য?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যদ্যপি তুমি কল্পনার দৃষ্টি লইয়াও জানিতে চাও, তথাচ এই মৃৎ-শিলাময় ভূর্লোক সত্য হইতে পারে না; কেন না, ইহা হইল, কেবল মনেরই কল্পনা-জনিত। আর যদি তত্ত্বদৃষ্টি লইয়া জানিতে চাও, তথাচ এই যে ভূতল দেখিতেছ, ইহা অকিঞ্চিৎ হইয়া পড়ে। ফলে আমি যে ভূর্লোক হইয়াছিলাম, তাহাও কিছুই নয়। আমি যাহা, বাস্তব পক্ষে তাহাই আছি; মনঃকল্পিত হই নাই। যেরূপ ভূমণ্ডলের কথা বলা হইল, সেরূপ ভূমণ্ডল বাস্তবিকই কোথাও নাই। যাহা দেখিতে পাইতেছ, ইহাও মনেরই কল্পনাজাত। যাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া বুঝ, তাহাও তোমার মনোময়। আমি শুদ্ধ চিদাকাশ; আমার যে চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি, তাহাই সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্পই মন, ভূলোক ও পিতামহ ব্রহ্মা। সঙ্কল্প-কল্পিত পুরীর ন্যায় চিদাকাশে চিত্তাকাশই প্রকাশমান। তাই বলিতেছি, তুমি জানিয়া রাখ, আমার সঙ্কল্পই মন। এই মনই ধারণাভ্যাসে পরিপুষ্ট হইয়া বিশাল ভূমণ্ডলাকারে পর্য্যবসিত। মানস কল্পনা সতত আকাশরূপেই বিরাজিত। কিন্তু যখন ইহাতে ‘ইহা অমুক’ ইত্যাকার

প্রত্যয় হয়, তখন মানস ভাব পরিহারপূর্ব্বক ইহা মূর্ত্ত স্থূলভাব পরিগ্রহ করে। তৎকালে এই স্থির, কঠিন বিশাল ভূতল ইত্যাকার জ্ঞান সেই চিদাকাশে অভ্যাসের বশেই সুদৃঢ় হইয়া উঠে। 'বাঁচারম্ভণ' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে যদি দেখা যায়, তবে বুঝা যাইবে, এই ভূমণ্ডল মনোময় সৃষ্টির সূক্ষ্মস্বরূপ মাত্র; তদিতর ইহা অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্যই পুর-গ্রামাদির আকারে বিরাজমান; সেইরূপ একমাত্র চিৎই সৃষ্টিকালে জগদাকারে অবস্থিত। এই যে ভূতলাদি ত্রিজগৎ দেখা যায়, জানিও,—ইহা চৈতন্যরূপ বালকের মনোরাজ্য বৈ আর কিছুই নহে। চিৎস্বরূপ আত্মার সঙ্কল্প চিদ্রূপাতিরিক্ত নয়। আর এই যে জগৎ, ইহাও ঐ সঙ্কল্পাতিরিক্ত নহে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এ জগৎ সত্যাত্মময় নয়, বা জড় পিণ্ডময় নয়, অথবা উজ্জ্বলও নয়। যে পর্য্যন্ত না সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পর্য্যন্তই এই নিখিল দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব বোধ হইয়া থাকে। পরন্তু যখন উহা লব্ধ হয়, তখন আর দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। সম্যক্ জ্ঞান কিরূপে হইবে? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলা যায়, এত দিন ধরিয়া আমি যে সকল উপদেশ তোমায় প্রদান করিয়া আসিতেছি, উহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই তোমার সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইবে; নিশ্চিতই। যাহা হউক, আমি সংক্ষিপ্তভাবে পুনরপি তোমায় বলিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি চৈতন্য—যিনি সর্ব্বময় প্রশান্ত, সেই তিনি আপনা হইতেই আপনাতে স্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহাতে না আছে ভূমণ্ডলরূপ, না আছে কোন দৃশ্যরূপ, না আছে দ্বিত্ব-একত্ব। ফলে কোন কিছুই তাঁহাতে নাই। কোনরূপ যত্ন নাই, চেষ্টা নাই, তথাচ বৈদূর্য্যমণিতে স্বভাবতই যেমন শুক্লপীতাদি নানা বর্ণের উদয় হয়, তেমনি চিদাকাশও কোন চেষ্টা যত্ন করেন না, তথাচ তাঁহা হইতেই এই জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিদাত্মার করণীয় কিছুই নাই। তিনি স্বস্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকেন; কাজেই মনঃকল্পিত কোন একটা পদার্থও কিছুই নাই। এই যে দেখিতেছ ভূমণ্ডল, ইহাও কিছুই নহে। এই ইনি চিদাকাশ; চিদাকাশই ভূমণ্ডলবৎ সতত প্রতীত হইয়া থাকেন। ঐ যে আকাশ দেখিতেছ,—যাহা অনন্ত অমল, অচলপ্রতিষ্ঠ, উহা আত্মাতেই

অবস্থান করিতেছে। চিদাকাশের যাহা স্বভাবিক স্ফুরণ, তাহা সেইরূপই রহিয়াছে। তবে কখন কখন অন্তর্হিত হয়, সেইজন্য এই যে অতীব নির্ম্মল আকাশ, ইহাই জগদাকারে অবলোকিত হইয়া থাকে। এই যে ভূমণ্ডল, আর আমি সে কালে ভাবনায় যে ভূমণ্ডল কল্পনা করিয়াছিলাম,—এই উভয় ভূমণ্ডলই মহাচিতের স্বরূপ। স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ন্যায় এই যাহা তোমাদের নিকট জগদাকারে প্রত্যয়যোগ্য হইতেছে, এই ভূমণ্ডল আর আমার দৃষ্ট সেই ভূমণ্ডল উভয়ই আকাশস্বরূপ। অজ্ঞানোপহিত আত্মার জ্ঞান হইতেই এই জগদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, তখন এই ভূমণ্ডল বা আমার সেই ধারণাকল্পিত ভূমণ্ডল, এতদুভয়ের কিছু মাত্র অস্তিত্ব থাকে না। ত্রৈকালিক ত্রৈলোক্যোদরে যে জীবনিবহের অবস্থিতি, তাহাদের ভ্রম বা স্বপ্ন-সঙ্কল্প মনোরাজ্য-দশাতেই হয়।

রামচন্দ্র! ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান নিখিল ভূমণ্ডলই সত্তাসামান্য চিৎসত্তা মাত্র। ঐ ভূমণ্ডল আমিই এবং তদন্তর্গত ভূমণ্ডলও আমি বৈ আর কেহই নহে। এই নিমিত্তই সেই সকল ভূমণ্ডল আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে,—অনুভূত হইয়াছে। অজ্ঞানদশায় পরমাত্মাই স্বীয় শুদ্ধ স্বস্বভাবের অপরিহারে এই যথাবস্থিত জগৎ সদাকারে ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তখন তিনি কিছুই ধারণ করেন না।

উননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে জগৎপরম্পরার উল্লেখ করিলেন, ঐ সকল জগতের অভ্যন্তরে আরও কোন জগৎ আপনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল কি না, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি স্বয়ং পরমাত্মরূপী, তথাচ যখন ভূমণ্ডল ধারণা করিলাম, তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নভূমণ্ডলরূপী হইয়া নিজ হৃদয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিযোগে অনুভব করিতে লাগিলাম যে, সর্ব্বত্রই অসংখ্য জগৎ

অবস্থিত রহিয়াছে। দৃশ্যপ্রপঞ্চ শান্ত শূন্য বটে, তথাচ দ্বৈতস্বরূপে অবস্থান করিতেছে। সর্ব্বত্রই অনন্ত জগতের অস্তিত্ব এবং সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজিত। এই যে কিছু বাহ্যাড়ম্বর আছে, এতৎসমস্তই শান্ত শূন্য পরব্রহ্ম। এই ক্ষিতিপ্রভৃতি স্থূল পদার্থ সকল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; কিন্তু সে সকল বস্তুগত্যা অকিঞ্চিৎ—সমস্তই একমাত্র সেই চিদাকাশ। ফলতঃ এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ননগরের ন্যায় বেদ্য বিষয়। নানা, অনানা, নাস্তিত্ব, অস্তিত্ব, বা আমি, এ সকল যাঁহাতে নাই, এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে কোথা হইতে আসিয়া স্থান পাইবে? 'অহ'মিত্যাকার দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্যস্বরূপে অনুভূতিগোচর হইলেও বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার কিছুই কুত্রাপি নাই। 'আছে' এইরূপ স্বীকার করিতে হইলে, ইহাই স্বীকার করা সমুচিত যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন;—তিনি অজ, অনাময়, শান্ত। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে একমাত্র চিদাকাশই বিকাশমান ছিল। তাহা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই পরবর্ত্তীকালে চিদাকাশে অনুভূয়মান এই জগৎকে স্বপ্ননগরবৎ অলীক বস্তু বলাই সঙ্গত। ইহাকে নাস্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না; কেন না, ইহার তো কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। ফলে যাহার অভাব হইবে, অগ্রে এবং পশ্চাতে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমি পৃথ্বীরূপ ধারণায় যেমন সেই জগৎনিশ্চয় দেখিয়াছি, তেমনি জলরূপ ধারণাতেও জলাবলোকন করিয়াছি। আমি অজড়; তথাচ জলধারণায় জলস্বরূপে সাগরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কতকাল কত গুল্‌গুল্‌ ধ্বনি করিয়াছি। কোন ক্ষুদ্র কীট অলক্ষিতভাবে গাত্রে উঠিলে তোমরা যেমন অনুভব করিতে পার না, তেমনি আমি জলরূপে মন্দগমনে কত তৃণলতা-গুল্মাদির আস্তর স্তম্ভেই অলক্ষিতভাবে উঠিয়াছি; ধীরে ধীরে গিয়া তৃণ-লতাদির অন্তরালে প্রবেশপূর্ব্বক সে সকলের মধ্যে মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিয়াছি। আমি জলরূপে গিয়া লতা ও তাল-তমালাদি তরুর ফলে পল্লবে রসভাবে থাকিয়া সে সমুদায়ে কত রেখাই না রচিত করিয়াছি। আমি প্রাণীদিগের জলপানকালে তাহাদের মুখবিবর দিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি এবং বসন্তাদি ঋতুবিশেষে তাহাদের ধাতুবৈষম্য ঘটাইয়া দিয়াছি। প্রাণীদিগের অন্তরে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই ধাতুত্রয় কখন কখন সমভাবে

রাখিয়াছি, আবার কখন বা বিষমভাবে কুপিত করিয়া দিয়াছি। জঠরানলে কত বস্তুর পরিপাক ঘটাইয়াছি, এবং কতই না ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছি। আমি একইকালে সকলস্থানে সকল দিকে হিমকণারূপে পল্লবতলে শয়ন করিয়াছি। নদ, নদী ও হ্রদাদি জলাশয় মধ্যে প্রতিনিয়ত আমি জলরূপে প্রবাহিত হইয়াছি। আবার ক্বচিৎ কোথাও 'সেতুরূপ সুহৃদ পাইয়া তাহার প্রাসাদে বিশ্রাম করিয়াছি। আমি চৈতন্যযোগে অচৈতন্য জড়াংশকেই বিষয় করিয়াছি, সেই বিষয়াংশরূপেই কেবল রহিয়াছি। প্রকৃত চিৎস্বরূপ যে কি, তাহার সন্ধান একেবারেই লই নাই। আমি তখন কেরল জড় হইয়াছি এবং জড়াশয়েই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। পাদপ যেমন গিরিশিখর হইতে গর্ত্তমধ্যে পড়িয়া গিয়া শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, আমিও তেমনি জলপ্রবাহরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া শত সহস্রধা বিচূর্ণিত হইয়াছি। আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে ধূমাকারে বহির্গত হইয়াছি। গগনাম্বুধি-জলে সুনীল নক্ষত্রমণির মধ্যভাগস্থ রত্নকণিকা হইয়া বিরাজ করিয়াছি। আমি ঘন হইয়া ঘনাঞ্জনবৎ নীল হইয়াছি, সেই অবস্থায় শেষশরীরে বিভু নারায়ণের ন্যায় সৌদামিনী-কামিনীর সহিত ঘনমণ্ডলে বাস করিয়াছি। ব্রহ্ম বস্তু যেমন সর্ব্বময়রূপে সর্ব্ববস্তুরই অন্তরে অবস্থিত, আমি তেমনি পরমাণুময় সৃষ্টিতে নিখিল স্থূল পদার্থের অভ্যন্তরেই অলক্ষ্যে অবস্থান করিয়াছি। আমি মধুরাদি রসরূপে রসনারূপ অণু সহ মিশিয়া গিয়া পরমোত্তম রসাস্বাদ অনুভূতিগোচর করিয়াছি। ঐ অনুভূতি আত্মার বা দেহের অনুভূতি নহে; উহা কেবল জ্ঞানেরই অনুভূতি। চেত্যবিষয় আস্বাদিত হইবার নহে। তাহাতে সুখলেশ নাই বলিয়াই তাহা আস্বাদনের অযোগ্য। জীবদিগের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই চিৎকর্ত্তৃক ঐ চেত্য তাহাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি সর্ব্বদিকেই সর্ব্বঋতুর রসরূপে নানা সুরভি-কুসুমরস উপভোগ করিয়াছি। কল্পনায় জড় হইলেও বাস্তব পক্ষে আমি জড় চেতন। আমার এই চেতনরূপেই নিখিল প্রাণীর অন্তরে আমি বিরাজ করিয়াছি। আমি সলিলকণারূপে পবনপথে সমারূঢ় হইয়া সৌরভ-কণিকার ন্যায় স্বচ্ছাকাশে খেলা করিয়াছি।

রামচন্দ্র! প্রত্যেক পরমাণুতেই জগৎ আছে; ইহা সেই অবস্থায় আমার অনুভূত হইয়াছে। আমি অজড়; তথাচ সে কালে জড়-ভাবনায় জড় হইয়াছি এবং সর্ব্ব পদার্থের অন্তরালে জ্ঞাতাজ্ঞাতরূপে বাস করিয়াছি। তৎকালে কদলীপত্রস্তরের ন্যায় পরপর-বিন্যস্ত ক্ষয়োদয়শীল লক্ষ লক্ষ জগৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি এই যে সকল উপদেশবাণী বিবৃত করিলাম, ইহার তাৎপর্য্য—জগৎ বা অজগৎ যে কিছু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছ, এতৎসমস্তই সেই চিদাকাশ। ঐ যে আকাশ, উহা অপেক্ষাও সেই চিদাকাশ সমধিক সুনির্ম্মল। তুমি বা তোমার এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কিছুই নহে; এ সংসারের সমস্ত দৃশ্যই মিথ্যা। যাহা কিছু প্রতিভাসিত হইতেছে, সকলই সেই এক পরম বোধস্বরূপ। এই পরম বোধ দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপ কিছুই নহে। যাহা অনন্ত চিদাকাশ, তদ্রূপেই তুমি বিকাশমান হও।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর আমি তেজোভাবনা করিতে লাগিলাম। সেই ভাবনায় ক্রমে আমি রবি, শশী ও নক্ষত্রাদি বিচিত্রাকারময় তেজ হইয়া পড়িলাম। সর্ব্বদা সত্ত্বপ্রধানরূপে প্রকাশমান হইলাম; প্রকাশ-রূপে সকল জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিলাম। তখন তিমির-স্তোম সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিহার করিয়া তস্করের ন্যায় পলায়মান হইল। আমি যেন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলাম। যেমন নানাবেশধর চর প্রেরণ করিয়া পৃথিবীপতি পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জন-সদনের সমস্ত বৃত্তান্ত সতত প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি আমিও তখন শত শত বর্ত্তিকান্বিত স্নিগ্ধ দীপাবলী দ্বারা তেজোরূপে সমুদায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। চন্দ্র-সূর্য্যাদির কিরণরাজিরূপ মদীয় রোমাবলী জগদ্দর্শনে হৃষিত হইল। আমার সেই রোমরাজির উপর গগনরূপ নীলপট পরিস্তৃত ছিল, তাহা আর তখন মদীয় গাত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল না। অন্ধকার

নিখিল রূপাদি দর্শনের প্রতিরোধক; তাই সেই তেজঃপ্রকর্ষে অন্ধকার তখন অপসারিত হইল। সর্ব্বজগৎ তেজোময় হইয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। তেজ তখন তিমিররূপ তমালতরুর কুঠাররূপ ছেদনকর্ত্তা হইল। জ্যোৎস্নাদেবীর উৎসঙ্গে শুক্ল, কৃষ্ণ ও শ্বেত-পীতাদি বর্ণরূপ যে সকল পুত্র শয়ান, ঐ তেজ তাহাদের উৎপাদক পিতৃস্থানীয়। তেজ পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবেই দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু সে তাহা করে না; তাই বলা যায়, ঐ তেজ পৃথিবীর প্রতি একান্তই স্নেহকারী। উহা যেন প্রীত হইয়াই তৎকালে প্রতিগৃহে প্রদীপরূপ ছত্র স্থাপন করিয়া দিল। পাতালগহ্বর অন্ধকারপুঞ্জে পরিণত; সেখানেও ঐ তেজ অল্প অল্প পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ভূতাকীর্ণ ধূলিময় ভূতল,—এখানে উহা অর্দ্ধাংশে অবলোকিত হইল। তখন সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মহাপ্রকাশ, দেবালয়ের নিত্যতা, জগৎরূপ জীর্ণ নিকেতনের প্রদীপ, জল ও অন্ধকারের অন্তগ্রাসী মহাকূপ, দিগঙ্গনাদিগের স্বচ্ছ মুকুর, নিশাতুষারের সমীরণ, রবি-শশি হুতাশের সত্ত্ব এবং আকাশের কুঙ্কুমলেপরূপে ঐ তেজ বিরাজ করিতে লাগিল। উহা দিবসরূপ শস্যের ক্ষেত্র, তিমিরাবৃত রূপরাশির প্রকাশকত্ব নিবন্ধন যেন মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ এবং আকাশরূপ সুবৃহৎ কাচপাত্রের প্রক্ষালক জলস্বরূপ। ঐ তেজঃ সর্ব্বপদার্থের সত্তাপ্রদ ও প্রকাশকর্ত্তা; তাই উহা চিন্মাত্ররূপ পদার্থের যেন সহোদর ভ্রাতা। ঐ তেজ ক্রিয়া-রূপিণী কমলিনীর দিনমণি এবং ভূতলের জীবনরূপী। উহা চৈতন্যবৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের হেতু এবং মানস প্রত্যক্ষের নিদান। তখন ঐ তেজ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডখাতের অভ্যন্তরবর্ত্তী মহাসাগরবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। গগনতলগত অগণিত নক্ষত্রনিকর ঐ মহাসাগরের মণিপ্রকরবৎ প্রকাশমান হইতে লাগিল। দিন, ঋতু ও বৎসররূপ স্ফীত বাড়বানলাদির বিক্ষোভ-বশতঃ সতত ঐ মহাসাগর ফেনিল হইতে লাগিল। তদীয় রবি-শশিরূপ ঊর্ম্মিমালার অভ্যন্তরে ধূলিজাল পতিত হওয়ায়, ঐ মহাসাগর বিনা জলেই পঙ্ক-পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে ঐ তেজ অক্ষয় মহাসমুদ্রস্বরূপে উপলভ্যমান হইতে লাগিল। সুবর্ণাদির বর্ণ, মানবাদি জীবের বল, রত্নাদির ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ষাদির বিকাশরূপে সেই তেজ তখন প্রতীত হইতে লাগিল।

উহা জ্যোৎস্নাদেবীর বিধু-বদন-ক্ষরিত স্নেহ, সুধা ও হাস্যরূপে ক্ষরিত হইল ; যে সহজ-বিলাস কামিনীদিগের কপোল ও নয়নাদির ঔজ্জ্বল্যকারী, ঐ তেজ তৎস্বরূপেই বিকাশ পাইতে লাগিল। এই ত্রিভুবনকে যাঁহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রবল শত্রুকেও কম্পিত হইতে হয়, আমি তথাবিধ তেজোরূপ হইয়া বীর-শ্রেষ্ঠদিগের মস্তকে বজ্রাহতিরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। সিংহাদি যে সমস্ত বলবান্ জন্তু—আমি তাহাদের হৃদয়ে বলরূপে বিরাজ করিতে লাগিলাম। যাহারা কঠিন কবচভেদী অসিসমূহের প্রহারটঙ্কার-নাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলেন, আমি তথাবিধ উদ্ধত যোদ্ধৃবৃন্দের উদ্ভট গতিরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলাম। আমি তখন তেজঃস্বরূপে দেবগণের দেবত্বরূপে, দানবদিগের দানবত্বরূপে, স্থাবরাদির ঔন্নত্যরূপে এবং সর্ব্বভূতের বলরূপে বিরাজ করিতে লাগিলাম। তৎপরে আমি সেই ভাবনাকল্পিত জগতের আকাশকোষে জলভ্রান্তিজনক মরুস্থলীর ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া অনুভব করিতে লাগিলাম,—সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তার করিয়া জগৎরূপ বিহঙ্গম ধরিতে উদ্যত হইয়াছেন। শৈলসকল ঐ জগদ্বিহঙ্গের অঙ্গরূপে প্রতীত হইতেছে। ভূমিভাগ অল্পমাত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। যিনি অমৃতের হ্রদ, গগনের বদন, নিশারূপিণী অভিসারিকার হাস্য, রজনীচরগণের স্ফূর্ত্তি, জাগতিক নিখিল সুন্দর সামগ্রীর উপমাস্থল, রাজনী-রোহিণী-কুমুদিনীর প্রিয়তম স্বামী এবং যাবতীয় লোকের বদন ও নয়নের আহ্লাদজনক পরম রম্য বস্তুরূপে বিরাজমান, আমি ভাবনাবলে সেই চন্দ্র হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলাম। যে সকল নক্ষত্র আকাশ-লতিকার কুসুমাবলী ও স্বর্গের মশকসমূহরূপে প্রকাশমান, আমার তৎ-পরক্ষণের নক্ষত্রভাবনায় সেই নক্ষত্ররূপেই আমি পরিণত হইলাম। অনন্তর আমি ভাবনাবলে বণিগ্জনের বিপণীপ্রসারিত ও সাগরের ঊর্ম্মিকর-চালিত রত্ন হইলাম। তৎপশ্চাৎ ভাবনাগুণে আমি সাগরের সলিলশোষী বাড়বাগ্নি হইলাম। তখন আমা হইতে ভীত হইয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শফরী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, আমি সেই বাড়বাগ্নিরূপে তাহাদের ভ্রমণকৌতুক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর ভাবনাবলে মেঘের বজ্রানল ও পর্ব্বতের

দাবানল হইলাম। তখন সেই অবস্থায় আমি নিজেই নিজদেহে জ্বালানুভব করিতে লাগিলাম। তাহার পর ভাবনা করিয়া আমি সাধারণ বহ্নি হইলাম। সে বহ্নিদাহে কাষ্ঠনিচয় দগ্ধ হইল; দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠ-ফাটনের কঠোর শব্দ করিয়া তাহা সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পরে যজ্ঞানল হইলাম; দেহে ঘৃতদাহ অনুভব করিতে লাগিলাম। অনলাবস্থায় কত ধনাগার দগ্ধ করিলাম; বহু মূর্খের বাদবিতণ্ডায় প্রকৃত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যনাশের ন্যায় সেই সেই ধনাগার দাহকালে মণি-মাণিক্যাদির উত্তম জ্যোতিও আমার তেজে তিরস্কৃত হইয়া গেল। আমি ভাবনার বলে মুক্তাহার হইলাম। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বাঙ্গনাদিগের কুচমণ্ডলে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে তখন আমি ভাবনাবলে খদ্যোত হইয়াছি এবং পান্থজনগণের পদতলে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছি। কখন কামিনীর ললাটফলকের তিলক হইয়াছি। আবার সমুদ্রে শফরীসঞ্চারের ন্যায় কখন বা আমি বিদ্যুৎ হইয়া মেঘোপরি বিকাশ পাইয়াছি। কখন আমি অন্তঃপুরের সুন্দর সুকোমল চম্পককলিকার ন্যায় দীপকলিকা হইয়া কামিনীজনের কতবার কত সুরতকেলি সন্দর্শন করিয়াছি। কখন সেই দীপকলিকার বর্ত্তিকায় কজ্জলপাত হইয়াছে, তাহাতে হীনপ্রভ হইয়া আমি কচ্ছপবৎ সঙ্কুচিতগাত্রে রহিয়াছি। কদাচিৎ আমি প্রলয়ের মহাবহ্নি হইয়াছি, সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অপিচ কজ্জলাভ শ্যামাকারে লীন হইয়া গিয়াছি। কদাচিৎ আমি বাড়বাগ্নি হইয়া আকল্প অশেষ জলরাশি পান করিয়াছি; পরন্তু যখন দেখিয়াছি, কি জগৎ, কি জলরাশি—সকলই আকাশবৎ শূন্য হইয়া গিয়াছে, তখনই আমি আকাশে থাকিয়া নৃত্যারম্ভ করিয়াছি। কখন অঙ্গাররূপ দশন, জ্বালারূপ বাহু ও ধূমরূপ বিলোল কুন্তলশালী প্রখর অনলরূপে নিখিল জন্তু কবলিত করিয়া যাবতীয় জল শোষণপূর্ব্বক কাষ্ঠাদি অশেষ পদার্থপুঞ্জকে আমার খাদ্যসামগ্রী করিয়াছি। কদাচিৎ আমি কর্ম্মকারগৃহে লৌহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং কর্ম্মকারের লৌহ-মুদ্গরে আহত হইয়া বহ্নিকণা বমন করিয়াছি। কদাচিৎ বহু মূল্য-বান্ মণি হইয়াছি। সেই অবস্থায় বিশাল শিলাখণ্ডের ভিতরে অবস্থান

করিয়াছি, আর নিখিল জীবের চক্ষুর অগোচরে শত শত যুগ যাপন করিয়াছি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি আপনার যে সময়ের যে যে অবস্থার কথা কহিতেছেন, তখনকার সেই সেই অবস্থায় আপনার কি সুখ হইয়াছিল, অথবা দুঃখানুভব হইয়াছিল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। তাহাতে আমার জ্ঞান বর্দ্ধিত হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মানুষ যে সচেতন হইয়াও নিদ্রাবস্থায় যেমন জড় হইয়া পড়ে, তেমনি চিদাকাশও যখন দৃশ্যদশায় উপনীত হন, তখন তিনি আপনাকে জড়ভাবাপন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকেন। তিনি যখন আপনাকে ক্ষিতিপ্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান করেন, তখন তিনি সুপ্তাবস্থাপন্ন জড় ব্যক্তিবৎ অবস্থান করিতে থাকেন। অন্যথায় তিনি যেমন, তেমনই থাকিয়া যান। তাঁহার যে আকাশ কিম্বা ক্ষিতিপ্রভৃতি রূপ, তাহা বস্তুগত্যা সৎ নহে। ব্রহ্ম দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবে বিভাত হইলেও সতত অবিকৃতরূপেই বিরাজ করেন। এই প্রকার সত্যজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার নিকট সকলই একাকার; পঞ্চভূত বা দ্রষ্টৃদৃশ্য ভ্রম কিছুই তাঁহার নাই। ফলে আমারও ঐরূপ সত্যজ্ঞান ছিল; তাই ভেদজ্ঞানের অসদ্ভাবে সে কালে আমার কোনই দুঃখানুভূতি হয় নাই। আমি সে কালে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-রূপেই ছিলাম। সেই ভাবে থাকিয়াই সেই সেই দশা ভোগ করিয়া-ছিলাম। যদি ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে আর ভাবনাপ্রভাবে ঐ সকল হওয়া সম্ভবপর হয় না। নিরাময় আত্মাই নিখিল দৃশ্যরূপে পরিণত হইতেছেন; ইহাই যখন স্থির সিদ্ধান্ত, তখন বুঝিতে হইবে, আমি সে কালে ব্রহ্মপদে থাকিয়া আত্মাকেই দেখিয়াছিলাম। ভূত-পঞ্চকের ভাবনা করিয়া আমি যদি জড়ই হইয়া যাইতাম, আমার চৈতন্য যদি বিলুপ্ত হইয়াই যাইত, তবে আমি পূর্ব্বোক্ত ক্ষিতিপ্রভৃতি ঐঐরূপ হইয়া ছিলাম বলিয়া অনুভবই করিতে পারিতাম না। আমি নিদ্রিত হইলাম, এইরূপ জ্ঞান থাকে বলিয়াই সুষুপ্ত ব্যক্তি চেতন হইলেও নিদ্রাজন্য অজ্ঞান-রূপ জাড্য প্রাপ্ত হয়; পরন্তু কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্রকাশ বস্তুর অনুভূতি তখন থাকেই।—নহিলে সুষুপ্তিকালের অননুভূত নিদ্রা অজ্ঞানাদির

পরেও স্মরণ হয় কিরূপে? জ্ঞানোদয়ে যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয়, তাহার আধিভৌতিক দেহ শান্ত হইয়া যায়। ক্রমশঃ জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। সেই যে জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহ, যোগী তাহাকে নিজের ইচ্ছানুসারে কখন সূক্ষ্ম, আবার কখন বা বৃহৎ করিতে সক্ষম হন। তথাবিধ আধিভৌতিক দেহাবস্থায় যোগীর জীবন্মুক্তভাবই অবস্থিত হয়। যোগী ঐ জ্ঞানময় দেহেই দুর্ভেদ্য কঠিন শিলাভ্যন্তরেও প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তথা হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন। কি আকাশ, কি পাতাল, সর্ব্বত্রই ঐ জ্ঞানদেহ যাতায়াত করিতে পারে।

রামচন্দ্র! আমি ঐ সময় জ্ঞানময় হইয়াছিলাম এবং সেই দেহেই ঐ সকল দশা ভোগ করিয়াছিলাম। অনন্তর উল্লিখিত সেই সেই ঘটনা-গুলি চিদাকাশ দেহেই অনুভব করিলাম। বস্তুতঃ আকাশ, পাতাল, এমন কি বজ্রোপরিও ঐরূপ চিন্ময় দেহে গতায়াত করা যায়, তাহাতে কোনই বিঘ্নসম্ভাবনা নাই। সেই চিদাকাশ জ্ঞানময় দেহে জড়াজড় নিখিল পদার্থেই সমভাবে অবস্থিত। উক্ত জ্ঞানদেহে দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ চিদাত্মার এইরূপ গতায়ত স্বেচ্ছাক্রমেই হয়। যে জন নিজের ইচ্ছায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কি কোনরূপ ক্লেশ সম্ভাবনা করা যায়? কেন না, যদি ক্লেশানুভূতিই হইবে, তবে সে ঘুরিয়া বেড়াইবে কেন? বুধগণের মতে কেবল জ্ঞানই অক্ষয় আতিবাহিক দেহরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বৎস! সেই জ্ঞানময় আতিবাহিক দেহেরই অনুভব তুমিও এক্ষণে করিতেছ। যদি তত্ত্ববিদ্‌গণ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 'আমিই একমাত্র চিৎ' এইরূপ ভাবনার বলে সূর্য্যাদি সমস্ত জগৎ অস্তমিত করত আত্মভাবে সৎ ও অনাত্ম জগদ্‌ভাবে অসৎ হইয়া অবস্থান করিতে পারেন। জাগ্রদবস্থায় যে জগৎ অস্তি বলিয়া পুরুষের প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্নদশায় তাহার অনস্তিত্ব হইয়া পড়ে, অপিচ স্বপ্নাবস্থায় যে জগৎ সত্যরূপে প্রতীত, তাহা জাগ্রদ্দশায় অলীক হইয়া যায়। এইরূপ অজ্ঞ দর্শনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান এ জগৎ জ্ঞানীর নিকট অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যায়, যেমন কোন কল্পনাকারীর গাত্রে তদীয় মনোরাজ্য কল্পিত অঙ্গার-নদীর জ্বলন্ত শিখাময় তরঙ্গ সংলগ্ন হইল, কিন্তু তাহাতে

কোনরূপ ক্লেশানুভব হইল না; পরন্তু কৌতুক প্রাপ্তিই হইল, তেমনি উক্ত চিদাকাশ পাষাণাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়াও কোন ক্লেশানুভব করেন না।

যাহা হউক, রামচন্দ্র! অতঃপর আমি বহ্নিভাবনায় বহ্নি হইলাম এবং অঞ্জনরূপ ভ্রমরনিকরে সুশোভিত হইয়া বহ্নিজ্বালারূপ কিংশুক-কুসুমাবলী বিকসিত করিয়া সমগ্র কাননপ্রদেশ বহ্নিময় করিয়া তুলিলাম। হে রাঘব! এইরূপে আমি খলজনের সমৃদ্ধির ন্যায় চঞ্চল বহ্নিজ্বালা-রূপে অভ্যুদিত হইয়া ক্ষণমধ্যেই সে ভাব হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইলাম।

হে রাম! আমি বহ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রতি পরমাণুর মধ্যে মধ্যে এই এইরূপে বহু জগৎ অবলোকন করিয়াছি। সেই সকল মদবলোকিত জগৎ ও তোমাদের এই জগৎ চিদাকাশ হইতে সম্পূর্ণই অভিন্ন। এ বিষয়ে তোমাদের স্বপ্ন-সংদৃষ্ট গিরি-পুরাদিই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎপরে আমার জগদ্দর্শনে কৌতূহল হইল। আমি ধীরতার সহিত বায়বী ধারণা করিতে করিতে বায়ুভাবনায় অনন্ত বায়ু হইয়া গেলাম। ঐ বায়ু লতাবধূর নৃত্যশিক্ষক হইল, কমল, উৎপল ও কুন্দাদি কুসুম-সৌরভকণা বহন করিয়া হেলায় হিমবিন্দু-হরণে তৎপর হইল; সুরতক্লান্ত কামীজনের কলেবরে স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিতে লাগিল; তৃণ, গুল্ম ও লতাপ্রভৃতির নর্ত্তনকার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিল; লতা, ওষধি ও পুষ্পাদির সৌরভসঙ্গে আমোদিত হইল। উহা শুভ সময়ে শান্ত শীতল সুগন্ধি হইতে লাগিল, আবার উৎপাতপাতে প্রলয়ো-দয়ে ভীষণাকারে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। সেই বায়ুই নন্দনবনের

পারিজাতাদি কুসুমের মকরন্দ পরাগপ্রকরে অরুণিত হইল, আবার উহাই নরকাগ্নির অঙ্গাররাশিময় হইয়া ভীষণভাবে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। ঐ বায়ুই সাগরে মৃদুমন্দ তরঙ্গভঙ্গী প্রকটিত করিয়াছিল। উহাই গগনের মেঘ সরাইয়া দিয়া সুধাকররূপ দর্পণদেশ শনৈঃ শনৈ মালিন্যহীন করিয়াছিল। উহাই নক্ষত্রনিকররূপ সৈন্যসমবায়ের বেগগামী রথ হইয়াছিল। ঐ বায়ুই আকাশযানের বহনকর্ত্তা, এবং মনের ন্যায় সবেগে গতিশীল —যেন মনেরই দ্বিতীয় ভ্রাতা। আমি সে কালে ঐ বায়ুরূপে নিরাকার হইয়াও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিলাম এবং নন্দনবনের চন্দনদ্রুম কম্পিত করিতাম। ঐ বায়ুতে যে সকল তুষারবিন্দু ভাসিতে ছিল, সে সমুদায় তখন যেন আমার পক্ব গাত্ররোম হইয়াছিল। ঐ বায়ুর সৌরভই মদীয় বয়ুরূপ দেহের যৌবনমদ এবং মৃদুতাধর্ম্ম আমার শৈশব হইয়াছিল। আমি সেই বায়ুরূপে নন্দনবনে সৌরভ লইয়া মধুরভাবে বিচরণ করিতাম। কুবেরের চৈত্ররথ হইতে আমিই ঐ বায়ুরূপে বহিয়া আসিতাম এবং কান্তাজনের রতিখেদ অপনয়ন করিতাম। বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গার তরঙ্গমালা আন্দোলিত করিতাম এবং ঐ কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। কিন্তু পরিশ্রম যে কি, তাহা আমি বুঝিতাম না; অথচ লোকের অনন্ত পরিশ্রম অপনয়ন করিতাম। বিলোল পল্লব যাহাদের হস্ত, অলিমালা যাহাদের নেত্রপঙ্ক্তি, এবং কুসুমভারে যাহারা অবনতাঙ্গী, তথাবিধ লতাবধূদিগকে আমি বায়ুরূপে স্পর্শ করিয়া চঞ্চল করিয়া দিয়াছি। সেই বায়ু—আমি সুধাংশুমণ্ডলের সুধাস্বাদ করিয়া নীরদশয্যায় শয়ন করিয়াছি, কমলবন কাঁপাইয়াছি এবং কামুকদিগের রতিখেদ অপনয়ন করিয়াছি। আমি বায়ুরূপে আকাশতরঙ্গ হইয়া ছুটিয়াছি; ধূলিজাল উড়াইয়া দিয়াছি এবং বন্য মাতঙ্গের মদগন্ধ প্রকটিত করিয়া তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গান্তরের ক্রোধোৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়াছি। আমি বায়ুরূপে বংশী বাজাইয়া গো-মহিষাদি পশু পালন করিয়াছি। জলবিন্দু সকল যেন মুক্তামালা; আমি সেই মালার সূত্ররূপে অবস্থান করিয়াছি। কত ধূলিনাশক জলবিন্দু শুষ্ক করিয়া দিয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি।

সে কালে আমি আকাশকুসুমের সৌরভ, সমগ্র শব্দসমষ্টির সহোদর, সমস্ত জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিচালক ও ঐ সকল জীবের দেহস্থ নাড়ী-প্রণালীমধ্যে জলরূপে রহিয়াছি। মর্ম্মস্থলের যাহারা কর্ম্মকার, তাহাদের মধ্যে আমিই একমাত্র আত্মস্বরূপ ও হৃদয়রূপ গুহার অধিবাসী সিংহস্বরূপ হইয়াছি। আমি অগ্নির বলাবল বুঝিয়াছি; তাই যাহাকে দুর্ব্বল পাইয়াছি, তাহাকে নিবাইয়া দিয়াছি আর যাহাকে প্রবল দেখিয়াছি, তাহাকে আরও প্রবল করিয়া দিয়াছি। আমি সর্ব্বদাই পথে পথে রহিয়াছি, বায়ুরূপে সৌরভরত্ন লুঠিয়া লইয়াছি এবং আকাশরূপ নগর ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি তাপান্ধকারের চন্দ্র হইয়াছি এবং শৈত্য-শীতাংশুর উদ্ভবস্থান ক্ষীরাব্ধি হইয়াছি। আমি প্রাণাপানরূপ সূক্ষ্ম সূত্রযোগে প্রাণীদিগের দেহযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছি। আমি সমস্ত দ্বীপেই সঞ্চরণ করিয়াছি। আমি সাগরের তরঙ্গাহতি দ্বারা কোন কোন দ্বীপ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি; আবার ধূলিরাশি স্তূপীকৃত করিয়া কোন কোন দ্বীপ বর্দ্ধিত করিয়াছি। সে কালে আমি সর্ব্বদ্বীপেই সঞ্চরণ করিয়াছি। আমি সম্মুখে থাকিয়াও সকলের অদৃশ্যভাবে মনোরাজ্যবৎ কাল কাটাইয়াছি। কখন বা আমি পঙ্কের বন্ধনস্তম্ভ হইয়াছি; আবার তিলাভ্যন্তরেও তৈলরূপে অবস্থান করিয়াছি। যেমন গঙ্গার প্রবাহ নানাবিধ তরঙ্গশ্রেণীতে ধূলি মাখাইয়া একাকার করিয়া দেয়, তেমনি আমিও প্রলয়পবনরূপে ক্ষণমধ্যেই সমস্ত পর্ব্বত সমুৎপাটন-পূর্ব্বক একত্র স্তূপীকৃত করিয়া দিয়াছি। আমি ধূম, ধূলি, মেঘ ও জলা-লোড়নকর প্রবল পবন হইয়াছি; আকাশগঙ্গার উৎপলগত ভ্রমররূপে বিরাজ করিয়াছি। আমি বাত্যারূপ দেহযোগে জীর্ণ পর্ণরাজিকে শনৈঃ শনৈ পরিক্ষিপ্ত করিয়াছি। স্পন্দরূপ কমলদলের বিকাশক বিভাকর হইয়াছি এবং শব্দরূপ বারিবর্ষণের বারিধর হইয়াছি। আমি বায়ুরূপে আকাশবনে মাতঙ্গ, দেহগৃহে সদা শব্দায়মান ঘরট্টযন্ত্র, নানাস্থানে ধূলিজাল এবং বনশ্রেণীরূপ নায়িকা-লিঙ্গনে নায়ক হইয়াছি। হিম ও ঘৃতাদির পিণ্ডীভাব সম্পাদন, পঙ্কাদির পরিশোষণ, বারিধরাদির বিধারণ, তৃণ প্রভৃতির পরিস্পন্দন, সৌরভাদির সমাহরণ এবং কাল ও পাত্রভেদে শৈত্যসম্বিধান, এই সকল নানাকার্য্যে লিপ্ত রহিয়া আপ্রলয় ক্ষণেকের

স্তরেও বিশ্রামলাভে সমর্থ হই নাই। তেজ যেমন রসাকর্ষক, তেমনি আমিও তখন তদীয় সহোদরবৎ রসাকর্ষী হইতাম। আমি হরণ ও গ্রহণাদি কার্য্যের কর্ত্তৃত্বে করাদি অবয়ব পরিচালিত করিয়াছি। নাড়ী-পথ ধরিয়া দেহনগরে নির্ব্বিঘ্নে আমি যাতায়ত করিয়াছি। দেহভাণ্ড অম্বরসময়; তাহাতে আমি প্রাণ ও অপানাদিরূপে পর্য্যবসিত হইয়া আয়ুরূপ মূল্যবান্ মণির সঞ্চয় ও ব্যয় বিধানে শ্রেষ্ঠ বণিক্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। কত শত দেহগৃহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি এবং কখন বা সে সকল নির্ম্মাণ করিয়াছি। সে কালে দেহের রসধাতুপ্রভৃতিকে পৃথক্ করিবার কৌশলও বিলক্ষণ আমি বিদিত হইয়াছিলাম। আমি বায়ুভাবে উপনীত হইয়াও প্রতি অণুতে অণুতে বহু জগৎ দেখিয়াছি। ঐ দৃষ্টপূর্ব্ব জগৎপরম্পারাতেও আবার পৃথ্ব্যাদি বিবিধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি; অথচ আমার যে অনন্ত বিশাল চিদাকার রূপ, তাহার অন্যথা কখনই হয় নাই; চিরদিন তাহা একই ভাবে বিরাজ করিতেছে। যদি কল্পনাদৃষ্টি লইয়া দেখা যায়, তবে প্রত্যেক পরমাণুতেই সৃষ্টিপরম্পরার প্রচলন প্রত্যক্ষ হইবে। কিন্তু যদি পরমার্থ দর্শনে দেখা যায়, তবে প্রত্যক্ষ হইবে, বাস্তবিকই কিছুই নাই। এইরূপ দৃষ্টিতে সমস্তই যখন শূন্যাকার, তখন তাহা থাকিবেই বা কিরূপে? প্রতি পরমাণুগর্ভে যে সকল জগৎ দেখা গিয়াছে, সেই সেই জগৎপরম্পরার অন্তরালেও চন্দ্র আছেন, সূর্য্য আছেন, অগ্নি আছেন, যম আছেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আছেন, আর গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, নগ, সাগর, মহাসাগর, দ্বীপ, দিগন্তর, লোকপতি, ক্রিয়া, কাল, কলা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ভাব, অভাব, জরা, মরণ, ইত্যাদি সকলই বিদ্যমান আছে।

রামচন্দ্র! এইরূপে আমি ত্রিলোকরূপ কমলোদরে উল্লিখিত ভূত-পঞ্চকরূপে বিহার করিয়াছি। আমি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুর সমষ্টি-রূপ তরুশরীরে বাস করিয়াছি এবং তদবস্থায় মূল দেশ দ্বারা ভূমিরস পান করিয়াছি। যাহা সুধা, চন্দনদ্রব ও শৈত্য শুক্লাদি গুণময় তুষারশয্যার সহিত উপমিত হইতে পারে, তথাবিধ সুধাংশুমণ্ডলে শয়ান হইয়া আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আমি সকল ঋতুতেই সকল দিকের সকল কাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ সুরভি কুসুম রস পান করিয়াছি। যাহা

আকাশপ্রাঙ্গণে আস্তীর্ণ অতীব শুভ্র এবং নবনীতময় সুকোমল ভূমিতল-সদৃশ, তথাবিধ মেঘমালায় আমি শয়ন করিয়াছি। যদিও আমার কাম-বাসনা একেবারেই নাই, তথাচ যাহারা শিরীষ-কুসুমবৎ কোমলাঙ্গী ও নীল-কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ-শালিনী, তাদৃশ সুন্দরী সুরাঙ্গনা ও গন্ধর্ব্বাঙ্গনাদিগের অঙ্গোপরি আমি অবস্থান করিয়াছি; আমার সে অবস্থানে লেশমাত্রও কুভাব সঞ্চার হয় নাই। যে সকল সরোবরের মধ্যে মধ্যে কুমুদ, কহ্লার ও কমলাদি জলজ কুসুমকুল প্রস্ফুটিত আছে, আমি সেই সেই সরোবরে গিয়া কলহংসের সহিত কতই না কলরব করিয়াছি। আমি ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছি। তদবস্থায় নদীনিচয়কে শিরার ন্যায়, জীবনিবহকে রোমরাজির ন্যায়, এবং পর্ব্বতবৃন্দকে অস্থিপুঞ্জের ন্যায় নিজাঙ্গে ধারণ করিয়াছি। জগতের যাবতীয় পর্ব্বত, নদীরূপ দীর্ঘ সূত্র এবং সমুদ্র, এই সকল আমার অঙ্গে প্রতিবিম্বময় দর্পণবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। যে সকল সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি সচেতন প্রাণী অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার দেহে সে কালে মশকাদি-বৎ অবস্থান করিয়াছেন। সূর্য্যাদি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, হরিত ও রক্তবর্ণাকার পদার্থপরম্পরা আমারই অনুগ্রহে সে কালে অবস্থান করিয়াছে। সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সাগর আমারই প্রকোষ্ঠে বলয়বৎ বিভাত হইয়াছে। আমি অলক্ষ্যে থাকিয়া বিদ্যাধরবনিতাদিগের অঙ্গযষ্টি স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের আনন্দজন্য রোমাঞ্চ প্রকটিত করিয়া দিয়াছি। নদীনিচয় যাহাদের শিরাস্থানীয় এবং জলরাশিরূপ মজ্জায় যাহারা অন্বিত, তথাবিধ সচ্ছিদ্র জগৎ-পরম্পরা মদীয় দেহের অস্থিরূপে প্রকট হইয়াছিল। উড়ুম্বরের অভ্যন্তরে যেমন মশককুলের বাস, তেমনি গগনবিহারী অগণিত ঐরাবতাদিগজ মদীয় হৃদয়ে অবস্থান করিয়াছে।

রামচন্দ্র! আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত হইলে সমগ্র পাতাল আমার পদতল হইয়াছিল। ঐরূপে ভূতল আমার উদর এবং আকাশ আমার মস্তক হইয়াছিল। আমি সকল দিকে সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্য করিয়াছি, তথাচ অসর্ব্বরূপেই রহিয়াছি। কিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎ, সাকার, নিরাকার, জড় ও চেতন ইত্যাদি সকল ভাবই আমার উপলব্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে সাগরে মৈনাক মগ্ন হইয়াছিল, তাহার ন্যায় অন্যান্য পর্ব্বত সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট

হইলে সাগরের পর্ব্বতাবিষ্ট সেই সেই স্থান যেমন এক একটা জগতের ন্যায় অনুভবলভ্য হয়, আমিও তেমনি বহু সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দর্পণ যেমন নিজোদরে নানা প্রতিবিম্ব নগর ধারণ করে, তেমনি আমিও আমার দেহে ব্যক্তাব্যক্ত বহু জগৎ ধারণ করিয়াছি। চৈতন্য যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা বস্তু উদ্ভাবন করে, আমিও তেমনি আকাশাকারে অবস্থিত হইয়াও আপনাতে মায়াবশে জল, অনল, অনিল ও ভূমির সৃষ্টি করিয়াছি। সে কালে আকাশোদরে প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে আমি অগণিত জগৎ দেখিয়াছি। স্বপ্নাবলোকিত পুরীর অভ্যন্তরে যেমন পুনরায় স্বপ্ন দেখা যায়, সেই স্বপ্নের অন্তরালেও যেমন আবার স্বপ্ন অবলোকিত হয়, তেমনি পরমাণুর উদরে যে জগৎ দেখিয়াছিলাম, সেই সৃষ্ট জগতের অভ্যন্তরগত পরমাণুগর্ভেও পুনরায় অন্য জগৎ দেখিতে লাগিলাম। আমি নিজেই দ্বীপাদিমণ্ডিত ভূমণ্ডল হইয়াছিলাম, অথচ সর্ব্বময়ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করি নাই। এ সকলই আমার একাংশে সম্পন্ন হইয়াছিল। আমি পুরাদি বিবিধ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছি, তৃণ-লতাদির অঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়াছি এবং ভূমিতল হইতে রসাকর্ষণ করিয়া লইয়াছি। যাহাতে নিখিল দ্বৈতভাবের সংহার হইয়া যায়, সেই জ্ঞানকাল প্রাপ্ত হইয়া যখন আমি বিশুদ্ধ হই, তখন আমাতে ঐ লক্ষ লক্ষ জগতের একটীও থাকে না; কাজেই জ্ঞানদশায় শুদ্ধ হওয়ায় ঐ সমুদায়ের একটীও আমার ছিল না। চিদভ্যন্তরে যে সমস্ত আত্মচমৎকৃতি থাকে,—থাকিয়া স্বতই স্বীয় সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপ চমৎকারভাব জগতে আরোপণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া দেয়, এই সৃষ্টিরূপে তাহারই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। এই যে এত কষ্টানুভব, ইহার মধ্যে পরমার্থ-চমৎকার বৈ আর কিছুই নাই। আত্মাই অধ্যারোপক্রমে বিশ্বরূপ ও সর্ব্বকর্ত্তা, আর তিনিই অপবাদক্রমে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। ফল কথা, যাহা কিছু স্ফুরিত হইতেছে, দেখা যাইতেছে, সমস্তই ব্রহ্মময়; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। যিনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহার নিকট সর্ব্বময় আত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বাব্যাপক। যাহারা অপ্রবুদ্ধ, তাহাদের নিকট সেই আত্মা যে কি, তাহা আমার সম্পূর্ণই অবিদিত। চিদাত্মা আকাশোদরের ন্যায় স্বচ্ছ; তাঁহাতে যে এই সৃষ্টিপরম্পরা প্রতিভাত

হইতেছে, ইহা তাপান্তর্গত উষ্মার ন্যায় অস্বতন্ত্র বলিয়াই জানিবে। ইহাতে পার্থক্য কিছুই নাই, কেবল একমাত্র অনন্ত সৎই ইহাতে বিদ্যমান।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ঐ প্রকার ভাবনার উৎকর্ষে জগৎ দর্শন করিবার পর আমি উল্লিখিত কৌতুক দর্শন ব্যাপার হইতে বিরত হইলাম এবং সেই যে মদীয় প্রাক্তন সমাধিস্থান,—সেই আকাশোদরবর্ত্তী কুটীর-দেশ, আমি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—সেই কুটীরের কুত্রাপি আমার স্বীয় কলেবর নাই। সেখানে অপর এক সিদ্ধ পুরুষ আছেন, তিনি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়া সমাধিমগ্ন অবস্থায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ বীরাসনে সমাসীন; সমাধিবশে তদীয় অবিচল শান্তভাব দেদীপ্যমান। দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন অচিরোদিত বাল বিভাকর অথবা যেন দগ্ধেন্ধন হুতাশন। তাঁহার তাদৃশ অবস্থানে উগ্রতা নাই; তিনি নিশ্চলভাবেই বিরাজমান। তিনি বীরাসনে বিরাজ করিতেছেন; তদীয় অণ্ডকোষ পাদগুল্‌ফদ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। তাঁহার স্কন্ধযুগল বিশাল, উহা সে কালে কিঞ্চিৎ আনমিত হইয়াছে এবং গ্রীবাদেশ সরলভাবে রহিলেও তাহা শঙ্খবৎ বন্ধুরভাবে পরিণত হইয়াছে। যাহা পরমোদার পরম পদার্থ, তাঁহাতেই তাঁহার মন সংলগ্ন রহিয়াছে। উহা বাহ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। তদীয় বদনমণ্ডল প্রসন্ন সৌম্য, মস্তক উন্নত, আর পাণিদ্বয় নাভিসন্নিধানে উত্তানভাবে বিরাজিত। তাঁহার তথাবিধ পাণিযুগ্ম হইতে কান্তিচ্ছটা প্রসারিত হইতেছে; বোধ হয়, যেন হৃৎপঙ্কজ হইতেই তেজোনির্গম হইতেছে। চক্ষুর পক্ষ্ম সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; নয়নযুগ্ম অর্দ্ধ নিমীলিত; কাজেই তাহার বাহ্য বস্তুর দর্শনশক্তি সম্পূর্ণই বিলুপ্ত। সে অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, রাত্রি-

কালে সরোজনেত্র নিমীলিত,—যেন একটা নিবাত নিষ্কম্প সুপ্ত সরোবর বিরাজিত। তাঁহার অন্তরে কোন চঞ্চলতা নাই; তিনি উৎপাত-বিরহিত আকাশবৎ প্রশান্ত অন্তরাত্মাকে ধীরভাবে স্থির রাখিয়াছেন। আমি নিজের দেহ দেখিলাম না; পরন্তু এই প্রকার মুনিবরকে দেখিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম,—পূর্ব্বে বিচারপূর্ব্বক বিশ্রামলাভার্থ আমি তপস্যা করিয়াছিলাম। দেখিতেছি, এখানেও কোন সিদ্ধ পুরুষ আমারই ন্যায় তপঃসাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই তাপস ভাবিয়াছিলেন যে, আমি সমাধিযোগ্য স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হইব কি? এইরূপ সত্যভাবনাবলেই এই স্থান ইহাঁর লব্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, তদনন্তর আমি যখন ভাবিলাম যে,আমার এই সৃষ্টি কিছুই নয়,—সম্পূর্ণই মিথ্যা; তখনই আমার সেই সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। সঙ্কল্পক্ষয়ে সেই মহাসিদ্ধ স্থান কোথায় অন্তর্হিত হইল! সে কালে রহিল কেবল মাত্র আকাশ—আকাশ! যখন স্বপ্ন-সঙ্কল্পের অপগম হয়, তখন যেমন সঙ্কল্প-কল্পিত নগরও নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি সেই মহাসিদ্ধ-স্থান নষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য সমাধিমগ্ন সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় নিম্নাভিমুখে পতিত হইলেন। বোধ হইল,—মেঘ যেন আকাশ হইতে নিম্নে নিপতিত হইল অথবা প্রলয়ে যেন সুধাংশুমণ্ডল স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। যেন নষ্টপুণ্য বৈমানিক, যেন ছিন্ন-মূল পাদপ অথবা যেন আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় সেই তাপস ব্রাহ্মণ ভূপতিত হইতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি, এই কুটীরও সেই কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকুক, এই প্রকার সত্য-কল্পনা যেমন আমার শান্ত হইয়া গেল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কুটীর ক্ষয় হইল আর সেই তাপসেরও অধঃপতন ঘটিল। তৎপরে আমি সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিবার জন্য আতিবাহিক দেহে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলাম। প্রবহাখ্য বায়ু-যানের মধ্যগত জল যেমন আবর্ত্তবৎ ঘূর্ণমান হইতে থাকে, তেমনি সেই ব্রাহ্মণ ঘুরিতে ঘুরিতে সে কালে সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সাগরের অপর পারস্থিত কোন এক দেবক্রীড়াস্থানে গিয়া পতিত হইলেন। তদীয় প্রাণ ও অপান পবন সেকালে ঊর্দ্ধগামী ছিল; তাই আকাশ হইতে পতনকালে তিনি

বদ্ধপদ্মাসনেই পতিত হইলেন। তাঁহার তথাবিধ বিক্ষোভ প্রাপ্তি হইল, অথচ তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন না; অচেতন প্রস্তরখণ্ডবৎ অবিচল, তুলাবৎ লঘু, অপিচ পাষাণবৎ ভারবান্ হইয়া রহিলেন। আমি তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম এবং তথাবিধ সত্যসঙ্কল্প প্রভাবে আকাশের মেঘ হইয়া বারিবর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলাম। আমি সেইরূপ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত করিলে সেই পতিত মুনি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে হইল, ময়ূর যেন বর্ষায় জাগিয়া উঠিল। তাঁহার অঙ্গশ্রী উৎফুল্ল হইল, তিনি নয়ন উন্মীলিত করিলেন। সেই জলধারাপ্লুত মুনি বর্ষাকালীন কমলাকরবৎ প্রতীত হইতে লাগিলেন। তদীয় আত্মসাক্ষাৎকরী মনোবৃত্তি শান্ত হইয়া গেল। আমি সেই পরমার্থ-বিচ্যুত প্রবুদ্ধ মুনিকে সরলভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—মুনিবর! আপনি কোথায় আছেন? কি করিতেছেন? কে আপনি? এই যে অতি দূর হইতে আপনি পড়িলেন, এই পতন আপনার বোধগম্য হইল না কেন? আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মুনিবর আমার দিকে তাকাইয়া স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন,—মহাশয়! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন। আমি অগ্রে পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত স্মরণ করি; পরে সমস্ত বিষয় যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলি।

সেই মুনিবর এই কথা কহিয়া চিন্তা করিলে দিনান্তে দৈনিক ঘটনা স্মরণের ন্যায় সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্তই জানিলেন,—জানিয়া সুধাকরকরবৎ শীতল আহ্লাদকর শুভ বাক্যে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি অধুনা আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনাকে আমার নমস্কার। প্রথম দর্শনমাত্রেই আপনাকে যে আমি নমস্কার করি নাই, তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করুন। ক্ষমাই তো আপনার স্বাভাবিক গুণ। মুনিবর! মধুকর যেমন মধুলোভে কমলে কমলে ভ্রমণ করে, আমিও তেমনি ভোগসুখলালসায় মোহগ্রস্ত হইয়া কত দিন কত দেবোদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তদনন্তর যখন বুঝিতে পারিলাম, এই দৃশ্যনদীর নিকটে নিকটে সোৎসুকে সন্তরণ করিতে করিতে ক্রমে আমি প্রবল তরঙ্গতাড়নায় অগাধ আবর্ত্তে গিয়া পড়িলাম; তখন আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম। ভাবিলাম,—আমার আর

উদ্বেগ করিয়া কি হইবে? আমি কেবল চিদাকাশেই অবস্থিত হই; তাহা হইলে আর কিছুমাত্র উদ্বেগাশঙ্কাই থাকিবে না। এই যে দৃশ্য-প্রপঞ্চ—ইহাতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ এই সকলই আছে; এতৎসমুদায় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই তুচ্ছ রূপ-রসাদিতে মগ্ন হইয়া থাকি কেন? এই সকলই তো সেই একাদ্বয় চিদাকাশ বা চৈতন্য মাত্র। সুতরাং মূঢ়ের ন্যায় এই অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চে কেন বৃথা আসক্ত হইয়া থাকি? শব্দস্পর্শাদি বিষয়পরম্পরা বিষবৎ ভয়াবহ; রমণীরা কেবল কাম-মোহেরই উৎপাদনকর্ত্রী; যাহারা রমণীজনে একান্তই অনুরক্ত, তাদৃশ পুরুষদিগকেও উহারা কখন কখন বিরক্ত করিয়া তুলে। যাহার বুদ্ধি নিতান্তই মন্দ, সে না হইলে কে আর এই বিষয়প্রভৃতি অসার বস্তুতে মজিয়া থাকিবে? জরা যেন এক বৃদ্ধ বকী; সে এই জীবন-জম্বাল-মধ্যে বুদ্ধিরূপিণী শফরীকে আয়ত্ত করিবার জন্য শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সে শরীর ক্ষণবিনশ্বর; সাগরের জলবুদ্বুদাবলীর ন্যায় দেখিতে না দেখিতেই চক্ষুর অগোচর হইয়া যায়; দীপশিখার ন্যায় অচিরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। হায় রে! এই উত্তপ্ত জীবিত-নদী একান্তই ভয়াবহ। এ নদীর কত তরঙ্গ, কত আবর্ত্ত! জনন-মরণ উহার উভয় পার্শ্বগত তটভূমি, সুখ দুঃখ তরঙ্গশ্রেণী, যৌবন-বিলাস পঙ্কসঞ্চয় এবং বার্দ্ধক্য-ধবলিমা ফেনরাজি। কাকতালীয় ন্যায়ে কোন কোন সময়ে সুখ এ নদীর বুদ্বুদবৎ প্রতিভাত হয়। লৌকিক ব্যবহারপরম্পরা উহার খরতর স্রোতের ন্যায় প্রকাশমান। অজ্ঞ লোকেরা যে সকল প্রলাপ-বাক্য প্রয়োগ করে, সেই সমস্তই উহার জল-কলকল-ধ্বনি। রাগ-দ্বেষরূপ মেঘ এ নদীর সলিল শোষণ করে। লোভ-মোহ উহার ভীষণ আবর্ত্ত বিবর্ত্ত। দূর-দর্শনে এ নদীকে শীতল বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে উহা অতীব উত্তপ্ত। আত্মীয় বন্ধু ও ঐশ্বর্য্যাদির সমাগম এই নদীর জল; এ সকল জল একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, দীর্ঘকাল স্থির থাকিতেছে না। কাজেই যে সকল বস্তু আইসে আর যায়, সেই সমুদায় ক্ষণিক পদার্থপরম্পরা দ্বারা আমার কি প্রয়োজন আছে? এখানে যত কিছু নূতন নূতনভাবের আবির্ভাব

হইতেছে, তাহাতেই বা আস্থা স্থাপন করা যাইবে কিরূপে? কেন না, তাহারও তো স্থায়িত্ব নাই, ক্ষণপরেই তাহা কোথায়, কোন্ অজ্ঞাত-দেশে চলিয়া যায়। অপর যে সকল নদী আছে, তাহাদের জল চলিয়া গেলে আবার ফিরিয়া আইসে; কিন্তু দেহনদীর জল একবার গেলে আর ফিরিয়া আইসে না। এই সংসারসাগরে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই কুলাল-চক্রারূঢ় ঘটাদিবৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তমান হইতেছে। ইন্দ্রিয়সকল চতুর চোর, আর বিষয়সমূহ বিষম শত্রু; তাহারা চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে আর বিবেকরূপ সর্ব্বস্বধন হরিয়া লইতেছে। অতএব আর ঘুমাইব না; এখন হইতে জাগিয়া থাকি। ঘুমাইয়া পড়িলে উহারা আমার যথা-সর্ব্বস্বই হরিয়া লইবে। আয়ুঃ ক্ষয় পাইয়া বারবার গলিয়া যাইতেছে; কাল দিনসমূহকে বিনাশ করিতেছে; এই সকল কার্য্য সকলেরই অজ্ঞাত-সারে ঘটিতেছে; কেহই এ রহস্য জানিতে পারিতেছে না। কি বলিব বিস্ময়ের বার্ত্তা! আমার ইহা রহিল, ইহা গেল, এ বস্তু আমারই, এইরূপ ভাবনাবিহ্বলতায় পড়িয়া আয়ুঃক্ষয় হইয়া যাইতেছে; মৃত্যু নিকটস্থ হই-তেছে; ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। আমার বিষয়ভোগ যথেষ্টই করা হইয়াছে, আমি অপার অনন্ত বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। অনেক সুখদুঃখ আমার লক্ষ্যীভূত হইয়াছে। এ সংসারে আমার আর সাধনার বিষয় কিছুই নাই। বারম্বার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছি, এ সংসারে বারম্বার বিবর্ত্তিত হইয়াছি। সংসারের সর্ব্ব বস্তুই আমার জ্ঞানে অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; এখন আমি ভোগোৎকণ্ঠা হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। সংসারে যে কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, তৎসমস্তই আমি ভোগ করিয়াছি। এ সংসারের সকল বস্তুই যে অনিত্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কোথাও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি নাই। আমি উত্তুঙ্গ সুমেরুশৃঙ্গে, নন্দনবনে, লোকপালদিগের নগরে নগরে বিহার করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি কোনই চিরস্থির বস্তু প্রাপ্ত হই নাই। সর্ব্বত্রই দেখিলাম—কাষ্ঠময় বৃক্ষ আছে, মাংসময় জীব আছে, মৃণ্ময়ী পৃথ্বী আছে, আর আছে দুঃখ এবং আর আছে সর্ব্ববস্তুর অনিত্যতা। এই সকল আমি নিজে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে আশ্বস্ত হইয়া

রহিব বলুন দেখি! ধন, মিত্র, পুত্র, সুখ, বান্ধব, কেহই তো নিত্য নহে; কালের করাল গ্রাসগ্রস্ত জীবকে রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম হয় না। ধূলিজালবৎ অস্থির জীব প্রতিক্ষণেই ক্ষীণ ও বিলীন হইয়া যাইতেছে, কাম আমার নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হয় না; উহাকে আমি অতি বিরস বলিয়াই মনে করি। আমি বেশ বুঝি, এই 'জীবন' ও যৌবন যুবতীর অপাঙ্গভঙ্গীর ন্যায় একান্তই চঞ্চল।

মুনিবর! আজই হউক, কালই হউক, ক্রূর কৃতান্ত মদীয় মস্তকে আপদ্‌ভার চাপাইয়া দিবে। সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে না। অতএব কিরূপেই বা আশ্বস্ত হইয়া বসিয়া থাকি? যেমন তরুর জীর্ণ পর্ণ, তেমনি এ জীবন ক্ষণধ্বংসী। এই সকল দেখি শুনি, আর এ বিষয়ে যতই আলোচনা করি, আমার বুদ্ধি অস্থির হইয়া উঠে। মধুরাদি যে ছয়প্রকার রস আছে, তাহা আমার নিকট বিরস বলিয়াই বোধ হয়। আমি এত দিন পর্য্যন্ত বীতরস বিষয়ভোগে কাল কাটাইয়াছি, যাহা অপূর্ব্ব পুরুষার্থ, তাহার সাধনা আমি কিছুই করিতে পারি নাই; সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা বা যত্নও আমার করা হয় নাই। অধুনা আমার মোহ কিঞ্চিৎ অপনীত হইয়াছে, এই দেহের কিম্বা বিষয়ভোগের প্রতি আমার আর অণুমাত্র আস্থা নাই। ইদানীং আমার ধারণা—বিষয়ের প্রতি আস্থা বর্জ্জনই উত্তম ব্যবস্থা। আর এই জীবনে এবং বিষয়ে যে আস্থা স্থাপন, তাহাই অতি নিন্দার্হ মন্দ ব্যবস্থা। মোহজননী বিপদ এই আইসে, এই আসিল, এইরূপ মনে রাখিয়া কদাপি আর সংসারাসক্ত হওয়া উচিত নহে। সম ও বিষম ভূমিতে পড়িলে জল যেমন ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি নিত্য অনিত্য বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা মানবেরা নানাদিকে বৃথাই বিচলিত হইতেছে। বিষয় যেন বিষময় বায়ু; উহা চিত্তরূপ পুষ্প হইতে বিবেকসৌরভ হরিয়া লইয়া তাহাতে মোহগরল ঢালিয়া দিতেছে; এইরূপ বিষপ্রক্রিয়ায় এ জগৎ মূর্চ্ছিত হইতেছে। যেমন কোন আবরণ দ্বারা আবৃত রহিলে সদ্বস্তুও অসতের ন্যায় অনুভূত হয়, তেমনি বিষয় একটা অলীক পদার্থ; উহাকে সৎ বলিয়া বোধ করায়, উহা সৎ হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বাস্তবিকপক্ষে দেখ, তবে দেখিবে, উহা অসৎ বৈ

কখন সৎ নহে। সাগর-বধূ নদীগণ যেমন হেলিয়া দুলিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি মোহমগ্ন জনগণও নানা অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। চিত্ত-বাণ একটীবার নিক্ষিপ্ত হইলেই বিষয়রূপ লক্ষ্যে গিয়া নিপতিত হয়। যেমন কৃতঘ্ন লোক সৌহার্দ্দ স্পর্শ করে না, উপকারী বা অনুপকারী, কাহারও সহিত সদ্ভাব রাখে না, তেমনি চিত্তরূপ বাণ একবার বিষয়-লক্ষ্যে পড়িলে আর কখনই গুণস্পর্শ করে না। ফল কথা, বাণ একবার ধনুর্ম্মুক্ত হইলে পুনরায় আর মৌর্ব্বীতে আসিয়া যুক্ত হয় না; অন্য দিকে চিত্ত বিষয়াসক্ত হইয়া রহিলে বিবেক-বৈরাগ্যাদি গুণ তাহাতে আর আশ্রয় লয় না। আমার মনে হয়, উৎপাতবায়ুর ন্যায় আয়ু বড়ই ক্লেশজনক। জীবনে সুখ কিছুই নাই। পূর্ব্বে জানিতাম—যাহারা মিত্র; এখন জানিলাম—তাহারাই শত্রু। বন্ধু-গণ কেবল বন্ধনস্বরূপ। উহাদের মায়াকর্ষণে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। অর্থে স্বার্থ কিছুই নাই; উহা কেবলই অনর্থের মূল। পূর্ব্বে যাহাকে সুখবোধে সমাদর করিয়াছিলাম, তাহা তো সুখ নহে; তাহাই বিষম দুঃখ-ময়। বিষয়ভোগ সংসারের একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। এই ব্যাধি একবার যাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। বিষয়ে যে রতি, তাহাই বিষম অরতি। স্পন্দ মাত্রেই বিপদ্‌স্বরূপ; সুখ তো দুঃখেরই মূল; আর যাহা জীবন, তাহা মরণেই পর্য্যবসিত। অহো! কি অপূর্ব্ব মায়াবিকাশ! কালপরিবৃত্তি, ইষ্টানিষ্ট, সুখ-দুঃখ, প্রিয়জন-বিচ্ছেদ, ক্লেশপরিণতি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, নিজে অনুভব করিয়া, লোকসকল দিন দিন জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমার মতে বিষয়ভোগ সাক্ষাৎ বিষপূর্ণ বিষধর; কেন না, উহাকে স্পর্শ করিবামাত্রেই উহা স্পর্শ-কারীকে দংশন করে; যদি দেখিতে যাও, তবেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। পরম পদ লাভ অশেষ আয়াসসাধ্য নহে; তথাচ লোকে সে জন্য চেষ্টা না করিয়া পরিণাম-বিরস দারুণ কষ্ট-চেষ্টাতেই আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। না খাইতে দিয়া কৃশ করিয়া বন্য হস্তীকে যেমন বন্ধনগ্রস্ত করা হয়, তেমনি ভোগাশাবদ্ধ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণকেও পদে পদে অপমানপ্রাপ্ত হইতে হয়। সম্পত্তি এবং যুবতী উভয়ই তরঙ্গশ্রেণীবৎ ক্ষণবিনশ্বর। এমন বিজ্ঞ কে

আছেন ?—যিনি সেই ফণি-ফণাচ্ছায়ার ন্যায় আপাত শীতচ্ছায় সম্পদাদিতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবেন ? কাম এবং ঐশ্বর্য্য এই দুইটা জিনিষ যদি সত্য সত্যই রম্য হয়, তথাচ তাহাতে আসক্ত হওয়া অবিধেয় ; কেন না, কয় দিন বা জীবন, আর কয়দিনই বা তাহা ভোগ করা যাইবে ? জীবন তো যৌবন-মদমত্তা যুবতীর কটাক্ষপাতবৎ ক্ষণস্থির। বিষয় সকল আপাত-রম্য ; ইহাতে যাহারা মজিয়া থাকে, তাহাদের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ ; তাহারা ঘোর নরকমধ্যেই অবশেষে বাস করিতে থাকে। যাহারা অভব্য, অর্থ তাহাদিগেরই সেব্য। আমি উহাকে কোনক্রমেই সন্তোষকর বলিয়া নির্দ্দেশ করি না। কেন না, প্রথমে দেখ, ঐ অর্থ সংগ্রহ করিতে কতই না শীতাতপাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তার পর যদিই বা উহা কষ্টে-কৃচ্ছ্রে সংগৃহীত হয়, তথাচ দীর্ঘ দিন উহা থাকে না ; অবিলম্বেই নষ্ট হইয়া যায়। অর্থ বাস্তবিকই কোথাও স্থির থাকে না ;—থাকিতে পারে না। লক্ষ্মী ক্ষণভঙ্গুরা ; আপাতত তাহাকে মধুর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটুকু পরেই উহা আবার অসহ্য দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। উহাতে আপাতমাত্রেই লোকদিগকে কেমন একটা মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে মাত্র। যেমন অসাধু জনের সংসর্গ, তেমনি অর্থ আপাতমাত্রেই মাধুর্য্যময় ; কিন্তু উহাতে অবশেষে বিষম বিপাকেই পাতিত করে। বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহা অতি জঘন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। যৌবনের কথা বলিব ! সে তো শরৎকালের মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর। যে সকল ভোগ্য বিষয়, সে সমুদায় তো আপাতমাত্রেই মধুর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহার পরিণাম বড়ই দুঃখদায়ক। এ সংসারে এমন মহাত্মা কে আছেন ? যিনি কৃতান্তের হস্তে নিগৃহীত হন না ; ফলতঃ কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, সকলকেই কৃতান্ত-কবলে পতিত হইতে হয়। বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ-গত জলবিন্দুর ন্যায় দেহীদিগের আয়ু নিতান্তই অল্পক্ষণস্থায়ী। জীব বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলে তাহার কেশ-দন্ত ইত্যাদি সকলই জীর্ণ হইয়া যায় ; কিন্তু তাহার তৃষ্ণা তখনও জীর্ণ হয় না ; সে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। এই সমগ্র দেহ-কাননে তখন একমাত্র তৃষ্ণারূপিণী বিষয়মঞ্জরীই অহরহ উপচিত হয়। শৈশব ও যৌবন উভয়ই উভয়ের

ন্যায় চলিয়া যায়। ক্ষণবিনশ্বরতা বিষয়ে শৈশব ও যৌবন উভয়ই পরস্পরের উপমাস্থল। অঞ্জলিগত জল যেমন অঙ্গুলিচ্ছিদ্র দিয়া এক একটু করিয়া গলিয়া যায়, তেমনি জীবনও সত্বরই পলায়নপর হয়। নদীর স্রোত যে দিকে যায়, সে দিক্ হইতে তাহাকে যেমন ফিরান যায় না, তেমনি জীবনও চলিয়া যাইতে থাকিলে আর তাহাকে ফিরাইয়া আনা সম্ভবে না। হঠাৎ বাতাসের ন্যায় দেহ আসিয়া কোথা হইতে উপস্থিত হয়, কিন্তু তরঙ্গ, মেঘ ও প্রদীপের ন্যায় অচিরেই আবার দেখিতে দেখিতে বিলয় পাইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহাকে রম্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাতেই আবার অরম্য ভাব উপলব্ধি করিয়াছি। বুঝিয়াছি,—যাহা স্থির, তাহাও পরে অস্থির বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাতেই আবার অসত্য ভাব আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি এ সংসারের সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছি। মন যখন সত্ত্বভাবে উপনীত হয়, তখন আত্মবিশ্রান্তিতে এক চমৎকার সুখোদয় হইয়া থাকে। সে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, তাহা স্বর্গ-মর্ত্ত্যগত কোন ভোগ্য-পদার্থেই নাই। চিত্রার্পিত লতা যতই কুসুমিত হউক, সে যেমন ভৃঙ্গাকর্ষণে সমর্থ হয় না, তেমনি নিখিল বিষয়ভোগকর্ত্তা পঞ্চেন্দ্রিয়—হউক না একত্র মিলিত, তথাচ আমাকে আর বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই দীর্ঘ কাল কাটিয়া গিয়াছে, পরে অদ্য আমি নিরহঙ্কার হইয়াছি। স্বর্গ বা মুক্তি, এতদুভয়ের কোন একটী লাভেই আমার ইচ্ছা নাই। আমি একান্তে চির বিশ্রাম করিব, এই অভিপ্রায়ে আপনার ন্যায় এই পরমাকাশে আসিয়াছিলাম। আমার আসিবার কালে আমি ভবৎকল্পিত কুটীর দেখিতে পাইয়াছিলাম। যখন ঐ কুটী আমি দেখি, তখন বুঝি নাই যে, উহা ভবৎকল্পিত কুটী বা আপনি সে কুটীতে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, অদ্য আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকী নাই; আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। সে কালে আমার একবার অনুমান হইয়াছিল বটে যে, হয় তো কোন সিদ্ধ পুরুষ সেই কুটীরে ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন;—করিয়া নির্ব্বাণ পাইয়াছেন। প্রভো! এই তো আমার বৃত্তান্ত; আমি এইস্থানেই রহিলাম; অধুনা আপনার যাহা কর্ত্তব্য থাকে, করুন।

মুনিবর! আমরা তো অতি সামান্য ব্যক্তি; ভবাদৃশ সিদ্ধ পুরুষেরাও সাবধানে বিচারালোচনা না করিয়া ত্রৈকালিক কোন ঘটনারই আমূল বৃত্তান্ত জানিতে পারেন না। অধিক কি, যিনি সাক্ষাৎ অব্জযোনি ব্রহ্মা, তাঁহার ন্যায় প্রধান প্রধান দেবগণও ধ্যানদৃষ্টিযোগে পর্য্যালোচনা না করিয়া আপাতত কোন বিশেষ ঘটনাই অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তাই বলিতেছি,—ভগবন্! আপনাকে সর্ব্বাগ্রে জানিতে না পারিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, সে অপরাধ আমার ক্ষমা করুন।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যেখানে সেই সিদ্ধ পুরুষ তখন সমাসীন হইয়া আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, ঐ স্থান আকাশবৎ বিস্তীর্ণ এবং সপ্ত-সাগর-পরিবৃত সপ্ত দ্বীপের বহির্ভাগে বিরাজিত; অথচ উহার সর্ব্বত্রই সুবর্ণ পরিব্যাপ্ত। আমি সেই স্থানে থাকিয়া সেই সিদ্ধ পুরুষকে তখন বন্ধুভাবে মধুরবাক্যে বলিলাম,—হে মহাতাপস! তৎকালে কেবল যে আপনিই বিচার করিয়া দেখেন নাই, এরূপ নহে; আমিও বিচারনেত্রে বিলোকন করি নাই। এ কথা সত্যই যে, যে কোন বিষয়ই হউক, বিশেষরূপে প্রণিধান না করিয়া কোন লোকই ভূত ও ভাবী বিবরণ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় না। বস্তুতঃ তাৎকালিক ব্যাপারে আমিও আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি। কেন না, আমি যদি সে কালে জানিয়া লইতাম যে, আপনি মৎসঙ্কল্পিত স্থানে আসিয়া তপস্যা করিতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সে স্থান হইতে পতন ঘটিত না। সেই কুটী আমার কল্পিত হইলেও আমি সত্য সঙ্কল্পবলে তাহা স্থির করিয়া রাখিতাম। এ ভাবে কিছুতেই নষ্ট করিতাম না বা নষ্ট হইতে দিতাম না। সেরূপ হইলে আপনিও সেখানে স্বচ্ছন্দে স্থির থাকিয়া তপস্যা করিতে

পারিতেন। যাহা হউক, যা হইয়াছে—হইয়াছে; এক্ষণে উঠুন, আসুন—আমরা উভয়ে সিদ্ধলোকে গমন করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। স্বস্থানে থাকাই ইষ্টসিদ্ধির প্রধান অবলম্বন।

আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষেপণীযন্ত্র হইতে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডবৎ নক্ষত্রবেগে যুগপৎ তথা হইতে আকাশপথে প্রধাবিত হইলাম। অনন্তর আমরা উভয়ে উভয়কে প্রণামান্তে পরস্পর বিদায় লইলাম। সেই সিদ্ধ পুরুষ স্বীয় গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন আর আমিও আমার অভিমত স্থানে প্রয়াণ করিলাম।

রঘুবর! এই আমি তোমার নিকট পাষাণোপাখ্যান ও সিদ্ধপুরুষের বিবরণ সকলই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অবধারণ করিয়া এ সংসারের যে কি অপূর্ব্ব ঘটনাবৈচিত্র্য, তাহা তুমি একবার অন্তরে অবলোকন করিয়া দেখ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার সেই সঙ্কল্পিত পুরী; তাহা তো তখন পৃথিবীতে বিলয় পাইল—পরমাণু হইয়া গেল। আপনার দেহের দশাও তাহাই ঘটিল। অথচ পরে আপনি সিদ্ধলোকে ভ্রমণ করিলেন! এই ভ্রমণ আপনার কোন্ দেহে ঘটিয়াছিল বলুন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শুন রাম! এখন তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। আমি তখন সিদ্ধলোকে লোকপালগণের পুরীতে বিচরণ করিয়াছিলাম। তদবস্থায় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। সেই যে সিদ্ধলোকে গেলাম, তাহার পর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমি ইন্দ্রালয়ে যাই। ঐ সময় আমার ভৌতিক দেহের সদ্ভাব ছিল না, আমি আতিবাহিক দেহেই বিরাজ করিতেছিলাম; সেইজন্য তত্রত্য কোন ব্যক্তিই আমায় দেখিতে পারে নাই। আমি সে কালে আধার নহি, বা আধেয় নহি; মাত্র চিদাকাশাকারেই অবস্থিত ছিলাম। তখন আমি কোন কিছুরই গ্রাহক বা তোমাদের ন্যায় লোকের গ্রাহ্য ছিলাম না। বৎস! তখন আকাশই আমার আকার ছিল। কোথাও কোন দেশ কালের সহিত আমি সম্বন্ধসম্পন্ন ছিলাম না। কেবল মনঃসঙ্কল্পরূপেই আমার অবস্থিতি ছিল। তৎকালে ক্ষিতিপ্রভৃতি ভাব আমাতে কিছুই ছিল না।

আমি একটা সঙ্কল্পময় পুরুষ হইয়াছিলাম। তখন কোন কিছুই আমি স্পর্শ করি নাই; কাজেই কাহারও আমি বোধক হই নাই। কোন প্রকার পদার্থপরম্পরায় যে আবদ্ধ হওয়া, তাহাও আমি হই নাই। যেমন স্বপ্নাবস্থার মন, তেমনি আমি কেবল স্বানুভব দ্বারাই ব্যবহারনিষ্ঠ ছিলাম।

রামচন্দ্র! এ বিষয়ের চরম দৃষ্টান্তস্থলে স্বপ্ন-কালীন অনুভবই উল্লেখযোগ্য। তাদৃশ দৃষ্টান্তযোগেই উহার স্পষ্টোপলব্ধি হয়। অধিক বুঝান বাহুল্য মাত্র। তবে কথা এই, যাহারা স্বপ্নকালীন অনুভবের অপলাপ করে, সে অনুভব অঙ্গীকার করিতে চাহে না, তাহাদের কথা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, তাহারা নিতান্তই অজ্ঞতাপূর্ণ। যাহা হউক, যেমন মানুষ গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত থাকে; নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে সে নানাস্থানে বিচরণ করে; তেমনি আমিও সে কালে স্বর্গবাসীদিগের নিকট-নিকট দিয়া যাতায়াত করিলেও তাঁহারা কেহই আমায় দেখিতে পান নাই। আমি কিন্তু সে কালে অন্যান্য সকলকেই স্থূল পার্থিব-দেহশালী দেখিলাম। আমার তখন আতিবাহিক দেহ ছিল; তাই আমায় কেহই দেখিতে পাইল না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—আপনি বিদেহ—আকাশদেহ ছিলেন বলিয়া কেহই যদি আপনাকে দেখিতে না পাইল, তবে সেই স্বর্ণময় প্রদেশস্থ সিদ্ধপুরুষ আপনাকে দেখিতে পাইলেন কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমাদের ন্যায় যোগী পুরুষেরা সত্য-সঙ্কল্পবলে না করিতে পারেন, এমন কার্য্য নাই। যাহা অদৃশ্য, তাহাও দৃশ্য করিতে পারেন; এরূপ করায় অবশ্য সঙ্কল্প চাই; নহিলে কিছুই করিতে পারেন না। অমলচেতা যোগী যদি লৌকিক ব্যবহারে নিমগ্ন হন, তাহা হইলে ক্ষণমধ্যেই তিনি স্বীয় আতিবাহিক দেহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন। আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি আমাকে দর্শন করুক; তাহারই জন্য সেই সিদ্ধ আমায় দেখিয়াছিল। যিনি ভেদ-জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণই বর্জ্জিত, তাঁহারই সঙ্কল্প সত্য হইয়া থাকে। যাঁহার ভেদজ্ঞান আছে ও ক্রমেই তাহা দৃঢ় হইয়াছে, তিনিই সঙ্কল্পবলে কিছুই

করিয়া উঠিতে পারেন না। তবে যদি এমন কখন ঘটে যে, একজন সিদ্ধ-পুরুষ সম্মুখস্থ অন্য এক সিদ্ধ যোগীকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি ইঁহাকে দর্শন করিব; কিন্তু অপর যোগীর সঙ্কল্প এই যে, ইনি যেন আমায় দেখিতে না পান। এইরূপ বিরোধস্থলে উল্লিখিত সঙ্কল্পকারী উভয় সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে যিনি স্বভাবতঃ সমধিক বিশুদ্ধ, তিনিই সত্যসঙ্কল্প হইবেন; অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্পই সিদ্ধ হইবে। সে কালে আমি সিদ্ধ সৈনিকদিগের মধ্যে গিয়াছিলাম, লোকপালদিগের আলয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ ব্যবহারে জড়িত হইয়াছিলাম; তাই নিজের যে সেই আতিবাহিক ভাব, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি সে কালে সেই মহাকাশে নিজের ইচ্ছামত অন্যের সঙ্গে যে কোন সময়ে ব্যবহারপরায়ণ হইয়াছিলাম; কিন্তু আমায় কেহই সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ইচ্ছা হইলেই দেখিতে পায় নাই। বৎস! সুপ্ত পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় যত বড় চিৎকারই করুক, তাহার সেই চিৎকার যেমন কেহই শুনিতে পায় না, তেমনি আমিও সে কালে সেই সুরলোকে চিৎকার করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই সেই চিৎকার-শব্দ আমার শুনিতে পাইল না। দেখিলাম,—সে সময় কে একজন পড়িয়া যাইতেছে; দেখিয়া তাহাকে আমি ধরিতে গিয়াও ধরিলাম না; কেন না, ধারণ করিবার উপযোগী হস্তাদি তো আমার তখন ছিল না; আমি কেবল মনের সঙ্কল্পরূপেই তৎকালে অবস্থান করিতেছিলাম। অধিক কহিব কি, আমি যেন তখন সেই দেবপুরীর এক পিশাচ হইয়াই পড়িলাম। ফলে পিশাচেরা অদৃশ্যরূপে থাকে, তাহাদের কি কার্য্য, কেমন তাহাদের আকার, এ সকল যেমন কাহারও লক্ষ্যীভূত হয় না, তেমনি আমিও অবিকল তদবস্থই হইলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—আপনার বর্ণিত দেবলোক কি প্রকার? আর পিশাচের আকৃতি, জাতি ও আচারানুষ্ঠানই বা কিরূপ? ঐ পিশাচেরা কোথায় অবস্থান করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কথাপ্রসঙ্গে যখন পিশাচের কথা উঠিয়াছে, তখন তাহা তোমায় অবশ্যই বলা যাইতেছে। তুমি দেবলোকস্থ পিশাচের কথা শ্রবণ কর। তত্রত্য একশ্রেণীর পিশাচ আকাশের ন্যায়; আবার

পিশাচভেদে কাহারও কাহারও দেহ অতীব সূক্ষ্ম মনোময়; সেই সকল পিশাচ স্বপ্নবৎ মনঃকল্পনায় কর-চরণাদি-বিশিষ্ট হইয়া তোমার ন্যায় আকার দর্শন করে। ঐ শ্রেণীর পিশাচেরা মানবদেহে ভীষণ প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চিত্ত আক্রমণপূর্ব্বক দুঃখক্রমক বাসনার উন্মেষণ করিয়া দেয়। যাহারা অল্পসত্ত্ববলশালী, তথাবিধ নিকৃষ্ট মানবদিগকেই ঐ সকল পিশাচে বিনাশ করিয়া থাকে। উহারাই তাহাদের রক্ত-মাংস ভোজন করে এবং তাহাদিগকে ক্ষীণবল করিয়া তুলে। এইরূপে ঐ পিশাচদল চিত্ত আক্রমণ করিয়াই জীবহিংসা সম্পাদন করে; ঐ পিশাচ-সমূহের মধ্যে কেহ কেহ আকাশবৎ, কেহ কেহ নীহারনিভ এবং কেহ কেহ বা স্বপ্ন মানবপ্রায়। উহারা কল্পনাবলে আকার ধারণ করে বটে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে উহারা আকাশস্বরূপ। উহাদের মধ্যে কোন কোন পিশাচ আকারে যেন মেঘখণ্ড; আবার কোন কোন পিশাচদেহ কেবলই বায়ুময়; ঐ পিশাচদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ যাহাকে আক্রমণ করে, তাহারা সেই আক্রান্ত পুরুষের ভ্রান্তিকল্পিত দেহই ধারণ করিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, উক্ত সমস্ত পিশাচই মনোময়। উহাদিগকে ধরিবার সাধ্য নাই, উহারাও কাহাকে ধরিবে, সেরূপ ক্ষমতা নাই। ঐ সকল পিশাচ যদিও আকাশবৎ শূন্যাকৃতি; তথাচ স্বস্ব আকৃতি অনুভব উহারা করিয়া থাকে। বাহ্যিক জলাদি পান, অন্নাদি ভোজন বা আক্রমণ, উহারা করিতে পারে না। ইচ্ছা বল, দ্বেষ বল, ভয় বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, বা মোহ বল, ইত্যাদি সকলই উহাদের আছে। মন্ত্র, ঔষধ, তপস্যা, ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম, এই সকল উহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায়স্বরূপ। যোগ, যন্ত্র বা মন্ত্রগুণে কেহ কেহ উহাদিগকে দেখিতে বা ধরিতেও সক্ষম হইয়া থাকে। ঐ সকল পিশাচ দেবযোনিবিশেষ; তাই উহাদের মধ্যে দেব-ধর্ম্মও লক্ষিত হয়। উহাদের কাহারও কাহারও শ্রী মনুষ্যের ন্যায়; আবার কেহ কেহ সর্প, শৃগাল ও কুকুরের ন্যায়ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রাম, জঙ্গল, জলাশয়, বিষ্ঠাগার পথ বা নরকবৎ অপবিত্র দেশেই উহাদের বাস। রাম! পিশাচকুলের আকার, বাসস্থান এবং আচারব্যবহারের পরিচয় তোমায় বলা হইল। অধুনা উহাদের উৎপত্তি প্রকার বলিতেছি।

অগ্রে মায়াশবল ব্রহ্মের যেরূপে জীব ভাব লাভ এবং মনঃ প্রভৃতি উপাধি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। যাহাঁতে চেত্যভাব নাই, যিনি চিন্ময় সর্ব্বশক্তিমান্ স্বস্বভাবস্থিত ব্রহ্ম, তিনি যখন চেত্য সঙ্কল্প করিয়া পুরুষবৎ জ্ঞানরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে জীব নামে নিরূপণ করা হয়। সেই জীব ক্রমে অভিমান-পুষ্ট হইয়া অহঙ্কার নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই অহঙ্কার যখন ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠে, তখন তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট উহা মন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই মনোরূপ জীবই সমষ্টিরূপে ব্রহ্মা নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মার স্বরূপ সঙ্কল্পাকাশ। এই যে নিরাকার অসত্য মন, ইহাই দৃশ্যমান জগতের বীজস্বরূপ। ফলে মনই ব্রহ্মা; তিনি দেহশালী হইয়াও নির্ম্মল আকাশস্বরূপ এবং তিনি সৎ হইলেও বস্তুগত্যা স্বপ্ন-মানববৎ মিথ্যা, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অপিচ তিনি আতিবাহিক দেহ ধারণ করেন; তাঁহার পার্থিবাদি মূর্ত্তি একেবারেই নাই। বস্তুতঃ যে পুরুষ আকাশে সঙ্কল্পিত, তাহার আবার পার্থিবাদি আকারসম্ভাবনা হইবে কিরূপে? ভবদীয় মন যেমন কল্পনাকাশে নগর নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববর্ণিত মনও তেমনি আপনাতে ব্রহ্মভাব কল্পনা করিয়া দেখে। মন এইরূপে ব্রহ্মা হইয়া স্বকল্পিত বিষয়কে সৎস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে। যাহা জীবনামে নিরূপিত হইল, তাহাতে সত্য চিন্ময় জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান; তাই তাহার দর্শনশক্তি থাকাই তো সম্ভবপর। আকাশে বা ব্রহ্মে ঐ শূন্য নিরাকার মনোরূপী ব্রহ্মা যে ব্রহ্মাণ্ডাকারে শূন্য সন্দর্শন করেন, তাহারই নাম জগৎ। এই জগৎরূপ ধারণা তাঁহার বহু দিবসের সত্যভাবনায় ঘনীভূত ও পরিপুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ স্বপ্নবৎ অতীব শোভন হইয়া উঠে। ব্রহ্মা আতিবাহিক দেহশালী; তাঁহার সেইরূপ দীর্ঘভাবনায় চিন্ময় ব্রহ্মই বহুল সৃষ্টিরূপে অনুভূতি-গোচর হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার সেই আতিবাহিক দেহ যখন দৃঢ় ভাবনায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন উহা ক্রমশঃ আধিভৌতিক ভাব ধারণ করে। এই আধিভৌতিক ভাব ধারণা করিবার ফলে ক্রমশঃ বিবিধরূপে সমুজ্জ্বল জগৎ জগদাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ঐ চৈতন্যরূপী ব্রহ্মা সর্ব্বদাই

অজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থিত আছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্বীয় দেহের দ্রব-কাঠিন্যাদি বিবিধ অংশকে ক্ষিতি, জল, তেজ ইত্যাদি পঞ্চ নাম অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ ভাগপঞ্চক যখন চিৎপরিপুষ্ট হয়, তখনই এই জগৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন তদ্‌গত ভাবে ভাবনা করিতে করিতে অসত্য সঙ্কল্পও তোমার নিকট সময়ে সময়ে সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি ঐ ব্রহ্মাও আত্মসঙ্কল্পকে সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্বয়ং তিনি চিন্ময় আকাশস্বরূপ বলিয়া তদীয় সেই সঙ্কল্পও চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। অতএব সমস্ত জগৎ ও জগতের উৎপত্তি-বিনাশ স্বপ্ন ব্যতীত আর কি? উহাদিগকে তদ্ভিন্ন অন্য আর কোন্ নামে অভিহিত করা যাইবে? তোমার মন ও মনোবৃত্তিগুলি যেমন সত্য, জানিবে—ব্রহ্ম নির্ম্মিত রবি-শশি প্রভৃতির সত্যতাও সেইরূপই। মীমাংসা যখন এইরূপই হইল, তখন জগৎপ্রপঞ্চকে মনোরাজ্য ব্যতীত অন্য আর কোন্ নামে অভিহিত করিব? ঐ মনোরাজ্যও তো চৈতন্যে শূন্য নিরালম্ব আকাশের স্বয়ম্প্রকাশ বৈ আর কিছুই নহে। স্বপ্ন পুরী ও স্বপ্নদৃষ্ট শৈল, এই উভয়ই যেমন আকাশ, তেমনি উল্লিখিত ব্রহ্মকল্পিত জগৎও নিরাকার স্বচ্ছাকাশ বৈ আর কি? যিনি নির্ম্মল চিদাকাশ, তিনিই এই জগৎ-স্বরূপে প্রকট হইতেছেন। ফলে এ জগতের উৎপত্তিই বল, স্থিতিই বল, আর বিনাশই বল, সকলই ভ্রান্তি মাত্র।

হে শুদ্ধদেহ! এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে বুঝা যায়, তুমি, আমি বা জগৎ, কাহারও কিছুই ঐ চিদাকাশে জাত বা নাশ প্রাপ্ত হইতেছে না। তাই বলিতেছি, অনর্থের হেতুভূত বৃথা রাগ দ্বেষ-ভয়াদি তোমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইল কেন? তাহা বল দেখি!

রামচন্দ্র! সৃষ্টির কারণ বাস্তবিকই নাই এবং সৃষ্টি বা সৃষ্টির অভাবও নাই। একমাত্র সদাপ্রকাশময় চিদাকাশই বিদ্যমান এবং সেই আকাশই এইরূপ ভাবে প্রকাশমান। চিদাকাশরূপ ক্ষেত্র অনন্ত চৈতন্য-সলিলে পরিপূর্ণ; উহা যখন অজ্ঞানকল্পনারূপ পঙ্কযোগে পঙ্কিল হইয়া উঠে, তখন তাহাতে আকাশরূপ বীর্য্য হইতেই বিমল ভূতসৃষ্টিরূপ পাষাণনিচয়ের আবির্ভাব হয়। এইরূপ আবির্ভাব হইতেছে, হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও

হইবে। চিদাকাশই সতত একভাবে অবস্থিত। কল্পনারূপ পঙ্ক-পরিব্যাপ্ত উক্ত চিদাকাশক্ষেত্রে যে সকল ভূতরূপ শিলার সমুদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা উজ্জ্বলাভ রত্নস্বরূপ, তাহারাই প্রবুদ্ধমনা দেব ও ঋষিজাতীয়। যাহারা অর্দ্ধোজ্জ্বল, তাহারা নর-নারী ও গজাশ্বাদি-জাতীয়, যাহারা ধূলিময় মলিন, তাহারা কৃমি ও স্থাবরজাতীয়, আর যাহারা দেখিতে বড়, ঔজ্জ্বল্য কিছুই নাই—কেবল শূন্য, জীর্ণ, অর্দ্ধ আকারবিশিষ্ট, অথবা আকারহীন, তাহারাই পিশাচজাতীয়। যিনি সঙ্কল্পকর্ত্তা, তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বাধীন-ভাবে প্রযুক্ত হয় না। সৃষ্ট জীবনিবহের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই উহা প্রসার পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মার ইচ্ছাই সুর, নর ও পিশাচ প্রভৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধমাদি ভেদে সর্ব্ববিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্যথা ইচ্ছামাত্রেই তিনি কেবল উত্তম জীবেরই সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেন। উল্লিখিত নিখিল ভূতই চিদাকাশময় আতিবাহিক দেহে অবস্থিত। উহাতে পৃথিব্যাদি ভাব কিছু মাত্রই নাই। বহুকাল অনুভববশে স্বপ্ন যেমন কখন কখন জাগ্রদবস্থায় উপনীত হয়, তেমনি ঐ যে আতিবাহিক দেহধারী ভূত-বৃন্দ, উহারাও চিরন্তন অভ্যাসবশেই আধিভৌতিক ভাবনা উপগত হইয়া থাকে। উল্লিখিত পিশাচপ্রভৃতি নিকৃষ্ট ভূতজাতি আধিভৌতিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া সসন্তোষ-চিত্তে এ সংসারে বিহার করিয়া থাকে। যাহারা উত্তম জীব বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদের নিকট ঐ সকল অধম ভূতজাতির অবস্থা ক্লেশকর ও কুৎসিত বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের নিজের নিকট উহা উত্তম অবস্থা বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই পিশাচকুল স্ব স্ব অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকে। এক গ্রামস্থ ব্যক্তি-বর্গের পরস্পর আহারবিহারের ন্যায় এবং এক ব্যক্তির স্বপ্ন-প্রতীত মিলিত বহু ব্যক্তির একত্র কার্য্য-ব্যবহারের ন্যায় ঐ সকল পিশাচদিগের মধ্যেও কোন কোন পিশাচ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আহার-বিহার ও আলাপ-আপ্যায়নাদি নানা কর্ম্ম করিয়া থাকে। কোন কোন পিশাচ বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাপ্নলোকবৎ দূরদেশে বিবিধস্থানে বিদ্যমান, তাই তাহাদের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়াদি ঘটে না। এ জগতে যেমন পিশাচাদি বহু কুৎসিত জাতি বিদ্যমান, কুষ্মাণ্ড, যক্ষ ও প্রেতাদি

জাতিও তেমনি প্রচুরপরিমাণ। যেমন নিম্নভূমিতেই জল থাকে, তেমনি যেখানেই ঐ পিশাচাদি জাতি, সেইখানেই তমোভাবের অবস্থিতি। মধ্যাহ্নকাল, প্রখর সৌরকর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; এমন সময়ে প্রাঙ্গণে যদি পিশাচাবির্ভাব হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি সেখানে ঘোর অন্ধকারও আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই যে অন্ধকার, তাহা সৌরকরেও বিনাশ্য নহে। অন্যে যে কেহ তাহা দেখিবে, সে সম্ভাবনাও থাকে না। কেবল পিশাচেরই তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া দেখ, কি এ অপূর্ব্ব মায়া! ফলে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডলের ন্যায় ঐ পিশাচাদিমণ্ডলও তেজোময়। যেমন উলূকেরা আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারে আলোক দর্শন করে, তেমনি ঐ সকল পিশাচেরাও আলোকে অন্ধকারদর্শী হয় এবং অন্ধকারেই উহাদের প্রাবল্য হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! সেই আমি দেবলোকে পিশাচবৎ হইয়া বিহার করিতেছিলাম। এই কথার প্রসঙ্গক্রমে তুমি যে আমার পিশাচজাতির বিবরণ জানিতে চাহিয়াছিলে, সে বিবরণ তোমার নিকট সকলই বলা হইল। এখন আবার আমার সেই পূর্ব্ব কথা বলি, শুনিতে থাক।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎপরে আমি সেই আকাশদেশে ভূত-পঞ্চক-বিরহিত চিদাকাশদেহে পিশাচবৎ বিচরণ করিতেছিলাম। তৎকালে কি চন্দ্র, কি সূর্য্য, কি ইন্দ্র, কি উপেন্দ্র, কি হর, কি সিদ্ধ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি অপ্সরোগণ, কেহই আমায় দেখিতে পাইলেন না। আমি অনেক সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলাম বটে; কিন্তু তাঁহারা আমায় আক্রমণ করিতে সক্ষম হইলেন না। আমি যে তখন কথা কহিলাম, তাহাও তাঁহারা শুনিতে পাইলেন না। আমি যেন সাধু, অন্যে যেন আমায় ক্রয় করিয়াছে, তাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা না

করিয়াই ভাল মানুষটীর মত ক্রেতার সঙ্গে চলিয়াছি। আমি তখন যেন এমনই একটা অবস্থাপন্ন হইয়াই বিচরণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি ভাবিলাম,—আচ্ছা, আমি তো একজন সত্যসঙ্কল্প পুরুষ; আমার সেই সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাবে এই দেবগণ আমায় দেখিতে থাকুন।' আমি যেমন এই ভাবনা করিলাম, তৎপরক্ষণ হইতেই দেবগণ আমায় দেখিতে লাগিলেন। যেমন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় প্রদর্শিত বৃক্ষ, তেমনি সহসা আমি তাঁহাদের সমক্ষে প্রকটিত হইলাম। পরে আমি সেই দেবনিকেতনে অনেক লৌকিক ব্যবহার-নিষ্ঠ পুরুষ হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমায় দেখিলেন, তাঁহারা আদ্যন্ত ঘটনা কিছুই জানেন না; তাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আমি পৃথিবীস্থ বশিষ্ঠ হইলাম। যে সকল গগনচারী ব্যক্তি আমাকে অম্বরদেশে সৌরকর হইতে জাত দেখিলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আমি তৈজসরাশি বলিয়াই নিরূপিত হইলাম। গগনগত সিদ্ধগণ আমায় বায়ু হইতে উৎপন্ন দেখিলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আমি বায়ুময় বশিষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলাম। যে সকল মুনীন্দ্র আমায় জল হইতে উত্থিত দেখিলেন, তাঁহারা আমায় জলময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমি সেই কাল হইতে ক্বচিৎ পার্থিব, ক্বচিৎ জলময়, ক্বচিৎ তেজোময় এবং ক্বচিৎ বায়ুময়রূপেই খ্যাতি লাভ করিলাম। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, আমার সেই যে আতিবাহিক দেহ; তাহাতেই আধিভৌতিক ভাব সিদ্ধ হইয়া গেল। ফলে, আতিবাহিকই বল, আর আধিভৌতিকই বল, উভয়ই এক—উভয়ই এক আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দ্বিবিধভাবে একমাত্র চিৎই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি কোথাও কোথাও আকাশাদি ভূতরূপে থাকি বটে, কিন্তু সেই পরম চিদাকাশরূপেই আমার অবস্থিতি। আমার কোন আকার নাই, নিশ্চিতই; কিন্তু তোমাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্তই আমার সাকারত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যবহারনিরত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি যেমন প্রকাশাত্মক, যিনি বিদেহমুক্ত,—তিনিও তেমনি ব্রহ্মাকাশস্বরূপ। প্রকৃত কথা এই, আমি সে কালে যে ভৌতিক ব্যবহারে নিরত হইয়াছিলাম, আমার ব্রহ্মভাব তাহাতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। উল্লিখিত ব্রহ্মভাবের অন্যথা

আমাতে একান্তই অসম্ভব। আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব বলিয়াই ব্রহ্ম আমি—বশিষ্ঠ হইয়াছি। স্বাপ্ন মানব অজাত এবং আকার-বর্জ্জিত; তথাচ তাহাতে যেমন আধিভৌতিকতা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমনি আমাদেরও আধিভৌতিক বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মাদি দেহও অন্যের দৃষ্টিতে আধিভৌতিক বলিয়া প্রতীত হয়। যাহা হউক, সেই আমি আকাশ-বশিষ্ঠ অদ্য তোমাদের সমীপে তোমাদের বুদ্ধির অনুগুণ ভৌতিক দেহ লাভ করিয়া পুষ্ট হইয়াছি। স্বয়ম্ভূর সমস্ত সৃষ্টি যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে মনোমাত্র বলিয়াই মীমাংসিত হয়। বালক যেমন অজ্ঞানদোষে বেতাল দর্শন করে, তেমনি আমি, তুমি প্রভৃতি সৃষ্টিও তোমাদের নিকট অজ্ঞতাবশে বজ্রবৎ অচল অটল অনশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে। যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন চিরপ্রবাসী বন্ধুর প্রতি স্নেহ ক্ষয় হইয়া যাইবার ন্যায় অচিরকালমধ্যেই ঐ সৃষ্টি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে যে নিধি দর্শন হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে সে নিধির উপাদেয়তা যেমন থাকে না, তেমনি মোহ শান্ত হইয়া গেলেই এই অহঙ্কারাদি স্থূল ভাবেরও উপশম ঘটিয়া থাকে, যে জন মরুভূমির তত্ত্ব জানে, তাহার নিকট যেমন তদ্‌গত বুদ্ধি থাকে না, তেমনি যদি তত্ত্ব-পরিজ্ঞান হয়, তবে নিখিল দৃশ্যই নিবৃত্তি পাইয়া যায়। এই মহারামায়ণ-তুল্য শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ জ্ঞান তো সহজলভ্যই বলা যায়। দেহাদি অভাবস্বরূপ; কিন্তু সংসার-বাসনার বশীভূত হওয়ায় যাহার বুদ্ধি ঐ দেহাদিতে আসক্ত হয়—মোক্ষ-বিষয়ে মোটেই স্পৃহা রাখে না, জানিবে—সে ব্যক্তি অমেধ্য কুক্কুর বা ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহে।

বৎস! জীবন্মুক্ত কিরূপ ভোগ্য উপভোগ করেন আর মূর্খই বা কীদৃশ ভোগ্য উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা তুমি একবার বিচার করিয়া দেখ! যাহা অপবিত্র, তাহাই মূর্খলোকের ভোগ্য, আর যাহা বিশুদ্ধ চিদানন্দ, তাহাই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপভোগযোগ্য। ভোগ্য বস্তুতে অজ্ঞদিগেরই অগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ তৃষ্ণাদি সন্তাপ সমুদিত হয়। তবে কথা এই, যাঁহারা এই মহারামায়ণের ন্যায় শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের ঐরূপ সন্তাপ

উৎপন্ন হয় না। এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ শীতল হয়। চিত্তের শীতলতা এবং চিত্তের সন্তাপ, এই উভয়ই যথাক্রমে মোক্ষ এবং বন্ধ। লোকের কি প্রগাঢ় মোহ! কেন না, এ তত্ত্ব সহজে বুঝিবার শক্তি তাহাদের বেশই আছে; অথচ বুঝিয়াও তাহারা অন্তঃকরণের শীতলতা লাভে চেষ্টা মাত্র করে না। এই যে লোক সকল স্বভাবদোষে বিষয়াকৃষ্ট ও পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে নিরত—কেবল ধনার্জ্জনের জন্যই কৃতপ্রযত্ন; ইহারা যদি এই মোক্ষশাস্ত্র যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের মর্ম্মগ্রহ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে আর উহাদিগকে ঐরূপ বিবাদ-বিসম্বাদে প্রাণান্ত করিতে হয় না; তাহারা চিরদিনের তরে সুখশান্তি লাভ করে,—করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাইতে পারে।

বাল্মীকি বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলেই সেই দিন ফুরাইল। সায়ং বিধি সমাধার জন্য দিনমণি অস্তাচলশিখর আশ্রয় করিলেন। সায়ংকাল আসিল দেখিয়া সভ্যবৃন্দ সকলেই পরস্পর অভিবাদন-পুরঃসর সায়ংস্নান সমাধার জন্য স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল; প্রভাত হইল; রবিকরনিকর প্রসর্পিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যগণ পুনরায় সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষন্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ!—হে কর্ত্তব্যজ্ঞানশালিন্! এই পাষাণোপাখ্যান তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তিত হইল। এই উপাখ্যানের যাহা মর্ম্মার্থ, তাহা যদি বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে সকলই চিন্ময়রূপে দৃঢ় প্রতীত হইয়া থাকে। তখন ধারণা হইবে, এই সৃষ্টি-সমষ্টি চিদাকাশেই বিরাজিত; কুত্রাপি কিছুই কোন কালে নাই। ব্রহ্ম আনন্দমূর্ত্তি; তাঁহাতে যথাযথরূপে ব্রহ্মই কেবল বিরাজমান। উক্ত ব্রহ্ম কি? জানিবে,—উঁহার স্বরূপ মাত্র চিন্মাত্রই। স্বপ্ন-দর্শনদশায় ঐ

চিন্মাত্রেই নগর হয়; পরন্তু উহা নিজস্বরূপ হইতে কখনই স্বতন্ত্র হয় না। কি জীবসমষ্টিরূপ স্বয়ম্ভূভাব, কি স্থূল দৃশ্যভাব, এতদুভয়ের কোন একটার লাভ-দশাতেই ঐ চিদাকাশ ব্রহ্ম নিজরূপ পরিহার করেন না। তিনি নিজে চিদাকাশ, সেই চিদাকাশই থাকেন। তাহার অত্যল্প মাত্র ব্যতিক্রমও ঘটে না। স্বয়ম্ভুর কথাই বল, আর জগৎ বা স্বপ্ননগরীর বিষয়ই উত্থাপন কর, এ সমুদায়ের কোন কিছুই নাই। পরমার্থ দর্শনে একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিরাজমান। সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় যাবৎ একমাত্র অখণ্ডাবস্থ চৈতন্যই স্বপ্নদশায় ভবদীয় অনুভূতিগোচর নগরের ন্যায় এই জগদাকাশে অবস্থান করিয়া থাকেন। সুবর্ণ ও সুবর্ণশিলা এবং স্বপ্ননগর ও চেতন, এই সকলের পার্থক্য যেমন সম্পূর্ণই অসম্ভব, তেমনি চৈতন্য আর যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ, এতদুভয়েরও পার্থক্য অলীক ব্যাপার। প্রকৃত কথা এই যে, এক সেই চৈতন্যই সত্য পদার্থ; এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ মিথ্যা। দেখ, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের স্বর্ণই সত্য, অঙ্গুরীয় একটা আরোপিত ভ্রমমাত্র। স্বপ্নে কখন কখন এক একটা পর্ব্বত দেখা যায়। এই পর্ব্বতপ্রত্যয়েও একমাত্র চৈতন্যই সত্যরূপে প্রকট। পরন্তু তাঁহাতে পর্ব্বতভাব কিছুই নাই। নির্ব্বিকার চৈতন্যই স্বপ্নাবস্থায় শৈলবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন। ঐরূপ উপমানুসারে বলা যায়, নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন। এই চিদাকাশ অনন্ত, অজ, অক্ষয়। ইহার ক্ষয়োদয় সহস্রকল্পেও নাই। চিদাকাশই পুরুষ; তুমি, আমি এমন কি এই জগৎই চিদাকাশ। চিদাকাশ ছাড়িলে এই সমস্ত শরীরই শবাকার নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। উহা কদাচ দগ্ধ, ছিন্ন বা নষ্ট হইবার নহে। তাই বলিতেছি, সকলই যখন চিন্ময়; চিন্ময় বৈ আর কিছুই যখন নাই, তখন জন্ম কিম্বা মরণও কাহারই নাই। জগদাকারে মাত্র চিৎপ্রকাশই অনুভূত হইয়া থাকে। যিনি চিন্ময় পুরুষ, তাঁহার মৃত্যু নাই; যদি তাহা হইত, তবে পিতার মরণে পুত্রেরও মরণ নিশ্চয়ই ঘটিত। কেন না, পুত্র তো পিতারই আত্মা। আত্মা যে এক, তাহা শ্রুতিই ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই আত্মা মরে, এ কথা বলিলে একের মরণে বহুর মরণই হইতে পারিত। সে ব্যবস্থায় ভূমণ্ডল শূন্য হইয়াই যাইত।

রামচন্দ্র! অদ্যাপি কাহারও চৈতন্যের মরণ ঘটে নাই। এই ভূমণ্ডলও শূন্য হয় নাই। চিন্ময় পুরুষ অক্ষয় অবিনশ্বর; এইরূপই তো এ যাবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ঐ যে অবিনশ্বর চিন্ময় পুরুষ, উহাই আমি; আমার এই দেহাদি 'আমি' পদবাচ্য নহে। এই প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান যদি করিতে পারা যায়, তবে আর জনন-মরণের কথা কোথায়? সুনির্ম্মল চৈতন্যই আমি, এইরূপ আত্মানুভবকে যাহারা কুতর্ক তুলিয়া নষ্ট করে, তাহারা তো আত্মঘাতী; বিপৎসাগরের অতল তলেই তাহাদের স্থান হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীর অনুভব এই যে, আমি অনন্ত নিত্য নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ; আমার স্বচ্ছতা আকাশ অপেক্ষাও অধিক; আমার জীবন-মরণ কি? আর সুখ-দুঃখই বা কি? আমি চিদাকাশ, আমার তো শরীরাদিও কিছুই নহে। কিন্তু এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানের অনুভবের যাহারা অপলাপ করে, সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিবর্গ ধিক্কারেরই যোগ্য পাত্র। আমি স্বচ্ছ চিদাকাশ, এবম্বিধ স্পষ্টানুভব যদীয় হৃদয় হইতে অস্তমিত হয়, বুধগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে শব বলিয়াই বুঝেন। আমার দেহই বা কি? ইন্দ্রিয়ই বা কি? আমি তো জ্ঞানস্বরূপ; এইরূপ জ্ঞান অধিগত হইয়া যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, বিপদ সেই বিমলাত্মা ব্যক্তির কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। যিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় আত্মা, তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্থিরভাবে অবস্থান করে, বাণে কঠিন পাষাণ বিদ্ধ না হইবার ন্যায় কোন মনোবেদনাই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। নিজের চিন্ময়তা যাহারা ভুলিয়া থাকে, শরীরের প্রতি আস্থাবান্ হয় এবং শরীরকে আত্মবোধে পালন ও পোষণ করে, তাহারা প্রকৃতই নির্ব্বোধ; সুবর্ণ ফেলিয়া ভস্মের প্রতিই তাহাদের আদর প্রদর্শন করা হয়। 'এই দেহই আমি' এইরূপ ভাবনার গুণে বল, বুদ্ধি, তেজ, সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। আর আমি চৈতন্য, এবম্বিধ ভাবনার বলে ঐ সকল আবার পুনরভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ আমি—আমার আবার জনন-মরণ কি? এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যখন অভ্যুদিত হয়, তখন আর লোভ-মোহাদির থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি চিদাকাশ পরিহার-পূর্ব্বক দেহকেই সারাৎসার বলিয়া মনে করে, সে তো মূঢ়; লোভ-

মোহাদির আশ্রয় বলিতে তাহাকেই বলা যায়। 'আমি বজ্রবৎ কঠোর চিৎস্বরূপ; কিছুতেই আমি ছিন্ন বা দগ্ধ হই না।' এইপ্রকার ধারণা যাহার বদ্ধমূল হইয়া যায়, মৃত্যু তাহার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ বস্তু। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য যে, যাঁহারা জ্ঞানী সুধী, তাঁহাদেরও মোহ দৃষ্ট হয়। কেন না, সেই সকল জ্ঞানীর মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা এই দেহনাশেই নষ্ট হইলাম বলিয়া ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আমি চিদাকাশ বৈ অন্য কেহই নহি, এইরূপ সত্য ধারণা যখন সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন অশনি-সম্পাত বা প্রলয়ানলও পুষ্পবর্ষণবৎ প্রতীয়মান হয়। আত্মার নাশ অবশ্য কখনই নাই। তথাচ 'যাহা অবিনশ্বর চৈতন্য বস্তু, তাহা আমি নহি। আমি দেহ—আমি তো নষ্ট হইয়া গেলাম।' এইরূপ চিন্তা করিয়া-করিয়া যে ব্যক্তি ক্রন্দন করে, বিবেকী পুরুষেরা তাহার সে ক্রন্দন নট-জনের ক্রন্দনবৎ অকিঞ্চিৎ পরিহাস বস্তু বলিয়াই মনে করেন। যাহা চৈতন্য বস্তু, তাহাই আমি; এই দেহাদি—আমি নহি; এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, সে কদাচ মোহমগ্ন হইবার নহে। বস্তুতঃ আমি চিদাকাশ, আমার কখনই বিনাশ নাই। এই যে জগৎ, ইহা চিদাকাশেই পরিব্যাপ্ত। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ওহে মহামোহ-মগ্ন জন-সাধারণ! তোমরাও চৈতন্যমাত্রই; চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই কুত্রাপি তোমরা পাইয়াছ কি? আমি তো মনে করি, কিছুই তোমরা পাও নাই; বৃথা আত্মাপলাপ করিতেছ। ভাবিয়া দেখ, চৈতন্য বস্তু যদি মৃত হয়, তাহা হইলে তো সকল লোকই মরিয়া যায়। বলি, চৈতন্যের যদি মরণ হয়, তাহা হইলে তোমরাও কি মরণদশায় উপনীত হও না? ফল কথা, যদি চৈতন্যের মৃত্যু স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তোমাদেরও মরণ নিত্যই ঘটে। ফলে, নিখিল চৈতন্যই তো এক বস্তু; মৃত্যু প্রত্যহ কোথাও না কোথাও ঘটিতেছে। সুতরাং ঘটনা এই-রূপ দাঁড়ায় যে, বস্তুগত্যা কিছুই মরেও না বা জীবিতও থাকে না; আমি জীবিত, আর মৃত, এই দুই অবস্থা কেবল চৈতন্যই অনুভব করিতেছেন। প্রকৃত কথা—তিনি মরেনও না বা জীবিতও হন না। চৈতন্য যাহা অনুভব করেন, তাহাই তিনি সত্বর দেখেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ,

সকলেরই ইহা অনুভূতিসিদ্ধ। অপিচ চৈতন্য কোথাও স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হন না। সংসার এবং মোক্ষ, উভয়ই তিনি দেখিতেছেন এবং যাহা সুখ ও যাহা দুঃখ, তাহাও তাঁহার অনুভূত হইতেছে। পরন্তু নিজের সেই যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা হইতে কখনই তিনি বিচ্যুত হইতেছেন না। তিনি যে কালে নিজ স্বরূপ বুঝেন না, তখনই মোহ নাম গ্রহণ করেন। আর যখন তিনি স্বস্বরূপ পরিজ্ঞাত হন, তখন মুক্তিনামে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যখন সকলই আকাশবৎ স্বচ্ছ চৈতন্য, তখন অস্ত কিম্বা উদয় কাহারও যে নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই চিদাকাশময় জগৎ; এখানে সকলই সত্য হইতে পারে আবার সকলই মিথ্যাও হইতে পারে। সত্য এবং মিথ্যা এই দুইটী—ভাবনার প্রাবল্যেই হয়। যে প্রকারে যে যাহা ভাবিবে, তাহার নিকট তাহাই সেইরূপে প্রতিভাত হইবে। চিদাত্মা যেরূপে যাহা ভাবনা করেন, তাহা তিনি সেইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা তো সর্ব্ব-জনেরই অনুভূতিসিদ্ধ বিষয়। সুধাবোধে বিষও যেমন সুধা হয়, আর বিষবোধে পীযূষও যেমন বিষ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি দেশ, কাল ও পাত্রভেদে জগতের সর্ব্বপদার্থই ভাবনানুগুণে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা ভাবনার অনুযায়ী নহে।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এ জগৎ পরমাত্মার স্বপ্নভূত; ইহাকে যদি পরম সত্য ব্রহ্মাকাশরূপে জ্ঞান করা হয়, তবে এই নিখিল জগৎ-প্রপঞ্চই ব্রহ্ম হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এ জগৎকে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে সকলেই পারে। বলিতে পার,—ব্রহ্মরূপে ইহার সত্যতা হইতে পারে; পরন্তু ভ্রান্তি-প্রত্যয়রূপে এ জগতের সত্যতাসিদ্ধ কি প্রকার? দেখ, যেখানে রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রম হয়, তথায় তো রজ্জুই সত্য হইয়া পড়ে।

কিন্তু সেই রজ্জুতে যে সর্পের অধ্যাস, সেই সর্প তো আর সত্য নহে। এতদুত্তরে বলা যায়, রজ্জুসর্পের উদাহরণস্থলে সর্পের সত্যতা অসিদ্ধি; কেন না, রজ্জু এবং সর্প উভয়ই দৃশ্য বস্তু; কিন্তু উভয়ের উক্ত দর্শন তো আর যুগপৎ হইবার নহে; দর্শন হইতে উহাদের মধ্যে একটীরই হইবে। অর্থাৎ যখন রজ্জু দেখা যাইবে, তখন আর সর্প দেখা যাইবে না; এই নিমিত্ত উহাকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু জগদ্‌ভ্রমের বেলায় ভ্রমই কেবল দৃষ্ট হয়। যাহা মহাচিৎ, তাহা দৃশ্য নয়; কাজেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে কথা এই, উক্ত চিৎ দৃশ্য জগদ্ভ্রমের কারণ কি না, তাই কার্য্য-দ্বারা সত্তানুমান মাত্র হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মহাচিৎ-কার্য্যে জগদ্ভ্রমকে যদি সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে সে নির্দ্দেশও যুক্তিযুক্ত হওয়াই সম্ভবপর। সহজ কথা এই যে, সত্য-মিথ্যার ব্যবহার স্বস্ব অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই হয়। এই প্রকারে অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া জগদ্‌ভ্রমকে যদি সত্য বলা যায়, তবে যিনি পরমার্থ সত্য আত্মা, তাঁহাকেও অসত্য বলা অযৌক্তিক হয় না। নিখিল দৃশ্য-প্রপঞ্চের বিলয়রূপ যে মোক্ষ, তাহা বন্ধদশায় ঘটে না। মোক্ষ না ঘটিলেও আবার আত্মপ্রত্যয় সম্ভবপর নহে। যদি মোক্ষ ঘটে, তথাচ প্রতীতিকর্ত্তা জীবের অভাবনিবন্ধন কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কোন কালেই আত্মানুভব হইয়া উঠে না। এই সকল কারণসামর্থ্যে যাহা পরম সত্য পদার্থ, তাহাকে শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকারে নিজ নিজ অনুভূতির অনুগুণে যদি সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে পারা যায়, তবে কোন সম্প্রদায়ের মতই অসত্য হইতে পারে না। কাপিল দর্শনের মত এই যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি ক্রমে এই সুখদুঃখময় জগতের আবির্ভাব। চৈতন্যময় পুরুষ সাক্ষিস্বরূপ; তাঁহার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। এই মতও সাংখ্যকার কপিলমুনির অনুভূতি অনুসারে সত্য হইতে পারে। বেদান্তী সম্প্রদায়ের মত, এ জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র। ইত্যাকার মতও তাঁহাদের অনুভবে সত্য। কেন না, কারণপর্য্যালোচনা করিলে বেদান্তী সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার অনুভব যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সম্প্রদায়বিশেষের আর

এক প্রকার মত এই যে, এ জগৎ পরমাণুসমষ্টি বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপ মতবাদীদিগের অনুভবে উক্ত কল্পনাও সত্য বলিতে হইবে। দৃষ্ট-সৃষ্টিবাদীদিগের কল্পনা এই যে, এ জগৎ যেমন দেখা যাইতেছে, ইহা সেইরূপই; ইহা না সৎ, না অসৎ, ইত্যাদি। এইরূপ মতবাদীদিগের অনুভব অনুসারে উল্লিখিত কল্পনাও সত্য বলা যায়। চার্ব্বাক-মতবাদীরা বলেন,—বাহিরে এই যে ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষগোচর হয়, এই সকল ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই মতও সত্য; কেন না, উক্ত মতবাদীরা স্বীয় শরীরমধ্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আর কোন পদার্থই উপলব্ধি করেন না। যাঁহারা প্রতিক্ষণেই পদার্থপরম্পরার পরিবর্ত্তন দেখেন,—দেখিয়া বলেন, সকলই ক্ষণিক—ক্ষণবিনশ্বর; তাঁহাদের মতও অসত্য নহে। কেন না, সেই পরম পদ সর্ব্বশক্তিযুক্ত; তাঁহাতে সমস্তই সম্ভবপর। অর্হতদিগের মত এই যে, ঘটাবরুদ্ধ চটক পক্ষী যেমন ঘটের মুখাবরণ উন্মোচন করিলে বাহিরে উড্ডীন হইয়া যায়, তেমনি দেহান্তরালে পরিচ্ছিন্ন জীব কর্ম্মাবরণের অপসারণে পরলোক প্রাপ্ত হয়। এইরূপ মতকল্পনাও সত্য হইতে পারে। আর ম্লেচ্ছ-যবনাদিরা যে কল্পনা করে, এই দেহাকার জীব ঈশ্বরের উৎপাদিত; মৃত্যুর পর ঐ জীবকে যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়, সেইখানেই অবস্থান করে, পরে ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে উহাকে মোচন, উচ্ছেদন, স্বর্গে প্রেরণ বা নরকে নিপাতন করেন, এইরূপ কল্পনাও উহাদের অনুভবগুণে অসত্য নহে। জনন, মরণ, পীযূষ, বিষ, ইত্যাদি পদার্থপরম্পরা পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন কালোৎপন্ন হইলেও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশালী একমাত্র সত্য পদার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট যে সতত সত্য সমান প্রত্যয় হয়, সে প্রত্যয়ও মিথ্যা নয়; কেন না, ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বময়। এই সমগ্র জগৎ স্বভাব হইতেই উদ্ভূত এবং স্বভাব হইতেই বিনষ্ট; ইহার উদ্ভব-নাশের কর্ত্তা অন্য কেহই নাই। এইরূপ মতপ্রচারক স্বভাববাদী চার্ব্বাকদিগের মতও অযৌক্তিক নহে। ঘট-পটাদির অবশ্য সচেতন কর্ত্তা আছে; পরন্তু সর্ব্ববস্তুর তো কৈ কর্ত্তা দেখা যায় না। আরও দেখ, আকালিক বর্ষণ, কৃষকের সাহায্য ভিন্ন সুক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি, ইত্যাদি কার্য্যেরও কর্ত্তৃপুরুষ অন্বেষণে মিলে না। যাহাদের

মতে ক্ষিতিপ্রভৃতি নিখিল কার্য্যের কর্ত্তৃপুরুষ এক, তাহাদের মতও অসত্য বলা যায় না; কেন না, তাহারাও তো তাহাদের নিজ মতের সত্যতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরেরই উপাসনা করে এবং সে উপাসনায় স্বস্ব অভীপ্সিত সিদ্ধিও করিয়া থাকে। আস্তিক ব্যক্তিরা ইহলোকও মানেন এবং পরলোকও মানেন। এই জন্য পরলোকের সুখৈষণায় তাঁহারা যে তীর্থ-স্নানাদি কার্য্য করেন, তাহাও অফলোপধায়ক হয় না। সুতরাং তাঁহাদের তথাবিধ ভাবনাও অসত্য নহে। বৌদ্ধমতে সমস্তই শূন্য। এই শূন্যবাদী মতও অসত্য বলা যায় না; কেন না, দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া কোন কিছুই উপলব্ধ হয় নাই বলিয়াই বৌদ্ধ মতে সমস্তই শূন্য নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মতের প্রধান যুক্তি এই যে, চিদ্বস্তু কল্পতরু বা চিন্তামণির ন্যায়; উহার যাহা ঈপ্সিত হয়, তাহাই সত্বর সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অথচ নিজে যে আকাশময়ী, সেই আকাশময়ী হইয়াই বিরাজ করে। মতান্তরে এ জগৎ না শূন্য, না অশূন্য; এই মতও অসত্য হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিশালী, তাঁহার মায়া অত্যাশ্চর্য্য ও অনাখ্যেয়। সেই মায়াশক্তি শূন্যও নহে এবং অশূন্যও নহে। ফল কথা, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্; তদীয় বিচিত্র মায়াপ্রভাবে যে, যে প্রকার অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করে, তাহার তাহা হইতেই ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কথা এই যে, ঐরূপ কার্য্যের চেষ্টায় থাকিয়া মূর্খতাবশতঃ তাহা হইতে যেন বিরতি ঘটে না; চেষ্টায় বিরত হইলে কার্য্যফল অনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানের না উদয় হয়, ততদিন পর্য্যন্তই উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; পরন্তু আত্মজ্ঞান উদ্দীপিত হইলে আত্মাকে সত্য বলিয়া ধারণা হইবে; অন্য সকলই মিথ্যা হইয়া যাইবে। কিন্তু যে সে লোকে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে, আর তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; এরূপ প্রবৃত্তি অবশ্যই শ্রেয়স্কর নহে। যাঁহাদের প্রশস্ত বুদ্ধি আছে, সদসদ্-বিবেকবতী মতি আছে, তথাবিধ বুধ জন অন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারালোচনা করিয়া যাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় এবং সেই অনুসারেই কার্য্য করা বিধেয়। যিনি বিশিষ্টরূপে শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া-

ছেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সদাচারে নিরত আছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত পণ্ডিত আখ্যায় অভিহিত করা হয় এবং তাদৃশ পণ্ডিতের আশ্রয় লওয়াই উচিত কার্য্য। যাহারা শাস্ত্রার্থ লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করে, অথচ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝে নাই, তাহাদিগকে শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া যে জন তাহাদের আনন্দবিধান করেন এবং নিজ হইতেও কদাচ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করেন না, তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—তাদৃশ পণ্ডিত জনের সংসর্গে বাস করাই সমুচিত। জল যেমন নিম্নাভিমুখেই ধাবমান হয়, তেমনি সকল জীবই স্বস্ব ইষ্ট বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলে জীবনিবহ নানা পথেই ধাবিত হয় আর স্বস্ব রুচি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই সেই পথকে হিত ও সত্য বলিয়া ধারণা করে। ঐ সকল নানা পথের মধ্যে যে পথ ধরিলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। আহা! এই জনসমূহ সংসার-বারিধির তরঙ্গ-হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া তৃণাগ্রলগ্ন জলবিন্দুবৎ অলক্ষ্যে দিবস সকল যাপন করিতেছে!

রামচন্দ্র কহিলেন,—বিভো! আপনি যেরূপ পণ্ডিতের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন, সেরূপ পণ্ডিত তো অধুনা দুর্ল্লভ হইয়াছে। এখন সকলেরই ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই তৃষ্ণা ব্রহ্মাকাশের জগদা-কার-পাদপে শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক লতার ন্যায় উপচিত হইতেছে। পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক সারাসারের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃত বস্তু বুঝিয়া লইতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি এখন কেহ আছেন কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! আমি যেরূপ পণ্ডিতের কথা কহিয়াছি, তাদৃশ পণ্ডিত যে এখন সুদুর্ল্লভ, তৎপক্ষে আর সন্দেহাবসর কি আছে? ঐরূপ পণ্ডিত একেবারেই যে দুর্ল্লভ, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। সুর, নর ও গন্ধর্ব্বাদির মধ্যে এমন দুই এক জন আছেন, যাঁহাদিগকে অবাধে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। সূর্য্য হেন তেজস্বী তাদৃশ দুই একজন মহাপুরুষ আছেন বলিয়াই এখনও দিবস প্রকাশ পাইতেছে। তা ভিন্ন অন্য জনসাধারণ সকলেই মোহের সাগরে তৃণ-পুঞ্জবৎ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেবাদি যত জাতি আছে, সমুদায়ের মধ্যেই

মোহমগ্ন মূর্খের সংখ্যা সমধিক। বলিতে কি, দেবসমাজের মধ্যেও এমন সকল অজ্ঞের অস্তিত্ব দেখা যায়, যাহাদের আত্মজ্ঞান কিছুমাত্রই নাই। পর্ব্বতগত তরুরাজি যেমন দাবানলে প্রজ্বলিত হয়, তেমনি ঐ সকল অজ্ঞ কেবল ভোগানলেই বিদীপ্তিত হইতেছে। এরূপ অনেক অজ্ঞ দৈত্য-জাতির মধ্যেও মিলে, যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। তাহারা অতি উদ্ধত ঘোর অত্যাচারী; বন্য গজের ন্যায় এ জগতে বিষম অত্যাচার করিবার জন্যই যেন তাহারা প্রাদুর্ভূত। দেবগণ তাহাদের নিধনসাধনেই সচেস্ট। গন্ধর্ব্ব সমাজের মধ্যেও বহু অজ্ঞ আছে। বিবেকের লেশ-মাত্রও তাহাদের নাই। তাহারা হরিণকুলের ন্যায় কেবল সঙ্গীতরসে মত্ত হইয়াই বিচরণ করে। বিদ্যাধরেরা মনে করেন, তাঁহারা বিদ্যার আধার। সেই গর্ব্বেই তাঁহারা আত্মহারা; তাই তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় তাঁহাদের অনাদর; কেবল ভোগবিদ্যাতেই তাঁহারা অভিরত। যক্ষগণ অজ্ঞতাপূর্ণ; তাহারা অত্যাচারে চিরকালই ভূমণ্ডল ক্ষুব্ধ করে এবং নিজেরা চিরদিনই অক্ষত থাকিবে বলিয়া ভাবনা করে। যে সকল বালক, বৃদ্ধ বা আতুর ব্যক্তি অসহায়; তাহাদের উপরই ঐ সকল যক্ষের আধি-পত্য। রামচন্দ্র! সিংহ যেমন মদমত্ত গজের বধ বিধান করে, তেমনি তুমিও প্রভূত উদ্ধত নিশাচরের বধ সাধন করিয়াছ এবং পরবর্ত্তীকালেও বহু রাক্ষসের বধ বিধান করিবে। বহ্নিমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত ঘৃতাহুতি যেমন বহ্নিশিখায় দগ্ধ হয়, তেমনি পিশাচেরা কেবল প্রাণি-ভক্ষণ-চিন্তাতেই দগ্ধ হইয়া থাকে। পিশাচেরা বড়ই অজ্ঞ জীব; তাহাদের বিবেক প্রাপ্তির আশা কোনক্রমেই নাই। নাগনিচয় মৃণালনালবৎ ভূগর্ভেই প্রোথিত থাকে এবং বৃক্ষমূলবৎ জড় বিমূঢ়ভাবেই তাহাদের কাল কর্ত্তন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটকুল বিবরমধ্যেই বাস করে; তাহাদের ন্যায় বিবরই যাহাদের আশ্রয়ভূমি, সেই সকল অসুরজাতির বিবেকলাভের কথাই তো উত্থাপন হইতে পারে না। মর্ত্ত্যে মানব জাতি বাস করে, তাহাদের কথা আর কি বলিব? তাহারা তো পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যৎসামান্য আহার নির্ব্বাহের জন্যই অহরহ ঘুরিয়া বেড়ায়।

এইরূপে নিখিল জীবজাতিই দুরাশায় উত্তেজিত হইয়া উন্মত্তবৎ

ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। তাহাদের দিন এইভাবেই কাটিয়া যায়। যে জন অগাধ জলে মগ্ন হইয়াছে, তাহার গাত্রে যেমন ধূলিস্পর্শ হয় না, তেমনি বিমল বিবেক প্রায় অধিকাংশ লোককেই স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষকেরা শূর্প দ্বারা বাতাস দেয়, তাহাতে অসার ধান্যগুলি যেমন ধান্যাধার হইতে অপগত হইয়া যায়, তেমনি জীবসমূহ দেহাত্মাভিমানরূপ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়,—হইয়া অক্রোধ অহিংসাদি নিয়ম সকল পরিহারপূর্ব্বক ক্রোধ-হিংসাদি রিপুকুলের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল তান্ত্রিক যোগিনী আছে, তাহারা মদ্য, রক্ত ও মাংসাদিরূপ কর্দ্দমাক্ত দুর্গন্ধ-পল্বলে পতিত হইয়া অপবিত্র পিশাচবৎ জীবনাতিপাত করে। তাহাদেরই বা বিবেকবিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? দেবগণ মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, সূর্য্য, বৃহস্পতি, শুক্র ও অগ্নি প্রমুখ দেবগণ; দক্ষ কশ্যপাদি প্রজাপতিগণ; নারদ ও সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণ; স্কন্দ-প্রমুখ দেবকুমারগণ; হিরণ্যাক্ষ, বলি, প্রহ্লাদ, ময়, বৃত্র, অন্ধক, নমুচি, কেশিপুত্র ও মুরপ্রভৃতি দৈত্যগণ; বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ ও প্রহস্তপ্রমুখ রাক্ষসগণ এবং শেষ, তক্ষক, কর্কোটক ও মহাপদ্মাদি নাগগণ; এই সকল সুর ও সুরেতর-গণই বিশিষ্ট বিবেকশালী জীবন্মুক্তস্বভাব। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ইন্দ্রলোকে ঐরূপ আরও অনেক জীবন্মুক্ত মহাত্মা অবস্থান করেন। রঘুবর! সিদ্ধ এবং সাধ্যলোকে, এমন কি মনুষ্যলোকেও আরও দুই চারিজন প্রখ্যাত জীবন্মুক্ত রাজা, ব্রাহ্মণ এবং মুনি যে না আছেন, এমন নহে; তবে সেরূপ ব্যক্তি ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! এ জগতের সর্ব্বদিকেই প্রভূত জীবের বাস; কিন্তু তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানশালী জীব অত্যন্তই বিরল। দেখ, ফল-পল্লবশালী পাদপ প্রচুর আছে; কিন্তু কল্পপাদপের সংখ্যা অতীব অল্প।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যাঁহাদের বিবেকোদয় হয় এবং সেই বিবেকপ্রভাবে সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমপদে বিশ্রাম লাভ করেন, লোভ-মোহপ্রভৃতি রিপুসকল তাঁহাদের ক্ষয় পাইয়া যায়। তাঁহারা কোন কিছুতেই কুপিত হন না, কোন কিছুতেই হৃষ্ট হন না, কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, কোনরূপ ভোগ্য সামগ্রীর সঞ্চয়ে ব্যগ্র হন না, কোন কিছু হইতে ভয়প্রাপ্ত হন না, কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, নাস্তিক্য বুদ্ধি লইয়া কোন অবৈধ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন না, আর আস্তিক্য বুদ্ধিতে কোন অতি-ক্লেশজনক কর্ম্মেও লিপ্ত হন না। তাদৃশ সংসারবিরক্ত পুরুষ সতত উদাসীনভাবেই অবস্থান করেন। তাঁহাদের ব্যবহার অতীব মাধুর্য্যময়। তাঁহারা সকলেরই সমভিব্যাহারে কোমল ও মধুরভাবে আলাপ ব্যবহার করেন। তথাবিধ মহাত্মাদিগের সংসর্গ চন্দ্রকিরণবৎ শীতল ও আহ্লাদ-কর। সেরূপ সংসর্গে চিত্তে বড়ই আনন্দসঞ্চার হয়। তাঁহাদের সংসর্গ পাইলে কোনরূপ উদ্বেগের আশঙ্কাই থাকে না। কোন কর্ম্মে কোনরূপ সন্দেহ সমুদ্রিক্ত হউক, সুচতুর বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা ক্ষণমধ্যেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া দেন। তাঁহারা বাহিরে সর্ব্বপ্রকার লোকব্যবহার পালন করেন, অন্তরে সদাই শীত শান্তভাবে বিরাজ করেন। তাদৃশ মহাপুরুষেরা শাস্ত্রার্থকুশল, শাস্ত্ররসের আস্বাদ-লোলুপ, পূর্ব্বাপর লোক-বৃত্তান্ত-বেত্তা, হেয়োপাদেয় বস্তুবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারী। তাঁহারা যথেচ্ছভাবে কোন একটা কর্ম্ম করিয়া বসেন না; শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা সদাচারে অতি মাত্র নিরত এবং সর্ব্বদাই আনন্দোৎফুল্ল। প্রফুল্ল পদ্ম যেমন সৌরভ ও রসবিতরণে অলির অভিনন্দন করে, তাঁহারাও তেমনি সমাগত জনকে উপদেশ দিয়া জ্ঞান, আশ্রয় ও অন্নদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুণ-গৌরবে সকল লোকই বাধ্য হইয়া পড়ে। সকলেরই তাঁহারা সন্তাপ দূর করেন। যেমন শীতল স্থান, তেমনি তাঁহারা স্নিগ্ধতাময়। দুর্ভিক্ষ-মহামারী প্রভৃতি বিপদ—রাষ্ট্রবিপ্লব ও দেশবিপ্লবের হেতুভূত; বর্ষা-

কালের বারিধরের ন্যায় তাঁহারা তাহা তপোবলেই নিবারিত করেন। ভূকম্পও তাঁহাদের দ্বারা নিবারিত হইয়া যায়; তাঁহারা বিপদে লোক-দিগকে সমুৎসাহিত করেন, এবং সম্পদের অভ্যুদয়ে সুখী করিয়া থাকেন। তাদৃশ মহাত্মগণ চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুস্নিগ্ধ এবং পতিগতপ্রাণা রমণীর ন্যায় প্রেম-মাধুর্য্যাদি-গুণে অন্বিত। তথাবিধ সাধুপুরুষেরা বসন্ত ঋতুবৎ যশঃ-কুসুমে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন, পুংস্কোকিলবৎ মধুরালাপ করেন, এবং ভাবিনী সৎফলপ্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকেন। তাঁহারা লোকচিত্তরূপ মহাসাগরকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন। ঐ মহাসাগর মোহরূপ জল-জন্তুর আকর, দুঃখরূপ আবর্ত্ত ও তরঙ্গসঙ্কুল এবং ক্রোধরূপ পবন-হিল্লোলে উদ্বেগময়। যদি বুদ্ধিভ্রংশ হয় অথবা বিষম সঙ্কট ও দারুণ দুর্ব্বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে তাদৃশ সাধুগণই একমাত্র গতি। সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিয়া যে সকল জীব পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা বিশ্রাম-লাভার্থ উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা তাদৃশ সাধুপুরুষকে চিনিয়া লইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থান করিবে। কারণ উক্ত প্রকার সাধুসঙ্গ ব্যতীত সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর উপায় নাই। যাহা হইবার হইবে, সে জন্য আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ধারণা করিয়া গর্ত্ত-মধ্যস্থিত কীটবৎ অনভিহিতভাবে অবস্থান করা কোনক্রমেই সমীচীন নহে। সাধু জনের যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, তন্মধ্যে একটী গুণও যদি কাহারও থাকে, তবে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহারই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; সাধুর সম্পূর্ণ গুণ নাই বলিয়া তৎপ্রতি হতাদর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে বাল্য হইতেই দোষ-গুণবিচারের ক্ষমতা জন্মে, সে নিমিত্ত সম্ভবমত শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষণ করা প্রয়োজন। যৎকিঞ্চিৎ দোষ থাকিলেও তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুসেবা করা বিধেয়। যাহারা ঘোর বিষয়াসক্ত ও মোহগ্রস্ত, তাদৃশ পরিজনবর্গের সঙ্গত্যাগ শনৈঃ শনৈঃ কর্ত্তব্য। কেন না, তথাবিধ মোহাপন্ন লোকের সংসর্গবশে রম্য বস্তুও অরম্য হইয়া দাড়ায়; যাহা স্থায়ী পদার্থ, তাহাও অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় এবং সাধুও অসাধু হইয়া পড়েন, এ বিবরণ কল্পিত নহে; ইহা আমি অনেকবার প্রত্যক্ষও করিয়াছি।

সুতরাং অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে; সেরূপ সঙ্গে সকলেরই অনর্থ হইতে পারে। দেশ ও কালপ্রভাবে ঐরূপ অসাধুসঙ্গে বিষম বিপত্তি হইবার সম্ভাবনা। অতএব অন্য সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কেবল সাধু-সংসর্গে বাস করাই বিধেয়। সেরূপ সঙ্গে অনিষ্টাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। অথচ তাহাতে ইহ-পরকালেরই হিতসাধন হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে; বিনীতভাবে সাধুজনের সেবা করাই কর্ত্তব্য। সাধুগণের সমীপে যাহারা গমন করে, শমদমাদি পুষ্পপরাগে তাহাদের অঙ্গ বিভূষিত হয়। ফলে সাধুর যে সকল গুণ থাকে, তাহার সংসর্গ করিলে তৎসমুদায় অনায়াসেই লাভ করা যায়।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার এক্ষণে আর একটা বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা মনুষ্য, আমাদের ঐহিক পারত্রিক দুঃখ যাহাতে নষ্ট হইতে পারে, এরূপ উপায় অনেক আছে। সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা এই সকলই সেই উপায়মধ্যে গণ্য। কিন্তু কীট-পতঙ্গাদি যে সকল তির্য্যক্ ও স্থাবর জাতি আছে, তাহাদের দুঃখনাশ হইবার উপায় কি? আর দুঃখ নাশ না হইলেই বা তাহারা বাঁচে কি প্রকারে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এ জগতে চরাচর যে কিছু প্রাণী আছে, সকলেই স্বস্ব ভোগোচিত সুখে সুতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদের যেমন ভোগবাসনা আছে, অণুপ্রমাণ সামান্য কীট-পতঙ্গাদিরও তেমনি ভোগ-বাসনা বিদ্যমান। তবে আমাদের যে ভোগবাসনা, তাহাতে আমাদের আস্থা অতি অল্প; এই নিমিত্ত পরমার্থলাভে আমাদের বিঘ্ন সম্ভাবনাও সামান্য মাত্র। কীট-পতঙ্গাদির ভোগবাসনা অত্যন্ত কি না, তাই তাহাদের

পরমার্থ-সাধনায় প্রচুর বিঘ্ন। যেমন আপন অধিকার নির্ব্বাহের জন্য বিরাট দেহ হিরণ্যগর্ভেরও স্বীয় ভোগে প্রবৃত্তি হয়, তেমনি যে সকল কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্মদেহ কীটাদি আছে, তাহারাও তেমনি স্ব স্ব ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কেশমূলের ছিদ্রবৎ অতি ক্ষুদ্র স্থানেও তাহারা স্ব স্ব ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতে সমুদ্যত হইতেছে। বুঝ, এখন অহঙ্কারের কতই মাহাত্ম্য! ঐ দেখ, নিরাধার গগনে কত অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিতেছে, মরিতেছে এবং মৃতাবশিষ্টগণ ঐ শূন্য দেশেই অবস্থান করিতেছে। সর্ব্ব-সময়ের জন্যই তাহাদের আপন আপন ভোগসিদ্ধির প্রয়াস। ক্ষণেকের তরেও তাহাদের চেষ্টার বিরাম নাই। সামান্য পিপীলিকাশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে,—তাহারা স্ব স্ব আত্মবর্গ সমভিব্যাহারে সামান্য আহারের তরে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তদ্দর্শনে মনে হয় না কি যে, তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সময় সঙ্কুলান আমাদের দিবসব্যাপী সময়েও হয় না। ফলে ঐ প্রকার কার্য্যে আমাদের একটী দিবস, তাহাদের একটী ক্ষণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে; তাহার নাম তিমি; তিমির প্রমাণ একটা ত্রসরেণুর সমান। বেশ দেখা যায়, তাহারা দ্রুতগমনে গরুড়বৎ আকাশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। কেন বেড়ায়? বলিব না কি যে, ভোগবাসনার পরিতৃপ্তিই উহাদের ঐরূপ ছুটাছুটির উদ্দেশ্য? এই আমার গৃহ, এই আমার পুত্রপরিজন, এইরূপে আমার আমার করিয়া জগদ্বাসী মানবেরা যেমন দিনাতিপাত করে, সামান্য কৃমিকীটের কথা ভাবিয়া দেখ, তাহারাও তেমনই করিয়া কাল কর্ত্তন করে। এমনও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ক্ষতস্থানোপরি জন্ম লয়। আমরা যেমন, তাহারাও তেমনি দেশ-কালাদির অনুসরণ করে; এই আমার বাসস্থান, এইখানে আমি এতটুকু কাল আছি, এই সময় ইহা খাইতেছি, এইরূপ জ্ঞানে কার্য্যব্যগ্র হয়, এইভাবে তাহারা নিজ জীবন যাপন করে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ; তাহাদেরও কিয়ৎপরিমাণ বোধ ও জীবনীশক্তি বিদ্যমান। পাষাণাদি অচেতন বস্তু; তাহাদের বোধ একেবারেই নাই। কৃমি-কীটাদি জীব মনুষ্যবৎ স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত আছে। তাহারাও মনুষ্যদিগের ন্যায় স্বপ্ন ও জাগরদশায় উপনীত হইয়া

থাকে। স্বপ্নে তাহারা নিশ্চেষ্ট হয় আর জাগ্রদবস্থায় তাহারা কার্য্য করে। আমরা যেমন দেহনাশে দুঃখ পাই, তাহারাও শরীরস্থিতিকাল পর্য্যন্তই সুখ ভোগ করে; শরীরনাশে তাহাদেরও দুঃখানুভব হয়। কোন লোক দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইলে তথায় উপস্থিত হইয়া সে যেমন সবিস্ময়ে অথচ ঔদাস্য সহকারে তথাকার সমস্ত বস্তু দেখে, ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত তত্রত্য কাহারও সহিত না পরিচয় ঘটে, সে পর্য্যন্ত কিছুই নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না, তেমনি পশু পক্ষী প্রভৃতি যে সকল তির্য্যগ্জাতি আছে, তাহারাও অস্মদীয় ভোগ্য দ্রব্যগুলি ঐরূপেই দর্শন করিতে থাকে। এ সংসারে আমরা যেমন সুখ-দুঃখ উভয়ই উপভোগ করি, তির্য্যগ্জাতিরাও তেমনি করিয়া থাকে। তবে আমরা মনুষ্যজাতি; আমাদের ভাল মন্দ বিচারের শক্তি আছে, আর উহারা তমঃপ্রধান তির্য্যগ্-জাতি, উহাদের তাহা নাই। কোন অপরিচিত দূরদেশে বিক্রীত লোক যেমন নিজের দুরবস্থার কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না, মনের দুঃখ মনেই তাহার থাকিয়া যায়, তেমনি বলীবর্দ্দাদি পশুরাও নাসারজ্জুবন্ধনে কৃষক-গণ কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়,—হইয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারে না বা কাহারও নিকট আত্মদুঃখ ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয় না। আমরা কোমলত্বক্; তাই নিদ্রাবস্থাতেও শীত, গ্রীষ্ম ও মশক-মৎকুণাদির দংশনক্লেশ আমাদের অনুভূতিগোচর হয়। এইরূপ তরু-গুল্ম-কীটাদিরও হইয়া থাকে। দেশে যদি বিপ্লব-বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা যেমন পথ অপথ বিবেচনা করি না, কণ্টকাকীর্ণ বন হউক, খাত হউক বা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ সঙ্কট-কঠোর স্থানই হউক, কিছুই লক্ষ্য না করিয়া বিশৃঙ্খল গমনে যে পথে সত্বর গমন করা যায়, সেই পথেই ছুটিতে থাকি; সর্প ও পশুপক্ষ্যাদি সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। ভয়ব্যাকুল হইলে তাহারাও পথ অপথ লক্ষ্য না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল গমনে ছুটিতে থাকে। অরণ্যের বাহ্য বিক্ষেপশূন্য সামান্য কীট আর স্বর্গের রাজা ইন্দ্র—স্বরূপানন্দ উভয়েরই তুল্য; পার্থক্য কিছুই নাই। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-সুখ বাহ্যতঃ ইন্দ্রও যেমন ভোগ করেন, কীটকুলও তেমনি করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি ও দ্বেষজন্য সুখদুঃখ বা জরামরণ ক্লেশ—এ সকল দেবরাজ ইন্দ্রেরও যে প্রকার,

সাধারণ কীটজাতিরও সেইরূপই। শাস্ত্রসমাধের পাপপুণ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি এবং অতীত ও ভবিষ্য ঘটনার জ্ঞান, এই সকল ব্যতীত অন্যান্য-বিষয়ক জ্ঞান—শৃগাল, সর্প, নকুলাদি জীব ও অন্য মনুষ্য সাধারণ সকলেরই সমান। প্রস্তরাদি স্থাবর জীব সুষুপ্তি-দশাবস্থ পাদপের সত্তাও নিজ সত্তামাত্র অনুভব করে। হিমাচল ও সুমেরুপ্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ পর্ব্বতবৃন্দ অখণ্ড চিদাকাশের অনুভব করিতে করিতেই সমাধিতে অবস্থিত। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, বৃক্ষাদি-দৃষ্টিতে এই জগৎকল্পনার অনুভবই হয় না; কেন না, ঐ বৃক্ষাদি প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। তাহাদের অনুভবশক্তি অণুমাত্রও নাই। পর্ব্বতাদি জীবজাতির অনুভবে এই জগৎ-কল্পনার প্রত্যয়ই হয় না; কেন না, তাহারা নিজের সত্তামাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না। জঙ্গম জাতির মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ আছেন। এই জগৎকল্পনার অনুভব তাঁহাদের দৃষ্টিতে হয় না; কেন না, মাত্র চিদাকাশেরই তাঁহারা অনুভব করিতে থাকেন। কেবল কতিপয় জঙ্গম জীব আছে। তাহাদের দ্বারাই এই জগৎকল্পনার অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু তাহাতে জগৎসত্তা যথাযথ প্রমাণ করা যায় না। এতাবতা বুঝিবে, শৈলাদির সত্তা, বৃক্ষাদির সত্তা বা জগৎসত্তা সকলই সেই একমাত্র অখণ্ড চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। ইহাতে দ্বৈতভাবের লেশমাত্রও নাই। যে পর্য্যন্ত না নিজ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই পর্য্যন্তই জগৎ; পরন্তু যখন তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আমি, তুমি, সত্তা, অসত্তা, কিছুরই আর ভেদভিন্নতা থাকে না। একমাত্র সচ্চিদাকাশই অজ্ঞ লোক-সমীপে স্বপ্নবৎ জগদ্‌বৈচিত্র্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। চিদাকাশের অবস্থান্তর কিছুই ঘটিতেছে না। উহা সৃষ্টির প্রাক্‌কালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে; আবার ভবিষ্যতেও এই একইরূপে থাকিবে। ইহাতে না আত্মত্ব, না পরত্ব, না জগত্ত্ব, না শূন্যত্ব, না মৌনিত্ব, না মৌনত্ব, কিছুই নাই। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক। আমিও যেমন আছি, তেমনি থাকি। কেন না, শান্ত পরমাকাশ; তাহাতে সুখাসুখ নাই। স্বপ্নদশায় যে নগর পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে পরমাকাশত্ব বৈ আর কি আছে বল দেখি? পরিদৃষ্ট স্বপ্ননগর পরমাকাশই। জানিবে,—অজ্ঞানই ঐরূপ

ভ্রমের উৎপাদক। যদি পরমাকাশের স্বরূপ জ্ঞান হয়, তবে আর এ ভ্রান্তি থাকিবার নয়। এই জগৎস্বপ্নের স্বরূপ পরিজ্ঞানে যখন ইহার সত্যতা-সমুপলব্ধি কিছুই হয় না, তখন উহার প্রতি এত আগ্রহ করিবার কি আছে? বন্ধ্যানন্দনের প্রতি স্নেহাকর্ষণ কি প্রকার? স্বপ্নকালে এই জগৎস্বপ্ন প্রতি পরমাণুতে হওয়াই সম্ভবপর? জাগ্রদবস্থায় কিছুই তো ইহার থাকিবার নয়; সুতরাং এতৎপ্রতি আর আস্থাবন্ধন কি? এইরূপ যদি একটা আপত্তি উত্থাপন হয় যে, প্রবোধসময়ে এই জগৎ-স্বপ্ন অসৎ হইয়া যাউক, স্বপ্নসময়ে ইহা সত্য হইবার পক্ষে ক্ষতি কি আছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বপ্ন এবং প্রবোধ, এই উভয়েরই অসদ্ভাব; সুতরাং স্বপ্নকালে ঐ জগদ্ভাব দর্শন অজ্ঞতা বৈ আর কি? ফল কথা, স্বপ্ন এবং প্রবোধ, এইরূপ প্রভেদ কল্পনাই মিথ্যা; সুতরাং স্বপ্নে সত্য আর প্রবোধে মিথ্যা, এ আবার কিরূপ কথা? সমস্তই এক মাত্র সম চিদাকাশ। জলের তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে তরঙ্গাবলী ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু জলের কোনই অনিষ্ট হয় না, এইরূপ দেহে দেহে আঘাত লাগে, তাহাতে দেহ নষ্ট হয়; কিন্তু চিদাত্মার তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই। চিদাকাশে যে 'অহ'মিত্যাকার ভ্রম হয়, সেই ভ্রম-জ্ঞানই দেহ; এই দেহ যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাতে চিতের কি কিছু নষ্ট হইয়া থাকে? প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এই জগৎকে চিদাকাশেরই স্বপ্ন বলিয়া বুঝেন। ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতসম্পর্ক বস্তুতই উহাতে কিছুমাত্র নাই। কাজেই এই জগৎ যে একটা স্বপ্ন, এইরূপই তুমি ধারণা কর স্বষ্টির আদিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবিষ্ট চিৎ স্বস্ব সংস্কার বাসনার অনুগুণে ক্ষিত্যাদি বস্তু উপলব্ধি করিয়া থাকে। সেই উপলব্ধি স্বপ্নের ন্যায়ই হয়। কাজেই ক্ষিত্যাদি পদার্থে ও স্বপ্ন পদার্থে যে সত্যতা ভ্রম, তাহা কেবল কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। এই যে জগৎস্বপ্ন অনাদি প্রবাহরূপে চলিয়াছে, ইহা যদিও সম্পূর্ণরূপেই অসত্য, তথাচ মূঢ়জনগণ ইহাকে সত্য বলিয়াই বুঝে। এই জগৎস্বপ্ন একটা ভ্রম মাত্র; এ ভ্রম মিথ্যা হইলেও অজ্ঞ জনের দর্শনে একান্তই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই সত্য, তাহা অতীব স্বচ্ছ সুনির্ম্মল। জড়তা আসিয়া তাহাকে কখন কলুষিত

করিতে পারে না। তিনিই অনন্ত বিস্তৃত চিদ্‌ব্রহ্ম; তিনিই বস্তুতঃ একমাত্র বিদ্যমান। ক্ষিতিপ্রভৃতিনামীয় কোন সত্য বস্তুই কোন কালে ছিল না; কাজেই তাহার স্মরণকর্ত্তা বা বিস্মরণকর্ত্তা কে কিরূপে হইবার সম্ভাবনা? যাহা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, তাহার অপরিজ্ঞানহেতুই জগতের প্রতি সত্যতা বোধ সুদৃঢ় হইয়া উঠে। পরন্তু যখন চিৎস্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন ভ্রমরূপ কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। যখন অজ্ঞানের বাধঘটনা হয়, তখন চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। সে কালে ক্ষিতিপ্রভৃতির সত্তা কোন প্রকারেই সম্ভাব্যমান হয় না। তখন কি দ্রষ্টা, কি দৃশ্য, সকলই একমাত্র শিবস্বরূপ হইয়া যায়। বাহিরে যদি বস্তু থাকে, তবে তদভিমুখস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বপাত হয়; কিন্তু এই যে জগৎ, ইহা চিৎস্বরূপ দর্পণে আপনা হইতেই প্রতিবিম্বাকারে নিপতিত হইয়া থাকে। দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা যেমন ধরিয়া দেখিতে গেলে থাকে না, তেমনি এই চিদাকাশের প্রতিবিম্ব—বিশ্বকেও দেখিতে যাও, কিছুই থাকিবে না। যদি শাস্ত্র-বিচারে প্রমাণ দ্বারা দেখা যায়, তবে একমাত্র চিৎই যে পরমার্থ সত্য, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহা ছাড়া এই ভ্রান্তপ্রত্যয় জগৎ কোন কালেই হয় নাই। অতএব ইহাকে সৎ বলা যাইবে কিরূপে? যদি সৎই না হয়, তবে আমাদের এ জগতে ব্যবহার চলিতেছে কিরূপে? ইহার কারণ প্রদর্শনস্থলে বলা যায়, যাহা ভ্রমাত্মক কার্য্য, কোন কোন স্থানে তাহা যথার্থ কার্য্যকারী হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত-স্থলে স্বপ্নে কামিনী-সম্ভোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, ঐরূপ সম্ভোগ বাস্তবিক মিথ্যা; তথাচ প্রত্যয়ক্ষণে প্রকৃত শুক্রক্ষরণাদির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। ফলে কি 'তুমি' কি 'আমি' ইত্যাদি দৃশ্যদশা কিছুই কিছু নহে।

রামচন্দ্র! উল্লিখিত জ্ঞানযুক্তিবলে তুমি চৈতন্যস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহ। সুতরাং তোমার দেহনাশে পুনরায় যদি উৎপত্তি হয়, তাহাতে তোমার ক্ষতি কিছুই নাই; আর যদি একেবারেই মুক্তি হয়, তাহা হইলে তো শান্তিই হইল। ফলে যে দিক্ দিয়াই দেখ, কোন দিকেই তোমার দুঃখকারণ নাই। তবে মূঢ় লোকেরা যে জনন-মরণে দুঃখানুভব করে, তাহার কারণ তাহাদেরই পরিজ্ঞেয়; আমাদের তাহা

[illegible]। যে জন মৃগতৃষ্ণাজলের মীন হয়, মরীচিকা-নদীর তরঙ্গান্দোলন কি প্রকার, তাহা সেই জনেরই জানা আছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিদিত আছেন,—অন্তরে বাহিরে একমাত্র চিদাকাশই বিদ্যমান। চিদাকাশই চিদাকাশ হইয়া 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি সর্ব্বস্বরূপে অথচ একইরূপে স্ফুরিত হইতেছেন। চিদাকাশময় আত্মাই সঙ্কল্পিত শাখা প্রশাখাদি লইয়া দেহ-দ্রুমরূপে প্রতিভাত হয়, এই যেমন দৃষ্টান্ত, 'তুমি' 'আমি' বা 'জগৎ' এই এই প্রকার ভাব সমষ্টিও সেইরূপই।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি আরও একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বিদিত হইয়া তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিন্। এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, যে পর্য্যন্ত বাঁচিতে হইবে, সুখেই কাল কাটাইয়া দিবে। মৃত্যু তো আর দৃষ্টিগোচর হইবে না; সুতরাং তাহার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ক্লেশানুভব করিলে কি হইবে? মৃত্যু হইল তো সবই ফুরাইয়া গেল। মরণান্তে আর তো আসার সম্ভাবনা নাই। দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলে সে দেহের সমাগম আর কোথা হইতে হইবে? এইরূপ মতবাদীদিগের দুঃখোপশম হইবার উপায় কি আছে? তাহারা যে মত প্রচার করে, তাহা তো সমগ্র আস্তিকসমাজের পরিপন্থী অথচ আপনি ঐ প্রকার মতকে সত্য বলিলেন কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! উল্লিখিত মত সত্য হওয়া বড় একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ সম্বিৎ অন্তরে যেরূপ নিশ্চয়বতী হয়, অনুভবও তাহার অবিকল তদনুরূপই হইয়া থাকে। ইহা তো সার্ব্বত্রিক প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রকৃত কথা, এই যে বহিরাকাশ আছে, ইহা যেরূপ সর্ব্বগত ও শান্ত, সেই চিদাকাশও তেমনি সর্ব্বব্যাপক। কি চার্ব্বাকাদির কল্পিত দেহাত্মবাদ দ্বৈত, কি বেদান্তবাদী কোবিদকুলের অনুভবসিদ্ধ ঐক্য,

উভয়ই সেই চিদাকাশমাত্র। তদ্ভিন্ন আর কিছুই সম্ভব নহে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ মহাপ্রলয়াবস্থা, তাহাতেও ঐ চিদাকাশ বৈ আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। চিদাকাশের কারণ কেহই নাই; উহা বিশাল ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই বিরাজিত। যাহারা এ সকল কথা গ্রাহ্য করে না, বেদের বাণী অমান্য করে, মহাপ্রলয়াদির নিয়ম মানে না, তাহারা নিতান্তই মূঢ়; শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত মূঢ়গণ আমাদের নিকট মৃত বলিয়াই অবধারিত। তাই তাঁহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ প্রদানে আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা তাহাদিগকে উপদেশ পাইবার যোগ্য বলিয়াই মনে করি না। যাহাদের মন প্রত্যগাত্মচৈতন্য-ভাবাপন্ন হইয়া সকলই ব্রহ্মবোধে পূর্ণকাম ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে কোন প্রকার উপদেশ দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পুরুষের মানসে যাদৃশ অনুভবের আবির্ভাব হয়, পুরুষ অবিকল সেইরূপই হইয়া উঠে। দেহ থাকুক আর যাউক, ক্ষতি কিছুই নাই। ফলে চার্ব্বাকাভিমত দেহাত্মবাদে ঐ প্রকার সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক অনুভবই কারণ; দেহকে কারণ বলা হয় না। এই নিমিত্তই বলা যায়, আত্মা যদিও আনন্দময়, তথাচ তথাবিধ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা অনুভূতিবলে পুরুষ দুঃখানুভব করে। দৃঢ় ভাবনার প্রাবল্যে জীব তন্ময় হইয়া গেলেই আত্মস্বভাব-বিরোধী দুঃখাদি জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই দুঃখময় জগৎ; ইহাকে যদি নিরতিশয় আনন্দময় চিৎস্বরূপে ভাবিতে পারা যায়, তাহা হইলে তথাবিধ দেহাত্মবাদীদিগেরও উদ্ধারসাধন অসম্ভব নহে। যিনি কূটস্থ অদ্বয় চিদাকাশ, তাঁহাকে ভাবনা করিতে করিতে তাহারা যখন সেই চিদাকাশময় হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের দুঃখানুভব আর কিরূপে সম্ভবপর? তাহারা তো তখন আনন্দময়রূপেই পরিণত হইবে। যাহারা একনিষ্ঠ ভাবনা করিতে করিতে চিদাকাশকেই দৃঢ় নিশ্চয়রূপে অনুভব-গোচর করিয়াছেন, আকাশে যেমন ধূলিজাল লিপ্ত হয় না, তেমনি তাঁহাদের অন্তরেও সুখ বা দুঃখ কিছুই লগ্ন হয় না। অনুভূতি সত্য বা অসত্য, যাহাই হউক, আপাততঃ যে একটা নিশ্চয়, তাহাই তো সত্য বা অসত্য এই উভয়ানুভবের কারণ হইতে পারে। যে, যে পদেই থাকুক,

অনুভব সকলেরই একটা না একটা হয়। চার্ব্বাকাভিমত দেহ, সাংখ্যানুমোদিত পুরুষ এবং মীমাংসকমতের ভোক্তা জীব, এই সকলকে উল্লিখিত অনুভব হইতে যদি পৃথক্‌রূপে নিরূপিত করা যায়, তবে আর কিছুই থাকিবার নয়। এই নিমিত্তই বলা যায়, অনুভবই সর্ব্বকল্পনাস্থল; অনুভবই সকল এবং অনুভবই এ জগতের অনুভাবক। যে অনুভবে জগৎ-সত্তা নিশ্চিত হয়, তাহা সত্য বা অসত্য যাহাই হউক, তাহা দ্বারাই স্বপ্নে আকাশ, পাতাল, জল, স্বর্গ, সর্ব্বত্রই স্বকল্পনানুরূপ দেহেরও প্রত্যয় হয়। উক্ত প্রত্যয়জ্ঞান সত্য বা অসত্য যাহাই হউক, পুরুষও সেই জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ হয় নিশ্চিতই। ঐ জ্ঞান নিশ্চয় হইয়া গেলে তখন তাহা সত্যরূপেই নিশ্চিত হইয়া উঠে। এই অনুভূতি-নিশ্চয়ের উপরই নির্ভর করিয়া আমি সমস্ত মতের সত্যতার সমর্থন করিয়াছি। একমাত্র অনুভবজ্ঞানই আমার মতে সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার। চৈতন্যে যে অবিদ্যা আছে, তাহাই নানা সম্প্রদায়ের নানা অনুভবরূপে পর্য্যবসিত। ঐ অবিদ্যা যখন বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণতি পায়, তখন উহা বিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষ-ফলেরই ভাজন হইয়া পড়ে। পুণ্য দেশে পুণ্যকালে স্নানদানাদি, যথাকালে মণি-মন্ত্র ও ঔষধাদির ব্যবহার এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ করিলে উল্লিখিত অবিদ্যার ঘনত্ব কিঞ্চিৎ অপগত হয়। এইরূপ হইলে তখন যে বিশুদ্ধ সম্বিদের আবির্ভাব হয়, সে সম্বিদ্ কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উক্ত অবিদ্যা ক্ষীণ হইবার পর যদি ক্ষণমধ্যেই পুনর্ব্বার প্রকট হয়, তবে জীবের দুঃখোপশম কোনরূপেই আর ঘটে না। মানবদিগের অবিদ্যাবিষ্ট চৈতন্যই জীব; সেই জীব যখন দৃঢ় ভাবনার প্রাবল্যে সুস্থ হইয়া উঠে, তখনই সে নিশ্চয় সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ আত্মচৈতন্য, তাহাকে বাস্তব পক্ষে বিদিত হইতে পারিলে, ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তত্ত্ববেদিগণের যে তথাবিধ বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞান, তাহাই ভবোচ্ছেদের অদ্বিতীয় উপায়। উক্ত জ্ঞান যদি না হয়, তাহা হইলে শিলার ন্যায় জড়ভাব ও অন্ধভাব চিরকালই পুরুষের থাকিয়া যায়। নিদ্রাকালে যেমন মাত্র জড়তারই অনুভব হয়, তেমনি পুরুষ স্বপ্রকাশ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ

হইয়াও ঐরূপ নিজ স্বরূপের অজ্ঞানবশেই এই বাহ্য প্রপঞ্চের অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত স্বস্বরূপের না বিকাশ হয়; ততদিন উহার অজ্ঞানান্ধতাই অবশিষ্ট থাকে; তদ্ব্যতীত আর কিছুই থাকিবার নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এই অপার অনন্ত সংসার; ইহার কখনও ক্ষয় নাই। ইহা সর্ব্বকালের জন্যই সত্য। এইরূপ ভাবনার প্রভাবে যে ব্যক্তি জগতের উপর নশ্বরত্ব বুদ্ধি রাখে না, ইহা অবিনশ্বর বলিয়াই মনে করে, এ জগৎ যে বিজ্ঞানঘন চৈতন্যমাত্র, তাহা বুঝিতে পারে না; এই যথাবস্থ জগৎকেই কেবল দেখে; তথাবিধ মোহান্ধ জীবের দুঃখনাশোপায় কি আছে! যাহা আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। আপনি আমার সে সন্দেহ নিরস্ত করিয়া জ্ঞান বর্দ্ধন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই প্রকার নাস্তিকের কথা প্রথমেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল নাস্তিকদিগের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। ইহারা পাষণ্ড, তাই ইহাদের কথা বলিতে বা শুনিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। এই মাত্র বলিতে পারি, যদি বহু আয়াস স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। যদি মতিগতির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে উহাদের উদ্ধার না হইবার তো কারণ কিছুই দেখি না। উহারা যাহাতে সুপথে আসিতে পারে, তাহার উপায় আছে। সে উপায় আমি বলি, শ্রবণ কর।

হে পুরুষপ্রবর! তুমি যাহার দুঃখনাশের কথা জানিতে চাহিলে, সে মানবের মতে আত্মা কি দেহাতিরিক্ত চৈতন্য? অথবা আতিবাহিক দেহ, স্থূল দেহ, বিশুদ্ধ সম্বিৎ বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিৎকেই সে আত্মা নামে অভিহিত করিয়া থাকে? কিম্বা তাহার মতে সম্বিদের কথা একেবারেই কি অলীক? যদি দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই তন্মতে আত্মা হয়, তবে তো আপনাকেই সে চৈতন্যরূপে অনুভব করিতে পারে। কেন না মৃত্যুর পর যখন দেহাদি উপাধির বিলয় হইবে, তখন তো সে পরমাত্ম সহ এক হইয়াই যাইবে। অন্ততপক্ষে সে কালে অনুভব হইবারই কথা। আর যদি অমরসময় বিনশ্বর দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তবে

স্বনাশশঙ্কায় দুঃখ তাহার হইবেই হইবে। কিন্তু যাহা অবিনশ্বর চৈতন্য, তাহাকে আত্মা বলিলে ঐ দুঃখ আর হইবে না। এইরূপ ক্রমে যদি বুঝাইতে পারা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ নাস্তিকও আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। যদি তাহার মতে স্থূল শরীরই আত্মা বলিয়া অবধারিত হয়, তবে তাহাকে বুঝান উচিত যে, স্থূল শরীর মাত্রই অবয়বসম্পন্ন; সুতরাং যাহার অবয়ব আছে, তাহার তো বিনাশ অবশ্যই ঘটে। কিন্তু যিনি আত্মা, তাঁহার তো বিনাশ নাই। যদি এই প্রকার বুঝান যায়, তাহা হইলে আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তাহা আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে। তুমি যাহার দুঃখনাশের উপায় জিজ্ঞাসিলে, তাহার মতে যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা হয়, তবে তো সে জীবন্মুক্ত পুরুষ, সে পুরুষ সতত লীলাসংহকারে জগদ্দর্শন করিয়া পরে বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। এ সংসার সে আর অবলোকন করিবে না। অপিচ যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্যই তাহার মতে আত্মা হন, তবে তো তাহাকে চির দিন সংসারী হইয়াই থাকিতে হইবে। কেন না, অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্য যদি জ্ঞানজলে প্রক্ষালিত না হন, তবে আর সংসারমোচন হইবার নহে। তবে কথা এই, সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি কদাচিৎ তাহার জ্ঞান সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তখন তাহার মোক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। রাম! তোমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্বিদের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করে, তবে তো তাহাকে মানুষপর্য্যায়েই গণ্য করা যাইবে না; সে তো দেখিতেছি, অচেতন পাষাণপ্রায় জড় বস্তুমাত্র। তথাবিধ মূর্খ আমরণ ঐরূপ ধারণা লইয়াই কাল কর্ত্তন করে। অনন্তর যখন তাহার দেহাবসান ঘটে, তৎপরে সে সম্পূর্ণরূপেই সুষুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। সুখদুঃখ কোন জ্ঞানই তাহার তখন থাকে না। তাহার পক্ষে সেই মৃত্যুই তখন শ্রেয়স্কর হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের মতে সবই শূন্য; আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য; এরূপ দৃঢ় নিশ্চয়শালীদিগের পক্ষে শুদ্ধ চৈতন্য লাভ অসম্ভব। তাহারা দেহাবসানে জড়ভাবাপন্ন হয় এবং অসূর্য্যনামা অন্ধতমসাবৃত লোকে বাস করে। যাহারা এ জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণিক জ্ঞানময় বলিয়া মনে করে, এ জগৎ অপরের নিকট যেরূপ সুখদুঃখময়, তাহাদের নিকটও তেমনি

হইয়া থাকে। যাহাদের জ্ঞানে এ জগৎ চিরস্থির, সুখদুঃখভোগ তাহাদেরও যেমন, ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদিগেরও সুখদুঃখভোগ সেইরূপই। জগতের স্থিরত্ব বা অস্থিরত্ব জ্ঞানভেদে সুখদুঃখের তারতম্য কিছুই হইবার নয়। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী মহৎ ব্যক্তি, তাঁহাদের বিচারে এই ক্ষিত্যাদি ভূতবৃন্দ ক্ষণিক কি অক্ষণিক, সে প্রশ্ন আদৌ উত্থিতই হয় না। তাঁহারা মনে করেন, ওরূপ আলোচনায় প্রয়োজন কিছুই নাই। তাঁহাদের জানা আছে, যিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অনন্ত চৈতন্য, এই ক্ষিত্যাদি ভূতরূপে তিনিই প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু সেই চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব কিছুতেই সম্ভাব্য নহে। ভ্রান্ত লোক ভ্রান্ত যুক্তির বলেই চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব নিশ্চয় করিয়া চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র জগতের অঙ্গীকার করে। ঐ সকল লোক মূর্খ; উহাদের সহিত আলাপ করাও অবিধেয়। চৈতন্য হইতে শরীরোৎপত্তি যাঁহারা অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানশালী; তাদৃশ জ্ঞানী সাধুগণ সর্ব্বত্রই বন্দনীয় হইয়া থাকেন। নিকৃষ্ট অজ্ঞ লোকেরাই শরীর হইতে চৈতন্যোৎপত্তির কথা বলে। কিন্তু তাহাদের কথা শ্রোতব্যই নহে। যেমন অম্বরোড্ডীয়মান মশকাদি, অথবা যেমন বৃহৎ পাত্রপূর্ণ জলবিন্দুশ্রেণী, তেমনি জীবের চৈতন্যস্বরূপ বীজসমষ্টি উর্দ্ধে, অধোভাগে এবং অন্তরালে সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সৃষ্টির উপক্রমে হিরণ্য-গর্ভরূপী চিদাভাশ বীজসমষ্টিরূপী আত্মাকে ব্যষ্টিভূত কর্তৃরূপে জ্ঞান করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ তিনি সেই ভাবে ভাবিত হন এবং আপন হৃদয়ে আপনিই নানাবিধ কর্ত্তৃস্বরূপ অনুভব করিতে করিতে নানাকারে ছড়াইয়া পড়েন এবং এই সংসাররূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। সেই হইতে চৈতন্যময় জীব যেরূপ অনুভব করে, অচিরাৎ সেই সেইরূপে উপনীত হয়, ইহা সর্ব্বত্রই অব্যভিচরিত। আকাশে ধূম ও মহার্ণবে জল যেমন বিচিত্র আবর্ত্তরূপে ঘূর্ণমান, এই সংসারও তেমনি চিদাকাশে প্রতিবৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তনশীল। স্বপ্নাবস্থায় চিদাকাশই যেমন সুপ্ত পুরুষের দৃষ্টিতে বিচিত্র পুরী হইয়া পড়ে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে উক্ত চিদাকাশই তেমনি জগৎ-আকার ধরিয়া আছে। স্বপ্নদশায় নগরাদি নির্ম্মাণ হয়; সে নির্ম্মাণের যেমন সহকারী কারণান্তর কিছুই থাকে না, তেমনি যখন

।র উপক্রম হইয়াছিল, তখন ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতসমষ্টির সাহায্য বিনাই এ জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না স্বপ্নদর্শনের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, স্বাপ্ন পুরীর অঙ্গসমূহ ততকাল অপরিপুষ্টভাবেই থাকে। যখন উত্তমরূপে স্বপ্নদর্শন হয়, তখন যেমন নগরের সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্নতা দেখা যায়, এই যে জগদাকার স্বপ্ননগর, ইহার পদার্থপর-ম্পরাও তেমনি ক্রমশঃ পুষ্টি পাইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, সকল লোকই চিদাকাশ; চিদাকাশে দ্বিত্ব একত্ব নাই। আকাশে অঞ্জন-লেপ কি প্রকার? আকাশে আকাশই বিদ্যমান। শীত সমাহ্লাদিনী চিচ্চন্দ্রিকা চতুর্দ্দিকেই চৈতন্যালোক ছড়াইয়া দিতেছে। তাহার সেই আলোকেই এ জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সৃষ্টি যখন আরব্ধ হইয়াছে, তদবধি নিরবধি আপ্রলয় কেবল শূন্যস্বভাব চিদাকাশেই এই সৃষ্টিদর্শন হইয়া আসিতেছে। ফলে চিদাকাশ ব্রহ্মাই সৃষ্টিদৃষ্টি; তদ্‌ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। যাহা ব্রহ্মাকাশ, তাহাই পরিচ্ছিন্ন জগদাকারে স্বপ্নবৎ সমুদীয়মান হইতেছে, আবার অপরিচ্ছিন্নরূপে বিলয় পাইয়া অস্ত হইয়াও যাইতেছে। সেই চৈতন্যরূপ সদ্বস্তু শ্রুতিসিদ্ধ; উহা যাহাই অনুভব করিবে, ক্ষণমধ্যে তাহাই হইয়া যাইবে। সেই সদ্বস্তুই বিদ্যমান; তদিতর কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা আছে, সকলই সেই সুবিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র। যাঁহারা পরম পদে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন, হৃদয় যাঁহাদের শুদ্ধ হইয়াছে, তথাবিধ চৈতন্যরূপী শান্ত সাধুগণ অম্বরবৎ সুনির্ম্মল ও চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্ররূপে অসৎস্বরূপ হইলেও সর্ব্বদা চিৎস্বরূপেই বিরাজমান। তাঁহারা সঙ্গদোষ বর্জ্জন করিয়াছেন, মান-মোহ-শূন্য হইয়াছেন, সেই অবস্থায় যথালব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরাময়ভাবে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অবুদ্ধিযোগেই নিখিল লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই একাদ্বয় চৈতন্যই পুরুষ ; এই জগৎরূপে ও পুরুষরূপে তিনিই মাত্র বিরাজমান। সেই চৈতন্য হইতে পৃথক্‌রূপে দেখিলে অন্য কিছুই উপলব্ধিগোচর হয় না। যাহা বিশুদ্ধাকাশ, তাহাই উক্ত চৈতন্য। এই দ্রষ্টৃভাব ও এই জগৎকেও চৈতন্যময়ই বলা হয়। সুতরাং ইহাতে হেয়োপাদেয়-জ্ঞানের সম্ভাবনা কি ? যে জন বৃহস্পতিমতের অনুসরণপূর্ব্বক ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ প্রচার করে, তাহার মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান বৈ আর কিছুই নাই। কাজেই সে মতে আসক্তি বা বিরক্তি কিছুরই বিষয় দেখা যায় না। ঐ মতসিদ্ধ বস্তুও চৈতন্যই ; তদ্ব্যতীত অন্য কোন সারবস্তুরূপে উহা স্বীকার্য্য নহে।

রঘুবর ! এই জগৎস্বপ্ন চিদাকাশময় ; ইহাতে ইষ্টানিষ্ট বা অনুরাগ-বিরাগ বিষয় কি, বল দেখি ! আমার দৃষ্টিতে তো সকলই সমাকার। ইহা হেয়, আর ইহা উপাদেয়, এইরূপ জ্ঞান—চিদাকাশই কল্পনার বশে করিতেছেন। আমার দৃষ্টিতে কিন্তু নির্ম্মল চিদাকাশই চিদাকাশে বিরাজমান। আমি দেখি, ইহাতে তো হেয়োপাদেয় জ্ঞানের বিষয় কিছুই নাই। সুর-নর-নাগাদি চরাচরাত্মক ভাবাভাব নিখিল পদার্থই সম্বিম্মাত্র। জলধির তরঙ্গশ্রেণীর ন্যায় ভেদদর্শীর নিকট সম্বিৎ পৃথক্ পৃথক্‌রূপেই প্রতীয়মান। এই যে দেখিতেছ ;—আমি আমিও সেই সম্বিদাকাশ। আমার কখনই মরণ নাই ; সম্বিদের মরণ কখন হয় কি ? সম্বিদের যে অপর একটা কিছু সম্বেদ্য আছে, তাহাও নাই। সেই সম্বিদ্ স্বয়ংই সম্বেদ্যরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। এ জগতে সম্বিদই আছেন ; তদতিরিক্ত দ্বিত্ব একত্ব কিছুমাত্রই নাই। বিচারালোচনা করিয়া দেখ, তদতিরিক্ত কুত্রাপি কিছু পাইবেও না। ঐ সম্বিদই নিত্য বস্তু ; তদ্ভিন্ন আর নিত্য বস্তু কিছু আছে কি ? উহার যদি মরণ হইত, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিতে পারিতাম কি ? সৌগত ও লোকায়তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে উক্ত সম্বিদাকাশই স্বীকার্য্য ; তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার্য্য

আছে কি? এই সম্বিদাকাশই কাহারও মতে ব্রহ্ম, কাহারও মতে জ্ঞান, কাহারও মতে শূন্য এবং কাহার কাহারও মতে গুড়তণ্ডুলযোগে মত্ততা-শক্তিবৎ পদার্থশক্তি বলিয়া অভিহিত। কেহ বলেন,—ঐ সম্বিদই পুরুষ; কেহ বলেন চিদাকাশ এবং কেহ বলেন শিবাত্মা।

এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যান করিলেও উহা যে চিন্মাত্র, সেই চিন্ময়ই থাকে; তাহার আর অন্যথা ভাব প্রাপ্তি ঘটে না। চিৎ নিজেই নিজেকে জানেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণিত হউক, কিম্বা সুমেরুবৎ সুদৃঢ়ভাবেই থাকুক, আমার তো ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই; আমি চিদাকাশরূপী। পিতামহাদি সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু চিতের মরণ নাই; তিনি মরেনও নাই। যদি তাঁহার মরণ হইত, তবে আমাদের চিৎও মরিয়া যাইতেন। তাহাতে আমাদিকেও আর জন্মিতে হইত না। অক্ষয় চিদাকাশের জন্ম-মৃত্যু নাই। বল দেখি, যাহা আকাশ, তাহার আবার ক্ষয় হইবে কি? ঐ চিৎ জগদাকারে প্রকাশমান ও অবিনশ্বর। তাঁহার অস্তোদয় নাই; তিনি আপনাতেই আপনি কেবলাকারে অবস্থিত। চিদাকাশ স্ফটিকাচলবৎ আপনাতেই জগদ্ভাব ধারণ করেন, আবার আপনিই তাহাকে দগ্ধ করেন। তাঁহার আদি অন্ত বা অবধি কখনই নাই। তিনি স্বচ্ছভাবে আপনাতেই আপনি বিরাজিত। নৈশান্ধকারে যেমন একটা মেঘমণ্ডল-প্রায় জগদাবরণ প্রতিভাত হয়, আবার যখন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, তখন সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণ চক্ষু চাহিতে না চাহিতেই নষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ এই বিশ্বও আত্মায় উদয় প্রাপ্ত হয় আবার দেখিতে দেখিতেই কোথায় বিলয় পাইয়া যায়। পুরুষ চিন্মাত্র আকাশসদৃশ; তাহার নাশ কখনই নাই। অতএব 'আমি নষ্ট হইলাম' বলিয়া শোক প্রকাশ বৃথা। তবে কি না, এই দেহের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; তা ঘটুক, সে তো সুখেরই বিষয়; কেন না, একটা পুরাতন জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অভিনব দেহেরই প্রাপ্তি হয়। অতএব হে সংসারমূঢ় জীবগণ! মৃত্যুর জন্য ভাবিতেছ কেন? সে তো তোমাদের আনন্দের বিষয়; সে আনন্দে শোক কিসের? ভাবো,—মৃত্যু হইল, মরণের পর আর জন্মিতে হইল না; ইহাও তো একটা মহান্

অভ্যুদয়। ইহাতে বিষাদের কারণ তো কিছুই দেখি না। ইহাতে ভাবাভাব জন্য পীড়া তো কৈ থাকে না। তাই বলিতেছি, সুখ কিম্বা দুঃখ এই দুইটা পদার্থ যখন কিছুতেই নাই, তখন জীবন ও মরণ তো তুল্য কথা। বস্তুতঃ ওসব কিছুই নাই; মাত্র চিদাকাশই এইরূপে বিবর্ত্তমান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত ব্যক্তির দেহলাভ তো একটা অভিনব উৎসববিশেষ। কেন না, মৃত্যুশব্দের অর্থ দেহনাশ; দেহনাশে তো পরম সুখোদয়। অত্যন্তনাশের নামই যদি মৃত্যু হয়, তবে তো তাহা আরও উত্তম। কেন না, তাহাতে সংসারব্যাধির চরম উপশমই ঘটে। আর যদি অভিনব দেহের লাভ হয়, তবে তো একটা মহোৎসব ব্যাপারই হইয়া পড়ে। অতএব মরণে ভয়ের কারণ তো কিছুই নাই। তবে কথা এই যে, কুকর্ম্মারা নরকযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। এও-তো একটা ভয়ের বিষয়। যদি সে ভয় হয়, তবে তাহা তো ইহলোকেও বিদ্যমান। ঐ ভয় যে শুধু মৃত্যুর পরই হইবে, তাহার অর্থ কি? লোকে ইহলোকে কুকর্ম্ম করিলে তাহার উপর রাজদণ্ড পতিত হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ ভয় থাকিলে কুকর্ম্মের দিকে কেহই আর অগ্রসর হইও না। কুকর্ম্মাচরণ কেহই করিও না; ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে। মরিব, মরিব, কহিতেছ; কিন্তু জন্মিব জন্মিব, এ কথা তো কহিতেছ না। দেখা উচিত—মরণের পর নূতন হইতে হইবে; সে নূতনত্বে আনন্দ আছে। ফলে জনন মরণ কৈ? জনন-মরণের আধারই বা কৈ? সর্ব্বত্রই চিদাকাশ, আকাশ—আকাশরূপেই বিদ্যমান।

রামচন্দ্র! তুমি স্বয়ং চিদাকাশস্বরূপ; সুতরাং এমনভাবে শয়নাশন ও পানাহার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাক, যেন সংসারে তোমার মমতা সঞ্চার না হয়। যিনি সাধু পুরুষ, তিনি আপনার কর্ত্তব্য পবিত্র নিত্য কর্ম্মগুলি দেশ-কালানুসারেই সমাধা করেন, যথাপ্রাপ্ত পূত ভোগ্য সামগ্রী নির্ভয়ে ভোগ করিয়া যান, দেশ ও কালবশে মাঝে মাঝে যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, সাধু অবজ্ঞার সহিত সে সমুদায়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না; তিনি স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে অবস্থান করিতে থাকেন। মৃত্যুতেও তাঁহার দুঃখবোধ হয় না, মরণেও তাঁহার সুখানুভব নাই, তিনি সুখের

আশা বা দুঃখের প্রতি দ্বেষ কিছুই করেন না; সতত বাসনাবিরহিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, জনন-মরণ তাঁহার নিকট জীর্ণ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু; তিনি ইচ্ছা ও বাসনাবর্জ্জিত হইয়া অজ্ঞ জনবৎ নির্ভয়ে—অচলবৎ স্থিরভাবে বিরাজ করিতে থাকেন।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহার আদি-অন্ত নাই; তথাবিধ পরম বস্তু পরিজ্ঞাত হইয়া জ্ঞানী পুরুষ কীদৃশ অবস্থাপন্ন হন, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষ কি প্রকার, আজীবন তাঁহার কিরূপ আচারব্যবহার, তাহা বলি, শ্রবণ কর। তথাবিধ জ্ঞানী যদি নির্জ্জন বনেও বাস করেন, তথাচ তাঁহার মনে হয়, যেন তিনি জনাকীর্ণ রম্য ভবনে বাস করিতেছেন। তিনি বনবাসে থাকিয়া পাষাণকেও মিত্র জ্ঞান করেন। বনের বৃক্ষ তাঁহার বন্ধু, বনের মৃগশাবক তাঁহার আত্মীয় স্বজন, এইরূপই তাঁহার জ্ঞান হয়। যাহা শূন্য স্থান, তাহাও তিনি জনাকীর্ণ বলিয়া মনে করেন। বিপদ্ তাঁহার নিকট সম্পদ্ বলিয়া মনে হয়। বধ-বন্ধনাদি যে কোন বিপদই উপস্থিত হউক, তাহা তাঁহার নিকট মহোৎসব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি মহারাজ্যেই থাকুন, আর মহারণ্যেই থাকুন, তাঁহার ভাবান্তর কিছুতেই হয় না। তদীয় অসমাধি-অবস্থাই মহাসমাধি, দুঃখই মহান্ সুখ, ব্যবহারদশায় অবস্থিতিই মৌনাবলম্বন এবং কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য। তিনি জাগ্রদবস্থাতেই সুষুপ্তিগত এবং জীবনসত্ত্বেই মৃতপ্রায়। যাবতীয় লোকব্যবহারই তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত হয়, অথচ তিনি কোন কিছুই সম্পাদন করেন না। তিনি রসিক অথচ অরসিক, বন্ধুবৎসল অথচ স্নেহ-বর্জ্জিত, একান্ত দয়াপরবশ অথচ নির্দ্দয় এবং তৃষ্ণাতুর অথচ তৃষ্ণা-বিরহিত। তদীয় সাধু-ব্যবহার সর্ব্বজনেরই প্রশংসিত;

পরন্তু তাঁহার মনে হয়, তিনি কিছুই করেন না; যেন নিশ্চেষ্টভাবেই রহিয়াছেন, এইরূপই তাঁহার জ্ঞান হয়। তাঁহার না আছে শোক, না আছে ভয়, না আছে ক্লেশ, অথচ তিনি যেন শোকাতুর বলিয়াই লক্ষিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভয় কেহই করে না এবং তিনিও যে কাহাকে দেখিয়া ভয় করেন, তাহা নহে। এ সংসারের রসাস্বাদ তিনি করেন অথচ তাঁহার বিশেষ ভয়ও করিয়া থাকেন। কোন প্রাপ্ত বিষয়ের তিনি অভিনন্দন করেন না এবং কোন অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্যও তাঁহার স্পৃহা নাই। যথালব্ধ বর্ত্তমান বিষয়ে যে একটা হর্ষ বা বিষাদ অনুভূয়মান হয়, তিনি তৎশূন্য হইয়াও অবস্থান করেন। কোনরূপ সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে অভিভব করিতে পারে না; সুখ-দুঃখ যাহাই ঘটুক, সকলই তিনি সমভাবে সহ্য করিয়া যান; দুঃখীর দুঃখে দুঃখী এবং সুখীর সুখে সুখী হন। যেরূপ অবস্থাই হউক, একইভাবে তাঁহার কালাতিবাহন হয়। কেবল পুণ্যকর্ম্মই তাঁহার প্রিয়; তদ্ব্যতীত কর্ম্মান্তর তিনি ভাল বাসেন না। কারণ, মহতের স্বভাবই এই যে, অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই তাঁহারা বিরত থাকেন। তাঁহার কোথাও রসিকতা প্রকাশ নাই অথচ তিনি যে কোথাও অরসিকতা করেন, তাহাও নহে। উপযাচক হইয়া কোনরূপ কার্য্য করাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। মনে মনে তিনি বীতরাগ অথচ সর্ব্বত্রই তাঁহার সরাগ-ভাবের প্রদর্শন। এ সংসারের সুখ দুঃখে তিনি স্পৃষ্ট নহেন; এই অবস্থায় শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মই কেবল তাঁহার কার্য্য। সে কার্য্যেও কোনরূপ হর্ষ বা বিষাদ ভাব তাঁহার নাই। এই সংসার-নাটকের অভিনয় প্রদর্শন-ব্যপদেশে কখন কখন তিনি সুখ-দুঃখ ভাব প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু সে ভাবটা তাঁহার অন্তরের নহে। সংসারীর অনুকরণ করিতে এক এক-বার তাঁহার সাধ হয়; তাই তিনি ঐরূপ করেন মাত্র; ফলতঃ একই স্বভাবে তাঁহার অবস্থিতি। পুত্র-পরিজন বা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য সামগ্রী, ইত্যাদি সর্ব্ব বস্তুই তত্ত্বদর্শীর নিকট জলবিম্বপ্রায়। তৎসমুদায়ের প্রতি তাঁহার স্নেহ বা আসক্তির ভাব কিছুই প্রদর্শিত হয় না। তত্ত্ববিৎ অন্তরে এইরূপ স্নেহ-বিহীন হইলেও বাহিরে প্রগাঢ় স্নেহার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তির ন্যায় বাৎসল্য ব্যবহার প্রদর্শন করেন। অজ্ঞ লোকেরা আত্মার দৈহিক সত্তা স্বীকার

করে; তাই মোহাচ্ছন্ন হইয়া একেবারে বিষয়রসে ডুবিয়া থাকে। উত্তপ্ত বৈতরণীজলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া লোকে যেমন উন্মগ্নমুখে কিয়ন্মাত্র বায়ু-স্পর্শসুখ অনুভব করে, তেমনি ঐ সকল লোকের ভাগ্যেও বিষয়ের কিয়দংশ মাত্র ভোগ হয়। পরন্তু সম্পূর্ণ বিষয় ভোগ করিয়া বিশ্রাম লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি বাহিরে সকল প্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন; অথচ অন্তরে তাঁহার সর্ব্বদাই শীতলভাব। তিনি অন্তরে অন্তরে নিয়ত বাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি-বর্জ্জিত; অথচ বাহিরে আসক্তের ন্যায় প্রতিভাত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনীন্দ্র! আপনার বর্ণিত এই যে তত্ত্ববিদের লক্ষণ, ইহা কি সত্য—না দাম্ভিকাদি লোকের কল্পিত অসত্য? ইহা নির্ণয়ের উপায় কি? অজ্ঞ দাম্ভিক লোকও তো বাহ্যক্রিয়ায় এরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুনিবর! এমন ঘটনা অপ্রত্যক্ষও নহে যে, ভণ্ড লোকে নিজেকে একটা সাধু তপস্বী বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিবার জন্য চিত্তশুদ্ধি না হইলেও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে তত্ত্বজ্ঞানীর ভান দেখাইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানীর স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, উহা সত্যই হউক বা ভণ্ডচর্য্যাই হউক, ঐরূপ ভাবই সর্ব্বথা সমীচীন, সন্দেহ নাই। ভণ্ডাচার করিয়া যদি এরূপ ভাব কেহ প্রদর্শন করে, তাহাও উত্তম; কেন না, অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ ভাবটা স্বাভাবিক হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। বস্তুতঃ তোমায় আমি যে লক্ষণ নিরূপণ করিয়া দেখাইলাম, তত্ত্বজ্ঞগণের স্বভাবানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই উহা যথাযথ বর্ণিত হইল। ভণ্ডচর্য্যার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে; তাহা আমি বলিও নাই। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সংসারে আসক্তি নাই; তাই ক্রিয়াফলেও তাঁহারা নিরাগ্রহ। তবে যে তাঁহারা সংসারাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন, তাহা কেবল বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ব্যবহারের অনুরোধেই হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতই দয়ার্দ্র; সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহাদের হাস্য বিকাশ নাই; তথাচ অজ্ঞ লোকের ব্যবহার দশায় হাস্য করিয়া থাকেন। চিত্ত-মুকুরে নিখিল দৃশ্য পদার্থই

প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁহারা ঐ সকল পদার্থকেই স্বপ্নাবস্থায় হস্তগত সুবর্ণ ও মিথ্যা কল্পিত রম্য হর্ম্ম্যের ন্যায় অসৎ বলিয়াই মনে করেন। লোকে যেমন দূর হইতেই আঘ্রাণ দ্বারা চন্দনতরুর সৌরভ বুঝিতে পারে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃশীতলতা দূর হইতে দেখিয়াই অনুমিত হয়। আর যাঁহারা জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহাদের আশয় পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারা তো দেখিবামাত্রই তত্ত্বজ্ঞানীর ঐরূপ ভাব অবগত হইতে পারেন।—ফলে সর্পের পদ সর্পেই জানিতে পারে। নিজের ঐ প্রকার ভাব দাম্ভিকেরাই লোকসমাজে দেখাইয়া বেড়ায়; পরন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী মহামনা, তাঁহারা তাহা করেন না। তাঁহারা উহা গুপ্তভাবেই রাখিয়া দেন। ভাবিয়া দেখ, সাধারণ লোকে যে দ্রব্য ক্রয় করিতে সক্ষম হয় না, সেই অনর্ঘ্য চিন্তামণি বস্তু—কেহ কি তাহার বিপণীতে বৃথা পাতাইয়া রাখে? জ্ঞানীরা নিজের গুণ প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেন কেন? কেন তাঁহারা আপন গুণ গোপন করিয়া রাখেন? ইহার তাৎপর্য্য—দাম্ভিকেরা যেমন অন্যের নিকট সুখ্যাতি-সম্মানের আশা করে, তাঁহারা তেমন আশা মোটেই পোষণ করেন না। কেন না, তাঁহাদের বিষয়-বাসনার সম্পূর্ণ অভাব।

রামচন্দ্র! অপরে অবজ্ঞা করুক, নিজে অপরের নিকট অসৎকৃত হউন, অথবা দারিদ্র্যদশা ভোগ করিতে থাকুন, তাহাতে তিনি যেমন সুখানুভব করেন, মহাসম্পত্তি লাভ করুন অথবা লোকের নিকট মহাসম্মানে সম্মানিত হউন, তাহাতেও তাঁহার তেমন সুখোদয় হয় না। তাঁহাদের যে স্বানুভবস্বরূপ জ্ঞাতজ্ঞেয়তা, তাহা তাঁহারা অপরকে দেখাইতে চাহেন না। বলিতে কি, যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি নিজেও তাহা দেখিতে সক্ষম নহেন। আমি গুণী, অন্যে আমার গুণ জানুক;—জানিয়া আমার সম্মান-সৎকার করুক, এইরূপ ইচ্ছা অভিমানীদিগেরই হইয়া থাকে। যিনি মুক্তচেতা যোগী পুরুষ, তিনি কখনই ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন না।

হে রাঘব! যদি মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করা যায়, তবে খেচরী প্রভৃতি সিদ্ধি অজ্ঞ লোকদিগেরও আয়ত্ত হইতে পারে। কি প্রাজ্ঞ, কি অজ্ঞ, যাহার যেরূপ আয়াস, সে অবশ্য সেইরূপ ফললাভেই সমর্থ। চন্দন-

সৌগন্ধ যেমন চন্দনকাষ্ঠ সহ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, তেমনি বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মফলও সর্ব্বজনহৃদয়ে সদা সন্নিহিত; পরন্তু কাল পাইলেই তাহা প্রকাশিত। অহম্ভাব, বাসনা, দ্বৈতভাব ও বাস্তব বুদ্ধি যাহার দৃশ্যপদার্থে বিদ্যমান, আকাশগতি প্রভৃতি ক্রিয়াকাল সাধনে সেই ব্যক্তিই সক্ষম। যিনি জানেন, সকলই ভ্রান্তি; কিছুই কিছু নয়—সবই শূন্য; সেই বাসনা-বর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানী ক্রিয়াফল-সাধনে সমর্থ হইবেন কিরূপে? তিনি কোন-রূপ কার্য্য বা অকার্য্য কোন কিছুতেই কোন প্রয়োজন দেখেন না। যাবতীয় ভূতগ্রামের মধ্যে কোন একটী ভূতের সহিত তিনি সম্পর্ক রাখেন না। কি পৃথ্বী, কি স্বর্গ, কি দেবস্থান, কুত্রাপি তত্ত্বজ্ঞানীর উদার মনের প্রলোভক বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না। এই সমগ্র জগৎই যাঁহার নিকট তৃণ-তুচ্ছ, তাঁহার আদরের বস্তু কি হইতে পারে? জাগতিক যাবতীয় কার্য্যই যৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, তাদৃশ পরিপূর্ণমনা মুনি যথাস্থিতভাবেই অবস্থিত এবং যথালব্ধ কর্ম্মেরই তিনি অনুসরণকারী। তাঁহার অন্তঃ-করণের শীতলতা সর্ব্বদাই আছে। তাঁহার মন—সর্ব্বদাই সত্ত্বভাবে উপনীত, তদীয় আকার—পরিপূর্ণ সাগরবৎ নিয়তই পূর্ণতাময়, আশয়—গভীরতাশালী হইয়াও প্রকটরূপ। তিনি প্রতিনিয়তই মৌনাবলম্বনে অবস্থিত। যেমন সুধাপূর্ণ হ্রদ এবং পরিপূর্ণ সুধাকর, তেমনি তিনি নিত্যই আপনাতে আনন্দধারী এবং অন্যেরও আনন্দকারী। জ্ঞানীর দ্বারা অন্যের যতদূর আনন্দ উৎপাদিত হয়, বুঝি বা পারিজাতমঞ্জরী-ময় রম্য দেবকুঞ্জেও সেরূপ আনন্দ হইতে পারে না। নিদাঘকালীন চন্দ্রমণ্ডল আর সুরভি কুসুমকাননের বসন্ত, এই উভয়ের সহিতই তত্ত্ব-জ্ঞানী তুলনীয়। যাহা রাগাদি দ্বারা অদূষিত—অক্ষত, তথাবিধ উদার অন্তঃকরণকেই তিনি সাররূপে গ্রহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞানীর ধারণা—এই ইন্দ্রজালময় বিশ্ব অসত্য ভ্রান্তিমাত্র; এইরূপ ধারণা থাকে বলিয়াই তাঁহার হৃদয় হইতে বিশ্ব-বিষয়িণী সঙ্কল্পকল্পনা দিন দিন অপসৃত হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী শীতাতপাদি-ক্লেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাই ঐ সকল তাঁহার দেহস্থ হইলেও অপরের দেহস্থ বলিয়াই মনে করেন। ফলে তাঁহার নিজের ঐ সকল কিছুই অনুভূতিগোচর হয় না। লতা যেমন

একমাত্র বৃক্ষেরই আশ্রয় লইয়া তাহা হইতেই জল পায় এবং তাহাতেই সন্তোষ লাভ করে, এই সংসারবিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানী তেমনি একমাত্র করুণোদার বৃত্তি অবলম্বনেই জীবিকা যাপন করেন। জন সাধারণ যেরূপ ব্যবহার করে, তত্ত্বজ্ঞ সেইরূপ ব্যবহার সমাধা করিলেও স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতোপরি তিনি বিরাজমান। তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধি-প্রাসাদে সমারূঢ়; তাই তাঁহার অনুশোচনার বিষয় কিছুই কুত্রাপি নাই। শৈলারূঢ় ব্যক্তির চক্ষে ভূতলচারী লোক সকল যেমন প্রতীয়মান হয়, তাঁহার দৃষ্টিতেও সমস্ত লোক সেইরূপই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এক সংসারভ্রম বিশাল সাগর; ইহার পর পারে তিনি উপনীত হইয়াছেন এবং এ সাগরের তরঙ্গতাড়না হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহার পরম বিশ্রাম লাভ হইয়াছে। এ জগতের পূর্ব্বতন অবস্থা তিনি প্রশান্তমনে আলোচনা করেন, আর অন্তরে অন্তরে উপহাস করিতে থাকেন। যে সকল লোক ভ্রমান্ধ, তাহাদিগকেও তিনি উপহাস করেন। এই অসতী সংসারদৃষ্টি দিগ্‌ভ্রমের সহিতই উপমিত; অথচ ইহাই পূর্ব্বে আমায় মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এই ভাবিয়া অন্তরে তিনি বিস্ময় বোধ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্যই আমার নিকট তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু; এই বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি উপহাস করেন; কিন্তু তাঁহার উপশান্ত-বৃত্তি বলিয়া অন্তরে তিনি গর্ব্বভাব কিছুই পোষণ করেন না। তত্ত্বজ্ঞগণের অবস্থানের কোনও একটা বিশেষ নিয়ম নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই কাল কাটাইয়া থাকেন। কেহ ভিক্ষুকের বেশে ভ্রমণ করেন, কেহ তপস্বীর বেশে নির্জ্জনে অবস্থান করেন, কেহ মৌনী বা ধ্যানী হইয়া কাল যাপন করেন, কেহ কেহ পণ্ডিত হইয়া শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতির শ্রোতৃরূপে অবস্থান করেন, কেহ রাজার বেশে অথবা কেহ ব্রাহ্মণের বেশে বাস করেন। কেহ অজ্ঞের ন্যায় অবস্থিত হন। কেহ কেহ গুটিকাদি বিষয়ে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। কেহ বা শিল্পকলায় সুনিপুণ হইয়া বাস করেন, কেহ কেহ পামরজনোচিত বেশ ধরিয়া বিরাজ করেন, কেহ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেশে বিচরণ করেন, অন্য কেহ বা আচারভ্রষ্ট যথেচ্ছা-চারী হইয়া থাকেন। কেহ এমন ভাবে ভ্রমণ করেন, দেখিলে বোধ হয়,

যেন এক উন্মত্তব্যক্তি যাইতেছে। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পরিব্রাজকের ন্যায় গতিবিধি করিয়া থাকেন। শরীরাদিকে পুরুষ বলা যায় না আবার চিত্তাদি পদার্থও পুরুষপদবাচ্য নহে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার নাশ কোন কালেই নাই। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও নিত্য, এই সকল বিশেষণ তাঁহাতেই সুসঙ্গত। তিনি সর্ব্বগামী, সনাতন, স্থাণুর ন্যায় অবিচল। এই প্রকার জ্ঞানযোগ লইয়া যে ব্যক্তি প্রবোধ পাইয়াছেন, তিনি যত্রতত্র যথেচ্ছভাবেই অবস্থান করিতে পারেন; তদীয় অবস্থিতির একটা নিয়ম-নির্দ্দেশ কিছুই নাই। তিনি পাতালে যাউন, আকাশ ভেদ করিয়া প্রয়াণ করুন, দিক্চক্রবালে বিচরণ করিতে থাকুন, কিম্বা শিলা দ্বারাই পিষ্ট হউন, তাঁহার স্বভাবের অভাব কিছুতেই নাই। তিনি অজর চৈতন্যস্বরূপ; তদীয় নাশসম্ভাবনা কোনকালেই নাই। তিনি আকাশবৎ বিশদ, শিব, শান্ত, অজ, ধ্রুব পদার্থ।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মদুক্ত ঐ চৈতন্যরূপী পুরুষ প্রত্যগাত্মার প্রকাশরূপে বিষয়াকারে সর্ব্বত্রই ভাসমান। উহঁার আদি অন্ত নাই। সুতরাং উহঁার নাশ সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? আমার মতে ঐ চিন্মাত্রই পুরুষ নামে নির্ব্বাচিত। এই পুরুষের নাশ কখনই নাই। বলিতে পার, তাঁহার নাশ আছে, এ কথার উত্তরে বলা যায়, যদি তাহাই হয়, তবে সৃষ্টির সাক্ষী না থাকায় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। একটী চৈতন্যের উৎপত্তি, তৎপরে সৃষ্টি, এইরূপ বলিলে তাহার উত্তর বাক্য এই যে, ঐরূপ বলাও সমীচীন নহে; কেন না, চিৎ এক বৈ দুই নাই। চিতের ভেদ-ভিন্নতা কাহারও মতেই স্বীকার্য্য নহে। চিতিজ্ঞান বা অনুভব নামক পদার্থ সকলের নিকটই এক। ইহা যেমন সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয় যে, হিম—শীতল, অগ্নি—উষ্ণ ও জল—মধুর, তেমনি যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্র, তিনি একই

বস্তু, ইহাই সর্ব্ব-সুধী-সম্মত। যদি বল, দেহের নাশে চিন্মাত্রেরও নাশ হইয়া যায়, তবে তো বলিব, ঐ নাশ আনন্দেরই বিষয়। কেন না, যে নাশে সংসারের ক্ষয় হয়, তাহাতে তো দুঃখ কিছুই নাই। এই কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, চার্ব্বাক ও বৈশেষিক প্রভৃতির মত এই যে, সুখ-দুঃখের অনুভবরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন চিন্মাত্র বা চিৎ-সামান্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান নাই। তাঁহারা বলেন, উক্ত বিশেষ জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে শরীরই কারণ; কাজেই জ্ঞানের কারণীভূত যে শরীর, তাহার নাশে জ্ঞানের অস্তিত্ব অসিদ্ধ। অতএব এই চার্ব্বাক-বৈশেষিকাদির মতানুসরণ করিলেও মরণে আনন্দেরই বিষয়, দুঃখের কারণ কিছুই নাই। কেন না, যাহা সুখ- দুঃখ জ্ঞান, তাহাই আমাদের মতে সংসার। পরন্তু যদি মরণেই এই জ্ঞানের অবসান হয়, তবে তো মুক্তি সহজেই হইয়া পড়িল। ইহাতে আনন্দ না হইলে আর আনন্দ কোথায়? এখন প্রকৃত কথা এই, শরীরের নাশ হইলে চিদাকাশের নাশ হয় না। কারণ শরীর যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে সেই শরীরাধিষ্ঠাতা যে পিশাচ-ভাবাদি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেকেরই অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ। শরীরের নাশ হইলে চিতিরও নাশ হইবে, ইহা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। পিশাচ দর্শন নিকৃষ্ট জীবেরই ধর্ম্ম; এ কথা বলিলে বলা যায়, নিকৃষ্ট জীব তাহার বন্ধুমরণের পরই পিশাচ দেখে কেন? সর্ব্বদাই বা দেখেন না কেন? যদি বল, পিশাচদর্শন জীব-সাধারণেরই ধর্ম্ম নহে; যাহার বন্ধুমরণ জ্ঞান থাকে, তাহারই পিশাচ দর্শন হয়। এ কথাও বলা যাইতে পারে না; কেন না, কাহারও বন্ধু বিদেশে আছে, কেহ মিথ্যা করিয়া বলিল, তোমার বন্ধু মরিয়াছে, এ ক্ষেত্রে ঐ বিদেশী ব্যক্তির বন্ধুমরণ-জ্ঞান সত্ত্বেও তাহার পিশাচ দর্শন হয় না কেন? সুতরাং এ কথা নিশ্চিতই যে, এই চৈতন্য সর্ব্বময়, ইনি কোন বস্তুকৃত পরিচ্ছেদে নিয়ন্ত্রিত নহেন। ফলে ইনি যেখানে যে যে বস্তু জ্ঞান করেন, তাহাতে আপনাকেই তত্তৎবস্তুরূপে জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহা জ্ঞেয় বস্তু, তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। সম্পূর্ণ ঘনীভূত অবাধিত চিৎ সঙ্কল্পগুণে যে যেরূপ হন, অনুভবও অবিকল সেই সেইরূপ হইয়াই দাঁড়ায়। সৃষ্টি-

ব্যাপারে চিত্তের স্বভাবই একমাত্র কারণ; তদ্ব্যতীত কারণান্তর কিছুই লক্ষিত হয় না। যদি এমন কথা হয় যে, তাঁহা ভিন্ন কারণান্তর আছে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—সেই কারণ কি, কি প্রকার? ও কিরূপে তাহা সম্ভবপর? ফল কথা, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই জগদাকার বিকল্পকল্পনা ছিল না; একমাত্র চিদাকাশই এতৎস্বরূপে ভাসমান। এই যাহা দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা সেই চৈতন্যেরই বিবর্ত্ত মাত্র। নিজের যে একটা চমৎকার চাতুরী, চিদাকাশ তাহাকেই দৃশ্যাকারে জাগ্রৎস্বপ্ন-জ্ঞানে অনুভব করিয়া থাকেন। সুষুপ্তি অবস্থায় ঐরূপ জ্ঞান থাকে না; তাই ঐ দৃশ্যবোধ তখন হয় না। এতাবতা বুঝিতে হইবে, উক্ত বোধাবোধ চিদাকাশেরই স্বরূপ। উহা চিদাকাশরূপে একই বস্তু। এ বিষয়ে বাক্যের পার্থক্য বৈ আর পার্থক্য কিছুই নাই। সুতরাং দৃশ্যভাব নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তবে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের যে দৃশ্যভাব, তাহা অবিচারণা বৈ আর কিছুই নহে। ঐ অবিচারণা তত্ত্ব-জ্ঞানের বিচারোদয়েই বিনষ্ট হয়। কাজেই কোথায় আর সে দৃশ্যভাব? আত্মজ্ঞানের বিচারবিষয়ে বুদ্ধির চেষ্টা হয়। এই চেষ্টাতেই আত্ম-জ্ঞানের উত্তম অভ্যাস হইয়া থাকে। উক্ত অভ্যাসগুণেই উভয়লোক সিদ্ধি হয়

হে সাধুশীল! তোমাদের যদি অবিদ্যোপশম ঘটেও, তথাচ অভ্যাস ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইবার নহে। যে পুরুষ শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়াছে, আলস্য-উদ্বেগাদি-বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রত্যহ প্রতিক্ষণ এই উভয় লোক-হিতজনক অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তোমরা বহু সৌভাগ্যসম্পন্ন; অথচ তোমরাই যদি একযোগে একনিষ্ঠায় আত্মজ্ঞান বিচার অভ্যাস করিতে না পার, তবে উহা জ্ঞাত হইলেও অবিজ্ঞাত হইয়াই উঠিবে। দেখ, যে যাহার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে, সে তাহা অবশ্যই পায়। তাই বলিতেছি, তোমরা অসৎশাস্ত্রের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হও; যাহা সৎশাস্ত্র, তাহারই আলোচনা কর। এইরূপ করিলে, যুদ্ধস্থল হইতে বিজয়লক্ষ্মী লাভের ন্যায় সত্বরই তোমরা শান্তি লাভ করিবে। বিবেক ও অবিবেক এই দুই দিকেই মনোরূপ নদীর

প্রবাহ ; পরন্তু যত্ন করিয়া যে দিকে প্রবাহ নিয়মিত করা যায়, সেইদিকেই স্থির হয়। এই মদ্‌বর্ণিত অধ্যাত্মশাস্ত্র অপেক্ষা কল্যাণজনক কিছুই আর নাই ; ভবিষ্যতে কিছু হইবেও না। তাই বলিতেছি, যাহা পরম বোধ, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য এই অধ্যাত্মশাস্ত্রেরই বিচারালোচনা কর। নিজে নিজে বিচার করিয়া দেখিতে পারিলেই সংসার-পথ ক্লেশহর পরম বোধ উপলব্ধ হয়। অন্যথা বর-শাপাদির ন্যায় সহসা উহা উৎপন্ন হইবার নহে। তোমার জনক-জননী বা তোমার অর্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম তোমার যে কল্যাণসাধনে সক্ষম হয় নাই, এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা কর, ইহাতে তোমার সে কল্যাণ সুসাধিত হইবে।

হে সাধো ! এই ভব-বন্ধনময়ী মহাবিসূচিকা বড়ই বিষমা ; ইহার শান্তি আত্মজ্ঞান ভিন্ন কোন ক্রমেই হইবার নহে। 'অহ'মিত্যাকর মোহ-ময়ী মায়ার প্রসাদে যে একটা দারুণ দুঃখজনক দশার উপস্থিতি হয়, শাস্ত্রার্থের ভাবনা করিতে করিতে সে দশা হইতে অচিরেই মুক্তি লাভ কর। হে সজ্জনগণ ! ক্ষুধার্ত্ত সর্পের নীরস পবনাশনের ন্যায় তোমরা পরিণাম-বিরস বিষয়সমূহের আস্বাদ লইয়া আকাশরূপিণী সংসার-মায়ায় আর আবদ্ধ রহিও না। হায় ! কি কষ্টের কথা ! তোমাদের অজ্ঞাতসারেই এই সকল বাসর চলিয়া যাইতেছে। অতএব এখন হইতে যতদিন বাঁচিবে, শুভকর্ম্মেই সেই সকল দিন কর্ত্তন কর। হে ভবভীতগণ ! শাস্ত্রা-লোচনাদি উপায়যোগে আশ্বাস লাভ করিবার সুবিধাও ঐ সকল দিন পর্য্যন্তই আছে। যখন মৃত্যুকাল আসিয়া পড়িবে, তখন তো কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। মৃত্যু উপস্থিত হইলে কষ্টের আর অবধি রহিবে না। প্রগাঢ় ভ্রমান্ধকারপূর্ণ মূঢ় লোকেরা প্রাণপাতেও সমরে ধন-মানাদি অর্জ্জন করিতে যায় ; কিন্তু তাহাদের মূঢ়তা এতই যে, তাহারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিবেক-বৈরাগ্যাদির অভ্যাস করিয়া তত্ত্ববোধশালিনী পবিত্র বুদ্ধি-যোগে অনায়াসগম্য অজর পদ অর্জ্জনের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস স্বীকার করে না। যাহারা চেষ্টা করিলেই চিদাকাশোপরি পদক্ষেপে সক্ষম হয়, তাহারা কি নিমিত্ত যে নিজ মস্তকোপরি অজ্ঞানরূপ অরির পদক্ষেপ সহ্য করে, ইহা বাস্তবিকই ধারণাতীত।

হে জনসাধারণ! তোমরা মান, মোহ, পরিত্যাগ কর, সুদৃঢ় বিবেকের আশ্রয় লও, এবং মোক্ষপথের পথিক হইয়া নিকৃষ্ট সংসার-গতি আর প্রাপ্ত হইও না। যদি বিবেকবৈভবে আত্মবোধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই নিখিল বিপদের উন্মূলন হইতে পারে। বুঝিয়া দেখ না কেন, আমি দিন-যামিনী তোমাদের জন্যই বাক্যব্যয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছি, অতএব আমি যাহা বলি, তোমরা দয়া করিয়া তাহা একবার শুন, এবং শুনিয়া যাহা দেহাদিপরিচ্ছিন্ন আত্মভাব, তাহা বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ কর। মৃত্যুরূপ অবশ্যম্ভাবিনী আপদের চিকিৎসা যে মূঢ় এখনই করিতে পারিল না, মৃত্যু যদি আসিয়া পড়ে তো, সে কি উপায় অবলম্বন করিবে? তৈলার্থীর প্রয়োজন তিল দ্বারাও যেমন সাধিত হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানার্থীর আকাঙ্ক্ষা এই গ্রন্থসাহায্যেই পূর্ণ হইয়া থাকে। এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থই আত্মজ্ঞানের পরম উপযোগী; ইহা অপেক্ষা তদ্বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নাই। প্রদীপ দ্বারা বস্তু প্রকাশের ন্যায় এই শাস্ত্র দ্বারাই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইহা পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং কান্তাজনের ন্যায় মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরের সাহায্যে যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই গ্রন্থের অনুশীলনায় সেই দুর্লভ জ্ঞান অনায়াসেই লব্ধ হয়। যে সকল তত্ত্ব-জ্ঞানোপযোগী উত্তম গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থই সে সকলের মধ্যে অত্যুত্তম। এই গ্রন্থের সহায়তায় আত্মজ্ঞান সহজেই লব্ধ হয়। অথচ এ গ্রন্থ যে নীরস কর্কশ, তাহাও নহে; ইহার সুরসতাও সুপ্রচুর। এ গ্রন্থে অতি-রঞ্জিত বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধ ঘটনাপরম্পরাই যথাযথ উল্লিখিত আছে। যে জন চিত্তবিনোদন-ব্যপদেশে এই গ্রন্থান্তর্গত অপূর্ব্ব উপাখ্যানাংশ অধ্যয়ন করে, তাহার পরমাত্মলাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয়াবসর নাই। যে সকল পণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত আছেন, আজ পর্য্যন্তও যে তত্ত্ব তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই, এই গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বিচার করিলে তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—সুবর্ণসন্নিভ সৈকতভূমির ক্ষালনে সুবর্ণ লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। বলিতে পার, এই গ্রন্থ যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার

যেরূপে জ্ঞানার্জ্জন হইয়াছিল, আমরাও সেইরূপেই জ্ঞানার্জ্জন করিব; সে জন্য এই গ্রন্থের সাহায্য লইবার আবশ্যক কিছুই নাই। এ কথার উত্তরে বলা যায়, যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সহস্র সহস্র যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থের সাহায্য লইয়াই অনেকে জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকে জ্ঞানলাভ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে, তখন আর এই গ্রন্থকর্ত্তার জ্ঞানসঞ্চয় কিরূপে হইল, তাহার সন্ধান লইবার প্রয়োজন কি? সে পথে না গেলেই বা কি? এই গ্রন্থের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম কর—করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া যাও; ইহাতে আপত্তি কি? অজ্ঞান লোক দ্বেষ বা মোহের বশেই বিচার না করিয়া এই শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাহারা আত্মঘাতী, আত্মজ্ঞান লাভের শক্তি তাহাদের কদাচ হয় না এবং সেইরূপ লোকদিগের সংসর্গে কদাচ বাস করিতেও নাই।

রামচন্দ্র! তোমার, আমার এবং এই শ্রোতৃসগুলীর গুণাগুণ কিরূপ আছে না আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; তথাচ তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই আগমন করিয়াছি। অথবা আমার যে তোমাদের নিকট আগমন, ইহা আর কিছুই নহে; আমি তোমাদেরই শুদ্ধ সচ্চিৎ আত্মা,—তোমাদিগকে উপদেশ দানে উদ্যত হইয়াছি। তদ্ব্যতীত আমি তো অন্য কেহই নহি। আমি সুর, নর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইহাদের কেহই নহি। যিনি তোমাদের জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, সেই আত্মাই আমি। এই যে তোমরা রহিয়াছ, এই তোমরাও বিশুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ, তোমাদের আত্মজ্ঞানই পুণ্যপরিপাক-বশে এই বশিষ্ঠরূপে অবস্থিত। তাহা ভিন্ন আমি তো আর কিছুই নহি। সুতরাং আমি তোমাদের পরম প্রেমাস্পদ আত্মরূপেই যাহা যাহা বলিয়া যাইতেছি, ধীরভাবে শ্রবণ কর। যে পর্য্যন্ত না তোমাদের ভীষণ মরণ-দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত বাহ্য বস্তুর প্রতি তোমরা বৈরাগ্য আনয়ন কর। জানিবে—বৈরাগ্যই সারসঞ্চয়। ঔষধ সত্ত্বেও যে নর এখানে নরকরোগের চিকিৎসা করিল না, সে পীড়িতাবস্থায় ঔষধবর্জ্জিত স্থানে গিয়া কি করিবে?—কিরূপে ঐ রোগের হাতে অব্যাহতি পাইবে?

যে পর্য্যন্ত না নিখিল বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্যোদয় হয়, এই ভবভাবনা ততদিনে ক্ষীণভাব ধারণ করিবে না। বাসনারে ক্ষীণ করিতে হইবে, নহিলে আত্মোদ্ধারের আর উপায় কিছুই নাই। যদি এই সমস্ত বাহ্য বস্তু সত্য হইত, তাহা হইলে না হয় ইহাতে বাসনা করা যাইত; কিন্তু এ সকল তো সত্য নহে; শশশৃঙ্গাদিবৎ অলীক পদার্থ। অবিচারক্রমেই ঐ সকলের সত্যত্বও মনোহারিত্ব হইয়া থাকে, আর বিচার করিয়া দেখিতে যাও, ইহার কিছুমাত্র সত্তা উপলব্ধ হইবে না; সকলই অলীক হইয়া পড়িবে। যদি প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া বিচার করা যায়, তবে এই জগদ্ভাব বাস্তবিকই যে কিছুই নয়, এইরূপই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আর সত্তা স্বীকার করিলে সে সত্তা কি প্রকার? তাহার স্বরূপ কি? ফলে আমাদের চক্ষে এই সমগ্র জগদ্ভাব আদৌ উৎপন্নই নহে। কেন না, এতদুৎপত্তির কারণ কিছুই নাই। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলই পরম পদ। ইহা সর্বেন্দ্রিয় ও মনোনামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়বৎ অতীত। সুতরাং ইহাকে এই ভাব-সমূহের কারণ বলা যাইতে পারে না; আর মনোনামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও কারণ নহে। কারণ, এই ভাবসমূহ মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াত্মকই। আর দেখ, তাঁহার কোনই আত্মা নাই। কিন্তু এই ভাবসমষ্টি নানা আখ্যায় আখ্যাত; অতএব যাহা আখ্যাবর্জ্জিত, তাহা আখ্যাসম্পন্নের কারণ হইবে কিরূপে? ফলে কার্য্য-কারণে বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে না; যেমন কার্য্য, কারণও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। জানিবে—বস্তুতে অবস্তুত্ব এবং আকাশে অনাকাশত্ব সম্ভবপর নহে। যাহা সাকার বস্তু, তাহার কারণ হইতে সাকার বস্তুই হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বটবীজের নাম উল্লেখ করা যায়। অন্যথা নিরাকার হইতে উৎপন্ন বস্তুর সাকারত্ব সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? যাহাতে আকৃতিমৎ কিয়ন্মাত্র বীজও নাই, তাহা হইতে সাকার বিশ্বের উৎপত্তি, এ অতি অযৌক্তিক কথা। প্রকৃত কথা, সেই পরম পদে কার্য্য-কারণ-ভাবের সম্পূর্ণই অভাব; তথাচ লোকে যে তাঁহার নাম নির্ব্বাচন করে, তাহা তাহাদের মূর্খতামূলক বাচালতা বৈ আর কিছুই নহে। যদি সহকারী বা নিমিত্ত কারণ না থাকে, তবে কেবল সমবায়ী কারণরূপেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার নহে। ইহা সকল

লোকেরই বোধগম্য। জগতের জ্ঞানস্বরূপে চিৎ কখনই জগতের কারণ হইতে পারে না; কেন পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—ঘটজ্ঞান কি কখন ঘটকারণ হইতে পারে? ফলে যাহা চৈতন্য, তাহাতে চৈতন্যেতর জগতের অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না।—আতপে কখন' ছায়া তিষ্ঠিতে পারে কি? পরমাণুসমষ্টি একত্র হইয়াই জগৎ হয়। ইহাই কাহার কাহারও মত; কিন্তু এ মতও সমীচীন নহে। কেন না, পরমাণু অতি সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয়; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উদ্ভব—অসম্ভব কথা। শশশৃঙ্গ অলীক বস্তু; এই যেমন, জগতের অলীকত্বও সেইরূপই। যদি পরমাণুসমষ্টির সম্মিলনে এই জগৎ নির্ম্মাণ হইত, তবে ঐ সকল পরমাণু আবার যথেচ্ছ যে কোন কালে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারিত। এই জগদঙ্গ সূক্ষ্ম ধূলিকণাসকল প্রত্যহ প্রতিদেশ ও প্রতিগৃহ হইতে যদি এক একটু করিয়া উড়িয়া যাইত, তবে তাহা কোথাও গিয়া হয় তো একত্র স্তূপীকৃত হইত, অথবা ধূলি উড়িয়া যাওয়ায় কোথাও গভীর খাত হইত; সমান-সংস্থান অবশ্য থাকিত না। নিরবয়ব পরমাণু যে কোথাও আছে, তাহাও দেখা যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, তাহা আছে, তথাচ তাহা দ্রব্যপর্য্যায়ে গণ্য হইতে পারে না। কেন? সংযোগযোগ্যতা তাহাতে নাই বলিয়া। দ্রব্যমাত্রেই সংযোগ; সংযোগ একদেশবৃত্তি বলিয়া নিরবয়বের তাহা সম্ভবপর নহে। আর এক কথা, অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমষ্টির সংযোগে যে জগৎ নির্ম্মাণ হয়, কাহাকে তাহার কর্ত্তা বলা যায়?—সংসারীকে, না অসংসারীকে? যদি সংসারী বল, তবে তাহা অসঙ্গত হয়; কেন না, তাহার সেই কর্ত্তৃত্ব-সামর্থ্য নাই। অসংসারী তো ঈশ্বর; ঈশ্বরের জগৎ-রচনাকর্ত্তৃত্বে প্রয়োজন কিছুই দেখি না; কেন না, তিনি নিত্য মুক্তস্বরূপ। এই জগৎরচনা তিনি করিতে যাইবেন কেন? তবে কি পরমাণু স্বয়ং কর্ত্তা, ইহাও বলা যায় না; কেন না, পরমাণু হইল জড় বস্তু, জড় বস্তুর ঐ প্রকার রচনাক্ষমতা অসম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, হে রামচন্দ্র! বুদ্ধিপুরঃসর কেহই এ কার্য্য করে না; বুদ্ধিপূর্ব্বক বৃথা কার্য্য বা অকার্য্য করিবার প্রবৃত্তি উন্মত্ত ব্যতীত আর কাহার হইয়া থাকে? দেখ, বায়ুর কর্ত্তৃত্বেও এ কার্য্য সম্ভবপর নহে; কেন না, বায়ু—জড়;

বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা তাহারও নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা না হইলে পরমাণু-সংযোগ হওয়াও সম্ভবপর নহে। তুমি, আমি, সে, ইত্যাদি করিয়া সকলেই আমরা চিদাত্মা; যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলই চিদাকাশ মাত্র। তথাচ, স্বপ্নে যেমন নানা লোক দেখ, তেমনি এই সকল বিভিন্নাকারে দেখিতেছ। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বের উৎপত্তিও নাই, অবস্থিতিও নাই, এক সেই নির্ম্মল চিদাকাশই আপনাতে আপনি প্রকাশমান। পবনে যেমন স্পন্দন, জলে যেমন দ্রবত্ব, আকাশে যেমন শূন্যতা, তেমনি একমাত্র চিদাকাশেই এই বিশ্বাকাশের বিশ্রাম। নিমেষ মধ্যে একদেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে মধ্যে যে সম্বিদাকার প্রতীত হয়, জানিও—তাহাই চিদাকাশের কলেবর। ফল কথা, চিদাকাশই সর্ব্বপদার্থস্বরূপ, সর্ব্ব-পদার্থই চিদাকাশময়; অতএব এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আকাশ-স্বরূপ। চিদাকাশ স্বস্বভাব হইতে পৃথক্ না হইয়া যে বিবর্ত্তমান হয়, ঐ বিবর্ত্তনই জগতের রূপ। সুতরাং জগৎ ও চিদাকাশ, এ উভয়ের কিছুই পৃথক্ত্ব নাই। পবন ও পবনস্পন্দের ন্যায় উক্ত উভয়ের রূপ একই, ভিন্নতা কিছুই নাই। মনোমধ্যে এক দেশ অনুভবের পর অন্য দেশানুভবের উদয় হইতে না হইতে সম্বিদের যে আকার ভাসমান হয়, সেই বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত আকারই চিতের মুখ্য স্বরূপ। উহাই সর্ব্বপ্রাণীর স্বভাব। হরি-হরাদি প্রধান প্রধান যোগিগণ নিয়ত উহাঁরই ধ্যান করিতে-ছেন। তাঁহারা ঐ নিত্য চিৎস্বরূপ হইতে কিয়ন্মাত্রও বিচলিত হন না। আকাশই এ বিশ্বের প্রকাশ; তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে এ বিশ্বের আকার কিছুই নাই। ইহা অব্যয় চিৎস্বভাবরূপেই অবস্থিত; তদিতর অপর কিছুই নয়। ফলে জনন-মরণ কাহারই হইতেছে না; কিম্বা হইয়া কোথাও আবার আবির্ভূত হইতেছে না। আকাশ হইতে শূন্যতা যেমন অভিন্ন—এই জগৎও তেমনি চিদাকাশ হইতে স্বতন্ত্র নহে। এই বিশ্ব বাস্তব পক্ষে নাই, পরেও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবার নয়। যাহা কিছু ভাসমান হইতেছে, সকলই চিদাকাশ; চিদাকাশই পরমাত্মায় প্রতিভাসমান। স্বপ্নে চিন্মাত্রের নগরাদি ভাব ধারণের ন্যায় জাগ্রৎ-স্বপ্নেও জগদ্ভাব ধারণ হইতেছে। এই বাহ্য বস্তুনিচয়ের সত্তা সৃষ্টির

প্রথমে ছিল না ; সুতরাং শরীরস্থিতিই বা কোথায় ? স্বয়ম্ভু-নামধেয় দেহ উল্লিখিত মহাচিত্তের আদ্য স্বপ্ন ; অনন্তর এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর-বৎ ঐ স্বয়ম্ভূ-দেহ হইতেই আমাদের আবির্ভাব। আমরা গলগণ্ডোপরি-জাত বিস্ফোটক তুল্য ; আমাদের ভ্রম অত্যধিক ; অতি বড় চেষ্টা সত্ত্বেও চিত্ত আমাদের পরব্রহ্মলীন হয় না। ব্রহ্মই অসত্য পুরুষাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া গণ্ডোপরি-জাত বিস্ফোটকবৎ সত্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম যখন হইতে জীবভাব ধারণ করিয়াছেন, তখন হইতেই এই অলীক জগতের বিশাল বিস্তৃতি হইয়াছে। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এই জগৎ অসত্য ; স্বপ্ন প্রতীত অসত্য বস্তু যেমন স্বপ্নভঙ্গে বিলয় পায়, তেমনি এই জগৎও আশু বিনশ্বর হয়। স্বপ্নে চিদাকাশই জগদ্ভাব লাভ করেন, —করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে তিনিই আবার জাগ্রৎস্বপ্নে জগদ্ভাব উপগত না হইয়াই তদ্ভাবে প্রকাশমান হন। স্বপ্নে আত্মচৈতন্যের যেমন অসত্য জগদাদিরূপে আবির্ভাব হয়, তেমনি এ জগৎ অসত্য অলীক হইলেও অনুভূতিগম্য ও সত্যবৎ প্রতিভাত। ঐ চৈতন্য পরমাণুবৎ আকাশা-পেক্ষাও সূক্ষ্ম ; তথাচ জগদ্ভাব উপগত না হইয়াও যেন সাক্ষাৎ সাকার-ভাবে বিরাজিত। প্রকৃত কথা, আকাশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতাধর্ম্ম উক্ত চৈতন্যে না থাকিলেও তাঁহাকে আকাশ হইতে সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, জগতের স্থূলভাব উহাঁতে থাকিতে পারে না। ইষ্টকাদি হইতে গৃহাদির যেমন উৎপত্তি, তেমনি জগৎ হইতেই জগদুৎপত্তি, এ কথা বলা উচিত হয় না ; কেন না, জগদাদি কিছুই সৃষ্টির আদিতে ছিল না ; কাজেই জগৎ হইতে জগতের উৎপত্তি, এ কথাও বলা যায় না। অপিচ স্বপ্নাবস্থায় ইষ্টকাদির অভাব সত্ত্বেও যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ দেখা যায়, তেমনি জাগ্রদাখ্য স্বপ্নে চিদাকাশেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। শূন্য ও আকাশের অভিন্নতার ন্যায় স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত ও চিদাকাশের ভেদ কিছুই নাই। চিদাকাশ ও স্বপ্ননগর এই উভয়ই এক, পার্থক্য কিছুই নাই। স্পন্দাস্পন্দ স্বরূপ পবন যেমন অবিকল আকাশনিভ, তেমনি চিদাকাশ জগদাকারে লক্ষিত। ফলে সমস্তই শূন্য, সমস্তই নিরালম্ব এবং সমস্তই চিদাদিত্যের দ্যুতি। তত্ত্ব-

দর্শনে জগৎপ্রভৃতি সমস্তই শান্ত—উদয়াস্ত-বর্জ্জিত; তবে কি আছেন? —আছেন মাত্র পাষাণবৎ অচল অমল চিদ্বিকাশ; উহা অনন্ত ও অনাময়। এই সকল বাহ্যভাব কিরূপে কোথা হইতে তাঁহাতে প্রকট হইবে? ভাব-বুদ্ধি, দ্বৈত, একত্ব, ভাব বা ভাবনা, এ সমুদায়ের কে কোথায়? ফলে কিছুই নাই; কিছুই কিছু নয়।

রামচন্দ্র! তুমি ব্যবহার-পরায়ণ হইলেও তোমার একত্ব-দ্বিত্ব সংখ্যা-রহিত নিত্যোদিত নির্ব্বিকার অন্তরে অতি শীতল অনাময় শুদ্ধ বোধ সহ একত্ব লাভ কর,—করিয়া নির্ব্বাণপদে অবস্থান করিতে থাক। তখন দেখিতে পাইবে, এ সকল ভাব বাস্তবিকই নাই।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! আকাশ—শব্দতন্মাত্র, আর বায়ু—স্পর্শতন্মাত্র; এই আকাশ ও বায়ুর একান্ত সংঘর্ষবশত রূপ-তন্মাত্রের উৎপত্তি। এই রূপতন্মাত্রই তেজ আখ্যায় অভিহিত। এই তেজের শান্তি হইতেই শৈত্য-দ্রবত্বের অধিগতি; সেই শীত-দ্রব-ভাবই রসতন্মাত্র বা জল। এই সমুদায়ের সমবায়ে যে গন্ধ-তন্মাত্রের উদয়, তাহার নাম পৃথিবী। এইরূপে এই জগদাকৃতির ভান চৈতন্য হইতেই হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ মূর্ত্তিবর্জ্জিত—নিরাকার, তাহা হইতে আকারোৎপত্তি কিরূপে হইল? বলিতে পার, অনুভবগুণেই কল্পনা করা হইল, অনুভবাত্মিকা জ্ঞপ্তিদেবীই আমাদের নিখিল বিরোধ-ভঞ্জিনী; অনুভবগুণেই রূপবিরহিত আকাশ হইতে বায়ুপ্রভৃতি ক্রমে রূপাদির আবির্ভাব। এ কথার উত্তর এই যে, যদি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া শেষে জ্ঞপ্তিদেবীরই শরণ লইতে হয়, তবে ঐ জ্ঞপ্তিদেবীই স্বপ্নসম্ভ্রম-বৎ জগদাকারে বিবর্ত্তমান; এ কথা বলায় দোষ কি আছে? যাঁহাতে

কোন দোষের লেশ নাই, যিনি স্বভাবতই স্বচ্ছ সুনির্ম্মল, তথাবিধ ব্রহ্ম-পদেই এ সকল বিবর্ত্তের সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া উত্তম নহে কি? অতীব নির্ম্মলা জ্ঞপ্তিদেবীই আত্মস্বরূপে প্রকাশমানা। এইপ্রকার ভানই জগৎ। যদি পরমার্থ যুক্তি লইয়া সিদ্ধান্তের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়, তবে সমস্তই যে একমাত্র ব্রহ্ম, ইহাই প্রতীত হয়! আকাশ-নগরের ন্যায় ভূত-পঞ্চকের অস্তিত্ব বাস্তবিকই কোথাও নাই। উহা নিতান্ত অসৎ হইলেও যে অনুভবগোচর হয়, সে অনুভব স্বপ্নাবস্থার অনুভবের ন্যায়ই বলা যায়। নির্ম্মল স্বভাবই জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ননগরের ন্যায় জগদাকারে প্রতিভাসমান। বাস্তবিক উহা আকাশ বৈ আর কিছুই নয়। আমি ও জগৎ, এই উভয়াকারে একমাত্র চিদাকাশই বিরাজ করিতেছে। কাজেই আমি এবং জগৎ উভয়ই একমাত্র শিলাসদৃশ ঘটাকাশই; ইহাতে অন্য কিছুই নাই। এ জগতের উৎপত্তির কথাই উত্থাপন কর, কিম্বা স্থিতি-সংহারের কথাই বল, সকলই সেই এক নিরাকার আকাশ। কত রূপে কত পরিবর্ত্তন অনুভূত হইতেছে, তথাচ চিদাকাশ সমভাবেই বিরাজমান। নির্ম্মল আত্মস্বভাবের অববোধে দুঃখহীন সুখময় অবস্থাই মোক্ষ; তুমি তথাবিধ মোক্ষই লাভ কর এবং সেইরূপ মোক্ষ পাইয়া কৃতার্থ হও।

চতুরধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! চৈতন্যস্বভাব আত্মা স্বতই স্বস্বভাবকে জগদাকারে অনুভব করেন; ঐ অনুভব স্বপ্নের ন্যায়। ফলে কিন্তু এই কল্পনাখ্য জগৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন। এই জাগ্রৎপ্রকার জগদ্ভাব-ভাবিতাবস্থাতেই সুষুপ্ত; ইহার মূলাংশ শিলাসম কঠিন এবং অধিষ্ঠানাংশে ইহা শূন্যাকাশ মাত্র। এ জগৎ কিছুই নয় অথচ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সৎ হইয়া দাঁড়ায়। স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় এই জাগ্রদ্দশায় প্রতীয়মান

জগৎও অলীক বলিয়াই অবগত হইবে। জাগ্রৎই বল, আর স্বপ্নই বল, কোন অবস্থাতেই জগৎশব্দার্থের সম্ভাবনা করা যায় না। ফলে যাহা চিদাকাশের ভাব, তাহাই জগদাকারে প্রতীয়মান। চিদাকাশ স্বয়ম্ভূ; তিনিই অবিদ্যাবৃত আত্মাকাশে শৈলাদি রূপ ধারণপূর্ব্বক আত্মবিবর্ত্ত তমোভাগকেই জাগ্রৎস্বপ্নে জগদাকারে জ্ঞান করেন। কিন্তু এ জগৎ অকিঞ্চিৎ, চিতের রূপও অকিঞ্চিৎ। এই চিদাকাশ ও জগৎ বৃথাই আভাসমান। ত্রৈলোক্য জাগ্রদবস্থায় আভাসমান; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যেমন ইহার কিছুই থাকে না, সকলই শূন্য হইয়া পড়ে, জাগ্রদ্দশাতেও তেমনি বিকারশূন্য হইয়া আছে, ইহার স্বরূপ কিছুই নাই।

হে ধীমন্! স্বপ্নাবস্থা নানা নির্ম্মাণময়ী; তাহাতে সর্ব্বারম্ভই অনারম্ভ এবং অসৎও সৎ হইয়া দাঁড়ায়। যাহা অনাকাশ, তাহাই অসীম অনন্ত আকাশ হইয়া পড়ে। ঐ আকাশ নানাকারে নানা গিরিশ্রেণীরূপে পর্য্যবসিত হয়। স্বপ্নদশায় ঘন গর্জ্জন ও সাগরের কলকলনাদ এতই মৌন হইয়া যায় যে, পার্শ্বগত নিদ্রাসক্ত ব্যক্তিও তাহার কিছুই অবগত হইতে পারে না। স্বপ্নাবস্থাতেই বন্ধ্যানন্দন উৎপন্ন হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যায়, মানুষ মরিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও বিস্মৃতিবশে মনে করে যে, আমি জন্মি নাই; একই আছি। স্বপ্নসময়ে শয়নস্থানের অননুভূতির ন্যায় সৎও অসৎ হইয়া পড়ে। রাত্রি—দিন হয় এবং দিনও রাত্রি হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে ভাবিয়া দেখ, স্বপ্নদশায় সকলই বিপরীতরূপে প্রতিভাত হয়। এমন কি, নিজের মরণ দর্শন তো একান্ত পক্ষেই অসম্ভব; সেই যাহা অসম্ভব, তাহাও স্বপ্নে সম্ভবপর হয়। আকাশে যেমন জগতের ভান হয়, তেমনি অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। উলূকাদি জীব দিবাভাগে নিদ্রার উপাসনা করে, তাহাদের নিকট আলোকই অন্ধকার হয়, আর অন্ধকারই প্রকৃষ্ট আলোক হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় যখন এইরূপ অনুভব হইতে থাকে যে, আমি গর্ত্তে পড়িতেছি, তখন পৃথিবীটাই একটা গর্ত্ত বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে যেমন অসত্য বিষয়ের প্রতিভাস হয়, জাগ্রতেও ভান তেমনি হইয়া থাকে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র ভেদই দেখি না। পূর্ব্বদিনে যে সূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল, আর অদ্য যে সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, এই উভয়

সূর্য্যই যেমন অভিন্ন, তেমনি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাই এক; স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! আপনি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাকেই এক বলিয়া বর্ণন করিলেন; কিন্তু আমার জ্ঞানে তো উহা ভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। কেন না, স্বপ্নে যাহা দেখিলাম,—স্বপ্ন ভাঙ্গিল তো তাহার বাধ হইয়া গেল; সুতরাং তাহা যে অলীক বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহাবসর কি আছে? কিন্তু জাগ্রদবস্থার কথা বলিতে গেলে, বলা যায়, এই অবস্থায় অনুভূত বিষয়ের বাধ কখনই হয় না; কাজেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ, এই উভয় অবস্থায় ঐকরূপ্য হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্নজগতে কত স্বাপ্ন জনের সহিত মৃত্যুগ্রস্ত হয়; স্বপ্ন জগতে মরিলে স্বপ্ন জীবের বিয়োগে দুঃখিতও হইয়া থাকে। অনন্তর স্বপ্নভঙ্গে সে যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে নিদ্রামুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। দ্রষ্টাকে স্বপ্নজগতে দিন-যামিনীর বিপর্য্যয়ে এইরূপে কত প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া পরে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। অনন্তর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন জগৎ হইতে তাহার মোচন ঘটিল। ঐ সময় তাহার এইরূপ জ্ঞান সঞ্চার হয় যে, এই স্বপ্ন-জগৎ অসত্য। এইরূপে স্বপ্নদর্শী নর স্বপ্নের সংসারে যেমন মরে, অমনি আবার অন্যবিধ জাগ্রৎস্বপ্ন দেখিবার তরে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর জাগ্রৎদর্শী জাগ্রৎ সংসারে মরিয়া আবার অন্যবিধ জাগ্রৎস্বপ্ন দেখিবার জন্য জন্ম লয়। জাগ্রদ্দশায় মরণাপন্ন হইয়া অন্য দশায় জন্ম গ্রহণান্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাগ্রদ্দশায় যে যে বিষয় দেখা হয়, তাহাই সত্য বলিয়া তাহার প্রতীত হয়। এইরূপে একস্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হইলে, পূর্ব্বের স্বপ্নও জাগ্রতের ন্যায় সত্যরূপে অনুভূত হয়। মুগ্ধমতি মানব এইরূপে স্বপ্নে জাগ্রদ্‌বোধ স্থাপন করে—করিয়া তাহাতেও আবার স্বপ্নান্তর অবলোকন করে; বারবার স্বপ্নান্তর ঘটনায় স্বপ্নও তাহার নিকট জাগ্রৎরূপে অনুভূত হয়। এইভাবে জাগ্রৎই বল, আর স্বপ্নই বল, কোন অবস্থাতেই জীব বাস্তব পক্ষে মরে না বা জন্মে না। এইমাত্র হয় যে, সেই সেই দেহাভিমানের পরিহারে ও গ্রহণে দ্রষ্টা মৃত ও জাতরূপে

ব্যবহৃত হইতে থাকে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নভঙ্গে প্রবুদ্ধ আর জাগ্রদবস্থায় মরিলেও—স্বপ্নে প্রবুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এইভাবে দেখিতে গেলে জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়েরই ঐকরূপ্য দেখা যায়। এক স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হওয়ায় তৎকালে দ্বিতীয় স্বপ্ন পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নাপেক্ষা বর্ত্তমানত্ব নিবন্ধন প্রকৃষ্ট দর্শন ও জাগ্রৎ আখ্যায় নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপে জাগ্রদবস্থায় মৃত্যু হইবার পর স্বপ্ন জাগ্রতের অন্তরালে প্রবুদ্ধ জনের পূর্ব্বজগতের স্বপ্ন নিশ্চয়ই হয়। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয়ই প্রাক্তন ঘটনার খ্যাপনাত্মক ও পরস্পর উপমানোমেয়-ভাবাত্মক। এই প্রকারে স্বপ্ন—জাগ্রতের ন্যায় এবং জাগ্রৎও স্বপ্নের ন্যায় হয়। প্রকৃত কথা, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই অসৎ অসত্য; একমাত্র চিদাকাশই সত্যরূপে পরিস্ফুরিত। চরাচরাত্মক সমগ্র ভূতবৃন্দের মধ্যে চিন্মাত্র ব্যতীত অন্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না। যে ভাণ্ড মৃন্ময়, তাহার মৃত্তিকা না থাকিলে যেমন কিছুই থাকে না, তেমনি চিবৈচিত্র্যরূপ কাষ্ঠ-পাষাণাদি যদি চিদ্‌বর্জ্জিত হয়, তবে আর কিছুই থাকে না। এই সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থায়ও যেমন দেখা যায়, জাগ্রদ্দশায়ও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাগ্রদ্দশায় যাদৃশ পাষাণ দর্শন হয়, স্বপ্নে পাষাণদর্শনকালে তাহার কখন অন্যথা দেখিয়াছ কি? বিজ্ঞ তুমি, বিজ্ঞের সহিত এ সম্বন্ধে একবার বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে—চিদ্‌বৈচিত্র্য বর্জ্জিত হইলে এই সমস্ত বস্তুর কিছুই থাকে না। চিদ্‌ভিন্ন হইলে, কি বলিয়াই বা ইহার নির্দ্দেশ করা যায়? বিচারে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, কেবল চিৎই বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই। স্বপ্নে যেমন, জাগ্রতেও তেমনি বা তদভিন্ন আকারই দেখিয়া থাক। অতএব জানিতে হইবে, চিন্ময় ব্রহ্মই জগদাকারে বিভক্ত; অধ্যারোপ বা অপবাদক্রমে যে দিক্‌ দিয়াই জানো,—সকলই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ম। যে ভাণ্ড মৃত্তিকাময়, তাহা যেমন মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত লব্ধ হইবার নয়, তেমনি চিন্ময় চেত্যও চিদ্‌বর্জ্জিতভাবে প্রাপ্য নহে। যেমন দ্রবরূপ জল দ্রবশূন্য নাই এবং যেমন উষ্ণরূপ বহ্নি উষ্ণতাশূন্য দেখা যায় না, তেমনি চিন্ময় চেত্যও চিদ্‌বর্জ্জিত লব্ধ হয় না। বায়ু স্পন্দময়, তাহা যেমন স্পন্দভিন্ন নাই, তেমনি চেত্য বস্তুও চিদ্‌ভিন্ন মিলে না। মৃত্তিকাময় বস্তুর মৃত্তিকা বিনা

প্রাপ্তি সম্ভবে কি? অশূন্য আকাশই বা কোথায় মিলিয়া থাকে? মূর্ত্তি-বর্জ্জিত পৃথ্বীরই বা অস্তিত্ব কোথায়? এই পরিদৃশ্যমানে ঘটপটাদি সমগ্র পদার্থই চিদাকাশময়রূপে বিরাজমান; সুতরাং স্বপ্নই বল, জাগ্রৎই বল, সর্ব্ব অবস্থাতেই সর্ব্ব পদার্থ চিদাকাশাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন।

হে সুন্দর! এই যে নগ-নগরাদি নিখিল পদার্থ দেখা যাইতেছে, এ সকল যেমন স্বপ্নে, তেমনি জাগ্রতে; উভয় অবস্থাতেই চিদাকাশ-ময়। যখন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই কল্পনার শান্তি হয়, তখন একমাত্র চিৎই অবশেষে বিরাজ করেন। ইহাতে আর বিবাদ-বিতর্কের বিষয় কি আছে?

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহাকে আপনি চিদাকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং যাহা পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হয়, সেই চিদাকাশ কীদৃশ? তাহা বিশদরূপে বর্ণন করুন। ভবদীয় উপদেশ বাক্য বহুবার শুনিতেছি, তথাপি তৃপ্তির শেষসীমায় পৌঁছিতে পারিতেছি না; যতই শুনি, শুনিবার সাধ উত্তরোত্তর প্রবল হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যেমন লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য দুইটী যমজ সন্তানের দুইটি বিভিন্ন নাম রাখা হয়, তেমনি অখণ্ড চিন্ময় স্ফটিক শিলাতলেরও দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, সেই দুইটী ভিন্ন নাম—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ; এই স্বপ্ন জাগ্রৎ উল্লিখিত শিলাতটেরই প্রতিবিম্বপ্রায়। ফলতঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন উভয়ই এক পদার্থ; দুইটী বিভিন্ন পাত্রগত দুগ্ধের ন্যায় উঁহাদের ভেদ-ভিন্নতা কিছুই নাই। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দুইটীই সেই সুনির্ম্মল চিদাকাশ; তাহা বৈ আর কিছুই নয়। একদেশ হইতে অন্যদেশে নিমেষমধ্যে গমনকালীন সম্বিদের যাদৃশ রূপ

প্রতীত হয়, তাহারই নাম চিদাকাশ। মূলদেশের সাহায্যে পার্থিব-রসাকর্ষী পাদপের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি-বিরহিত ভাব, চিদাকাশও সেই মতই স্বচ্ছ ভাব-যুত। নিখিল ইচ্ছার অপগমে যদীয় চিত্ত শান্ত হইয়াছে, তাঁহার ভাব যাদৃশ, চিদাকাশও সেইরূপই। নিদ্রার উপক্রমে মন যখন বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার যে স্বস্থ ভাব আইসে, সেই ভাবের নামই চিদাকাশ। বর্ষায় কিম্বা শরতে অভ্যুদয়প্রাপ্ত লতা-গুল্মাদির যে একটা সানন্দ ভাব হয়, সেই ভাবের নামই চিদাকাশ। যে জীবৎ পুরুষের বাহ্য রূপের মনন নাই, মন নাই, তাহার যে শারদাকাশবৎ বিষদ ভাব, সেই ভাবই চিদাকাশ। শিলা, শৈল ও কাষ্ঠাদির যে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান, সেই স্বাভাবিক অবস্থান যদি সচেতন জীবের সত্তায় পর্য্যবসিত হয়, তবে তাদৃশ স্বরূপাবস্থানের নামই চিদাকাশ বলা যায়। যাঁহা হইতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনটীর উদয় হয়, আবার যাঁহাতেই পুনরায় লয় পায়, জানিবে—তাহাই অনাময় চিদাকাশ। যাহা হইতে এই সমস্ত বিচিত্র বস্তুর উদয় ও যাঁহাতেই পরিণাম ঘটে, তাঁহারও নাম চিদাকাশ। যাঁহাতে সকল, যাঁহা হইতে সকল, যিনি সকল এবং সকল হইতে যিনি, সেই সদাসর্ব্বময় দেবই চিদাকাশাখ্যায় অভিহিত। যিনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বান্তরে, সর্ব্ব বহির্ভাগে, সর্ব্বত্রই প্রতিভাত হইতেছেন, সেই প্রকাশময় দেবই চিদা-কাশাখ্যায় ব্যাখ্যাত। দৃঢ় সূত্রে যেমন মাল্য আবদ্ধ থাকে, তেমনি যে নিত্য বস্তুতে এই সদসদাত্মক বিশ্ব গ্রথিত এবং এই বিশ্ব যদীয় অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত, তাহারই নাম চিদাকাশ। সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, যাঁহা হইতে হয়, যাঁহাতে লয় পায় এবং এই সকল প্রপঞ্চই যন্ময়, তাঁহাকেই চিদাকাশ বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হয়। সুষুপ্তি-প্রলয়রূপ নিদ্রার অবসান হইলে যাঁহা হইতে এই জগৎস্বপ্নরূপ বিশ্বের আবির্ভাব হয়, এবং বিক্ষোভশক্তির শান্তিতে যাহা শান্ত হইয়া যায়, তাঁহারই নাম চিদাকাশ। যাঁহার উন্মেষ-নিমেষে এই জগৎসত্তার প্রলয়োদয় হয়, সেই আপন অন্তরে আপনি স্থিত স্বানুভবাত্মক দেবই চিদাকাশাখ্যায় অভিহিত। তন্ন তন্নরূপে বিচার করিলে যখন সকলই 'কিছু না' হইয়া দাঁড়ায়, তখনকার যাহা অবশেষ, তাহাই চিদাকাশ। মনের একদেশ হইতে দেশান্তর গমনকালে অন্তরালে সম্বিদের

যে আকার উপলব্ধ হয়, সেই অর্দ্ধনিমেষ-লক্ষিত সম্বিদাকারই চিন্মাত্র রূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এ বিশ্ব সর্ব্বদা যে ভাবেই থাকুক, ইহা সর্ব্বদাই যে চিন্ময়, সে পক্ষে আর তর্কাবসর নাই। ইহা রূপ, আলোক ও মনো-ভাবে ভাবিত, তথাচ চিদাকারময় হইয়াই প্রতিভাত। চিদাকাশের ঈষদুন্মেষণেই এই বিচিত্র বিশ্ব যেন ভাবান্তর ধারণ করে; বাস্তবিক কিন্তু ভাবান্তর কিছুই হয় না। স্বচ্ছ সত্য চিদাকাশই অবশিষ্ট থাকেন। এ জগতের যে ভিন্নতাভ্রম, তাহা বাসনার বশেই হয়। অতএব বাসনারে তুমি বর্জ্জন কর, তদবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দ্রষ্টা হইলেও নিশ্চয়ই চিদেকঘন হইতে পারিবে। তাই বলিতেছি, বাসনাবিমুক্ত হইয়া সুষুপ্তি-ভাবে অবস্থান কর। তুমি বাসনারে বর্জ্জন করিয়া শান্তচিত্ত হও। ঐ অবস্থায় গমন, আসন, সংগ্রহণ বা কথোপকথন, যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর; সেরূপ করণে তোমার অনিষ্ট কিছুই নাই। তুমি নিয়ত চিদেকঘন ও মৌনাবস্থ হইয়া পাষাণবৎ অচলভাবে বিরাজ কর। তোমার সম্মুখস্থ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমস্ত বস্তুতঃ মরীচিকাজল বা দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ একান্তই অসম্ভব। কেন অসম্ভব? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, ইহার কারণাভাব বলিয়া আদৌ ইহা অনুৎপন্ন। দেখ, কারণ বিনা তো কার্য্যোৎপত্তি কখনই হইবার নহে। এই যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই সেই কারণহীন ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। ফল কথা, ব্রহ্ম যথাস্থিতরূপেই বিদ্যমান; তদীয় অন্যথা ভাব অসম্ভব। তবে এ সকল কি দেখায়? যাহা দেখায়, তাহা মিথ্যা; ভ্রমের বশেই কেবল উৎপন্ন বলিয়া লক্ষিত। বস্তুতঃ এ সকল যথাস্থিত-ভাবে একইরূপে অবস্থিত। যেমন একই চন্দ্রমণ্ডল, ভ্রমের বশে দুইটী বলিয়া লক্ষিত হয়, তেমনি এতৎসমস্তও একমাত্র চিদাকাশস্বরূপ হইলেও ভ্রমের প্রভাবে তদ্ব্যতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাতে যে জগদ্বুদ্ধি হয়, তাহা স্বপ্নাবলোকিত রমণীর ন্যায় অলীক হইলেও তদ্বৎ আবার কার্য্যোপযোগী হইতেছে। তাই বলিতেছি, বাস্তব পক্ষে দৃশ্যোৎপত্তি হয় নাই, হইতেছে না বা হইবেও না। ইহা যে নষ্ট হয়, তাহাও নহে; কেন না, যাহা একেবারেই নাই, তাহার আবার নাশ কি? প্রকৃত কথা এই যে, সেই পরম শান্ত চিদাকাশই স্বস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত হইয়া

স্বস্বরূপে স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক যেন জগদাকারে সমুদিত হইতেছেন। সম্মুখের কোন দৃশ্য বাস্তব বা সৎ নহে; ইহার দ্রষ্টাও কেহই নাই। ফলে দৃষ্টার্থই যখন নাই, তখন আর দ্রষ্টৃত্ব হইবে কিরূপে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য হইলে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের প্রত্যয় হয় কেন? আর এই চক্ষের সম্মুখেই বা এ সকল দেখা যাইতেছে কি? বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কোন কারণ নাই; কাজেই এ অসত্য দৃশ্যের একেবারেই অসম্ভাবনা। তবে যে ইহাকে দৃশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, সেটা প্রৌঢ়োক্তি মাত্র; স্বতঃ সম্ভবপর নহে। স্বপ্নে যে আকাশ-কানন দেখা যায়, তাহার স্থিতি আত্মচৈতন্যেই; এইরূপে চিন্মাত্রই আপনাতে জগৎস্বরূপে অবস্থিত। সৃষ্টির আদি কাল হইতে এ যাবৎ জগতের কোন উপাদান কারণ কোথাও দেখা যাইতেছে না, এরূপে কেবল ব্রহ্মই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত রহিয়াছেন। আত্মায় আপনা হইতে যে চিদাকাশের পরিস্ফুরণ, তাহাই জগদাকারের গ্রাহক। ভাবের ভাবত্ব, শূন্যের শূন্যত্ব ও আকারবানের আকারশালিত্ব যেমন, চিদাকাশের এ জগৎও সেইরূপই। পরমার্থঘন চিদাকাশই মায়ার বশে স্বয়ং এইরূপ ত্রিপুটী হইয়া অবস্থিত। ফলে মায়াত্যাগে দ্বিতীয় প্রত্যয় আর থাকে না, তখন সৎ কি অসৎ, কেহই তাহা বুঝে না, একমাত্র অনির্দ্দেশ্য পরম বস্তুই বিরাজ করিতে থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! এইরূপই যদি হয় তো এই কার্য্যকারণাদি ভেদ কিরূপে হইল? কিরূপেই বা ইহার সত্যতা ঘটিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! প্রাণীদিগের কর্ম্ম বাসনার উদ্বোধন-ক্রমে সত্যসঙ্কল্পতা বশতঃ চৈতন্যময় ঈশ্বর যেমন যেমন ভাবনা করেন, তুমিও সেই সেই রূপেই দেখিয়া থাক এবং সেই সেই রূপই তোমার অনুভূত হয়। এই কার্য্য-কারণ ভাবও চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় এতদীয় উপাদানও চিদাকাশই। ইহার যাহা নিমিত্ত কারণ, তাহার নাম মোহ। এই চিদাকাশের যখন আত্মাকাশে পরিজ্ঞান হয়, তখন ইনি মোহে মগ্ন হইয়া থাকেন। লোকে যেমন

নিদ্রাক্রান্ত হইলে মোহমগ্ন এবং নিদ্রাভঙ্গে মোহমুক্ত হয়, তেমনি ইনিও যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন মোহমুক্ত হইয়া থাকেন। ইনি কেন যে মোহগ্রস্ত হন, এরূপ অনুযোগ কেই বা ইহাঁর নিকট করিয়া থাকে? একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির অন্তরালে সম্বিদের যে আকার থাকে, তাহাই চিদাকাশাখ্যায় অভিহিত। সেই যে চিদাকাশ, তিনিই নিখিল পদার্থরূপে বিভাত। ঈশ্বর জীবভাবের কল্পনা যেমন করিলেন, অমনি জীবও নিজ অবিদ্যাবশে কার্য্য-কারণাদি ভাবের কল্পনা করিল। এই কল্পনাকর্ত্তা আত্মার উদ্দেশে এরূপ প্রশ্ন বর্ষণ কে করিবে যে, হে আত্মন্! তুমি এই প্রকার কেন কর? অপর কেহ যদি এ বিষয়ের কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা থাকিত, তবে এরূপ অনুযোগ করা যাইত যে, এ দৃশ্য কেন বা কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? বস্তুতঃ সেরূপ কর্ত্তা তো নাই; এক আত্মা আছেন, তিনিই এই সমুদায়ের কল্পনাকর্ত্তা। ফলে স্বপ্নে যেখানে নিরাভাস, নির্ম্মল, এক হইয়াও অনেকরূপী, চিদাকাশই বিরাজ করিতেছেন, সেখানে আর কোথায় ঐরূপ অনুযোগ উত্থাপনের অবসর আছে? আত্মযোনি ব্রহ্মা হইতে নিখিল সৃষ্টি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই চিন্মাত্রে প্রতীয়মান। ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে, ইহা ব্রহ্মই। অপরিজ্ঞানের ফলে ভ্রান্তি, মায়া, জগৎ, অবিদ্যা, দৃশ্য, ইত্যাদি নামে ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। বালক যেমন অসত্য বেতালকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, তেমনি চিদাকাশ হইতে অস্বতন্ত্র হইলেও চিদাকাশের বিকাশ-ঘটনায় চিৎস্বভাব একটা স্বতন্ত্র দৃশ্য পিশাচাকারে অনুভূতিগোচর হয়। স্বপ্নে কত নগ-নগরাদি সত্যরূপে দেখা যায়, এইরূপে এই জগদ্ভাবের অসত্যতা সত্ত্বেও চিদাকাশ-বশেই উহা সত্য সাবয়বাকারে উপলব্ধিগোচর হয়। স্বপ্নে যেমন নগ-নগরাদির অনুভূতি হয়, তেমনি আমি শৈল, আমি সমুদ্র, আমি বিরাট্, আমি রুদ্র, ইত্যাদি ইত্যাদি অনুভব চিৎই আকাশে করিয়া থাকেন। কোনরূপ মূর্ত্ত কারণ নাই; তাই বাস্তব পক্ষে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। বস্তুতঃ মহাপ্রলয়রূপ চিদাকাশে চিৎই এরূপে কারণ বিনা চিদাত্মায় এই নিরবয়ব চিন্ময় আকাশকে জগদাকারে অনুভূতিগোচর করিতেছেন। দর্পণ আপন অন্তরালে নানাবিধ চেতনমূর্ত্তি ধারণ করে; কিন্তু তাহা হইলেও সে তাহার

জড়ত্ব যেমন অপনয়ন করিতে পারে না, যে জড়—সেই জড়ই তাহাকে থাকিতে হয়, তেমনি সকল জন্তু সম্বন্ধেই সেই এক কথা, যে, তাহারা আপন স্বরূপ নিরূপণে অপারগতা নিবন্ধন জড় হইয়া অনর্থক জীর্ণ দশায় উপনীত হয়। তবে কথা এই, যে বিচার করিতে জানে, চিন্ময় প্রত্যগাত্মা তাহার করস্থ হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, সেই সেই বিভিন্ন স্বরূপ পরিহার-পূর্ব্বক জগৎকে মাত্র চিদাকাশরূপে ভাবনা করিতে করিতে চিদেকঘন হইয়া পাষাণবৎ অচলভাবে বিরাজ করিবে। দেহাদি মায়িক বস্তু; ইহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন একান্তই অবৈধ। জল আপনাকে স্পন্দিত করে, —করিয়া আবর্ত্ততরঙ্গাদিরূপে যেমন বিরাজ করে, তেমনি এই চিৎও আপনাতে চেতনকর্ত্তৃত্বাদির কল্পনাপুরঃসর জগদাকারে অবস্থান করেন। কল্পতরু ও চিন্তামণি এই দুইটী বস্তু যেমন ভাবনানুরূপ ইষ্টসাধন করে, তেমনি চিৎও অন্তরের যেমন ভাবনা, তদনুযায়ী ইষ্টসিদ্ধি ক্ষণমধ্যেই করিয়া দেন। চিৎ আকাশরূপিণী, তিনি আপন অভীষ্ট অতি সত্বরই সমাধা করেন। মনের একদেশ হইতে দেশান্তরে যাইবার অন্তরালে চিতের যদ্বিধ আকার থাকে, এই দৃশ্যবর্গেরও আকার সেইরূপই। কাজেই একত্ব-দ্বিত্বরূপ ভ্রম কোথায়? আকাশের নীলিমার ন্যায় অনন্তোজ্জ্বল নির্ম্মল চিৎপ্রভাই শূন্যময়ী হইয়াও জগদাকারে প্রতীয়মান। ফলে এ দৃশ্যদর্শন আর কিছুই নহে। ইহা সেই আদ্যা চিৎ, তিনিই স্বপ্নবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছেন।

ষড়ধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহা চেত্য নয়, —চিন্ময়; চারিদিকে কেবল চিদাকাশই প্রতিভাসমান, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। কি চেত্তা, কি চেতয়িতা, কি চেতন, সকলই স্বচ্ছ চিদাকার।

সুতরাং জীবন সত্ত্বেও সকলে মৃত বলিয়াই অবধারিত। সকলে ব্যবহার দশায় রহিয়াও কাষ্ঠ-পাষাণাদিবৎ ব্যাপার-বর্জ্জিত—চেষ্টা-বিরহিত। এ কথা নিঃসন্দেহ। অথবা এই যে চরাচরাত্মক নিখিল পদার্থ বিদ্যমান, এ সকলই আকাশবৎ মূর্ত্তিহীন। এই যাহা কিছু, সমস্তই আকাশ, কাচ ও কেশ-নীলিমার ন্যায় বিরাজমান। ফলে কিছুই কিছু নহে, ইহাই বটে নিশ্চয়। যাহা চিদাকাশ, তাহাতেই বা কিরূপে কোন্ বস্তু থাকা সম্ভবপর? বস্তুতঃ অত্র প্রত্যয়যোগ্য সকলই আকাশে অনুভূয়মান কেশ-গুচ্ছ, নদী, ধূম বা মুক্তাদিবৎ অলীক বস্তু। বাস্তবিক আকাশই অনুভূয়মান হয়, ইহাতে প্রকৃত পক্ষে অন্য কিছুরই অনুভব হয় না। এই যে জগদাখ্য চিদাকাশ অনুভূত হইতেছে, ইহাও শূন্য, ইহাতে আস্থা স্থাপনের বিষয় কি আছে? এই পৃথ্ব্যাদি পদার্থ ভ্রমের বশে আকাশে উদীয়মান; ইহা চিৎশক্তিরই কল্পনা—শূন্য, বৃথা অকিঞ্চিৎকর! রে অবোধ বালকদল! তোমরা কেন এই ব্যর্থ অসত্য বিষয় লইয়া 'আমি' 'আমার' করিয়া আসক্তি দেখাইতেছ? তোমাদের বালকবুদ্ধি এখনও যায় নাই, তাই বুঝি তোমাদের এরূপ আস্থা? যে বালক হয়, সে-ই বালকোচিত বিষয় লইয়া খেলিয়া বেড়ায়। ওহে মূঢ় মানবগণ! তোমরা যদি এই অসৎ পৃথ্ব্যাদি বস্তু লইয়াই থাক, তবে তোমাদের কাল বৃথাই কাটিয়া যাইবে। আকাশ জলে ক্ষালিত করিবার ন্যায় অফলোদয় কর্ম্মেই তোমরা কাল ক্ষেপণ করিবে; প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা তোমরা কিছুই অবগত হইতে পারিবে না। এই আকাশ অজাত অসত্য বস্তু, ইহাকে লইয়া যাহারা কার্য্য করে, সেই জীবন্মৃত পুরুষেরা অজাত বা মৃত সন্তান লইয়াই পালন করিতে থাকে। ফলে যাহা একান্তই অসম্ভব, তাহারা সেইরূপ কার্য্যই করিতে থাকে। এই যে পৃথ্ব্যাদি দেখা যায়, ইহা বা কি? কোথা হইতে কাহা দ্বারা কিরূপে উৎপাদিত হইল? ফলে এ সকল কিছুই কিছু নয়, একমাত্র চিদাকাশ আপনিই আপনাতে এ ভাবে প্রকাশমান। কার্য্য, কারণ, কাল, ইত্যাদির কল্পনায় চিত্ত যাহাদের চঞ্চল, তথাবিধ বালক জনের নিকটেই পৃথ্বী ভূপ্রতি সত্যরূপে শোভা পায়। তথাবিধ অনভিজ্ঞ বালকসম্প্রদায় লইয়া আমাদের কোনই প্রয়োজন দেখি না। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয়

অবস্থায় অবলোকিত জগৎই চিদাকাশময়। আত্মানুভবই যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ, সেই চিদাকাশের অবয়ব আকার-বর্জ্জিত—এবং তাহাই পৃথ্ব্যাদিরূপ দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান।

সপ্তাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! উক্ত চিদাকাশের অবিদ্যা—শূন্য-রূপিণী হইলেও লোকের নিকট অশূন্যরূপে বিরাজ করে। উহার স্বরূপ কীদৃশ? পরিমাণই বা কি? আর কত কালই বা উহার ঐরূপ ভাবে অবস্থিতি? ইহা আমাকে পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস, রাম! যেমন পরব্রহ্মের দেশ-কাল-কৃত পরিচ্ছেদ নাই, তেমনি ঐ অবিদ্যা যাহাদের নিকট বিদ্যমান, সেই সকল অজ্ঞের ধারণায় উহা দেশকালক্রমে অপরিচ্ছিন্নরূপেই প্রতিভাত। তাহাদের জ্ঞানে অবিদ্যার আদি অন্ত নাই। এ সম্বন্ধে এ স্থানে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিতেছি, মন দিয়া শুনিতে থাক। চিদাকাশের কোন এক কোণদেশে এই বর্ত্তমান জগতের ন্যায় অবিকল এক জগৎ আছে। এ জগতের ব্যবস্থা-সংস্থা যে প্রকার, সেই জগতেরও ব্যবস্থাদি সেইরূপই। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামে এক ভূভাগ আছে। তাহার কোন এক সমতল প্রদেশে তৎনিতি নামে এক পুরী; সে পুরী সেই দ্বীপের অলঙ্কাররূপিণী এবং নানা জাতীয় জীবনিবহের বিহারস্থলী। সেই পুরীর যিনি রাজা, তাঁহার নাম বিপশ্চিৎ; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নামনিরুক্তি হইয়াছিল। বিপশ্চিৎ বড়ই সভ্য ভব্য রাজা, সভাস্থলে তাঁহার পরম শোভা; লোকের নিকট তাঁহার পরম সমাদর। সরোজসঙ্কুল সরোবরে রাজহংসের, নক্ষত্রচক্রের অন্তরালে চন্দ্রমার এবং শৈলমালার মধ্যগত সুমেরুর ন্যায় সভামধ্যে তাঁহার পরম

শোভা তাঁহার গুণের ইয়ত্তা হয় না; কবিগণ তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে গিয়া পরাঙ্মুখ হন। তথাচ তিনি কবিগণের যশোমানের রক্ষক এবং কবিগণের সঙ্গ করিতে সমুৎসুক। প্রত্যহ প্রাতে যেমন বিকচ কমলকুল হইতে সৌরাতপশ্রী সমুদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি সেই রাজার প্রতিদিন বিকশিত প্রতাপসম্পদ সর্ব্বত্রই অভ্যুদিত হইত। সেই রাজা বিপ্রগণের হিতবিধাতা ছিলেন; একমাত্র অগ্নিকেই তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তিভরে পূজা করিতেন। তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে তিনি মানিতেন না। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন অনেক; তন্মধ্যে চারিজন সর্ব্বপ্রধান;—যেন চারিদিকে চারিটী মহাসাগর বিরাজমান। তাঁহারা মহাসাগরসমূহের ন্যায়ই মৎস্য, মকরব্যূহ ও আবর্ত্ত চক্রব্যূহাদি দ্বারা পরিশোভিত; গজবাজিরাজি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সৈন্যতরঙ্গ দ্বারা ভয়াবহ। সমুদ্র যেমন মর্য্যাদারক্ষক, ঐ সকল মন্ত্রীও তদ্রূপ মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর। তাঁহারা কখন অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হন না; পরের সম্মান রক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহারা চলেন। এমন সমস্ত মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বিপশ্চিৎ রাজা বাস্তবিকই অখিল লোকের আশ্রয়, বিষ্ণুচক্রের ন্যায় সর্ব্বশত্রুর অজেয় ও সর্ব্বত্র বিজয়ী ছিলেন।

একদা পূর্ব্বদিক্ হইতে এক চতুর চর আসিয়া রাজার নিকট শশব্যস্তে নিবেদন করিল,—মহারাজ! আপনি নিজ ভুজদ্রুমে পৃথিবীরূপিণী গাভীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্ব্বজয়ী, আপনিও তেমনি সর্ব্বত্র জয়শালী। যাহা হউক, অধুনা আমার মুখ্য বক্তব্য বলি, শুনিয়া আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন। রাজন্! আপনি যে মন্ত্রীর উপর পূর্ব্ব দিক্‌রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি জ্বররোগে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমার এক একবার মনে হয়, আপনি শত্রুবিজয় ভালবাসেন; তাই তাঁহাকে দিগ্‌বিজয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তিনিও যমরাজকে জয় করিবার জন্যই যেন যমালয়ে গিয়াছেন। তাঁহার মরণের পর দক্ষিণাপথ-নিযুক্ত ভবদীয় মন্ত্রী পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্ জয় করিয়া লইলেন; কিন্তু সেই দিকেরই এক দল শত্রু আসিয়া তাঁহাকে সবলে নিহত করত কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিয়াছে। দক্ষিণাপথের মন্ত্রী

এইরূপে নিহত হইলে আপনার পশ্চিমদিক্‌স্থিত মন্ত্রী আসিয়া সদলবলে পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্‌ আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিলেন; কিন্তু ঐ সময় পূর্ব্বাঞ্চলের শত্রুগণ দক্ষিণাপথের শত্রুগণসহ সম্মিলিত হইয়া মধ্য পথেই তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনিও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই চর এইরূপ বলিতেছিল, ইতি মধ্যে প্রলয়পয়োধির জলস্রোতের ন্যায় অতি সত্বর আর একজন চর তথায় আসিয়া কহিল,—দেব! রাজ্যের উত্তরাংশে আপনার যে সেনাপতি ছিলেন, শত্রুগণ তাঁহাকে সদলে তাড়াইয়া দিয়াছে; তাহাতে সেতুভঙ্গে জলপ্রবাহের ন্যায় সবেগে তিনি তাঁহার দলবল লইয়া এইদিকেই ফিরিয়া আসিতেছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা বিপশ্চিৎ দূতবাক্য শুনিলেন—শুনিয়া স্থির করিলেন, আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে। তিনি অবিলম্বে স্বীয় শোভন ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন,—ওহে আমার কর্ম্মচারিবৃন্দ! তোমরা মদীয় অধীনস্থ সামন্ত ও মন্ত্রিগণকে ত্বরায় সমরার্থ সুসজ্জিত করিয়া মৎসমীপে লইয়া আইস; আমার যে আয়ুধাগার আছে, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর; সেখান হইতে ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্র বাছিয়া আনিয়া আমায় অর্পণ কর; যোদ্ধৃগণ সকলেই স্ব স্ব গাত্রে বর্ম্মাবরণ পরিধান করুক; পদাতিবৃন্দ উপস্থিত হউক; সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া আসন্ন সমরার্থ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হউক; সেনাপতিগণ সত্বর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হউন; যুদ্ধের উদ্‌যোগ আয়োজনে যেন ত্রুটি হয় না; সত্বর চর সকল নানা দিকে প্রস্থান করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা ব্যস্ত হইয়া এইরূপে যুদ্ধের আয়োজনে আদেশ দিতেছেন; ইত্যবসরে প্রতীহারী সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণামপুরঃসর নিবেদন করিল,—দেব! আপনার যে সেনাপতি উত্তরদিক রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভবদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। মনে হইতেছে, পদ্ম যেন সূর্য্যদেবের দর্শনাশায় অবস্থান করিতেছে। রাজা কহিলেন,—প্রতীহারিন্‌! অবিলম্বে যাও, তাঁহাকে

এইখানে লইয়া আইস। কোথায় কিরূপ ব্যাপার ঘটিল না ঘটিল, তাহা ইহাঁর মুখে জানিতে পারিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজাদেশে প্রতীহারী উত্তরদিক হইতে সমাগত সেনাপতিকে রাজসমীপে লইয়া গেল। সেনাপতি রাজদর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। রাজা সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তদীয় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; মুখ দিয়া শোণিতনির্গম হইতেছে; দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস বহিতেছে; তখনও অঙ্গে তাঁহার বাণ বিদ্ধ রহিয়াছে। সেনাপতি এই অবস্থায়ও স্বীয় ধৈর্য্যগুণে বেদনাবেগ সহ্য করিয়া দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে রাজাকে কহিলেন,—দেব! তিন দিকের তিন প্রধান অধ্যক্ষই স্ব স্ব বিপুল বাহিনীসহ যমরাজ্য জয়ের জন্যই যেন যমালয়ে উপনীত হইয়াছেন। আমি একমাত্র অবশিষ্ট আছি; তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না। প্রবল শত্রু ভূপাল, ঐ দেখুন,—আমায় আক্রমণ করিবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে এই পর্য্যন্তই আসিয়াছে। আপনার রাজ্যের সর্ব্বস্থান এখন শত্রুসৈন্যে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা যে হয়, এক্ষণে আপনি করুন। আপনার অজেয় কিছু আছে, এমত বিশ্বাস আমাদের নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সমরে শস্ত্রাঘাতে দুর্ব্বলাঙ্গ বলাধ্যক্ষ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা লোক আসিয়া কহিল,—রাজেন্দ্র! ঐ দেখুন, অসংখ্য লোক আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিঞ্চিৎ বায়ুবেগে পত্রপুঞ্জের ন্যায় তাহারা হস্তমস্তকাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক আস্ফালন করিতেছে। অগণিত শত্রুসৈন্য আপনার রাজধানীর চারিদিক্ অবরুদ্ধ করিয়াছে। রাজপুরীর বহিঃস্থ স্থানগুলি লোকালোকশৈলের তটদেশবৎ বিপুল শত্রুসৈন্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের হস্তে যে সকল চক্র, গদা ও কুন্তপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আছে, তৎতাবতের প্রভায় চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, রথসকল শত্রুবর্গের অস্ত্র ও পতাকাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষোড্ডীন ত্রিপুরসমবায়ের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ঐ দেখুন, বিপক্ষ পক্ষের গজঘটা স্ব স্ব শুণ্ডাদণ্ড

উত্তোলনপূর্ব্বক আকাশে যেন মাংস-মহীরুহের কানন করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষাকালের বারিদবৃন্দের ন্যায় উহারা বৃংহণধ্বনি করিতেছে। নতোন্নত ভূভাগ দিয়া শত্রুপক্ষীয় বাজিরাজি অসম গগনে বিচরণপূর্ব্বক গভীর হ্রেষারব করিতেছে। মনে হইতেছে, কলকল্লোলনাদী সমুদ্র যেন প্রবল পবনতাড়নে গর্জ্জন করিতেছে। অশ্বগণ ফেনোদ্গিরণ করত আবর্ত্তের ন্যায় মণ্ডল গগনে তরঙ্গায়িত লবণাব্ধির ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। শত্রু-সৈন্যের অন্ত নাই। ঐ দেখুন, স্বস্ব বর্ম্ম ও শস্ত্র-সজ্জে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুসৈন্যগণ প্রলয়ের পয়োধিপ্রবাহের ন্যায় ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। উহাদের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও মুকুটাদি অলঙ্কারনিচয় আছে, তৎসমুদায়ের কান্তিচ্ছটা যেন ভবদীয় প্রতাপানলশিখাবৎ দীপ্তি পাইতেছে। মৎস্য ও মকরব্যূহান্বিত আবর্ত্তগতি সৈন্যশ্রেণী সাগর-তরঙ্গাবলীর ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। উহাদের কুন্তাদি অস্ত্রশস্ত্র সকল পরস্পর সঙ্ঘর্ষ বশতঃ আহত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে, আর ঝন্ ঝন্ রবে ক্রোধজ্বলিত হইয়াই যেন হুঙ্কার ছাড়িতেছে। হে দেব! ভবদীয় রাষ্ট্রসীমারক্ষী বলাধ্যক্ষের পদে যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমার সেই প্রভু আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ জানাইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাষ্ট্রসীমা হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধার্থ বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইয়াছেন। মহারাজ! আমিও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সম্প্রতি তাঁহারই পার্শ্বে যাই। আমার বক্তব্য সকলই বলা হইল; এক্ষণে যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই লোক রাজার নিকট এই সকল সংবাদ জানাইয়া প্রণামান্তে অতিদ্রুত প্রস্থান করিল। তৎকালে রাজভবনের সর্ব্বত্র রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রী, যোদ্ধা, ভৃত্য, এমন কি গজ-বাজী পর্য্যন্ত সকলেরই মনে একটা ভীতত্রস্ত ভাব উদিত হইল। রাজসৈন্য দলে দলে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত হইতে লাগিল। সমগ্র রাজভবন তখন প্রচণ্ড মারুত-চালিত মহাকাননের শ্রী ধারণ করিল।

অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দৈত্যদল যৎকালে গগনপথ আক্রমণ করে, তখন যেমন গগনবিহারী সিদ্ধ মুনিগণ ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তেমনি সেই দুর্ঘটনার সূচনায় সমস্ত মন্ত্রী রাজার সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাজাকে কহিলেন,—দেব! আমরা বিশেষ বিচারালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া উপস্থিত শত্রুদলকে দমন করা যাইবে না। ইহাদের উপর শেষ উপায়—দণ্ড প্রয়োগ করাই উচিত হইতেছে। ইহাদের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন হইয়া উঠিবে না, অথবা নিজ পক্ষভুক্ত লোকদিগকে ছল-ক্রমে উহাদের মধ্যে শরণাগতরূপে প্রবেশ করাইয়া গোপনে বিনাশ-চেষ্টা করিলেও বিশেষ ফলোদয় হইবে না। সুতরাং সেরূপ কোন উপায় অবলম্বনও অধুনা উচিত হইবে না। শত্রুগণ নানা দেশীয়, পাপাচারে সিদ্ধহস্ত ও ধনাঢ্য; উহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। উহারা ছিদ্র পাইয়া একযোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই সামাদি উপায়ে কোনই ফল দর্শিবে না। অতএব এক্ষণে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইবে; তা ভিন্ন আর উপায় নাই। কাজেই যুদ্ধোদ্যোগ করাই শ্রেয়স্কর। বীরেন্দ্রবর্গকে যুদ্ধার্থ আদেশ দেওয়া হউক, ইষ্ট-দেবতার অর্চ্চনান্তে সামন্ত রাজগণকে রণে আহ্বান করা হউক, রণ-দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে থাকুক, যোদ্ধৃগণ সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে রণস্থলে অবতীর্ণ হউক। প্রলয়পয়োদ-প্রতিম প্রগাঢ় কৃষ্ণকান্তি গজ-সৈন্যদল চারিদিক্ অবরুদ্ধ করুক। ধনুঃসকল আস্ফালিত হইতে থাকুক, জ্যানির্ঘোষে গগনতল বিদীর্ণ হইয়া যাউক, অর্দ্ধমণ্ডলাকার ধনুকে চতুর্দ্দিক্ শ্যামলবর্ণ হইয়া উঠুক। বীরেন্দ্রগণ মেঘবৃন্দের ন্যায় মৌর্ব্বীরূপ বিদ্যুদ্‌বল্লীর আলোকচ্ছটায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করুন এবং গভীরতর গর্জ্জনপুরঃসর নারাচাস্ত্রনিভ বারিধারা বৃষ্টি করিতে থাকুন।

রাজা কহিলেন,—আর মুহূর্ত্ত বিলম্বের প্রয়োজন নাই। সকলেই যুদ্ধার্থ যাত্রা কর; এই উপস্থিত ব্যাপারে যাহার যাহা কর্ত্তব্য, সকলেই

তৎপরতার সহিত পালন কর। আমি স্নান করিয়া অগ্নিদেবের উপাসনান্তে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। নরপতি এই বলিয়া মনে মনে মহাকার্য্য সাধনের সঙ্কল্প পোষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণমধ্যেই ঘটপূর্ণ গঙ্গাজলে স্নান-কার্য্য সারিয়া লইলেন। যেমন বর্ষাজলধৌত নূতন উদ্যান, তেমনি তিনি স্নানান্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা বিপশ্চিৎ অগ্ন্যগারে প্রবেশ করিলেন, এবং ভক্তিভরে অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি বিবিধ ভোগবিলাসে থাকিয়া এই দীর্ঘকাল হেলায় কাটাইয়া দিলাম। এতদিন ধরিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে অভয় প্রদান করিলাম। আসমুদ্র ক্ষিতিতলের শাসন পালন করিলাম। কত সময়ে কত প্রবল শত্রু আসিয়া ভূমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে পদতলে আমি দলিত করিয়াছি। আমার শাসনে নানাদেশবাসী জনসাধারণ ফলভারনম্র তরুর ন্যায় নত হইয়াছে। প্রজাপুঞ্জের চন্দ্রমণ্ডলোপম হৃদয়ক্ষেত্রে মদীয় শুভ্র যশোরাশি অঙ্কিত করিয়াছি। এ ভূতলে ভাগীরথীর ন্যায় কতকীর্ত্তি আমি স্থাপন করিয়াছি। সুহৃৎ, মিত্র, বন্ধু ও অপরাপর সাধু সজ্জনের আকাঙ্ক্ষা—আমি ধনরাশি বিতরণ করিয়া কোশাগারবৎ পূরণ করিয়াছি। আমি দিক্‌চক্রবাল জয় করিয়া আসিয়া সাগরতীরে উপবেশনপূর্ব্বক কতবার কত নারিকেলাসব পান করিয়াছি। মদীয় শত্রুসমূহের প্রাণ আমি ভেকবৃন্দের কণ্ঠত্বকের ন্যায় কাঁপাইয়া দিয়াছি। আমার শাসনমুদ্রায় দ্বীপান্তরের কুলাচলকুলও অঙ্কিত হইয়াছে। দিগ্‌দিগন্তে যে সকল সিদ্ধ সেনা আছেন, তাঁহাদের সহিত আমি বিহার করিয়াছি, এমনও অনেক সময় গিয়াছে, যখন লোকালোক পর্ব্বতের শিখরে গিয়া আমি বারিধরবৎ বিশ্রাম করিয়াছি। তখন আমার মনে হইয়াছে, যেন আমি একান্তমনে পরব্রহ্মেই বিশ্রাম করিতেছি। প্রকৃতিপুঞ্জের হিত নিমিত্ত কত রাজ্য আমি করায়ত্ত করিয়াছি। অশিষ্ট রাক্ষসদিগকে কতবার আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছি। অক্ষত ভাবে ধর্ম্মার্থকামের সেবা করিয়া আমার এ দীর্ঘ বয়ঃক্রম আমি কাটাইয়া দিয়াছি। আমি শ্বেতবর্ণ যশোরাশি পান করিয়াই যেন জরাধবলিত হইয়া গিয়াছি। শষ্পোপরি হিমবিন্দুরাজির ন্যায় মদীয় কেশকলাপে এখন ধবলিমা

আসিয়া দেখা দিয়াছে। বার্দ্ধক্যই সর্ব্ববিধ ভোগবাসনার হ্রাসকারী; সেই বার্দ্ধক্যই এখন আসিয়া আমার উপস্থিত হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ, তদুপরি আবার চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ; এ সময়ে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিব কিনা সন্দেহের স্থল। অতএব আমার আর কর্ত্তব্য আছে কি? যিনি আমার জয়প্রদ ইষ্টদেবতা, আমি সেই অগ্নি দেবকেই আমার এই মস্তকাহুতি প্রদান করি। এই ভাবিয়া রাজা অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব, হব্যবাহন! পূর্ব্বে আপনাতে যেমন যজ্ঞীয় আহুতি প্রদান করিতাম, তেমনি অদ্য আমার এই মস্তকাহুতি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। দেব! আমার এই কার্য্যে আপনি যদি সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন, তবে আপনার প্রসাদে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হউক। ভগবন্! আপনার এই কুণ্ড হইতে বিষ্ণুর ভুজচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটী দেহ আমার উত্থিত হউক। আমি তাহা দ্বারা চারিদিকে গমনপূর্ব্বক অনায়াসে শত্রুসমূহের নিধনসাধনে যেন সক্ষম হই। প্রভো! আপনার দর্শন পাইব বলিয়াই আপনাকে শরণ লইয়াছি। আপনি আমার প্রত্যক্ষ হউন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই মহীপতি এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং বালক যেমন হেলায় কমল দ্বিখণ্ড করে, তেমনি তিনি নিজ মকস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যেমন সেই ছিন্ন মস্তক অনলে আহুতি প্রদান করিবেন, অমনি দেহ সহ অগ্নিকুণ্ডে গিয়া পতিত হইলেন। অগ্নি তাঁহার সেই আহুত দেহ ভোজন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি আবার চতুর্গুণ দেহ প্রদান করিলেন। বস্তুতঃ মহতেরা যাহা গ্রহণ করেন, তাহার অধিক গুণই প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অনন্তর রাজার তেজঃপুঞ্জ-পরিদীপ্ত মূর্ত্তিচতুষ্টয় অগ্নি হইতে উত্থিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বলাভ দেহচতুষ্টয় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সেই দেহ-চতুষ্টয়ের যোগ্য বসন, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রও উঠিল। এতদ্ভিন্ন বর্ম্ম, শিরোরত্ন, কটক, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলাদি দেহভূষণ সকলও সমুত্থিত হইল। উক্ত দেহচতুষ্টয়ই অবিকল একরূপ ও একাবয়বশালী। উহারা চারিটী শ্রেষ্ঠ অশ্বে সমারূঢ়। চারি মূর্ত্তিই কনকময় তূণীরে কনকময়

শর ধারণ করিতেছে। উঁহাদের সকলের হস্তেই ধনুর্ব্বাণ আছে। ঐরূপ মূর্ত্তিশালী পুরুষেরা সকলেই সদাশয়। উঁহাদের আর একটি অলৌকিক গুণ এই যে, নরযান, অশ্বযান, গজযান বা রথ, যাহাতেই উহাঁরা আরোহণ করুন, কিছুতেই তাহা নষ্ট হইবার নহে। অগ্নি হইতে সেই উজ্জ্বল দেহচতুষ্টয় আবির্ভূত হওয়ায় মনে হইল, বাড়বাগ্নি যেন চতুঃসমুদ্র পান করিয়া তাহা ঐ সকল অভূতপূর্ব্ব পুরুষাকারে পরিণামিত করিল এবং পরে অগ্নিকুণ্ডে আনিয়া দিল। তাহাদিগকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বোধ হইল, যেন চারিটী বিষ্ণুমূর্ত্তি, কিম্বা মূর্ত্তিমান্ সাগর-চতুষ্টয় অথবা যেন মূর্ত্তিশালী চতুর্ব্বেদ আসিয়াই উপস্থিত হইল। সেই অশ্বারূঢ় পুরুষচতুষ্টয় চন্দ্রকান্তিনিভ ঈষৎ হাস্যচ্ছটায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া লইলেন।

নবাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এ দিকে সেই রাজার রাজধানীর চারিদিকেই আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের সহিত দারুণ যুদ্ধারম্ভ হইল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজাকুল ভয়ব্যাকুল হইয়া পড়িল। শত্রুপক্ষ বহু প্রজার গৃহদাহ করিল। অগ্নিসংযোগে গৃহ সকল দাউ দাউ জ্বলিতে লাগিল। মেঘপুঞ্জের ন্যায় সমুত্থিত ধূমস্তোম নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। শরসমূহের ন্যায় মহাধূমোদ্গমে সৌরমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহাতে চতুর্দ্দিকে ঘোরান্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। ক্রমে সৌরমণ্ডলের অদর্শন ঘটিল। বহ্নিদাহ হইতে যে দারুণ উত্তাপ উত্থিত হইল, তাহাতে বনের লতা-পাতাসকলও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত শূল, মুষল, অঙ্গার ও পাষাণাদি দ্বারা আকাশ-দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। জ্বলিত অনলের প্রতিবিম্ব-পাতে উভয় পক্ষ

নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহের কান্তিচ্ছটা আরও ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিল। সমরমৃত মহাবীরগণ স্বর্গে গিয়া অপ্সরাদিগের অধরসুধা পান করিতে লাগিল। সমরোৎসুক বীরগণ মদমত্ত মাতঙ্গের নাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। চারিদিক্ হইতে অজস্রধারে ভুষণ্ডী, প্রাস, শূল ও তোমরাদি বর্ষিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বলেরা প্রবলের হুঙ্কার শ্রবণেই মৃত্যু-প্রাপ্ত হইল। ধূলিপুঞ্জরূপ শুভ্রবর্ণ মেঘখণ্ড উত্থিত হইয়া স্বর্গপথ রুদ্ধ করিল। অনেক শরাহত সামন্তনৃপ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। চারিদিক্ হইতে বজ্রাগ্নি পাত হইতে লাগিল, তাহাতে প্রজাপুঞ্জ ধ্বংসমুখে পতিত হইল। অগ্নিদগ্ধ গৃহশ্রেণী ভূপতিত হইলে অগ্নিকণোদ্গারী ধূমস্তোম তথা হইতে মেঘবৎ বহির্গত হইতে লাগিল। তুরঙ্গসকল সাগরতরঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলিল; তাহাদের গতিভঙ্গিমায় সাগরতরঙ্গও পরাজিত হইল। অগণিত শরধারা-রূপ মেঘোদ্গমে কোন পক্ষের বিষাদ, কোন পক্ষের বা আনন্দ হইতে লাগিল। গজঘটার পরস্পর দন্তসংঘর্ষণের ফলে অতি বিকট উচ্চ নাদ উত্থিত হওয়ায়, সেই রণস্থল বিষম কর্কশ হইয়া উঠিল। প্রধান প্রধান যোধগণ দুর্গপার্শ্বস্থ কুটীরভিত্তিতে কণ্টকবৎ শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। গৃহসমূহ বহ্নিদাহে চট চট ধ্বনি করিয়া সংক্ষোচভাব প্রাপ্ত হইতেছিল; তাহাদের শিখরভাগে বহ্নিশিখা দীপ্তি পাইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ অনবরত অসংখ্য পট্টিশাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল; তাহারা হুহুঙ্কার রবে পথি মধ্যে যাতায়াত করত পান্থগণের গমনাগমন রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। উপরি উদ্ধৃত ধ্বজপটাবলী পার্শ্বস্থ প্রাসাদগাত্রে সংলগ্ন হওয়ায় পবনভরে পট পট ধ্বনি করিতে লাগিল। গজরাজের দন্তকান্তিচ্ছটার বিকাশ, অস্ত্রসমূহের শিলাসহ সঙ্ঘর্ষণ, আর বীরেন্দ্রবৃন্দের উচ্চ হুঙ্কার—এই সকল দ্বারা অনু-মান হইতে লাগিল—যেন দিগ্গজবৃন্দ রণমদে প্রমত্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছে। শরশ্রেণীরূপিণী নদীর প্রবাহে আকাশরূপ মহাব্ধি পূর্ণ হইয়া গেল। বীরগণের চক্র, কুন্ত ও তরবারি সকল তাহাতে যেন মকরকুলের ন্যায় প্রতিভাত হইল। যোধবৃন্দ উচ্চ নাদ করিতে লাগিল। তাহাদের গাত্রস্থ বর্ম্মসমূহ পরস্পর সঙ্ঘর্ষবশে ঝন্ ঝন্

রব উত্থাপন করিল; সে রবে দ্বীপ সকল পূর্ণ হইয়া গেল। রক্তাক্ত শব-নিকর রণক্ষেত্রে পতিত ও সেই সেই আর্দ্র স্থান পাদপৃষ্ট হওয়ায় কর্দ্দমাকুল হইয়া উঠিল। নানা স্থান দিয়া রুধিরনদীর প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সে প্রবাহে রথ-গজাদি ভাসিয়া চলিল। পট্টিশাদি অস্ত্র শস্ত্র পতগেন্দ্র গরুড়ের ন্যায় পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। এক পক্ষের অস্ত্ররূপ জলজন্তু সকল যেন অন্য পক্ষের শরতরঙ্গাঘাতে ভগ্ন ও বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। হেতিসমূহের পরস্পর সংঘর্ষে সমুত্থিত বহ্নি-শিখা সকল আকাশদেশ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। যে সকল বীর সমরে নিহত হইতে লাগিল, তাহারা স্ব স্ব বার্দ্ধক্য পরিহারপূর্ব্বক স্থির যৌবন লাভ করত স্বর্গে সমুপনীত হইল। আকাশে মেঘপ্রায় পাণ্ডুরাভ ধূলিজাল উত্থিত হইতে লাগিল। আর তাহার উপর উজ্জ্বল চক্রাস্ত্র যেন বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে লাগিল। হেতি অস্ত্র উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল পরি-ব্যাপ্ত করিল, তাহাতে তথায় কিছু মাত্র অবকাশও অবলোকিত হইল না; যুদ্ধভূমি অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ হইয়া গেল; তাই তাহা যুদ্ধের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিল। শরবর্ষী যোদ্ধৃবর্গের সগর্ব্ব আক্রোশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহাদের প্রতিযোদ্ধাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ চিৎকারে সেই রণ-স্থান আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। শকটসমূহের সংঘর্ষবশতঃ কোন কোন স্থান নিষ্পিষ্ট হওয়ায় গতিহীন রথরাজী ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখা গেল, সেই সমরস্থলের কোথাও কবন্ধ নাচিতেছে, বেতাল বেড়াইতেছে, শত্রুদল আস্ফালন করিতেছে, এবং কোথাও বা বেতাল আসিয়া শবদেহের বক্ষ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া লইতেছে। এই ভাবে সেই রণভূমি একান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। শত্রুসমূহের মস্তক, হস্ত, নখ ও উরু, বীরগণ দ্বারা শীর্ণ ছিন্ন হইল। সমরে কত কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল; তাহাদের বাহুবৃক্ষ গগনে ঘূর্ণমান হইলে মনে হইল, গগন যেন একটা অরণ্য হইয়া গেল। বেতালেরা রাশি রাশি শবদর্শনে আনন্দে আস্ফালন করিতে লাগিল; আর হস্ত মুখ নাড়িয়া চাড়িয়া স্বীয় পেটিকাভ্যন্তরে শবসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কত স্থানে কত বর্ম্মী চর্ম্মী ভীষণ যোদ্ধৃগণ সগর্ব্বে ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্ব স্ব বীরত্ব খ্যাপন করিতে

লাগিল। বীরগণ 'মারিব বা মরিব' এইরূপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা পরকে প্রহার করিতে পটু নহে অথবা যাহারা অপরের প্রহার সহ্য করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। অনেক বীরশ্রেষ্ঠের এবং অনেক মত্তমাতঙ্গের মদজল বিশুষ্ক হইয়া গেল। বহু বীর অগণিত সৈন্য সংহার করিয়া কৃতান্তের প্রীতি বর্দ্ধন করিল। বীরগণের মধ্যে মুখে যাহাদের আত্মশ্লাঘা নাই, অথচ কার্য্যতঃ যাহারা শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকাশ করিতে লাগিল, তাদৃশ মহাবীরগণেরই জয় ঘোষণা সর্ব্বত্র শতমুখে হইতে লাগিল। যাহারা ভয়ে ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল, তাদৃশ শৌর্য্যহীনদিগের কথা অনেকে তাহাদের প্রভুর নিকট গিয়া বলিয়া দিতে লাগিল। যাহাদের বাহুতে প্রভূত বলবীর্য্য আছে এবং যাহারা দুর্ব্বল লোকের আশ্রয়রূপে বিরাজ করিতেছে, সেই সকল গুণবান্ বীরের বাহুবল সম্যক্ প্রদর্শিত হইল; তাহাতে তাহারা মনে মনে অতীব প্রীতি লাভ করিল। গজারোহী ও রথারোহীদিগের পরস্পর যুদ্ধ হইল; সে যুদ্ধে রথারোহীর শরাঘাতে গজারোহীর গজগণ্ডস্থল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। মত্ত মাতঙ্গগণ প্রহারে ভীত হইয়া পৃষ্ঠে আরোহী লইয়াই জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তাহাতে আরোহীরা সারসাখ্য পক্ষিসমূহের ন্যায় চিৎকার করিতে করিতে মাতঙ্গপৃষ্ঠ পরিহারপূর্ব্বক পলাইয়া যাইতে লাগিল। কোন কোন নিপুণ যোদ্ধা বৃদ্ধদশায় উপনীত হইয়াও স্বীয় যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইল না। কোথাও কোথাও অগণিত সৈন্য মৃতপ্রায় করিয়া বীরবৃন্দ বীরগর্ব্বে চলিয়া গেল। মৃতপ্রায় যোদ্ধারা পলাইতে গিয়া পরস্পরের পদাঘাতে পিষ্ট হইতে লাগিল। অভিমানরূপ উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া বীরবৃন্দ পদানত ভীরুদিগকেও প্রহার করিতে লাগিল। যুদ্ধস্থল যেন একটা প্রকট দোকান হইল; তাহাতে অজস্র প্রাণিবিক্রয় হইতে লাগিল। বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ পতাকাপঙ্‌ক্তি গতিশীল বাহুবৃক্ষবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। ঐ পতাকাপঙ্‌ক্তি শোণিতসম্পর্কে লোহিতবর্ণ হইল; তাহাতে উহা প্রবালভূষণবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। মন্থনকালীন ফেনায়মান

চ-জলের ন্যায় শুভ্র ছত্র সকল গগনাঙ্গনে কুসুমগুচ্ছসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সুর, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আকাশে থাকিয়া সমর-ভূমিস্থিত প্রকৃষ্ট বীরগণের সমর-কৌশলের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। যোধবৃন্দ গগনগত গন্ধর্ব্বাদির গাত্র ও স্ব স্ব হেতিপ্রভায় বলরামবৎ শ্বেতশ্রী ও আনন্দোন্মত্তরূপে প্রতিভাত হইল। সমরস্থলে সংখ্যাতীত রাক্ষস আসিয়া যোগদান করিল। তাহারা অর্দ্ধমৃত যোধগণকে মারিয়া ফেলিল এবং নীরবে ভক্ষণ করিয়া আপন উদর পূরণ করিল। অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা লইয়া গিয়া তাহারা গিরিদরীবাসী বিষবৃক্ষোপম অপরাপর আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইতে লাগিল। কুন্তাস্ত্রধারী যোধগণ কুন্তপ্রহারে বিপক্ষদিগের হস্ত ও মস্তক কর্ত্তন করিয়া সেই সেই ছিন্নাবয়ব দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলিল। বহু বীর ক্ষেপণী-চক্রের সাহায্যে অসংখ্য শিলাখণ্ড নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ ভয়াবহ করিয়া তুলিল। যোধবৃন্দের বাহ্বাস্ফোটন জন্য চটচটারবে বোধ হইল যেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ বহ্নিদগ্ধ হইয়া চটচট শব্দে স্ফুটিত হইতে লাগিল। যাহাদের পতি সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই সকল বিধবা করুণ ক্রন্দনধ্বনি তুলিয়া নগর-মন্দির সঙ্কুল করিয়া তুলিল। উভয় পক্ষ-নিক্ষিপ্ত নিশিত শরসমূহ আকাশে উড্ডীন হইয়া প্রজ্জ্বলিত পাবকবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ স্ব স্ব ধন, জন, গৃহ, পরিহারপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিল। দিকে দিকে হেতিরাজি সমুৎক্ষিপ্ত হইলে দর্শকসমূহ ভীতি-বিহ্বলভাবে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। ভুজঙ্গগণ যেমন গরুড়সান্নিধ্য পরিহার করে, তেমনি সেই ভীরুগণ একেবারেই সে স্থান বর্জ্জনপূর্ব্বক পলায়ন করিল। হতাবশিষ্ট যোধগণ হস্তিগণের শুণ্ডাদণ্ড প্রহারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। সে কালে গজগণ্ড যেন প্রেতপতির মনুষ্যরূপ দ্রাক্ষাফল-পেষণের যন্ত্র বলিয়া প্রতীত হইল। অনেক বীর পাষাণযন্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে বিপক্ষদলের নভো-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। যোধবৃন্দের সিংহ-নাদের সঙ্গে সঙ্গে গজঘটারও বিকট চিৎকার শ্রুত হইতে লাগিল। সে চিৎকারে গিরিগুহা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঐ চিৎকার যখন

গিরিগুহায় গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, তখন উহা আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। যোধগণ তাহাদের প্রাণসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমরে কত শত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে যোধগণ যেন ভর্জ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধাদি বিবিধ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; তাহাতে কত যে অগণিত জীব যমভবনের অতিথি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। হতাবশিষ্ট যোধবৃন্দ প্রভুর জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা সমরে মরণকেই জীবন এবং জীবনকেই মরণ বলিয়া বোধ করে, তথাবিধ প্রশস্ত যোধগণ মরিয়া হইয়া যুঝিতে লাগিল। সমরে এমন সমস্ত প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিল, যাহারা বড় বড় মাতঙ্গকেও হেলায় কর্ত্তন করিয়া বীরদর্পে বিরাজ করিতে লাগিল। পাষাণযন্ত্রের নিক্ষেপ-ধ্বনি, সদ্যশ্ছিন্ন মস্তকরাশির ফুৎকার রব, ভ্রাম্যমাণ অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দ ও হস্ত্যশ্বাদির চীৎকার এবং শরসমূহবর্ষী সৈন্যগণের সিংহনাদ, এই সকল শব্দে তত্রত্য প্রাণিবৃন্দের কর্ণকুহর বধির হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন তাহাদের কর্ণছিদ্র এক এক খণ্ড শিলা দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিল।

দশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ঐরূপে প্রলয়কালবৎ ভয়ঙ্কর সমর আরব্ধ হইল। সমরক্ষেত্রে অগণিত সেনা পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। কত ভেরী, তুরী ও মহাশঙ্খের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। খড়্গের কচকচা-শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সকল শব্দ যেন একযোগে আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। বীরবৃন্দের উচ্চ হুঙ্কারবৎ ধনুর্গুণধ্বনি সেই সঙ্গে উত্থিত হইতে লাগিল। যোধবৃন্দের কটকট রবে বিপক্ষ পক্ষের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের সেই কঠোর কর্কশ আস্ফালন-

দর্শনে সকলেরই অন্তরে ভীতিসঞ্চার হইল। রাজা বিপশ্চিতের পক্ষভুক্ত সৈন্যদল সমরে সমাহত হইয়া ছিন্ন তরুবৎ ভূপতিত হইতে লাগিল।

এই সময় রাজা বিপশ্চিৎ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিযানকালীন ঘোর দুন্দুভিনাদ উত্থিত হইল। সে বিকট নাদে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। এক এক করিয়া চারি প্রস্থ দুন্দুভি একযোগে বাদিত হইল। তখনকার সেই দুন্দুভিনাদ এতই ভীষণ হইয়া উঠিল যে, প্রলয়-পয়োধরের গভীর নাদের সহিত তাহা তুলিত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন, একই সময়ে কুল পর্ব্বতকুল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন দুন্দুভির চটচটা ধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। ভূপতি বিপশ্চিৎ নারায়ণের বাহুচতুষ্টয়বৎ চারি মূর্ত্তি ধরিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সমরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গ সৈন্য নির্গত হইল। তিনি সেই সকল সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তদীয় রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সৈন্যদল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে। প্রবল শত্রুসঙ্ঘ ভীষণ যুদ্ধে উদ্ধত অব্ধিবৎ গভীর গর্জ্জন করিতেছে। শত্রুপক্ষ কোথাও মকরব্যূহ, কোথাও গজব্যূহ, কোথাও অশ্বব্যূহ, কোথাও চক্রব্যূহ এবং কোথাও বা আবর্ত্তব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের প্রক্ষিপ্ত শরনিচয় দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—সেই সৈন্যসাগরের মধ্যভাগ তরঙ্গায়িত হইয়াছে; রথরাজি আবর্ত্তভঙ্গীর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে; ছত্রসমূহ ফেনপুঞ্জবৎ প্রতিভাত হইতেছে; হেতি সকল সেই সাগরের সলিলধারাবৎ লক্ষিত হইতেছে; মাতঙ্গ ও তুরঙ্গদল চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছে; অস্ত্রজালে পতিত হইয়া পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ সকল কৃষ্ণসর্পসমূহবৎ ভাসিয়া চলিয়াছে; দ্রাবিড়-দেশবাসী যোধগণ গুল্‌গুল্‌রবে পরস্পর কথা কহিতেছে। তথায় প্রলয় পবন গিরিগুহা বিদারণ করিয়া ঘুম্ ঘুম্ রবে প্রবাহিত হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ একবার উন্নত এবং একবার নত হইয়া চলিয়াছে। ঐ সকল মাতঙ্গের আকার প্রকার দর্শনে মনে হয়, উহারা ইচ্ছামাত্রে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতকেও উন্মগ্ন এবং নিমগ্ন করিতে পারে। বিপশ্চিৎ

আরও দেখিলেন,—সেই সংগ্রামক্ষেত্রে যে সকল মাতঙ্গ তুরঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছে, যদি বিপক্ষদল হইতে পর্ব্বতবৃন্দও নিক্ষিপ্ত হয়, তথাচ তাহারা হেলায় তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। তত্রত্য অগণ্য সৈন্য-শ্রেণী তরঙ্গায়িত তোয়নিধির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। সেই সমর যেন আকালিক প্রলয়ের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। রক্তে রক্তে রণক্ষেত্র মহাসাগর হইয়া গিয়াছে। ঐ সাগর ভূতল ও নভস্তলের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যোধগণের সমুজ্জ্বল অস্ত্রসকল রত্ননিচয়ের ন্যায় চারিদিকে সমুত্থিত হইয়া সমগ্র সংগ্রামস্থল আচ্ছন্ন করিয়াছে। ব্যূহবদ্ধ সৈন্যশ্রেণী চলিয়াছে, তন্মধ্যে ক্ষেপণ পাষাণ সকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যোধগণের গাত্রবর্ম্ম ও রত্নপ্রভারাজির মিলনে স্থানে স্থানে সান্ধ্য জলদজাল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কোথাও কোথাও প্রচুর ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে; আর তাহা দ্বারা অস্ত্ররাজি ঢাকিয়া যাইতেছে।

এই প্রকার সমরসাগর অবলোকনপূর্ব্বক রাজা বিপশ্চিৎ মনে মনে স্থির করিলেন,—এই যে সাগর, অগস্ত্য মুনির ন্যায় আমি এক্ষণে ইহার পানকর্ত্তা হই। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া রাজা তখন সেই রণার্ণব পান-করণার্থ বায়ব্যাস্ত্র স্মরণ করিলেন। ত্রিপুর-ধ্বংসকালে ভগবান্ শূলপাণি যেমন সুমেরুশৈলরূপ শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সেই চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী বায়ব্যাস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলেন। রাজা আপনার সৈন্যদল রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিদেবকে নমস্কার ও অগ্নিমন্ত্র জপ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রতাপানল প্রশমিত করিবার জন্য মহামেঘাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজার চারি দেহ; চারি দেহেরই ধনুশ্চতুষ্টয় হইতে বাণ, ত্রিশূল, শক্তি, ভুষুণ্ডী, মুদ্গর, প্রাস, তোমর, চক্র, পরশু ও ভিন্দিপালাদি অস্ত্রনিবহের নদী বহিল। তখন প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বহিতে লাগিল। তাহাতে জনসাধারণের মনে প্রলয়াশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বারিধারা পতিত হইয়া নদীর আকারে বহিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ সর্প

মহামারতে বর্দ্ধিত হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই সকল ভীষণ সর্প দর্শনে মনে হয়, উহারা যেন প্রধান প্রধান পর্ব্বত হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তখন সেই সৈন্যসাগর অস্ত্রবৃষ্টিবেগে ক্ষণমধ্যেই ধূলিরাশিবৎ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড পবনবেগে এবং বজ্র ও জলাস্ত্র বর্ষণে সৈন্যসমূহ ভগ্নসেতু সলিলপ্রবাহবৎ নানাদিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। বিপশ্চিৎ রাজার অস্ত্রবেগে পরাহত হইয়া শত্রু সৈন্যদল বর্ষাকালের গিরিনদীপ্রবাহবৎ চারিদিকে ক্ষিপ্রতার সহিত ছুটিয়া চলিল। বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজপতাকা বায়ুতাড়নায় ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পতিত পাদপের ন্যায় সেই সৈন্যসাগরে ভাসিতে লাগিল। চঞ্চল অসিলতার বন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না, তাহারা সমরে পাষাণখণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহাদের রক্তস্রোতে সেই যুদ্ধস্থান প্লাবিত হইয়া গেল। যে সকল অস্ত্রাহত সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল, তাহাদের ঘোর ঘুর ঘুর ধ্বনি শ্রবণে অন্যান্য ভীরুজনের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই সৈন্যসাগরে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ভাসিতে ছিল, তাহাদের দন্তঘর্ষণরবে মনে হইল, যেন ভয়ঙ্কর অম্বুধরগর্জ্জন হইতেছে। অস্ত্র ও শিলাসমূহের পরস্পর আঘাত হইতে যে শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, তাহাতে গিরিনদীতীরজাত কুসুমোপরিগত ভ্রমর-নিকরের ঝঙ্কার বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তুরঙ্গসঙ্ঘ অবিকল নদী-তরঙ্গবৎ শব্দ করিতে লাগিল। শিলাহত যোধবৃন্দের চীৎকার রব অবিকল বর্ষাকালীন দর্দ্দুররববৎ প্রতীত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অগণিত সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাতে সেই সকল স্থান একান্তই দুর্গম হইয়াছে। কোথাও ধনুকের কঠোর টঙ্কারধ্বনি, কোথাও আহতদিগের চিৎকার এবং কোথাও বা গেলাম, মরিলাম, ইত্যাকার করুণ আক্রন্দন হইতে লাগিল। তাহাতে সেই সমরভূমি অতীব ভীষণ ভাব ধারণ করিল। কোন কোন স্থান হইতে সৈন্যগণ অনবরত পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পলায়নকালে কি এক প্রকার গুল্‌গুল্‌ধ্বনি হইতে লাগিল। নীহারবিন্দুর ন্যায় নভোমণ্ডলে

শোণিতবিন্দু সংলগ্ন হইল; তাহাতে আকাশ যেন সান্ধ্য মেঘবিতানে সমাবৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আকাশপথে প্রচলিত অস্ত্রনিচয় জলভারাবনম্র নীরদপটলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। অনেক স্থানে সমরভূমি শোণিত-কর্দ্দমাক্ত হওয়ায় সৈন্যগণ তদুপরি সিকতাদি নিক্ষেপ করিয়া গমনের পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। বহু সৈন্য বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াও বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। ভীরু লোকেরা হরিণ-শাবকের ন্যায় করুণ কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল। হস্ত্যশ্ব ও যোধগণের রাশি রাশি শবদেহ নানাস্থানে জীর্ণ পর্ণরাশিবৎ পড়িয়া রহিল। অস্ত্র-বিক্ষত দেহসমূহ হইতে অবিরলধারে বসা ও শোণিতাদি নির্গত হইতে লাগিল; তাহাতে বহুস্থান পঙ্কময় হইয়া উঠিল। মৃত কঙ্কালাদি সকল অশ্বাদির খুরাঘাতে চূর্ণিত ও পিস্ট হইয়া শুভ্র বালুকাস্তূপের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই সমরসাগরে কত শিলা এবং কত শত কাষ্ঠ ভাসিতে ছিল; তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষণে টং টং ইত্যাকার রব নিঃসৃত হইতে লাগিল। মেঘগর্জ্জন, প্রভঞ্জনপ্রবহণ, বারিধারা-বর্ষণ এবং ভীষণ বজ্র-নিনদন, সকলই প্রলয়কালের ন্যায় হইতে লাগিল। সমগ্র সংগ্রামস্থলী পতঙ্গ ও পয়োরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। দিকে দিকে সুখদ শীতল সলিলধারাও বিকীর্ণ হইতে লাগিল। গ্রাম, গৃহ, নগর, সর্ব্বত্রই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, সৈন্য ও অন্যান্য জনসঙ্ঘ, ভয়ে ঘোর গভীর চিৎকার করিতে লাগিল। ভূতলে রথনির্ঘোষ, গগনে মেঘগর্জ্জন এবং চতুর্ম্মূর্ত্তি বিপশ্চিতের চাপচতুষ্টয়ের উচ্চ টঙ্কার, তখন চতুর্দ্দিক্ ভীষণ করিয়া তুলিল। পরস্পর সঙ্ঘর্ষ পাইয়া মেঘসঙ্ঘ গভীরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুদ্‌বল্লী বিকসিত হওয়ায় লোকলোচন ঝল্‌সিতে লাগিল। শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও ভিন্দিপালাদি অস্ত্রের বর্ষণ চারিদিক্ হইতেই হইতে লাগিল।

এইরূপে বিপশ্চিৎ নরপতির সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইলে বিপক্ষপক্ষীয় মহীপতিবৃন্দের অসংখ্য সৈন্য দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে দুর্ব্বল মশকপালের ন্যায় নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। জীর্ণারণ্যে বহ্নিসংযোগ হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, বিপশ্চিৎ রাজের বিপক্ষ-

সৈন্যদিগেরও তেমনি দশা ঘটিল। অনবরত অস্ত্রাঘাতে ও লোকবিধ্বংসী বিদ্যুদ্‌বজ্রপাতে তাহারা বাড়বাগ্নি-দহ্যমান জলজন্তুসমূহের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তখন দেখা গেল, চেদীদেশীয় যোধগণ যেন চন্দনকানন; তাহাদের গলবিলম্বী মনোহর হারগুচ্ছ যেন ভুজঙ্গসজ্ঞ; তাহারা পরশুপ্রহারে ছিন্নাঙ্গ হইয়া দক্ষিণাব্ধির জলে পতিত হইতে লাগিল। পারসীকদেশীয় যোদ্ধৃগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া চঞ্চলারণ্যে গিয়া পড়িল আর মরিয়া গেল। দর্দ্দরদেশীয় দারুণ যোদ্ধৃগণ সমরে সমাহত হইয়া দর্দ্দরগিরির দুরধিগম্য গুহামধ্যে পলায়ন করিল, কিন্তু ভয়ে তাহাদের হৃদয়কন্দর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সমীরণ—শর, প্রাস, অসি ও পরশু প্রহারে বিচূর্ণিত শিলাবর্ম্মাদির ভগ্নাংশ লইয়া প্রবাহিত হইল। তখন গজবৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া ভগ্নদন্ত ও রক্তাক্ত হইল। তাহারা যেন প্রেতপতির উদরপূর্ত্তিকর রাশি রাশি গ্রাস-পিণ্ডবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। দরদদেশীয় যোদ্ধৃগণ ভীষণ তোমরাস্ত্রে তাড়িত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ রৈবতকগিরির আশ্রয় লইল, কিন্তু সেখানে গিয়াও তাহাদের নিষ্কৃতি হইল না; রাত্রিকালে তত্রত্য মায়াবিনী পিশাচীরা আসিয়া তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া কুটিয়া ভাগ করিয়া খাইয়া ফেলিল। দশার্ণদেশীয় বীরবৃন্দ জীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া তমালতালী বনে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু সেখানে তাহাদের অনেকক্ষণ অবস্থান ঘটিল না। [illegible] আসিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। যবনগণ পশ্চিমাব্ধির তীরে [illegible] পলায়ন করিল; সমুদ্র হইতে কতকগুলি মকর উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। শকদেশীয়গণ নারাচাঘাত সহিতে

পারিল না, তাহারা তাহাতে আহত হইয়া বজ্রাহত কমলবনবৎ ক্ষণমধ্যেই ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইল; তাহাদের প্রাণান্ত ঘটিল। নীলবর্ণ অসংখ্য যোদ্ধা আকাশপথে পলায়ন করিলে, তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া মহেন্দ্রাচল মেঘজালবেষ্টিতবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। নানা স্বর্ণালঙ্কার-মণ্ডিত তঙ্গন-সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল; কিন্তু চোরগণ পথিমধ্যে তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল; অবশেষে রাক্ষসের কবলে পড়িয়া তাহারা জীবন হারাইল। যেমন নক্ষত্রনিকরে আকাশের শোভা হয়, তেমনি সেই সময় অগ্নিময় অস্ত্রসমূহে সংগ্রামভূমি সুশোভিত হইল। মেঘের প্রতিধ্বনিচ্ছলে অন্তরীক্ষ দেশ যেন মৃদঙ্গ বাদ্য করিয়া বিপশ্চিৎ-ভূপতির বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। মৎস্যসমূহের বিহারভূমি—শৈবাল-পল্লল যখন জলবর্জ্জিত হয়, তখন যেমন মৎস্য ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণ পরিহার করে, তেমনি দ্বীপান্তরস্থ সৈন্যগণ চক্রাস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যবদ্বীপবাসী যোদ্ধারা অস্ত্রাহত হইয়া সহ্য পর্ব্বতে পলায়ান করিল এবং তথায় গোপনে সপ্তরাত্রি অবস্থানপূর্ব্বক চিকিৎসায় সুস্থকায় হইয়া ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গান্ধারদেশবাসী বীরেন্দ্রগণ প্রাণ রক্ষার্থ গন্ধমাদন গিরির পুন্নাগবনে পলায়ন করিয়া বিদ্যাধরসুন্দরীগণের আশ্রয়লাভে প্রাণ রক্ষা করিল।

এ দিকে বিপশ্চিৎ রাজা যে সকল চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লগিলেন, সে সমুদায় অনুকূল পবনবেগে প্রেরিত হইয়া চিন, হুন ও কিরাত-দেশীয় বীরগণের মস্তকমণ্ডল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বিপশ্চিৎ নরপতির ভয়ে নিলীপদেশীয় যোধগণ পলায়নপূর্ব্বক বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া রহিল। বিপশ্চিৎ-পরিক্ষিপ্ত দূরগামী শরনিকরপাতে চতুর্দ্দিকস্থিত শৈল বন পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইল। কণ্টকদেশস্থ কর্কশপ্রকৃতি যোধগণ ভয়ে ভয়ে দস্যুনিবাস নিভৃত কঞ্জরগহনে গিয়া পলায়ন করিল। ভীত ত্রস্ত পারসীকগণ প্রলয়কালীন প্রচণ্ড পবন-পরিক্ষিপ্ত নক্ষত্রনিকরের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া সন্তরণপূর্ব্বক সাগরপারে উপনীত হইল। প্রলয় পবনের ন্যায় তাৎকালিক প্রচণ্ড পবন—পর্ব্বতবৃন্দ বিধ্বস্ত, চতুর্দ্দিকস্থ বনভূমি চূর্ণ বিচূর্ণ এবং সাগর সকল সমুদ্বেলিত করত বহিতে লাগিল

প্রবল পবন-ক্ষিপ্ত অস্ত্রজালে ও ধারাসারে দশদিক্ পঙ্কিল ও জলপূর্ণ হইয়া যেন চক্ষুর অগোচরীভূত হইল। শব্দায়মান সমীরবেগে ছপ্ ছপ্ রবে নীহারপাত হইতে লাগিল। দূরদেশীয় রথারোহিগণ প্রবল বাতাঘাতে তরঙ্গসমূহবৎ চীৎকারপূর্ব্বক রথ হইতে সরোবরজলে পতিত হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র সত্ত্বেও অনেক বিপশ্চিতের চক্রাস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়া পড়িল; এত কাতর হইল যে, তাহারা পলায়ন করিতেও পারিল না; কেবল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। হূনদেশীয় বীরগণ সিকতাময় দেশে আকণ্ঠ মগ্ন হইল এবং কর্দ্দমক্লিন্ন হইয়া মলিনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। বিপশ্চিৎ ভূপাল শকদেশীয় যোদ্ধৃগণকে পূর্ব্বসাগরের তীরস্থ এলাবনে এক দিবস বন্দী করিয়া রাখিলেন; পরে দয়া করিয়া মোচন করিলেন; এজন্য তাহাদিগকে যমালয় দর্শন করিতে হইল না। মদ্র-দেশীয় যোদ্ধৃগণ মহেন্দ্রাচলের উন্নত শৃঙ্গ হইতে পতিত হইলে, তত্রত্য মুনিগণ আশ্রমমৃগবৎ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কতিপয় যোদ্ধা সহ্যাচলে আরোহণপূর্ব্বক দৈবাৎ তাহার শিখরাভ্যন্তরস্থিত এক ভীষণ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য দেবীর নিকট হইতে দুইটী বর প্রাপ্ত হইল, বস্তুতঃ ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে কাকতালীয়বৎ অনর্থ হইতেও ইষ্টার্থ লাভ হইয়া থাকে। দশার্ণদেশীয় বীরগণ দর্দ্দুরা-চলের অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অজ্ঞাতসারে বিষফল ভক্ষণপূর্ব্বক সেই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। হৈহয়দেশীয় বীরগণ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বিশল্য করণী ভক্ষণে বিদ্যাধর হইয়া স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বঙ্গদেশীয় বীরবৃন্দ পৃষ্ঠে ম্লান পুষ্পের মালা ও হস্তে মাত্র ধনু গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। সেই যে তাহারা গৃহে গেল, আর ফিরিল না। অঙ্গদেশীয় যোধগণ সৌভাগ্যক্রমে কেমন এক প্রকার বন্য ফল ভক্ষণ করিল; তাহাতে তাহাদের বিদ্যাধরপদ লাভ হইল। সেই হইতে অদ্যাবধি তাহারা স্বর্গে বিদ্যাধরগণ সমভিব্যাহারে কেলি করিতেছে। পারসীক সৈন্যগণ তালী ও তমালীবনে প্রবেশ করিল; প্রবেশমাত্র শত্রুদলের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেই মোহ লাগিয়াই রহিল। তাহারা মনে করিল, যেন বিমানচারীর ন্যায় নিয়তই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

রামচন্দ্র! কলিঙ্গদেশীয় চতুরঙ্গবাহিনী পথি মধ্যে অঙ্গদেশীয় সৈন্য দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া সবেগে ছুটিতে ছুটিতে তুঙ্গনদেশীয়গণের গৃহাঙ্গণে গিয়া প্রবেশ করিল। সাল্বদেশীয়েরা পলায়ন কালে শত্রুগণদ্বারা আক্রান্ত হইল। তখন তাহারা স্বীয় প্রভু, সমভিব্যাহারে শরশৈলের মধ্যস্থ কোন এক জলাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। এইরূপে বহু মনুষ্য পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইল। নদ, নদী, সাগর, শৈল, অটবী, নদীতট, প্রপাত, গ্রাম, নগর, কূপ, তড়াগ, কন্দর ও লোকালয়াদি কত স্থানে যে ঐরূপে সৈন্যসমূহ পলায়ন করিল, তাহার ইয়ত্তা করে, কাহার সাধ্য?

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যেমন সেই শত্রুসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল, সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয়ও অমনি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া বহুদূরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বশক্তিশালী; সকলেই সর্ব্বজন-হৃদয়বিরাজিত চিন্ময় ঈশ্বরের নিয়োগক্রমে একই মনোভাবে ভাবিত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সাগরতীর পর্য্যন্ত বিপক্ষদলের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। অবিশ্রান্তভাবে সেই পর্য্যন্ত গিয়াই তাঁহারাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহাদের আরও শ্রান্তি বোধ হইল। স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর জল যেমন ক্ষীণ হয়, তেমনি দূরগমনে স্ব-পর-পক্ষীয় সৈন্যগণ মুমুক্ষু জনের পাপপুণ্যবৎ ক্ষীণ হইয়াছে, আর দাহ্যাভাবে বহ্নিজ্বালার যেমন শান্তি হয়, তেমনি নিজেদের কৃতকৃত্য অস্ত্রশস্ত্রও শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে; এই সকল দেখিয়া বুঝিয়া বিপশ্চিৎচতুষ্টয় পরসৈন্যদিগকে আর আক্রমণ করিলেন না। বিহঙ্গেরা যেমন দিবাবসানে

স্বস্ব কুলায়ে গিয়া নিদ্রিত হয়, তেমনি তাঁহাদের অস্ত্রনিচয়ও স্বস্ব তূণীরাদিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তরঙ্গ—জলে, হিম—জলদে, জলদ—পবনে এবং সৌরভ যেমন আকাশে বিলয় পায়, তেমনি ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রও স্বস্ব আধারে লুক্কায়িত রহিল। তৎকালে আকাশরূপ অনন্তাব্ধি জলময় ও শান্ত হইয়া গেল। নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র তখন জলচর জন্তুর ন্যায় শান্তভাব ধারণপূর্ব্বক পঙ্কতলে মগ্ন রহিল। আকাশে আর নারাচ-নীহারের বর্ষণ নাই; চক্রাবর্ত্তের ভ্রমণ নাই; কেবল সুবিমল সৌম্যভাবই আকাশে বিরাজমান। মেঘসংরম্ভ নাই। নক্ষত্ররূপ রত্নরাজি নভোমণ্ডলে লীন রহিয়াছে। আকাশরূপ বারিনিধির এক কোণে সূর্য্যরূপ বাড়বাগ্নি বিরাজ করিতেছে। মহত্তের মনের ন্যায় নভোমণ্ডল তখন রজোরহিত হইয়া স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন,—কল্লোলমালার গুলু গুলু গর্জ্জনে সাগরশ্রেণী আকুল হইয়াছে। নীহারবিন্দুবাহী জলদমালার বিচরণে সাগর সকল সুন্দর সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগ-তাপে তাপিত আছে বলিয়াই উহারা যেন ভূতলে স্বীয় দেহ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে; আর তরঙ্গরূপ বিশাল বাহু আস্ফালন করিতেছে। উহারা যেন দশাবিপর্য্যয়ে সংসারের ন্যায় বিসংষ্ঠুল হইয়া পড়িয়াছে, কল্লোলমালায় কুটিল হইয়াছে এবং জড় হইলেও স্পন্দময় হইতেছে। সাগরশ্রেণীর তটদেশস্থিত রত্নাবলীর কিরণচ্ছটায় উদীয়মান দিবাকরের কান্তিসন্ততি আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। তীরগত শঙ্খসমূহের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ হেতু শব্দ হওয়ায় যেন তর্জ্জন গর্জ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে। উত্তাল তরঙ্গমালা হইতে মেঘবৎ গভীর গর্জ্জন উত্থিত হইতেছে; তাহাতে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভীষণতাময় হইয়াছে। প্রবাল-পাদপ সকল বর্ত্তুলাকার আবর্ত্তমণ্ডলে পড়িয়া ঘুরিতেছে। সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে মকরনিকরের গভীর-গর্জ্জন উত্থিত হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যের পুচ্ছাঘাত বশতঃ বহু তরণী জলমগ্ন হইতেছে। তরণীর আরোহীরা তখন করুণ চীৎকারে দিক্‌সকল আকুল করিতেছে। মকরকূর্ম্মাদি জলজন্তুগণ গ্রীবা উত্তোলন করিয়া জলমগ্ন যাত্রীদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। সূর্য্য ও সূর্য্যাশ্বের প্রতিবিম্ব তরঙ্গমালার উপরি পতিত

হওয়ায় তাহা যেন আকাশবৎ প্রতীত হইতেছে। এক একবার প্রবল বাত্যা আসিতেছে, তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ মহাজননৌকা জলসাৎ হইয়া যাইতেছে। তরঙ্গোপরি ভাসমান মণিরত্ন সকল তরঙ্গাঘাতে তীরগত হইয়া উৎপতন করিতেছে; উৎপতনকালে রত্নরাশির ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে; নানাস্থানে নানা রশ্মিবিকিরণকারী মণি মাণিক্য সকল এক একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে। কোন স্থানে হিণ্ডীরময় আবর্ত্ত-বিবর্ত্তোপরি মকরব্যূহ ভাসিয়া উঠিতেছে। কোথাও জলমগ্ন মাতঙ্গসমূহের শুণ্ডাসকল ঊর্দ্ধোন্নতভাবে অবিকল বংশবনবৎ প্রতীত হইতেছে। তরঙ্গ-সমূহোপরি করি-পুচ্ছ সকল লতাততির ন্যায় অনুভবগম্য হইতেছে। করী-দিগের নীলপ্রভ পৃষ্ঠ যেন ভৃঙ্গসজ্ঘ; তাহাতে ফেনপুঞ্জ কুসুমাবলীর ন্যায় সংলগ্ন;—মনে হয় যেন মাধব জলাভ্যন্তরে নিজ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বিশ্রাম লইতেছেন। কোথাও অগণিত দৈত্য বাস করিতেছে। কোথাও দেবনিবহ বাস করিতেছেন। কোথাও ফেনপুঞ্জময় তরঙ্গমালা তারকা-নিকরমণ্ডিত গগনমণ্ডলের উপহাস করিতেছে। কোথাও পক্ষযুক্ত পর্ব্বত সকল পক্ষচ্ছেদনের আশঙ্কায় জলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গুহামধ্যগত মশকপালের ন্যায় অবস্থিত আছে। কোথাও তীরগত পর্ব্বতগণ বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গমালার আঘাত পাইয়া-পাইয়া খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। কোথাও সাগরগর্ভস্থ রত্নরাশির সমুত্থিত প্রভাপুঞ্জ আকাশক্ষেত্রের অঙ্কুরনিকরবৎ প্রতীত হইতেছে। কোথাও সমুদ্র-সৈকতের স্তূপে স্তূপে শুষ্ক শুক্তি-নিঃসৃত মুক্তারাশি পড়িয়া আছে। কোথাও কোথাও সাগর সকল তন্তু-বায়ের তন্তুগত বসনের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। কোথাও ইন্দ্রনীলমণিময় তটসকল মুক্তাশুক্তিনিচয়ে শোভিত হইয়া শতচন্দ্রসমন্বিতবৎ প্রতিভাত হইতেছে। কোথাও তরঙ্গোপরি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কুসুমিত তীর-তালীবন রত্নরাজির করনিকর বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কোথাও জলজন্তু সকল ফললাভার্থ তীরগত এলাবনে প্রবেশ করিতেছে। কোথাও তীরগত আম্রকদম্বাদি বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়াছে; জল-জন্তুগণ বাস্তব জ্ঞানে তাহা খাইতে গিয়া প্রতারিত হইতেছে। কোথাও কোন বৃহৎ খেচর জন্তুর প্রতিবিম্ব দেখিয়া জলজন্তুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ

ধাবিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে চতুঃসাগর আকাশবৎ সুনির্ম্মল; উহারা স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে ত্রিজগতের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছে; তাই কুক্ষিস্থ ত্রিজগদ্‌বিধারী মূর্ত্তিবিরহিত নারায়ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় অনুমিত হইতেছে। গাম্ভীর্য্য, নৈর্ম্মল্য ও বিস্তৃতি, এই সকল গুণে মনে হইতেছে, চতুঃসাগর যেন হৃদয়ে আকাশ ধারণ করিতেছে। কমল যেমন নিজোদরে ভ্রমর ধারণ করে, তেমনি ঐ চতুঃসাগর হৃদয়ে জলচর বিহঙ্গবর্গের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। সমুদ্র সলিলের অন্তর্গত গিরিকন্দরে যেন প্রলয়ের মেঘমালা লুকায়িত আছে; বায়ুর প্রবেশনির্গমরূপ উদ্গারে কন্দরোদরের অনন্ত গাম্ভীর্য্যগুণেই ইহার অনুমান হইতেছে। জলাভ্যান্তরগত পর্ব্বতের গুহা হইতে আবর্ত্তসমূহের গভীর গুলুগুলুধ্বনি আবির্ভূত হওয়ায় সমুদ্রের কোন কোন স্থান বজ্রবৎ ভীষণাকারে অনুমিত হইতেছে; সমুদ্রের বাড়বানল যেন অগস্ত্য মুনিকেও গ্রাস করিতেছে। সলিলরূপ কানন যেন আকাশে উত্থিত হইয়াছে। জলকণাশ্রেণী ঐ কাননের পুষ্পাবলী, তরঙ্গ উহার তরু এবং লহরী উহার মঞ্জরীরূপিণী। উড্ডীয়মান মৎস্যাদি প্রাণি-পরিবৃত তরঙ্গশ্রেণী একবার আকাশে উঠিতেছে, উঠিয়া আবার নিম্নে পড়িয়া যাইতেছে।

বিপশ্চিৎ ভূপতির সৈন্যদল এ হেন সাগরের তীরদেশে উপস্থিত হইল এবং বিশাল তীরভূমিত গগনচুম্বী শৈলশিখরে এলা, লবঙ্গ, বকুল, আমলকী, তাল ও তমাল কাননের ভ্রমরাত শ্যামকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৩

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই বিপশ্চিৎ রাজার যাহারা পার্শ্বচর ছিল, তাহারা তাঁহাকে সেই বিবিধ বিচিত্র বন, বৃক্ষ, সাগর, শৈল ও মেঘাদি রম্য রম্য বস্তু দেখাইতে লাগিল। বলিল,—দেব! দেখুন দেখুন, এই গিরির শিখরদেশ কেমন সমুচ্চ—যেন গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ স্তরে স্তরে প্রস্তর সকল বিন্যস্ত আছে, তাহাতে ইহার মধ্যস্থল কেমন উন্নত দেখা যাইতেছে। ঐ বনাবলীর মধ্যে মধ্যে কি সুন্দর সুবিন্যস্ত বকুল, নারিকেল ও পুন্নাগাদি পাদপবৃন্দ বিরাজ করিতেছে। এই দেখুন, নানাবিধ সৌরভ লইয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। ঐ দেখুন, সমুদ্রের তীরস্থিত উপত্যকাভূমি, তৎসন্নিহিত শিলাসকল, এমন কি পর্ব্বতের মূলদেশ পর্য্যন্ত ফলপল্লব-ব্যাপ্ত বনভূমিও সমুদ্রতরঙ্গরূপ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন, গিরিশ্রেণীর অধিত্যকায় কত মেঘ বিশ্রাম করিতেছে; বাতাস দিয়া ধূমস্তোম অপসারণের ন্যায় সমুদ্রই যেন পবনচালিত তরুলতাদিরূপ বাহু বিক্ষেপে উহাদিগকে বিধূনিত করিতেছে। ঐ দেখুন, সাগরতীরে যে সকল বৃক্ষ আছে, পূর্ণিমায় জলবৃদ্ধি হওয়ায় তৎসহ সমাগত শঙ্খশ্রেণী উহাদের শাখায় শাখায় সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে চন্দ্রবিম্ববৎ সুধাময় ফলরাজিশোভী কল্পতরুসমূহের ন্যায়ই উহারা প্রতিভাত হইতেছে। ঐ দেখুন, তরুগণ লতাবধূর সহিত রক্তপল্লবরূপ পাণিদ্বারা রত্নপুষ্পসমূহের উপহার লইয়া আপনাকে যেন পূজা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ শুনুন, ঋক্ষ যেমন ঘুর ঘুর ধ্বনি করে, তেমনি ঐ ঋক্ষবান্ গিরি শব্দ করিতেছে। উহার গুহামুখে পাষাণশ্রেণীরূপ দশনরাজি বিরাজমান; সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জলজীব ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, ঐ গিরি উহার গুহামুখদ্বারা তৎসমস্তই গ্রাস করিতেছে। এই যে মহেন্দ্রাচল রহিয়াছে; ইহার উপরিভাগে মেঘদল গর্জ্জন করায় মনে হইতেছে, এ গিরি যেন কোন বিপক্ষদলকে তর্জ্জন-গর্জ্জনে তিরস্কার করিতেছে। ঐ দেখুন, চন্দন-

চর্চ্চিত শ্রীমান্ মলয়াচল যোদ্ধার ন্যায় প্রতিযোদ্ধা সাগরের তরঙ্গরূপ ভুজাস্ফালন নিবারণ করিতেই যেন সমুন্নত রহিয়াছে। এই সাগরের সর্ব্বত্রই রত্ন আছে! তরঙ্গরূপিণী মালারাজি দ্বারা ইহা সুশোভিত হইতেছে; গগনবিহারী প্রাণিগণ ইহাকে ধরণীদেবীর রত্নবলয় বলিয়াই অনুমান করিতেছে। এই যে বনরাজি-পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, এ সকল বায়ুবেগবিক্ষুব্ধ সর্পসমূহের ন্যায় নতোন্নতভাবে স্পন্দমান হইতেছে। সর্পমস্তকে রত্নের অভাব নাই, এই সকল গিরিশিখরেও তেমনি প্রচুর রত্ন বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গোপরি কত মকর ও জলহস্তিসকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে; মনে হয়, তাহারা যেন গিরিশৃঙ্গ গ্রাস করিবার জন্যই বদন ব্যাদান করিয়া ধাবিত হইতেছে। ঐ দেখুন, একটা মাতঙ্গ দৈবাৎ সাগরের অগাধ জলে পতিত হইয়াছে, জলে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে, মাত্র শুণ্ডাদণ্ডটি উন্নত করিয়া মাতঙ্গ মরণাপন্ন হইয়াছে। ঐ সাগর সকল অগাধ সলিলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; উহাদের মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত আছে, তাহাতে উহারা বিষম হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মের অনন্ত অসীমাকারে অবস্থিত। ইহার গর্ভে এখন আর সার-সামগ্রী কিছুই নাই; পূর্ব্বে দেবাসুরগণ মন্থন করিবার সময় ইহার সমস্তই হরণ করিয়া লইয়াছেন। কতিপয় সূর্য্যকান্তমণি মাত্র এই সাগর গোপনে রাখিয়াছিল। সেই সকল মণি তেজোময়; তাই পাতাল-তল হইতেও স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। মণিগুলি গোপনে সুরক্ষিত হইয়া পরে পশ্চিমাব্ধির মধ্যে প্রত্যহ এক একটি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মনে হয়, তাহাই বুঝি প্রতিদিন পূর্ব্বসাগরের উপর দিয়া আকাশে উত্থিত হইতেছে, যেমন কোন উৎসব উপলক্ষে কলকল শব্দে চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকসমাগম হয়, তেমনি নানাদিক্ ও নানাদেশ হইতে এ সাগরে আসিয়া জলরাশি কলকলরবে মিলিত হইতেছে। আমরা মনে করি, যত কিছু যুদ্ধোৎসাহী জন্তু আছে, তন্মধ্যে জলজন্তুগণই শ্রেষ্ঠ; কেন না, উভয় সাগরের সম্মিলনস্থানে উভয়মুখী স্রোতের প্রতিকূল জলজন্তুগণ পরস্পর আহত হইয়া নিয়তই সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের সে সংগ্রামের আর নিবৃত্তি হইতেছে না। ঐ দেখুন, তিমি প্রভৃতি বড় বড় মৎস্য তরঙ্গোপরি

আবর্ত্তবিভ্রম সহকারে নৃত্য করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। পবন দেব উহাদিগকে যেন জলবিন্দুরূপিণী মুক্তারাজি পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিয়া এই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঐ দেখুন, নদী যেন মুক্তাহার; আর মেঘ যেন তাহার মধ্যস্থ নায়ক মণি; এ হেন মুক্তাহার সাগরকণ্ঠে লম্বিত হইয়া পরস্পরাহতি বশতঃ খন্ খন্ শব্দ করিতেছে। ঐ দেখুন, গুহাগৃহে সাগরসলিল প্রবেশ করায় সিদ্ধ সাধ্যাদি দেবযোনিগণ সে গৃহ পরিহারপূর্ব্বক মহেন্দ্রাচলের ঊর্দ্ধগত উন্মুক্ত তটদেশে গিয়া সুখে বাস করিতেছেন। ঐ দেখুন, মন্দরাদ্রির কন্দরোত্থিত বায়ুবেগে বনাভোগ কম্পিত হওয়ায় কত পুষ্পমেঘ আকাশে বিস্তৃত হইতেছে। বিদ্যুৎরূপ চকিত নয়নযুত মেঘরূপ হরিণকুল, আম্রকদম্বাদি পাদপপরিবৃত গন্ধমাদনের গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হিমাচল-গুহানিঃসৃত মৃদু মৃদু পবন লতানিচয়কে নর্ত্তিত করত উপরিস্থ মেঘ ও নিম্নস্থ সাগরতরঙ্গমালা ভেদ করিয়া ধাবিত হইয়াছে। গন্ধমাদনাচলের পবন আম্র ও কদম্বকুসুমের সংসর্গে সুরভি হইয়া সমুদ্রকল্লোল আলোড়িত করত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ বায়ু, অলকাপুরীর অলকস্বরূপ জলদজালও চালিত করিতেছে এবং কাননভূমির আকাশোপরি পুষ্পমেঘ বিস্তারপূর্ব্বক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। দেখুন, মহারাজ! এই স্থানের বায়ু, কুন্দ ও মন্দারকুসুমের মধুর সৌরভে মন্থর হইয়া তুষারকণিকা বহিয়া বহিয়া কেমন শীতল হইয়াছে, একবার স্পর্শ করিয়া অনুভব করুন। ঐ দেখুন, মল্লিকাদি লতানিচয় নাচাইয়া নাচাইয়া সুরভিত মৃদুমন্দ মারুত পারসীক-নগরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন, মহাদেবের প্রমোদকাননের সৌরভামোদিত জলদবিকম্পী প্রকম্পন কৈলাসশৈলের কমলাকর কম্পিত করিয়া কেমন একপ্রকার মধুরভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এই বিন্ধ্য-কন্দরের সমীরণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করিকুম্ভ-নির্গত মদজলস্পর্শে মন্থর হইয়া কেমন যেন সুক্ সুক্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এই দেখুন, মলয়াচলের বনশ্রেণী যেন একটা নগরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই কাননেরই অভ্যন্তরে ব্যাধবৃন্দ সপরিবারে বাস করিতেছে। এই ব্যাধগণের পরিধান বৃক্ষপত্র; তাহা দ্বারাই উহারা স্ব স্ব লজ্জা

নিবারণ করে। এই বনে ব্যাধের মহিমায় মৃগ-পক্ষীর সঞ্চার আর তেমন নাই। এই দেখুন, চারিদিকেই নারাচাস্ত্র সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে।

মহারাজ! ঐ দেখুন, শৈল, সাগর, সরিৎ, বন ও মেঘবৃন্দ-পরিপূর্ণ দিগ্‌দিগন্ত দিনকরকিরণে রঞ্জিত হওয়ায় মনে হয়, উহা যেন স্বীয় অসাধারণ প্রতাপ-পরিদর্শনে সানন্দে হাস্যচ্ছটা বিকিরণ করিতেছে। এই প্রদেশস্থ শৈলপার্শ্বের বনবীথিকায় বিদ্যাধর-দম্পতিদিগের যে সকল বিহার-শয্যা আছে, তাহাদের উভয় পার্শ্বের অলক্তক-চিহ্ন দর্শনে মনে হয় যেন, সুন্দরী কামিনীরা এথায় পুরুষায়িত আচার করিতেছে।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

পার্শ্বচরগণ কহিল,—মহাশয় মহারাজ! ঐ দিকে দেখুন, পর্ব্বতোপরি কিন্নরমিথুন ক্রীড়াসক্ত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে করিতে দিবাবসান কাল বুঝিতে পারিতেছে না। উহারা মাঝেমাঝে গান গাহিতেছে; সে গানের কতই মাধুর্য্য! উহাদের প্রেয়সীরাও গীত-নিরতা; উহারা সে গান শ্রবণেও অবহিত হইতেছে। ঐ যে হিমালয়, মলয়, বিন্ধ্য, সহ্য, ক্রৌঞ্চ, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর ও মন্দরাদি গিরি-শ্রেণী শ্বেতবর্ণ মেঘপটে পরিবৃত হইয়া বহু দূর হইতে দর্শকদিগের চক্ষে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক পত্রাচ্ছাদিত লোষ্ট্ররাশির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, ঐ সকল কুলাচল শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত; দূর হইতে উহাদের অন্তরাল পথ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, তাহাতে উহারা যেন অবিকল একটা বৃহৎ পুরীর বৃহৎ প্রাচীর বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ঐ দেখুন, নদীনিচয় সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতেছে; প্রবেশকালে বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে ভূপতে! পর্ব্বতোপরি দৃষ্টিপাত করুন; দেখুন,—দশ দিক্ কেমন সুশোভিত হইতেছে! চারিদিকই মেঘপটলে সমাবৃত আছে; তাই প্রগাঢ় শ্যামকান্তি ধারণ

করিয়াছে। বিহঙ্গসকল কলরব করিয়া বেড়াইতেছে, লতাবিচ্যুত কুসুম-রাশি দ্বারা ঐ রম্য বনশ্রেণী সুশোভিত হইতেছে; ঐ বনশ্রেণী দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন দিগ্মণ্ডলের বাহুলতাবৎ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের কলকলরব উহার আলাপের ন্যায় হইয়াছে। মনে হয়, সুন্দরী দিগঙ্গনারা যেন স্বীয় সৌন্দর্য্যে স্বীয় অন্তঃ-পুরিকাদিগকে উপহাস করিতেছে। সমুদ্রের তীরস্থিত কাননরাজি—তমাল তালী ও বকুল প্রভৃতি পাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু দূর হইতে উহা যেন একাকার বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। বিলোল জলধিতরঙ্গ তীরাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে; তাহাতে ঐ কানন সমাহত হইয়া তীরলগ্ন ঘন শৈবালরাশির ন্যায় প্রত্যয়গোচর হইতেছে। ঐ সমুদ্রের এক প্রান্তে কেশব শয়ান আছেন। অন্য দিকে তদীয় শত্রুবর্গ অবস্থান করিতেছে। উহার কোন অংশে পক্ষবান্ পর্ব্বত সকল আসিয়া পক্ষচ্ছেদভয়ে তদীয় শরণ গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিত আছে। কোথাও বা বাড়বানল রহিয়াছে, কোথাও বা পুষ্করাদি মেঘবৃন্দ আসিয়া জল লইতেছে। ঐ সাগরের কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা! একই সময়ে এত ভার সহিতেছে!

রাম! বিপশ্চিৎচতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন, সুমেরুশৈলের জম্বূনদীতট প্রদর্শন করাইয়া কেহ তাঁহাকে কহিল,—রাজন্! ঐ দেখুন, দিনকর-কিরণ-পরিব্যাপ্ত জম্বূনদীতট কেমন শোভা ধারণ করিতেছে। অত্রত্য জম্বূনদীর তটে যে সকল গ্রাম, কানন, পুরী, গিরি, তরু ও স্থাণু আছে, তৎসমস্তই সুবর্ণময় হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থান-সমূহ হইতে চতুর্দ্দিকে কান্তিচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হওয়ায়, মনে হয় নভোমণ্ডল যেন অগ্নিশিখায় সমালীঢ় হইতেছে। নরপতে! এই প্রকার রম্য স্থান সুরগণেরই ভোগার্হ; মানবেরা ইহা ভোগ করিতে পারে না। এই সুমেরুশৈলের সৌরপথপাতী অধিত্যকাগুলি কদম্বকাননে আকীর্ণ হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। উহারা সূর্য্যপথাবরোধী মেঘবৃন্দ বলিয়া আপনার যেন ভ্রম ধারণা হয় না। যেমন পৃথিবী, ইহাও তেমনি একটা স্থলপ্রদেশ বলিয়াই অবগত হইবেন। এই যে সম্মুখে একটা পর্ব্বত দেখিতেছেন, ইহার নাম মলয়াচল; অত্রত্য রম্য রম্য লবলীলতায় জড়ীভূত চন্দনতরুর তীব্রতর সৌরভযোগে এখানকার অন্যান্য তরুনিকরও

চন্দনস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়। সুর, অসুর, নর—সকলেই উহার তিলক ধারণ করে। মহাদেবের নৃত্যকালে যে সকল স্বেদবিন্দু বিনির্গত হয়, ঐ চন্দনতরুর সৌরভবশতই তাহা শীতল হইয়া যায়। উক্ত অচলের সাগরতরঙ্গ-ধৌত সুবর্ণতটে এই সকল চন্দনতরু বিরাজিত আছে। বৃহৎ বৃহৎ সর্প ঐ সকল চন্দনপাদপ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এখানে বিদ্যাধরীদিগের মুখকমলের কি সুন্দর ছবি! যেন পর্ব্বতের সমগ্র শিলাতটই তাহাতে কনককান্তি ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখুন, ক্রৌঞ্চাচল; কত শত বংশস্তম্ভ উহার উপরি ভাগে বিরাজিত রহিয়াছে; উহা হইতে কেমন এক প্রকার কচকচ শব্দ প্রতিনিয়ত পরিশ্রুত হইতেছে। ঐ অচলে যে সকল নদী, কন্দর ও শিলাকুঞ্জ আছে, সে সমুদায়েরও শব্দ হইতেছে। এই সকল শব্দসঙ্কুল বংশধ্বনি ও তাললয়-সংকৃত গীতধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক মুকুলগত ভ্রমরেরা নীরবে অবস্থান করিতেছে; এখানে ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে; তাহাদের কেকারবে ভীত হইয়া বড় বড় অজগর সর্প নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুনুন, মহারাজ! ঐ শুনুন—ক্রৌঞ্চাচলের তটদেশে, কোমল কনকলতাময় কুঞ্জমধ্যে, কান্তসহ ক্রীড়ানিরত কামিনীগণের কেমন মধুর বলয়শিঞ্জন শুনা যাইতেছে। অনুরক্ত রমণীরা উহাকে কর্ণামৃত হেন জ্ঞান করিতেছে। ঐ দেখুন, সাগরসমুত্থিত সলিলকণা গজশুণ্ড-ক্ষরিত মদজল ধারাসহ মিশিয়া গিয়া, অনন্তর বিলোলতরঙ্গরূপ ভ্রমরনিকরে চর্চ্চিত ও বিরক্তীকৃত হইয়া যেন ক্রন্দন করিতেছে! মহারাজ! দেখুন, দেখুন, ঐ দেখুন, নির্ম্মল-কলেবর শশধর প্রতিবিম্বচ্ছলে ক্ষীরসাগরে পতিত হইয়া যেন পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন! নবনীতবৎ কোমলাঙ্গী তারা-সুন্দরীরা উঁহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ দেখুন, মলয়াচলের সুবিমল সানুদেশে নবনব লতাবধূ সকল মধুমত্ত কোকিলকুলের কলকূজনচ্ছলে কাকলী তুলিয়া অনবরত নাচিতেছে। ঐ যে দেখিতেছেন বিলোল ভৃঙ্গমালা; উহারাই ঐ লতাবধূগণের নয়নশ্রেণী। নানাবিধ কুসুমরাজি ঐ সকল লতাবধূর পত্ররূপ পাণিতলে বিরাজ করিতেছে; যেন উহারা বসন্তোৎসবের বাহার দিয়াই বাঁহির হইয়াছে। পর্ব্বতোপরিস্থ বংশচ্ছিদ্রে,

সমুদ্রে শুক্তিমধ্যে, স্বাতীনক্ষত্র দিনে যে সকল বর্ষাবিন্দু পতিত হয়, তাহারা মুক্তারূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এখানে যে সকল গন্ধহস্তী আছে, তাহাদের কুম্ভমধ্যেও মুক্তা পাওয়া যায়। এইরূপে এ পর্ব্বতের বংশ-রন্ধ্র, শুক্তি ও গজকুম্ভ এই স্থানত্রয়ে ত্রিবিধ মুক্তা জন্মিয়া থাকে। রাজন্! এখানে যে সকল শৈল, সাগর, বন, ভেক, শিলা ও গজ আছে, তৎসমস্ত হইতে নানাপ্রকার মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপশমন, শত্রু-সমুচ্চাটন, মারণ, জ্বর, ভয় ও ভ্রমোৎপাদন, দূরগমনক্ষমতা, আকশ-গমন-শক্তি, ভুত-ভবিষ্যৎদর্শনশক্তি এবং ব্যাধি-দুর্ভিক্ষাদির বিনাশশক্তি, ইত্যাদি নানা ব্যাপার ঐ সকল মণি দ্বারা সম্পাদিত হয়। চন্দ্রোদয় হইলে অত্রত্য মন্দরাদ্রি যেন স্বীয় কন্দরজাত বেণুরন্ধ্র দিয়া সুধাসিন্ধু শশাঙ্ক-দেবের স্তুতি করিতে থাকে। এই হিমাদ্রি হইতে যৎকালে মেঘমালা সমুত্থিত হয়, তখন মুগ্ধ সিদ্ধকামিনীরা সাশঙ্কমনে উন্মুখনয়নে চকিতে মেঘগতি দর্শন করিতে থাকে। তাহাদের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, বায়ু বুঝি গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। রাজন্! ঐ দেখুন, মহেন্দ্রা-দ্রির তটে তটে কেমন সুন্দর কুসুমসকল ফুটিয়া আছে। ঐ দেখুন, বিদ্যাধরেরা মনোরম শিলাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। গঙ্গাতরঙ্গের শীতল সলিলকণা আসিয়া ঐ প্রদেশ যেন শীতল করিয়া তুলিয়াছে।

হে ভূপতে! এখানে এই যে সকল পুণ্য ক্ষেত্রোপরি সুবিস্তৃত বনরাজি, পুষ্পবন, উপবন, নগর ও পুণ্য জল আছে; এতৎসমস্ত সন্দর্শন করিলে দৌর্ভাগ্য আর থাকে না। এই পর্ব্বতস্থিত সাধুর আশ্রম, মেঘ-মণ্ডিত হিমাদ্রিকন্দর, অত্রত্য কুঞ্জপুঞ্জ এবং সেতুবন্ধাদি পবিত্র তীর্থসমূহ সন্দর্শন করিলে অতি বড় গুরুতর পাপরাশিও দূরীভূত হইয়া থাকে। রাজন্! মলয়াচলের চন্দন কানন, বিন্ধ্যাচলের মদমত্ত মাতঙ্গ, কৈলাস-শৈলের অনুত্তম সুবর্ণ, মহেন্দ্রাচলের চন্দ্রাভিধেয় ধাতুবিশেষ এবং হিমাদ্রির অতি রমণীয় রত্নরাজি বিরাজিত থাকিতেও দুর্ভাগ্য মানব সে সকল দেখিতে পায় না। তাহারা অন্ধ ইন্দুরের ন্যায় জীর্ণভবনেই বৃথা অবসাদ প্রাপ্ত হয়। ঐ দেখুন, মেঘান্ধকারাবৃত দিক্‌সকল প্রলয়ে একার্ণবীকৃত জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ উঠিয়া চঞ্চল শফরীর

ন্যায় শোভা পাইতেছে। সশব্দ বর্ষাবায়ু চতুর্দ্দিকে শীতল নীহারবর্ষী হইয়া মেঘদলকে মাতাইয়া বহিয়া যাইতেছে। গাত্রে শীতল বাতাস লাগিতেছে; গাত্র রোমাঞ্চে দৃগমে অঙ্কিত হইতেছে। বায়ু চারিদিকেই পুষ্প পল্লব ছড়াইয়া দিতেছে এবং সুনীল জলদাবলীর সঙ্গে সঙ্গে শীতলভাবে ছুটিয়া যাইতেছে। উহা কুসুমকানন আলোড়নপূর্ব্বক চলিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকেই সুন্দর সৌগন্ধ্য বিস্তার করিতেছে। শীতল জলকণা বর্ষণে ঐ বায়ু নিদাঘতপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট বড়ই আরামদায়ক হইতেছে। উহা সুরতাসক্ত কামিনীগণের নিশ্বাসযোগে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্বর্গচ্যুত জীবগণের প্রাক্তন বাসনার অবশিষ্টাংশ লাভের ন্যায় কিঞ্চিৎ সৌরভ্যও লাভ করিতেছে। কুবলয়কানন বিকসিত করিয়া—বন উপবন কাঁপাইয়া মৃদু মন্দ মারুত কেমন বহিয়া যাইতেছে। মারুতের সঞ্চারবেগে জলদপট ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে; কাননের কুসুমসকল বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছে। রাজভবনের প্রাঙ্গণে সুন্দর সুকোমল কুসুমরাশি বিকীর্ণ রহিলে পাছে উহা দলিত হয়, এই আশঙ্কায় তত্রত্য ভৃত্যবর্গ যেমন শনৈঃ শনৈঃ চরণচালন করে, তেমনি আকাশপ্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ধ্য মেঘদলের ছেদ ভেদ না হইবার জন্য ধীরে ধীরে সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে। গিরিশিখরসঞ্চারী সমীরণ কোথাও কুসুমগন্ধ এবং কোথাও বা কমলগন্ধ বিস্তার করিতেছে, কোথাও বায়ুপ্রবাহে সুন্দর সুন্দর বকুলফুলের বৃষ্টি হইতেছে; কোথাও অন্য নানাজাতীয় কুসুমসকল বিকীর্ণ হইতেছে; ঐ সমীর কোথাও হিমযোগে পাণ্ডুবর্ণ এবং কোথাও গৈরিকাদি ধাতুযোগে হরিত, পীত ও শ্যামাভ হইতেছে; উহা কামুকদিগের সুরত জন্য ঘর্ম্ম অপনীত করিতেছে। কোথাও সূর্য্যদেব করসহযোগে দহ্যমান সূর্য্যকান্তমণি হইতে আঙ্গাররাশি বর্ষণ করিতেছেন, কোথাও যুবতীজন পুরুষ-রসায়ন ভোগে তৃপ্ত হয় নাই; সুতরাং সম্ভোগতৃপ্ত পুরুষ যখন তাহার নিকট বিদায় চাহিতেছে, তখন সেই বিদায়বাক্য যুবতীর নিকট বিষবৎ অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও মৃদু মন্দ বনবায়ু কমলস্পর্শে সুগন্ধি এবং সুধাকর-করস্পর্শে সুশীতল হইয়াও বিরহীদিগের নিকট অগ্নিবৎ তাপজনক হইতেছে।

ঐ দেখুন রাজন্! পূর্ব্ব-সাগরের নিম্নতটে যৌবনমদোন্মাদিনী শবরকামিনীগণ, কেমন গতিভঙ্গী দেখাইয়া গমন করিতেছে। উহাদের হস্তে কাংস্যকটক রহিয়াছে; উহারা অপরিষ্কার বসন পরিধান করিয়াছে। ঐ দেখুন, কোন কামিনী প্রাণকান্তসহ নবানুরাগে সম্ভোগাসক্ত হইয়া সুখনিশার অবসানাশঙ্কায় ক্ষণেকের তরেও কান্তকে পরিত্যাগ করিতেছে না; মনে হইতেছে, চন্দনলতা যেন আপন অঙ্গ হইতে সর্পালিঙ্গন কদাচ ত্যাগ করিতেছে না। ঐ দেখুন, প্রভাতকালীন তূর্য্যনাদ হইতে থাকিলেও কোন কামিনী স্বামীর বক্ষে লীন হইয়াই রহিয়াছে; সহজে আর উত্থিত হইতেছে না। দক্ষিণাব্ধির তটে বনশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে কিংশুক কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হওয়ায় মনে হয়, বনবিভাগ যেন অনলে জ্বলিয়া উঠিতেছে; তাই শান্তির জন্য সাগরের জলতরঙ্গ যেন উহাকে সিক্ত করিতেছে। ঐ সকল কিংশুকতরু হইতে বাতাহতিবশে কুসুমসমূহ যেন জলদঙ্গারবৎ পতিত হইতেছে। ঐ বনভূমি হইতে কৃষ্ণকান্তি মেঘদল যেন ধূমস্তোমবৎ নিঃসৃত হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গসকল নির্ব্বাণ অঙ্গারবৎ যেন ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ দেখুন, উত্তর দিকের গিরিশৃঙ্গস্থিত বনভূমি বস্তুতই বহ্নিযোগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পবনদেব দূর হইতে তাহা আবার সঞ্চালিত করিতেছেন। ঐ দেখুন, ক্রৌঞ্চাচলের তটপ্রদেশে জলভারমন্থর মেঘমণ্ডলের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ময়ূরদল নৃত্য করিতেছে। ফল-কুসুমময়ী কাননভূমি বাতবর্ষার বিধূননে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। ঐ সূর্য্যস্যন্দন অস্তগিরির স্বর্ণময় শৃঙ্গে সমাহত হইয়া শ্লথ-সন্ধিবন্ধন হইতেছে। উহার চক্র-কুবরাদির উচ্চধ্বনি শুনা যাইতেছে; অবশেষে ঐ রথ নিম্নস্থানে নিপতিত হইতেছে। ঐ উদয়গিরি-শিখরে চন্দ্রমা ভেরুতরুর কুসুমবৎ প্রতীত হইতেছেন। কলঙ্করূপ ভ্রমর আসিয়া ঐ চন্দ্রকুসুমে বসিয়াছে। বস্তুতঃ বিধাতা এ জগতে কাহারে না কলঙ্কিত করিয়াছেন? ঐ দেখুন, যেমন সন্ধ্যাকালে নর্ত্তনকারী ত্রিলোক-সংহারী রুদ্রদেবের অট্টহাস, তেমনি এই গগনসাগরের চন্দ্রা-লোক, অথবা ইহা যেন জগদ্গৃহের সুধাধবলিমা কিম্বা যেন ক্ষীরনীরধির জলরাশি! ঐ দেখুন, চন্দ্ররূপ ক্ষীরাব্ধির দুগ্ধ তরঙ্গময় প্রভাপুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল

যেন গঙ্গার প্রবাহে পূর্ণ হইতেছে। হে মহনীয়চরিত্র মহামহিম মহারাজ! দেখুন, ঐ গুহ্যকেরা নিশাযোগে বেতাল শিশু সঙ্গে লইয়া ভবদধিকৃত হুন নগর আক্রমণ করিতেছে। ঐ নগরে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলকার্য্য নাই বলিয়াই উহাদের ঐরূপ সাহস হইয়াছে। দেখুন, মহারাজ! যে পর্য্যন্ত না বধূবদন-চন্দ্রমা গৃহবহির্ভূত হইতেছে, ততক্ষণই গগনে পূর্ণচন্দ্রের শোভা বিকাশ পাইতেছে। ঐ দেখুন, তুষারময় বিশাল হিমাচলশৃঙ্গ চন্দ্রকিরণরূপ নব বসন পরিধান করিয়াছে; গঙ্গাজলের প্রবাহগুণে উহার শিলাতল ধৌত হইতেছে। ঐ শৃঙ্গোপরি প্রাদুর্ভূত দীর্ঘ দীর্ঘ বল্লীগুলি উহার জটাচ্ছটার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। ঐ দেখুন, মন্দরের মন্দারকাননে সুন্দরী অপ্সরারা দোলায় বসিয়া গান গাহিতেছে। পবন-প্রসারে উহাদের সঙ্গীতরব দূরপথে নীত হইতেছে। ঐ মন্দরাদ্রির নানা-স্থানে নানামণির কিরণ-পাতে নানা চিত্রবৎ প্রতীত হইতেছে। ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা এতই যে, মনে হয় উহা আকাশোপরিই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, শিলীন্ধ্র তরুর পুষ্পাবলী বিকশিত হওয়ায় ঐ পর্ব্বতশ্রেণী যেন পুষ্পার্ঘ্যপাত্র ধারণ করিতেছে, উহাদের তটদেশ মেঘগর্জ্জনে গম্ভীর হইয়াছে। উহা নক্ষত্র-নিচয়ব্যাপ্ত আকাশশ্রী ধারণ করিয়াছে।

এইদিকে দেখুন, মহারাজ! ঐ কৈলাসশৈল কেমন অপূর্ব্ব শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে। উহার শুভ্রকান্তিচ্ছটা চারিদিকের আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত হওয়ায় ঐ নভোমণ্ডল শম্ভুসূনু ষড়াননের সুধাধবল কেলিগৃহবৎ প্রতীত হইতেছে। খণ্ডিত শাল্মলীকাণ্ড ও নিম্নগত মৃত্তিকাভিত্তি, দূরস্থান-স্থিত হইলেও অনবরত বারিবর্ষণে বৃক্ষখণ্ড ও ভিত্তিপ্রভৃতিতে তৃণাদির অঙ্কুর উদ্গত হইয়া বায়ুপ্রবাহে পরস্পর মিলিত হইতেছে। কদম্ব ও কুন্দসৌরভবাহী বায়ু মকরন্দ বর্ষণে পরিপুষ্ট হইতেছে। আর সর্ব্বজনের নাসিকাবিবরে সৌরভ লেপিয়া দিতেছে। কুসুমকোরক-বিকাশোন্মুখ বনস্থলীতে, পুষ্পশ্যামল জঙ্গলমধ্যে ও ফলযুক্ত বৃক্ষগণাকীর্ণ গ্রামাভ্যন্তরে ঐ দেখুন, লক্ষ্মীদেবী বাস করিবার জন্য যেন নিজেই গিয়া উপস্থিত হইতেছেন। কোশাতকী লতা সকল এই গ্রামের ভবনরাজি মধ্যে বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া সৌধভূমি আবৃত করিতেছে। তাহাতে

গ্রামটী যেন বনদেবতার নগরী বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ঐ যে পর্ব্বত আছে, উহার উপরিভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রম্যগ্রাম লক্ষিত হইতেছে। উহাদের মধ্যে মধ্যে কুসুমাকীর্ণ চম্পকতরুর শাখায় শাখায় দোলা নির্ম্মাণ করিয়া রম্যমূর্ত্তি রমণীরা ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখুন, নির্ঝরনিচয় হইতে ঝম্ ঝম্ রবে জল নির্গম হইতেছে, চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ তালতরু সকল দাঁড়াইয়াছে; লতাগৃহশ্রেণী বিকসিত লতামঞ্জরী দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে মধ্যে ময়ূরেরা আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিতেছে। চতুর্দ্দিকের সমুন্নত তালপাদপে মেঘমালা বিলম্বিত আছে। ঐ গ্রামের বনস্থলী শস্য-শ্যামলা; উহার স্থানে স্থানে পবনচঞ্চল পলাশপল্লবময় লতামণ্ডপ বিরাজমান। কোথাও কুক্কুট, কোথাও চক্রবাক এবং কোথাও বা লাবকাদি বিহঙ্গম অস্ফুটধ্বনি করিতেছে। কোথাও শবরসীমন্তিনীরা গান গাহিতেছে। কোথাও গোপনন্দনেরা স্বচ্ছন্দে গোবৎস সকল পালন করিতেছে। কোথাও ক্ষীর, দধি, মধু ও ঘৃতভোজনে সুপুষ্ট গোপশিশুগণ ক্রীড়াসক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখুন, এবম্বিধ রম্য রম্য গিরিগ্রামগুলি যেন বিধাতার সুধাময় বিশ্রামমন্দির বলিয়াই বোধ হইতেছে।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

অনুচরগণ কহিল,—দেখুন, মহাশয়! ঐ দেখুন, যুদ্ধাসক্ত রাজগণের সেনাদল যুদ্ধার্থ কিরূপ উন্মত্ত হইয়াছে। উহাদের পরস্পর অস্ত্রাঘাতে যে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহা গগনতল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। সমরে যে সকল বীর প্রাণ হারাইতেছে, অপ্সরাগণ মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহাদিগকে বিমানে লইয়া স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই পরস্পরজিগীষু যোদ্ধৃদলের তুমুল সংগ্রাম জনগণের যৌবনোচিত সুরতকেলির ন্যায় একান্তই ধর্ম্মসঙ্গত; সুতরাং বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কেন না, সংসারে সদুপায়ার্জ্জিত সম্পদ, সেই সম্পদ্‌যুক্ত আরোগ্য ও পরহিতার্থ ধর্ম্মযুদ্ধ,

এই সমুদায়ই জীবনের সাফল্যজনক বলিয়া বর্ণিত। নিজের সম্মুখাগত যোগ্য যোদ্ধ্‌ বীরের সহিত যে বীর ধর্ম্মতঃ যুদ্ধ করেন, দেবতার ন্যায়ই তাঁহার সম্মান হইয়া থাকে। দেখুন মহারাজ! তুরগখুরোত্থিত ধূলি-পটলে অন্তরীক্ষ ঢাকিয়া গিয়াছে; তাহাতে আকালিক নিশাসমাগম প্রতীত হইতেছে। ঐ দেখুন, জয়লক্ষ্মী স্বয়ম্বরোচিত সময় বুঝিয়াই যেন শস্ত্রাদি বিবিধ ভূষণ-ভূষিত সাহসী বীরজনকে সুখে বরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। ঐ বীরেন্দ্রগণ সমরে শর, শক্তি, শূল, অসি, গদা, ভুষুণ্ড, তোমর, কুন্ত ও চক্রাদি নানা অস্ত্রে পরিবৃত শুষ্ক তৃণ-গুল্মাবৃত গিরিশৃঙ্গে দাবানলবৎ বিচরণ করিতেছেন। মনে হয়, বিষধর ফণিগণ যেন সংগ্রামসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মহারাজ! এখন একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন, উহা যেন একদিকে সজল জলধররূপ নীল সাগরে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অন্য দিকে চঞ্চল তারকাশ্রেণী যেন উহার স্থূলতম মুক্তাহারের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার কোন দিকে মাত্র নীলবর্ণ আছে; তাহাতে উহা সজল জলদসদৃশ শ্যামল অন্ধকার সহ উপগিত হইতেছে। অন্যদিক্ সুধাকরকরে পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং আকাশের কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভাই না হইয়াছে! যথায় সুরাসুর-গণের নিত্য বিহারস্থান বিমানশ্রেণী তারকারাজিরূপে পরিগণিত এবং যাহা অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রনিচয়ের ও রবিশশি প্রভৃতি উচ্চ গ্রহগণের নিত্যাশ্রয়, সেই আকাশ সর্ব্বথা পরিপূর্ণ রহিলেও অজ্ঞ জনগণের শূন্য বলিয়া জ্ঞান অদ্যাপি তাহাতে বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং একথা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আকাশ অসীম হইয়াও অজ্ঞজনদত্ত অপবাদ যখন মার্জ্জনা করিতে পারিল না, তখন এ সংসারে এমন আর কেহই নাই যে, লোকাপবাদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এই আকাশে বহুবার মেঘসঙ্ঘর্ষ হইয়াছে, প্রলয়ানলের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, পর্ব্বতবৃন্দের পক্ষালোড়ন হইয়াছে, অগণিত নক্ষত্র সম্পর্ক হইতেছে, এবং সুরাসুরগণের সমরব্যাপারে বহুবার বহু সংক্ষোভ হইয়াছে, তথাচ এই মহাকাশ যেমন, তেমনই রহিয়াছে; ইহার কিয়ন্মাত্রও স্বভাবচ্যুতি ঘটে নাই। এতাবতা বুঝিলাম, মহামহিম গুণী জনের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা পাওয়া অসম্ভব। কি বলিব হে সাধুস্বভাব

আকাশ! নিয়তই তুমি তেজোময় রবিশশী ও বিষ্ণুকে নিজের অঙ্কে ধারণ করিতেছ, নিয়ত তোমার অঙ্কে বিদ্যুদাদি দীপ্ত পরিজন পরিভ্রমণ করিতেছে, তথাচ অন্তরের নীলিমরূপ অন্ধকার তুমি পরিত্যাগ কর নাই। এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা নিশ্চিতই। হে আকাশ! তুমি মালিন্যাদি নানা দোষে দূষিত হইয়াও সর্ব্বদাই একরূপী। তাই নির্ব্বিকার তত্ত্বজ্ঞানীর নির্ব্বিষয় সুখের ন্যায় তোমারও শূন্যতারূপ অসাধারণ গুণ বিদ্যমান। ওহে আকাশ! তুমি প্রলয়ের মেঘদল ও উদ্ভিদ তরুলতাদির অবকাশ প্রদান কর—করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধান করিয়া থাক; রবিশশী, দেব, দানব, কিন্নর, সকলকেই তুমি ধারণ করিতেছ; তুমি নির্ম্মলস্বভাব; তাই সমস্ত কর্ম্মই তোমার মনোরম; পরন্তু সূর্য্যাদি তেজস্বীদিগের আশ্রয়দাতা বলিয়া জগতের তুমি সন্তাপক। তোমার এ হেন কার্য্য আমাদের বড়ই খেদজনক। ওহে আকাশ! তুমি বড়ই নির্ম্মল, একান্তই ভাস্বর এবং অতীব উন্নত; তাই দেবগণের তুমি উত্তম আধার। কিন্তু ঐ দেখ, ঐ করকাবর্ষী মেঘ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া সাধারণের পীড়া জন্মাইতেছে; এ দোষ তোমার একান্তই অপকর্ষজনক। আকাশ! দিবসে তোমার ভাস্বর বর্ণ, সন্ধ্যায় তুমি রক্তকলেবর, এবং রাত্রিকালে কৃষ্ণকান্তি; অথচ কদাচ তুমি কোন সৎপদার্থের বাহক নও বলিয়া নিখিল পদার্থেই তোমার অসংস্পর্শ। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ জনের ব্যবহারবৎ তোমারও মায়া সকলেরই দুর্জ্ঞেয়। তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বশূন্য হয়—হইয়াও সর্ব্বকার্য্য সাধন করেন; আকাশ! তুমিও ঐরূপ অন্তঃশূন্য অথচ সর্ব্বোন্নত বস্তুরই-উন্নতিকারক। তুমি আকাশ; তোমার শূন্যপথে বিশ্রাম-স্থান নাই, পথিকের শ্রমাপনোদক ছায়া বা পানীয় জল নাই, গ্রাম বা কোন রাজগৃহেরও অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই; নিবিড় পল্লবময় পাদপ নাই কিম্বা কোন পানীয়শালাও দৃষ্ট হয় না, তথাচ সূর্য্যদেব প্রতিদিনই একই-ভাবে এ পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। কেন করেন?—তাহার কারণ এই যে, সত্ত্বগুণশালী মহাত্মগণ আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যে অবশ্যই তাহা সমাধা করেন। এখানে সৌরালোকরূপ শুভ্র বসন পরিয়া দিবস আপনাকে ভূষিত করিতেছে, রজনী অন্ধকাররূপ

বসনে আবৃত হইতেছে; সুধাকর স্বীয় কিরণরূপ কর্পূররাশি দিয়া নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন; নৈশ নক্ষত্রনিকররূপ কুসুমসমূহে অন্তরীক্ষ আপন অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতেছে; জলধরের ও তুষারের বারিবিন্দুরূপ পুষ্পপ্রকর-যোগে ঋতুকাল আপনাদিকে সজ্জিত করিতেছে; অপিচ এই সকলে মিলিত হইয়াই আবার ভুবনপতি সূর্য্যচন্দ্রের ক্রীড়া-ভূমি—এই আকাশ অলঙ্কৃত করিতেছে। এই আকাশে ধূম, মেঘ, ধূলি, অন্ধকার, চন্দ্র, সূর্য্য, সন্ধ্যা, নক্ষত্র, বিমান, দেব, দানব ও অন্যান্য অনেকেরই নিত্য সম্পর্ক আছে; তথাচ ইহার কিছুমাত্রেই বিকৃতি প্রাপ্তি হইতেছে না; আকাশ তাহার পূর্ব্বতন অবস্থা বর্জ্জন করিতেছে না। বস্তুতঃ মহাশয়দিগের অবস্থান একান্তই বিস্ময়াবহ। এই ত্রিভুবন একটা পুরাতন ভবন; চতুর্দ্দিক্ ইহার ভিত্তিভূমি; ঐ অন্তরীক্ষ উহার উপরিতন গৃহ, পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি ইহার ভাণ্ডাদি গৃহোপকরণ; বিদ্যাধর-নাগ দৈত্যাদি উহার ঊর্ণনাভি এবং ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোক ইহার পিপীলিকাশ্রেণী; এ হেন সংসারভবনে কেবল কাল ও ক্রিয়ারূপিণী দম্পতি রম্যোদ্যানচারী ভোগবিলাসী দম্পতির ন্যায় অনন্তকাল হইতে বসবাস করিতেছে। পরন্তু প্রতিদিনই ঐ ভবনের ধ্বংসাশঙ্কা বিদ্যমান; তথাচ ইহার যে নাশ নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই আকাশে লক্ষ লক্ষ জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, আবার লক্ষ লক্ষ লয় পাইতেছে, তথাচ ইহাকে যে শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, আমি এ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করি না। কেন না, এ সংসার সকলই আকাশে লয় পাইতেছে এবং আকাশ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতেছে। অতএব আকাশকে যাহারা ঈশ্বরা-তিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারা একান্ত উন্মত্ত পদ-বাচ্য। যথায় সৃষ্টি-ব্যাপার সকল নিয়ত অগ্নিস্ফ লিঙ্গাকারে যাতায়াত করিতেছে এবং অনবরত উৎপতিত ও নিপতিত হইতেছে, সেই অনাদি অমধ্য অনন্ত আকাশই কেবল কারণরূপে বিবেচিত; ঈশ্বরাভিধেয় কারণান্তর নাই। এ ত্রিভুবনে যত কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, যিনি তাহার আধাররূপে নিজাঙ্গে সর্ব্ব বস্তু ধারণ করিতেছেন, এবং এই জগদ্ভ্রমের অস্তোদয় যাহাতে হইতেছে, সেই চিন্ময় ব্যোমস্বরূপ পরম ব্রহ্মাকার একমাত্র আমাকেই আমি অবগত হইতেছি। ঐ সম্মুখস্থ গিরিবনভূমির মনোজ্ঞ পাদপরাজি মধ্যে কায়াবিষ্ট বনচরগণ

সুন্দর গান গাহিতেছে। ঐ যে উহার অধোভাগে বিয়োগবিধুর পথিক ঐ গান শুনিয়া একান্ত সরস চটুলভাবে গায়কের প্রতি বারম্বার তাকাইতেছে। ঐ দেখুন, কোন বিয়োগিনী বিদ্যাধরী ঐ উচ্চ শৃঙ্গের উন্নত বনরাজিকুঞ্জে প্রিয়তমোদ্দেশে উৎকণ্ঠিতার ন্যায় অস্ফুট মধুর রবে গান গাহিতেছে। ঐ দেখুন, উহার অধোভাগে এক পথিক ভ্রমণ করিতেছে, আর সেই গান শুনিয়া দোলাচলচিত্তে সম্মুখে যাইতেছে না এবং তাহার সমভিব্যাহারী অনুচরেরাও তাহাকে তথাগমনের উৎসাহ দিতেছে না। ঐ গিরিশিখর; উহার উপরিগত তরুর তলদেশে বসিয়া ঐ বিয়োগিনী বিদ্যাধরী কাতরভাবে নয়নবারি বিসর্জ্জন করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে আর এই ভাবে গান করিতেছে; যথা—হে নাথ! তোমার সেই সহাস্য বদন আমার মনে পড়িতেছে; আমি তোমার অঙ্কশায়িনী হইয়া তোমার ঐ বদনের চুম্বন কতবার যে মহৌষধির ন্যায় খাইয়াছি, এক্ষণে তাহাই স্মরণ করিয়া করিয়া এই সম্বৎসর কাল কাটাইয়া দিয়াছি; আর সহিতে পারিব না; নাথ! প্রসন্ন হও। রাজন্! এই যে বিদ্যাধরীর কথা কহিলাম, ইহার যুবকপতি কোন মুনির শাপে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বৃক্ষ হইয়া রহিয়াছে। সেই নিমিত্ত বিদ্যাধরী ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া বসিয়া ঐ রূপে সম্বৎসর গণনা করিতে করিতে বৃক্ষকেই নিজ পতিজ্ঞানে গাঢ়ালিঙ্গনাদি দিয়া গান গাহিতেছে। আমি পান্থগণের মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার দর্শনমাত্রেই যেন সেই বিদ্যাধরের শাপান্ত ঘটিবে, ইহাই সেই মুনিবর শেষে বলিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম; আমার দর্শনমাত্রেই ঐ বৃক্ষরূপী বিদ্যাধর যেন শাপমুক্ত হইয়া তদীয় প্রণয়িনী বিদ্যাধরীকে আলিঙ্গন করিল। ঐ দেখুন, তাহাদের সেই বহুকাল পরের-প্রণয় ব্যবহার। ঐ দেখুন, পর্ব্বত শৃঙ্গসকল যেন গজরাজি; পাদপসমূহ যেন উহাদের রোমাবলী; তাহাতে ঐ যে প্রস্ফুট কুসুমরাশি আছে, উহারা বাসন্তিক হিমরাশির ন্যায় কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে। এদিকে এই কাবেরী নদী কুসুমরাশিরূপ শুভ্রপট পরিধান করিয়া কেমন অপূর্ব্বভাবে শোভা পাইতেছে। ইহার মধ্যে কত মৎস্যাদি জলজন্তু আছে। তাহাদের সবেগলম্ফনে কি শোভাই না ধারণ করিয়াছে। উহার কূলে কূলে ও সন্নিহিত স্বল্পসলিলময় স্থানসমূহে অসংখ্য মৃগ

বিশ্বস্তভাবে ভ্রমণ করিতেছে। এই দিকে দেখুন, সুবেলশৈলের মধ্য-স্থান, ঐ স্থানে ঐ যে সুবর্ণময়ী উজ্জ্বল ভূমি দেখা যাইতেছে, উহা রবিকর-যোগে কেমন শোভা পাইতেছে; যেন সাগরের তরঙ্গপরম্পরায় ইতস্ততঃ বহুবাড়বাগ্নি বিস্তৃত রহিয়াছে, আর তাহার অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। এদিকে ঘোষপল্লীস্থ গৃহসমূহের শোভা একবার দেখুন, ঐ সকল গৃহ শৈলসন্নিহিত বলিয়া বিশালমেঘবৃন্দে সতত সমাবৃত রহিয়াছে। উহার সীমা প্রদেশে যে সকল নবরোপিত তরু আছে, কুসুমসমূহের বিকাশবশে তাহারা অতীব শোভা পাইতেছে। ঐ সকল গৃহের উপরিভাগ পলাশপাদপের শাখাপল্লবদ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। ঐ সম্মুখে পর্ব্বতের কাছে কাছে যে সকল গ্রাম আছে, তাহা-দেরও শোভা চমৎকার! কেন ন', ঐ সকল গৃহের সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানগুলি প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে কতই না সুন্দর হইয়াছে। ঐ দেখুন, অনূপ স্থান-গুলিতে ময়ূরদল নাচিতেছে। জলপ্রপাতের ধ্বনিরূপ বাদ্যধ্বনি গুহাভ্যন্তরে শব্দিত হইয়া সেই নৃত্যের অনুকরণ করিতেছে। স্বর্গবোধে গায়কদল ঐ সকল স্থানে সানন্দে গান করিয়া অভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেছে। পার্ব্বত্য গ্রামসমূহে যে সকল পুষ্পোদ্যান আছে, তন্মধ্যে মধুপানমত্ত মধুপকুল কূজন করিতেছে; তাহাতে কামোন্মত্ত ঘোষদম্পতি সকল কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেছে। আমার মনে হয়, যদি দেবগণ নন্দনকাননে থাকিয়াও ক্রীড়া করেন, তথাচ ঐরূপ আনন্দ তাঁহারা প্রাপ্ত হন কি না সন্দেহ! এই স্থানের কাননশ্রেণীর লতাকুল ভৃঙ্গসঙ্ঘের ক্রীড়াসাধন দোলাস্থানীয়, দেখিয়া ব্যাধবধূগণ সানন্দে গান গাহিতেছে। মৃগীগণ সেই গানে মুগ্ধ হইতেছে, আর উহাদের সুনয়নে নিজ নিজ সুনয়ন যেন মিশাইয়া দিয়াছে। নিজ রমণীদিগের নয়নশোভাপহারিণী মনে করিয়াই যেন ব্যাধগণ ঐ মুগ্ধ হরিণীদিগকে শত্রুর ন্যায়বিনা কারণে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখুন, সম্মুখস্থ গ্রামসমূহে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। মৃদু মন্দ পবন ঐ সকল পুষ্পের আমোদভরে একান্ত সুরভিত হইয়া লতানিচয় কম্পিত করত পান্থজনের শ্রমাপনোদন করিতেছে, আর জলসম্পর্কে জলবিন্দুযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ বায়ুপ্রবাহে

গ্রামসকল সৌরভ্য শৈত্যাদি গুণে যেন সুধাংশু অপেক্ষাও উত্তম হইয়াছে। অত্রত্য নির্ঝরনিবহের জলরাশি শব্দায়মান হইতেছে। স্থানে স্থানে উন্নত উন্নত তালতরু সকল দাঁড়াইয়া আছে। বিকসিত কুসুমাকীর্ণ লতানিচয় সুশোভিত হইতেছে। ঐ অন্তরীক্ষ চন্দ্রাতপবৎ শোভা পাইতেছে। ঐ সীমান্তে জলদজাল লম্বিত হইয়াছে; কাজেই এই সকল অতি রম্য গ্রামশ্রেণী চন্দ্রলোকস্থ উদ্যানবৎ প্রতিভাত হইয়া নানাগুণে ব্রহ্মলোকস্থানও পরাজয় করিতেছে। শিখিগণের সুকোমল পুচ্ছখণ্ডের সম্পর্কগুণে ঐ সকল গ্রাম যেন চন্দ্রকান্তমণিময়রূপেই বিরাজমান হইতেছে। বিদ্যুদ্বিমণ্ডিত জলধরদিগের ঘর্ঘরনিনাদ শ্রবণ করিয়া নৃত্যশীল ময়ূরেরা নব নব তাণ্ডবকালে ঐ সকল পুচ্ছ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলরূপ ভূষণ যাহাদের একপার্শ্বে এবং জলভারাবনত শ্যামল মেঘরূপ গজগণ যাহাদের অপর পার্শ্বে, সেই সকল গিরিতটভূমিতে অবস্থিত হইয়া ঐ দেখুন, ঐ গ্রামসমূহ কেমন শোভা পাইতেছে। অত্রত্য গিরিগহ্বরগুলি নন্দনবৎ অতীব সুরভি। এখানকার কুঞ্জপুঞ্জ কল্পতরুদিগকেও পরাভূত করিতেছে এবং মধুপ-সমাবৃত বিকসিত নিম্বতরুনিকরে পরিবৃত রহিয়াছে। অতএব আমার সাধ হয়, আমি এইখানেই থাকিয়া যাই। এই সকল পার্ব্বত্য গ্রাম মৃগীদিগের মধুর গানে রমণীয়; মনোরম কামগৃহে থাকিয়া জীবের যেরূপ প্রীতি সঞ্চার হয়, এখানেও মানবগণের তেমনই অনুরাগ অবলোকিত হইতেছে। গিরিপ্রদেশ হইতে এই গ্রামশ্রেণীর গহ্বরে গহ্বরে স্ফটিকময় স্তম্ভরাজির ন্যায় কত সুদৃশ্য নির্ঝর জল পতিত হইতেছে। তদ্দর্শনে ময়ূরীরা কি সুন্দর নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের নৃত্য নিরীক্ষণে কুসুমভারাবনম্রা লতা-কামিনীরাও যেন বিলাসিনী হইয়া নির্ঝরসমীপস্থ কুঞ্জপুঞ্জে অবস্থান করত কেমন এক প্রকার সমীরকম্পনচ্ছলে নাচিতেছে। ঐ গ্রামসমূহের উপবন-তরুনিকরে হরিতাল-বিহঙ্গেরা কেমন সুখে বাস করিতেছে। এই স্থানস্থ বাপীশ্রেণী হংসসারসাদির মধুর নাদে নিনাদিত হইতেছে। আমার বিবেচনা হয়, গিরিগুহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কামদেব যেন স্বীয় রস বিস্তার করিয়া পরমানন্দে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই

দেখিতেছি, মেঘোদয় হইয়াছে। হে মেঘ! তোমার চরিত মহতের ন্যায় অতি উদার। তুমি জগৎপালক মহাশয়। তোমার আকৃতি আতপ-হারিণী, অভ্যুন্নতা ও গভীরতাময়ী। জলধর! তুমি গিরিশ্রেণীর শিরো-ভূষণ এবং তুমিই জলের একমাত্র আশ্রয়স্থান। তোমার গুণের সীমা নাই; তথাচ তুমি যখন বর্ষণকালে ঊষরক্ষেত্রে ও পল্বলাদি ব্যর্থ স্থানেও পরমানন্দে সুক্ষেত্রের ন্যায় জলাদি প্রদান করিয়া থাক, তখন তোমার যে স্থান-অস্থান-জ্ঞান নাই, তাহা দেখিয়া বড়ই খেদ হইয়া থাকে। বারিধর! গঙ্গাদি যত কিছু তীর্থ আছে, সেই সমুদায়ে প্রত্যহ তুমি স্নান করিয়া থাক; পর্ব্বতাদি যে সকল উচ্চ স্থান আছে, তাহাতে বসিয়া সকলকেই তুমি জল দান কর, বনস্থলীতে মৌনব্রতী হইয়া বাস কর, বর্ষাকালে তোমাদ্বারা প্রভূত জল বিতরিত হয়; তাই শরতে সর্ব্বস্বহীন হইলেও তোমার দেহের অপূর্ব্ব শ্রী দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু দানের জন্য উত্থিত হইয়াও তুমি যে বজ্র প্রকটনপুরঃসর কটু ধ্বনি করিয়া থাক, তোমার এই ক্ষুদ্র জনোচিত ব্যবহার নিতান্তই অবিধেয়। এ সংসারে দেখা যায়, উত্তম বস্তুও যদি দুষ্টস্থানে পতিত হয়, তবে তাহা দুষ্ট হইয়া পড়ে আর অনুত্তম বস্তুও উত্তম স্থানগত হইলে উত্তম হইয়া থাকে। এই জন্যই অদ্য সুনির্ম্মল শুভ্র সলিল, মেঘাকার মন্দাধারে গিয়া কৃষ্ণচ্ছবির ন্যায় দেখা যাইতেছে। ঐ বারিদবৃন্দ যখন বারিবর্ষণ করে, তখনই তাহাতে ভূমিভাগ পূর্ণ হইয়া যায়। বারিবর্ষণেই ভূতলের ম্লান শস্য সকল সরস হইয়া উঠে।—ধনী যেন ধন দানে দরিদ্র বন্ধুকে পোষণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে মূর্খদিগের বিষয় ভাবা যাউক। নির্ঘৃণতা, চঞ্চলতা, অপবিত্রতা, সতত ভ্রমণ-কারিতা ও নিন্দনীয়তাদি যে সকল দোষ মূর্খদিগের বিদ্যমান, আমার অদ্যাপি ধারণা হয় নাই যে, মূর্খেরা ঐ সকল দোষ কুক্কুরদিগের নিকট হইতে লইয়াছে, কি কুক্কুরেরাই মূর্খদিগের নিকট হইতে ঐ সকল শিখিয়াছে? বস্তুতঃ মূর্খলোকেরা কুক্কুরের ন্যায় জঘন্য; তাহারা বহু দোষে দূষিত রহিলেও তাহাদের শৌর্য্য, সন্তোষ ও ভক্তি প্রভৃতি কতিপয় গুণ আছে বলিয়াই তাহারা অনেক লোকের নিকট আদর পাইয়া থাকে। যাহারা উন্মাদনায় বা ক্রোধের উত্তেজনায় কূপাদিতে পতনোদ্যত হয়,

মদিরাপানে মত্ত হয়, ভূতাবেশে সতত ধাবিত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, নিতান্ত ভোগাসক্ত বিষয়লম্পট মূর্খ লোকেরাই তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে মূর্খেরা কুক্কুরতুল্য এবং ঐ উন্মত্তাদি হইতে তুচ্ছস্বভাব। সিংহ ও কুক্কুরের পশুভাব সমান; কিন্তু মেঘধ্বনি প্রভৃতির কোলাহল সিংহের মুদ্রিত নয়নে অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। কিন্তু কুক্কুরেরা ঐ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হয়; কাজেই উক্ত উভয়ের পার্থক্য আছে যথেষ্ট। পণ্ডিতে ও মূর্খে যত পার্থক্য, উহাদের পার্থক্যও সেইরূপই। কুক্কুরকে বলা যায়, ওহে কুক্কুর! তুমি সর্ব্বদাই অপবিত্র! কোন কারণ নাই অথচ তুমি সমস্ত পথ পরিভ্রমণ করিয়া থাক। তোমার চিত্তবৃত্তি মূর্খের ন্যায়; তাই মনে হয়, কোন মূর্খই বুঝি তোমাকে নিত্য অশুচিতাদি গুণ অভ্যাস করাইয়াছে। বিধাতা নিয়ত তুল্যাতুল্য জগদ্ব্যাপার নির্ম্মাণ করিয়াছেন; একত্র একজাতীয় বহু বিষয় দেখিবার বুঝি তাঁহার সাধ হইয়াছিল, তাই বুঝি স্বদুহিতা দেবশুনীর বংশধর কুক্কুরের জন্য গর্ত্তমধ্যে বাস, বিষ্ঠাদি বস্তু ভক্ষণ, প্রকাশ্য রাজপথে মৈথুনেচ্ছা এবং সর্ব্বজন-নিন্দনীয় এই কুৎসিত দেহ বিধান করিয়াছেন। একদা এক কুক্কুরকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসিয়াছিল, তোমা হইতে অধম কে আছে? তখন কুক্কুর সেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বলিয়াছিল, যে জন অজ্ঞানকে, অপবিত্র শরীরকে এবং অবিচারকে আশ্রয় করিয়াছে, আমা অপেক্ষা অধিক অধম সেই-জনই। আমাতে বিক্রম, ভক্তি ও ধৈর্য্য এই সকল গুণ বিদ্যমান; কিন্তু মূর্খ জনে উহার একটীও মিলিবার নহে। সুতরাং মূর্খ লোক আমা হইতে সম্পূর্ণই অধম। ফল কথা, কুক্কুর অতি কদর্য্য-কার্য্যেই লিপ্ত; সে জীবিত নকুলাদি প্রাপ্ত হইয়া বিনা দোষে বধ করে, বিষ্ঠাদি অতিনিকৃষ্ট বস্তুতে একান্ত স্পৃহালু হয়, ছাগাদি দুর্ব্বল জন্তুদিগকে বিনাপরাধেই কামড়াইয়া থাকে; যৎকালে কুক্কুরীর সহিত মৈথুনাসক্ত হয়, তখন সকলেই লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়না করে। ফলে বিধাতৃসৃষ্ট কুক্কুরাকার ক্ষুদ্র প্রাণী সারা জীবন কৌতুকেই অতিবাহন করিয়া থাকে। এ হেন কুক্কুর হইতেও মূর্খ লোক নিকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

অনন্তর কোন কাক নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিবে বলিয়া শিবলিঙ্গোপরি উপ-

বিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে কোন ভাবুক বলিতে লাগিলেন—ঐ কাক বিসর্জ্জনা-প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের উপর উপবেশন করিয়া ইহাই প্রদর্শন করিতেছে যে, এ জগতে যত পাপ কার্য্য আছে, তন্মধ্যে অদ্য আমি শিবদ্রব্য ভোজনরূপ চরম পাপাচরণে লিপ্ত হইয়াছি; একবার সকলে চক্ষু চাহিয়া দেখ! কিন্তু ওহে কুৎসিত কাক! তুমি কটুনিনাদে হংস-সারসাদি বিহঙ্গম রব ঢাকিয়া দিয়া এই সরসীর পঙ্কপুঞ্জে ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রমরগুঞ্জনকেও যে তিরোহিত করিয়া দিতেছ, ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি আমার শিরোব্যথা-জনক শল্যস্বরূপই হইয়া উঠিয়াছ। এই বলিয়া মিত্র সম্ভাষণান্তে অন্য মিত্র বলিল, মিত্র দেখ দেখ, এই কাক কোমল মৃণালনাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সাগ্রহে যে ঘৃণিত বিষ্ঠাদি ভোজন করে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; কেন না, যাহার যেরূপ চির অভ্যাস, সে তাহার অনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে। ঐ কাকের অঙ্গ প্রথমে নানাবিধ পুষ্পপরাগে ধবলিত হইয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, ঐ বুঝি একটা হংস বসিয়া আছে; কিন্তু যখন দেখিলাম, ঐ কাক গলিত কৃমিসমূহ খাইতেছে, তখনই উহার সম্বন্ধে স্বরূপজ্ঞান হইয়া উঠিল। তখনই বুঝিলাম, ওটা কাক বৈ আর কেহই নহে। ঐ কাক যখন নিজের তুল্য কান্তি কোকিলের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন শব্দ না করিলে কোনপ্রকারেই উহাকে কাক বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। যখন নিশীথে লোক সকল নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখন ঐ কাক চতুষ্পথস্থ উন্নত বৃক্ষারূঢ় তস্করের ন্যায় বনমধ্যস্থ প্রাচীন মৃত্তিকাস্তূপোপরি উপবেশন করিয়া আহারান্বেষণে চারিদিকে দৃষ্টি চালনা করিতে থাকে। ঐ দেখ, সারসখণ্ডিত পদ্মের মধু লাগিয়া কাকের দেহ কেমন সুন্দর হইয়াছে! ঐ কাক স্বীয় স্কন্ধ ধূলিধূসরিত করিয়া কেমন বিহার করিতেছে।

মহারাজ! দেখুন, দেখুন, দুষ্ট কাক সম্মুখস্থ সরোবরগত পদ্মদল-মধ্যে রাজহংসদিগের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক নানা ভঙ্গী করিয়া ঐ হংসদিগের অনুকরণ করিতেছে। ইহা বড়ই মন্দ দৃশ্য! ফলে উহার মুখমণ্ডল শিলাপ্রহারেরই যোগ্য। রে কাক! কর্কশ রবরূপ ক্রকচ দ্বারা তুমি সর্ব্বদাই চিহ্নিত থাক, তোমার সেই সদা সশঙ্কভাব এক্ষণে কোথায় গেল! ওহে কাক! তুমি এই কোকিলশিশুকে বৃথা

পুত্র জ্ঞানে পোষণ করিতেছ; তোমার এ কার্য্য যে একান্তই উপহাসাস্পদ হইবে, একথা কি বুঝিতে পারিতেছ না। কাক! তুমি পদ্মবনের কলঙ্কস্বরূপ; সেখানে থাকিয়া তুমি যে কর্কশ ধ্বনি করিতে থাক, এটা আমার একান্তই অসহ্য বিষয়। তোমার ঐ কঠোর ধ্বনি শ্রবণে যাহার না চৈতন্য লোপ পায়, তুমি তাহাকেই উহা শুনাও; কোনই ক্ষতি নাই। এই সম্মুখস্থ জলাশয়ে প্রভৃত জন্তু বেড়াইতেছে। এখানে বক-কাকাদি নিত্যই অবস্থিত আছে। অধুনা পেচকদল আসিয়া যদি এই কাকদিগের সহিত যোগ দান করে, তাহা হইলেই এ সভা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়। কোকিল কাকের দলে মিলিত হইলে তুল্যরূপ বলিয়া যদিও পার্থক্য বুঝা যায় না, তথাচ কোকিল কথা কহিলেই সভাস্থ পণ্ডিতের ন্যায় তাহার অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। ঐ দেখ, কুসুমশালিনী কোমলা লতা কোকিলের দলনও সহজে সহিতে পারে, কিন্তু বক-কাকাদির কর্কশ স্পর্শও তাহার অসহ্য বিষয় হইতেছে। লোকে বলে, সাধুর অপরাধ সহ্য করা যায়; কিন্তু খলের ব্যবহার অসহনীয় বিষয় হয়। এই কথার সহিতই উল্লিখিত ব্যাপারের উপমা দেওয়া যায়। ওহে কোকিল! তোমার ঐ মধুর ধ্বনি দম্পতির প্রণয়কলহ সহজেই মিটাইয়া দিতে পারে; কিন্তু কেহই তো তোমার ঐ ধ্বনি শুনিতেছে না। কেন না, ঐ কুঞ্জমধ্যে কাককুল কৌশিকদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছে; তাহাতে যে ঘোররব হইতেছে, সে রবে শ্রোতৃবর্গের কর্ণ বধির হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মূর্খদল বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সাধুর মধুর শব্দ যেমন কেহই শুনিতে পায় না, তেমনি তোমার শব্দও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, ঐ দেখুন মহারাজ! কোকিলশিশু কোমল বাক্যে শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জনে উদ্‌যোগী হইল, অমনি কোথা হইতে সহসা দুষ্ট কাক আসিয়া এই বলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ তুলিল যে, এই আমার পুত্র; ইহাকে আমি পোষণ করিয়াছি। এ শব্দে শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ ভঙ্গ হইল। ফলে অতি বড় দুষ্ট জনেরই এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। হে কোকিল! তুমি আনন্দিত হইয়া মধুর শব্দ করিও না; কেন না, ইহা তো সেই কুসুমসমূহময় ঋতুরাজ বসন্তের রাজ্য নয়; এক্ষণে হেমন্ত ঋতুর অধিকার। তাই হিমসমাযোগে বৃক্ষাবলী

শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; অতএব এ সময় তোমার বাক্য নিষ্ফল হইতেছে। মহারাজ! কোকিল দেখিয়া বিরহিণীরা মধুমাসে এই বলিয়া খেদ করিয়া থাকে যে, হে নিত্যসুন্দর কোকিল! এই মধুমাস কাহার? তুমি নিত্য নিত্য তোমার তোমার বলিয়া শব্দ কর; ইহা তোমার একান্তই ভ্রম; কেন না, এরূপ দুঃখাবহ মিথ্যা কথা তুমি কাহার নিকট শিখিয়াছ? জানিও—মধুমাস বিরহিণীর পক্ষে মধুর নহে; তোমা হেন প্রিয়-সহচর ব্যক্তিরই উহা মধুর হইয়া থাকে। দেব! কোকিল কাকের সহিত মিশিয়া নীরবে অবস্থান করে বটে, উহার বর্ণ এবং পক্ষাদি ধুনন কাকের অনুরূপ বটে, তথাচ ঐ কমনীয়মূর্ত্তি কোকিল দূর হইতেই অনুমেয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মূর্খসমাজে পণ্ডিতকে অনায়াসেই চিনিতে পারা যায়। কেন না, যাহাদের আকার দর্শনে কার্য্যানুমান হয়, তথাবিধ উত্তম ব্যক্তি তুল্যরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও তিনি আপন মহিমায় আপনিই প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। ভাই কোকিল! এই উন্নত তরুশাখায় বসিয়া কাককুল শব্দ করিতেছে; ইহাদের দেখাদেখি তুমি কেন বৃথা শব্দ করিতেছ? এখনও বসন্ত ঋতুর সমাগম হয় নাই। ইহা শীতের সময়; এ সময় তোমার রবে কোন গুণেরই প্রকাশ নাই। অতএব পত্রপুঞ্জ-পরিবৃত পাদপকুঞ্জকোটরে তুমি নীরবে অবস্থান কর। হে মহাশয় মহারাজ! এই সকলের মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কোকিলশিশু তদীয় মাতা কাকীকে ছাড়িয়া যাইতেছে; কাকীই আবার উহাকে চঞ্চুচরণে স্পর্শ করিতেছে। কোকিলশাবক মাতার ন্যায়ই সোৎসাহে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, ভাগ্যবানের মহিমা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া থাকে।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সহচরগণ কহিল,—মহারাজ! ঐ যে সম্মুখে পর্ব্বত আছে, উহার তটদেশে বিচিত্র সরোবর সন্দর্শন করুন। ঐ সরোবরস্থ কমল-কুসুমাদি নানা জাতীয় পুষ্পোপরি নানা বিহঙ্গম উপবেশন করিয়া মধুর নিনাদ করিতেছে দেখিয়া, মনে হয় যেন, উহা নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশপ্রতিবিম্বই প্রতিভাত হইতেছে। ঐ অতি রম্য সরোবর দর্শকের কামোদ্দীপক হওয়ায় উহা যেন কামের প্রধান অনুচররূপে বিরাজ করিতেছে। ঐ সরোবরে নানাজাতীয় পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। সেই পদ্মের অন্তরালে কত রাজহংস কেমন সুন্দরভাবে অবস্থান করিতেছে। উহাতে ভ্রমর-নিকর ইন্দ্রনীলময় পীঠের ন্যায় বিরাজমান; তাই উহা মর্ত্ত্যধামে প্রজাপতির দ্বিতীয় গৃহবৎ পরিশোভমান। ঐ সরোবর অনবরত সলিলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হিমময় করিয়া তুলিয়াছে। উহা নিজে প্রফুল্ল কমলের পরাগযোগে গৌরবর্ণ হইয়াছে। উহার উপরিভাগে মধুলোভ-মুদিত মধুকরনিকরের ও স্নানাগত ব্রাহ্মণগণের গীতধ্বনি হওয়ায় উহা নিত্যই মুখরিত হইতেছে। ঐ সরোবরের অংশবিশেষ তরঙ্গাকুল; উহার কোথাও মদমত্ত মধুকরকুল নিরন্তর ঝঙ্কার-নিরত; কোথাও বা অতি গভীর স্বচ্ছ সলিল যেন নিদ্রানিমগ্ন এবং কোন কোন স্থান বা কমল ও কুমুদাদি কুসুমে সমাচ্ছন্ন। ঐ সরোবর হইতে মুক্তার ন্যায় স্থূল জলবিন্দু সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাধারণের সন্তাপ দূর করিতেছে; কোন সিংহ উহার তীরে আসিয়া স্বচ্ছ জলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে সিংহান্তরের আশঙ্কায় জলপান হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। জলপ্রায় দেশ সকল ঐ সরোবরের তরঙ্গযোগে ধৌত হইয়া যাইতেছে। উহার সুবিস্তৃত কচ্ছদেশ দেখিলে উহাকে ভূতলগত অন্তরীক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সরোবরের মধ্যস্থল বায়ু-বিচালিত পদ্মপরাগযোগে বিদ্যুদ্বিলসিতবৎ শোভমান। উহার স্থানে স্থানে জলবিন্দু ও স্থানে স্থানে অন্ধকার থাকায় উহা সন্ধ্যাকালের আকাশ-সদৃশ চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান হইতেছে। উহাতে হংসশ্রেণী একত্র সঞ্চিত

চন্দ্রবিম্বাবলীর ন্যায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় উহা বায়ুবিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ডময় শারদাকাশবৎ প্রকাশ পাইতেছে। বায়ু সম্পর্কে উহার তরঙ্গ সকল সজল পঙ্কস্থান আহত করিতেছে; তাদৃশ আঘাতে উহা হইতে পটপটা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সেই শব্দ শ্রবণে বিহঙ্গমকুল ক্ষুভিত হওয়ায় তাহাদের গাত্রসংঘর্ষে তীরতরুরাজি হইতে অনবরত পুষ্প বর্ষণ হইতেছে। তদ্দর্শনে মনে হয়, তরঙ্গাবলী যেন সরোবরের পটপ্রণয়ন-কার্য্যে নিরত হইয়াছে। উহার কমলরূপ চঞ্চল তালবৃন্ত উহাকে ব্যজন করিতেছে; মনোজ্ঞ ফেনপুঞ্জ উহার চামরকার্য্যে নিরত হইতেছে; ভ্রমর কোকিলাদিরূপ বন্দীগণ উহার স্তুতি পাঠ করিতেছে; পদ্মলতারূপিণী সুন্দরীরা সর্ব্বদা উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; ইহার সম্মুখে ভ্রমররূপ প্রধান পাত্রগণের সুন্দর গীত ধ্বনি হইতেছে; পদ্মরেণুর মর্দ্দনরূপ যুদ্ধে উহা লিপ্ত আছে এবং ধবল পুষ্পখণ্ডরূপ ভূষণে উহা বিভূষিত রহিয়াছে; সুতরাং ঐ সরোবর রাজার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ঐ সরোবর সৎসঙ্গের সহিত উপমিত হইতেছে; কেন না, সাধু সঙ্গে হৃদয়কমল বিমল ও আহ্লাদযুক্ত হয় এবং স্বাদু রসে সমাপ্লুত হইয়া থাকে। ঐ সরোবরও নিজাভ্যন্তরে সাধারণের আহ্লাদকর পদ্ম সকল ধারণ করিতেছে এবং স্বয়ং সুমিস্ট জলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হে সুন্দর! ঐ দেখুন, মরুস্থলের নির্জ্জন শরদাকাশকে প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়া ঐ সরোবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রতিবিম্বগ্রাহী জ্ঞানিগণের মানসবৎ বিরাজ করিতেছে। ইহা হেমন্তে হিমাবৃত হইয়া কিয়ন্মাত্র লক্ষিত হইবে এবং ইহার শ্যামলতা নস্ট হইয়া যাইবে। তৎকালে ইহা হিমাকুল মেঘবৎ পরিদৃশ্যমান হইবে। দৃশ্য সকল ব্রহ্মের যেমন কোনই বিকার নহে; সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, তেমনি উহার জলে তরঙ্গাদি পৃথক্ কিছুই নাই; সকলই একমাত্র জল। মহারাজ! যাহারা কেবল জলময়, জলেই যাহাদের চক্রাবর্ত্তাদি আকারকল্পনা, তাদৃশ জলাশয়সমূহের তরঙ্গাদিরূপে পার্থক্য-নিরূপণ একান্তই আশ্চর্য্যজনক। বাপী-কূপ-সমুদ্র-সরোবরাদির আকৃতিগত ভেদ ব্যতীত যেমন বাস্তব ভেদ নাই, তেমনি এ সংসারে স্ত্রীপুরুষাদি জীবনিবহের আকারগত ভেদ সত্ত্বেও বাস্তব পার্থক্য

নাই। জীব বারম্বার নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া একান্ত জীর্ণ হয়; তাহাতে তাহার চিত্তের ইচ্ছা দ্বেষাদি অসংখ্য ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, কত প্রকারে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা যেমন নির্দ্ধারণ করা যায় না, তেমনি বিবিধ পুষ্প-লতাদির নিয়ত সম্পর্কগুণে এই জীর্ণদশাপন্ন সরোবরের বহুল কমলদলেরও সংখ্যা করা কাহারও ক্ষমতাসাধ্য নহে। মহারাজ! ইহার জলের বিলাস একান্ত আশ্চর্য্যকর। ঐ দেখুন, ঐ জলগত পদ্ম স্বয়ং অশেষ গুণালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, তথাচ বিজ্ঞজনকৃত দোষ-গোপনের ন্যায় স্বীয় সৌরভ্যাদি গুণসমূহকে অন্তরে মুকুলাবস্থায় রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট গর্হিত কণ্টকরাশি প্রকাশ করিতেছে। পদ্মসমূহের গুণ অশেষ; তথাচ উহারা ছিদ্রময়, অতি সূক্ষ্ম ও অসার; কাজেই একান্ত উপেক্ষার বিষয়। কিন্তু উহাদের গুণও অনেক আছে। ঐ সকল সৌরভ্যময় পদ্মরাজির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণতঃ বর্ণনা করা সহস্রমুখ বাসুকিরও অসাধ্য। বিশেষ কথা, ভগবান্ নারায়ণ; তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিতা ভগবতী কমলা; তিনি স্বীয় শোভা বৃদ্ধির জন্য যে কমল ধারণ করেন, তাহার আর অন্য প্রশংসার প্রয়োজন কি? মহারাজ! এই সরোবরস্থিত কমল ও কুমুদের আন্তরিক দ্বেষভাব রবিশশীর প্রতি যথাক্রমে তুল্য হইলেও উভয়ের আকৃতিগত পার্থক্যে উভয়ই পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই সম্মুখস্থিত প্রফুল্ল কমলের যাদৃশ অপূর্ব্ব শোভা—সে শোভা বিকসিতকুসুম সরোবরের, নক্ষত্রনিকর-সঙ্কুল আকাশের কিম্বা অসংখ্য চন্দ্রের সহিতও তুলনীয় নহে। যে সকল ভ্রমর একমনে সারা জীবন কুসুমরস পান করে, তাহারাই ধন্য সৌভাগ্যসম্পন্ন। আর যাহারা রসাল কুসুমের সৌরভ্য ও অঙ্কুররস পান করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, সেই সকল ভ্রমরেরাও ধন্যবাদার্হ। ঐ যে কত মধুপান-লোলুপ মধুকর কমলা-করের উপর গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, উহারা যেন কোন মধুর রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত ভ্রমরদিগকে উপহাস করি-তেছে। ঐ যে ভ্রমর এক্ষণে শশিগর্ভসদৃশ কোমল কমলোদরে সোল্লাসে শয়ন ও উপবেশনপূর্ব্বক গুঞ্জন করিল, আহা! শিশিরসমাগমে ঐ ভ্রমর নীরস তরুকুসুমে গিয়া মধুলোভে বিচরণ করিবে। ঐ দেখুন, অস্ফুটস্ত

মল্লিকামুকুলে মধুকর কেমন বসিয়া আছে। মনে হয়, সংহারকর্ত্তা রুদ্র যেন উহাকে স্বীয় শূলোপরি বসাইয়া রাখিয়াছেন। কেহ বলিল,—ভৃঙ্গ! তুমি অখিল শৈলগর্ত লতাভবনে ভ্রমণ করিয়া সতত পুষ্পমধুর আস্বাদনার্থ বিচরণ করিতেছ; তথাচ তোমার আশা মিটে নাই। জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি এরূপ দুরাশাপ্রাপ্ত হইলে? অথবা এখনও বুঝি তোমার মনের মত বস্তু মিলে নাই! তাই তুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? কেহ কহিল,—হে কমল-রসাস্বাদসুদক্ষ মধুব্রত! তুমি কেন বৃথা বদরীকুঞ্জে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বীয় কমলরসপুষ্ট দেহকে কণ্টকক্ষত করিতেছ? যাও যাও, তুমি সরোবরে যাও। সুধীজন নিজের যোগ্য অনুকূল সমাজ না পাইলে তিনি যেমন সুধীজনের সংসর্গে থাকিবার অভিপ্রায়ে অগত্যা প্রতিকূল সমাজে গিয়া বাস করেন, তেমনি তোমায় বলি, ওহে মধুকর! তুমিও হেমন্তে বা শিশিরে যখন কমলের কোমল সঙ্গ না পাইবে, তখন অতসী বা বিকসিত তমালে গিয়া অগত্যা কালাতিপাত করিবে। কোন এক ভাবুক অনুচরের দৃষ্টিতে হংসশ্রেণী পতিত হইল। সে রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—মহারাজ! ঐ দেখুন, হংসশ্রেণী সামসঙ্গীতের ন্যায় মধুর কূজন করিতে করিতে চলিয়াছে। কমল-কিঞ্জল্ক খাইয়া খাইয়া উহাদের দেহ-কান্তিও ঐরূপ দর্শনীয় হইয়াছে। ঐ দেখুন, কোন হংসের প্রিয়তমা হারাইয়া গিয়াছে; হংস প্রিয়ার সন্ধানে আকাশে উত্থিত হইয়াছে। হংস প্রিয়ার চিরবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। বলিব কি, মহারাজ! এরূপ স্ত্রৈণতা যেন কোন পুরুষের হয় না। দেখুন দেখুন, দেব! ঐ স্ত্রৈণ হংস প্রিয়তমার জলমজ্জনাশঙ্কায় নিজেই অগ্রে জলে ডুবিয়া মরিয়া গেল! অন্য কেহ বলিল,—আহা! রাজহংস হেলায় যেরূপ কূজন করিল, বক শতবর্ষ শিক্ষা করুক, তথাচ ঐরূপ স্বর ব্যক্ত করিতে পারিবে না। দেখা যায়, জন্ম, স্থান, আকার, জাতি, ব্যবহার, আহার, সমস্তই সমান; তথাচ রাজহংসে ও অন্য হংসে পার্থক্য প্রচুর। ঐ দেখুন, কুমুদ কুসুমবৎ শ্বেতবর্ণ শ্বেতপক্ষ হংস স্বীয় শোভায় লোকলোচনের কিরূপ প্রীতিপ্রদ হইতেছে! ঐ দেখুন, সরোবরের কমলনাল তীরে উঠিতেছে। কমলকুল কেমনভাবে প্রস্ফুটিত আছে। ঐ কমলসঙ্কুল

সরোবরে যে সকল হংস কেলি করিতেছে, উহাদের সহিত কি অপর কোন বিহঙ্গের তুলনা করা যায়? ঐ সরসী যেন রমণী; উহা সুন্দর হংসক-যুগল দ্বারা কেমন শোভা ধারণ করিতেছে; উড্ডীয়মান অলিকুল ঐ সরসীরমণীর লোল অলকাবলী; সারসের কূজন উহার নূপুরনিস্বন; আবর্ত্ত নাভিস্থল, চঞ্চল ঊর্ম্মি নয়নভঙ্গী; বিশীর্ণ জলবিন্দুরাজি হারমুক্তা; কুমুদ, কহ্লার ও উৎপলাদি কুসুম ঐ সরসীরমণীর বিভূষণ। কেহ হংসকে সম্বোধিয়া কহিল,—হংস! জলকাক, বক ও কাকাদিরূপ হিংস্র পক্ষিকুলে পরিব্যাপ্ত সরোবরে তুমি একাকী বাস করিও না। কেন না, সহসা বিপৎপাত ঘটিলেও ঐরূপ দুর্জ্জনদিগের সহিত কেহই বাস করিতে অভি-লাষ করে না। এই তো ভ্রমর, এক্ষণে ইহার কতই আনন্দ! এ বড় বড় গজের গণ্ডে পদার্পণ করিতেছে, পদ্মাকারে বাস করিতেছে এবং কহ্লার, কুমুদ ও কুন্দাদি কুসুমের রসাস্বাদ করিয়া নিজে যে একজন সৌভাগ্যশালী, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু যখন শীত আসিবে, তখন উহাকেই জীর্ণ শীর্ণ বকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, ফলে এইরূপই হইয়া থাকে। বিপদে পড়িলে মহতেরাও অতি দীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন।

রাজন্! ঐ সরোবরের স্বচ্ছ জলে নীরবে যে হংস বিচরণ করিতেছে, উহার পক্ষাঘাতে পদ্মিনীনাল কম্পিত হইতেছে; তাহাতে পদ্মযোনির পদ্মাসনবৎ সুন্দর পদ্ম হইতে যে মধুময় সলিলবিন্দু ইতস্ততঃ বিসৃত হইয়া পড়িতেছে, জলচরেরা তাহা সেইক্ষণেই পান করিতেছে।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

সহচরেরা আবার কহিল,—মহারাজ! বক নির্গুণ পক্ষী হইলেও ইহার একটী মাত্র গুণ এই যে, উহারা 'প্রাবৃট্ প্রাবৃট্' এইরূপ কথা

কহিয়া লোককে বর্ষাকাল স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ বলিল,—ওহে চতুর মদ্‌গু! যথায় মৎস্যাদি বহুল জীব বাস করে, তুমি সেই জলের ভিতর পুনঃপুন তাহাদিগকে চঞ্চুদ্বারা ধরিয়া ধরিয়া ভক্ষণ করিয়াছ, অদ্য দৈববশে তোমার দেহ অপটু হইয়াছে, তুমি মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারিতেছ না, ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়াও নিশ্চেষ্টভাবে তীরে বসিয়া রহিয়াছ; সম্মুখাগত সহজলভ্য মৎস্যদিগকেও ধরিবার তোমার ক্ষমতা নাই। ফলে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরের হিংসা করিলে ফল শেষে এইরূপই হইয়া থাকে। এই বক বিহঙ্গ উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বীয় স্বচ্ছ পক্ষযুগল বিস্তারপূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছে, লোকে দূর হইতে দেখিয়া ইহাকে হংস বলিয়া প্রত্যয় করিতেছে। এই বক যৎকালে অল্প জল হইতে শফরী লইয়া উড্ডীন হইবে, তখনই লোকে ইহাকে বক বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কেহ কহিল,—মহারাজ! ঐ দেখুন, কোন কামিনী হাব, ভাব, সকোপ দৃষ্টি ও হাস্য প্রদর্শন করাইয়া পথিকজনকে কি যেন বলিতেছে! ঐ দেখুন, মূর্খ ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে পরস্পর যেমন সদ্ভাব থাকে না, তেমনি ঐ বক মদ্‌গু প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিদিগের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব নাই। ঐ দেখুন, পল্বলতীরস্থিত পাদপে বসিয়া চঞ্চল বক যেমন চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি কর্দ্দমাক্ত অল্পজলস্থিত শফরী ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বকের গ্রাস হইতে আত্মদেহ রক্ষা করিল। বস্তুতঃ যখন প্রাণহানিকর মহাবিপদ উপস্থিত হয়, তখন প্রাণত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে? বিড়ালাদি হিংস্র জন্তু দেখিলে মৎস্যাদি জলচর জীবের অন্তরে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহার নিকট বজ্রপাতভয়ও অতি তুচ্ছ। এ কথা আমি কোন জাতিস্মর পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি। তিনি মৎস্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেই তদবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ দেখুন, উন্নতহৃদয় ময়ূর ইন্দ্রের নিকট জল চাহিতেছে, মহাত্মা ইন্দ্রও তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন এবং সেই উপলক্ষে নিখিল মহীই জলপূর্ণ করিয়া দিতেছেন। কোন পথিক হরিণদর্শনে দয়িতার নয়ন চিন্তা করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে! অন্য কোন পদার্থের দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই। নত হইয়া জল লইতে ইহবে, এই আশঙ্কায়

ময়ূর জল গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু সর্পগুলিকে সবলে ধরিয়া ধরিয়া ভোজন করিতেছে। মহারাজ! দেখুন, দেখুন, ময়ূরেরা স্বস্ব পুচ্ছজাল বিস্তার করিয়া কেমন সুন্দর নাচিয়া বেড়াইতেছে। ময়ূর পূর্ব্বে মেঘের স্ফটিক নির্ম্মল জল পান করিয়াছে, তাই এক্ষণে তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও ময়ূর জলান্তর পানে সমুৎসুক হইতেছে না। সে অনবরত জলধরের স্মরণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। ফল কথা, যাহারা গুণবানের নিকট প্রত্যাশী হয়, তাহাদের পরিশ্রম বা কষ্টও সুখকর হইয়া থাকে। নরপতে! ঐ দেখুন, কতকগুলি যুবতী সরোবর হইতে কমল, উৎপল, কুমুদ, মৃণাল, পদ্মপত্র ও শীতল জল লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে। তদ্দর্শনে কোন পান্থ জিজ্ঞাসিতেছে,—কেন তোমরা ইহা লইয়া চলিয়াছ? তরুণীরা উত্তর করিতেছে, ওহে পান্থ! কোন বিরহতাপতপ্তা অবলার আমরা সখী; সখীর বিরহতাপ অপনয়নের জন্যই এ সকল আমরা লইয়া যাইতেছি। যুবতীদিগের ঐ উক্তি শুনিয়া পথিকের মনেও তাহার কান্তার কথা জাগিল। পথিক ভাবিল,—এই আকাশ, এই ঘনশ্যামল বর্ষাকাল এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন; এই সকল দেখিয়া আমাদের বিলাসিনী-দিগেরও বিরহানল উদ্দীপিত হইতেছে। এইরূপে তাহারাও সখীগণের পরিচর্য্যায় তাপাপনোদন করিতেছে, আর নির্জ্জনে কতই না বিলাপ করিতেছে।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

ঊনবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

সহচরেরা কহিল—মহারাজ! ঐ দেখুন, পথিক বহুদিনান্তে প্রিয়াকে পাইয়া তৎসমীপে স্বীয় বিরহকালের অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। পথিক বলিতেছে,—প্রিয়ে। তোমার সহিত যখন আমি বিযুক্ত ছিলাম, তখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল; আজ তাহা তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি;

শ্রবণ কর। আমি এক দিন ভাবিলাম—তোমার নিকট দূত পাঠাইব, কিন্তু কাহাকে পাঠাইব? সেই ভাবনায় আমি ব্যাকুল হইলাম; ভাবিলাম —এই বিরহকাল প্রলয়কালোপম; এ সময় প্রিয়ার নিকট আমার সংবাদ লইয়া যাইবে এমন কে আছে! বস্তুতঃ পরের দুঃখ প্রশমনের জন্য সরল-ভাবে যিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন, সংসারে এরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব একরূপ দুর্লভই। এই তো দেখিতেছি, এই গিরিশিখরে অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী পরোপকার-রসিক বারিধর বিদ্যুদ্বনিতা সহ সমাশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। বলি ভাই নভোবিহারী বারিধর! তুমি নিজোচিত গুণসম্পন্ন মহেন্দ্রচাপ গ্রহণ করিয়া আমার প্রিয়ার পার্শ্বে যাও, গিয়া স্বীয় ধারাসিক্ত মন্দ মারুত দ্বারা আমার প্রিয়াকে আশ্বাসিত কর, মুহূর্ত্তের জন্য দয়াপরবশ হও, আর ধীর রবে বার্ত্তা প্রদান করিয়া আইস। যদি ধীর রব ছাড়িয়া তথায় গিয়া কঠোর রব কর, তবে আমার সেই বালমৃণাল-কোমল-কলেবরা তন্বী প্রিয়া সে রব সহ্য করিতে পারিবে না। আহা! প্রিয়া আমার বিরহ-ব্যসনে অবিরল বাষ্পাকুলনয়নে সমাসীনা। ও হে মেঘ! আমি চিত্তরূপ তুলিকা দিয়া হৃদাকাশে সেই সুন্দরীর আকৃতি লিখিয়া আলিঙ্গন করিয়া ছিলাম; কিন্তু বুঝিতেছি না, আমার সেই প্রিয়া অধুনা সে স্থান হইতে কোথায় পলাইয়া গেল। অয়ি প্রিয়ে! মেঘকে এই বলিতে লাগিলাম, আর তোমার চিন্তায় চিন্তায় আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। আমার মনের প্রসার অন্তরে লয় পাইল; তাহাতে আমার পূর্ব্বাপর সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হইয়া গেল। কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় আমার দেহ সে কালে নিস্পন্দ হইল। হায়, হায়, দুঃসহ বিরহযাতনায় কত দুঃখ। এ জগতে সে দুঃখ কেহই সহিতে পারে না। প্রিয়ে! আমি সেই অবস্থায় পড়িয়া গেলাম; আমাকে দেখিয়া অনেক পান্থ মিলিত হইল। কোন পথিকবধূ বক্ষে করাঘাত করিয়া আমার দুঃখে কতই ক্রন্দন করিল; বলিল—হায় কি কষ্ট। পথিক মরিয়া গেল। সেই পান্থসমবায়ের মধ্য হইতে কেহ কেহ আবার মেঘকেও তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর সমবেত পান্থগণ আমার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গন্ধ, পুষ্প, ও মাল্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। পরে কাষ্ঠরাশি সংগৃহীত হইল; আমায় দাহ করিবার জন্য তাহারা ভীষণ শ্মশান-

ক্ষেত্রে লইয়া গেল। সেই রৌদ্র শ্মশান তখন জ্বলিত চিতানলের চট পট-শব্দে শব্দায়মান হইতেছিল। অয়ি পঙ্কজাননে! তৎক্ষণে কতিপয় পান্থ অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আমায় চিতাশয্যায় শয়ন করাইল। অনন্তর চিতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। যখন অগ্নিরূপ কনকের কণামাত্র দৃষ্টি-গোচর হইল, তখন উষ্ণ কৃষ্ণ ধূমলেখা মদীয় কণ্ঠ ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; কিন্তু আমি তোমার আকাররূপ অমৃতদ্বারাই আচ্ছাদিত ছিলাম, কাজেই সে ধূমলেখা আমার কোনই পীড়া জন্মাইতে পারে নাই। কেবল ধূম বলিয়া কথা কি! তোমার মূর্ত্তিরূপিণী মদনতরঙ্গিণীতে অবগাহন করায় সেই মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ বহ্নিরাশিও আমার তাপ জন্মাইতে পারে নাই। আমার সেই মূর্চ্ছাবস্থায় তোমার সহিত বহু কাল আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেছিলাম। সেই সুখের সহিত তুলনায় বিশাল রাজ্যের আধিপত্যসুখও দুঃখপর্য্যায়ে গণ্য হইয়া থাকে। প্রিয়ে! সেই কালে তোমার সে সেই স্মিতপূর্ব্ব মধুর বাক্য, সেই কটাক্ষ-বিক্ষেপ, সেই নখক্ষতাদি চেষ্টা ও সেই রতিকালীন মধুর রব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলে আজও আমার অন্তঃকরণ সুধারসাহ্লাদে মগ্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, পরে তোমার সঙ্গম-জনিত সুরত সুখ-রসায়নে একান্ত তৃপ্ত হইলাম; তাই শ্রমার্ত্ত হইয়া শরতের শীত সুনির্ম্মল শশাঙ্কবিম্বসম কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে চন্দনপঙ্ক-শীতল শশাঙ্ক হইতে সমুৎপন্ন অশনির ন্যায় একান্ত অসম্ভাব্য চিতানল—আমি নিজ শয্যায় অবলোকন করিলাম; দেখিলাম—ক্ষীরাব্ধির বাড়বানলের ন্যায় উহা অতীব ভীষণ।

সহচরগণ এই সময় রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক আবার কহিল—মহারাজ! পতির এই কথা শুনিয়া সেই মুগ্ধাঙ্গনা হাহাকার করিয়া উঠিল; সে প্রগাঢ় মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই সুন্দরীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাহার স্বামী তখন শীতল নলিনীদল-ব্যজনে তাহাকে আশ্বাসিত করিল এবং তদীয় কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া এই মন্দরগিরিতে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর আবার সেই প্রিয়ানুরক্ত পুরুষ প্রিয়ার চিবুক ধরিয়া যে কথা কহিয়াছিল, তাহার সেই শেষ কথা শ্রবণ করুন। সে বলিয়াছিল,—প্রিয়ে!

আমি কিঞ্চিৎ শ্রমার্ত্ত হইয়া যেমন 'হা অগ্নি' এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিতে পারি, অমনি সেই সমবেত পান্থগণ হৃষ্ট হইয়া আমার সেই চিতাগ্নি সত্বর নষ্ট করিয়া দিল। আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়া হৃষ্ট হইলাম। পান্থগণ আমায় চিতা হইতে উত্তোলন করিল। তাহারা আমার অঙ্গে তরুমঞ্জরী দিয়া গাঢ়ালিঙ্গন দান করিল এবং সকলেই সানন্দে হাস্য, নৃত্য ও উল্লম্ফন দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া তুলিল। অনন্তর আমি সেই শ্মশানের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম—সেই শ্মশান সংহারকারী রুদ্রের কলেবরবৎ বিঘ-বিনায়কগণের অভিমত এবং ভীম ভুজগ, শব ও শশিধবল কপাল-পরিপূর্ণ। তথায় প্রবলতর কর্কশ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। ঐ বায়ু পাংশুরাশি পরিক্ষিপ্ত করিয়া পার্শ্বস্থ বনাবলীর হরিৎ কান্তি হরণ করিয়াছে; উহার সঞ্চালনে কঙ্কালগন্ধ সকল পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; উহা ভস্মমিশ্রিত নীহার-পুঞ্জ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছে। ঐ বায়ু,সকলের কেশরাশি বিধুনন করিয়া আকাশকোষস্থ শরাকার ধারণ করিয়াছে এবং শঙ্করের ভূষণার্হ অস্থি-পুঞ্জের অভিঘাতে ঘোর আরাব উত্থাপন করিতেছে। সেই শ্মশানভূমির জ্বলদগ্নিময় চিতা হইতে ধূমপুঞ্জ প্রবাহরূপে নির্গত হওয়ায় স্ফুলিঙ্গময় পবনে তরুরাজির পত্রনিচয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; এই সেই ভীষণ স্থান অগ্নি, বায়ু ও বৈবস্বতের বিহারগৃহ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ স্থান প্রমত্ত শৃগাল ও বায়সাদির শব্দে ভীষণ হইয়াছে; অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কালসমূহে ভরিয়া গিয়াছে এবং ঐ স্থান হইতে উৎকট দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। ঐ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য যে সকল শব আনীত হইয়াছে, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব বন্ধুগণের ক্রন্দনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ স্থানে পক্ষিগণ শবদেহের অন্ত্রতন্ত্র আকর্ষণ করিতেছে; তাহাতে উহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ শ্মশানের কোন স্থান চিতাগ্নিশিখায় স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে; কোথাও মহাকেশপাশ মহামেঘবৎ দেখা যাইতেছে এবং কোন স্থান নৈশ অস্তগিরির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; আমি সেই শ্মশান তখন এই-রূপই ভীষণ দেখিলাম।

উনবিংশত্যধিক শততম স্বর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

সহচরগণ কহিল,—দেখুন মহারাজ! ঐ প্রণয়ি-যুগল এইরূপ আলাপ-আপ্যায়নের পর উত্তম আসবপানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দেখুন, ঐ স্থানে কুসুম-কেশরমণ্ডিত বিবিধ বায়ু কদলী ও কন্দলী প্রভৃতির স্বচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ সকল বিকাসিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ বায়ু কান্ত ক্ষিপ্ত ললনালকের বিলাসক হইয়া বিবিধ আমোদময় ভাবে চলিতেছে, আর ঘর্ম্মবিন্দুসমূহের শোষণ করিতেছে। ঐ দেখুন, লবণজলধির বায়ু কুলাচলসমূহের গুহাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বলোৎকট সিংহের ন্যায় মেরুশিখরাভিমুখে ছুটিতেছে। ঐ দেখুন, জলকল্লোত্থিত যে সকল বায়ু তমাল ও তাল তরুসমূহে শিশুজনবৎ দুলিয়া দুলিয়া পরে তরুশিখর অবলম্বন করিয়াছিল, সে অধুনা পুষ্পধূলিধূসরিত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে উদ্যানমধ্যে নৃপতির ন্যায় বিহার করিতেছে। এই যে বংশবন-বিশ্রান্ত বনবায়ু, এ যেন হস্তিনানগরের নারীগণের নিকট শিক্ষা পাইয়াই গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ণিকার তরুনিকর বায়ুকে তিরস্কৃত করিয়াছিল; এই জন্যই বোধ হয় ভ্রমরনিকর দূর হইতে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছে। এই তাল তরু অত্যুন্নত স্তম্ভের ন্যায় অবস্থিত; তাই যাচকদিগকে ফলপল্লব দানে অপারগ হইয়াছে। নৃপতে! গুণহীন জড়াত্ম বস্তুসমূহের রাগ কেবল শোভারই জন্য হয়। দৃষ্টান্ত দেখুন, কিংশুক তরু কেবল রাগবশেহ নৃপতিজনবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ঐ তরু-কুসুমসকল আগুচ্ছ কর্ণিকারময় হইলেও দর্শকদিগের বিকার কারণ হইয়াছে। ঐ সমুদায় কুসুমের গন্ধমাত্র নাই; কাজেই নির্গুণ জন্তুর ন্যায় ইহা দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি কিছুই হইবার নহে। এই তো অসিত তমালতরুশ্রেণী রহিয়াছে। ইহাদের বিলোল মঞ্জরীপুঞ্জ তাড়দাকারে শোভা পাইতেছে; তাই চাতকদলের অকারণ অম্বুদভ্রম উৎপাদন করিতেছে। এই তো উন্নত বংশরাজি পত্রভূষিত ও দুর্ভেদ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; উহারা স্বীয় কান্তিচ্ছটায় পর্ব্বতরাজি সমাবৃত করিয়া গুণযুক্ত মহাবংশের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ঐ অম্বুদবৃন্দ হেমসানুরূপ আসনোপরি

সমাসীন হইয়া পীতবাসা হরির ন্যায় তড়িদাচ্ছাদিত অম্বর ধারণ করিয়াছে। যাহাতে প্রবেশ-নির্গম-ব্যগ্র বিহঙ্গদিগের ন্যায় ভ্রমররূপ শরনিকর উপবেশন করিতেছে, সেই কিংশুক যোদ্ধার ন্যায় রক্তাক্তদেহ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। প্রমত্ত কামী গন্ধর্ব্ব মন্দারমঞ্জরীর প্রভায় অরুণিত মহেন্দ্রাচলের শিখরে সুপ্ত হইয়া অবস্থিত আছে। ঐ দেখুন, রাজন্! ঐ পান্থ বিদ্যাধরবৃন্দ কল্পপাদপের তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহিত মধুর স্বরে গান গাহিতেছে। ঐ দেখুন, কল্পপাদপের বনে প্রতি পল্লবে পল্লবে বিশ্রান্ত সুরসুন্দরীবৃন্দ গীত ও হাস্য করিতেছে। ঐ সুন্দর মন্দরে সেই মন্দপালনামধেয় উদার মুনি বাস করেন। ঐ মুনিরই সেই প্রখ্যাতনামা পক্ষিণী ভার্য্যা হইয়াছিল। ঐ দেখুন, মহারাজ! মুনিগণের আশ্রমশ্রেণী; উহা সর্ব্ব ঋতুতে ফলকুসুমদায়ক ও নানাবিধ তরুনিকরশালী। ঐ সকল আশ্রমে সিংহ, হস্তী, নকুল ও সর্প প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী জন্তুগণ স্বাভাবিক দ্বেষ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক পরস্পর সপ্রণয়ে বাস করিতেছে। ঐ দেখুন, সমুদ্রতীরে কত বিদ্রুমদ্রুমরাজিত লতা আছে; উহাদের পল্লবস্থ জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যদেব প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন; তাহাতে সেই সকল লতা অতীব সুশোভিত হইয়াছে। যেমন তরুণীগণ বিলাসীদিগের বক্ষঃস্থলে সবিলাসে পরিভ্রমণ করে, তেমনি মণি-মাণিক্যসমূহের আকরে তরঙ্গশ্রেণী আবর্ত্তমালায় পরস্পর কেলি করিতেছে।

রাজন্! ঐ শুনুন, নাগলোকস্থিত রমণীগণের গমনাগমনে তাহাদের যে স্বর্গীয় ভূষণঝঙ্কার উত্থিত হইতেছে, তাহা স্পষ্টতই শুনা যাইতেছে। এই সকল স্থান গজগণ্ড-ভ্রষ্ট মদোন্মত্ত ভ্রমরীগণের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ; সুতরাং ইহা ঐরাবতের স্নানভূমি বলিয়া স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে। এই বনরূপিণী রমণী একান্তই প্রশংসাস্থলী; অত্রত্য পরিমল গন্ধই ইহার নিশ্বাস, ছায়াই শীতলাঙ্গ ও বিকশিত কুসুমই নয়ন; এই রমণী নানা কুসুমশোভায় অন্বিত, উহার বনবিন্যাস বস্ত্ররাজি, নির্ঝর বিমল হাস্যপ্রায় এবং আস্তীর্ণ পুষ্পসকল আস্তরণসন্নিভ। প্রশস্তমনা মানবেরা নন্দনে যেমন আনন্দ লাভ করেন, শুষ্ক শুদ্ধ বনভূমিতেও তাঁহাদের তেমনি আনন্দ হইয়া থাকে। মুনিদিগের বিষয়বিরক্ত চিত্ত ও বিষয়ার্থিগণের সুরক্ত চিত্ত, এই উভয় চিত্ত হরণ

করিবার শক্তিই এই রম্য বনভূমির আছে। সাগরতটস্থিত যে সকল গিরির বপ্রসমূহ জল দ্বারা ধৌত হইয়াছে, তাহাদের পাদপর্ব্বতগুলি নূপুরের ন্যায় রত্নরাজি-রাজিত হইয়া শব্দ করিতেছে। যে সকল পুন্নাগ-নগবিশ্রান্ত হেমচূড় পক্ষীদিগের কান্তি কান্ত কাঞ্চনবৎ দেদীপ্যমান, ঐ দেখুন, তাহারা নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ আরও দেখুন, ভ্রমর ও মেঘরূপ ধূম ও ফুল্ল চম্পকবনময় পর্ব্বত, জ্বলিত বস্তুবৎ বায়ুভরে কাঁপিতেছে। কোকিল কোকিলাকে আলিঙ্গন করিয়া গীতালাপ করাইতেছে। ঐ দেখুন, লবণাব্ধির তটভূমিসমূহ উপায়নপাণি রাজগণের কলকল-রবে মুখরিত হইয়াছে।

হে রাজন্! লবনাম্বুধির পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ হইতে যে সকল নরপতি সমরার্থ সমাগত হইয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া নিজের বশীভূত করিয়া লউন। সর্ব্বদিকের সর্ব্বস্থান রক্ষার নিমিত্ত আপনি ক্ষমা সহকারে অস্ত্র ধরুন আর চির অনুপম বিক্রম বিকাশ করিয়া শান্তি সহকারে সকলের শাসন সংরক্ষণ করুন।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অতঃপর সেই চারিজন বিপশ্চিৎই অম্বুধিতটে উপবিষ্ট হইলেন এবং তখন হইতে সেইস্থানেই যথাক্রমে স্ব স্ব বাসভূমি প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ প্রখ্যাত করিবার জন্যই যেন দিবসকর সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালতলের আশ্রয় লইলেন। এই সময় শ্যামচ্ছবি যামিনীর বিস্তার হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা দিবস ব্যাপার সমাধা করিয়া স্ব স্ব শয়নে শয়ন করিলেন। তাঁহারা নদীপ্রবাহের ন্যায় সমুদ্র পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন; এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আহা! দেব-দেব হুতাশনের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! আমরা তাঁহারই প্রসাদে এবং আমাদের

উত্তম উত্তম বাহনসমূহের সাহায্যে অদ্য এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিলাম! এই দৃশ্যশ্রী কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ! এদিকে সমস্ত সমুদ্র, তদনন্তর দ্বীপসমূহ এবং তাঁহার পর সর্ব্বসমুদ্রের অধিপতি আর এক অম্বুধি বিদ্যমান। আবার এই দিকে দ্বীপ আছে; তদনন্তর অম্বুধি আছে; এই অম্বুধি কি অন্তসীমায় অবস্থিত কিম্বা তাহারও পরে আবার দ্বীপ রহিয়াছে? এই প্রকার মায়ার পরিমাণ ফল কত এবং কীদৃশ, তাহা বলিয়া উঠা অসম্ভব। অতএব আমরা হব্যবাহন দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া দেখি। তাঁহার প্রসাদে অনায়াসেই আমরা দিঙ্মণ্ডলের সীমাভাগ অবলোকন করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তার পর তাঁহারা সকলেই একযোগে যথাযথ স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্বরে ভগবান্ বিভাবসুকে ডাকিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রতি চিরপ্রসন্ন মূর্ত্তিমান্ হুতাশন তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইলেন; বলিলেন,—বৎসগণ! তোমরা মনোভীষ্ট বর গ্রহণ কর। বিপশ্চিদ্গণ কহিলেন,—হে সুরবর! এই স্থূলদেহের, মন্ত্রদেহের এবং মনের অগম্য পঞ্চভূতাত্মক দৃশ্যের অন্তগমনে যাহাতে সক্ষম হই, এবং যাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিযোগ্য বিষয় সকল দর্শন করিতে পারি, আমাদিগকে তাদৃশ উত্তম বরই প্রদান করুন। অপিচ যে সকল সংস্থা যোগিগম্য ও যাহা মনোমাত্রের দৃশ্য, আমরা স্থূল দেহেই যাহাতে সেই সকল স্থানে যাইতে পারি, এবং যোগলভ্য মার্গগমনকালে মৃত্যু যাহাতে আমাদিগকে না আক্রমণ করিতে পারে, আপনি তাহাই করিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিপশ্চিদ্গণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, অগ্নি বলিলেন,—তথাস্তু। এই বলিয়া তিনি সমুদ্রগমনার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অগ্নির অন্তর্দ্ধান হইবার পর রাত্রি আসিল। কিয়ৎকাল পরে সেই রাত্রিও অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে দিবাকর সমুদিত হইলেন। তখন সেই বিপশ্চিদ্গণেরও সমুদ্র-লঙ্ঘনেচ্ছা উদ্রিক্ত হইল।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

—:*:—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বিপশ্চিদ্‌গণ প্রভাতে পৃথিবীর যথাশাস্ত্র সমস্ত শাসন ব্যবস্থা স্থির করিলেন। মন্ত্রিগণ অনুরাগবশে তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন না। রাজ-পরিবারগণ সকলেই শোকাশ্রুবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। বিপশ্চিদ্‌গণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া মমতাশূন্যভাবে মাৎসর্য্য, অভিমান, লোভ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি পরিহার করিলেন; মুখে বলিলেন, —আমরা দিগন্ত দর্শন করিয়া সমুদ্র পার দর্শনান্তে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা মন্ত্রশক্তিগুণে সকলেই উত্তম-দেহতা লাভ করিলেন এবং পাদচারেই সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। বিপশ্চিৎ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন ভৃত্য চলিল; তাহারাও প্রত্যেক দিকে সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বিপশ্চিৎচতুষ্টয় সমুদ্রসলিলে তরঙ্গোপরি পাদবিন্যাস করত এক এক জনে বিমুক্তদেহে গমন করিতে লাগিলেন। সাগরতটে তাঁহাদের যে সকল ভৃত্য ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে তখন পর্য্যন্তও দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শারদ নীরদের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হস্তিপকের প্রেরণায় গজগণ যেমন দ্রুত গমন করে, তেমনি তাঁহারাও তখন সমুদ্রে পাদ চালনপুরঃসর সেই পথে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে আরোহণ ও অবরোহণক্রমে পর্ব্বতপ্রমাণ বারি-তরঙ্গশ্রেণীর শোভা হরণ করিয়া তাঁহারা ভগমূর্ত্তির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শস্ত্রপাণি বিপশ্চিৎ ক্বচিৎ কোথাও সাগরে প্রমত্ত মকরগ্রস্ত হইয়াও মন্ত্রবলে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জলকল্লোলে বিশ্রান্ত ও বায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়াও ক্ষণমধ্যে শত শত যোজন দূরে গমন করিলেন। সমুদ্রের জলকল্লোল যেন মাতঙ্গ, তাঁহারা তথাবিধ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া রাজ-গজসমূহের পৃষ্ঠারোহণশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা তটাহত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় স্বীয় ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। মহাসাগরের মহা তরঙ্গস্থিত মুক্তামাণিক্যসমূহে তাঁহাদের মূর্ত্তি-

সকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাঁহারা একৈক হইয়াও পুরুষকারপরম্পরা-বৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শুভ্র শুভ্র হিণ্ডীরপিণ্ড-সমূহের মধ্যে আরোহণপূর্ব্বক শ্বেত শতদলগত রাজহংসগণের ন্যায় শোভা-সম্পন্ন হইলেন। ভীষণ বেলাবন-বিজৃম্ভিত অর্ণবের গভীর উচ্ছ্বাস উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে সেই পর্ব্বতপ্রায় বিপশ্চিদ্গণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। মেঘস্পর্শী সজল গিরীন্দ্রসমূহের পতন ও উৎপতন-বশে তাঁহারা কদাচিৎ পাতালে এবং কখন বা সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, বারিপ্রবাহের পতনরূপ পটাবৃত হইয়া তাঁহারা বারিদ-বিতানাবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। জলময় তরঙ্গশ্রেণীর শুভ্র শুভ্র জলবিন্দু দ্বারা তাঁহাদের দেহচ্ছবি পুষ্প ভূষিতবৎ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কুলীর-কর্কট-কুম্ভীরাদি-পরিব্যাপ্ত আবর্ত্তমধ্যে সমন্তাৎ বিভ্রান্ত মকর-নিকর তাঁহাদের সহচরস্থানীয় হইল। এইরূপে তাঁহারা সাগরোপরি গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই সমুদ্রগামী বিপশ্চিৎচতুষ্টয় এইরূপে দৃশ্যরূপিণী অবিদ্যার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর হইতে দ্বীপ এবং দ্বীপ হইতে সাগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। যে বিপশ্চিৎ পশ্চিম দিগন্ত পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কোন অতি বেগশালী মীন সহসা ভক্ষণ করিল। ঐ মীন বিষ্ণুমীন-কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বিপশ্চিৎ ক্ষীরোদধিমধ্যে গমন করিলেই মীনকবলে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মীন তাঁহাকে জীর্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই জন্য ঐ মীন ক্ষীরাব্ধি পরিহারপূর্ব্বক দূরদিগন্তে গমন করিল। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎ ইক্ষুরসার্ণবস্থিত যক্ষনগরে গমন করিলে তত্রত্য বশীকরণপটীয়সী কোন এক যক্ষিণীর বশতাপন্ন হইয়া তিনি

কামুক হইয়া পড়েন। তৃতীয় বিপশ্চিৎ পূর্ব্বদিক্ গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি গঙ্গার সহস্র মুখের বিভেদ দর্শন করেন, তখন কোন এক মকর তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় বিপশ্চিৎ তাঁহার উদ্ধার সাধনার্থ তাহাকে গঙ্গায় আনয়ন করেন এবং তথায় তাহাকে বিদারণ করিয়া ফেলেন। তৎকালে তিনি সেই মকরকে গঙ্গার পথে আনিয়া কান্যকুব্জ নগরে পরিত্যাগ করেন। চতুর্থ বিপশ্চিৎ উত্তর কুরুদেশে গমনপূর্ব্বক তথায় ঈশ্বরীসহ ক্রীড়ানিরত ঈশ্বরের আরাধনাপূর্ব্বক অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের পর মরণে ভীতিশূন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই বিপশ্চিৎ মকরাদির গ্রাসে পতিত হইয়াও পুনঃপুন স্বদেহ লাভ করিতে লাগিলেন; আর বহু দ্বীপান্তরস্থিত কুলাকুল সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন। হেমচূড় গরুড় বিহঙ্গ সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া কুশদ্বীপে লইয়া যায়। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চদ্বীপের কোন বনাভ্যন্তরগত রাক্ষসের কবলে পতিত হন; পরন্তু তাহার হৃদয়যন্ত্র বিদারণ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে নিক্রান্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ বিপশ্চিৎ শাকদ্বীপে দক্ষের শাপে যক্ষ হইয়া শতবর্ষান্তে মোক্ষ লাভ করেন। উত্তর বিপশ্চিৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুনদী অতিক্রম করিয়া মহাব্ধি-মধ্যস্থ সুবর্ণ ভূমিতে সিদ্ধাভিশাপে শিলাকার প্রাপ্ত হন। অনন্তর শতবর্ষ অতীত হইলে অগ্নির প্রসাদে সেই সিদ্ধশাপ হইতে মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ আট বর্ষ পর্য্যন্ত নালিকেরনিবাসীদিগের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎ পশ্চাৎ কালক্রমে তিনি পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মেরুর উত্তরদিক্স্থিত কল্পপাদপ বনে অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে দশবর্ষ কাল বাস করেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ বিহঙ্গসমূহের বশীকরণ বিষয়ে তত্ত্বাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এক পক্ষিণীর সহিত পক্ষিনীড়ে দশ বর্ষকাল বাস করেন। অনন্তর মন্দরী নাম্নী কোন কিন্নরী মন্দরাদ্রির মৃদু লতাময় গৃহে একদিন সেই পশ্চিম বিপশ্চিৎকে ভজনা করে। আর সেই পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ নারিকেল বন হইতে ক্ষীরাব্ধির বেলাতটে গমনপূর্ব্বক অপ্সরোগণ সহ কামাকুলভাবে বিহার করেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম সর্গ ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পরস্পর একই দেহ ও একই আত্ম-বিশিষ্ট সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় কি জন্য বিবিধ ইচ্ছা-সম্পন্ন হইয়াছিলেন? ফল কথা, জীব এক হইলেও বিবিধ প্রকার ইচ্ছা হইল কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সম্বিৎরূপ ঘনাকাশ একমাত্র হইলেও নিজেই বিবিধাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আত্মা যখন সুপ্ত হয়, তখন চিত্ত যেমন অবিদ্যার বশে বিবিধভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাভিন্ন জীবের জাগ্রদবস্থা থাকিলেও তথাবিধ কর্ম্মসত্ত্বে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন কুমুরোদরের আকাশে গিরিসরিৎ প্রভৃতির সহিত স্বচ্ছ মহাকাশপ্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনি সম্বিদ্‌ঘনের স্বচ্ছতাবশতঃ নানাকারে প্রতীত আত্মা স্বাত্মায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যে যে কালে যে যে ভোগ্য বস্তু যাদৃশ অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তখন সেই সেই বস্তু দ্বারা সেই চৈতন্যই স্ব স্বভোগ ব্যাপার সমাধা করিয়া থাকেন। ইহা চিদ্‌ঘনের স্বাভাবিক গুণ। যদি নানা মাত্রের নিষেধ হয়, তবে প্রতিনিয়ত একইরূপ হইয়া থাকে। অপিচ অনানাত্ব ধর্ম্মের নিষেধে নানাত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে না। কাজেই বাস্তব অনানা ঘটনায় ব্যবহারতঃ নানারূপে প্রতীত হয়; এই জন্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদবশতঃ বস্তুর উভয়াত্মকতা অবিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই সকল বিপশ্চিতের মধ্যে যে যে পদার্থ যদীয় সম্মুখাগত হইয়াছিল, তিনি সেই সেই পদার্থে বিস্ময় লাভ করিয়া তাহাতে আসক্ত-চিত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে এক দেশীয় যোগিগণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধা করেন এবং ত্রৈকালিক সর্ব্ব বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয়ও সেইরূপই হইয়াছিলেন এবং সেইরূপ হইয়াই উল্লিখিত কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়াছিলেন। মেঘ যেমন নিজ মহিমায় নগ-নগরাদি নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় অংশভাবে সমকালীন সৌধ-ক্ষালন, পুটভেদন, জলবর্দ্ধন ও শস্যপরিষোষণাদি বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন

করে এবং 'আমার দ্বারাই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে' এই বলিয়া তদভিমানী জীব অনুভব করিয়া থাকে, তেমনি এই স্থলেও উপপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। যাঁহারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, তাঁহারা একই কালে অগণিত জগদুৎপন্ন কর্ম্মসমূহ অবলোকন করিয়া থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই,—ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর্ব্বাহু; তিনি সেই বাহুচতুষ্টয় দ্বারাই বিভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং জগৎ পরিপালনপুরঃসর বরাঙ্গনা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। বহু ব্যক্তি বহু বাহু দ্বারা এক যোগে অর্থ সংগ্রহ করে; প্রয়োজন হইলে সম্মিলিত সর্ব্ববাহু দ্বারা সংগ্রামও করিয়া থাকে। এইরূপে সেই বিপশ্চিদ্গণ সন্বিন্ময় হইয়াও সর্ব্বদিকে অবস্থান-পূর্ব্বক সেই সেই বিভিন্ন ব্যবহার সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূশয্যায় শয়ন, দ্বীপান্তরে ভোজন, বনরাজিমধ্যে বিহার, মরুস্থলীতে ভ্রমণ, গিরিসমূহে বাস, সমুদ্রকুক্ষিতে প্রবেশ, নানা দ্বীপপুঞ্জে বিশ্রাম, মেঘবৃন্দে গমন এবং অর্ণবশ্রেণী, বাত্যা ও জলবীচিসমূহের উপরিতন অংশে আরোহণ, তথা পর্ব্বত ও সাগরের তটস্থিত নগরে কেলি করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ যক্ষ কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া শাক দ্বীপের অভ্যন্তরস্থিত গিরিতটে সপ্ত বর্ষকাল বাস করেন। ইনি অত্যন্ত পাষাণাম্বু পান করিয়া তদবস্থায় সপ্ত বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। শাকদ্বীপের অন্ত গিরিশিখরে যে অভ্র গুহাগৃহ আছে, পশ্চিম বিপশ্চিৎ তন্মধ্যে পিশাচাপ্সরার প্রভাবে এক মাস যাবৎ কামুকতা প্রাপ্ত হইয়া বাস করেন। অনন্তর তিনি শাল্ভভয় নামক বর্ষে কোন মুনির অভিশাপে হরীতকীতরুরূপে অন্তর্হিত অবস্থায় অবস্থান করেন। রৈবতক শৈলে শিশির নামে এক বর্ষ আছে, তাহাতে পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ যক্ষ-বশীভূত হইয়া দশ রাত্রি সিংহরূপ হইয়াছিলেন। পিশাচ-মায়ার শেষ হইলে তিনি এক কাঞ্চনকন্দরের ভেক হইয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হয়। হিমাদ্রির উত্তর তটে কৌমার বর্ষ অবস্থিত। তিনি ঐ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অন্ধমণ্ডূকাকারে এক বৎসর কাল বাস করেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ মরীচক বর্ষের জনৈক বিদ্যাধরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হন। তৎকালে বেলা বনভূমির শীত সুরভি সমীরণই তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে যে শাস্তভয়াখ্য বর্ষের কথা বলিয়াছি, তাহাতে জলধর নামে এক পর্ব্বত আছে। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ ঐ পর্ব্বতের হরীতকী বনে হরীতকী বৃক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি শিলাসম্পর্কিত পানীয় পান করিতে করিতে শাকদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর এই বৃত্তান্ত পাশ্চাত্য বিপশ্চিতের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তথায় আসিয়া শাপপ্রদ মুনির প্রসন্নতা সম্পাদন করেন এবং তদীয় বৃক্ষত্ব অপনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। পাশ্চাত্য বিপশ্চিৎ নিজে শিশিরাখ্য বর্ষে পাষাণ হইয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষিণ বিপশ্চিৎ আসিয়া গোমাংসাদি প্রদানপূর্ব্বক শাপপ্রদ পিশাচের পরিতোষ সাধনান্তে তাঁহাকে অচিরাৎ মুক্ত করিয়া দেন। কোন গোরূপিণী পিশাচী পশ্চিম বিপশ্চিৎকে অভিশাপ দিয়াছিল, তাহাতে তিনি অস্তাচলশিখরের অপর পারস্থ শিখ বর্ষে এক বৎসর কাল বৃক্ষাকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ বিপশ্চিৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এই প্রদেশেরই ক্ষেমক বর্ষে দক্ষিণ বিপশ্চিৎ যক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কোন যক্ষের অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করেন। এই স্থানের বৃষক বর্ষে কেশর নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ সিংহত্ব লাভ করেন। অনন্তর পশ্চিম বিপশ্চিৎ তাঁহার মুক্তি সাধন করেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বিভো! যোগিগণ একদেশস্থিত হইয়া কি প্রকারে সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি পল্লবিতরূপে প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যাহারা অপ্রবুদ্ধ, তাহাদের চক্ষেও যখন ভূতভৌতিকাদি নানা স্থূল বস্তুর সদ্ভাব আছে, তখন প্রবুদ্ধের মনোমাত্র বস্তুরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থ ক্রিয়ার সমাধান হইবে, এ আর একটা আশ্চর্য্যের কথা কি? দৃশ্যের নাশে প্রলয়ে যোগিগণের দৃষ্টিতে চিন্মাত্রসত্তা-সামান্য ব্যতীত অনাত্মস্বরূপ জগতের প্রতিভাস হয় না। ফল কথা, এই জগৎ

বা জাগতিক পদার্থের প্রতি তাঁহাদের দৃক্‌পাত নাই ; তাঁহারা দেখেন—সকলই চৈতন্যময়। বৎস, রাম ! যিনি সর্ব্বত্রগ সর্ব্বাত্মক ব্যক্তি, বল দেখি কে কোন্ কালে কোথায় কিরূপে তাঁহার প্রকাশকার্য্যে বাধা ঘটাইতে পারে ? রামচন্দ্র ! যত কিছু ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সেই সেই কালে সেই সেই স্থানে প্রকাশমান আছে, ঐ সকলের কোন কিছুই আমাদের সেই সর্ব্বাত্মায় বিদ্যমান নাই। এইরূপে কি দূর, কি অদূর, কি নিমেষ, কি কল্প, কি সেই অতীতাদি প্রপঞ্চ, সকলেই সত্তাসামান্যস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। দেখ, যথাস্থানস্থিত মায়া-প্রপঞ্চ সকল সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপেই অবস্থিত ; এই নিমিত্ত বিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ সর্ব্বাত্ম ব্রহ্ম আকাশত্ববাসনায় আকাশস্থ হইয়াছেন। জগদাত্মা মায়াশবল ; এ জগতে দৃষ্টৃ-দৃশ্য-ভাবাপন্ন হইয়া তিনিই জগদাকারে সমুদিত হইতেছেন। এই বিশ্বের তিনিই আত্মা ; তিনিই দৃক্ ও বপুঃস্বরূপ। এই কারণ কচিৎ কেহই তাঁহার জ্ঞাননিরোধ করিতে সক্ষম নহে। ওহে তত্ত্বজ্ঞ ! বুঝিয়া দেখ, যিনি সাধ্য অসাধ্য এই উভয়স্বরূপ, তাঁহার অসাধ্য কি আছে ? সুতরাং ঈশ্বর একই, কেবল চৈতন্যোপাধির নানাত্ব প্রযুক্ত একভাবাপন্ন চিত্তের মহিমায় সেই বিপশ্চিৎ-নিচয়ের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবোধানুগামী পরম পদার্থ ঈশ্বরচিৎ যদিও এক, তথাচ তাহাতে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বকার্য্যের সংযোগ ঘটনা অসম্ভব নহে। ফলে, বোধ-শবল আত্মরূপে অসাধ্য কিছুই নাই।

এইরূপ সেই বিপশ্চিদ্‌গণ সকলদিকে গত হইয়াও পরস্পরের সর্ব্ব-ব্যাপার সকলেই অবগত হইয়াছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের দর্শন অনুভব ও সঙ্কটে সুচিকিৎসা ইত্যাদি সমাধা করিয়াছিলেন। বোধাকাশ স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইলে যথাবস্থভাবে সুসঙ্গত ব্যক্তিও অন্যথাভাব উপগত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ ! সেই বিপশ্চিদ্‌গণ প্রবুদ্ধ হইয়াও কি নিমিত্ত সিংহ বৃষাদি অবস্থা অধিগত হইয়াছিলেন ? ইহা আমার নিকট মদীয় বোধবৃদ্ধির কারণ বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! আমি প্রসঙ্গতঃ বিপশ্চিৎসমূহের প্রবুদ্ধ-

ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছি; পরন্তু বাস্তবপক্ষে বলিলে বলা যায়, তাঁহারা প্রবুদ্ধ ছিলেন না; সেই সকল বিপশ্চিৎ নিপুণ ভাবে প্রবোধ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা বোধ ও রোধ এই উভয় দর্শনমধ্যে দোলাচলভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। মোক্ষ ও বন্ধ উভয় চিহ্নই তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা দোলায়িত-চিত্ততা প্রযুক্ত ধারণার বলে যোগিত্ব উপগত হইয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মপদ অধিগত হইতে পারেন নাই। অপিচ তাঁহারা ধারণাগুণে যোগিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবিদ্যাপরিবর্জ্জিত যথার্থ যোগিত্ব লাভ তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। বৎস! যথার্থ যোগী যাঁহারা—তাঁহারা কি কখন অবিদ্যাবলোকন করেন? কখনই করিতে পারেন না। তবে এই বিপশ্চিদ্‌গণ কিরূপ যোগী? ইহাঁরা মাত্র ধারণাযোগী। ইহাঁরা অগ্নির প্রসাদাৎ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবিদ্যা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহাতে সংসক্ত ছিলেন; তাই আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হন নাই। রামচন্দ্র! যাঁহারা জীবন্মুক্ত প্রাণী, তাঁহাদের অপরবিধ সমাধির পর ব্যুত্থানদশাতেই পদার্থান্তরের জ্ঞান সঞ্চার হয়। যাহা চেতোধর্ম্ম মোক্ষ, তাহা তাঁহাদের সমাহিত চিত্তে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতে থাকে। পরন্তু যখন দেহভাবাপন্ন ব্যুত্থানদশা, তখন ঐ মোক্ষ অবস্থান করে না। দেহভাবাপন্ন ব্যবহারদশায় জীবন্মুক্ত দেহের কখনই নিবৃত্তি হয় না। এই কারণ ব্যুত্থানকালে পদার্থান্তরের জ্ঞান হইয়া থাকে। পরন্তু সেই নির্ম্মুক্ত চিত্ত পুনরপি আর অবস্থিত হইবার নহে। ভাবিয়া দেখ, যে ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া যায়, তাহাকে আর কে বদ্ধ করিতে পারে? জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের দেহ দেহধর্ম্মেই আবদ্ধ হইয়া থাকে; পরন্তু তাঁহাদের যে চিত্ত, তাহা অচলের ন্যায় অবিচল হইয়া রহে। মধুরাদি আস্বাদসুখের ন্যায় মোক্ষ কেবল আত্মসম্বেদ্য; পরন্তু তাহা ধারণাদির ন্যায় পরজ্ঞেয় নহে। স্বানুভবপ্রদ আত্মা সুখদুঃখাদি মনোধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বয়ং বন্ধনাদি অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। পরন্তু সেই মনের যখন মুক্তি হয়, তখন তিনি মুক্তিমান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যাঁহার অন্তঃকরণ সুশীতল, তাঁহারই নাম মুক্তিমান্। যে চিত্ত পরিতপ্ত, তাহাতেই বন্ধ অবস্থিত। এই বন্ধ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেহচ্ছেদ করিলে দেখা যায় না।

এ জগতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ক্রন্দন বা হাস্য করুন, তাহাতে দেহবশে সুখ-দুঃখ তাঁহার অন্তরনুভূত হয় না। অবচ্ছেদক সম্বন্ধে দেহে সুখদুঃখাদি গ্রহণ করিলেও আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার জ্ঞান মনুষ্যগণের আত্মায় পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য উল্লিখিত ব্যাপারসমূহ আত্মাতেই ঐরূপে কল্পিত হইয়া থাকে; দেহাদিতে ঐরূপ কল্পনা হয় না। এই নিমিত্ত আত্মার অধ্যাস জ্ঞানের অভাবে দেহাদিতে আত্মাভিমানবশে রূপান্তরিত চার্ব্বাক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও কণাদাদি পণ্ডিতবর্গ বৈদান্তিকগণের নিকট পরাভব পাইয়া থাকেন। স্বভাববশে জীবন্মুক্ত-গণের দেহাদি কখন হয় না, তাঁহাদের দেহাদি মরিয়াও মরে না, কাঁদিয়াও কাঁদে না। জীবন্মুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হাসিয়াও হাসেন না। ঐ সকল তত্ত্বদর্শী বীতরাগ হইয়াও সরাগ, অকোপ হইয়াও সকোপ এবং মোহ-বিহীন হইয়াও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। দর্পণ যেমন নভোমার্গ হইতে অতি দূরে অবস্থিত হয়, তেমনি এই সুখ, এই দুঃখ, ইত্যাদি প্রকার কল্পনা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। যাঁহাদের জগদাত্মা জগৎ-স্বরূপ ও অজ্ঞানবিরহিত, অপিচ উহা সর্ব্বত্র একরস ব্রহ্মমাত্রেই বিরাজিত, তৎসমস্ত জীবন্মুক্তদিগের সুখদুঃখও আকাশপাদপের ন্যায় অসম্ভব। জয়যুক্ত জীবন্মুক্তবর্গ বীতশোক হইয়াও সশোক হইয়া থাকেন। তথাবিধ তত্ত্বদর্শিগণের দৃষ্টিতে কেবল অচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় আত্মভাবমাত্রই পতিত হয়। মহাদেব একটি মাত্র নখপ্রহারে প্রজাপতি ব্রহ্মার একটি মস্তক অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন। ঐ মস্তক অম্বুজবৎ মনোহর এবং উচ্চৈঃ-স্বরে সামগানশীল ছিল। ব্রহ্মা তাঁহার সেই মস্তক যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াও তাহার উৎপাদনে আর প্রয়াস স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মা আকাশসদৃশ মিথ্যা মস্তকের অপ্রয়োজন দেখিয়াই সে সম্বন্ধে বিরাম লইয়াছেন। যে বিষয় যেরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা সেইরূপেই হউক, অপর সাধনের প্রয়োজন কি আছে? মহাদেব অনুগৃহীত মদন হইতে হরিণ-শাবনয়না দুর্গাদেবীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করেন, আর নিগ্রহপ্রাপ্ত মদন হইতে সমাধিকালের অশ্রুধারণ করিয়া থাকেন। এই দেবদেব মহাদেব সামর্থ্য সত্ত্বেও রাগিতা পরিহার করেন নাই। যখন তিনি মদন দহন করেন,

তখন তাঁহাতে নারীগত গুণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঐহিক কৃত বা অকৃত ব্যাপারে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন নাই। অপিচ নিখিল প্রাণীর অভ্যন্তরেও তাঁহাদের কোন প্রকার প্রয়োজনপ্রাপ্তি নাই। এই জীবন্মুক্তগণ রাগিতা বা অরাগিতা এই বিষয়ে কোন কিছুতেই কোন প্রয়োজন জ্ঞান করেন না। যেরূপে যাহা সম্পন্ন হইবার হয়, তাহা সেইরূপেই তাঁহারা সম্পাদন করেন। জনার্দ্দন জীবন্মুক্ত পুরুষ, তিনি স্বয়ং কার্য্য সম্পাদন করেন, অপরকেও সেইরূপে কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। তথাবিধ জীবন্মুক্ত লীলাসম্বরণের জন্যই অপরের চক্ষে মৃত হন ও অনবরত জন্ম ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীবন্মুক্তের সামর্থ্য সত্ত্বেও আজব ও জবীভাব প্রাণিকর্ম্ম-বশেই পরিবর্জ্জন করেন না, আর যদিই বা এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে? তাই তথাবিধ জীবন্মুক্ত বাসনাবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করেন। দৃষ্টান্ত দেখ, শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপী ভগবান্ হরি নিরিচ্ছ হইয়াও অবস্থিত হন। সূর্য্যদেব জগস্তবনের নভঃপ্রাঙ্গণে কালকন্দুকরূপে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়তই আপনাকে আন্দোলিত করিতেছেন। তিনি ইচ্ছাবর্জ্জিত ও জীবন্মুক্ত হইয়াও স্বদেহ নিরোধে অক্ষমতা নিবন্ধন যথাবস্থিতভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। রোহিণীকান্ত চন্দ্র কল্পান্ত পর্য্যন্ত দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে বৃথাই আক্রান্ত আছেন। তদীয় জীবন্মুক্ততা হেতুই তিনি যথাবস্থভাবে অবস্থিত রহিয়া-ছেন। জীবন্মুক্ত অগ্নিদেবও যথাস্থানস্থ হইয়া যজ্ঞীয় হব্য ও শৈব বীর্য্য গ্রাস প্রভৃতির খেদ ভোগ করিতেছেন। জগদ্গুরু শুক্র ও বৃহস্পতি জীবন্মুক্ত ভাবে থাকিলেও বহু বিজিগীষা করিয়া পরে কৃপণ হেন অবস্থান করিতেছেন। জীবন্মুক্ত মহামুনি জনক রাজকার্য্য সমাধা করিয়াও এ জগতে অনেকবার অনেক উৎকট যুদ্ধে জর্জ্জর হইয়াছেন। নল, মান্ধাতা, সগর, দিলীপ ও নহুষাদি রাজন্যগণ জীবন্মুক্তভাবে বহুকাল রাজ্য করিয়াছেন। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এতদুভয়ের সমান ব্যবহার; তবে উঁহাদের বন্ধ-মোক্ষের কারণ কেবল বাসনা এবং নির্ব্বাসনাই। বলি, প্রহ্লাদ, নমুচি, বৃত্র ও অন্ধকাদি অসুররাজগণ জীবন্মুক্ত ও রাগ-বর্জ্জিত হইয়াও রাগসম্পন্নের ন্যায় ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াছিলেন। এই

কারণেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিদাকাশে লক্ষ্য স্থাপনে রাগদ্বেষের ক্ষয়োদয়ে কিম্বা সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা সত্ত্বেও প্রকটস্বরূপ মোক্ষের ঐ ঐ বিষয়ে সংশ্রব কিছুই থাকে না। যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মাকাশের ন্যায় শুদ্ধজ্ঞানে সমস্ত জীবকে অদ্বয় ব্রহ্মাকাশরূপে লাভ করেন, সেই সমস্ত জীবন্মুক্তের ভেদবুদ্ধি সমুদিত হইবে কেন? যেমন উজ্জ্বল আভাসমাত্র ইন্দ্রধনু বিততাকারে নানারূপ বর্ণময় পরিদৃশ্যমান হয়, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ পরমাণুসমষ্টি অসত্য হইলেও প্রকাশমান হইতেছে। যেমন আকাশ শূন্যতার অজনন ও অনিরোধ হইলেও প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনি এই জগৎ অসৎ হইলেও সদ্বস্তুরূপে প্রত্যয়গোচর হইতেছে। এ জগতের আদি অন্ত থাকিলেও ইহা আদ্যন্তবর্জ্জিত। ইহা অশূন্য হইলেও শূন্য, উৎপন্ন হইলেও অনুৎপন্ন এবং অনষ্ট হইলেও বাস্তবিকই নষ্ট। থাকুক না এ জগতে উৎপত্তি-বিনাশ; তথাচ, ইহা সুচিরপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। সমাধি অবস্থায় নিখিল কলনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া বিনিদ্র আত্মতত্ত্বে অবস্থান করিলে যাদৃশ একান্ত চিদাভাস পরিলক্ষিত হয়, এ জগতের স্বরূপও তাহাই। অসমাধি অবস্থায়ও যখন শাখাচন্দ্র দেখা যায়, তখন শাখাদেশ হইতে বুদ্ধিবৃত্তির চন্দ্রদেশ প্রাপ্তির অন্তরালে যে নির্ব্বিষয় স্থানপ্রকট চৈতন্যস্বরূপ, তাহাই এই জগৎ। এইরূপে চিদাত্মায় যে দ্বৈত বিশেষরূপ একত্ব ও সামান্যাকার একত্ব প্রকাশমান হয়, তাহা সেই চিদাকাশের স্বাভাবিকই অভাব বলিয়া বুঝা যায়। কেবল যে তাহা শূন্য, এ কথাও সত্য নহে। কেন না, যাহা পূর্ণানন্দৈকরস, তাহাতে শূন্যত্বও তিষ্ঠিতে পারে না। এই জগদাকাশ আত্মস্বরূপ অথবা আত্মাবস্থিত; ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, ভাবী পুর পরিদৃষ্ট হইলেও অপ্রকাশ আর অপ্রকাশ হইলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে আকাশকোশ-বিশদাশয় রঘুনাথ! এই দৃশ্য প্রপঞ্চ শিলাঘন হেন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মৌনভাবেই অবস্থিত। ইহার স্বীয় আত্মাই জগদিত্যাকার অভিধান বিধান পুরঃসর নিখিল জীববৃন্দ

মোহিতবৎ অবস্থিত আছে। আহা! মায়ার কি বা অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার!

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় এই দ্বীপ-সাগর-কানন-শৈল-সম্পন্ন দিগ্‌দিগন্তে কি কি করিতে করিতে অবস্থিত হইয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তাঁহারা তাল-তমাল মালা-মণ্ডিত দ্বীপ-জলধি-কাননাদি স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কি কি করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। মাতঙ্গ-পদদলিত মালার ন্যায় এক বিপশ্চিৎ ক্রৌঞ্চ দ্বীপস্থিত পর্ব্বতের তটে পিষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিপশ্চিৎকে কোন এক রাক্ষসে শূন্যে আকাশে লইয়া যায়, তাহাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত হন। পশ্চাৎ তিনি বাড়বানলে পতিত ও ভস্মীভূত হইয়া যান। বিদ্যাধরগণ তৃতীয় বিপশ্চিৎকে ইন্দ্রসভায় উপনীত করিয়াছিল। তিনি তথাগত হইয়া ইন্দ্রকে অভিবাদন করেন না; তাহাতে ইন্দ্রের শাপে তাঁহাকে ভস্মীভূত হইতে হয়। চতুর্থ বিপশ্চিৎ কুশদ্বীপের গিরিতটে গমন করেন। গমনকালে নদীতটস্থিত একটা মকর তদীয় দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। যেমন কল্পান্তকালে লোকপালগণ বিনাশ প্রাপ্ত হন, তেমনি সেই ব্যাকুলচেতা নরপতিচতুষ্টয় পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন। অতঃপর বিপশ্চিদ্গণের সম্বিৎ পূর্ব্বতন সংস্কারের বশে ব্যোমরূপ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মেদিনীমণ্ডল দর্শন করিয়াছিল। সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সাগর ঐ মেদিনীমণ্ডলের বলয়স্বরূপ ও পত্তনসমূহ ভূষণবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। ফলে চিদাত্মাই ঐ ভূমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন। সুরশৈলের শিখরদেশ ঐ চিদাত্মার আসন, ব্রহ্মলোক শিরোমণি, চন্দ্র ও অর্কবিম্ব নয়ন, নক্ষত্রনিকর মুক্তাকলাপ,

চঞ্চল বারিধর বস্ত্র এবং বিবিধ বন অঙ্গবলয়স্বরূপ। এইরূপে সেই সকল বিপশ্চিৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের সম্বিৎ সেই চতুর্থ দেহ অবলোকন করিল। তখন আকাশাত্মক বিপশ্চিদ্‌গণ মানস প্রতিভামাত্রে বিষয়ে প্রাতিভাসিক দেহের আধিভৌতিক দেহ জন্য স্থূলভাবগুলি অগ্রে প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপ নিশ্চিত দেহের অজ্ঞাত আত্মভাব হইবার পর সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় এই দৃশ্যরূপিণী অবিদ্যার পরিমাণ কত, তাহা অবগত হইবার জন্য পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন। দৃশ্য ও দর্শনের অভ্যন্তরে যে উৎকীর্ণ মণ্ডলীরূপ অনুভবাকার অবিদ্যা, তাহার স্থিতিজ্ঞানার্থ তাঁহারা দ্বীপ-দ্বীপান্তরসমূহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম বিপশ্চিৎ সপ্ত সাগর ও সপ্ত মহাদ্বীপ লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই দ্বীপান্তরে সেই মহাপুরুষ হইতে অতুলনীয় জ্ঞান লাভ করিলেন এবং পঞ্চ বর্ষাবসানে পুনরায় স্বীয় চিত্তে সত্তা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহার দেহভাব পরিহৃত হইল। তিনি চিত্তে সন্মাত্ররূপতা প্রাপ্ত হইয়া পরে পরম নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ স্বদেহকে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের পার্শ্বস্বরূপে চিন্তা করিতেছিলেন। বহু দিনের বহু চিন্তার পর তিনি দেহ পরিহারপূর্ব্বক চন্দ্রলোকে বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণ বিপশ্চিৎ শাল্মলীদ্বীপে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় শত্রুসমূহের উচ্ছেদসাধন করিয়া অদ্যাপি রাজ্য করিতেছেন। এই বিপশ্চিৎ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিয়াও বাহ্য ব্যাপার সকল বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। উত্তর বিপশ্চিৎ তরল কল্লোলময় সপ্তম সাগরের অন্তরালস্থিত কোন এক মকরের উদরে সহস্র বৎসর করেন। অনন্তর তিনি তাহার উদরগত হইয়াই তদীয় মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলেন; তাহাতে সেই মকরপ্রবর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পরে তিনি সেই মকরগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। অনন্তর সেই বিপশ্চিৎ দেবগম্য মহামহীতে গমন করেন। এইস্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে হিমোপম শীত সলিলপূর্ণ স্বাদু সাগরের অবশিষ্ট অশীতি সহস্র যোজন উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর অরণ্যময় দশ সহস্র যোজন ব্যবধানে উক্ত মহামহী সুবর্ণ-নির্ম্মিতাকারে অবলোকিত হয়। মহামহীতে উপনীত হইবার

পর তিনি লোকালোক পর্ব্বতে গমন করেন। সেই ভূমিতে উপস্থিত হইলে তিনিও দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই বিপশ্চিৎ দেবগণের মধ্যে একজন প্রধান দেবতা হন এবং সেই অবস্থায় ভূমণ্ডল-পাদপের আলবালস্বরূপ লোকালোকাচলে গমন করেন। এই অচলের প্রথমাংশ পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত এবং সৌর ও মানুষলোকের আচারব্যবহারে অন্বিত। ঐ বিপশ্চিৎ যখন লোকালোক-শিখরে উপনীত হইয়া তারকা-পথে অবস্থান করেন, তখন অধোলোকবর্ত্তী জনসাধারণের দৃষ্টিতে উচ্চস্থ নক্ষত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল।

রামচন্দ্র! ঐ মহাপর্ব্বতের পরভাগ অন্ধকারময়; উহার চতুর্দ্দিক্ পরিখাপরিবৃত, আকশবৎ শূন্য ও যোজনায়ত। তাহার পরই এই বর্ত্তুলাকার ভূভাগের পরিসমাপ্তি। উক্ত অচলের পরবর্ত্তী স্থান কেবল পরিখাযুক্ত, অন্ধকার-পুঞ্জময় ও আকাশের ন্যায় শূন্যভূমি। বৎস! জানিবে—ঐস্থানে কেবল অন্ধকারই বিদ্যমান। উহা ভ্রমর, কজ্জল ও তমালতরুর ন্যায় নিরন্তর নীলবর্ণময়। ঐ স্থানে না আছে মহী, না আছে কোন জঙ্গমাদি প্রাণী, না আছে কোন আশ্রয়; কিছুই নাই; কোন কালে কোন পদার্থ প্রাদুর্ভূতও হয় নাই।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! এই ধরিত্রী কিরূপে অবস্থান করিতেছে? কি ভাবে নক্ষত্রনিকর গমন করিতেছে? লোকালোক গিরির স্বরূপই বা কি? এতৎসমস্ত আমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চিন্মাত্রে বালক এই ভূমির কল্পনা করিয়াছেন। বালক-কল্পিত কন্দুক যেমন আকাশে অবস্থান করে, তেমনি এ ভূমি আকাশেই অবস্থিত আছে। নয়ন যাহার তিমিররোগে আক্রান্ত হয়, তাহার যে ভাবে কেশগত চন্দ্রাদি দর্শন ঘটে, তেমনি সৃষ্টির প্রারম্ভে

চিদাকাশেরও পৃথিবীপ্রভৃতির দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেমন কোন সঙ্কল্প নগর কোনরূপ আধারধৃত বলিয়া লক্ষিত হয় না, তেমনি চৈতন্যের পৃথিবী-অনুভব কোন আধার-পরিধৃতরূপে দৃষ্ট হয় না। চেতনার স্বভাবই চৈতন্য; উহা যখন যেরূপে যতটুকু প্রকাশ পায়, চেতনাত্মক পদার্থও তখন তেমনিভাবে ততটুকু পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার নেত্র তিমিররোগে সমাক্রান্ত হয়, তাহার দৃষ্টিতে যেমন অম্বরে কেশোণ্ড্রক লক্ষিত হইতে থাকে, চিন্মাত্রে যে মহীগোলক প্রকাশ পায়, তাহাও তেমনই ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে সরিৎসমূহের যদি ঊর্দ্ধ প্রবাহ ও হব্যবাহনের যদি অধোমুখ গতি কল্পিত হইত, তবে বিপরীত প্রতীতি সত্ত্বেও বর্ত্তমান কালে তাহা তেমনই ভাবে অবস্থান করিত; কিছুতেই তাহা অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না। অতএব বাদিগণ যে ভূমির অনবরত পতন, ঊর্দ্ধ চলন, ভ্রমণ ও পতনাদি কল্পনা করেন, তাহা অল্পবুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যসত্তাতেই সত্য; স্বরূপতঃ সত্য নহে। কাজেই বাদিগণের স্ব স্ব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যভান, তদনুসারে বিরুদ্ধ নানাত্মকতাও সম্ভবপর। মহী নিশ্চলভাব-সম্পন্ন; তাই স্তব্ধ এবং যে সকল প্রাণীর দৃষ্টি অহর্নিশ অকুণ্ঠিত, তাহাদের দৃষ্টিতেই সতত প্রকাশ-ময়ী। কিন্তু যাহারা জাত্যন্ধ, তাহাদের দৃষ্টিতে সদাই অপ্রকাশস্বরূপ হইয়া বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে বিরাজিত। সদসদ্‌বাদিগণের চিদ্‌ভাব ক্রমে ঐ অখণ্ড তারাচক্র ও মহীমণ্ডল লোকালোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। অনন্তর নভোরূপী গভীর গর্ত্ত; উহা একার্ণবপ্রতিম মহান্ তমস্তোমে পরি-ব্যাপ্ত। পরন্তু লোকালোকের উভয় শৃঙ্গের অন্তরাল প্রদেশে ঈষৎ সৌরা-লোক প্রবেশও বিদ্যমান। নক্ষত্রচক্র অতি দূরে অবস্থিত। মহাগিরি লোকা-লোক করালাকারে প্রতিভাত। উহার ঐ অংশে অন্ধকার এবং অধিত্যকা পর্য্যন্ত কোন দেশে তেজেরও অস্তিত্ব প্রকট। এই নিমিত্ত এ গিরির নাম লোকালোক। লোকালোক শৈলের পরপারস্থিত আকাশমণ্ডল হইতে দশ-দিকেই অতি দূরে দূরে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণশীল। পাতাল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত নক্ষত্রচক্র বিদ্যমান। সর্ব্বোর্দ্ধ ধ্রুব; ধ্রুবের ভ্রমণ নাই; তদ্ব্যতীত অপর সকলই ভ্রমণ করিতেছে। সপাতাল নিখিল ভূর্লোক নক্ষত্রমণ্ডলদ্বারা

প্রদক্ষিণীকৃত হইতেছে। এই প্রদক্ষিণব্যাপারও চিৎকল্পনার অতিরিক্ত নহে। লোকালোক ও ভূর্লোকের দ্বিগুণ আকাশপথের অনন্তর নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। বিল্বত্বকের ন্যায় স্থিতিযুত দশ দিকেই ঋক্ষচক্রের পরিপুষ্টতা। এই প্রকার সন্নিবেশময় ব্রহ্মাণ্ডরূপে যে জগতীস্থিতি, তাহা শবল ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পাত্মক কবচ কচনরূপেই প্রতিভাত। অন্য এক নভোদেশ আছে, তাহা নক্ষত্রচক্র হইতে দ্বিগুণ। তাহারও কোন স্থান প্রকাশময় এবং কোন কোন স্থান তীব্র তমোময়। পূর্ব্বোক্ত নভোদেশ অবধি ব্রহ্মাণ্ড খর্পর বিদ্যমান। ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শতকোটি যোজন বিস্তীর্ণ বজ্রবৎ দৃঢ় সম্বেদনময় খর্পরদ্বয়; মধ্যস্থানে গগন। পরমার্থ পক্ষে ব্যোমবিকার পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্য, ভূতব্যোম চিদাকাশই মহীগোল নভোদেশের সর্ব্বত্রই সদিনকর, নক্ষত্রজ্যোতিশ্চক্র অবস্থিত। ঐ জ্যোতিশ্চক্রের ঊর্দ্ধ বা অধো নির্দ্দেশ কি? উহাঁর সমুদায়ই ঊর্দ্ধ, সমুদায়ই অধঃ; অপিচ সকলই উত্তর, সকলই দক্ষিণ, সকলই পূর্ব্ব, সকলই পশ্চিম। নিখিল বস্তুর পতনোৎপতনাদি যে কিছু প্রতিভাত হয়, তাহা প্রত্যাগাত্মারই স্ফুরণ বা প্রতিভান মাত্র। বাস্তব পক্ষে ঐ সকল কিছুই নাই।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

—:*:—

বশিষ্ঠ কহিলেন—ঐ যে লোকালোক ও নক্ষত্র চক্রাদির সংস্থানের কথা কহিয়াছি, উহা অনুমানের বিষয় নহে; মাদৃশ যোগিগণের উহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমাদের আতিবাহিক দেহেই আমরা যোগাভ্যাসজনিত তত্ত্ববোধরূপ সমস্ত জগৎতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, উহা আমাদের স্থূল দেহে প্রত্যক্ষ হয় নাই, আমাদের অবলোকিত জগৎস্বপ্নেই লোকালোকাদি অভিহিত হইয়াছে। আমরা যাহা দেখি নাই, তদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডান্তররূপ জগৎস্বপ্নেও সাধারণতঃ লোকালোকাদির সংস্থান একইরূপ। আবার

কোথাও কোথাও উহার রূপান্তর বিদ্যমান। এক্ষণে তাহা বলার প্রয়োজন দেখি না। আপনারা সকলে ইহা জানিবেন যে, সাধারণতঃ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই সমুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জ, আর সমুদ্রের উত্তরাংশে মেরু ও দক্ষিণে লোকালোক শৈল বিদ্যমান। এইরূপ সংস্থান সপ্ত দ্বীপের অধিবাসীদিগের পক্ষেই বলা যাইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে যাহাদের অবস্থান, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ নির্ণয় অসঙ্গত।

বৎস রাম! এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাণ্ডকপাটের বা খর্পরদ্বয়ের প্রমাণ নিরূপণ করিয়াছি, তাহার বহির্ভাগে দশগুণ জলাবরণ অবস্থিত। স্বীয় শক্তিযোগে তৃণমণির তৃণ ধারণ কিম্বা কল্পপাদপের অর্থিবাঞ্ছিত রত্নাদি ধারণ যে প্রকার, নিজ নৈসর্গিক আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকপাটের উক্ত জলরাশি ধারণ সেইরূপই। জলের স্বাভাবিক আকর্ষণা শক্তি নাই; তথাচ সর্ব্বত্র পার্থিবাংশের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মেঘমুক্ত জলকরকা প্রভৃতি সমুদ্রজলে পতিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডাবরণ জলরাশির বহির্ভাগে তত পরিমাণ নিরিন্ধন তেজোরাশি বিদ্যমান। তেজোরাশির বহির্দ্দেশে আবার বিস্তীর্ণ বায়ুরাশি অবস্থিত। উক্ত বায়ুর বাহিরে দশগুণ নির্ম্মল ব্যোম বিরাজমান। তদনন্তর অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মাকাশ। ঐ অনন্ত ব্রহ্মাকাশের না আছে প্রকাশ, না আছে অন্ধকার; উহা মহা চিদ্‌ঘন অব্যয় বস্তু। উহার অভ্যন্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডের দূরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের বারম্বার আবির্ভাব ও বিলয় হইতেছে। ঐ মহাকাশ আদি, মধ্য ও অন্তবিরহিত, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, লৌহপ্রায় ছিদ্রশূন্য, নির্ব্বাণাকার ও মহা চিদাখ্য। ব্রহ্ম মহাকাশ বাস্তব পক্ষে অবিকারী; উহাতে কোন কিছুই হইতেছে না, ব্রহ্মই মাত্র অবিদ্যার কর্ত্তৃত্বে জগদাকারে কল্পিত হন। তোমার নিকট এই দৃশ্যানুভবক্রম কীর্ত্তিত হইল। শ্রবণ কর, এক্ষণে লোকালোক পর্ব্বতে বিপশ্চিতের কি কি বৃত্তান্ত হইয়াছিল? বিপশ্চিৎ দিগন্ত দর্শনোদ্‌যোগের সংস্কার নিশ্চয়ে প্রেরিত হইয়া লোকালোকশৈলের শিখর দেশ হইতে উক্ত পূর্ব্বতমোগর্ভে নিপতিত হইলেন। অনন্তর এক গিরি-শৃঙ্গোপম বিহঙ্গ তাঁহার স্বদেহ ভক্ষণ করিল। পরে তথায় মনোময় দেহ স্বচিন্তিত দিগন্ত দর্শনে প্রবৃত্ত হইল।

সেই দেশ অতি পবিত্র; তাই তাঁহার আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিকতা সংস্কারের উদ্বোধন হইল। পরন্তু ততটুকু মাত্র প্রবোধবিশিষ্ট বিপশ্চিৎ দেহত্রয়ের অতিরিক্ত বিশুদ্ধ চিন্মাত্রাত্ম-বিষয়ক প্রবোধও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে দিগন্ত দর্শনকার্য্যের পর্য্যবসান দেখিয়াও তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মহর্ষে! দেহাভাব দশায় চিত্তের প্রসার হইতে পারে কিরূপে? অপিচ পূর্ব্ব দেহ হইতে আতিবাহিক দেহের বিশেষত্বই বা কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! অন্তঃপুরবাসীদিগের মন যেমন সঙ্কল্পের পথে প্রধাবিত হয়, তেমনি সেই বিপশ্চিতের মনও সঙ্কল্পপথেই প্রধাবিত হইয়াছিল। ভ্রান্তিদশায় মনোরাজ্যে এবং স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যা জ্ঞানে ও কথাশ্রবণে মনের যাদৃশ প্রসার হয়, তাদৃশ ভাবেই সেই বিপশ্চিতের মনঃ-প্রসার ঘটিয়াছিল। যে দেহে ভ্রম স্বপ্নাদি হয়, তাহাকেই আতিবাহিক দেহ বলা যায়। কালপ্রভাবে আতিবাহিক দেহাভিমানের যখন বিস্মৃতি ঘটে, তখন আধিভৌতিক বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, বিচার করিবার পর আধি-ভৌতিক ভ্রম নিরস্ত হইলে আতিবাহিক দেহই অবশিষ্ট থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জুসর্প ভ্রম বিচারে রজ্জু মাত্রের অবশেষের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার ঐ আতিবাহিক দেহেরও নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখ, দেখা যাইবে যে, উহাও চিন্মাত্র ভিন্ন অন্য কেহই নহে! এক দেশ হইতে অপর দেশ প্রাপ্তি ঘটিলে অভ্যন্তরেও ঐ অনন্ত চিন্মাত্র এক সম্বিদেরই রূপ বিদ্যমান; সুতরাং বল দেখি কোথায় দ্বৈত, কোথায় দেশ আর কোথায়ই বা রাগাদির অবস্থিতি? জানিবে—সকলই আদি-অন্ত-বিরহিত নিত্য বোধাত্মক শিবস্বরূপ। নির্গলিত মন মননই নির্ম্মলোত্তম বোধ; সেই আতিবাহিক দেহাভিমানী বিপশ্চিৎ তথাবিধ বোধ প্রাপ্ত হইলেন না, তাহার বৈপরীত্যে তিনি আতিবাহিক দেহ মাত্র আত্মবোধ-বিশিষ্ট হইলেন। এই প্রকার বোধের ফলে সেই বিপশ্চিৎ মনকে গর্ভবাসোপম তমঃপ্রদেশে গমন করিতে দেখিয়াছিলেন। তৎপরে কোটি যোজন-বিস্তৃত হেমময় ব্রহ্মাণ্ডের কপাটসন্নিভ বজ্রসার-তুল্য, ভূতল স্থান তাঁহার দৃষ্টিপথে

পতিত হইয়াছিল। তদনন্তর ব্রহ্মাণ্ডকপাট অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক জলরাশি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ জলরাশি কপাটভূমির অনুরূপ বলিয়া দ্বীপান্তে অর্ণবপৃষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত। বিপশ্চিৎ উহা অতিক্রমপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রলয়াগ্নিপ্রতিম ঘন জ্বালাপিণ্ডকোটরাভ ভাস্বর তৈজসাবরণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহার দাহ-শোকাদি-বর্জ্জিত মনোময় দেহে ঐ তৈজসাবরণ উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্ববর্ণিত বায়বাবরণে বহন অনুভব করিলেন। বিপশ্চিৎ সেই বায়বাবরণে উহ্যমান হইয়া আতিবাহিক আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন। সেই চিন্মাত্রাত্মা অনুভব করিয়াছিলেন,—যেন নিজেরই কিছু উহ্যমান হইতেছে।

এই প্রকার বোধ সাহায্যে ঐ ধীরপ্রকৃতি বিপশ্চিৎ বায়ুসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সেই বায়বার্ণব হইতে দশ গুণ অধিক ব্যোমমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তার পর সেই বিপশ্চিৎ ঐ ব্যোমমণ্ডল অতিক্রম করিলেন এবং অপার অনন্ত অবিদ্যাশবল ব্রহ্মাকাশ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা হইতে অখিল উৎপত্তি স্থিতি সম্পন্ন হয়, তথাবিধ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মাকাশে সেই বিপশ্চিৎ তখন মনোময় দেহে ভ্রমণ করিতে করিতে আরও দূর দেশে প্রয়াণ করিলেন, সংস্কার বশতঃ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও জগৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি পুনরায় সংসার-রচনা, পুনরায় স্বর্গসংস্থান, পুনরায় দিকৃচক্রবাল, পুনরায় মহীধরবৃন্দ, পুনরায় ব্যোমমণ্ডল এবং পুনরায় মনুষ্য সকল অবলোকন করিলেন। পুনরায় পঞ্চ মহাভূত, তাহাতে সমগ্র জগৎ, পুনরায় স্বর্গসংস্থান, পুনরায় দিঙ্মণ্ডল, পুনরায় অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মাকাশ, আবার স্বর্গ, আবার অন্য অব্যবস্থান্বিত পদার্থ—তিনি দেখিলেন।

এই ভাবে সেই বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছেন,—এখনও সেই ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছেন। জগতের প্রতি চিরাভ্যস্ত সত্যতা নিশ্চয়হেতু অদ্যাপি তাঁহার বিরতি লাভ ঘটে নাই। ঐ কারণেই তাঁহার অবিদ্যারও অবসান হয় নাই। ফলতঃ অবিক্রিয়স্বভাব ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ, ইহাই অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দৃক্-স্বভাবই আত্মা—তিনি প্রকাশস্বভাব। জাগ্রৎই বল, স্বপ্নই বল, সকল

অবস্থাতেই ব্রহ্ম পূর্ব্বে যেমন যেমন ভাবে দৃষ্ট হইয়াছেন, সম্প্রতিও সেই সেই ভাবেই দৃষ্টিবিষয়ীভূত হইতেছেন; পরবর্ত্তী কালেও সেই ভাবেই দৃষ্ট হইবেন, ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ; তিনি সেইভাবেই নিত্য ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন এবং ভাবী কালেও থাকিবেন। ছিল, আছে ও থাকিবে ইত্যাদি ক্রমসম্পন্ন জগৎ প্রতিভা নিদ্রিত নয়নযুগের তৈমিরিক চক্রবৎ প্রতিভাত হইতেছে। এই প্রতিভা চিন্ময়াত্মদৃষ্টিতে সৎ নহে এবং অজ্ঞদর্শনে অসৎও নহে।

হে রাঘবেন্দ্র! রঙ্কু নামক মৃগবিশেষ যেমন বনমধ্যে ভ্রমণ করে, তেমনি সেই বিপশ্চিৎ অসংবিদিত পরতত্ত্ববশতঃ তমুতর বৈশ্বানরোদরের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাবলোকিত ও তদনুরূপ অন্য জগতে বারম্বার ভ্রমণ করিতেছেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

ঊনত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! শুনিলাম, বিষ্ণুর প্রসাদাৎ এক বিপশ্চিৎ মুক্তি পাইয়াছেন; অন্য বিপশ্চিৎ অবিদ্যার অধীন হইয়া বারম্বার ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি, যে দুই বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে শাল্মলীদ্বীপ-রাজ্যে ভোগাসক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দিগন্তদর্শনরূপ দেববর সম্বন্ধে কি হইয়াছিল? আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিপশ্চিৎযুগলের মধ্যে দক্ষিণ বিপশ্চিৎ চিরাভ্যস্ত বাসনার বশীভূত হইয়া নানা দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বিবিধ দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর বিপশ্চিতের পথে উপনীত হইয়াছিলেন। উত্তর বিপশ্চিতের ন্যায় তিনিও ব্রহ্মাণ্ডাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পরমাকাশোদরে অনন্ত সংসারপরম্পরা দেখিতে দেখিতে আজও অবস্থান

করিতেছেন। অপর অর্থাৎ পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ চন্দ্রলোকে চন্দ্র-সন্নিধানে ছিলেন; চন্দ্রের মৃগে তাঁহার স্নেহাতিশয্য হইয়াছিল; তাই তৎসঙ্গ বশতঃ তিনি ভ্রমণময় দেহোপলক্ষিত মৃগরূপে আজও গিরিপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সেই চারিজন বিপশ্চিতেরই সর্ব্বদা একই বাসনার উদয় ছিল। এ অবস্থায় কেন তাঁহারা উত্তমাধম ফল লাভ করিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জীবগণের নিজাভ্যস্ত বাসনা দেশ, কাল ও ক্রিয়া নিবন্ধন কোমল হইলে অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর যদি উহা দৃঢ়ীভূত হয়, তবে অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল ও ক্রিয়াদির একত্ব এবং বাসনার একত্ব এতদুভয়ের মধ্যে যাহার বলবত্তা হইবে, তাহারই জয় সুনিশ্চয়। ঐরূপ বিভাগবশতই সেই বিপশ্চিৎচতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্ন-রূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অবিদ্যাবাধ্য, এক জন মুক্ত এবং অন্য জন মৃগ হইয়াছিলেন। আজও সেই ভ্রান্তি-বুদ্ধিশালী বিপশ্চিৎত্রয় অবিদ্যার অন্ত লাভ করেন নাই। অবিদ্যা সহস্র সহস্র ভ্রান্তিদ্বারা বর্দ্ধিতা হইয়া অনন্তাকারে বিরাজিতা। সূর্য্যোদয় হইলে তিমিররাশি যেমন নিঃশেষতঃ নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি যখন বিজ্ঞানা-লোক প্রস্ফুট হয়, তখন অবিদ্যা সত্বরই উপশম লাভ করে। পশ্চিম বিপশ্চিতের স্ব-বাসনাকল্পিত জগতে যেরূপ যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। পশ্চিম বিপশ্চিৎ যখন স্মৃতি ভ্রমবশতঃ স্বাদূদধির পর-পারস্থিত কাঞ্চনভূমির ব্রহ্মমহাকাশাধ্যস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে বাস্তব ব্রহ্মরূপে দৃশ্যভাব উপগত হইলেন, তখন তিনি শমদম ও ভগবদনুরক্তি প্রভৃতি গুণৌঘ-সঙ্গবশে জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের অন্তর্ভূত হইয়া দৃশ্যমান জড়বস্তু প্রপঞ্চ যথাযথ বিদিত ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানের উৎকর্ষে মৃগতৃষ্ণা-সলিলের ন্যায় অবিদ্যা তখন ব্যাহত হইল। পশ্চিম বিপশ্চিতের চেষ্টিত স্পষ্টতঃ এই বিবৃত করিলাম। অবিদ্যা ব্রহ্মময়ী, তাই ইহা ব্রহ্মের ন্যায় অন্তবিরহিতা। অপরিজ্ঞাত-দশায় ব্রহ্ম মিথ্যা অবিদ্যানামে নিরূপিত হইয়া থাকেন; আর পরিজ্ঞাত হইলেই শান্ত ব্রহ্ম আখ্যায়

অভিহিত হন। ভেদই অবিদ্যাময়; তাই এ ভেদ ভেদই নয়। বিপশ্চিৎ শত যুগেও অবিদ্যার অন্ত লাভে সক্ষম নহেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ঐ বিপশ্চিৎ কি ব্রহ্মাণ্ড-কপাট পাইয়া ছিলেন? বক্তৃবর! আপনিই তো পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকপাট ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্রেই দ্বিখণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে দুই হস্তে ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ ভাগদ্বয় পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত জলাদি আবরণ উল্লিখিত ভাগদ্বয়ের ন্যায় বিভক্ত হইয়াই ভাগযুগ্ম অবলম্বনপূর্ব্বক রহিয়াছে। তাহারা নিজেই নিজেদের আধারস্থান। ঐ দুই অণ্ডকপাটের অভ্যন্তরেই আকাশ; সেই আকাশই আনীল বলিয়া পরিলক্ষিত। উহাতে জলাদি আবরণ সংলগ্ন হয় না এবং থাকেও না। উহা সুনির্ম্মল শূন্যময়; আপ্রলয় উহা অন্যান্য ভূতবৃন্দের আধাররূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে। বিপশ্চিৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সেই অবিদ্যার পরীক্ষা নিমিত্ত আমোক্ষ আকাশে ঋক্ষচক্রবৎ গমন করিয়াছিলেন। অনন্তরূপিণী অবিদ্যা ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নহে। কেন না, অবিদ্যাই তো ব্রহ্মময়ী। অপরিজ্ঞান দশায় উহার অস্তিত্ব ও পরিজ্ঞাত হইলে অনস্তিত্ব। এই জন্যই বিপশ্চিদ্‌গণ পরমাকাশে দূর দূরান্তরে অবিদ্যার জগৎস্বরূপে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মুক্ত, কেহ মৃগ এবং কেহ কেহ বা জন্মান্তরীণ পুঞ্জীভূত সংস্কারবশে আজও ভ্রমণশীল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! যদি মৎপ্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে কিরূপে জগতের কতদূরে কোথায় সেই বিপশ্চিদ্‌বর্গ বিচরণ করিতেছেন, তাহা আমার নিকট বিশদভাবে বলুন। যে সংসারে তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সে সংসার কত পরিমাণ পথে অবস্থিত? আপনি আমাদের নিকট পরম আশ্চর্য্য কথারই অবতারণা করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বিপশ্চিৎযুগল যে জগতে অবস্থান করিতেছেন, বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হইবে না। তৃতীয় বিপশ্চিৎ মৃগযোনি লাভ করিয়াছেন; তিনি মৃগ হইয়া

যথায় অবস্থিত আছেন, তদন্তর্গত সংসার-ব্রহ্মাণ্ডও আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবার নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—তৃতীয় বিপশ্চিৎ মৃগযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে জগতে অবস্থান করিতেছেন, সেই জগৎ কোথায়, তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরম ব্রহ্মময় পরমাকাশে মৃগরূপধারী বিপশ্চিৎ যে জগতে অবস্থিত আছেন, তাহা শ্রবণ কর। এই ত্রিজগদভ্যন্তরেই ঐ মৃগ অবস্থিত আছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ঐ বিপশ্চিৎ এই জগৎ হইতেই গতি প্রাপ্ত হন, আবার এই জগতেই মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এ ঘটনার সামঞ্জস্য হইতে পারে কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অবয়বী যেমন অখিল অবয়ব নিত্য অবগত হইতে পারেন, আমিও তেমনি ব্রহ্মাত্মাবস্থিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিদিত আছি। সম্প্রতি যাহা অসদাকারে উৎপন্ন, পূর্ব্বে যাহা নিষ্পন্ন এবং যাহা বিনশ্বর বিচিত্র, পরস্পর অদৃশ্য, আর অভিন্ন চৈতন্যাবস্থ অধ্যাসবশে পরস্পর প্রোত পৃথ্বীবিকার পটবস্ত্রাদিরূপে সংস্থিত, সেই সকলও আমার বিদিত। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালগত অন্য কোন মার্গে অবস্থিতিকালে যাহা ঘটে, তাহা এই ব্রহ্মাণ্ডে যে ভাবে সংঘটিত হয়, আমিও তোমায় সেইভাবেই বলিয়া আসিতেছি। বিপশ্চিৎচতুষ্টয় নিজ নিজ বাসনা-কল্পিত বিবিধ সংসারে সেই সেই দেহ যোগে দিগ্‌দিগন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিপশ্চিৎ অনন্ত অম্বরপথে অখেদমনে কাকতালীয় ন্যায়ে ভূরি জগৎ পরিভ্রমণপূর্ব্বক এই জগতেরই কোন এক গিরিদরী-প্রদেশে হরিণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দূরদূরান্তরে বহুল জগৎ পরিভ্রমণান্তে যে সৃষ্টিতে মৃগ হন, সেই সৃষ্টি এই ব্রহ্মাকাশে কাকতালীয়বৎ বিরাজ করিতেছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ঐ মৃগ কোথায় কোন্ দিকে, কোন্ দেশে, কোন্ অচলে বা কোন্ অরণ্যে থাকিয়া কি করিতেছে? কিরূপেই বা সে শস্য-সমন্বিত ভূমিগত দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিতেছে? ঐ মৃগ সর্ব্বথা শিথিল জ্ঞান-শীল; সুতরাং কবেই বা সে তাহার সেই পূর্ব্বতন জাতি স্মরণ করিবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ত্রিগর্ত্তাধিপতি তোমায় একটা ক্রীড়ামৃগ প্রদান করিয়াছেন; ঐ মৃগ অধুনা তোমার ক্রীড়াগারে অবস্থিত আছে। জানিবে— উহাই সেই পূর্ব্ববিপশ্চিৎ।

বাল্মীকি কহিলেন,—রামচন্দ্র সভামধ্যে এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বালকবৃন্দকে সেই মৃগানয়নার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর সেই হৃষ্টপুষ্ট মৃগ আনীত, সভামধ্যে প্রবিষ্ট ও সভ্যগণকর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইল। তাহার দেহস্থিত বিন্দুবৃন্দে তারাবিন্দুখচিত গগনমণ্ডল বিড়ম্বিত হইতে লাগিল। তদীয় দৃষ্টিপাতরূপ উৎপলাসার-বর্ষণে সুন্দরীগণ যেন পরিতর্জ্জিত হইতে লাগিল। সে যেন সভাস্তম্ভখচিত মরকতপ্রভায় হরিত তৃণ ভ্রমে তাহা গ্রাস করিতে ধাবিত হইল। সেই ঊর্দ্ধীকৃত-নয়ন-গ্রীব মৃগ বেগবশে অস্থির ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তদীয় অবস্থান দ্বারা সভ্যগণ দর্শনোৎকণ্ঠায় আকুল হইলেন; ওদিকে তাহার আস্কন্দাশঙ্কাও তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই মৃগ দেখিয়া সভাস্থ রাজা, মুনি ও মন্ত্রী এবং অন্যান্য সকলেই এই বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে, আহা, সংসারের কি অনন্ত মায়া! সর্ব্বজনের দৃষ্টিরূপ নিবিড়োৎপলবর্ষণে সেই মৃগ তখন নীলীকৃতবৎ অবস্থিত ও রত্নাংশজালে পরিস্কৃত হইতেছিল। তদ্দর্শনে সেই সভা অদ্ভুত রসাস্বাদ-জন্য বিস্ময়জড়তায় পরিবৃতা হইয়া চিত্রলিখিত কমলিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইলে লাগিল।

ঊনত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিক শততম সর্গ

বাল্মীকি কহিলেন,—অতঃপর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! কোন্ উপায়ে ঐ বিপশ্চিতের দেহলাভ হইবে এবং কিরূপেই বা বাস্তব আত্মাবির্ভাবে উহার দুঃখান্ত ঘটিবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে পুরুষ যে দৈবের চিরোপাসনায় বারম্বার ইষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি সেই দৈব ভিন্ন হইবার নহে। যদিও হয় তথাচ তাহা শোভা পায় না; যদিও শোভা পায়, তথাচ পরিণামে তাহা সুখদ হয় না, যদি বা সুখ লাভ ঘটে, তথাচ পরলোকে তাহা কখনই হিতবিধায়িনী হয় না। ঐ বিপশ্চিতের অগ্নিই রাক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং কনক যেমন অগ্নিপ্রবেশে নৈর্ম্মল্য লাভ করে, তেমনি ঐ মৃগ অগ্নি প্রবেশ করিয়াই উহার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা দেখ, আমি এখনই ইহা করিব। তোমাদিগকে দেখাইব, ঐ মৃগ এখনই অগ্নি প্রবেশ করিবে।

বাল্মীকি কহিলেন,—ইষ্টচেষ্টা-নিষ্ঠ বশিষ্ঠ-মুনি এই কথা কহিয়া যথারীতি কমণ্ডলু-জলে আচমনপূর্ব্বক জ্বালাপুঞ্জময় নিরিন্ধন বহ্নিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তদীয় ধ্যানবশতঃ সভামধ্য হইতে জ্বালামালা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জ্বালামালী অনল—নিরঙ্গার, নিরিন্ধন, নির্ধূম ও নিষ্কজ্জল। উহা হইতে বম্ বম্ শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। সেই অগ্নি দেখিয়া মনে হইল, যেন একটা দীপ্তকান্তি কনকমন্দির কিম্বা সুন্দর কিংশুকতরু অথবা যেন সান্ধ্য অম্বুদ সমুত্থিত হইয়াছে। সেই প্রোজ্জ্বল জ্বলন দর্শনে সভ্যগণ দূরে দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু প্রক্ষীণপাপ হরিণ প্রাক্তন ভক্তি বশতঃ অগ্নিদর্শনে হৃষ্ট হইল এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার কামনায় তাহার পশ্চিম দিকে উৎপতনোদ্যত সিংহবৎ সমুপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মৃগসম্বন্ধীয় বিচার করিয়া দিব্যাবলোকনে তাহাকে ক্ষীণপাপ করিয়া লইলেন এবং বহ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্, হুতাশন! আপনি করুণা করিয়া এই কমনীয় মৃগের প্রাগ্ভবীয় ভক্তি স্মরণ করুন এবং ইহাকে আবার বিপশ্চিৎ করিয়া লউন।

মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিবা মাত্র লক্ষ্যাভিমুখ-ধাবিত বেগবিমুক্ত বাণের ন্যায় সেই মৃগবর সভামধ্য হইতে ছুটিয়া গিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। মৃগ অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, মুকুরগত প্রতিবিম্ব বা সন্ধ্যার নীরধরের ন্যায় তাহাকে স্পষ্টতই বিশ্রান্ত-কলেবর পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশগত অভ্রখণ্ডের ন্যায় দেখিতে দেখিতে ঐ মৃগ নর-

কলেবর পরিগ্রহ করিল। যেমন অর্কবিম্বে আদিত্য, চন্দ্রমণ্ডলে নিশাপতি, মহাসাগরে বরুণ, সান্ধ্যমেঘে শশধর এবং নেত্রকণীনিকায়, মুকুরে, মণিতে ও সলিলে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি তখন বহ্নিমধ্যে এক কনককান্তি ভক্ত পুরুষ পরিদৃষ্ট হইলেন। অনন্তর সন্ধ্যার নীরধরের ন্যায় কিম্বা বাতাহত প্রদীপের ন্যায় সেই বহ্নি তখন সভামধ্য হইতে অম্বরে বিলীন হইল। দেখা গেল, দবালয় ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ দেবপ্রতিমার ন্যায় অথবা দৃশ্য পটের উত্তোলনে অভিনেতার ন্যায় তথায় এক পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তিনি অক্ষমালা-ধর, শান্ত, স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত ও সদ্য সমুদিত শশাঙ্কের ন্যায় প্রতিভাত। তদীয় বেশ দর্শনে সভ্যগণের মুখ হইতে—'অহো ভা!' এইরূপ বিস্ময়োক্তি সমুচ্চারিত হইল। সভাস্থ অনেকে বলিয়া উঠিলেন,—এই পুরুষ মুর্ত্তিমান্ আভাস সদৃশ; অতএব ইনি ভাস-নামেই অভিহিত হইবেন। তাঁহাদের সেই ভাস আখ্যাক্রমেই তিনি ভাস নামে নিরূপিত হইলেন। অনন্তর সেই ধ্যানস্থ ভাসাখ্য পুরুষ তথায় উপবেশনপূর্ব্বক প্রাক্তন আত্মবৃত্তান্ত আমূলতঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন। সভাসদ্গণ সে কালে একান্ত বিস্ময়াবেশে নিষ্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ভাস মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধ্যান হইতে বিরত ও উত্থিত হইলেন। এই সময় সভাস্থ সভ্যগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। অনন্তর সহর্ষে বশিষ্ঠ ঋষিকে তিনি প্রণাম করিলেন, বলিলেন—হে জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রদ ব্রহ্মন্! তোমায় নমস্কার করি। তখন বশিষ্ঠ ঋষি আপনার উভয় হস্তে তদীয় মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন—তোমার চিরদৃশ্যমান অবিদ্যার অবসান হউক। অনন্তর সেই পুরুষ রামচন্দ্রকে 'জয় হউক' বলিয়া শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ স্বীয় আসন হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—রাজন্! আপনার শুভাগমন তো? আপনি এই আসনে আসিয়া উপবেশন করুন। হে বহুজন্ম সংসার-ভ্রান্ত! আপনি এখন এই স্থানে বিশ্রাম করিতে থাকুন।

বাল্মীকি কহিলেন,—দশরথ নরপতির বাক্যাবসানে ভাসাখ্য বিপশ্চিৎ বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন দশরথ কহিলেন—অহো! আলানবদ্ধ হস্তীর যেমন দুঃখ, তেমনি এই অবিদ্যাবদ্ধ বিপশ্চিতের বহুকাল বহুদুঃখ ভোগই হইয়াছে। অহো! অতত্ত্বজ্ঞানীর কি বিষম গতিই না হইয়া থাকে! নির্ম্মলাম্বরে একমাত্র অজ্ঞানই সৃষ্টিবিভ্রম প্রদর্শন করাইতেছে! বিতত আত্মায় এই জগৎ সমুদায় সমাস্তৃত; কি আশ্চর্য্য! বিপশ্চিৎ দীর্ঘকাল হেথায় ভ্রান্ত হইয়াছেন! বস্তুতঃ চিদাত্মবৃত্তি শূন্যাত্ম মায়ার কি অপূর্ব্ব মহিমা! উহা নিজে মহিমবিরহিত হইয়াও অম্বরবৎ অসঙ্গ ব্রহ্মচিদ্‌ঘন বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশমান।

ত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

দশরথ কহিলেন,—এই বিপশ্চিৎ অবিদ্যাবশে যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা আমি অবিপশ্চিৎ কার্য্য বলিয়া মনে করি। কেন না, অবশ্যই সাধন করিব এইরূপ একটা দুরাগ্রহ যদি মিথ্যা বস্তুতে করা হয়, তাহা হইলে উহা ক্লেশজনকই হইয়া থাকে।

বাল্মীকি কহিলেন,—এই সময় রাজার পার্শ্বোপবিষ্ট মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—মহারাজ! আপনার কথা সত্যই বটে; যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তিরূপিণী বাসনাই হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাবশেই অক্ষীণ নিশ্চয় বাটধান রাজপুত্রগণ অদ্য সপ্ত দশ লক্ষ বর্ষ যাবৎ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা ভূমির অন্তদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া আজও অনুদ্বিগ্নচিত্তে ধাবিত হইতেছেন। এই যে প্রসিদ্ধ পাতাল-ভূরাদি-লোক-ঘটিত ভুবনসমষ্টি, ইহা আকাশেই বর্ত্তুলাকারে অবস্থিত। হিরণ্যগর্ভেরই সঙ্কল্পবলে ইহা নিশ্চেতব্য; পরন্তু অন্যের পক্ষে অনিরূপণীয়। বালকের সঙ্কল্পতরুর ন্যায়ই ইহার অবস্থিতি। যেমন আকাশরুদ্ধ কন্দুকের পিপীলিকাদল দশ দিকে পরিভ্রমণ করে, তেমনি ভূতবৃন্দও তদীয় আধারভুবনে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। এই ভূলোকের

অধঃ ও ঊর্দ্ধ ভাগের যে যেখানে যাহার বাস, সে সেই স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অন্তরীক্ষের মন্দাকিনী ও চন্দ্রার্কাদি ধ্রুবচক্র বায়ুবন্ধনবশে দূর হইতে ভূর্লোক আশ্রয়পূর্ব্বক পরস্পর অসংস্পর্শভাবে ভ্রমণশীল রহিয়াছে। জ্যোতিশ্চক্র বেষ্টনপূর্ব্বক এই ভুবনেই দ্যুলোক অবস্থিত। সর্ব্ব দিকেই ঊর্দ্ধে আকাশ ও অধোভাগে মহী বিরাজমান। মহীমণ্ডলের অধোভাগে যে সমস্ত পদার্থপরম্পরা পরিভ্রমণশীল, তাহারা স্ব স্ব অবয়ব চিৎপ্রদেশে সংযুক্ত করিয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকে। পক্ষিগণ উৎপতন দ্বারা যে আকাশে গমন করে, তাহাই ঊর্দ্ধ আখ্যায় অভিহিত হয়। রাজন্! পূর্ব্বে ভূলোকস্থ বাটধান দেশে বাতদধীশ্বর নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার বংশে তিনটি রাজপুত্রের উৎপত্তি হয়। বিপশ্চিৎ যেমন জগতের অন্ত দেখিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই তিন রাজপুত্রও তেমনি জগতের অন্ত কোথায় আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বারম্বার কত কত দ্বীপ সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পুনঃ-পুন সেই সেই স্থান তাঁহাদের সম্মুখে আপতিত হইতে লাগিল; পুনঃপুন উঁহারা অতিক্রম করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে মরণান্তে নব নব দেহ লাভে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বচ্ছ কন্দুকাসক্ত কীটের ন্যায় প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতে করিতেও পৃথিবীর অন্ত সীমা প্রাপ্তি তাঁহাদের ঘটিল না। নানাদেশ দেশান্তরে তাঁহারা অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন মাত্র। যেমন ব্যোমগত কন্দুক-ভ্রান্ত পিপীলিকাপাল, তেমনি তাঁহারা অদ্যাপি সংস্থিত রহিয়াছেন। রাজন্! তাঁহারা কখন খিন্ন হন নাই কিম্বা এখনও খেদানুভব করিতেছেন না। এই ভূলোকের অধঃ বা পার্শ্বস্থ যে যে স্থানে তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই অন্তবর্জ্জিত অধ ও ঊর্দ্ধ দিক্ সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আমরা যদিও বিশেষ উদ্যোগ করিয়া এ স্থান হইতে অন্ত সীমা পাইলাম না, তথাচ আমাদের নিবৃত্তি নাই; আমরা এখনও সঞ্চরণ করিতে থাকিব। এইরূপে জানিবে—সকলই ব্রহ্মসঙ্কল্পাড়ম্বরময়; কিছুই কিছু নয়। এতৎসমস্তই স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় অনন্ত। চিদধিষ্ঠানবশে অজ্ঞানকল্পিত সঙ্কল্পের চিন্মাত্রই তত্ত্ব। সঙ্কল্প ব্রহ্মাধিষ্ঠিত, চিৎস্বরূপই ব্রহ্ম। আবর্ত্ত তরঙ্গ

ও বুদ্বুদাদি যেমন জল হইতে অতিরিক্ত নয়, তেমনি যাহা চিন্মাত্রকল্পিত, তাহাও চিৎ হইতে অতিরিক্ত নহে। তৎসদৃশ অন্যের অত্যন্তাসম্ভাবনা বশতঃ যাহা যেরূপে আভাত হয়, তাহা চিদাভ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টির আদিতে এই নামরূপ-প্রকটিত জগৎ ছিল না; কাজেই ইহা শূন্য। সেই যে শূন্য, তাহাই ব্রহ্মাকাশ; সেই ব্রহ্মই অধুনা স্বয়ং জগদাকারে প্রকাশমান হইতেছেন। প্রলয়-সৃষ্টি এইরূপেই দেখা যাইতেছে। কাম, কর্ম্ম ও বাসনানুসারে সেই চিদ্রূপ যে ভাবে যে যে কল্পনা করেন, সেইরূপেই তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেও চিরকাল যেমন জড় ও চিদ্রূপের অন্যান্যাধ্যাসযুক্ত স্বসংসার ছিল, অগ্রে ও চিরকাল তেমনই থাকিবে। উহা দৃশ্যাত্মক, একরূপ ও অক্ষয়। ঐ অক্ষয়রূপ স্বয়ম্প্রকাশ এবং অপ্রকাশের ন্যায়ও আভাসমান। যেমন শৈলোদরে শিলা ও আকাশে স্বচ্ছাকাশ অবস্থিত, তেমনি সেই সূক্ষ্ম চিন্মধ্যেই সেই সেই আকার-সম্পন্ন বাসনাবচ্ছিন্ন জগদনুভবাণুসমষ্টি বিরাজিত। স্বভাবনিষ্ঠেরাই অব্যাকৃত আত্মোদরে কৃতাবস্থান; নিরবদ্য চৈতন্যে অবস্থিতি করে না। কেন না, তাহাতে অন্য ব্যাবর্ত্ত্য রূপ নাই। হে শুদ্ধবুদ্ধি সভ্যগণ! সেই ব্রহ্ম হইতে অব্যাবৃত্তই জগৎ; কারণ সুবিতত জগৎ ব্রহ্মভাবরূপেই বিরাজমান। পূর্ব্বাপর পরামর্শপূর্ব্বকই ইহা নির্দ্দিষ্ট। জীব সেই পরম ধাম হইতে বাস্তবপক্ষে স্বয়ং অপ্রচ্যুত হইয়াও নানাত্ব বুদ্ধিবশে 'জীবোঽহং' রূপে গ্লানি ভোগ করিয়া থাকে; ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। হে বিপশ্চিৎ! হে ভাসাপরনামধেয়! হে রাজন্! তুমি কি কি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছ? কোথায় বা ভ্রমণ করিয়াছ? যদি তোমার স্মরণ থাকে তো সংক্ষিপ্তভাবে বল। ভাস কহিলেন,—আমি বহু দৃশ্য দর্শন করিয়াছি; অখিন্নমনে অনেক স্থানে অনেক ভ্রমণও করিয়াছি। বহু প্রকারে অনুভূয়মান বহু বস্তু অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে সমুদিত রহিয়াছে। আমি দূরে অতি দূরে বিবিধ দেহে অনন্ত জগদন্তরালে অব্যাকৃত আকাশ-দেশে অনন্ত সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছি। আমি অগ্নিদেবের বরে দৃঢ়চিত্ত হইয়া বিচিত্র দেহে জন্মান্তরাবর্ত্তে বিবর্ত্তিত হইয়াছি; স্বয়ং অনন্ত দৃশ্যপরম্পরা অনুভব করিয়াছি। আমি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক

জগতে বিবিধ দেহে ভ্রমণপূর্ব্বক পূর্ব্বতন দৃঢ় নিশ্চয়ের স্মরণবশতঃ দৃশ্যাত্মক অবিদ্যার অন্ত পরীক্ষায় একান্ত যত্ন করিয়াছিলাম। আমি সহস্র বৎসর যাবৎ বিটপী ছিলাম। সেই অবস্থায় বহিঃপ্রবৃত্তি-বর্জ্জিত জীবদ্বারা আমার সুখদুঃখ ভোগ হইত। তখন পূর্ব্বাপর পরামর্শের হেতু চিত্ত ছিল না বলিয়া পুষ্পফলাদির উৎপত্তিবিস্তার-ব্যাপারে আমি কন্দবিশেষবৎ ভৌমরসকালাদিতন্ত্র হইয়াছিলাম। অনন্তর শত বর্ষ ধরিয়া আমাকে মেরুপ্রদেশের মৃগ হইতে হয়। সে অবস্থায় আমার সুবর্ণবৎ বর্ণ ও তরু-পর্ণবৎ কর্ণ হইয়াছিল। আমি তখন দুর্ব্বাঙ্কুর আস্বাদন করিতাম, গান করিতাম; ঐ দুই ব্যাপারে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সে বনে যত মৃগ ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা আমি কনিষ্ঠ ছিলাম; সুতরাং আমার দেহ ক্ষুদ্র ও অল্পবলশালী ছিল। কাজেই কাহাকেও হিংসা করিতাম না। অতঃপর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতাঞ্চলের কাঞ্চন কন্দরে আমি শতার্দ্ধ বর্ষ পর্য্যন্ত শরভ হইয়াছিলাম। সে অবস্থায় আমার অষ্টপদ ছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে করকাদি পাতে আমার অতি শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অনন্তর আমি বিদ্যাধরযোনি লাভ করি। তখন মলয় ও মন্দরাচলের মন্দার, চন্দন ও কদম্বতরুর নিকুঞ্জপুঞ্জে সৌরভময় ক্রমান্দোলিত অনিল-সমভি-ব্যাহারে বিদ্যাধর-সুন্দরীগণের সুরতধর্ম্মসুধা পান করিয়াছি। তৎপরে বিরিঞ্চিবাহন হংসের পুত্র হইয়া আমি পঞ্চ দশ বৎসর মেরুগিরিতে মন্দাকিনীর তটান্তরালে রমণ করিয়াছি এবং হেমারবিন্দের মকরন্দ-পিশঙ্গিত পয়ঃপানে কালাতিপাত করিয়াছি। ক্ষীরোদ-বেলাবনের গন্ধবহ যাহাদিগের লীলালকবল্লরী বিলোলিত করিত, আমি শত বর্ষ ধরিয়া তাদৃশ মাধব-সুন্দরীদিগের শোকাপহারী সঙ্গীত শুনিয়াছি। আমি কালঞ্জর-গিরির মঞ্জরিত করঞ্জগুঞ্জাবনে জম্বুক হইয়াছিলাম; তদবস্থায় একদা গজপদ-দলনে আমার দেহ পিষ্ট ও চূর্ণিত হয়; তাহাতে আমি অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ি। সেই অবস্থায় দেখিতে পাইলাম,—একটা সিংহ আসিয়া সেই গজকেই নিহত করিয়া ফেলিল। অনন্তর সহ্যাদ্রির সন্তানকশোভী সানুদেশে সিদ্ধ-শাপবশে আমি ইন্দুসুন্দরমুখী সুরসুন্দরী হইয়া কল্পদ্রুম-কুলের স্তবকমণ্ডিত নিকেতনে সত্যযুগের অর্দ্ধকাল একাকিনী বাস

করিয়াছি। তারপর আমি গিরীন্দ্র-সন্নিহিত জলপ্রায় প্রদেশে করবীর-লতাগৃহে সদা রমণশীল বল্মীকাখ্য বিহঙ্গ হইয়া অশঙ্কিতমনে শত বৎসর যাপন করিয়াছি। এইরূপে দুই জন্মে আমার সিদ্ধ-শাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর আমি এক সিদ্ধ হইয়া প্রাদুর্ভূত হই। তদবস্থায় আমি মহেন্দ্রাচলের সানুদেশে চন্দনদ্রুম-বেষ্টিত লতাকুঞ্জে কত কামিনীজনকে লম্বিত দর্শন করি। তাহারা যেন সেই সকল লতার ফলসমূহের ন্যায় আবলিত হইতেছিল। অনন্তর তাহাদিগকে হরণ করিলাম এবং একে একে অনেক দিন ভোগ করিলাম। ইহার পর আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। আমি তত্রত্য পর্ব্বতের নিতম্ব কদম্বকচ্ছে তাপস হইয়া কালাতিপাত করি। মুনিবর! অপর একটী আশ্চর্য্য বস্তুর কথা বলি, শ্রবণ করুন। সেই আশ্চর্য্য বস্তু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা পরিপূরিত, জলচর-নিকরবৎ অশেষ দিগন্তস্থ ভূতগণ তাঁহাতে অবস্থিত; সেই ঈষদ্‌ব্যাকৃত নাম-রূপাবস্থ ব্রহ্মই অতি আশ্চর্য্য। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও একটী বনিতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। দেখিলাম,—স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিবিম্বের ন্যায় তদীয় দেহে আকাশ-শৈলাদিসহ দিক্-কাল ও প্রাণিপরিবৃত ত্রিজগৎ প্রকাশমান হইতেছিল। আমি সেই বনিতাকে তখন জিজ্ঞাসিলাম,—অয়ি বরগাত্রি! কে তুমি? তোমার এই দেহ কি ত্রিজগদ্-ঘটিত? অনন্তর সেই বনিতা আমায় বলিলেন,—যে শুদ্ধচিৎ বস্তুপরম্পরায় সর্ব্বাবভাসিকা, আমি তাহা ভিন্ন আর কেহই নই। এই যে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক মহাজগৎ আছে, ইহা আমারই শরীর। হে পুরুষ! যেরূপে আমি বিস্ময়ৈকদেহা, সেইরূপে সকলই। ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। লোক সকল এইরূপে যখন সমস্ত বস্তুই অবগত হইতে পারে, তখন আর এ ভাব পরি-দর্শন করে না। আর যৎকালে প্রতি বস্তুস্বভাব অপরিজ্ঞাত থাকে, তখন এই ভাব অবলোকন করে। প্রাণিবৃন্দ এই দেহান্তর্গত জগতে নিত্যই সর্ব্ববেদ ও শাস্ত্রাদির শব্দসামান্যরূপ নাদাত্মক অনাহত ধ্বনি শুনিয়া থাকে। সেই যে স্বতঃ ধ্বনি, তাহা বিধি ও নিষেধগর্ভ; অর্থাৎ বিধিপক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, শমদমাদির অনুষ্ঠান করিবে, আর নিষেধপক্ষে অমুক কার্য্য করিবে না, অমুক বস্তু ভক্ষণ করিবে না, ইত্যাদি।

সেই ধ্বনি শুনিয়া তাহার অন্তর্গত বিধি-নিষেধশাস্ত্রবৎ বাচ্যরূপ জগৎও যে দেহে বর্ত্তমান আছে, এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া লও। পদার্থসমুদায়ে অনুগত সত্তা যেরূপ শব্দ-সামান্যস্বভাব, ঐ অনাহত ধ্বনিও তদনুরূপই। ফলে অতি বড় জড়বুদ্ধি প্রভৃতিতেও যখন জগদ্‌ঘটিত চৈতন্যের অসামঞ্জস্য ঘটে না, তখন চেতনপ্রায় তোমাদের দেহে তো বস্তুতঃ অসামঞ্জস্য হইবারই নহে। আমি কোন কালে কোন দেশে স্ত্রী-বিরহিত জগতে উপস্থিত হইয়াছি। তথায় বহু ভূত বহির্গত হইতেছে। সেখানে উৎপাতাদি নিমিত্ত নিরপেক্ষ আকাশে আমি অভ্র দেখিয়াছি। তাহাতে শস্ত্র সংঘটন-ধ্বনিবৎ ঝন্ ঝন্ ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সেই অভ্র হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় বিদ্যুদাদি নিপাতিত হয়, সেই বিদ্যুৎখণ্ডের সাহায্যে মনুষ্যগণের আয়ুধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ জগতে যাবৎপরিমিত গ্রাম-গৃহাদি বর্ত্তমান, সকলই আকাশপথে প্রয়াণ করিতেছে; অতি দূরে দিগন্তরে চলিয়াছে। পরন্তু সেই সকল গ্রাম আমি স্থানান্তরেও দর্শন করিয়াছি। এ জগতে যত গ্রাম-গৃহ আছে, আমি সে সকলই দেখিয়াছি; কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার দৃষ্টি সে কালে তিমিরাদিদ্বারা উপহত হইয়াছিল। এই সুর, নর ও নাগাদি লোকত্রয়বাসীর যাহা কিছু অবান্তর বিভাগ, সমস্তই শূন্যতাময়; সুতরাং বলা যায়, সর্ব্বভূতই সমান। আকাশ হইতে সর্ব্ব-ভূতেরই উৎপত্তি আর কালক্রমে আকাশেই সর্ব্বভূতের লয় হয়। অতএব আমি এ জগতের এক অনির্ব্বচনীয় অধিপতিকে স্মরণ করিতেছি, আর স্মরণ করিতেছি—অপূর্ব্ব সুরাসুরনাগনরাদি ভূতবৃন্দ, অপূর্ব্ব দ্রুম-পত্তন-রাজি ও অপূর্ব্ব লোকান্তরযুত অনন্ত মহাজগৎ। এ বিষয়ে বহু বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। ফলে আমার যাহাতে গতি হয় নাই এমন দিক্ নাই, আর যাহা আমি দেখি নাই, এমন দেশও নাই, যাহা অনুভব করি নাই, এমন কৌতুকও নাই। ফলে আমার অনুভূতিরূপ সর্ব্বসাক্ষী হইতে পৃথক্ অধিষ্ঠান অন্য কিছুই নাই। পূর্ব্বে ক্ষীরার্ণবের মন্থন কালে ভ্রাম্যমাণ মন্দরাদ্রির রত্নময় শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্র-ঘর্ষণে উপেন্দ্রভুজাঙ্গদের যে মেঘগর্জ্জনবৎ সিঞ্জন জনসমূহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, আমি সেই আশ্চর্য্যময় সিঞ্জন এখনও স্মরণ করিতেছি।

একত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ভাস কহিলেন,—আমি একদা মন্দরপর্ব্বতের মন্দারপুষ্পময় মন্দিরে মন্দরানাম্নী কোন এক অপ্সরাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে একটী সরিৎপ্রবাহ তৃণের ন্যায় আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অপ্সরা জলপ্লাবনে ব্যাকুল হইল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—অয়ি বালে! এই আকস্মিক নদীপ্রবাহে আমরা পতিত হইলাম কেন? তখন ভয়চকিতা অপ্সরা আমাকে বলিল,—প্রিয়তম! এই প্রদেশে যখন চন্দ্রোদয় হয়, তখন চন্দ্রকান্তমণিময় অদ্রিতটের সন্তানস্বরূপ নদীনিচয় প্রস্রবণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। পরন্তু আমাদের নিদ্রাগমের পূর্ব্বে একথা বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেন না, তখন তোমার সঙ্গমরসাবেশে মন আমার তন্ময় হইয়াছিল। এই কথা কহিয়া বিহঙ্গীর ন্যায় সেই অপ্সরা আমাকে লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। আমি সেই অপ্সরার সহিত পুনরায় সাত বর্ষ যাবৎ নির্ম্মল মন্দর-শৃঙ্গে বাস করিলাম। তার পর-জন্মে আমি জ্যোতিশ্চক্রবর্জ্জিত এক প্রকার জনাকীর্ণ স্বপ্রকাশ জগৎ দেখিলাম। সে জগতে দিগ্‌বিভাগ, দিনরাত্রি, শাস্ত্র বা বেদবাদ নাই; এবং দৈত্য ও আদিত্যগণের ভেদ নাই। সে জগৎ আত্মার প্রকাশেই প্রকাশমান। অনন্তর আমার যে জন্ম হয়, তাহাতে সাগরতটবর্ত্তী গগনচুম্বী শৈলনিতম্ব-কদম্বকচ্ছে বিদ্যাধর ও অমরগণের বিহার-বিমান প্রদেশে আমি আবার সোমনামক জনৈক বিদ্যাধর হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ তপস্বী হইয়া বাস করিয়াছিলাম। এই জগতে যখন আমি অবিদ্যাদর্শনে সমুৎসুক হই, তখন অগ্নির বরপ্রসাদে কখন পবনবৎ বেগগামী সুন্দর অশ্ব, মেঘাকৃতি মানব এবং সিংহ, গজ, মৃগ, তরুলতা ও অন্যান্য নানা মৃগ-পক্ষি-পন্নগ-সঙ্কুল অপার গগনে উপনীত হইয়া অতি দ্রুত জন্ম গ্রহণ করিলাম। পরে সেই জগৎ হইতে যখন নির্গত হইলাম, তখন মহাসাগর-বিস্তৃত এক নভঃপ্রদেশে পড়িয়া গেলাম। তথায় সেই সেই দেশের নভোনক্ষত্রচক্রে আবদ্ধ হইয়া দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু ও অয়নাদি কাল এবং দিক্‌চক্রবালে গমনাগমন

অনুভব করিলাম। আমি আকাশে উল্লিখিতরূপে পতিত হওয়ায় আমার পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহাতে মদীয় অন্তঃকরণে নিদ্রার উদ্রেক হইল। আমি তথাবিধ সুষুপ্ত দেহে স্বপ্নাত্মক জাগ্রদবস্থায় স্বাত্মাতেই বিশ্বোপলব্ধি করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র পক্ষী যেমন বাতবলে পরিচালিত হয়, তেমনি আমাকেও তখন সংসারচাঞ্চল্যবশে পরিচালিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত দৃশ্য পরিচ্ছেদরূপ জগদ্‌গুহায় পতিত হইতে হইল। যে পর্য্যন্ত চক্ষুর বিষয়দর্শনাশা প্রাদুর্ভূত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আমি ক্ষণমাত্রেই গিয়াছিলাম। আবার সেইরূপ আমি দেখিলাম,—দেখিবার পর দৃশ্য বস্তু সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এইরূপে যাহা জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ও তদ্‌ব্যতিরিক্ত অবস্থায় অদৃশ্য, ঈদৃশ বিষয়োদ্দেশে বেগে গম্যাগম্য দেশ উল্লঙ্ঘন করিলেও আমার বহুল বর্ষ অতিপাতিত হইয়াছিল। বালক যেমন হৃদয়স্থ পিশাচের অসত্যত্ব অবগত হইতে পারে না, তেমনি দৃশ্যনামক অবিদ্যার আমি অন্ত প্রাপ্ত হইলাম না। ইহা সৎ নহে, ইহাও সৎ নহে, ইত্যাদিরূপ বিচারানুভব যদিও আমি বহুবার করিয়াছি, তথাচ চিরাভ্যস্ত দ্বৈতসংস্কারের প্রাবল্যবশে উহা সত্য, ইহা সত্য, এইরূপ প্রতিবিষয়-বিষয়িণী দুর্দৃষ্টি আমার নিবর্ত্তিত হয় নাই। উহা বিচারযোগে নিবৃত্তি পাইলেও প্রত্যেক ক্ষণেই দেশ-কালভেদে ইষ্টানিষ্ট জনসমূহের সমাগম নিবন্ধন প্রসক্ত সুখদুঃখ দ্বারা নদীনীরবৎ নূতনভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক্ষণে এক অপূর্ব্ব তালীতমালবকুলাদিময় উন্মাদ বাতবেগান্বিত শৃঙ্গ আমার স্মরণপথে সমুদিত হইতেছে। সেই শৃঙ্গে সূর্য্যাদির করসম্পর্ক নাই; তথাচ উহা স্বীয় কান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসমান। এই যে চরাচরাত্মক বিশ্বসংসার দেখা যাইতেছে, ইহা আমার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব শৃঙ্গের সানুস্থানীয়। সেই আশ্চর্য্য শৃঙ্গটী কি? তাহা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সেই শৃঙ্গ তাঁহাদেরই মন হরণ করিয়া থাকে। অপিচ যাহা স্বচ্ছ, অদ্বিতীয়, সর্ব্ববিকার-শঙ্কা-বিরহিত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদপরিবর্জ্জিত পদার্থ, তাহাও কোন রম্য জগতে আমার অনুভূতিগোচর হইয়াছিল। তাহার তুলনায় সুররাজলক্ষ্মীও অকিঞ্চিৎকর।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

সেই বিপশ্চিৎ কহিলেন,—শ্রবণ করুন, অন্য এক অপূর্ব্ব জগতে আমি এক আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়াছি। উহা ব্রহ্মহত্যাদির ফলে যে রৌরবাদি নরকাবস্থা উপস্থিত হয়, তাহারই সমান হইলেও আমি বহ্নির নিকট হইতে লব্ধ বরের প্রভাবে সবলে তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। কোন এক আকাশপ্রদেশ আছে; তাহা আপনাদিগের অগম্য। তথায় প্রদীপ্ত দিবাকর-নিশাকরাদি-সমন্বিত এক বিচিত্র জগৎ বিদ্যমান। সন্নিবেশক্রমে উহা এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডসমান হইলেও শূন্যত্ববশতঃ ইহা হইতে অন্যবিধ। দৃষ্টান্ত দেখাই, স্বপ্নাবস্থায় যে নগরাদি দেখা যায়, তাহা জাগ্রদবস্থাবলোকিত নগরপ্রায় হইলেও জাগ্রৎকালে তদভাবজন্য অন্যবিধ বলিয়াই ধারণা হয়। ঐ জগতে আমি যখন বাস করি, তখন আমার হৃদয়স্থ অর্থানুসন্ধানার্থ যেইমাত্র দিঙ্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি দেখিলাম, ধরাপৃষ্ঠে এক অলিজালমলিনাকৃতি অচলপ্রতিম মহাচ্ছায়া অতিমাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই প্রচুর চ্ছায়াজনক আশ্চর্য্য বস্তু কি? তাহা ভাবিতে ভাবিতে যেমন আমি সেই জগতের ঊর্দ্ধাংশে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম, অমনি দেখিলাম, আকাশপ্রদেশেও একটা পর্ব্বতপ্রতিম পুরুষাকার ঘূর্ণমান হইতেছে। ভাবিলাম—এই বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতবৎ পতিত গিরিবৎ গুরু পদার্থ কি? ইহা কি আকাশব্যাপক-বপুঃ ব্রহ্মা? না—ব্রহ্মাণ্ড-কলেবর বিরাট পুরুষ? দেখিতেছি, ইহা-দ্বারা সৌরমণ্ডল আচ্ছাদিত হওয়ায় বাসরশ্রী বিকাশ পাইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে কল্পান্ত-বাত-বিবর্ত্তিত পাতালাবপাতবৎ আকাশ হইতে বিবস্বান্ নিপতিত হইলেন। ভাবিলাম, ঐ ভীমাকার পুরুষ যখন পতিত হইবে, তখন ক্ষণমধ্যেই এই সপ্ত দ্বীপবতী বসুমতী চূর্ণ হইয়া যাইবেন। সুতরাং ঐ সঙ্গে আমারও বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি আমার আরাধ্য দেব অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জন্মান্তর-শতারাধিত ভগবান্ বিভাবসু সুধাকরবৎ সুশীতল হইয়া আমায় বলিলেন,—বিপশ্চিৎ! তোমার ভয় নাই। আমি

বলিলাম, দেব! আপনার জয় হউক। প্রতি জন্মেই আপনি আমার পরম আশ্রয়। প্রভো! এই অকালে কল্লান্ত উপস্থিত হইয়াছে; আমাকে এখন রক্ষা করুন। আমার এই কথার পর অগ্নিদেব পুনর্ব্বার বলিলেন,—ভয় নাই বৎস! উঠ, চল, আমার লোকে আগমন কর। এই কথা কহিয়া ভগবান্ বিভাবসু আমাকে তাঁহার বাহন শুকের পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া সেই পতনোদ্যত মহাদেহের একাংশ দাহ করত ছিদ্রপথে আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নভোদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর ভূতসম্পতের অন্তরালে উহার পতন দেখিতে লাগিলাম। সেই মহান্ পুরুষাকার দেহ যখন বেগে পতিত হইতে লাগিল, তখন শৈল সাগর-বন-পত্তন-পরিবৃতা সমগ্র বসুধা চঞ্চলা হইলেন। স্রবন্তী নদী-নিচয়ের উদকপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাতে গিরিনদীর উভয় কূল দিয়া জলপ্লাবন হওয়ায় দুইটি জলপ্রপাত প্রকট হইল। জলরাশি বেগে পতিত হওয়ায় ভূবিদারণ হেতু বাপীকূপ-তড়াগাদিরূপ বহু গর্ত্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিক্ এবং আকাশ, শৈল ও অপরাপর ভূতবৃন্দসহ নিখিলজগৎ যেন প্রলয়সম্ভ্রমবশতঃ ভীত চকিত হইয়া উচ্চ রোদন ধ্বনি করিতে লাগিল। পৃথিবী সেই পতিত বিরাট পুরুষাকৃতি শবের ধারণা জন্য ঘোর বিরাব-বেগ-সংরম্ভে নিখিল দিগন্তর তর্জ্জিত করিলেন। আকাশে ভুজঙ্গারিগণ ঘুঙ্কুম ধ্বনি করিতে লাগিল। গিরি-দরী সকল অত্যন্ত বিদীর্ণ হওয়ায় নির্ঘাত নিস্বন উত্থিত হইল। সে নিস্বনে শ্রোত্র-হৃদয়াদি যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ঔৎপাতিক ভীম-বেগে মেঘাকর্ষী যুগান্তমারুত যেন সংরব্ধ প্রলয়পয়োধর-ধ্বনি করিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ ধ্বনি দিঙ্মুখে গিয়া শত গুণে অভিহত হইল। বিরাট শবদেহপাতে কুলাচলতট ও হিমাচল শৃঙ্গ সকল পাতালে প্রবেশ করিল। সেই সুমেরুশৈলের শিলাকার শব পতনে শৈলশৃঙ্গকুল দলিত, পৃথিবী বিদারিত, জলরাশি ক্ষোভিত, অদ্রি ও ভূপৃষ্ঠ সমীকৃত এবং সর্ব্বভূত পীড়িত হইল। ঐ রৌদ্র ব্যাপার তখন প্রলয়ার্থী রুদ্রগণের ক্রীড়া-সাধন হইয়া উঠিল। তাহাতে ভূতলে ভানু পতিত হইলেন; অদ্রি সকল চূর্ণীকৃত হইল। নভশ্চরগণ দ্বিতীয় ভূপীঠবৎ, অপর ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধবৎ অথবা মূর্ত্তা-

কারে পতিত শূন্যভাগের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। আমার দৃষ্টিতে তাহা একটা মাংসময় অচলপাতের ন্যায় লক্ষিত হইল। এই সপ্তদ্বীপা সুবিশালা পৃথিবী; ইহাতেও তাহার একটী অঙ্গ ধরিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাই আপনার প্রসাদপ্রার্থী হইয়াছি। হে ভগবন্, বিভাবসো! এ কি ব্যাপার! এমন একটা মাংসল দেহ নিপতিত হইতেছে কেন? তৎসহ সূর্য্যই বা কেন আকাশ হইতে নিপতিত হইতেছেন? এই সশৈল-বন-সাগরময় ভূপৃষ্ঠে তো এরূপ একটা বিশাল মাংসল দেহের স্থান সঙ্কুলান হইবে না?

অগ্নি কহিলেন,—বৎস! ব্যস্ত হইও না, ক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা কর। পরে আমি তোমায় বলিতেছি। ভগবান্ বিভাবসু এই বলিয়া বিরত হইলে, নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিবিধ বসন-ভূষণ-মল্যাদি-মণ্ডিত নভশ্চরগণ আগমন করিলেন। তখন সিদ্ধ, সাধ্য, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিন্নর, ঋষি, মুনি, যক্ষ ও অমরবৃন্দ সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরী শরণ্যা কালরাত্রি দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। নভশ্চরেরা কহিলেন,—মহাকল্পান্তকালে সংহারপ্রাপ্ত পদ্মযোনির কপিল জটামণ্ডল যিনি খড়্গাগ্র শৃঙ্গে গ্রহণ করেন, নিহত দৈত্যগণের মস্তকমালা যিনি বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন, সংহার-দশাগ্রস্ত বৈনতেয়ের পক্ষ দিয়া যিনি মস্তকাবতংস রচনা করেন, এই বিশ্বসংসারের যিনি সংহারকর্ত্রী এবং এই সমস্ত সংহার করিয়াও যিনি নির্লিপ্তা বা শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপা, তিনি—সেই দেবী আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

বিপশ্চিৎ কহিলেন,—দেবগণ যখন মহাদেবী কালরাত্রির স্তব করিতেছিলেন তখন আমি দেখিলাম, সেই পূর্ব্বোল্লিখিত পতনোদ্যত বিরাটবপু

পুরুষ সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রচ্ছাদন করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি শবের ন্যায়,—উহাতে জীবসঞ্চার নাই। সেই শবদেহের যে অংশ দ্বারা সপ্তদ্বীপময়ী মহী সমাচ্ছাদিতা রহিয়াছেন, সেই মহামহীধরাকার কুক্ষিনামক অংশ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি বহ্নিদেবের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলাম যে, সেই বিপুল শবদেহের বাহু, ঊরু ও শিরোভাগ লোকালোকাচলের মানবদুর্গম পরপারে পতিত হইয়াছে। সেই ব্যোমনিবাসী সিদ্ধসম্প্রদায় দেবীকে স্তব করিলে, দেবী সেই ব্যোমপ্রদেশেই প্রকট হইয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি শুষ্ক দেখা যাইতেছিল, প্রেতদল তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। মাতৃগণ, কুষ্মাণ্ড, যক্ষ ও বেতালদল তাঁহার সঙ্গে অম্বরপথে অবস্থিত ছিল। শিরাব্যাপ্ত সুদীর্ঘ দোর্দণ্ড প্রসারণে বনীকৃতনভস্থলী সেই দেবী দিগ্দাহকরী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দিবাকর দেবকে যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দেবীর প্রচণ্ড প্রোজ্জ্বল আয়ুধনিচয়ের ঝঞ্ঝনধ্বনি ব্যোমকোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল আয়ুধাঘাতে ব্যোমচারী কত শত পক্ষী শত শত খণ্ড হইতে লাগিল। তদীয় দেহাবয়বে দেহজ্বালা ও নেত্রাগ্নি দীপ্তি পাইতেছিল। তাহাতে তাঁহার দেহপ্রভা সুদীর্ঘ বেণুবনাকারে কোটি যোজনাবধি বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেখা গেল, তাঁহার দন্তেন্দু কান্তিচ্ছটায় দিঙ্মুখমণ্ডল দুগ্ধ-স্নপিতবৎ শুভ্রবর্ণ হইল। তদীয় কৃশ দীর্ঘ বিশাল দেহে অম্বর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যার অভ্রমালার ন্যায় তিনি লব্ধাস্পদা ও প্রেতাসনাসীনা হইয়া পরম পদে প্রকট হইলেন। সেই স্ফুরৎপ্রোজ্জ্বলরূপিণী মহাদেবী যেন গগনাম্বুধির বাড়বানলশ্রী ধারণ করিলেন। তিনি যেন শব, শবাঙ্গ, মুষল, কুন্তল, তোমর, মুদ্গর, আসন ও উদূখলাদি দ্বারা চঞ্চল মালা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতসম্ভবা নদী যেমন ঘর্ঘররবে উপলখণ্ড সকল বহন করে, তেমনি তিনি কটমটরবে দন্তধ্বনি করিয়া গগনাঙ্গনে জনাঙ্গমালা বহন করিতে লাগিলেন।

দেবগণ সেই মহাদেবীকে দেখিয়া কহিলেন,—হে দেবি, অম্বিকে! আপনাকে আমরা এই শবোপহার প্রদান করিতেছি, নিজ পরিবারবর্গসহ আপনি ইহাকে সত্বর ভক্ষণ করুন। দেবগণ এইরূপ নিবেদন করিলে

সর্ব্বজন-প্রাণশক্তিময়ী দেবী প্রাণ-পবনযোগে সেই দেহ হইতে শোণিত-সারাকর্ষণে উদ্যত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন গিরিদরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তেমনি প্রাণপবন-যোগে সমাকৃষ্যমাণ হইয়া শোণিত সকল তৎকালে ভগবতীর বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি আকাশে অবস্থান করিয়াই প্রাণাকৃষ্ট সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আকার শুষ্ক দেখাইতেছিল, এক্ষণে তিনি রক্তপানে তৃপ্তি লাভ করিয়া পীনাবয়ব হইলেন। প্রাবৃট্‌কালীন তড়িৎতরলনয়না রক্তবর্ণা মেঘমালার ন্যায় তিনি শোণিতপরিপীন-দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দেবী ভগবতী লম্বোদরা, বিষমাহি-বিভূষণা, রক্তাসব-মদোন্মত্তা ও নিখিলায়ুধ-ধরা। তিনি আকাশদেশ দেহার্দ্ধে পরিপূরিত করিয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন। লোকালোকাচলের শিখর বিরাজিত অমরবৃন্দ তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘ-সকল মহাচল আবৃত করিয়া রাখে, তেমনি পিশাচকুষ্মাণ্ডাদি মহাগণ-গণ সেই শব আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। কুষ্মাণ্ডগণ ঐ শব-শৈলের কটিভাগ গ্রহণ করিল। উদররূপিকা ও যক্ষবৃন্দ তদীয় পার্শ্বদেশ ধারণ করিল। তাঁহার কটি-পৃষ্ঠ গ্রহণের পর অবশিষ্ট উরু-কন্ধরাদি অবয়বসকল ব্রহ্মাণ্ডখর্পরের পরপারে গিয়া পতিত হইল। এইজন্য ভূতবৃন্দ সেই দূর দিগন্তরাবস্থিত অবয়বাংশ প্রাপ্ত হইল না। ঐ সকল কালবশে আপনা হইতেই কলিত হইয়া গেল। চণ্ডিকা যখন আকাশে নৃত্যারম্ভ করিলেন, ভূতবৃন্দ শব নিমিত্ত যখন ব্যাকুল হইল, দেবগণ যখন ভূধরপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পিণ্ডীভূত ভক্ষ্য-নেয়-আম-দুর্গন্ধি বসা-মাংসাদি দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইল। মাংসচর্ব্বণের সংরম্ভবশে তৎকালে শবশবাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শিরা ও অস্থিপুঞ্জের বিদারণ হেতু আকাশে তখন বৃহৎ কটকটারব প্রাদুর্ভূত হইল। ভূত-সঙ্ঘের পরস্পর বিষম বিশ্লেষণে ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। তখন বিন্ধ্যশৈলপ্রমাণ অস্থিপুঞ্জ দ্বারা ভুবনতল আচ্ছন্ন হইল। দেবীর মুখাগ্নিজ্বালায় মাংসরাশি পক্ক হইতে লাগিল। শোণিত-শীকরবর্ষণে দিঙ্‌মণ্ডল সিন্দূরাভা ধারণ করিল। দেবগণ সর্ব্বদিকে দর্শকরূপে দণ্ডায়-

মান হওয়ায় দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সপ্ত দ্বীপমণ্ডিতা বসুন্ধরা রুধিরৌঘপ্লাবনে একার্ণবীভূতা হইল। নিখিল অচলমণ্ডল শিখর-সমভিব্যাহারে একান্ত অন্তর্দ্ধান করিল; মনে হইল, দিগঙ্গনাগণ যেন রক্তপ্রভ অভ্রসম্ভাররূপ বসনাচ্ছাদনে আচ্ছাদিতা হইল। নভস্থল তখন দেবী ও তদীয় গণসমূহের লোল ভুজসমূহ-ভ্রান্ত আয়ুধনিকরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পুরনিকর ও পত্তনমণ্ডল তখন স্মৃতিপথে মাত্র সমারূঢ় রহিল। চরাচরাত্মক নিখিল জগৎ নিতান্ত অসম্ভবরূপে অন্বিত হইয়া কুষ্মাণ্ডাদি অনন্ত গণের অনন্ত সমাজরূপে পর্য্যবসিত হইল। যে সকল ভূতদল আকাশে নৃত্যারম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের অস্ত্রনিচয়ে সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইল। পিশাচদলের ঔদ্ধত্যে জগৎ যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। লোকালোকশৈলের শিখরস্থ সুরগণ জগৎকে রক্তার্ণবীকৃত দেখিয়া খিন্ন হইলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যে শবদেহের অতিদীর্ঘ হস্তপদাদি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগেও প্রসর্পিত হইয়াছিল, তথাবিধ মহাশব দ্বারা লোকালোকাচল আবৃত হয় নাই কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই মহাশবের উপর্য্যুপলক্ষিত মধ্য শরীর সপ্ত দ্বীপের অন্তরালেই অবস্থিত ছিল। শির ও খুরোপলক্ষিত উভয় পদ ও ভুজাদি অঙ্গসকল বহির্ভাগে বিরাজ করিতেছিল। এইরূপ ভাস-ভাষিত বিবরণ সত্য, সন্দেহ নাই। সেই মহাশবের পাদযুগল, উরু, মধ্য, কটি, পার্শ্বযুগ, শির ও অংশযুগে লোকালোকশৈলের শিখরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল না; কাজেই লোকালোকাচল ঊর্দ্ধে অবলোকিত হইয়াছিল। তৎকালে দেখা গিয়াছিল, লোকালোকশৈলের শিখরোপরি সুরগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। মাতৃগণ যখন নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন ভূতবৃন্দ অধোমুখে পতিত মহাশব ভক্ষণ করিতে লাগিল। অজস্র অসৃকপ্রবাহ ছুটিয়া চলিল। সর্ব্বত্র মেদোগন্ধ প্রসারিত হইল। তৎকালে দেবগণ দুঃখিত হইয়া সকলেই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হায় কি কষ্ট! কোথায় গেল পৃথ্বী! কোথায় গেল জলরাশি! কোথায় সেই ভূতবৃন্দ! কোথায় গেল ভূধরনিকর! কোথায় গেল সেই মন্দর!—যাহা সেই

চন্দন-কদম্ব-মন্দার-মণ্ডিত পুষ্পমণ্ডপবৎ প্রতিভাত হইত। দেখিতেছি, উচ্চ উচ্চ সুবর্ণ ভূমি সকল যেন শুক্লতার উপর কোপ করিয়াই রুধির-প্রবাহে পঙ্ক-পরিব্যাপ্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চাচলে এক মহান্ কল্পপাদপ ছিল; তাহার শাখাপ্রভা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হইত।. দেখিতেছি, সে পাদপও নাই; চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হে ক্ষীরার্ণব! তুমি পারিজাত-পদ্ম, চন্দ্র ও পীযূষের আধার। হে নবনীত-ভরিত-বেলাবন, দধিসাগর! হে যোগেশ্বরীসেবিত মধুসমুদ্র! কোথায় তোমরা? যাহারা সুরসুন্দরী ও দিগঙ্গনাগণের দর্পণের কার্য্য করিত, সেই স্ফটিকাদি রত্নশিলা সকল কোথায় এখন? হে ক্রৌঞ্চাচল! তোমার নানাদিকের বনরাজি বিরিঞ্চিবাহন হংস ও নলিনীজালে নিবিড়িত ছিল। তুমি কল্পদ্রুম ও কাঞ্চনলতায় নিহিত ছিলে। আর হে পুষ্করদ্বীপ! তোমার কদম্বকাননে বিদ্যাধরীগণ বিশ্রাম লইত; কত ক্রীড়াকোবিদ বিদ্যাধর-নাগর তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিত; তুমি সেই সেই নাগর-নাগরীর গৃহস্বরূপ ছিলে; এক্ষণে তোমরা সকলে কোথায় গিয়াছ! গোমেধ দ্বীপ, তত্রত্য কল্পতরু কানন, কনকলতা, শুভ্রাভ ক্রৌঞ্চাদ্রি, তদীয় সুন্দরদরীগৃহ সকল, ইত্যাদি পুণ্য পদার্থ-সমূহের স্মরণমাত্রে মানব-গণের স্বর্গ-সুখজনক পুণ্য-পুঞ্জের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মন্দানিলা বলিত বালবল্লী ও পল্লবদলে যাহারা যুক্ত ছিল, সেই সকল সন্তানকদ্রুমে সমস্ত দিগন্ত একদা ভাসিত হইত, কিন্তু হায়! এক্ষণে সকলই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! কি কষ্ট! অস্মদ্বিধ জনগণ এক্ষণে কিরূপে চিত্ত নির্ব্বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে? ইক্ষুসাগরের তীরগত শিলীভূত শর্করাময় ভূভাগে জানি না, কবে কোন্ সময়ে আবার মাধুর্য্যময় গুড়মোদক সকল দেখিতে পাইব? কবেই বা ক্রীড়ানিমিত্তক শর্করাপত্রিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে? কবে আমরা তালীতমালীবন-মণ্ডিত পর্ব্বতের কদম্ব-কল্পদ্রুম-শীতল কাঞ্চনাগারে উপবেশন করিয়া চন্দনচর্চ্চিত অপ্সরাদিগের নৃত্যব্যাপার নিরীক্ষণ করিব! জম্বুপাদপের যে সকল ফল আকারে গজসদৃশ, সুধা-রসের আস্বাদ ও জাম্বুনদ সুবর্ণের হেতুভূত, সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ জম্বুফল অধুনা স্মরণমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কি কহিব কষ্টের কথা!

যে সকল ফলের রসাম্বুধারায় জম্বূদ্বীপে নদী বহাইত, সেই সমস্ত ফল এবং সুরাসাগরতীরের শিলীন্ধ্র-নীরন্ধ্রীকৃত মহীধ্র-কন্দরস্থ মধুমদমত্ত সুরসুন্দরীগণের নৃত্যগীত স্মরণপূর্ব্বক প্রভাতের পদ্মের ন্যায় অথবা ইদানীন্তন পৃথ্বীর ন্যায় মদীয় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আহা, ঐ দেখ, সম্প্রতি সে মহী আর নাই; সাগরবারি যাহার বলয় ছিল, দ্বীপ, নদী, বন, জঙ্গল, গ্রাম, নগর, ব্রাহ্মণপল্লী, তরুপল্লবাঙ্কুরাদি যাহার ভূষণবৎ প্রতিভাত হইত, সে মহী কোথায় গেল, কি জানি!

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। ১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মত্ত মহাভূতগণ সেই মহাশবের অবয়ব ভক্ষণ করিতেছিল; যখন কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তখন লোকালোকস্থ ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—ঐ আকাশে—বিদ্যাধর-সুর-নিকরের সঞ্চারস্থানে ভূতগণ মেদোময় অভ্রজাল নিক্ষিপ্ত করিতেছে! কেবল কি আকাশে?—এই সপ্ত দ্বীপেই ভূতবৃন্দকর্তৃক মেদোজাল বিসারিত হইতেছে। মহাশবের মাংসরাশি ভক্ষিত হইয়াছে; রুধির সকল পীত হইয়াছে। এক্ষণে এই পৃথিবী কথঞ্চিৎ নেত্রগোচরীভূত হইবার যোগ্য হইয়াছে। পৃথ্বী সর্ব্বজীবেরই প্রমোদজননী ছিল, "এক্ষণে মেদোরূপ পটদ্বারা ইহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়! ঐ সকল বনস্থলীও মেদোময় শারদ নীরধরে সমাবৃত হওয়ায় যেন উহা ধূসর-কম্বলে সম্বীত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ মহাশবের অস্থিপুঞ্জ পড়িয়া এক একটা মহীধ্র হইয়াছে। উহা হিমাদ্রিশিখরবৎ দিকৃতটভূমি আচ্ছন্ন করিয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দেবগণ যখন এইরূপ আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, তৎকালে ভূতবৃন্দ পীতাবশিষ্ট মেদোজালে মেদিনীকে

মেদোলিপ্ত করত মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভূতবৃন্দ যখন নৃত্যাসক্ত হইল, তখন তাহাদের পীতাবশিষ্ট শোণিত—সঙ্কল্প-সম্ভূত একটী প্রবাহ দিয়া দেবগণ সাগরের দিকে লইয়া গেলেন। দেবগণ সঙ্কল্প সহকারে সেই সমুদ্রকেই সুধার্ণবে পরিণামিত করিলেন। আজও পর্য্যন্ত ঐ সাগর সুরার্ণব হইয়া বিরাজ করিতেছে। ভূতগণ আকাশে নৃত্য করিতে করিতে তথাকার সুরা পানপূর্ব্বক আকাশাঙ্গনে সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাৎকালিক সেই ভূতবৃন্দের ন্যায় বর্ত্তমান ভূতগণও যোগেশ্বরীগণ সমভিব্যাহারে অদ্যাপি মদিরাব্ধি হইতে মদিরা পান করিয়া থাকে। সেই ভূতগণ যে মেদোজাল ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তাহা কালে শুষ্ক হওয়ায় মহী মেদিনী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ প্রকারে ক্রমে সেই মহাশব-দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। সূর্য্য স্বীয় পদে স্থাপিত হইলেন। মেরুপ্রমুখ মহীধরগণও উদ্ধৃত হইল। ক্রমশঃ দিনযামিনী বিকাশ পাইল। অনন্তর প্রজাপতির অভিনব প্রজাসৃষ্টি হইতে লাগিল। ভূতলের ভূত-ভৌতিক-সৃষ্টি পূর্ব্ববৎ বিস্তার পাইল।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম সর্গ সমাপ্ত। ১৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

—:*:—

ভাস কহিলেন,—হে ধরাধিপতে, দশরথ! দহন-বাহন শুকের পক্ষকোণে অবস্থানপূর্ব্বক আমি পাবকদেবকে জিজ্ঞাসিলাম,—ভগবন্, স্বাহাপতে হুতাশন! ঐ যে একটা মহাশব নেত্রগোচর করিলাম, ইতি পূর্ব্বে উহা কি ছিল? কিসের জন্য উহা ঐরূপ শবাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

অগ্নি কহিলেন,—হে নরাধিপ! সেই ত্রৈলোক-ভাস্বর অনন্ত অক্ষত মহাশব-বৃত্তান্ত তোমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। পরম ব্যোম—অনন্ত অদ্বিতীয় নিরাকার। উহা চিন্ময়স্বরূপ; অসংখ্য জগৎপরমাণু ঐ চিন্ময়াকাশে অধ্যস্ত। একদা ঐ সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ

চিন্মাত্রাকাশে কোন কারণে স্বয়ং সম্বেদময়ী সম্বিদের আবির্ভাব হইল কোন পথিকের বিষয় চিন্তা করিয়া সুপ্ত হইলে তুমি নিজেই যেমন নিজের পান্থভাব অবলোকন করিয়া থাক, তেমনি তিনি আপন সঙ্কল্পগুণে স্ববিষয়ক তৈজস পরমাণুত্ব অনুভব করিলেন। চিত্তের অজ্ঞানাবরণ-দশায় সেই পরমাণু পদ্মরজঃপ্রতিম সঙ্কল্পাত্মক অণুত্ব অনুভব করিলেন। ঐ ভাসমান অণুত্ব নিজ উচ্ছূনতা ভাবনা করিতে করিতে আপন চক্ষুরাদীন্দ্রিয় অনুভবগোচর করিলেন। অতঃপর তাঁহার অনুভূত হইল, উহা যেন স্বতই শরীরে লগ্ন হইয়া গেল। স্বাপ্ন নগরের ন্যায় ঐ চক্ষুরাদিও স্বভাবের প্রেরণায় প্রথমে শব্দস্পর্শাদি গুণাধারধেয়বৎ ভূতময় জগৎ দর্শন করিল। জাতিবিশেষবিশিষ্ট অসুরাখ্য কোন প্রাণী বেদনাদি বিষয়াস্ত অধ্যারোপরূপ কার্য্য-কারণসমষ্টি মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ঐ প্রাণী স্বভাবের বশে অত্যন্ত অভিমানী হইয়াছিল। উহারও বিদূরথ-পিত্রাদিবৎ অসত্য প্রতিভাসাত্মক পিতাপিতামহ বর্ত্তমান ছিল। ঐ অসুর একদা দর্পযুক্ত হইয়া কোন মহামান্য মুনির সুখাস্পদ আশ্রম বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তখন সেই মুনি এই বলিয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে, তুই মহাকায় হইয়া আমার আশ্রম ভগ্ন করিয়াছিস্; অতএব এই কলেবর পরিহার করিয়া তুই অত্যন্ত ক্ষুদ্র মশকাকারে পরিণত হ'। মুনিবর যেমন অভিশাপ দিলেন, অমনি সেই অসুর শাপানলে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মনে হইল, বাড়বানল যেন সমুদ্রজল শোষণ করিল। তখন আসুরিক চেতন নিরাধার নিরাকার আকাশোপম হইল। চিত্ত সুপ্ত মূর্চ্ছিতবৎ হইয়া গেল। তৎপশ্চাৎ সেই অব্যাকৃত চেতন ভূতাকাশে মিশিল। ভূতাকাশ বায়ুর সহিত একীভূত হইল। দেহভ্রান্তির ভাবী কালে যাহার প্রাণী নাম নির্ব্বাচিত হইবে, সেই চেতনবিশিষ্ট আত্মা তখন অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। স্বভাববশে আকাশে যেমন বায়বাণু স্পন্দিত হয়, তেমনি পঞ্চিতন্মাত্র-পরিব্যাপ্ত চিন্মাত্রাণু স্বভাবের বশেই স্পন্দনাপন্ন হইল। বর্ষায় বায়ু ও বর্ষণজলাদির সাহায্যে ভূমিস্থিত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তেমনি সেই বায়ুগত চেতন স্থূলভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। অসুরসম্বন্ধীয় চিদাভাস সেই শুদ্ধ

মুনির শাপবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাণাশুস্থ স্বীয় মশকত্ব জ্ঞান-যুক্ত ছিল। তাই উহা সেই সংস্কারবশতঃ মশকাবয়ব পক্ষপাদাদি-সম্পন্ন হইয়া নিজেই মশক হইয়া উঠিল। ঐ মশকের পতন ও উৎপতন নিশ্বাস মাত্রেই ঘটিয়াছিল। এ হেন স্বল্পকায় সেই স্বেদজ মশকের জীবিতকাল দুই দিবস মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জগতে যত কিছু প্রাণী আছে, সকলেরই কি যোন্যন্তরোৎপত্তি? না—অন্যবিধ উৎপত্তিও রহিয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীরই উৎপত্তি দুই প্রকার—ভ্রান্তিজা ও ব্রহ্মময়ী। প্রাণিদিগের উৎপত্তিই ভ্রান্তিজা; আর নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের কখনই জগদ্‌ভ্রান্তি নাই, তিনি সর্গাদিকালে আপনা হইতেই জীবভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; এই জন্য তাঁহার উৎপত্তিই ব্রহ্মময়ী। ঐ উৎপত্তি যোনিজা নহে। আজন্মসিদ্ধ কপিলাদি ঋষিগণই এই ব্রহ্মময়ী উৎপত্তি অনুভব করিয়া থাকেন। অজ্ঞান মশকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। কাজেই জগদ্‌ভ্রান্তিবশেই মশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; ব্রহ্মময়ী উৎপত্তি তাহার ঘটে নাই। এক্ষণে ঐ মশকের চেষ্টাক্রম শ্রবণ কর। মশকদল ভূতলে ইক্ষুগুল্মে, বালতৃণে ও কাসমুঞ্জে অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া থাকে। মুনির শাপে যে মশকের উৎপত্তি হইল, সেই মশকও তন্মধ্যে অব্যক্ত ধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়ানুরাগে তদীয় পরমায়ুর অর্দ্ধকাল এক দিবস কাটাইয়া দিল। পর দিন মশক তাহার ভার্য্যার সহিত স্বাদ্বলোদর-দোলায় বাললীলাবশে দোল খাইতে লাগিল। মশক দোলন-ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া যেমন বিশ্রাম করিতে লাগিল, অমনি কোথা হইতে এক হরিণ আসিল; তাহার পাদ-পাতন-চাপে মশকের প্রাণ বিনষ্ট হইল। মশক মরণকালে হরিণাকার ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাই মশকদেহের অবসানে তাহাকে হরিণ হইয়া জন্মিতে হইল। অনন্তর হরিণ বনে বনে বিহার করিতে লাগিল। এক ব্যাধ অকস্মাৎ তাহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিল। ব্যাধের বদনে আবদ্ধদৃষ্টি হইয়া হরিণ দেহ ত্যাগ করিল; তাই জন্মান্তরে তাহাকে এক ব্যাধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। পরে ব্যাধ বনে বনে বিচরণ

করিতে লাগিল; এক দিন অকস্মাৎ এক মুনির আশ্রমকাননে উপস্থিত হইয়া ব্যাধ সেইখানে বিশ্রাম করিল এবং সৎসঙ্গ-লাভে প্রবোধ প্রাপ্ত হইল। মুনি তাহাকে প্রবোধ দিতে গিয়া বলিলেন,—ওহে ভ্রান্ত ব্যাধ! এ কি করিতেছ? দীর্ঘকাল দুঃখভোগের জন্যই কি ধনুদ্বারা এরূপে মৃগসমূহকে বধ করিতেছ? এ জগৎ ক্ষণভঙ্গুর; এখানে অহিংসা ও অভয়দানাদি মহাফলজনক হইলেও ঐ সকল শাস্ত্রমর্য্যাদা কেন তুমি রক্ষা করিতেছ না? মৃগবধ ব্যাধকুলাচারাগত জীবিকা; তাহা পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জীবন রক্ষা হয় এবং কিরূপেই বা ভোগসিদ্ধি সংঘটিত হইতে পারে? কিন্তু জানিও—আয়ু বায়ু-বিঘট্টিত অভ্রপটলের চঞ্চল জলবিন্দুবৎ ক্ষণবিনশ্বর; মেঘ সকল বারিদ-বিতান-মধ্যবিলসৎ বিদ্যুতের ন্যায় বিচঞ্চল। ভোগ্য যৌবনবিলাস জলবেগবৎ একান্ত অস্থির। এই ভোগায়তন দেহের প্রতিক্ষণেই অপায় সম্ভাবনা। বৎস! এইজন্যই বলি, এ সংসারের পারলৌকিক ভাবী অনর্থপরম্পরার বিষয় আলোচনা করিয়া ত্রস্ত হও এবং অভয়দান ও অহিংসাদি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক আত্যন্তিক অনর্থনিবৃত্তিলক্ষণ নিত্য নিরতিশয়ানন্দরূপ নির্ব্বাণ ব্রহ্মের অন্বেষণ করিতে থাক।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—মুনিবর! হিংসাদি কার্য্য যদি দুঃখের কারণ হয়, তবে এমন কি ব্যবহার হইতে পারে, যাহা দুঃখক্ষয়ের প্রতি অকর্কশ ও অমৃদু ব্যবহার?

মুনি বলিলেন,—ব্যাধ! তুমি এখনই সশর শরাসন ত্যাগ কর; মৌনী হও, যমনিয়মাদির আশ্রয় লইয়া এই আশ্রমে অবস্থান কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই ব্যাধ মুনির নিকট প্রবোধ পাইল; সশর শরাসন পরিত্যাগ করিল; অপিচ মুনিজনোচিত অযাচিতাশন হইয়া

সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। এই ভাবে ব্যাধের কিয়দ্দিন অতীত হইল। ক্রমে সৎসঙ্গ গুণে তদীয় হৃদয়ে শাস্ত্রসিদ্ধ সারাসার-বিবেক প্রবেশ করিল। বোধ হইল, পুষ্পমুকুলের বিকাশাদি-ক্রমোদ্ভব-জনিত আমোদ যেন নরহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। হে অরিন্দম! একদা ঐ ব্যাধ সেই মুনিবরের নিকট জিজ্ঞাসিল,—ভগবন্! প্রাণিগণের অন্তরের স্বপ্ন বাহিরে কেন জাগ্রতের ন্যায় প্রকাশ পায়? বাহিরের প্রপঞ্চ স্বপ্ন হইলে অন্তরে কি হেতু দৃষ্ট হয়? কি উপায়েই বা প্রাণীদিগের আন্তর স্বপ্ন অবলোকিত হয়! বাহ্য আন্তর স্বপ্নপ্রপঞ্চ কি রূপে পরিদৃষ্ট হয়! আর প্রপঞ্চই যদি স্বপ্ন, তবে অন্তর্বহির্ভেদ বশতঃ দ্বিবিধ দৃষ্ট হয় কেন?

মুনি বলিলেন,—হে সাধুশীল! অকস্মাৎ অম্বরে অভ্রোদয়ের ন্যায় মদীয় চিত্তের প্রথম অবস্থায় এইরূপই তর্ক উপস্থিত হয়। তখন হইতে আমি বদ্ধপদ্মাসনে বহিঃকুম্ভক ধারণ-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বাত্মভাবে সুপ্রসিদ্ধ সম্বিৎ-স্বরূপে স্থির হইয়াছি। সায়ং সময়ে দিবসকর যেমন আপন মণ্ডলশ্রী দ্বারা আতপ প্রত্যাহৃত করিয়া লয়েন, আমিও তেমনি তখন সম্বিৎস্বরূপে স্থির হইয়া সম্বিৎ দ্বারা দূর-ক্ষিপ্ত চিত্তকে স্বীয় হৃদয়ে প্রত্যাহৃত করিয়া লইলাম। কুসুম হইতে বাহিরে সৌরভ-নিঃসারের ন্যায় জীবোপাধি চিত্তান্বিত প্রাণকে প্রাণের সহিত জীবের বহির্গমনানুকূল যোগশাস্ত্রসিদ্ধ প্রযত্ন দ্বারা বহির্দ্দেশে নিঃসারিত করিলাম। অনন্তর বাহ্য ব্যোমগত জীবোপাধি চিত্তযুত প্রাণ-পবনকে আমি আমার পুরোভাগস্থ প্রাণীর প্রাণসহ সম্মিলিত করাইলাম। ঋক্ষ যেমন গর্ত্তমধ্যে মুখ প্রবেশ করাইয়া স্বীয় আহারভূত সর্পকে আকর্ষণ করে, তেমনি আমিও যে প্রাণী হইয়াছিলাম, তাহার প্রাণাবলম্বনে তদীয় হৃদয়ে উপনীত হইলাম। পরে তদীয় প্রাণরূপ অশ্বারোহণ করিয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণদ্বয়ের অনুসরণে স্বীয় বুদ্ধিবশে সঙ্কটে পতিত হইলাম। বহু কুল্যাপরিবৃত বাহ্য দেশের ন্যায় সেই সঙ্কট স্থানও সমন্ততঃ সঞ্চরমাণ রসময় বহু নাড়ী-নিচিত; পার্শ্বাস্থি-পঞ্জরে, প্লীহা, যকৃৎ ও রক্তাদি পিণ্ডে জীবগৃহ-স্বরূপ দেহ সঙ্কট-ব্যাপ্ত। নিদাঘ-তপ্ত ঊর্ম্মিজাল-ব্যাপ্ত অর্ণবের ন্যায় সেই স্থান জঠরাগ্নি-জনিত শলশলা ধ্বনিসহ উষ্ণাবয়ব-সমাকীর্ণ। তথায় প্রতিনিয়ত চিত্ত সমভিব্যাহারী

প্রাণ বায়ু দ্বারা নাসা প্রদেশ হইতে জীবন নিমিত্ত বহিঃশৈত্যময় চেতনাত্মক বায়ু উন্নীত হয়। রক্ত, অম্ল, রস, শ্লেষ্ম ও রসাস্রাব হেতু যে স্থান সতত পিচ্ছিল; উহা ঘনান্ধকার-ময় ও উষ্ণতাময়। কাজেই ঐ স্থান নরকের ন্যায় সঙ্কট পরিব্যাপ্ত। উহার দ্বাসপ্ততি সহস্র নাড়ীনিচয়ের মধ্যে কোথাও উদর এবং কোথাও বা অবয়বাশ্লেষবশে স্পষ্টাস্পষ্টরূপ প্রাণাদি পবনগণ ক্রীড়াপরায়ণ। উহাতে সপ্ত ধাতুর সাম্য ও বৈষম্য বশতঃ আগামী রোগাদি সূচিত, কোথাও অপানাদি ছিদ্রপথে বাতনির্গম-জন্য শব্দ প্রকটিত এবং কোথাও হৃদয়পদ্মনালের অভ্যন্তরে জঠরানল প্রজ্বলিত। উহাতে বাসনাপরিবৃত ইন্দ্রিয়-বদ্ধ জীব সাক্ষী আত্মস্বরূপে নির্ম্মল এবং চিত্তবৃত্তি ভেদে বা প্রদেশভেদে কোথাও সৌম্য এবং কোথাও ক্ষুব্ধতাময়। বহু নরাবয়ব-সম্বাধ নিরবকাশ নরবৃন্দমধ্যে শ্রেষ্ঠ নর যেমন প্রবেশ করে, তেমনি বিশ্রামান্তে আমি সেই জন্তুর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। যেমন সৌরালোক রাত্রিকালে চন্দ্রকরাভ্যন্তরে গমন করে, তেমনি আমিও বিশ্রামের পর সেই জন্তুর হৃদয়মধ্যস্থ তেজোধাতু প্রাপ্ত হইলাম। যাহা ত্রিভুবনের অন্তরভান হেতু ত্রৈলোক্য-বিষয়ে দীপবৎ প্রকাশক এবং যাহা নিখিল পদার্থের সত্তাস্বরূপ, সেই পরমাত্ম জীব উহাতেই বাস করিয়া থাকেন। সর্ব্বগতাত্মা জীব যদিও দেহমধ্যে আনখাগ্র প্রবিষ্ট আছেন, তথাচ ওজোধাতুতেই বিশেষরূপে তিনি কৃতাধিষ্ঠান। আমি সেই জীবাধার ওজোধাতুর অভ্যন্তরে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ স্থান করণাভিমানী দেবগণ দ্বারা সর্ব্বতঃ সুরক্ষিত। যাহা সাক্ষাৎ জীবোপাধিভূত মনোময় বিজ্ঞানময় কোষসম্বলিত আনন্দময় কোষ, আমি অনন্তর তাহাতেই প্রবিষ্ট হইলাম। সুগন্ধ যেমন বায়ুব্যাপ্ত হয়, সৌরকিরণ যেমন চন্দ্রমণ্ডলে লব্ধপ্রবেশ হয় এবং জল যেমন মৃৎপাত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি আমিও সেই ক্ষীরবুদ্বুদোপম সুন্দর স্থানে বিশ্রামলাভের পর নিজ ওজোধাতুর অভ্যন্তরে কৃতবসতির ন্যায় সুস্থভাবে স্বীয় স্বপ্নবৎ তদীয় স্বপ্নরূপ অখণ্ড বিশ্ব অবলোকন করিলাম। দেখিলাম—সূর্য্য, শৈল, সাগর, সুর, অসুর, নর, পত্তন, আভোগ, লোকান্তর, দ্বীপ, কাল, করণ, গ্রাম, কল্প, ক্ষণ, সমস্ত ঋতু, এমন কি

চরাচরাত্মক সমস্ত বিশ্বরূপ স্বপ্নই অনাদি প্রবাহগত প্রসিদ্ধ জগতের ন্যায়ই বিদ্যমান। আমি জাগ্রদ্দশাতেই তথায় বাস করিলাম; কারণ জাগ্রদ্ভঙ্গে আমার আর নিদ্রাসমাগম হইল না। আমি চিন্তা করিলাম, তবে কি বিনিদ্র দশাতেই এ স্বপ্ন আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে! এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়াই বুঝিলাম, এ সকলই সেই চিদাত্মার ঐশ্বরিক রূপ; তিনি আকাশাত্মক আত্মাকে ঘটপটাদি যাদৃশ নাম রূপে ব্যপদিষ্ট করেন, উহা আপনা হইতে সেই সেই নাম-রূপে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে যে স্থানে চিদ্ধাতুর অবস্থিতি, সেই সেই স্থানেই তিনি জগদাকারে স্বশরীর সন্দর্শন করেন। আহা! এই পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব এত দিনে অদ্য এরূপে বুঝিতে পারিলাম। লোকে ইহারই নাম স্বপ্ন। ইহা চিদ্বিবর্ত্ত মাত্র বৈ তো আর কিছুই নয়। কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, উভয়ই চিদ্বিবর্ত্ত মাত্র। ফলে স্বপ্ন এবং জাগ্রতের দ্বৈবিধ্য কিছুই নাই। পুরুষ চিন্মাত্র; তাই মরণ নামে একটা কোন পদার্থ নাই। হে মহামতে! বহু শত শরীর মৃত্যুগ্রস্ত হইলেও কোন কালেই কোন পুরুষের কিছুতে মৃত্যু সম্ভাবনা নাই। তিনি চেতন; আকাশাকারে তাঁহার অবস্থান। তিনি দেহাকারে বিবর্ত্তমান হইয়া থাকেন। অনন্ত অবিভাগস্বভাব মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাকারে তিনি কল্পিত হন মাত্র। যাহা স্বভাবতঃ অমূর্ত্ত, নিত্য অনন্ত প্রকাশস্বরূপ এবং যাহা চিৎসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহার সারই জগৎ। ফলে ভ্রমক্রমেই জগৎরূপের কল্পনা। চিদাকাশের অভ্যন্তরে জগদ্ভ্রমানুভবরূপ অণু প্রকাশমান হয়। এই প্রকাশ অবয়বীতে বিচিত্র অবয়বাণু-প্রকাশেরই অনুরূপ। জীব যখন বাহ্য ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাধার হৃদয়ে অবস্থান করে, তখন বাহ্য সংস্কারানুরোধী যে স্বকীয় রূপ, তাহাই স্বপ্নসর্গ হয়। ইহারই নাম চিদ্বিবর্ত্ত বলিয়া বিজ্ঞেয়। পক্ষান্তরে চিত্ত যখন বাহ্যোন্মুখ হইয়া উঠে, তখনকার স্বীয় রূপই জাগ্রৎ-শব্দে শব্দিত হয়। আবার চিত্ত যে কালে অন্তঃস্থিত হইয়া রহে, তখন ঐ জীবই স্বীয় রূপকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। অন্তরে ও বাহিরে স্বর্গ, পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, নদী ও দিঙনিচয় রূপ একাত্মক জীবই প্রস্থত হইয়া থাকেন। তেজোরাশি সূর্য্য যেমন স্ব-বিম্বগত হইয়া দীপ্তিচ্ছটায় একত্র অবস্থিত হন,

তেমনি জগদাত্মক জীবও অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। অন্তরের স্বপ্ন ও বাহিরের জাগ্রৎ এতদুভয়ই চিদাত্মক আমি; ইত্যাকার জ্ঞান যখন যথাযথ আবির্ভূত হয়, আর যখন ভূমিকাভেদের পরিণামক্রমে বাসনা-রাশি ধ্বংস হইয়া যায়, তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। অচ্ছেদ্য অদাহ্য জীব দ্বৈত সঙ্কল্পবশেই অন্যথা বিবেচনায় শিশুজনবৎ মুগ্ধ হয়। স্বাত্মার অন্ত-র্জগদ্রূপে যে দর্শন, তাহার নাম স্বপ্ন আর বহির্জ্জগদ্‌রূপে যে দর্শন, তাহাই জাগ্রৎ। সুতরাং স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ উভয়ই আত্মার স্বরূপ। জাগ্রৎস্বপ্নের এইরূপ তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে সুষুপ্তির স্বরূপ অবগত হইতে আমার মতি হইল। আমি সেই অনুসারে সুষুপ্তির অংশানুসন্ধানে উদ্যত হইলাম। এই যে সকল দৃশ্য দৃষ্টি, ইহাতে আমার কি ফল আছে! আমি চির দিন নিশ্চিন্ত ও তূষ্ণীম্ভাবেই রহিব। এই প্রকার সমরূপিণী সম্বিৎই সুষুপ্তি; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। দেহে যেমন নখকেশাদি বিদিত-অবিদিত উভয়রূপেই অবস্থিত, তেমনি সুষুপ্তিও চেতনাত্মায় অজড় অথচ জড় এই ভাবেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। আমি জাগ্রৎ স্বপ্ন ভ্রমণে শ্রমাতুর; বিশেষ সম্বেদন দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? আমি কিয়ৎ কাল শান্তভাবেই অবস্থান করিব। এই প্রকার সঙ্কল্প বশতঃ যে প্রগাঢ় নিদ্রাকার অনবচ্ছিন্ন পরিণতি, তাহারই নাম সুষুপ্তি; যিনি জাগ্রৎ পুরুষ, তাঁহাতেই নিশ্চিন্তাবস্থায় এবম্বিধ নিদ্রানিবিড়াত্মক সুষুপ্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থিতির ঘনতাপ্রাপ্তি-দশায় উহার নিদ্রা নাম নির্ব্বাচন করা হয়। ঈষদ্ বিক্ষেপরূপে যদি কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটে, তবেই তাহা স্বপ্নাখ্যায় অভিহিত হয়। এইরূপে আমি সুষুপ্তি নিশ্চয় করিলাম। অনন্তর বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় তুরীয় পদার্থের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। যেমন তম হইতে প্রকাশ প্রাপ্তি সম্ভবে না, তেমনি সমীচীন শুদ্ধ বোধ ব্যতীত তুরীয় বস্তুর পূর্ণরূপ প্রাপ্তি হয় না। যাহা সম্যক্ বোধ, তাহাই তুরীয় লাভের একমাত্র উপায়। যখন সম্যক্ বোধ উপস্থিত হয়, তখন এই দৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না। বিশ্ব তখন স্বরূপে অবস্থান করে। অতএব আত্যন্তিক বিলয় ঘটে না। স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি, এতত্ত্রয় জগৎসহ তুরীয়েতেই বিদ্যমান। পরন্তু ঐ

সকল পরিদৃশ্যমানাকারে অবিদ্যমান। যিনি সৎ, অজ, ব্রহ্ম, তিনিই এই পরিদৃশ্যমান জগদাকারে কল্পিত আছেন। এই প্রকার যে নিত্য বোধ, তাহারই নাম তুর্য্যতা। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জন্ম বা তৎকারণ-পরম্পরার সম্ভাবনা নাই। সর্গাত্মক দ্বৈতও কিছুই নাই। কিন্তু জল যেমন আপনিই দ্রবতাকে গ্রহণ করে, তেমনি জগদাকার চেতনার কর্ত্তৃত্বে চিতেই সৃষ্টি-সম্বিত্তি স্বয়ং গৃহীত হয়।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩৭॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—এই ভাবে জাগ্রদাদি তুর্য্য পর্য্যন্ত অবস্থাতত্ত্ব বিচার করিয়া আমি সেই প্রাণীর চিদাভাসরূপ জীবসহ একীভাব লাভে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন পুষ্পিত সহকারসম্বন্ধীয় সৌরভ বায়ুর সাহায্যে পদ্মাকরে নীত হইয়া পদ্মজাত বায়ুগত সৌরভ সহ মিলিত হয়, আমার সেই প্রবৃত্তিও তখন সেইরূপ হইয়াছিল। আমি চিদাভাসে প্রবেশোদ্যত হইয়া যেমন ওজোধাতু পরিহার করিলাম, অমনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্বিৎ বহির্ম্মুখ ব্যাপারে সবলে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর অন্তঃপ্রবণ প্রযত্ন সম্বিত্তি দ্বারা সেই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সম্বিত্তি-সমূহকে সবলে নিগৃহীত করিয়া সলিলে তৈল-বিন্দুপ্রসরণের ন্যায় অন্তরে প্রসৃত হইলাম। এরূপে উপাধি ব্যাপ্তি দ্বারা যেমন আমি সেই প্রাণীর চিদাভাস-সম্বিতে মিলিতভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইলাম, অমনি তাহার বাসনা ও আমার বাসনার অন্তঃপ্রতিভাস বশতঃ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দ্বিগুণিতভাবে অবস্থিত দেখিলাম। তখন দেখা গেল, দিঙ্নিচয় দ্বিগুণ হইয়াছে; দুই সূর্য্য তাপ প্রদান করিতেছে; দুই ভূমণ্ডল প্রতিভাত হইতেছে; দুই অন্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ হইতেছে; দর্পণপ্রতি-বিম্বিত দুইটী প্রতিবিম্ববদন যেমন দৃষ্ট হয়, দ্বৈগুণ্যোপচিত জগৎও তেমনি মিশ্রিতভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে; তিলদ্বয়ে তৈলবৎ বুদ্ধি-

কোশস্থ চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছে; উভয় সম্বিৎকোশস্থ উভয় জগতের মিশ্রণ ঘটিলেও বাসনার অমিশ্রণ বশতঃ ক্ষীর জলবৎ প্রকট হইতেছে। আমি তখন দর্শনমাত্রেই নিমেষমধ্যে সেই প্রাণীর চিদাভাস-সম্বিৎ স্বীয় সম্বিৎ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়াই একাত্মতায় উপনীত করিয়া লইলাম। ফল কথা, তৎকালে উভয় উপাধির ঐক্য বিধানে একীভূত করিলাম। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে এক ঋতুর অন্য ঋতুর সহিত, ক্ষুদ্র জলাশয়ের বৃহৎ জলাশয়ের সহিত, আমোদলেখার বায়ুর সহিত এবং ধূমলেখার মেঘের সহিত মিলনের উল্লেখ করা যায়। তৎকালে বাসনার একীকরণ দ্বারা উভয় সম্বিদের ঐকান্তিক একতা যেমন নিষ্পাদিত হইল, অমনি অনুভূতপূর্ব্ব দ্বিগুণীভূত জগৎও এক হইয়া গেল। যেমন দৃষ্টিদোষান্বিত পুরুষের পরিদৃষ্ট চন্দ্রদ্বয় পুনরায় দৃষ্টিপ্রসন্নতায় এক হয়, ঐ একত্ব সেইরূপই ঘটিল। অনন্তর তচ্চিতি-গত মদীয় স্ববিবেক পরিত্যক্ত না হওয়ায় সঙ্কল্প অল্পীভূত হইল এবং তদীয় সঙ্কল্পানুসারিণী স্থিতি লাভ করিল। তখন আমিও তদীয় চিত্তবৃত্তি দ্বারা তাহারই ভোগ্য বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং তদীয় হৃদয় পরিহার না করিয়াই জাগ্রদ্ব্যবহাররূপ দৈনন্দিনাচার সকল অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতঃপর সেই প্রাণী অন্ন জল উপভোগ করিল এবং শ্রমশ্রান্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যের সায়ংকালীন আতপ উপসংহারের ন্যায় দিঙনিকুঞ্জে প্রসৃত রূপালোকক্রিয়াজনক চিত্ত উপসংহৃত হইল। চিত্তের উপসংহারঘটনায় কূর্ম্মাঙ্গে কূর্ম্ম-প্রবেশবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি গুলিও চিত্তসহ ছিন্ন হইয়া হৃৎকোশে প্রবেশ করিল। চক্ষুরাদি মুদ্রিত হইল—হইয়া হৃদাকারে পরিণতি পাইল; মৃতবৎ নির্ব্ব্যাপার হইল। চিত্তের অনুবিধায়িত্ব বশতঃ আমিও তাহার চিত্তবৃত্তি সমভিব্যাহারে ইন্দ্রিয়গোলক পরিহারপূর্ব্বক নাড়ীপথে তদীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহা শয্যাসম কোমল তৈজসাগুস্থ আনন্দময় কোষ, তাহাতে আমি বাহ্যানুভব সংহারপূর্ব্বক ক্ষণকাল সুষুপ্তি অনুভব করিলাম। যে কালে অন্ন পান বিকার সচ্ছিদ্র নাড়ীনিচয়ে নিরুদ্ধ; সমান বায়ুর বহির্নির্গম নাই; সে, সূক্ষ্ম গতি অবলম্বন করিয়া অন্তরে সঞ্চরণশীল; তৎকালে প্রাণাত্মক অদ্বৈত প্রসন্নাত্মা তন্মাত্র-তৎপর

হইয়া হৃদয়ে পুরীনিকরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মরূপ পরম পুরুষার্থ স্বভাব বশতঃ চিত্তকে নিজের অধীন করিয়া লয়েন। তখন নিরতিশয় আনন্দ-রূপ সুষুপ্তিতে ঐ নিরতিশয় আনন্দ কলেবরই শোভা পাইতে থাকেন; তাঁহার দুঃখলেশও থাকে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! প্রাণায়ত্ত হইয়াই মন মননাদি করিয়া থাকে। সুষুপ্তিদশায় প্রাণায়ত্ত বলিয়াই মন যদি মনন না করে, তবে জাগ্রৎকালেই বা কিরূপে মনন করিয়া থাকে? কেন না, প্রাণ হইতে মনের যে একটা পৃথক্ স্বরূপ, তাহা তো আর নাই। আর যদিই হয়, তবে তো সে কিছুই নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদি অধিষ্ঠান সন্মাত্র হইতে পৃথক্ করা যায়, তবে তো দেহ প্রাণাদি কিছুই থাকে না। সেই সন্মাত্র হইতে যদি অপৃথক্ করা হয়, তবেই তো তাহার সত্তায় সকলই সত্তাশালী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রাণ হইতে যদি পৃথক্ করা যায়, তবে আর মন থাকে না। এ তো তোমার অল্পাশঙ্কা; কেন না, স্বপ্ন শৈলবৎ এই দেহই যখন মনের কল্পনাত্মক, তখন মন হইতে পৃথক্ করিলে এই স্বানুভূত নিজ দেহই তো থাকে না। চেত্যার্থের অভাব নিবন্ধন চিত্তের অসত্তা হয়; আর সর্গাদি সময়ে কারণ না থাকায় দৃশ্যোৎপত্তিও হয় না। এই জন্য বলা হয়, এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা, তাই এ বিশ্ব যথাস্থিতভাবেই বিদ্যমান, সত্তাশ্রয় চিত্ত দেহাদি সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মবিদ্গণের নিকট ব্রহ্ম-রূপে প্রতিভাত। অব্রহ্মজ্ঞগণের মতে এই চিত্ত বা দেহাদি যাদৃশ, আমাদের মতে তাদৃশ নহে। বৎস! এই যে বিবিধাকার জগত্ত্রয় দেখিতেছ, ইহা ব্রহ্ম মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এ কথা বিবৃত করা যাইতেছে, শ্রবণ কর, এক মাত্র চিন্মাত্র পদার্থ বিদ্যমান। উহা অমল অনন্ত আকাশস্বরূপ; উহাকে না জগৎ না দৃশ্য কিছুই বলা যায় না। অনাদিশুদ্ধ বুদ্ধরূপের অপরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ চিন্মাত্র কর্ত্তৃক প্রথমে মনস্তত্ত্বই অধ্যারোপিত। এই মনোদ্বারা আত্মার যে সঞ্চরণ কল্পনা, জানিবে—তাহারই নাম প্রাণ-পবন। এইরূপে মনো দ্বারা কল্পিত হইয়াই যেমন প্রাণতার অনুভব হয়, তেমনি ইন্দ্রদেহাদি দিক্‌পালকলনাদিও মনো দ্বারা কল্পিত হইয়াই

অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। এই ভাবে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অখণ্ড চিত্তমাত্র। যাহা চিত্ত, তাহাও চিন্মাত্র বৈ অন্য কিছুই নহে। কারণ এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, এতৎসমস্তই ব্রহ্ম কল্পিত। কাজেই যিনি নিরাকার, আদি-অন্ত-বর্জ্জিত, অনাময়, অনাভাস, শান্ত চিন্মাত্র, সম্মাত্র ব্রহ্মপদ, তাহাঁ হইতে এ জগৎ অতিরিক্ত নহে। প্রাথমিক মনঃশক্তি যোগে পূর্ব্বসিদ্ধ অনুভবোদ্ভাবিত হইয়া পরম ব্রহ্ম যাদৃশরূপে সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বত্র স্বপ্ন-জাগরস্বরূপ ভূতজগৎ সেইরূপেই তাঁহার অনুভূত হয়। সঙ্কল্পাত্মক মনই কার্য্য ব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত। এই ভূরাদি লোক ও অন্য বিষয় সকল যেরূপে তিনি সঙ্কল্প করেন, সেইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

রামচন্দ্র! যিনি শূন্যাত্মক চেতনাত্মা পুরুষ, তিনিই প্রথমে চিত্ত দ্বারা প্রাণবান্, অনন্তর দেহী, তদনন্তর গিরীকৃত ও তৎপশ্চাৎ ত্রিভুবনীকৃত হন। স্বপ্নাবস্থায় স্বদেহে কল্পিত পুরীর অন্তরালে সকলেই এ সকল অনুভবগোচর করিয়া থাকেন।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এ জগতের কর্ত্তা একমাত্র চিত্তই। চিত্তের যেরূপে যাহা সঙ্কল্পিত হয়, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে। চিত্তের সঙ্কল্পগুণেই কোন বিষয় অলীক হয়, কোন বিষয় ব্যবহারিক হয়, আবার কোন কোন বিষয় প্রাতিভাসিক হইয়া থাকে। প্রাণ সর্ব্বব্যবহারের নির্ব্বাহক; তাহা ভিন্ন আমি তিষ্ঠিতে পারি না। এ সকল কল্পিত মাত্র, এই কারণেই চিত্তকে প্রাণাধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। প্রাণাভাবে কিয়ৎকাল তিষ্ঠিতেও পারি, নাও পারি, এ কথাও কল্পিত। মনঃসংযুক্ত প্রাণ দ্বারা দেহ যথায় কল্পিত হয়, সুবিস্তৃত মায়ানগরের ন্যায় ক্ষণমধ্যেই দেহের

তথায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরে আমি কস্মিন্‌কালেও যেন প্রাণ ও দেহ-বিরহিত হই না, এইরূপ একটা সুদৃঢ় নিশ্চয় জীবেরই হইয়া উঠে। যিনি চিন্মাত্রস্বভাব আত্মা, তাহার ওরূপ নিশ্চয় হয় না। সন্দেহবশে দোলায়মান চিত্তই দুঃখভাগী হয়; তদ্‌বিপরীত দৃঢ় নিশ্চয়ের যথার্থতা ব্যতীত সে দুঃখের উপশম ঘটে না। যে ভ্রমজ্ঞান অতি দৃঢ় হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের অল্প বিকল্পনায় নষ্ট হইবার নহে। যাঁহার অহম্প্রত্যয় বিদ্যমান, তাহার ভ্রমজ্ঞান কোনক্রমেই নাশ পায় না। ভ্রম জ্ঞান নাশ করিবার পক্ষে আত্মবিজ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায়; তদ্ব্যতীত উহার উচ্ছেদের উপায়ান্তর নাই। এ দিকে মোক্ষোপায় বিচার ব্যতিরেকেও তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইবার নহে। অতএব মোক্ষের উপায় কি, তাহা সযত্নে বিচার করিয়া দেখ। জানিবে—'অহং' আর 'ইদং' এই দ্বিবিধ অবিদ্যা বিদ্যমান। মোক্ষোপায় ভিন্ন কোন কারণেই উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। প্রাণই আমার পরম প্রেমাস্পদ, এইরূপ দৃঢ়াভ্যাসবশেই মন প্রাণাধীন হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকারে মনের দেহাধীনতাও বিদ্যমান। প্রাণ যদি সুস্থদেহে স্থির থাকে, তবে সে মনন করিতে পারে; কিন্তু দেহ যদি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আর সেই ক্ষোভ যদি প্রাণগত হয়, তবে মনের আত্মতত্ত্ব-বিবেক-দৃষ্টির শক্তি থাকে না। মন যে কালে স্বকর্ম্ম সম্পাদনার্থ ব্যগ্র হয়, তখন সে আত্মজ্ঞানোন্মুখ কিছুতেই হয় না। প্রাণ ও মন পরস্পর রথ-সারথির ন্যায় বিরাজমান। রথ ও সারথি পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তনকারী। উক্ত উভয়ের কে না কাহার অনুবর্ত্তক? এইরূপে মন ও প্রাণ এই উভয়েও পরস্পর অনু-বৃত্তিস্বভাব। ইহাদের দ্বারাই আদি সৃষ্টিতে পরমাত্মা কল্পিত হইয়া থাকেন। এই জন্য আজও পর্য্যন্ত অপণ্ডিতগণের নিয়তি নিবৃত্তি হয় না। পরম পদে অনধিরূঢ় মন প্রাণ দেহীদিগের দেশ, কাল ও ক্রিয়া দ্রব্য ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রাণ ও মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাম্যভাবে স্বকর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক অবস্থিত হয়, ততক্ষণ জাগ্রদভিধেয় সমব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যৎকালে প্রাণ ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনা হইতে উপরত ও বিষমভাব-যুক্ত হয়, তখন বিষম ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নাভিধেয় মানস ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। নাড়ীমার্গ যখন ভুক্ত অন্নরসাদি দ্বারা

রুদ্ধ হয়, তখন পিণ্ডিত প্রাণের মন্দ সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময়ে মনের শান্তি ও সুষুপ্তির উদয় হয়। অন্নরসাদি দ্বারা পূর্ণ না রহিয়া যদি নাড়ীপথ ক্ষীণও থাকে, তথাচ শ্রমবশে প্রাণ নিস্পন্দভাবে রহিলেও সুষুপ্তির উদয় হইয়া থাকে। নাড়ী যদি মর্দ্দনাদিবশে মৃদু বা শরক্ষত-ব্রণে রুধিরাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তবে তখন প্রাণের লীনাবস্থায় নিস্পন্দ সুষুপ্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

তাপস বলিলেন,—আমি সেই যে তখন এক প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া তৎকালে সুষুপ্তভাবে ছিল। মদীয় চিত্ত তদীয় চিত্তসহ একীভূত হওয়ায় আমি স্বাতন্ত্র্য-বিরহিত-ভাবে সুখ-সুপ্ত নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। অনন্তর সেই প্রাণীর উদরাভ্যন্তরের অন্নাদি যখন জীর্ণ হইল, নৈসর্গিক নাড়ীমার্গ যখন অস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন প্রাণও স্পন্দমান হইতে লাগিল। কাজেই সুষুপ্তি তখন হ্রাস পাইল। সুষুপ্তির হ্রাসঘটনায় ভুবন সন্দর্শন করিলাম। দেখিলাম,—সেই ভুবন প্রলয়ের ক্ষুব্ধ অব্ধি-জাত মহাজলরাশি দ্বারা পূর্য্যমাণ হইয়াছে। সেই জলরাশি আবার অধঃপতিত মুষলপ্রমাণ বৃষ্টিধারায় স্ফীত পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গপ্রবাহে অন্বিত এবং সঞ্চালিত বনমালার ন্যায় তৃণরাজিময় পর্ব্বত-পরিব্যাপ্ত। দেখিলাম, পর্ব্বত-পাদপোন্মূলনকারী বায়ু বহিতেছে; ত্রৈলোক্য বহ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়াছে; আকাশস্থিত দেবাসুরগণের নগরনিচয় খণ্ড খণ্ড হইতেছে। আমি যে তখন সেখানকার কোথাও কোন নগরস্থিত গৃহে স্বীয় পত্নীসহ অবস্থান করিতেছিলাম, তাহাও দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম,—স্ত্রী, ভৃত্য, বান্ধব, গৃহোপকরণ ও গৃহাদিসহ সেই প্রলয়জলে প্রবাহিত হইলাম। সেই গ্রাম নগর তখন প্রলয়সলিল দ্বারা উহ্যমান হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সেই সেই স্থান লঙ্ঘন করিয়া চলিল। বারিপ্রবাহে সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ হইল। তথায় ঘোরতর কলকল শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল; তাহাতে মনে হইল, অব্ধিগর্জ্জনও তখন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। তথাকার লোক সকল একান্ত ক্ষুভিত হইয়াছিল। অনেকের পুত্রাদি আত্মজন বিনাশ পাইতে লাগিল। চঞ্চল আবর্ত্তময় জলোচ্ছ্বাসে নগর ও গ্রাম ভাসিয়া গিয়া

ব্যাকুল হইল। জনগণ তত্রত্য জঙ্গলসমূহে গিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে সেই সকল জঙ্গল ভীষণাকারে পরিণত হইল। সেই নগরে গৃহসমূহের বিদীর্ণ ভিত্তিস্থিত শ্লথ কাষ্ঠের শঙ্কুগুলি কটু কঠোর শব্দে শব্দিত হইতেছিল। গৃহাবলীর গবাক্ষে-গবাক্ষে অঙ্গনাগণের মুখরাজি বিরাজ করিতেছিল। আমি সেই অবস্থায় কিছুকালের জন্য সমস্ত দেখিয়া লইয়া দীনভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তরঙ্গাঘাতে বাল, বৃদ্ধ ও অঙ্গনা-পরিপূর্ণ গৃহ সকল শিলাপতিত নির্ঝরনিকরের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া শতধা বিভক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর আমি কলত্রাদি সমস্ত আত্মজন ছাড়িলাম, চিত্ত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম; কেবল প্রাণমাত্রসহায় হইয়া সেই প্রলয়জলে ভাসিতে লাগিলাম। তখন তরঙ্গ-মালায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া আমি এক যোজন হইতে যোজনান্তরে যাইতে লাগিলাম। প্রবাহোপরি যে সকল বৃক্ষ ভাসিতেছিল, তদুৎপন্ন বহ্নি-শিখার মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া আমার দেহ একান্তই জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত স্থানে প্রভূত কাষ্ঠ ছিল। আমি সেই সমুদায় কাষ্ঠের ঘর্ষণে আস্ফালিত হইতেছিলাম এবং আবর্ত্তভ্রমণে পাতাল-তলে গিয়া বহুকাল পরে উত্থিত হইয়াছিলাম। তখন আগম ও অপায় দ্বারা উত্থিত অব্যক্ত গুরু গভীর শব্দময় প্রভূত কল্লোলযুক্ত জলে আমি বারম্বার উন্মগ্ন নিমগ্ন হইতে লাগিলাম। কখন বা পরস্পর ঘর্ষণ-ভগ্ন শৈলপঙ্কিল জলে আমি পল্বলমগ্ন বারণবৎ মগ্ন হইতে লাগিলাম, আবার দৈবাৎ আগত জলোচ্ছ্বাসে উত্থিত হইতেছিলাম। আমি যেমন যেমন অদ্রিখণ্ডোপরি আরোহণপূর্ব্বক বিশ্রাম লইতেছিলাম, সেই সেই কালেই কল্পবারিরাশি আসিয়া আমার উপর পতিত হইতেছিল। অধিক কি কহিব? সেই কল্লোলময় জলরাশির আশ্রয় লওয়ায় আমাকে বহু দুঃখই ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেইকালে সেইখানে আজীবন অভ্যস্ত চিত্ত-বিষাদ বশতঃ পূর্ব্বতন স্বীয় সমাধিময় রূপ আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছিল। আমি স্মরণ করিতে লাগিলাম—অহো! পূর্ব্বে আমি অন্য-বিধ জগতে জনৈক তাপস ছিলাম। পরে অপর কোন ব্যক্তির স্বপ্ন-সন্দর্শনের নিমিত্ত তাহার দেহে প্রবেশপূর্ব্বক এই সমস্ত ভ্রম অবলোকন

করিতেছি। বর্ত্তমান স্বপ্নপ্রপঞ্চে দৃঢ়াভ্যাস বশতঃ স্বদেহে মিথ্যা জ্ঞান হওয়ায় সেই কল্লোল দ্বারা প্রাবহিত হইয়াও তৎস্মরণের পর সুখাবস্থান করিলাম। সে সমস্ত প্রলয়-বিবর্ত্তনক্রমে নগ, নগর, গ্রাম, ভূখণ্ড, তরু, সুর, নর, নাগ, নারী, নভশ্চর ও লোকপালগণের নিকেতনাদি বাহিত হইতে ছিল। প্রসিদ্ধ মরু-মরীচিকার বারির ন্যায় সেই সকল প্রলয় বিবর্ত্তন মিথ্যা বলিয়া দেখিতে পাইলাম। তার পর অদ্রিযুক্ত জলকল্লোল দ্বারা পর্ব্বত-পরম্পরার বিঘট্টনা সকল বার বার পরিদর্শন-পূর্ব্বক এ জগতের সংহার-ব্যাপারের চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—কি আশ্চর্য্য! দেবদেব ত্রিলোচনও অর্ণবান্তরালে জীর্ণ তৃণবৎ উহ্যমান হইতেছেন। অহো! তবে আর দগ্ধ বিধির অকার্য্য কিছুই নাই। প্রভাতে সৌরী প্রভা যেমন বিকচ পদ্মমধ্য দেখাইয়া থাকে, তেমনি গৃহরাজি চতুর্ব্বিধভিত্তি বিদারণ করিয়া আত্মমধ্যগত শোভা দেখাইতেছে। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল তরঙ্গস্তরের মধ্যে মধ্যে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সুর, নর, নাগ ও নারীবৃন্দ সমুল্লসিত হইতেছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল পদ্ম-পরিভূষিতা প্রসিদ্ধ নদী অন্যান্য নদী হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। এই জল-রাশিমধ্যে সুরাসুর-নাগদিগের মহা গৃহশ্রেণীর ভিত্তিভাগ সকল সুবর্ণময় নৌকারাজির ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র শীর্য্যমাণ মণিময় গৃহের মধ্যে থাকিয়াই প্রলয় জলভরে মগ্ন হইতেছেন; এবং কুঙ্কুম-চিহ্নিত মত্ত মাতঙ্গসমূহের কুম্ভবৎ পৌলমীর আপীন পয়োধরযুগ্মে রতিখেদবশে শ্রান্ত হইয়া তদপনয়নের নিমিত্তই যেন জলকেলি সুখোদ্দেশে তরঙ্গদোলা সকল সমাধা করিতেছেন। অহো! বারিবেষ্টনে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যাকুল হইয়াছে! ঐ কুসুমপ্রকরবৎ পরিকম্পিত নক্ষত্রনিকর বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইতেছে। রত্নসানুময় মধ্য প্রদেশে বিবুধগণের বিমান-শ্রেণী পতিত হইতেছে। বায়ু উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুমবর্ষণে যেন মঙ্গলাচরণ করিতেছে। অদ্রিক্ষুব্ধ অম্বুনিধির ভীষণ জলোর্ম্মিমালা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হৈম, দৃষদের ন্যায় ব্রহ্মলোকে ধ্যানৈকনিষ্ঠ পরমেষ্ঠীর পদ্মাসন পর্য্যন্ত পরবর্ত্তিত করিতেছে। ঐ ঊর্ম্মি-কুল আকাশে বারিদপটলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার আকার

গজ-বাজি-সিংহ-নাগ-মহীরুহ ও মহীতল-তুল্য এবং উহা অতি গম্ভীর ঘুঙ্ঘুম-ঘোষ জন্য ভয়ঙ্কর। অতসীকুসুমের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন প্রলয় জলধির জলোর্ম্মিমধ্যে সাক্ষাৎ যমরাজও যেন বারিময় দেহধারী যমান্তর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছেন। গিরি-গুহাগত বারিপুর ব্যাবর্ত্তিত হইয়া গুড় গুড় ধ্বনি করিতেছে; নগ• নগরাদি সহ নিখিল লোকপাল ও নাগগণ জলমগ্ন হইতেছে। ভূতল, পাতাল, নভস্তল ও দিক্তট সকল দুর্ব্বার বারিবল-নায় পরিপূরিত হইয়াছে; তাহাতে গ্রাম, পত্তন, বিমান ও নগসহ ইন্দ্র, যম, যক্ষ ও সুরাসুরগণ মৎস্যপালবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। অহো! দোহনসময়ে গোবৎসের মাতৃজজ্ঞাবৎ উহ্যমান শ্রীকৃষ্ণের অণু তনু সকলের বন্ধনস্তম্ভ হইল! দেবদানব মধ্যে পরস্পর নারী লইয়া হলহলা ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাতে কেমন একটা বুড় বুড়ারব পরিশ্রুত হইতে লাগিল। কোলাহলাকুল দেব-দানবদলের বেগপাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া অভ্রোদরে ভ্রাম্যমাণ জলদজাল যেন জলময় স্পষ্ট ভিত্তি রচনা করিতেছে। কি কষ্ট! ঐ বিশ্ববিখ্যাত বিভাকর আবর্ত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনপুরঃসর অধস্তাৎ পতিত হইতেছেন। অহো! এই যে দেখিতেছি,—কুবের, যম, নারদ ও বাস-বাদি সুরগণ প্রাণ পরিহার করিতেছেন। দেহাদি অহম্ভাববর্জ্জিত তত্ত্ববিদ্গণ স্ব স্ব শান্ত জড় দেহ সকল উহ্যমান দেখিয়া নিজেরাই শবপ্রায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। আহা! এই জলসমূহকে রক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই। ইহারা অর্দ্ধপরিপিষ্ট হইয়া এইখানেই কষ্ট ভোগ করিতেছে। জনগণ অন্তকের দংষ্ট্রা দ্বারা চর্ব্বিত হইতেছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের রক্ষায় অক্ষম। সর্পবৎ সর্পণকারী প্রবল জলচরগণের ভীষণ কল্লোল হইতেছে। কল্লোলমধ্যে দেবপত্তন সকল নৌকাবৎ উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। ত্রিভুবন নির্ম্মূলিত হইয়াছে এবং বারি-বিলোড়িত দ্বীপ শৈলেন্দ্র ও সুরাসুর নাগ চারণ পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অহো! আজ সেই মহাবিভবান্বিত বিশ্বনায়ক ইন্দ্রাদি দেবগণ কোথায় গেলেন!

উনচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—হে বিভো! আপনি জ্ঞানযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ; আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত প্রলয় জল প্লাবনাদি নানা ভ্রমপূর্ণ দশায় অতীতানাগত নিখিল দর্শনোপায় ধ্যান যোগাঙ্গের প্রয়োগে সর্ব্বভ্রম উপশান্ত না হইবার কারণ কি?

সেই তাপস কহিলেন,—কল্পান্ত কাল আসিলে অধিষ্ঠানচৈতন্যে ভ্রমরূপ জগতের নানাবিধ নাশ হয়। কোন কল্পান্তে উহার ক্রমিক নাশ হইয়া থাকে এবং কখন বা সপ্ত সাগরের যুগপৎ নাশ হয়। যৎকালে সহসা বারিবিকার উপস্থিত হয়, তখন সুরগণ হিরণ্যগর্ভসমীপে নিবেদনার্থ যেমন যাইবার ইচ্ছা করেন, অমনিই জলপ্রবাহে তথায় নীত হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় আমাদের কথা আর কি কহিব? তখন সুরগণও প্রমাদ গণিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে,—ওহে বনেচর ব্যাধ! কাল যখন সর্ব্বসংহারী হইয়া উঠেন, তখন ভবিতব্যতার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। যাহা হইবার তাহা হইবেই। সংহারকাল আসিলে মহৎ লোকেরও বল, বুদ্ধি, তেজ, বিপর্য্যস্ত হয়। অথবা বুঝিয়া রাখ ব্যাধ! আমি যে যে ঘটনার বর্ণন করিয়াছি, সে সকলই স্বপ্নে দেখা; স্বপ্নে কিছুই অসম্ভব হয় না!

ব্যাধ বলিল,—হে কল্যাণৈককোবিদ, ভগবন্! আপনার বর্ণিত বিষয় যদি স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হয়, তবে তাহা বর্ণন করিবার কোন্ প্রয়োজন আছে?

তাপস কহিলেন,—হে মতিমন্! এ বিষয়ে তোমার নিজের বোধ আবশ্যক। আমি যে দৃশ্য প্রপঞ্চের বর্ণন করিয়াছি, তাহার ন্যায় দৃশ্যমান প্রপঞ্চও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতঃপর অবশিষ্ট সত্য বার্ত্তা আমার নিকট শ্রবণ কর। তার পর সেই প্রাণীর ওজোমধ্যগত ভ্রান্ত আমি তথাকথিত একার্ণবাভ্যন্তরে স্বপ্নযোগে ভ্রান্ত বস্তু সকল দেখিতে লাগিলাম। বজ্র-বিত্রস্ত বিক্ষুব্ধ পক্ষবান্ গিরীন্দ্রবৃন্দবৎ যে কালে

সেই আবর্ত্ত-কল্লোলাদিময় বারি কোথাও নির্গত হইল, তখন আমিও সেই বারিরাশি দ্বারা উহ্যমান হইয়া দৈবাৎ কোন শিখরপ্রান্ত-সদৃশ তটপ্রদেশ প্রাপ্ত হইলাম এবং সেই তটাশ্রয়েই বাস করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ক্ষণমধ্যেই অশেষ সলিলরাশি নির্গত হইয়া গেল। হেমদ্বীপনিভ গীর্ব্বাণপুর-পরিব্যাপ্ত, ভ্রমমাণ সুরাঙ্গনালীন নলিনী-জালমণ্ডিত, নীল নীরজাতিশায়িত স্ফুরৎনীর সীকর ও উল্লোল বীচি-বিক্ষোভিত বৃহৎ বৃহৎ কল্পদ্রুমযুক্ত সেই সলিলরাশি ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। অতঃপর সেই একার্ণব-খাত শুষ্ক কোটরে পর্য্যবসিত হইল। দেখা গেল, কোথাও সহ্যাদ্রি গলিত, কোথাও শীর্ণমন্দির ভূধর ভূতলগত, কোথাও পঙ্ক-পতিত চন্দ্র, যম ও ইন্দ্রাদি বিরাজিত, এবং কোথাও বা কমলপ্রায় শীর্ণ লোকপাল-কপাল-কর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোন স্থান রুধিরহ্রদে পাটলীকৃত আছে; কোথাও আকণ্ঠ মগ্ন বিদ্যাধরীবৃন্দ বিরাজ করিতেছে; কোথাও মৃত মাতঙ্গনিভ যমবাহন মহিষবর পতিত আছে; কোথাও অমরশৈলসন্নিভ মহাকায় গরুড় রহিয়াছে; কোথাও ভূমিগত যমদণ্ডোপম জলনিরোধ ক্ষম মহাসেতু অবস্থান করিতেছে; কোথাও বিরিঞ্চি-বাহন হংস-সহিত পঙ্কিল ভূমি আছে, এবং কোথাও বা দেবসমূহের দেহার্দ্ধ পঙ্ক-পতিত হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর কোন পর্ব্বতের প্রান্ত দেশ প্রাপ্ত হইলাম। সেখানে কোন মুনির আশ্রম ছিল। আমি সেই আশ্রমে গিয়া যখন বীতশ্রম হইলাম, তখন প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া আমায় আক্রমণ করিল। তার পর পূর্ব্বোল্লিখিত বাসনায় অন্বিত হইয়া সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় নিদ্রান্ত প্রাপ্ত হইলাম। আমার সেই যে ওজোধাতু, আমি তাহাতেই স্থির হইয়া তথাবিধ কল্পান্তই অবলোকন করিতে লাগিলাম। আমার আবার দ্বিগুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। প্রবোধের পর আমি সেই প্রাণীর হৃদয়স্থ স্বপ্ন পুনর্ব্বার দর্শন করিতে লাগিলাম। দ্বিতীয় দিবসে দিবাকর সমুদিত হইলেন। লোক, আকাশ, পৃথ্বী, পর্ব্বত, সকলই সুন্দর দেখিলাম। বৃক্ষ হইতে পত্রাদির যেমন উৎপত্তি হয়, তেমনি স্বর্গ, পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিঙ্‌নিচয় চিত্ত হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই সকল

পদার্থ দর্শনে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের কিঞ্চিৎ স্মরণ হওয়ায় আমি সেই পদার্থ দ্বারাই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। অদ্য ষোড়শ বর্ষ হইল, আমার জন্ম হইয়াছে ; এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, আর এই আমার গৃহ ; ইত্যাদি রূপ ব্যবহারপ্রতিভা তৎকালে আমার সমুদিত হইল। সে সময়ে কোন গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রম আমি অবলোকন করিলাম। সেখানে অনেকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমি তাহাদের গ্রাম্য গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। অনন্তর তথায় জাগ্রদাদি দশা অনুভব করিতে করিতে অহোরাত্র আমার কাটিয়া গেল। সেই সকল গ্রাম তখন যথার্থ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। ইহার পর কালের গতিবশে আমার প্রাক্তন বুদ্ধি লোপ পাইল। ক্রমে আমি এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ হইলাম ; দেহমাত্রে আস্থা বন্ধন করিলাম। আমার বিবেক দূরীভূত হইল ; দেহমাত্রে আত্মবুদ্ধি জন্মিল ; রমণী মাত্রে অনুরক্ত হইলাম ; বাসনামাত্র সার হইল। ধনমাত্রেই তৎপর হইলাম। ধনের মধ্যে আমার থাকিল—একটী জীর্ণ গো-মাত্র। আমি আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে এক প্রকার লতা দ্বারা বৃতি প্রস্তুত করিলাম। অগ্নি, ক্ষেত্রোচিত ভূমি, পশ্বাদি প্রাণী ও কমণ্ডলু, এই কয়টী বস্তু আমার উপার্জ্জিত হইল। আমি সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার লোকাচারের অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। আমার গৃহপার্শ্বে এক আনীল শাদ্বলস্থলী ছিল। তাহাতে আমি মধ্যে মধ্যে উপবেশন করিতে লাগিলাম। শাক ও শস্যক্ষেত্রের রচনায় আমার দিন কাটিতে লাগিল। তখন নদী, হ্রদ ও সরোবরে আমি স্নান করিতাম। এইটী আমার কর্ত্তব্য আর এইটী আমার পক্ষে নিষিদ্ধ, এই প্রকার বিধি-নিষেধের রশ্মি দ্বারা আমি আবদ্ধ ও বিবশীকৃত হইলাম।

এইরূপ অবস্থায় আমার জীবনের যখন শত বর্ষ অতীত হইল, তখন এক দিন এক আত্মবান্ তাপস অতিথি আমার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে পূজা করিলাম। তিনি স্নানান্তে আমার আলয়ে বিশ্রাম লইলেন। অনন্তর রাত্রিকালে আহারের পর শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তিনি নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় নানারসের অবতারণা হইতে লাগিল। তিনি নানা দিগ্, দেশ, পর্ব্বত ও উর্ব্বীসম্বন্ধীয়

অনেক কথাই কহিলেন। অবশেষে সেই অতিথি এক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিলেন,—এই পরিদৃশ্যমান নিখিল পদার্থই অনন্ত অবিকার চিন্মাত্র; এই জগদাকারে চিন্মাত্রই কল্পিত। ফল কথা, পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এই কথা শ্রবণে আমার বোধের উদয় হইল। অনন্তর বোধ পরিপক হইলে ধারণাবশে মদীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল; আত্মবার্ত্তা মনে পড়িল। যাহার উদরে আমি অবস্থিত ছিলাম, তাহার বিরাট রূপের আশঙ্কায় তথা হইতে নির্গমনোদ্যোগ করিলাম; কিন্তু তাহার উদরস্থ অব্ধি, অদ্রি, পৃথ্বী ও সরিৎসমন্বিত ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিয়াও আমি তখন নির্গমপথ পাইলাম না। অনন্তর আমার সেই বন্ধুজন-পরিবৃত গ্রাম পরিহার না করিয়াই বহির্নিক্রমণ করিবার জন্য সেই প্রাণীর প্রাণপবন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তত্রস্থ বিরাটের আভ্যন্তর সকল দেখিব; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তৎপ্রাণ অহম্ভাবে ধারণাবদ্ধ হইলাম এবং পুষ্প হইতে যেরূপ গন্ধ নির্গম হয়, তেমনি তদীয় প্রাণপবন সহ নির্গমন করিলাম। পরে বাতস্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার মুখবিবর প্রাপ্ত হইলাম এবং বাতরূপ রথারোহণপূর্ব্বক একটী বহির্নিঃসৃত পুরী দর্শন করিলাম। দেখিলাম,—বাহিরে কোন গিরিকন্দরে কোন মুনির আশ্রম বিদ্যমান। শিষ্যগণ সে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। দেখিলাম,—সেই আশ্রমে মদীয় দেহ পূর্ব্বানুভূতবৎ বদ্ধপদ্মাসনে সমাসীন। আমি এক অন্তেবাসীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; দেখিলাম, সেই অন্তেবাসী গ্রামে গিয়া কোন এক উৎসবলব্ধ অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া শয়ান রহিল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার নিকট কিছুই আমি প্রকাশ করিলাম না; কৌতুক করিয়া পুনরায় তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিলাম। তদীয় হৃদভ্যন্তরে গিয়া যেমন তাহার অনন্দময়াদি কোষত্রয় অধিগত হইলাম, অমনি ভয়ঙ্কর যুগান্তকাল আসিল। ত্রিভুবনের বিপর্য্যাস ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। দেখিলাম,—সেখানকার ভুবনস্থিতি সম্পূর্ণই নূতন; তাহার ভূধর, বসুধা ও দিক্‌সংস্থান সকলই অন্যপ্রকার। আমার সেই পূর্ব্বতন বন্ধুগণ, সেই গ্রামসন্নিবেশ, কিম্বা সেই ভূপ্রদেশ, এ সকল কোথায় যে গেল,

তাহার তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, যেন একটা বাতাস আসিয়া সবই কোথায় উড়াইয়া লইল। তখন সেই অপূর্ব্ব সন্নিবেশ-বিশিষ্ট অপূর্ব্ব ভুবন যেমন একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিতেছি, অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখিলাম,—দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত, আর তাঁহাদের তাপে দশদিক্ প্রজ্বলিত; সে তাপে ঘনীভূত অম্বুর ন্যায় শৈলসকল গলনোন্মুখ; পর্ব্বতে পর্ব্বতে দিকে দিকে বনশ্রেণী দাহ-জ্বলিত; সমস্ত রত্নভূতি দগ্ধপ্রায়—কেবল স্মৃতিপথেই অবস্থিত। তখন সপ্ত সমুদ্র শুকাইয়া গেল। দিঙ্মণ্ডল হইতে প্রচণ্ড পবন উত্থিত হইল। ভূতল স্তূপীকৃত অঙ্গরাভা ধারণ করিল। অগ্রে পাতাল হইতে, পশ্চাৎ ভূতল হইতে, তৎপরে দিক্চক্রবাল হইতে অনর্গল জ্বালামালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণকালমধ্যে সমগ্র বিশ্বই এক জ্বালামালায় মণ্ডলিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালীন অভ্র-পটলের ন্যায় বিশ্বমণ্ডল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল। যেমন হেমপদ্মকোষে ভৃঙ্গ ভ্রমণ করে, তেমনি আমি সেই জ্বালাময় পদ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিলাম। কিন্তু পতঙ্গের ন্যায় আমি তখন দাহাদি বিকার দুঃখ প্রাপ্ত হই নাই। সেকালে পবনধারণায় আমি পবনাত্মক হইয়াছিলাম; সেই অবস্থায় জ্বালাময় মহাম্বুদকণ্ঠে বিদ্যুদ্বৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেহ আমার জ্বালা-পরিস্পন্দনে বিলোল হইতেছিল। স্থল পদ্ম-খণ্ডে যে ভ্রমর ভ্রমণ করে, আমি তাহারই শোভা ধারণ করিলাম।

চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—আমি সেই স্বস্থানে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে দহন দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলাম; কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখভাগী হইলাম না। আমার নিকট উহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল বলিয়াই আমি দুঃখ ভোগ করি নাই। সেই নবোত্থিত জ্বালামণ্ডল অবলম্বন করিয়াই অলাতচক্রবৎ

নিখিল নভঃপ্রদেশে আমি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আমার বুদ্ধি অখিন্ন হইয়াছিল, আমি সেই অনলতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে মারুত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মারুতপ্রবাহে মেঘ-রবপ্রতিম অতি গম্ভীর নাদ উত্থিত হইতে লাগিল। উহ্যমান শিলা, উল্মুক, রজ ও ভস্মাদি পদার্থপুঞ্জে ঐ বায়ু পরিব্যাপ্ত হইল। পরিবর্ত্তমান দ্বাদশ দিবাকরের মিশ্রণে ঐ বায়ু অলাতচক্রবৎ হইয়া উঠিল। জ্বালারূপ সান্ধ্য জলদপটলে অগ্নিময়ী শত শত বৃহৎ নদী প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া সুরনারীগণ পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দ্বারা অগ্নিশিখা দ্বিগুণ হইতে লাগিল। পতদঙ্গাররূপ জলধারা সকল ও অগ্নিবাণাকৃতি সীকরনিকর উন্নত দন্তবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধ দিঙ্মুখ ধূমান্ধকারে ম্লান ও আচ্ছাদিত হইল। ভূতল হইতে নভোমণ্ডল ও দিঙ্মুখ হইতে জ্বালারূপ সান্ধ্য বারিধর নির্গত হইতে লাগিল। ঐ বারিধর দ্বারাই সদেব সপ্তলোক জ্বালাশৈল-সম্পিণ্ড-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সেই পূর্ব্ববর্ণিত প্রচণ্ড পবন কালাগ্নিবৎ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথাও দেখা গেল, ঊর্দ্ধে উচ্ছলন জন্য আকীর্ণ অনলকণা সকল কপিলবর্ণ মূর্দ্ধজাকারে পরিণত হইল। ক্বচিৎ অধোদিকে পদাঘাত করায় কুড্যসমূহ প্রোড্ডীন হইয়া উঠিল। কঠোর রটনে পটু পবনের অঙ্গরাজি ভস্মাবগুণ্ঠিত হইয়া গেল। পতনোন্মুখ জ্বালাপটল ক্বচিৎ মধ্যভাগে উপসংগৃহীত হওয়ায় পরিধেয় পটবৎ পরিলক্ষিত হইল।

একচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—আমি তখন সম্ভ্রমে ও শ্রমে একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম—অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কি এ বৃথা দুঃস্বপ্ন

দর্শন করিতেছি। এ সমস্ত পরিত্যাগ করি, আবার জাগ্রৎদশায় উপনীত হই—হইয়া নিবৃত্তি লাভ করি।

ব্যাধ কহিল,—আপনি স্বপ্নতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ পর-দেহে প্রবেশ করিয়া পরের স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্বপ্নতত্ত্ব আপনার নিরূপিত হইয়াছে ত? আপনি যে পরকীয় হৃদয়ে মহার্ণবাদি দর্শন করিলেন, কি এ? জঠরে কল্পবায়ু ও হৃদয়ে কল্পানল কিরূপে সম্ভবপর। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, পবন, পর্ব্বত, দেহ ও দিঙ্‌নিচয় হৃদয়ে সম্ভব কিরূপে হয়? ইহার স্বরূপ কি, আমার নিকট সকল প্রকাশ করিয়া বলুন।

তাপস কহিলেন,—সৃষ্টির কারণ কিছুই নাই, উৎপত্তিও কাহারও হয় না; কাজেই সৃষ্টি-শব্দার্থ একটা অজ্ঞানবিষয় মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। বাস্তবিকই সৃষ্টিশব্দার্থে কোনও একটা তাৎপর্য্য নাই। পরমাত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই চিৎপ্রতিবিম্ব-সমন্বয়ে সর্গশব্দার্থ প্রসিদ্ধি পাইয়াছে। দেখ, যদি অভিপ্রেত স্বপ্নাদি জগৎ তত্ত্ব বোধ লব্ধ হয়, তবেই মূর্খতার শান্তি হইয়া থাকে। আমি বলিয়াছি, অনাদি অনন্ত পরম পদে বাস্তব পক্ষে সর্গশব্দার্থ নাই। মূঢ় সম্বেদনে যে ঐ শব্দার্থ, তাহা একান্ত পক্ষেই অসম্ভব। সুতরাং আমার তাহা বিদিত নাই। বোধমাত্র বস্তুই অবস্তুর আকারে প্রতিভাসিত হয়; তাই এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। বস্তুত কোথায় দেহ, কোথায় হৃদয়, কোথায় স্বপ্ন, কোথায় সলিলাদি, কোথায় বোধ, কোথায় অবোধ, কোথায় বিচ্ছেদ, কোথায় উৎপত্তি, আর কোথাই বা স্মরণাদি? কিছুই কোথাও নাই। একমাত্র বস্তু বিদ্যমান, তাহা স্বচ্ছ চিন্মাত্র; ঐ চিন্মাত্র বস্তু অতীব সূক্ষ্ম; এত সূক্ষ্ম যে, আকাশও উহার নিকট স্থূল বলিয়া গণনীয়। এতই স্থূল, যেন অণুর নিকট অদ্রি। যেমন স্বপ্ননগরে অদ্বিতীয় চিৎই প্রকাশ পায়, ফলতঃ পুরাদি কোন কিছুই থাকে না, তেমনি চিন্মাত্রই আকাশে জগদাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ চিন্মাত্র পদার্থ শান্ত অনাভাত ও অনাময়। চক্ষু যদি তিমিরোপহত হয়, তবে আকাশে যেমন চক্রকাদি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞানবশেই চিৎপদার্থের নানাকার পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নিকট না আছে অজ্ঞান, না আছে প্রতিভাসিক, না আছে

ব্যবহারিক, না আছে শূন্য, কিছুই নাই। যাহা অনাদি-অনন্ত অদ্বিতীয় নিরাকার চিদ্‌ব্যোম, তাহাই প্রকাশমান। স্বপ্নে যে অকারণবৎ ভান, তাহা মাত্র ত্রিপুটীপরিবর্জ্জিত শুদ্ধ দ্রষ্টা। এইরূপ নির্ণয় নিমিত্তই পূর্ব্বে জাগ্রদবস্থায় কারণভাব উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টৃদর্শনাদি ত্রিপুটী জাগ্রদ-বস্থাতেও নাই। কোন নির্ম্মল বস্তুই প্রকাশ পাইতেছে, উহার অনুভব অত্যন্ত পরিস্ফুট হইলেও উহা অনির্ব্বচনীয় ও আদি-অন্তবিরহিত এবং অদ্বিতীয় ও দ্বৈতৈকশূন্য। যেমন একই কাল সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়াত্মক, যেমন একই বীজ—অঙ্কুর কাণ্ড তরু শাখাদি হইতে পল্লব কুসুম-ফলান্ত যাবৎ নিজেই অবস্থিত, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডই সর্ব্বাত্মক। এক ব্যক্তির নিকট মহাকুড্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্য জন তাহাই নির্ম্মল নভো বলিয়া বিবেচনা করে। স্বপ্ন-সঙ্কল্প-ভ্রম-ভূমিতে ইহা অনুভব করা হইয়াছে। চিন্মাত্র আত্মা যেমন স্বপ্নেও জাগ্রদ্‌বৎ প্রকাশ পায়, জাগ্রন্ময় স্বপ্নেও সেইরূপই প্রকাশ হইয়া থাকে। অণুমাত্র স্বপ্ন হইতে জাগ্রতের অন্যথা ভান ঘটে না। ঐরূপে এখনও অন্যথা ভান হইতেছে না। এতাবতা আত্মা অদ্বিতীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য পবনে যে সৌরভ অবস্থান করে, তাহা যেমন ঘ্রাণজ অনুভব দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে, তেমনি অমূর্ত্ত চিন্মাত্রেই অমূর্ত্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে। সর্ব্ব মনন পরিহার করিলে অবশিষ্ট যে 'তুমি' অবস্থিত হইবে, তিনিই নিরাময় বহিরন্তরবস্থিত অনন্ত আত্মা; সেই আত্মাই নিয়ত কাল সুস্থির রহিবেন।

ব্যাধ বলিল,—ভগবন্! এ সংসারে প্রাক্তন কর্ম্ম কাহাদের থাকে? কাহাদেরই বা থাকে না? আর যদি কর্ম্ম থাকে, তবেই বা মনন ও তাহার পরিহার কিরূপ ঘটিয়া থাকে?

তাপস কহিলেন,—সর্গাদি সময়ে ব্রহ্মাদি স্বয়ম্ভু সুরগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহ বিজ্ঞানমাত্র; জন্ম কর্ম্ম তাঁহাদের নাই, সংসার ভোগ নাই, দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনা নাই। তাঁহাদের দেহ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ময়; সেই দেহেই সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মরূপে তাঁহাদের অবস্থান। সর্গাদি সময়ে কাহারও প্রাক্তন কর্ম্ম থাকিবার নয়; তৎকালে ব্রহ্মই সর্গাকারে

বিজৃম্ভমাণ হইয়া থাকেন। সর্গাদিতে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাদির প্রকাশের ন্যায় অন্য শত সহস্র জীবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরন্তু জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে; তাই স্বীয় ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারে না। ফলতঃ আমি ব্রহ্ম নহি, এইরূপই অবগত হইয়া থাকে। এইরূপে যে অসাত্ত্বিক জীব অবিদ্যাখ্য দ্বৈতে সত্যবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক তদ্বাসনায় বাসিত হইয়া পরলোক প্রয়াণ করে, উত্তরকালে কর্ম্মসহ জন্ম তাহারই দেখা গিয়া থাকে। কেন না, তাদৃশ জীব অচিৎ দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান প্রযুক্ত পরমার্থ বস্তু ভুলিয়া যাহা অবস্তু, তাহারই আশ্রয় লয়। যাঁহাদের কস্মিন্‌কালেও ব্রহ্মান্যত্ব জ্ঞান নাই, সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদিই কর্ম্মবন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত। তাঁহারা কচিৎ মলিনোপাধিতে জীবের ন্যায় ভান পাইয়া থাকেন। যেখানে জীবত্ব, সেইখানেই অবিদ্যা অবস্থিত। আত্মাও সংসার নামরূপ ধারণ করিয়া সেইখানেই বিদ্যমান। যখন কালক্রমে নিজ হইতেই আত্ম-স্বরূপ জ্ঞান হইবে, তখন নিজেই স্বরূপাভিন্ন ব্রহ্মভাব উপগত হইবেন। দ্রবত্ব হেতু জলের অন্তরে যেমন আবর্ত্ত সঞ্চার হয়, তেমনি অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরও সর্ব্বদাই ভ্রান্তিস্বভাব হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা সর্গ নাই; উহা ব্রহ্মেরই ভান; উহা না স্বপ্ন, না জাগর, কিছুই নয়। ব্রহ্মের সর্গত্ব বা অন্যত্র কল্প সম্ভাবনা কিরূপে হইবে। ফলে কল্প অবিদ্যা, বা সর্গ কিছুই নাই; সম্বেদনবশে সকলই অসদাকারে প্রতীত হইয়া থাকে। সর্গভূতাত্মক কর্ম্ম জন্ম প্রভৃতি কল্পনা ব্রহ্মই স্বয়ং করেন এবং সেইরূপেই ভান পাইয়া থাকেন। তিনি বিভু এবং সত্যসঙ্কল্প; তাই তাঁহাকেই কল্পিতার্থের আশ্রয় বলা হয়। সর্গাদি কালে কোন জীবেরই কর্ম্ম সম্ভব নহে। জীব পশ্চাৎ অবিদ্যা কল্পনা বশতঃ দেহাদির সাহায্যে কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকে। দেখ, যাহা জলাবর্ত্ত, তাহার দেহ কি, কর্ম্মই বা কি? জলাবর্ত্ত যেমন জলমাত্র, তেমনি জগৎও ব্রহ্মমাত্রই। স্বপ্নদৃষ্ট নরগণের কর্ম্মানস্তিত্বের ন্যায় চিন্মাত্র জীবেরও আদি সর্গে, শুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহে কর্ম্ম-সম্ভাবনা নাই। কেন না, তাহাদের স্বর্গ-বোধই হইবার নহে। সর্গে যদি সর্গবুদ্ধি রূঢ় হয়, তবেই কর্ম্মকল্পনা হইয়া থাকে। পরে কর্ম্ম-পাশ-নিয়ন্ত্রিত জীব

সংসারে ভ্রমণ করে। যাহা স্বর্গ, তাহাই তো স্বরূপতঃ সর্গ নহে; সর্গাকারে ব্রহ্মই অবস্থিত। কাজেই কোথায় কর্ম্ম, কাহারই বা কর্ম্ম, আর সেই কর্ম্মের স্বরূপই বা কি? যিনি স্বয়ং পরমাত্মা; তাঁহার অপরিজ্ঞান-মাত্রই কর্ম্মবন্ধনের হেতু। যিনি জ্ঞানী, তাঁহার অজ্ঞানরূপ কর্ম্মবন্ধ থাকে না। পাণ্ডিত্য বিজ্ঞান যখনই প্রবর্ত্তিত হউক, অমনি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। স্বরূপতঃ যাহার সত্তার অভাব, তাহার শান্তির জন্য আর কি কদর্থনা করিবে? মাত্র পরমার্থই আছে; তদ্ব্যতিরিক্ত স্বরূপতঃ বন্ধ কিছুমাত্রই নাই। যে পর্য্যন্ত না পাণ্ডিত্য সঞ্চয় হয়, ভবভয়করী মায়া ততদিনই বিদ্যমান। যাহার সঞ্চয়ে পুনর্ব্বার আর ভববন্ধনে পতিত হইতে হয় না, তাহারই নাম পাণ্ডিত্য। অন্যথা কেবল তর্কাদি ক্ষমতা হইলেই যে পাণ্ডিত্য হইবে, তাহা নহে। অতএব অনবরত অমল জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা পাণ্ডিত্য লাভে চেষ্টা করিবে। পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভবভয়-শান্তির উপায়ান্তর নাই।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—পণ্ডিতই সভার মণ্ডনস্বরূপ। তিনি সমস্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবিরুদ্ধ লৌকিক আচার এবং তদুভয়ের ফলস্বরূপ ঐহিক পারত্রিক সুখের তারতম্য নির্ণয়পূর্ব্বক সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া শ্রোতৃবর্গের বুদ্ধি বিকাশ করিয়া দেন। আত্মজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে গতি লাভ করেন; ইন্দ্রশ্রী তাহার নিকট জীর্ণ তৃণবৎ অকিঞ্চিৎকর। পাণ্ডিত্য হইতে যে সুখোদয় হয়, তাহা হইতে অতিরিক্ত সুখৈশ্বর্য্য পাতালে, ভূতলে বা স্বর্গেও নাই। যেমন মেঘমুক্ত শারদ সুধাকরে চক্ষুঃ প্রসন্ন হয়, তেমনি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতের সৎশাস্ত্র-বিচার জন্য পরমার্থ-বস্তুরূপিণী দৃষ্টি নিজাত্মায়

প্রসন্ন হইয়া উঠে। পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হন, তাঁহার যখন ব্রহ্ম-সত্যত্ব জ্ঞান হয়, তখন তিনি ব্রহ্মস্বভাবে অবস্থান করেন। ব্রহ্মের প্রতিভাসই এই জগদাখ্যায় অভিহিত। প্রাতিভাসিক বলিয়াই সমস্ত মিথ্যা ও তাহার কারণাভাব। স্বপ্নে যে সকল নর নিরীক্ষণ করা যায়, তাহাদের পিত্রাদি কারণ যেমন কাল্পনিক হইয়া থাকে, বাস্তব পক্ষে থাকে না, তেমনি জাগ্রৎরূপে ও স্বপ্নে যে সকল দৃশ্য দেখা যায়, তাহাদের বাস্তব কারণ নাই। তবে যাহা কারণরূপে বুঝা যায়, তাহা কাল্পনিক মাত্র। স্বপ্ন দশায় পুরুষের স্ত্রী-পুরুষাদি-ভাবে যেমন প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, তেমনি জাগ্রৎ-স্বপ্নভাবে ভাসমান দৃশ্য প্রপঞ্চেরও প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ বলিয়া নিরূপিত নহে। জীবগণ সমস্ত স্বর্গেই পরস্পর নিখিল স্বপ্নার্থ অবলোকন করে। বাসনানুসারে এ স্বর্গেও যে মিথ্যা-ভূত ব্যবহারপরম্পরা সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রাক্তন কর্ম্মের সত্তা বা বাসনা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। ভূত-ভৌতিক সৃষ্টির অন্তরে জীবগণ দেহ লাভ করিলে সংসারে স্বাপ্ন পদার্থবৎ স্ব স্ব সম্বিদনুসারে প্রকাশ পায়, সেই জন্য স্বাপ্ন পদার্থপ্রায় তাহারা সম্বেদ্যাংশে সৎ ও তদিতর অংশে অসৎ। স্বপ্নাবস্থায় সম্বেদনানুপাতে তাহাদের ভান হয় এবং জাগ্রৎ পদার্থবৎ পরস্পর অর্থক্রিয়ায় সামর্থ্য হইয়া থাকে। স্বপ্নে বাহ্যার্থের অভাব নিবন্ধন যেমন ভোজনাদি সঙ্কল্পসম্বিৎ পাকাদি সম্বিৎক্রমে গ্রাসাদি বস্তুতৎপর হয়, তৃপ্তি প্রভৃতি ফলও এইরূপেই হইয়া থাকে। এই ভাবে জাগ্রৎ সঙ্কল্প সম্বিৎ ও অর্থক্রিয়া সামর্থ্য হয়। তন্মধ্যে স্বপ্ন অস্ফুট ও জাগ্রৎ স্ফুট হইয়া থাকে। ভাস্বর স্বভাবস্থ শুদ্ধ সম্বিৎ স্ফুট কিম্বা অস্ফুট যে ভাবেই স্বয়ং ভান প্রাপ্ত হন, জাগ্রৎ বা স্বপ্ন এই দুই লৌকিক সংজ্ঞা সেই ভাবেরই হইয়া থাকে। সর্গাদিতে দেহাবসানে যাদৃশ বেদন যে ভাবে ভান পাইয়া থাকে, সেই বেদন সেই ভাবে আমোক্ষ প্রবাহরূপে অবস্থান করে। ইহাই সর্গ আখ্যায় অভিহিত হয়। জাগ্রৎ কিম্বা স্বপ্নাবস্থায় যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ, তাহাদের অমূর্ত্ত সম্বিদের সহিত তাহারাও অপৃথক্‌ভূত। এই অপার্থক্য আলোক ও প্রকাশের অভিন্নতার ন্যায়ই বিজ্ঞেয়। অপিচ অনলে ও উষ্ণতায়, পবনে ও স্পন্দনে, দ্রবে ও জলে এবং শৈত্যে ও অনিলে

যেমন অভিন্নতা, উক্ত অপার্থক্যও সেইরূপই। জগৎজাত সমস্তই অপ্রতিঘ, শান্ত ও অসম্ময়; পরন্তু উহা অধিষ্ঠানচিৎস্বরূপেই সন্ময়। ব্রহ্ম জগদাত্মকরূপে উদ্ভূত আর প্রলয়াত্মকরূপে মৃতাবস্থ; কাজেই তিনি দৃশ্যানুভবস্বরূপ। পরন্তু পরমার্থ, শান্ত, অজর, অমল, অদ্বিতীয় ও চিন্মাত্ররূপে বিরাজিত। যেমন মৃৎ-কুম্ভাদি পদার্থপরম্পরার কার্য্য-কারণ-ভাব পুরুষের কল্পনাপ্রসূত, তেমনি গগন-পবনাদি পদার্থপুঞ্জেরও কার্য্য-কারণভাব কল্পিত; সেইরূপ কল্পনাই চলিতেছে। তোমার হৃদয়ে স্বপ্নপুরীর কল্পনার ন্যায় ব্রহ্মের হৃদয়েই এই সর্গ কল্পনা হয়। যেমন স্বপ্নে, তেমনি স্বর্গেও কার্য্য-কারণতা; সম্বিদ্ঘনোদয়ে সর্গাদিতে যেরূপ কার্য্য-কারণতার কল্পনা, সে কল্পনা অদ্যাবধি বিদ্যমান। তোমার নিজের যেমন কল্পনাপুরীর কল্পনা, আর তোমার স্বসঙ্কল্পপত্তনে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য-করণ-ব্যবস্থা যে প্রকার, চিত্তের সঙ্কল্পরূপ সর্গে কার্য্য-করণরূপা ব্যবস্থা তেমনিই প্রকল্পিতা। এই যে দৃশ্যমান সর্গ, ইহা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্প-সম্ভূত। সুতরাং এ সর্গ সঙ্কল্প-সর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তোমার হৃৎসঙ্কল্প-পত্তনে চিদাদিত্যের স্বপ্রকাশরূপ অবস্থা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই যে অবস্থা, ইহাও সেই কার্য্য-করণতার্থ জন্য স্বভাবসিদ্ধ। সর্গারম্ভকালে হিরণ্যগর্ভের হৃদয়স্থ চিৎপদার্থে গন্ধ-কাঠিন্যাদিরূপে ক্ষিতি-প্রভৃতি পদার্থে যে চিত্তস্ফুরণ হইয়াছিল, সে স্ফুরণ এখনও রহিয়াছে। ক্ষিত্যাদির গন্ধকাঠিন্যাদি জলের দ্রবত্ব, তেজঃপদার্থের উষ্ণ প্রকাশ ও বায়ুর স্পন্দ-সৌক্ষ্য নিয়তি, ইত্যাদি অতীতানাগতাদি কালরূপে প্রাচী-প্রতীচ্যাদি দেশরূপে অবস্থিত। চেতনাকাশ—শূন্যতার যে নামে ও যেরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপে সেই পদার্থেই কার্য্য-কারণ ভাব আশ্রিত আছে। পবনের স্পন্দসত্তা যেমন পবনাতিরিক্ত স্বরূপশূন্য ও পবনানন্য, তেমনি চিদাকাশে যে জগদ্রূপী শূন্যতা, তাহাও অনন্যা। আকাশে সুষিরতা ও নিবিড়তা এবং নীল বর্ণস্থিতির ন্যায় চিৎপদার্থে চৈতন্য ও নিবিড়তা এবং সর্গোপস্থিতি হয়। এই সর্গ যখন সাধনাভ্যাসবশে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-পরিশূন্য চিন্মাত্রস্বভাবে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন আবার বিসর্গ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত,—যথা রজ্জুসর্পে পুনরায় রজ্জুরূপের পরিস্ফুরণ।

মৃত ব্যক্তিও স্বপ্নোপম ভিন্ন জগৎ অবলোকন করে। ফলে, ঐহিক ও পারলৌকিক সর্গ সমস্তই স্বপ্নপ্রায়।

ব্যাধ বলিল;—এই বর্ত্তমান দেহ নষ্ট হইবার পর দেহান্তর কিরূপে সম্পাদিত হয়? সে দেহের উপাদান, নিমিত্ত বা সহকারীই বা কি? মূর্ত্ত দেহাবচ্ছেদে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিত্য মোক্ষাভিধেয় রূপ সম্পাদন করে, এ কথা তো অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। কেন না, জন্মমাত্রই তো অনিত্য বস্তু।

তাপস কহিলেন,—ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনা কর্ম্ম জীব এই এইরূপ পর্য্যায়-শব্দ সমষ্টি কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র; পরন্তু বস্তুগত্যা অর্থভেদ কিছুই নাই। চিন্নভঃস্বরূপ আত্মাতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি নাম চিদাভাসরূপী জীব দ্বারা কৃত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে ও সঙ্কল্পে অসৎকে সৎ বলিয়া ধারণা হয়, তেমনি সম্বিদাত্মাও—যখন বিজাতীয় মনঃসংযোগ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহার পর অসৎকেই সৎ বলিয়া অবধারণ করেন। ফলতঃ তিনি স্বয়ং চিৎপদার্থ বলিয়া শূন্যে শূন্যাত্মক দেহরূপই অবগত হন। মরণান্তে জীববুদ্ধি স্বপ্নের সমানই ভান পাইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি তাহাই পরলোকরূপে অবলোকন করে; পরন্তু পরমার্থ পক্ষে তাহাতে সত্যতার সম্বন্ধ নাই। মৃত ব্যক্তিকে পুনর্নির্ম্মাণ করিলে কিরূপে পুনঃস্মৃতি সঞ্চার হইতে পারে? আর কিরূপেই বা 'সেই এই' এবম্বিধ প্রত্যভিজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর? পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাশ্রয়ে জাত চৈতন্য শূন্য-মাত্র; তাহা মরণান্তে আর জন্মে না, পরন্তু চিত্তই জন্মাদি বিক্রিয়াময়, আমি এখানে এইরূপে জন্মিয়াছি, এই প্রকার মিথ্যা কল্পনা আত্মাতে চিত্তই করিয়া থাকে। সে তাহার অভ্যস্ত স্বভাব চির দিন ধরিয়া অনুভব করে, তাহাতে স্পষ্ট প্রত্যয়বান্ হয় এবং অনর্থক সত্য বিবেচনা করে। আকাশেই আকাশাত্মা স্বপ্নোপম দৃশ্যাধ্যাসপুরঃসর বারম্বার নিজ জন্ম-মরণ ও জগদনুভব করিয়া থাকে। ব্যষ্টিভাবের অবলম্বনে জাগ্রৎ স্বপ্ন-কালে সন্নিধিমাত্রে বিষয় দর্শন, যাহা স্বাধ্যস্ত কার্য্য করণ, তাহাকে বিষয়ে প্রবর্ত্তনা এবং সুষুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষাবস্থায় সমুদায়ের অভ্যবহার উহা দ্বারাই কৃত হয়। যদি পরমার্থপক্ষে দেখা যায়, তবে নিশ্চিতই কেহ কাহারও অভ্যবহরণীয় নহে এবং কেহই কাহারও অভ্যবহর্ত্তা

নয়। এইরূপ কোটি কোটি জগৎ বিদ্যমান। এই সমস্ত যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন সকলই ব্রহ্ম; আর অপরিজ্ঞাত দশায় সকলই দৃশ্যমাত্র। ফলে, ঐ সকল জগৎ স্বরূপতঃ সৎ নহে। ঐ কোটি কোটি জগতের অন্তরালে ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চক ও চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সেই সেই জীবাভিমত হইয়াই বিরাজমান; ইহারা বিসদৃশভাবে বিরাজ করে না। এই ভূত-সমষ্টিও ব্যবহারদৃষ্টিতে সত্য, আর পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মমাত্র। যিনি বিদিতবেদ্য, তাঁহার দর্শনে যাহা সৎ; যে অজ্ঞ, তাহার দৃষ্টিতে তাহা অসৎ। পক্ষান্তরে চৈতন্যের যত প্রকার ভান, সমস্তই সত্য; অতএব নিখিল ভূতগ্রামও সত্যস্বরূপ। জগৎস্বরূপের সত্যতা কি অসত্যতা, তাহা সত্যসম্বিদ্ দ্বারাই নির্ণেয়। ভগবতী সম্বিদের নিরূপণ সত্যই; তদ্বৈপরীত্য করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। যে বস্তু সম্বিদনুসারে ভান পায়, তাহাতে একত্ব-দ্বিত্বের কথা কি হইতে পারে? দৃশ্যমান নিখিল পদার্থই জ্ঞান-জ্ঞেয়-ভেদে জ্ঞানমাত্রই। ইহা দ্বারাই দৃশ্যপরম্পরার গ্রাস হয় বলিয়া চিদদ্বৈতসিদ্ধিই প্রতিপন্ন হইল। জ্ঞপ্তি অসতী হইলে সেই জ্ঞান, এই জ্ঞেয়মাত্র, এইরূপে দৃশ্যেই পরিসমাপ্ত হইত। পরন্তু তাহা হয় না; কেন না, জ্ঞপ্তি সত্যরূপা; অন্যথা নির্জ্ঞপ্তি-জ্ঞেয়সিদ্ধি অসম্ভব। জ্ঞানই যদি অর্থ, তাহা হইলে জ্ঞপ্তি হইতে এই প্রপঞ্চ পৃথক্-স্থিত নয়; এইরূপে সমস্ত অর্থজ্ঞানাকারে থাকিলে অজ্ঞানবশে দ্রষ্টা নিজ জ্ঞপ্তিস্বভাব হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকেন, ফলতঃ জ্ঞপ্তির নাশ ঘটে না। যাহা জ্ঞান, তাহারই নাম জ্ঞেয়; পৃথক্ জ্ঞেয় সম্ভাবনা নাই। জ্ঞেয় জগদাত্মার বিস্তার—অজ্ঞানজ্ঞানই করিয়া থাকে। পৃথক্‌ভাবে যাহা অসৎ, তাহাও জ্ঞপ্তিভাবে সৎ হইয়া থাকে। এইরূপ সর্গদর্শী তত্ত্ববিদের যে দর্শনাদিসম্পাদক চক্ষুরাদি সর্গ, তাহা জ্ঞপ্তি ব্যতীত নহে। যে সর্গ মূর্খ-জ্ঞান-বিষয়ীভূত, তাহা আমার অবিদিত। প্রবোধবিশিষ্টের নিকট যাহা এক চিন্মাত্র বস্তু, তাহা চিজ্জড়াত্মক জীবের বহু সম্বেদনে বহু সহস্র। অপিচ একই চিন্মাত্র স্বপ্নে লক্ষাত্মরূপে অবস্থিত। পুনর্ব্বার যখন সুষুপ্তিকাল আইসে, তখন সেই লক্ষাত্মাই একমাত্র হইয়া থাকেন। যাহা চিদাকাশে স্বপ্ন-সম্বেদন, তাহাতেই জগৎস্থিতি নিরূপিত; আর যাহা সুষুপ্ত, তাহাই প্রলয়াখ্যায়

অভিহিত। একই সম্বিত্তি স্বপ্নসঙ্কল্পবৎ ভোগ্যাত্মরূপে নর-লক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐরূপে আবার অর্থপরিহীনতা প্রাপ্তিও ঘটে। সমস্তই শুদ্ধ বেদনমাত্র; উহা যেরূপে যখন ভান পায়, তখন সেই সংজ্ঞাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্গাদি সময়ে সর্গসিদ্ধির নিমিত্ত একই সম্বিত্তি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অম্বু. ও পৃথ্বী প্রভৃতি নিখিল পদার্থাকারে ভান পাইয়া থাকে। কেন না, একমাত্র আকাশরূপিণী সম্বিত্তিই ক্ষিত্যাদি নানানামে প্রকট হয়। এইজন্যই জগৎ শূন্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সম্বিদের ভান নশ্বর ও অনশ্বররূপে হয়; ফলে, সম্বিদের নাশ নাই। যাহার নাশ আছে, যাহা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেও বিনাশান্তে সম্বিদ্‌রূপে পরিণত হইতে হয়। তুমি পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে চির দিনই মন দ্বারা গিয়া থাক, এবং সেই সেই স্থানের দৃস্ট, শ্রুত ও অনুমিত অর্থপরম্পরা পরিজ্ঞাত হইয়া থাক, তোমার যে সর্ব্বত্র অপ্রতিঘাত, তাহা সম্বিদ্‌রূপেই হয়; এইজন্য সম্বিদ্ সপ্রতিঘ নহে। যে ব্যক্তি যুগপৎ দৃস্ট এবং শ্রুতার্থ অভ্যাস করে, তাহার যদি পরিশ্রম বোধে প্রত্যাবৃত্তি না হয়, তবে সে অবশ্যই তাহা অধিগত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, যে জন পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে যাইব ভাবিয়া কৃতনিশ্চয় হয়, তাহার গতি সেই দিকেই হইয়া থাকে। পরন্তু তদিতর ব্যক্তি ইতর দিক পরিহার করিয়া দিগন্তরে যায় না। এইরূপে মদবলোকিত ও মৎসঙ্কল্পিত অর্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া যাহার সম্বিত্তি অটলভাবে থাকে, তাহার উভয় অর্থসিদ্ধিই হয়। কিন্তু অন্যত্র অচল সম্বিদের উভয়ই নস্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণ বা উত্তর দিকে যাইব, ভাবিয়া যাহার সম্বিৎস্থৈর্য্য ঘটিয়াছে, তাহারও উভয় সিদ্ধি ঘটে; পরন্তু অপরত্র অচলসম্বিত্তি ব্যক্তির উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে। আমি আকাশে নগররূপ ও ক্ষিতিতলে পশুরূপ ধারণ করিব, এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পনিষ্ঠ ব্যক্তির উভয়ই হয়, উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যখন প্রবোধ উৎপন্ন হয়, তখন সর্ব্ব বস্তুই আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক চিদাত্মরূপে প্রতীত হয়। যে পর্য্যন্ত না প্রবোধোৎপত্তি ঘটে, সেই পর্য্যন্ত সেই পদার্থ নানা সম্বিৎসম্পন্ন সহস্র সহস্র জড়চৈতন্যময় জীবরূপে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হয়। জীবদেহের নশ্বরতা বা অনশ্বরতা যাহাই হউক, তৎপক্ষে এ

সংসার সকল অবস্থাতেই স্বপ্নপ্রায়। শরীরের নাশ হইলেও জীবাত্মা পৃথক্-ভাবে থাকে। এ তত্ত্ব—ম্লেচ্ছদেশে মরণবশতঃ পিশাচত্ব-প্রাপ্ত হইয়া পরে আর্য্যভূমিতে সমাগত কোন ব্যক্তির জীবাত্মার মুখে পূর্ব্বতন গৃহকৃত্যাদি শ্রবণপূর্ব্বক ভূততত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষতই উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহারা ম্লেচ্ছ-দেশে মরিয়াছে, শ্মশানানলে দগ্ধ হইয়াছে, তাহারাও স্ব স্ব বৃত্তান্ত খ্যাপন-পূর্ব্বক জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে, ভূত ও পিশাচাদির কথা সমস্তই একটা কল্পনা মাত্র। ভূততত্ত্বজ্ঞদিগের যে পিশাচাদি দর্শন, তাহা ভ্রমজ্ঞান বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রতিবাদ করা যাইতে পারে না। কেন না, ঐরূপ জ্ঞান তো কেবল তাদৃশ মৃত ব্যক্তি-বিষয়েই ঘটিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিদেশে গিয়া বাঁচিয়া আছে, কৈ তাহার সম্বন্ধে তো কখন ঐরূপ জ্ঞান হয় না। আর এই এক কথা আছে, যদি ভূততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের তথাবিধ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়, তবে তো উহা জীবিত কিম্বা মৃত, উভয়ের সম্বন্ধেই একরূপ হওয়া বিধেয় হইয়া পড়ে। কেন না, জীবিতের ন্যায় মৃত ব্যক্তি বিষয়েও অবিকল ঐরূপই অনুভব হইয়া থাকে। এই জগৎ স্বপ্নবৎ প্রকট হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই অভ্রান্ত। কারণ এ বিষয়ে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রেরই একবাক্যতা পরিলক্ষিত হয়। জগৎকে যাহারা সৎ ও অসৎরূপে অবলোকন করে, তাহাদের মতও পরস্পর প্রতি-ঘাত-বর্জ্জিত। চিৎশক্তি মাত্র সৎ বস্তুবিশেষের গ্রাহক, শুদ্ধ অনুভূতি-রূপে প্রকাশমান এবং স্বয়ং অর্থপরিশূন্য। ফল কথা, চিৎশক্তি নিজে উদাসীন; অথচ সর্ব্বপদার্থরূপেই পরিস্ফুরণশীল। চিদাকাশে যেমন নিখিল জগৎ অপ্রতিঘাত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক ও অপ্রকাশাবস্থায় বিরাজিত, তুমি আত্মানুধ্যানে নিরত হইয়া সেইরূপ ভাবেই বিরাজ কর। মনকে স্থির করিয়া অচল সম্বিৎ যেমন প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ এইরূপ জ্ঞানেরও শীঘ্রই প্রকাশ ঘটিতে থাকে। দেহ, কর্ম্ম, দুঃখ এবং সুখ, এই সকল স্বীয় অদৃষ্ট বশতঃ যেভাবে নিশ্চিত হইয়াছে, হউক, সেইভাবেই থাকুক, তাহাতে কাহার কিরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা? এইরূপে সর্ব্বজগৎ সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, সে জন্য তোমার

হৃদয়ে কোন প্রকার সম্ভ্রম সমুৎপন্ন হওয়া বিধেয় নহে। তোমার সমীচীনরূপে প্রবোধোদয় হইয়াছে; অতএব অকিঞ্চিৎকর ফললাভের জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ কর। অফলোদয় পরিশ্রমে আর প্রয়োজন নাই।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—সর্ব্ববিধ ভাবাভাব স্বরূপ স্বপ্নজ্ঞানাত্মক জগৎ-পরম্পরায় কে বদ্ধ? আর কেই বা মুক্ত? আকাশে যেমন দৃষ্টিবিভা গন্ধর্ব্ব-নগরাদি নানাস্বরূপে পরিস্ফুরিত, এই জগৎস্ফুরণও সেইরূপই। এ জগৎ অনবরত বিপর্য্যাসিত হয়, তথাচ অজ্ঞানবশতঃ ইহা স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই আর্য্যাবর্ত্তের যেমন কালে কালে নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, এই জগৎ তেমনি নিত্যই পরিবর্ত্তনশীল। ক্ষিতি, জল, আকাশ ও শৈলাদিময় অসৎ জগৎ যে কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তখন হইতেই পণ্ডিতবর্গ ক্ষণ, লব ও ত্রুটি প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা যুগকল্পাদির ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। এই অখিল জগৎ যদিও অসৎ, তথাচ স্বপ্নবৎ অনুভূয়মান। যে কালে জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান থাকিবে না, তখন একমাত্র চিৎকেই সর্ব্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আমরা এই একটি জগৎ অনুভব করিতেছি, আকাশে এইরূপ শত সহস্র জগৎ বিদ্যমান। পরন্তু উহারা পরস্পর পরস্পরের অনুভবে অক্ষম। সরোবর, সাগর ও কূপাদি তোয়াধারে বিভিন্নরূপ মণ্ডূকাদি জলজন্তু লক্ষিত হইয়া থাকে; পরন্তু উহারা কখন স্ব স্ব অবাসাতিরিক্ত জলাশয়সত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এক গৃহে শত ব্যক্তি শয়ন করিল, সকলেই স্বপ্ন দেখিল ; সে স্বপ্নে শত জনের দৃষ্টিতেই শতপ্রকার নগর প্রতিভাত হইল। এইরূপে আকাশেই শত শত জগৎ বিদ্যমান। সেই সকল জগৎ স্ব স্ব আশ্রিত ব্যক্তির অনুভবে সৎ, আর তদিতরের অনুভবে নয় বলিয়া অসৎ। যেমন এক-ভবন-সুপ্ত শত জনের স্বপ্নে শতপ্রকার নগর শোভিত হয়, তেমনি জগৎও আকাশে সৎ, অসৎ, উভয়রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আত্মা চিৎ, কেবলই প্রকাশস্বরূপ ; দৃশ্য বা জগৎ আত্মারই অবয়বস্বরূপ ও আত্মা হইতে অভিন্ন। জগতের রূপ আছে ; আত্মার রূপ নাই। জগৎ সকারণ ; আত্মা কারণবিহীন। জগৎ দৃশ্যাকারে পরিণতি প্রাপ্ত আর চিদাভাস-ব্যক্তিযোগে চিৎস্বভাবগত বুদ্ধিরই সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বুদ্ধিপ্রভাবে জড় দেহের যে কোন পৃথক্ সংস্কার হয়, তাহা নহে। সঙ্কল্পিত বস্তুর অনুভবব্যাপারে স্মৃতিই অপূর্ব্বরূপে উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়া স্বপ্ন হইয়া থাকে। জন্মান্তরের [illegible] যে সংস্কার, সেই সংস্কারবশেই [illegible]য জাগ্রৎসর্গাত্মক জগৎ, ইহাও [illegible] চিৎ কেবল প্রকাশস্বরূপ ও [illegible] নাই। শাস্ত্রবাক্যের নির্দ্দেশ [illegible] এই নির্দ্দেশ অনুসারে স্থির [illegible]হা পূর্ব্বেও এইরূপই প্রতিভাত ছিল। কাজেই এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে একেবারেই অভিন্ন। কার্য্য ও কারণ এই উভয়রূপেই পরমাত্মা উক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কারণরূপে থাকেন ; পরে কার্য্যরূপে পর্য্যবসিত হন। কার্য্যের যে একটা সংস্কারধারা, তাহাই কারণরূপে কার্য্য সম্পাদন করে। এই নিমিত্ত পরমাত্মাকেই কার্য্যানুকূল প্রযত্নরূপ সংস্কার বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্বপ্নাদিতে যে জাগ্রৎপদার্থরূপ অর্থ দৃষ্টান্তরূপে প্রকট হয়, তাহাই—সেই সূক্ষ্মার্থই সংস্কারাখ্যায় নিরূপিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন বাহ্যার্থই চিত্তে নাই। স্বপ্নাবস্থায় অবলোকিত সংস্কাররূপ পদার্থ জাগ্রদবস্থায় অনবলোকিত হয় ; এজন্য উহার অভাব অবগত হওয়া উচিত নহে ; কেন না, চিত্তাকাশে চেতনার ন্যায় নিয়তই উহা বিদ্যমান।

ভ্রম সংশোধন।

[illegible] সংখ্যায় পত্রাঙ্ক ৫৯৭ পরিবর্ত্তে ৫৯৫ হইবে।

আকাশবৎ নিরাকার আত্মা স্বপ্নে সাক্ষিরূপে বিরাজ করে, আর জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট পদার্থবৎ বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। যিনি সেই বেদান্ত-বিশ্রুত অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি পূর্ব্বসিদ্ধ দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত হইয়া যথাবস্থ স্ব স্ব-ভাবে বিরাজ করেন। এই কারণ সুধীগণ শিষ্যদিগকে পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বাজ্ঞাত পরমাত্মাই সংসার, আর বিজ্ঞাত ব্রহ্মই মোক্ষ। স্বপ্নদশায় যে জাগ্রৎসংস্কার পরিদৃষ্ট হয়, উহা একটী জাগ্রদনুভবকৃত অপূর্ব্ব পদার্থ; তাই তত্ত্বজ্ঞগণ উহাকে অজাগ্রৎ, অপিচ জাগ্রৎ বলিয়াই নিরূপণ করিয়া থাকেন। পরন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? কেন না, পবনে যেমন নৈসর্গিক বেগবত্তা, তেমনি চিত্তেও ভাবসমষ্টির স্বাভাবিক অবস্থান। উহারা স্বপ্ন-দশায় আপনা-আপনিই প্রবৃত্ত হয়। এ ব্যাপারে সংস্কারের কর্ত্তৃত্ব-স্বীকার কেন? একই চিৎ—তিনিই স্বপ্নে লক্ষ লক্ষ স্বরূপে বিরাজ করেন। স্বপ্নাবস্থায় লক্ষরূপী হইলেও সুষুপ্তিদশায় তিনিই আবার একই রূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন। চিত্তাকাশে স্বপ্নজ্ঞানই জাগ্রদাখ্যায় অভিহিত। যাহা সুষুপ্তি, তাহারই নাম প্রলয়। এতাবতা পরমাত্মাই যে সৎপদার্থ, একথা নিঃসন্দেহ। একই চিদাকাশ স্ব স্ব রূপ পরিহার না করিয়াই যে স্বপ্নবৎ বহুধা সাকাররূপ ধারণ করে, তাহারই নাম জাগ্রৎ। এইরূপে যিনি সেই পরমাণুবৎ সূক্ষ্মস্বরূপ চিৎ, তাঁহারই অন্ত-রালে এই নিখিল জগৎপদার্থ বিরাজিত। স্বপ্নদশায় কিম্বা দর্পণান্তরে যেমন নদ-নদী-বন-ভূধরাদি নানা বস্তু বিভাত হয়, চিদন্তরালে জগৎ-স্থিতিও সেইরূপই। ঐ চিৎ স্বয়ং অপরিণামিনী, পরিপূর্ণা, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপিনী, পরমাণুবৎ সূক্ষ্মা, জ্ঞানস্বরূপে বিরাজমানা এবং আদি, মধ্য ও অন্ত-বিরহিতা। ইহারই নাম জগৎ; সুতরাং এই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত চিদাকাশের সহিতই জগদ্‌ভান সর্ব্বতোভাবে সম্বদ্ধ; অতএব এ জগৎ ঐ চিৎ হইতে অভিন্ন। সমগ্র ভুবন চিৎস্বরূপ এবং 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি নিখিল জাগতিক পদার্থও চিদনতিরিক্ত। এই প্রকার গুরূপদেশ ও শাস্ত্র-বাক্যানুসারে এই জগৎকে অজ ও পরমাণুগর্ভে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। এই জন্যই বলা হয়, আমি বা আত্মা

পরমাণুস্বরূপ ও সমস্ত জগদাকারে পর্য্যবসিত। আমি কোথায় না আছি? এমন যে সূক্ষ্ম পরমাণুগর্ভ, তাহারও গর্ভে আমার অধিষ্ঠান। আমি চিৎস্বরূপ পরমাণুপদার্থ; ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও আকাশবৎ কোথায় না আমার ব্যাপ্তি আছে? আমি সর্ব্ব জগদ্ব্যাপী। সুতরাং সকল প্রকার অবস্থাতেই আমি ত্রিভুবনের দ্রষ্টা বা সাক্ষিস্বরূপ। দুইটা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জল আছে; উভয় স্থানের জল একত্র আনয়ন কর; উহা এক হইয়া যাইবে। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইলে আমি, তুমি, ইত্যাদি নিখিল পদার্থই একমাত্র ব্রহ্মরূপে ভান পাইয়া থাকে। এই সকল কথার পর তাপস বলিলেন,—আমি ঐ সময় সেই তেজোময় ব্রহ্মমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া তাঁহার অনুভবস্বরূপ ত্রিজগদাকারে অবস্থিত হইলাম। আমার সেই অবস্থান তখন পদ্মাভ্যন্তরস্থ বীজস্থিতির ন্যায় হইল। আমি সেইরূপে পরমাত্মার অভ্যন্তরেই অবস্থিত হই। তদ্বহির্ভূত কোন পদার্থের সহিতই কখন আমার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। স্বপ্নই হউক, জাগ্রৎই হউক, যে অবস্থায় যাদৃশ বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ দৃশ্য ভান পায়, উহা স্বচিত্তেরই ভান মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় জীবের যে আনন্দময় জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা অণুভূত চৈতন্যস্বরূপ আত্মারই তাদৃশ স্ফুরণমাত্র বৈ আর কিছুই নহে।

ব্যাধ বলিল,—সত্যই যদি এই জগৎ কারণবিহীন হয়, তবে ইহার সত্তা হইল কিরূপে? কেন না, যাহার কারণ নাই, তাহার তো সত্তা দেখা যায় না। আর যদি উহার অকারণত্বই প্রতিপন্ন হয়, তবে স্বপ্নদশায় সেই সেই কারণের অভাব সত্ত্বেও সৃষ্ট্যাদিসম্বন্ধীয় জ্ঞানের আবির্ভাব হয় কিরূপে?

তাপস কহিলেন,—প্রথমতঃ কারণ ব্যতিরিকেই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হয়; কেন না, ঐ সময় সৃষ্টিরূপে পর্য্যবসিত চিদাকাশ ব্যতীত অপর কোন কারণেরই অস্তিত্ব থাকে না। এ সংসারে অকারণে ভাবপদার্থসমষ্টির একান্তই অসম্ভাবনা; তাই কখন কোন প্রকার সপ্রতিঘ সৃষ্টিও সম্ভবপর হয় না। যিনি ভাস্বর চিন্ময় ব্রহ্ম, তিনিই এই জগদাকারে আভাত হইয়া থাকেন। তাঁহার আদি অন্ত নাই,

তথাচ তিনি সৃষ্ট্যাদি নানানামে নিরূপিত হন। এইরূপে অকারণ ব্রহ্ম যখন সৃষ্টিরূপে পরিণতি পান, সেই নিত্য পরমাত্মার অবয়বরূপে এই মায়াময় জগৎ যখন প্রতিভাত হয়, বাস্তব পক্ষে একমাত্র ব্রহ্ম যখন নানা অব্রহ্মরূপে পরিজ্ঞাত হন, যখন সেই কূটস্থ নিরাকার বস্তু সাকার হইয়া প্রকট হন, তখন চিন্ময়রূপতা হেতু স্বপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্মই সাকার বস্তুবৎ প্রত্যক্ষগোচরতা উপগত হইয়া স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ঋষি ও মুনি-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে বিধি, নিষেধ, নিয়তি, দেশ, কাল ও ক্রিয়াদির সৃষ্টি করেন। ভাবাভাবরূপে জ্ঞাতাজ্ঞাত স্থূল সূক্ষ্ম-রূপ চরাচরাত্মক পদার্থপরম্পরা নিয়তই ব্যভিচরিত হয়। পরন্তু নিখিল বস্তুর পর্য্যবসান না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়তি কদাচ ব্যভিচরিত হয় না। এইরূপ নিয়তি কল্পনা যে পর্য্যন্ত আছে, সিকতা হইতে তৈলোৎপত্তির অসম্ভাবনার ন্যায় তদবধি কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব বলিয়াই নিরূপিত হয়। নিয়তি ও নায়ক, ইহারা ব্রহ্মের অংশদ্বয়স্বরূপ ;—স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত। যেমন এক হস্ত দিয়া হস্তান্তর নিয়মিত করা হয়, ব্রহ্মও তেমনি উহাদের একের সাহায্যে অপরের নিয়মন করিয়া থাকেন। জলে জলাবর্ত্ত সকল যেমন আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়, জীবের জাগ্রৎস্বপ্নাদি ব্যাপারপরম্পরাও তেমনি কাকতালীয়বৎ অনিচ্ছা ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিয়তির অসত্তায় কার্য্যও প্রতিহত হইয়া যায়। নিয়তি নহিলে ব্রহ্মও ক্ষণেকের তরে তিষ্ঠিতে পারেন না। সর্ব্বপদার্থেরই ক্ষয়াগম ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বলা যায়, সমস্ত দৃশ্য পদার্থই স্ব স্ব কারণ সহ সতত বিদ্যমান আছে। যাহার সৃষ্টিতে যে কাল হইতে নিয়তি কল্পনা করা হইয়াছে, নিয়তি তদুপরি প্রভুত্ব বিস্তার সেই কাল হইতেই করিয়া আসিতেছে। এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধজ্ঞান অজ্ঞের নিকট ভ্রম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতের সৃষ্টি যদিও কাকতালীয়ের ন্যায়, তথাচ ইহা বরাবর যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেরূপভাবে চলিতেছে না ; এইরূপ ধারণাই নিয়তিনামে নির্দ্দিষ্ট। জন্য-পদার্থপরম্পরার একটা পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম দেখা যায় ; তদ্দর্শনেই উহা-দিগকে অবশ্য সকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জীবের

যে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি জ্ঞান হয়, তাহা কখন অকারণ হওয়া সম্ভবপর নহে। স্বপ্নাবস্থায় সর্ব্ব পৃথিবী ব্যাপিয়া জলক্ষোভ দেখিলে যে একটা প্রলয় ভ্রম আবির্ভূত হয়, সে সম্বন্ধে কারণ অনুভব কর। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, নিখিল বস্তুতেই তাঁহাদিগের ব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চের ঐক্যবিধায়ক যুক্তিপরম্পরা পরিস্ফুরিত হয়। এইজন্য সর্ব্বপ্রমাণের জীবনস্বরূপ শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তির ভাবনানুভবই শ্রেষ্ঠরূপে অঙ্গীকৃত হয়।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—জীব বহিঃস্থ ইন্দ্রিয়বর্গ ও আন্তর ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যথাক্রমে বাহ্যস্বপ্ন ও আন্তর স্বপ্নের অনুভব করে। উভয়দিকের অতি তীব্র সম্বেদসম্পন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে জীবের উভয়ানুভব হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়নিচয় যে কালে বহিঃসমাকুলভাবে অবস্থিত হয়, তখন সমস্ত সঙ্কল্পিতার্থই কিঞ্চিৎ অস্ফুটাকারে অনুভূত হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্মুখ হয়, তখন জগতের অতি সূক্ষ্ম বাসনাস্বরূপ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে জীবেরও অতি স্পষ্টানুভব হয়। বাহ্য জগৎ বা আন্তর জগৎ, কাহারই কখন স্থূলরূপাবস্থা হয় না; জীবের জ্ঞান-কারণ ইন্দ্রিয়বর্গের স্থৌল্য কল্পনা হয় বলিয়া যে স্থূল জ্ঞান জন্মে, তাহাতেই জগৎ স্থূলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞানকারণীভূত ইন্দ্রিয়-বর্গ যখন একান্ত বহির্ম্মুখতা উপগত হয়, তখন জীবভাবোপগত চিৎ স্থূল বাহ্য জগৎ অনুভূতিগোচর করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাগাদি; পঞ্চ বায়ু—প্রাণাদি এবং ইচ্ছাপ্রধান অন্তঃকরণ ও চিদাভাস, এতৎসমস্ত সম্মিলিতভাবে জীবাখ্যায় উক্ত হইয়া থাকে। চিদাভাস জীব আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; উহা সর্ব্বদা

সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপিয়া বিরাজিত; তাই সকল সময়ের জন্যই বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্ববিধ জগতের অনুভবে জীব সমর্থ হইয়া থাকেন। অতীব সূক্ষ্ম নাড়ীর অন্তরালগত হইয়া জীব যখন শ্লেষ্মাত্মক অন্নরস দ্বারা আপূরিত হইয়া পড়েন, তখন সেই সেই সূক্ষ্ম নাড়ীর অন্তরালেই তাঁহার বিবিধ বিচিত্র ভ্রম অনুভূত হইয়া থাকে। তৎকালে জীব বুঝিতে থাকেন, যেন তিনি ক্ষীরাব্ধিমধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছেন; গগনে চন্দ্রোদয় হইয়াছে; সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল পদ্ম ও কহ্লারদলে উদ্ভাসমান হইতেছে; উহারা যেন পুষ্পমেঘের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া মধুকর-নিকরোপগীত বসন্ত-ভূপতির অন্তঃপুরবৎ জীবাকাশে সমুদিত হইয়াছে। তিনি অজ্ঞানময় নানা উৎসব অবলোকন করিতে থাকেন; দেখেন—যেন ভোক্ষ্য ভোজ্য ও পেয়াদি দ্বারা গৃহাঙ্গন পূর্ণ রহিয়াছে; ভবনোল্লাসিনী অঙ্গনাগণ ক্রীড়ারত হইয়াছে; তাহাদের দ্বারাই ঐ সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। জীব দেখিতে থাকেন, যেন যৌবনগর্ব্বিতা যুবতীগণের ন্যায় তরঙ্গিণী সকল বিলাস-বিভ্রম সহকারে সরিৎপতির দিকে ছুটিয়াছে। বিবিধ জলজ পুষ্প-পরি-শোভিত ফেনপুঞ্জ যেন উহাদের হাস্যরাশি এবং চটুলতম শফরীবৃন্দ যেন নেত্রনিচয়। এতদ্ভিন্ন সুধাবিধৌত বহুল সৌধমালা তাঁহার নেত্রগোচর হইল। উহারা যেন হিমালয়োপম ধবলশিখরশালী, অতীব শীতল ও চন্দ্রময় কুট্টিমনিচয়ে নির্ম্মিত। তিনি নলিনীলতা-জড়িত কত দূর্ব্বাদল-শ্যামল ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। ঐ সকল ক্ষেত্র শিশিরাসারে পরিষিক্ত এবং হৈমন্তিক ও বার্ষিক বারিধর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। দেখিলেন—কত উপবন ভূমি আছে; সে সকল বিবিধ পুষ্পপরিকীর্ণ, মৃগগণরূপ অতিথি-বৃন্দের বিশ্রামস্থলী এবং স্নিগ্ধ পত্র-পরিব্যাপ্ত তরুনিকরের ছায়াশীতল। দেখিলেন—কত পুষ্পস্থলী শোভা পাইতেছে; উহারা কদম্ব, কুন্দ ও মন্দারসমূহের চন্দ্রাভ ধবল মকরন্দযোগে মণ্ডিত; তাই বিচিত্র বর্ণশালী আসনবৎ পরিশোভিত। নৃত্যকারিণী যুবতী রমণীর ন্যায় কৃশাঙ্গী, মালতী-লতা, সুন্দর চামর, ভৃঙ্গসার ও চন্দ্রাতপ সহস্র সমুল্লসিত, উৎফুল্ল শ্বেত নলিনীনিভ কত রাজসভা, লতাবলয়ের সবিলাস বিন্যাসবশে শোভিতা—বিলোল কুল্যাজলচারী জল-বিহঙ্গকুলের কলকাকলীপূর্ণা বনশ্রেণী এবং

সজল-জলদমালা-পরিবৃত পর্ব্বতরাজিরাজিত সীকর-নীহারহার-মণ্ডিত সর্ব্ব-দিক্। এ সকলও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। জীব যখন পূর্ব্বোল্লিখিত রীতি অনুসারে পিত্তরসভরে পরিপ্লুত হয়, তখন তেজঃ-প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মাকারে তাদৃশ পিত্তপ্রধান সূক্ষ্ম শিরার মধ্য দিয়া নিম্নবর্ণিত এই এই রূপ দৃশ্যাবলী দেখিতে থাকেন; যথা—অগ্নিশিখা সকল ধূ ধূ জ্বলিতেছে; উহারা সংশুষ্ক কিংশুক দ্রুমের ন্যায় শোভিত এবং উজ্জ্বল পদ্মদল সদৃশ স্নিগ্ধ। সন্তপ্ত বালুকারাশিতে জলসেক নিবন্ধন দিঙ্মুখ সকল বাষ্প-সমাচ্ছন্ন; উহারা সরিৎরূপ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত; এবং দাবানল-রাশির শিখা-সমুত্থিত শ্যাম ধূমস্তোমে শ্যামলতা প্রাপ্ত। অগ্নিপ্রতিম কর্কশ-শাণিত চক্রধারবৎ তীক্ষ্ণপ্রভ কত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রভা জলাশয়সমূহকে দাব-দাহবৎ আবৃত করিয়াছে। স্বীয় অভ্যন্তরগত উষ্মা দ্বারা খিন্ন হইয়া এই ত্রিলোকমণ্ডলী সমুদ্রসমূহকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তরুগুল্ম-লতাদির নিবিড়তাময় গহন অরণ্য হইতে যেন ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছে। প্রবাহ-চলিত মরীচিকাসলিলে সারসকুল সন্তরণ করিতেছে। বনস্থলী সকল বৃক্ষবিহীন হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ববৎ পরিলক্ষিত হইতেছে। পান্থ জন সবেগে যাইতে যাইতে দূর হইতে পথি মধ্যগত স্নিগ্ধচ্ছায়-তরু-কুঞ্জকে পীযূষবৎ জ্ঞান করিয়া উত্তপ্ত ধূলিজালে ধূসরিত হইতেছে। সমগ্র ভুবন অগ্নিপরিবৃত, উত্তপ্ত ও উত্তাপজর্জ্জরিত হইতেছে। দিক্ ও আকাশ-মণ্ডলের সর্ব্ব প্রদেশ ধূলিজালে ভরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই গ্রাম, গুহা, গিরি, সাগর, বন ও আকাশ অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নিবর্ণ অনন্ত মেঘমালা আকাশে উত্থিত হইয়াছে। শরৎ গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল সৌর উত্তাপ প্রখর করিয়াছে। সমস্ত বনভূমি তৃণ, পত্র, লতা, পদ্ম এবং উষ্মা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অম্বরতল যেন স্বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও বহু সরসী-সমলঙ্কৃত হিমশৈল দেশ, সকলই উত্তপ্ত হইয়াছে। জীব যখন পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লেষ্মা ও পিত্তরসরহিত নাড়ী-পথে প্রবেশ করিয়া বায়ু দ্বারা পরিপূরিত হন, তখন সেই সূক্ষ্ম নাড়ী-মধ্যে নিম্নবর্ণিত এই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে থাকেন। বায়ু দ্বারা চেতনা বিক্ষুব্ধ হইয়া গেলে বসুধাতল অদৃষ্ট বলিয়া প্রত্যয় হয়। গ্রাম,

নগর, নদ, সাগর ও বনভূমি সকল অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ ধারণ করে। মনে হয়, নিজেই যেন উড়িয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলা ও শৈল-ভূমিগুলিও উড়িতেছে। যেন গভীর মেঘগর্জ্জনে সর্ব্ব স্থান পূর্ণ হইয়াছে। জীব তখন মনে করে, আমি কখন অশ্বে, কখন উষ্ট্রে, কখন গরুড়ে, কখন মেঘে এবং কখন বা হংসে চড়িয়া বেড়াইতেছি; কখন বা সেই সেই বাহন হইতে অবতরণ করিতেছি। যেমন যক্ষ ও বিদ্যাধরাদি গমনাগমন করে, তেমনি আমি বেড়াইতেছি। সাগরে যেমন বুদ্বুদাবলী কাঁপিয়া উঠে, তেমনি গিরি, গগন, পৃথ্বী, সাগর, পাদপ, গ্রাম, নগর, দিঙ্মণ্ডল ও ভয়বিত্রস্ত প্রাণিগণ সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে। জীব কখন কখন নিজেকে অন্ধকূপে, কখন বা ভীষণ সঙ্কটে পতিত দেখে; আবার কখন কখন বা নভোদেশে, কখন কখন বৃক্ষাগ্রে, এবং কখন বা গিরি-সমারূঢ় দর্শন করে। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম সমন্বিত জীব যখন বায়ুর বশতাপন্ন হইয়া শ্লেষ্মাদি-রসভাগ দ্বারা পরিপূরিত হয়, তখন তাহার বিকৃতি প্রাপ্তি ঘটে; সে নিম্নবর্ণিত এই এই রূপ দৃশ্যাবলী দেখিতে থাকে। দেখে, আকাশ হইতে অনবরত যেন শিলাবৃষ্টি হইতেছে; শিলাবৃষ্টিবশে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে বৃক্ষাবলী স্ফুটিত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে। সিংহ, গজ ও বর্ষার মেঘ-পরিব্যাপ্ত দিঙ্মধ্যভাগে নিবিড় বনাবলী ভ্রমণ করিতেছে। উহাদিগকে উৎকট মেঘমালা বলিয়া ভ্রম হইতেছে। তাল, তমাল ও হিন্তালমালা জলনাবৃত হওয়ায় দিঙ্মধ্যস্থলে ভোঁ ভাঁ ও ঘর্ঘরাদি বিবিধ শব্দ হইতেছে। গজগণ পরস্পর সংঘট্টনে ঘট্টিত হইয়া সমুদ্র-মন্থনকালীন মন্দরাদ্রির ন্যায় গুরুগম্ভীর ধ্বনি করিতেছে। নদীনিচয় গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের সংঘট্টবৎ ভীষণ রব করিতেছে, চক্রবাকাদি বিহঙ্গের কেকারবে কর্কশ হইয়াছে এবং মুক্তাসন্নিভ সীকরাসার-ক্ষেপণে নভস্তল যেন পুষ্পমালায় মণ্ডিত করিতেছে। প্রলয়ের উদ্বেল মহাব্ধি শিলাখণ্ড-ব্যাপ্ত জলরাশি দিয়া অম্বরতল আপূরিত করিতেছে। ত্রিজগৎ যেন পরস্পর বিধৌত দশদিকের দর্শনে দন্ত বাহির করিয়া হাসিতেছে; দিগন্তপূরক চটচটারবে পর্ব্বতকটক স্ফুরিত হওয়ায় টঙ্কাঘাত-রবাকুল আকাশপথে প্রবহমাণ বায়ুকম্পিত বাতানুগত লতাসমূহে সমাকীর্ণ

হইয়াছে এবং স্বয়ং সমাগত প্রস্তরচূর্ণ দ্বারা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইভাবে ঐ জগত্রয় যেন সাগরমন্থনের পূর্ব্বকালে পরস্পর-বিমর্দ্দী দেবাসুর-বীরবৃন্দের গভীর গর্জ্জনবৎ ঘোরনাদে পরিপূরিত হইয়াছে। জীব ত্রিধাতুপূর্ণ নাড়ীমধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে স্বপ্নে বায়ুবশে জড়ীকৃত হইয়া পীড়িতাবস্থায় অবস্থান করে। এ যখন ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্র কীটবৎ, শিলান্তর্গত মণ্ডূকবৎ, গর্ভস্থ অপরিপক্ব ভ্রূণবৎ, ফলমধ্যগত বীজবৎ, বীজমধ্যস্থ অঙ্কুরবৎ, দ্রব্যপিণ্ডস্থ পরমাণুবৎ এবং তরুকোষস্থ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পুরীপ্রচয় নাড়ীপঞ্জরে নিরবকাশতা নিবন্ধন প্রাণ পবন জন্য নিষ্পন্দ হইয়া থাকে এবং যে কালে উত্তম উন্নতি প্রাপ্ত পার্শ্বগ্রন্থিরূপ শিলাখণ্ডে নিষ্পেষিত হইয়া বিলমধ্যে নিবদ্ধবৎ সর্ব্বথা নির্ব্ব্যাপারভাবে অবস্থান করে, তখন সেই ঘন তেজোমধ্যে অন্ধকূপের অভ্যন্তরবৎ গভীর গিরিদরীর উদরপ্রায় সুষুপ্তি ইহার অনুভূত হয়। যে কালে ভুক্ত পীত অন্নরস পরিপাক পাইয়া যায় এবং অন্নরসযোগে প্রবেশপদ্ধতির নিরোধরাহিত্যে পুনরায় অবকাশ প্রকাশ পায়, তখন জীব নির্গমব্যাপারে প্রয়াস পাইয়া থাকে এবং তদবস্থায় প্রাণসাহায্যে পরিবোধিত হইয়া স্বপ্নানুভব করে। ঐ অন্নরস যখন দেহে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া জীবসহ এক নাড়ীদেশ হইতে অপর নাড়ীপথে পতিত হয়, তখন পর্ব্বতবৃষ্টি অনুভূত হইয়া থাকে। জীব জঠরানল-পরিব্যাপ্ত বহু বাতপিত্তাদি-যোগে অন্তরে বাহিরে বিবিধ সম্ভ্রম সন্দর্শন করে। জীব উক্ত বাত-পিত্তাদির প্রেরণায় পরিচালিত ও অন্নরস প্রভাবের বশতাপন্ন হইয়া অন্তরে যেরূপ দেখে, বাহিরে ও ঊর্দ্ধে তেমনি জ্ঞান ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বাতপিত্তাদি-ক্ষুব্ধ অন্নরসের পরিমাণ যখন অল্প হয়, তখন অন্তরে বাহিরে অল্প ভ্রমজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাদির পরিমাণ যখন সমান হইয়া উঠে, তখন দৃষ্টিরও সমতা হইয়া থাকে। এই জীব যখন কুপিত বাত-পিত্তাদির দ্বারা পরিবৃত হয়, তখন ভূমি, অদ্রি ও আকাশের কম্পন কিম্বা অগ্নি দ্বারা জ্বলন দেখিয়া থাকে। নিজে ভ্রমণ করিতেছি; চন্দ্রোদয় হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন হিমাচলমালা, বৃক্ষ, শৈলারণ্য ও জলরাশি দ্বারা আকাশাপ্লাবন, এই সকল জীবের দৃগ্‌বিষয়ীভূত হয়। জীব আরও অনু-

ভর করে, যেন সমুদ্রে সে মজ্জনোন্মজ্জন করিতেছে। সুরলোকে গিয়া সুরসুন্দরীদিগের সহিত সুরত সম্ভোগ করিতেছে; এবং শৈলশিখরের উপবনস্থ শুভ্রমেঘময় পীঠোপরি বসিয়াছে। ঐ অবস্থায় কখন বৃহৎ ক্রকচ দ্বারা নিষ্পেষণ এবং কখন বা নরক যাতনা অনুভূত হয়। কখন কখন বা অম্বরে তালী, তমালী ও হিন্তালবনের সঞ্চালন দেখা যায়। কখন চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পতন এবং হঠাৎ আকাশে আরোহণ, এইরূপই জীবের অনুভব হয়। সে অবস্থায় শূন্য প্রদেশে জনসম্মর্দ্দ দেখায় এবং স্থলপথে সাগরমজ্জন অনুভবগোচর হয়। কত কত বিচিত্র বিপরীত ব্যবহার লক্ষ্য হইতে থাকে, মহানিশায় দিবসের ন্যায় সূর্য্যসন্দর্শন ঘটে এবং দিবসে রাত্রির ন্যায় অন্ধকারপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে সশৈলকাননা বসুধা, নিবিড় প্রাচীর-পরিবৃত নিরাবরণ স্থান, গগনে কুড্যবন্ধন এবং শত্রুবর্গে মিত্রভাব অনুভূত হয়। অবস্থায় স্বজনে পরতাবুদ্ধি জন্মে, দুর্জ্জনে সুজন ভ্রম উৎপন্ন হয়, গর্ত্তে সমতলভাব দেখায় এবং সমতল ভূভাগে গর্ত্তোপলব্ধি হইয়া থাকে। সুধাধবলিত, বিচিত্র নবনীতনির্ম্মিতবৎ স্নিগ্ধ শ্বেত স্ফটিক বা রজতময় শৈলসকল পরিলক্ষিত হয়। পদ্মে যেমন ভ্রমরের বিশ্রাম, তেমনি কদম্ব নীপ ও জম্বীর পত্রস্তবকে রচিত গৃহাভ্যন্তরে রমণীসহ সুখ বিশ্রাম অনুভব-গোচর হইতে থাকে। দেহস্থ রসধাতুর বৈষম্যঘটনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিচয় অন্তরে নিদ্রানিমীলিত হয়—হইয়া এই সমস্ত ভ্রমপরম্পরার অনুভব করিতে থাকে। ধাতুবৈষম্যবশতঃ স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশায় এবম্বিধ বিবিধ দর্শন ও অনুভব হয়। জীবসকল অন্তরে বাহিরে যে নানা বিপরীত ও ভীষণ কার্য্যকলাপ দেখে, তাহা ধাতুবৈষম্যেরই ফল; পরন্তু ধাতু সকল যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থিত হয়, তখন এই জীব নিজেই তৈজস নাড়ীর অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া এই ব্যবহারস্থিতি অবিকৃত অনুভব করে। জীব দেখিতে থাকে,—পুর, গ্রাম, পত্তন, অরণ্য, স্বচ্ছ বারি, বৃক্ষচ্ছায়া, দেশ, পথ ও যাতায়াত, সকলই যথাস্থিতভাবে রহিয়াছে। এই ভূমণ্ডল সুখ, সৌরাতপ, সূর্য্য, সুধাকর, নক্ষত্র এবং অহোরাত্র দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া সম্ভূতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চিত্ত যখন দৃশ্য বস্তুর উপলব্ধিরূপে পরিণত হয়,

তখন পবনে স্পন্দাস্পন্দতির ন্যায় অসৎ সত্তর এবং ভিন্ন অভিন্নের ন্যায় অনুভূতি হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ; তাঁহা হইতেই এই সমগ্র জগতের আবির্ভাব। ব্রহ্ম ব্যতীত পদার্থান্তরের নিষ্প্রপঞ্চ-স্বরূপতা নাই। অতএব অনন্ত চিতের যে আকাশোপম অবয়ব, তাহাতেই নানাবিধ জগৎ মাত্র প্রতিভাসরূপে ভান পাইতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—মুনিবর! আপনি যখন সেই ভ্রান্তিরূপী তেজোমধ্যে নামমাত্রে স্থিতি প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপনার কীদৃশ স্বপ্ন-দর্শনাদি ঘটিয়াছিল?

মুনি কহিলেন,—ব্যাধবর! আমি যখন তেজোমধ্যে নিষণ্ণ হইলাম এবং তাহার জীবে আমার দেহ যখন মিশিয়া গেল, তখন হইতে যাদৃশ স্বপ্ন-দর্শনাদি ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করিতে থাক। সেই যখন ঘোর প্রলয় সম্ভ্রম প্রকট হইল, প্রলয়কালের পবনে যখন অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলেন্দ্রকুল তৃণবৎ সঞ্চালিত হইতে লাগিল এবং আমি যখন সেই তেজো-ধাতুর অন্তরালে রহিলাম, তখন কি জানি কোথা হইতে একটা পর্ব্বতবৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘবৎ বিশাল শৈল সকল গ্রামপত্তন সহ উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমি যখন সেই তেজোধাতুর অভ্যন্তরে তদীয় অতীব সূক্ষ্মরূপস্থ জীবাত্মা সহ একীভূত হইয়াছিলাম, তখন তথাবিধ পর্ব্বতবৃষ্টি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম নাড়ীমধ্যগত অন্নরসের অভ্যন্তরস্থ অন্নকণাই যেন উচ্চ গিরি; তাহাতে আমার দেহ পিণ্ডীকৃত হইল; আমি নিশ্চেষ্ট হইলাম। অনন্তর অজ্ঞানান্ধতা-জড়িত প্রগাঢ় সুষুপ্তি আমার অনুভূত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল ঐরূপ সুষুপ্তির অনুভূতি হইলে ক্রমে আমি প্রবোধোন্মুখ হইলাম। আমার সেই বোধোন্মুখতা উষাকালে পদ্মাকরের বিকাশোন্মুখতার ন্যায় হইয়াছিল।

দৃষ্টি যেমন দীর্ঘকাল অন্ধকারে নিমীলিত হইয়া রহিলে একটা তেজোময় চক্রাভাসরূপে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি সুষুপ্তি তখন স্বপ্ন সময়ে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে আমি সুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে ক্রমশঃ স্বপ্ননিদ্রায় প্রবিষ্ট হইলাম—হইয়া সেই ওজোমধ্যে বিক্ষেপসহস্র সন্দর্শন করিলাম। এ বিষয়ে সমুদ্রের সহস্র সহস্র তরঙ্গাকুল স্বস্ফূর্ত্তি-পরিদর্শনই উপমাস্থল। স্থির পবনের অভ্যন্তরে স্বতঃসিদ্ধ স্পন্দন যেমন সন্নিবিষ্ট থাকে, তেমনি তখন জগৎ আমার জ্ঞানময় কোষাত্মক হইয়া অন্তরে উপনীত হইল। অগ্নিতে উষ্ণতা, জলাদিতে দ্রবতা ও মরীচাদিতে তীব্রাস্বাদ যেমন স্বতঃপ্রবিষ্ট, চিদাকাশের অন্তরে এই জগৎও সেইরূপই ভাবে অবস্থিত। তখন সুপ্তাত্মক দৃশ্য হইতে প্রসূত এই জগৎরূপ দৃশ্য চিৎস্বভাবসহ একইরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

ব্যাধ বলিল,—হে বক্তৃবর! আপনি যে সুষুপ্ত দৃশ্যের উল্লেখ করিলেন, উহা কি প্রকার, আমার নিকট ব্যক্ত করুন। এই সুষুপ্তাত্মক দৃশ্য বা সুষুপ্তি হইতেই কি বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়? কিম্বা অন্য কোন সুষুপ্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে?

তাপস কহিলেন,—জাগ্রদবস্থাতেই ঘটাদি ও জগদাদির প্রতীতি ও স্ফূর্ত্তি হয়; দ্বৈতবাদিগণের ইহা একটা কল্পনাত্মক প্রলাপমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। জাত শব্দ সৎ বা বিদ্যমান মাত্রেরই পর্য্যায়ভুক্ত; কেন না, পাণিনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণ জনি—জন ধাতুর প্রাদুর্ভাবার্থই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাদুর্ভাব পদটী ভূতধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ভূধাত্বর্থ—সত্তা বা বিদ্যমানতা; কাজেই যাহা বিদ্যমান, তাহাই জাত বলিয়া নিরূপিত। সৃষ্টি হইতে জাত বলিলে প্রকারান্তরে সৃষ্টিকেও সদ্বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু অস্মদ্বিধ পণ্ডিতবর্গের চক্ষে কোন বস্তুরই উৎপত্তি বা সংহৃতি নাই; সমস্তই শান্ত, অজ এবং অবিনাশী। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ সত্তাস্বরূপ এবং এই জগৎও সর্ব্বসত্তাত্মক। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মপদে সমস্ত বস্তুর 'অস্তি' 'নাস্তি' এই বিধি-নিষেধের অবকাশ কিরূপে হওয়া সম্ভবপর? অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি এই রূপই হয় তবে 'অস্তি' 'নাস্তি' এই দুই বিধি-নিষেধের ব্যবহার স্থল কৈ? এ কথায়

উত্তর এই যে, মায়ানামে যে একটা বস্তু আছে, 'অস্তি' 'নাস্তি' এইরূপ বিধি-নিষেধ ব্যবহার তাহাতেই হইয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞ পুরুষ, ব্রহ্ম বলিয়া ভান সেই মায়াশক্তিতেই তাহাদের হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ আছে; পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহার কোন কিছুই তেমন নাই। সৃষ্টির আদিম অবস্থায় জগতের যেমন কোনই রূপ থাকে না, তেমনি অনুভূতিমাত্রস্থ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প-প্রবাহের বস্তুগত্যা কিছুই নাই, এই স্বপ্নসৃষ্টির দর্শক হওয়া প্রাণাদি-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু যখন সৃষ্টির আদি—যখন প্রাণাদির উৎপত্তি হয় নাই, তখন আকাশাপেক্ষাও নির্ম্মল একমাত্র সেই শুদ্ধ চিন্মাত্রই থাকেন। বাস্তবিক দ্রষ্টা বা ভোক্তা কেহই এ জগতে নাই; কেন না, এ জগতের যে কিছু বস্তু, সমস্তই চিৎস্বরূপ। সৃষ্টির আদিম অবস্থায় কারণাভাব বশতঃ যাহা কিঞ্চিৎ অথচ অকিঞ্চিৎ, যাহা বাগতীত, অথচ নির্ব্বাক্, সেই চিন্ময় পদার্থে স্বপ্নাবস্থাকল্পিত কামিনী-জনবৎ যে বস্তু যেরূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, সৃষ্টি হইবার পর আপ্রলয় সেইরূপেই তাহা বিরাজ করে। অবোধ বালকই নিজাঙ্কগত ব্যাঘ্রাদির চিত্র দর্শনে ভীত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অবশ্য তাহাতে ভীত হয় না। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বলা যায়, উল্লিখিত চেতনাত্মক দ্বৈত হইতে অজ্ঞ লোকেরাই ভীত হয়; কিন্তু জ্ঞানীদিগের উহা হইতে ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। ফল কথা, যিনি অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অদ্বিতীয়, শুদ্ধস্বভাব, প্রকাশাত্মা, অবিকারী ব্রহ্ম, তিনিই যখন মায়ার বশে নানারূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন এই সমগ্র জগৎ হউক না অশান্তি-পূর্ণ, তথাচ শান্তিময়রূপেই প্রতিভাত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

তাপস কহিলেন,—হে মহাভুজ ব্যাধ! আমার যখন সুষুপ্তাবস্থার অবসান ঘটিল, তখন স্বপ্নদশায় সহসা এই দৃশ্যমান জগজ্জাল যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে বহির্গত হইল; যেন আকাশাবয়ব হইতেই উৎকীর্ণ হইল, যেন ভূতল হইতে খোদিত হইয়াই প্রকাশ পাইল; অথবা পাদপ হইতে পুষ্পোদ্গমের ন্যায় যেন চিত্ত হইতেই প্রকট হইল, কিম্বা যেন সৃষ্টি হইতেই বহির্নিষ্ক্রমণ করিল। সেকালে আমি এইরূপ প্রতীতিরই আশ্রয় হইলাম। এই দৃশ্য জগৎ যদিও পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, তথাচ তৎকালে আমার নিকট ইহা উৎপন্নরূপেই বিভাত হইল মাত্র। তখন আমার এমনও মনে হইতে লাগিল, যেন প্রবাহপ্রচলিত সলিলরাশি হইতে তরঙ্গততিই প্রাদুর্ভূত হইল। অথবা মনে হইতে লাগিল, ইহা যেন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িল; যেন চারিদিক্ হইতেই প্রকাশ পাইল; যেন পর্ব্বতাবয়ব হইতে উৎকীর্ণ হইল অথবা যেন ভূগর্ভ হইতেই প্রকট হইল। অথবা আকাশে মেঘ, বৃক্ষ হইতে ফল ও ক্ষেত্র হইতে শস্য-সমুৎপত্তির ন্যায় এ জগৎ আমার হৃদয় হইতেই যেন নির্গত হইল। যেন মদীয় অবয়ব-বিশেষ হইতেই উহার নিষ্ক্রমণ ঘটিল। কিম্বা আমার ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাই উহা যেন চারিদিকে উৎকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেমন পট হইতে চিত্র প্রকটন হয়, অথবা যেমন মন্দির হইতে প্রতিমা নিষ্ক্রমণ ঘটে, তেমনি কোন এক অদৃশ্য স্থান হইতেই যেন আকাশপথে আসিয়া উহার হঠাৎ পতন ঘটিল। অথবা ইহ-সঞ্চিত পুণ্যরাশি যেমন লোকান্তরে গিয়া উপনীত হয়, তেমনি উহা মৎসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গবিকাশ হয়, তেমনি ইহা যেন ব্রহ্ম-বৃক্ষের একটা পুষ্প-স্বরূপে প্রকট হইল। কিম্বা যেন খোদকারী শিল্পী ব্যতীত চিত্তরূপ স্তম্ভে একটী পুত্তলিকা প্রাদুর্ভূত হইল। এই দৃশ্য জগৎ আকাশময় মৃত্তিকার অসংখ্য ভিত্তি-বেষ্টিত শূন্য পত্তন। এখানে মন মাতঙ্গবৎ বিলসিত হইতেছে। এখানকার জীবজীবন মিথ্যা। এ জগৎ শূন্যোপরিগত, ভিত্তি-বর্জ্জিত ও রঙ্গরহিত কেমন যেন একটা অদ্ভুত চিত্ররূপে বিরাজিত হইয়া অবিদ্যারূপ

ঐন্দ্রজালিকের অসামান্য নৈপুণ্য ব্যক্ত করিতেছে। ইহা মহারম্ভশালী ও স্থিরপ্রকৃতি; তথাচ ইহাতে দেশ-কালের ইয়ত্তা নাই। ইহা যদিও অগণিত বস্তুপরম্পরায় পরিপূর্ণ, তথাচ অদ্বৈত এবং যদিও ইহা নানারূপ, তথাচ অকিঞ্চিৎ। এ জগতের প্রতি গন্ধর্ব্বনগরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়। ইহা মিথ্যা হইলেও জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয়। এ জগৎ একটা চিত্তস্ফূর্ত্তি মাত্র; যদিও ইহা অনারব্ধ, তথাচ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও সৃষ্টি-সংহারময় আরব্ধ বস্তুবৎ প্রতিভাত। যেমন কদলীতরুর অবয়বের আবরণান্তরালে আবরণান্তর পর পর জড়িত থাকিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাবন করে, তেমনি ইহাও সুরাসুরাদি-লক্ষিত ত্রৈলোক্যোদরে এবং তাহারও উদরে জড়িত রহিয়া অতীব বিচিত্ররূপের প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। দাড়িম্ব যেমন বিভিন্ন কোষজড়িত বীজ দ্বারা পরিপূর্ণ, এই জগৎস্থিতিও সেইরূপই। অতঃপর সমস্ত দৃশ্যমণ্ডলই আমার প্রত্যক্ষ হইল। দেখিলাম,—নদী, নগ, বন, আকাশ ও নক্ষত্রমণ্ডল, সাগরগর্জ্জন, রণবাদ্য ও বেদনাদ এবং সমীরণের বিবিধ ঘর্ঘর রবে সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ। এই সকল বিশেষভাবে দেখিতেছি; ক্রমে আমার সেই পূর্ব্বতন আবাস দৃষ্টিগোচর হইল। আমার পূর্ব্বতন বান্ধবকুল, সেই সেই অপত্য, সেই ভার্য্যা, সকলই আমি দেখিলাম। মহাব্ধিজাত তটাহত তরঙ্গ যেমন তটস্থ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে, তেমনি সেই পূর্ব্বজন্মান্তরীয় গ্রাম্য স্বজাতিদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা সবলে আমার বাসনাকে আকর্ষণ করিল। তদবস্থায় বাসনা-সম্পর্কে আমি সুখী হইলাম। কেন না, যেমন সেই বাসনার সহিত সম্পর্ক ঘটিল, অমনি আমার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইল। সম্মুখে যে বস্তু থাকে, দর্পণ যেমন তাহার প্রতিবিম্বগ্রাহী হয়, স্বভাববশে চিত্তদর্পণও সেইরূপই। যাহার সকল বস্তুতেই চিন্মাত্র গগনরূপ জ্ঞান হয়, তাহার আর দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। সে একা; একাকীই অবস্থান করে। নির্ম্মল বোধময়ী স্মৃতি যাহার নষ্ট না হয়, দ্বৈতরূপ পিশাচ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। অভ্যাসযোগে, সাধু ও সৎশাস্ত্রসেবায় যাহাদের প্রবোধোদয় হয়, সেই বোধ কখন আত্মোদয় বিস্মৃত হয় না। তৎকালে আমার সেই প্রবুদ্ধ বুদ্ধি প্রৌঢ়াবস্থায় ছিল না; তাই উহা

বাসনাহত হইয়াছিল। পরন্তু, অধুনা আর আমার দুষ্ট বাসনাবর্গ এই প্রবুদ্ধ বুদ্ধির বিলোপ-সম্পাদনে সক্ষম নহে। ওহে ব্যাধ! জানিবে,— তোমার বুদ্ধি সৎসঙ্গ বিরহিত রহিয়াছে; তাই বহু কষ্ট চেষ্টা দ্বারাই তোমাকে এই ক্লেশকর দ্বৈতজ্ঞান হইতে মুক্তি পাইয়া শান্তি পাইতে হইবে।

ব্যাধ বলিল,—মুনিবর! আপনার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য; কেন না, ভবদীয় এবম্বিধ পবিত্র প্রবোধবাক্য দ্বারাও মদীয় বুদ্ধি সৎপদে গিয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হইতেছে না। স্বীয় অনুভূত ব্যাপারেও অদ্যাপি সন্দেহ সংশয় নিরাস পাইতেছে না। অহো! এই অভ্যাস-সুদৃঢ়ীকৃতা অবিদ্যা একান্তই দুর্দ্ধর্ষা; কেন না, ইহা শান্ত হইয়াও শান্ত হইতেছে না। সৎশাস্ত্র দ্বারা এবং সাধুদিগের বিচারপদ্ধতিরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবশালী সদ্‌বক্তা দ্বারা বুদ্ধি যাহাদের প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের অভ্যাসবশেই জগদ্ভ্রান্তি নিরস্ত হয়, তদ্ব্যতীত ভ্রম-নিরাসের উপায় কিছুই নাই। এইরূপই আমার ধারণা।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—মুনিবর! এইরূপে যদি সকলই স্বপ্নময় হয়, তবে কোন কোন স্বপ্নের সত্যতা এবং কোন কোন স্বপ্নের বা অসত্যতা হইবার কারণ কি? স্বপ্ন-দর্শনব্যাপারে ইহা আমার একটা প্রবল সংশয় বিদ্যমান।

মুনি কহিলেন,—যে স্বপ্নজ্ঞান—দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যানুসারে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়া কাকতালীয়বৎ সফল হইয়া উঠে, তাহাকে সত্য স্বপ্নরূপে নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্নিহিত স্থানে, প্রত্যূষাদি কালে, দেবারাধনা, তপশ্চর্য্যা এবং ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠানে হবিষ্যাশী ও কুশশয্যাশায়ী হইয়া স্বপ্নদর্শন করিলে

তাহা দৈবাৎ সাফল্য লাভ করে, সেই সফল স্বপ্নই সত্য স্বপ্ন; আর এক প্রকার সত্য স্বপ্ন আছে। সে স্বপ্নজ্ঞান—মণিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতির মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরুষ-বিশেষে নির্দ্দিষ্ট ফল প্রদান করে এবং কোন কোন পুরুষে বা তাহা বিফলও হইয়া থাকে। এ জগতে সত্য স্বপ্নের প্রকৃতি এইরূপই। এখন দেখা যাউক, এই স্বপ্নসাফল্যের কারণ কি? কারণ এ ক্ষেত্রে কাকতালীয় ন্যায় ভিন্ন অন্য কিছুই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। হিরণ্যগর্ভাদির সম্বিৎ প্রাক্তন উপাসনার ফলে আপনাতেই স্থির-নিশ্চয়বতী; উহা যখন যেরূপ নিশ্চয়ের আশ্রয় লয়, প্রাক্তন উপাসনার উৎকর্ষবশে স্বভাবের প্রেরণায় সেই সেই আকারেই পর্য্যবসিত হয়। এ স্থানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, হিরণ্যগর্ভাদির সম্বিৎ যেরূপ নিশ্চয় করে, তাহা তথাবিধ সিদ্ধ পুরুষান্তরের তদ্‌বিরুদ্ধ সত্য সঙ্কল্প দ্বারা ব্যাহত হইতে বাধা কি আছে? এইরূপ আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা যায়, যদি হিরণ্যগর্ভের তাদৃশ সম্বিৎনিশ্চয়ের ব্যাঘাত অপর কেহ জন্মাইতে পারিত, তবে 'আমি জগতের সৃষ্টি করিব' এইরূপে সৃষ্টির আদিতে তাহার যে একটা নিশ্চয় হইয়াছিল, এইরূপ নিশ্চয়ানুগত ফল ভোগ করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না। ফলে তাহা হইলে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করিতে কিছুতেই পারিতেন না। কি অন্তরে, কি বাহিরে, কুত্রাপি বাস্তব পদার্থ কিছুই নাই। এক সেই সম্বিৎ যে যেরূপ ইচ্ছা, সেই সেই জগদন্তর্গত পদার্থাকারে বিরাজ করিতেছেন। অন্তরে যখন এইরূপ নিশ্চয় হয় যে, এই স্বপ্ন সত্য, তখন সম্বিৎও সেইরূপই হইয়া থাকে। অপিচ যখন সংশয় হয়, তখন সংশয়াত্মিকা সম্বিৎ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বপ্নের সত্যত্ব-কল্পনাবশে উপায়ান্তরে প্রাপ্ত ফলও স্বপ্ন-সূচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ ত্রিজগতে স্বসম্বিতের সাহায্যে অতীব দৃঢ়ীকৃত বস্তু সমস্তও দেশ কাল ও প্রযত্নের প্রভাবে চিরে বা অচিরে ব্যভিচারী হইয়া উঠে। সৃষ্টির আদি-মাবস্থায় এ জগৎ অব্যভিচারিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুতরাং চিৎই স্বেচ্ছানুসারে বস্তুসত্তা বিস্তার করে। ব্রহ্মের এক যে চিৎস্বরূপ, তাহা ভিন্ন অন্য সর্ব্ব প্রকার রূপই সত্য, অসত্য, নিয়ত বা অনিয়তভাবে বিরাজিত। এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাস্য অসঙ্গত নহে যে, একমাত্র সৎস্বরূপ

ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ; তদিতর অন্য কিছুই সৎ নাই। সুতরাং সত্যই বা কি আছে, আর অসত্যই বা কি আছে? ফলে যাহারা অপ্রবুদ্ধ, তাহাদের নিকটই স্বপ্ন কোথাও সত্য এবং কোথাও কোথাও বা অসত্যরূপে প্রতীত। কিন্তু যাঁহারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহাদের নিকট স্বপ্ন অসৎই; তবে কখন কখন বা তাহা সৎরূপে প্রত্যয়গোচর হইয়া থাকে। ভ্রমজ্ঞানই সাকার হয়—হইয়া জগদাখ্যায় পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। যখন উহা নিজেই নিজেকে ভ্রম বলিয়া পরিচয় দেয়, তখন তাহাতে আবার কীদৃশ নিশ্চয় হওয়া সম্ভবপর? চিত্তরূপে পরিণত চিৎই সলিলে বুদ্বুদাবলীবৎ যদাভাস সহকারে আত্মাকে স্পন্দিত করে, তাহারই নাম এই জগৎ। যেমন স্বপ্ন দর্শনানন্তর সুষুপ্ত্যনুভব হয়, তেমনি জাগ্রদাবস্থাবলোকনে স্বপ্নানুভব হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে মহামতে! জাগ্রৎকে স্বপ্ন এবং স্বপ্নকে তুমি জাগ্রৎ বলিয়া অবধারণ করিও। একমাত্র অজ বস্তুই উক্ত দ্বিবিধরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। এক সেই চিন্মাত্র ব্যোমস্বরূপই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-নামে বিভিন্নরূপে প্রথিত। এ সংসারে নিয়তি নামেও কোন কিছু নাই, আর অনিয়তিনামেও কোন কিছু বিদ্যমান নাই। যাহা স্বপ্নজ্ঞান, তাহাতে নিয়তি বা অনিয়তির স্থিতি কিরূপে হওয়া সম্ভবপর? স্বপ্নে যত দিন নানা পদার্থের ভান হয়, তত কাল বাহ্য বস্তু হইতে চিত্তনিয়ন্ত্রণা হইয়া থাকে। অতএব যিনি স্বপ্ন-ভানেরও নিয়মনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকেই মুনি নামে অভিহিত করা হয়। ওহে ব্যাধ! বল দেখি, অকারণ স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তিকারিণী সম্বিৎনিয়ম কি, বা কি প্রকার? অপিচ সম্বিদের কারণ-স্বরূপ যে আকারাদি কল্পনা হয়, তাহা কারণ নহে; কেন না, সৃষ্টির প্রতি চিতের কারণান্তর আর নাই। তবে কি নিয়তি বলিয়া একটা কিছুই নাই? —আছে। প্রত্যেক পদার্থই যতক্ষণ জ্ঞানে স্ফুরিত হয়, ততক্ষণ একই স্বরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, উহা যে ভিন্নরূপে স্ফূর্ত্তি পায় না, ইহারই নাম নিয়তি। স্বপ্নে কখন কখন সত্যতা হয়, আবার কখন কখন অসত্যতা ঘটিয়া থাকে। এতৎপ্রতি কারণ—নিয়তির অভাব। ইহাই কাকতালীয় আখ্যায় অভিহিত। মণি মন্ত্রৌষধি-মাহাত্ম্যের যে সত্যতা স্বপ্নেও যেরূপ দেখা যায়, জাগ্রদবস্থাতেও তাহা সেইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই

এ ক্ষেত্রে নিয়তি অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয়ই চিত্তের তাদৃশ বিকাশ বৈ আর কিছুই নয়। জাগ্রদবস্থায় যাদৃশ অনুভব হয়, স্বপ্নে তদনুরূপ অনুভবই হইয়া থাকে। নির্নিদ্র আত্মার যাহা জাগ্রদবস্থা, তাহাকে কিরূপে জাগ্রৎ, আর জাগ্রৎকেই বা কিরূপে স্বপ্ন বলা যাইতে পারে? যাহা স্বপ্নরূপে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বা স্বপ্ন বলা যায় কিরূপে? জাগ্রৎ স্বপ্নাদি কোন অবস্থাই আত্মার কখন হয় না; যিনি সৎ-স্বরূপিণী চিৎ, তিনি ভ্রান্ত স্মৃতিজ্ঞানের অনন্তর দৃশ্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন। আকাশপথে ভ্রমণকারী একই মেঘ যেমন অন্য বলিয়া বোধ হয়, এবং দিগ্‌ভ্রম বশতঃ একই দিক্ যেমন ভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তেমনি অনন্তকাল ধরিয়া অনবরতোত্থিত সৃষ্টি-শীকরোর্ম্মিরাশি বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। এ ব্যাপারে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদির কথা আর কি হইতে পারে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি প্রকার অবস্থাই আত্মাবয়ব; ইহা যদিও সর্ব্বাকার, তথাচ নিরাকার কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। আত্মা সৃষ্টিরূপ শরীরসম্পন্ন হইয়াও চিৎস্বরূপ-বিরহিত দৃশ্যাকারে আকাশাবকাশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং চিন্মাত্র আকাশ-স্বরূপ; আকাশ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই দৃশ্য জগৎ আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জল, পৃথ্বী, স্বর্গাদি লোক ও অম্ভোধর সহ থাকিয়া সৃষ্টির অগ্রে কারণানুভব বশতঃ মাত্র চিত্তরূপে বিদ্যমান ছিল, তৎকালে উহা কোনও নামে অভিহিত হইত না। তদনন্তর মনঃসাক্ষীভূত জ্ঞানময় আত্মসহ-সংযোগে মনের যখন লয় হয়, তখন শুদ্ধ জ্ঞানরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব উহা এক অভিন্ন বস্তু মাত্রই।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—হে তাপসবর! প্রাণিদেহে প্রবেশপূর্ব্বক আপনি প্রলয়াদি নানারূপ মহামহা ঘটনা সহ নির্ব্বাণস্মৃতি অনুভূতিগোচর

করিয়াছেন; সাংসারিক দশায় ভার্য্যা-বন্ধু-প্রভৃতির সহিত আপনার সম্মিলন ঘটনার পর কি হইয়াছিল, ব্যক্ত করুন।

মুনি কহিলেন,—হে সাধো! সেই প্রাণীর অন্তরে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইয়াছিল; বলিতেছি শুন। আমি যখন তাদৃশ আত্মচমৎকার ভুলিয়া গেলাম, তখন ঋতু ও সম্বৎসরাত্মক সময় চলিতেছিল। আমার তখন আত্মমনন ছিল না; আমি ভার্য্যানুরাগে আকৃষ্ট হইলাম। গৃহাশ্রমে আমার ষোড়শ বর্ষ অতীত হইল। এই ভাবে গৃহাশ্রমে আমার সময় কাটিতেছে, ইতিমধ্যে একদা উগ্রতপা নামক জনৈক মুনি অতিথিরূপে মদীয় গৃহে সমাগত হইলেন। এই অতিথি মুনি একজন বহু মানাস্পদ ও মহাবোধ-সম্পন্ন প্রকৃষ্ট পণ্ডিত। আমি তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিলাম। সৎকৃত সৎকারে তিনি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ভোজন-শয়নান্তে বিশ্রামের পর আমি তাঁহার নিকট প্রাণিবর্গের এইরূপ সুখ-দুঃখ-ক্রম জিজ্ঞাসা করিলাম; বলিলাম,—ভগবন্! আপনি গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং জগতের স্থিতি-গতি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। এইজন্য আপনার ক্রোধ দেখা যায় না; সুখেও আপনি আসক্তিবর্জ্জিত আছেন। শরৎকালে শস্যার্থীদিগের গৃহে যেমন শস্যাগম হয়, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিবর্গের শুভাশুভ কর্ম্মবলে সুখদুঃখ-সমাগম তেমনই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, প্রজাবর্গ একই যোগে একই সময়ে কি অশুভ কর্ম্ম করে যে, তাহারই জন্য উহাদের সমুদায়ের উপর দুর্ভিক্ষাদি দুঃখ একই সময়ে উপস্থিত হয়? দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিপ্রভৃতি উৎপাত উপদ্রব একই কালে সকলের উপর আপতিত হয়। এজন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সকল লোকই কি সমান দুষ্কর্ম্মকারী?

আগন্তুক মুনি আমার এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, অন্যমনস্কের ন্যায় অন্য দিকে চাহিলেন; পরে পীযূষনিষ্যন্দবৎ মনোজ্ঞ গভীরার্থদ্যোতক বাক্যে বলিলেন,—চিদ্‌বিবেকময় অন্তঃকরণে এই দৃশ্য-পরম্পরার কারণ সৎ বা অসৎ যাহাই তুমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছ, উহা কিরূপে তোমার বোধগম্য হইয়াছে বল। তুমি আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ কর; ভাবো—কে তুমি! কোথায় আছ? আমিই বা কোথায় আছি?

এই দৃশ্য কি, আর এতন্মধ্যে সারাংশই বা কি ? এই সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দৃশ্য যে কেবল স্বপ্নমাত্র-রূপেই প্রতিভাত হইতেছে, ইহা তোমার প্রতিবোধ হইতেছে না কেন ? কেন না, এই যে আমি রহিয়াছি, এই আমিও তোমার নিকট একটি স্বপ্ন-পুরুষ আর এই যে তুমি আছ, তুমিও একটি স্বপ্নপুরুষ-প্রতিম। এই নিরাকার অনাদি জগৎ চিদাকার কাচ-চাকচিক্যবৎ বিরাজিত। সর্ব্ব-ব্যাপিনী চিতের স্বরূপ এই যে, ইহার যখন যেরূপ কল্পনা হয়, এ তখনই সেইরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কেন না, কল্পনাকারী ব্যক্তির নিকট সমস্তই সকারণ, আর অকারণবাদীর নিকট সকলই কারণবিহীন। আমরা সকলে যদীয় হৃদয়ে অবস্থিত আছি, তিনি আমাদের এবং সমগ্র প্রজার বিশাল বিরাট্ আত্মা। সেই বিরাট্ আত্মা অস্মদীয় চিৎকল্পনাবশেই কল্পিত হইয়া থাকেন। আমাদের যিনি বিরাট্ আত্মা, তিনি অপরাপর প্রজাবৃন্দেরও সুখদুঃখাদির কারণ। এইরূপ অপর ভবিষ্য বিরাট আত্মার ধাতুবিকৃতি বা তদীয় দেহাবয়বের বৈষয়িক স্পন্দনাদি বশতঃ তদভ্যন্তরস্থিত জনসমূহের যুগপৎ বিশৃঙ্খলা অবশ্যই ঘটে। এই কারণ প্রজাবৃন্দের উপর যুগপৎ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, প্রলয় বা শান্তি আপতিত হয়। কেন না, এক বিরাড়ন্তর্গত সমস্ত জীবের একই প্রকার নিয়তি হইয়া থাকে। অথবা এমনও হওয়া সম্ভবপর যে, কাকতালীয়বৎ সর্ব্বপ্রজার দুষ্কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়া উঠে ; তাই একই কালে কতকগুলি বৃক্ষের উপর বজ্রপাতবৎ তাহাদের উপরও একই সময়ে দুর্ভিক্ষাদি পীড়া পতিত হয়। কর্ম্ম-কল্পনাকারীদিগের মতে সম্বিৎ স্বীয় কর্ম্মের ফলভাগিনী হইয়া থাকেন ; পরন্তু যে সম্বিৎ কর্ম্ম-কল্পনা হইতে বিমুক্ত, তাহা কর্ম্মফলভাগিনী হয় না। অল্প বা অধিক পরিমাণে যে যেরূপ কল্পনা সহেতুক বা অহেতুক যে যে বিষয়ে সমুদিত হয়, সে সে বিষয়ে সেই সেই ভাবেই অবস্থিত হইয়া থাকে। স্বপ্নময় নগরে কারণ কিম্বা সহকারী কারণ কিছুই নাই। সুতরাং জানিতে হইবে, একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন ; তিনি অনাদি, অজর, চৈতন্যস্বরূপ ও মঙ্গলময়। এই যে স্বপ্নময় ভ্রম, ইহা কদাচিৎ সকারণ এবং কদাচিৎ অকারণ হইয়া প্রতিভাত হয়। কেন না, উহা সদসৎ-স্বরূপ। সর্ব্ববিধ

স্বপ্নজ্ঞান কাকতালীয়বৎ প্রকাশমান ; উহাদের সহিত সমানরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাদের সহিত এই জাতিও পৃথগ্‌ভূত নহে। যাহার প্রসিদ্ধি সকারণরূপে, তাহাই সকারণাখ্যায় অভিহিত ; আর যাহা কারণবর্জ্জিত-রূপে প্রথিত, তাহাই অকারণাখ্যায় উক্ত। স্বপ্নদশায় কার্য্য-কারণরূপে যাহার যাহার উদয় হয়, তৎতাবৎই চিতের তথাবিধ ভান মাত্র। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণের মতে ঐ সমস্ত শান্তস্বভাব পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

হে প্রশস্তমতে! সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম যদি সর্ব্বপদার্থেরই কারণ, তবে সমস্ত পদার্থ সত্য না হয় কেন ? আর সর্ব্ব পদার্থেরই ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাব কিজন্য ? এই যে তোমার আশঙ্কা হইয়াছে, ইহার উত্তরে যাহা বক্তব্য, শ্রবণ কর। কোন্ কোন্ পদার্থ তোমার মতে সত্য কারণ বলিয়া নির্ণীত ? যে সকল বস্তু সত্য কারণ, তাহারা কীদৃক্ স্বভাবসম্পন্ন ; যে পদার্থের নাম আকাশ, তাহার কারণ কি ? ক্ষিতি প্রভৃতি পিণ্ডের ঘনত্বাদি সৃষ্টির কারণ কি ? অবিদ্যার কারণ কি ? এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মেরই বা কারণ কি আছে ? সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যখন বায়ু, তেজ ও জল কেবল জ্ঞানরূপে অবস্থিত ছিল, তখন কি কেবল শূন্য ?—না আর কোন পদার্থ উহাদের কারণস্থানীয় ? ভূতপঞ্চকের পিণ্ডরূপ গ্রহণ ও দেহ লাভ ব্যাপারে কারণ কি আছে ? সমগ্র সৃষ্ট পদার্থ এইরূপে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আকাশে যেমন রাশিচক্রাদি, তেমনি জগতে যাবতীয় পদার্থই চিরানুভববশতঃ ভ্রমদৃষ্টিতে এইরূপেই প্রবৃত্ত ও অবস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপেই ব্রহ্ম সৃষ্টিস্বরূপে প্রবৃত্ত হন ;—হইয়া পশ্চাৎ স্বীয় রূপেরই ক্ষিত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করেন। বায়ুতে যেমন স্পন্দ হয়, তেমনি সৃষ্টি সমষ্টিও চিদাকাশে অভাসমান হইয়া থাকে। অতঃপর তাহারা নিজেরাই স্ব স্ব দেহের কারণ কল্পনা করিয়া লয়। অগ্রে যে যে পদার্থ যাদৃশাকারে কল্পিত হয়, নিয়তি তাদৃশ দেহই ধারণ করিয়া থাকে। কেন না, সেই সেই রূপে কল্পিত চিতেরই উহা নিজ শরীর। চিৎ প্রথমে যে যে জ্ঞানাত্মকরূপে আত্ম-স্বরূপের স্বাভাবিক উদ্বোধন করিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত সেই সকল চিতে সেইরূপেই বিরাজিত আছে। ঐ চিৎই পুন অন্য প্রকার উত্তম মহাযত্ন-গুণে উহাদিগকে প্রকারান্তরে পরিণামিত করিতেও সক্ষম হইয়া থাকে।

যাহাতে কারণ কল্পনা হয়, কারণের প্রাধান্য তাহাতেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানীজনের মতে যাহার কারণ কল্পনা নাই, তাহাই অকারণাখ্যায় অভিহিত। এই অজ্ঞ জগৎ অগ্রে বাত্যাবর্ত্তবৎ অজ্ঞাত ছিল। যে অসৎরূপে অগ্রে ইহাকে অবগত হওয়া যায় নাই, এ সেই অসৎরূপে সেই ভাবেই অদ্যাপি অবস্থিত আছে। কোন কোন জীব পরস্পর এক যোগে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠাতৃগণ তাহাতে একই সঙ্গে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে দেখ, গিরিশিখর-গত শিলা যেমন অকারণ উৎপীড়িত হয়, তেমনি অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও সহস্র সহস্র জীব অকারণ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

ঊনপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—ব্যাধ! তৎকালে সেই আগন্তুক মুনি আমায় ঈদৃশ-রূপ সযুক্তি-সঙ্গত প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে আমার তত্ত্ব-জ্ঞান লব্ধ হইয়াছিল। তখন আর কোন কিছুই আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই হইতে আমি আর সেই মুনিকে পরিত্যাগ করি নাই। তিনি আমার অশেষ প্রার্থনার বস্তু; পূর্ব্বে যে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, সেই আমার সেই গৃহে তিনি বাস করিয়াছিলেন। যে মুনি চন্দ্রোদয় প্রতিম শুভ শীতল বাক্য বলিয়াছিলেন, দেখ, অধুনা সেই মুনিবর তোমারই পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। ঐ মুনি জগতের পূর্ব্বাপরাভিজ্ঞ যজ্ঞাদি শুভ-কর্ম্ম-জনিত মূর্ত্তিমান্ সুকৃতরাশির ন্যায় এবং আমার মোহ-হর। তিনি অপ্রার্থিতভাবে মৎসমীপে এই সকল কথা কহিয়া ছিলেন।

অগ্নি কহিলেন,—ব্যাধ তখন সেই তাপসের তাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া 'সত্যই কি সেই স্বপ্নসৃষ্টির উপদেষ্টা মুনি আমার প্রত্যক্ষ হইলেন?' এই ভাবিয়া বিস্ময়ে বিভোর হইয়া পড়িল।

ব্যাধ বলিল,—মুনিবর! আপনি আমার নিকট যে ভবতাপহর বাক্য বলিলেন,—তাহা মদীয় হৃদয়ে বড়ই বিচিত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে। স্বপ্নোপদেষ্টৃরূপে নির্দ্দিষ্ট মুনির জাগ্রদবস্থায় যে প্রত্যক্ষতার কথা কহিলেন, আমারও সেই প্রত্যক্ষতাই অনুভূত হইতেছে। ইহা আমি একান্ত বিচিত্র বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছি। ভূতযোনি যেমন বালক-দিগের প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি কিরূপে সেই স্বপ্ন-পুরুষ জাগ্রদবস্থায়ও স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইলেন? এই অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত আমার নিকট ব্যক্ত করুন। আমি জিজ্ঞাসা করি, স্বপ্নে পুরুষ-দর্শন হইল কি কারণ? কাহারই বা ঐরূপ দর্শন ঘটিয়াছিল? এ বিবরণ তো আমার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

মুনি বলিলেন,—মহাভাগ! অতঃপর আমার সম্বন্ধে কি যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমার বোধবৃদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষই সে কালে যে বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, আমি তাহাতেই সত্বর প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মায়াবসানে সুনির্ম্মল আকাশ যেমন নিজ নির্ম্মলভাব লাভ করে, তাঁহার সেই বাক্যে আমারও পূর্ব্ব স্বচ্ছ স্বভাব সেইরূপ স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছিল। অহো! আমি অগ্রে যেরূপ মুনি ছিলাম, পূর্ব্বসংস্কারের উদ্‌বোধনে তখন আমি সেইরূপই মুনি হইলাম। আমার হৃদয় স্ফীত হইল; বিস্ময়-রসে আর্দ্রীকৃত হইয়া গেল। অধ্বশ্রম-কাতর অনভিজ্ঞ পান্থ যেমন ফলাকাঙ্ক্ষায় মৃগতৃষ্ণার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি ভোগার্থী হইয়া ঈদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলাম। অহো, বেতাল্ দ্বারা বালক যেমন প্রতারিত হয়, এই ভ্রান্তিমাত্র স্বরূপ দৃশ্য জগতের জ্ঞানযোগে আমিও তেমনি প্রাজ্ঞ হইয়াও প্রবঞ্চিত হইয়াছিলাম। অহো কি আশ্চর্য্য! প্রস্ফুরৎ মিথ্যাজ্ঞান সর্ব্বথা নিরর্থক; আমি তাহারই দ্বারা কি এক শোচনীয় পদবীতেই না উপনীত হইয়াছিলাম! অথবা এই যে 'সোঽহং' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, ইহাও সৎ নয়—ভ্রান্তিমাত্র। 'আমি' নামে কোন পদার্থ নাই; আমার এই 'আমিত্ব' ভ্রান্তি, ইহাও নাই। এই জগৎ বা এই জগদ্‌বিষয়িণী ভ্রান্তিও নাই। পরন্তু এ বড়ই আশ্চর্য্য

যে, সমস্তই মিথ্যা, অথচ সদ্বস্তুবৎ বিরাজিত। অধুনা আমার কর্ত্তব্য কি? মদীয় হৃদভ্যন্তরে যে বন্ধনভেদনকরী অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়াছে, ইহাও চ্ছেদনার্হা। কাজেই উহাকে এখন আমার পরিত্যাগ করাই বিধেয়। থাকুক এখন এ কথা। আমার অনর্থরূপিণী ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যায় প্রয়োজন কিছুই নাই। কেন না, অসৎস্বরূপা ভ্রান্তিকে আমি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছি। এই যে মুনি আমার গৃহে অতিথিরূপে আসিয়া আমায় উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানও ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ মাত্র বৈ আর কি? দিবসে আকাশে যেমন অভ্রপুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সেই ব্রহ্মই উপদেশক মুনি হইতেছেন; আর এই যে আমি শিষ্যভূত; মদীয়স্বরূপেও সেই ব্রহ্মই ভান পাইতেছেন। সুতরাং আমি যাহা হইতে জ্ঞানোভ্যুদয়-শালী হইয়াছি, সেই এই মহনীয় মুনির নিকট মদীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করি;

এইরূপ চিন্তা-চর্চ্চা করিয়া সেই আগন্তুক মুনিবরকে বলিলাম,—হে মুনিপ্রবর! আমার সেই স্বীয় দেহে আমি প্রবেশ করি এবং যাহা দেখিব বলিয়া উদ্‌যোগী হইয়াছি, তাহাও দর্শন করিতে যাই। আমার এই কথা শুনিয়া সেই মুনি তখন হাসিয়া বলিলেন,—তোমার সেই দেহযুগ্ম এখন কোথায় আছে? তাহারা কতক্ষণ অতি দূরবর্ত্তী পথে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা ওহে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তবিৎ! তুমি নিজেই যাও; গিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আইস। কি ঘটিয়াছে না ঘটিয়াছে দেখ; দেখিলে নিজেই শেষে সেই দেহরহস্য বুঝিতে পারিবে।

মুনিবরের এই কথার পর আমি আমার সেই প্রাক্তন দেহসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সে কালে পার্থিব দেহের প্রতি স্বতই যে একটা অভিন্ন প্রত্যয় ছিল, আমি তাহা অকুণ্ঠচিত্তে পরিহার-পূর্ব্বক নিজ জীবকে প্রাণযোগে পবনস্কন্ধে উপনীত করিলাম। আমি যাইবার কালে বলিয়া গেলাম,—হে মুনিবর! আমি প্রাক্তন দেহ পরিদর্শনপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাবর্ত্তন করি, আপনি ততকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করুন। এই কথা কহিয়া আমি বায়ুর অন্তরালে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর বায়ুরূপ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কুসুমসৌরভবৎ অতীব ত্বরিত গমনে অচিরকালমধ্যেই অনন্ত গগনে ঘুরিতে লাগিলাম। আমি বহুকাল

যাবৎ এইভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন আর নির্গমদ্বার—অর্থাৎ মদীয় উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা হইতে নিষ্ক্রমণের পথ পাইলাম না, তখন তাহার সেই বাতাশয়ের অভ্যন্তরে গিয়া অতীব খেদানুভব করিলাম। পরে কিয়ৎকাল মধ্যেই আবার এই নিজ বন্ধনস্বরূপ জগজ্জালে আসিয়া পতিত হইলাম। ক্রমে আমার নিজালয়ে আসিলাম; আসিবামাত্র সম্মুখেই সেই মুনিবরকে দেখিতে পাইলাম। তখন চিত্তের একাগ্রতা প্রণয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, হে ভূত-ভবিষ্য-জ্ঞানীদিগের অগ্রণী! আপনার জ্ঞানময় চক্ষু সর্ব্বত্র প্রসর্পিত; তাহা দ্বারা আপনি সমস্তই দেখিতেছেন। তাই বলিতেছি, আপনি আমার অজ্ঞান অপনয়ন করুন। আমি যদীয় দেহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার এবং আমার দেহ অধুনা কোথায় গেল! কি জন্য আমি সেই দেহদ্বয় প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না। আত্মা হইতে স্থাবরান্ত এই অতীব বিশাল সংসারমণ্ডলে বহুকাল আমি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম। তথাচ কেন যে উহার নির্গমদ্বার পাইলাম না, তাহা বুঝিলাম না।

এইরূপে আমি জিজ্ঞাসা করিলে সেই মহাশয় মুনি আমায় বলিলেন,— হে পদ্মপলাশনেত্র! এ রহস্য তুমি আপনা-আপনি কিরূপে অবগত হইতে পারিবে। যোগানুষ্ঠান কর; তাহাতে একাগ্রচিত্ত হইবে। তদবস্থায় স্বয়ংধ্যান করিতে থাক। এইরূপ করিলেই করতলগত কমলের ন্যায় বিশেষরূপে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। আর যদি একান্তই আমার কথা শুনিবার তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সমস্তই আমি যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বলিয়া যে একটী স্বতন্ত্র বা ব্যষ্টি জীব আছে, তাহা নাই। পরন্তু যিনি জীবসমূহের তপস্যারূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ, কল্যাণরূপ কমলের আকর ও জ্ঞানময় পদ্মস্বরূপ, সেই হরির নাভি বা কর্ণিকারভূত তুমিই প্রকৃত; ফল কথা, তুমিই জীবসমষ্টি-ভূত হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ। একদা তুমি ব্যষ্টিভাবরূপ স্বপ্নদর্শনের বাসনায় মানোরাজ্যের আলোচনা করিতেছিলে; তদবস্থায় তোমার পরিপুষ্ট ব্যষ্টিভাবসম্বিৎ অন্য দেহাভ্যন্তরে স্বপ্নাদি কৌতুক কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত অন্য জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। যে হৃদন্তরে তোমার প্রবেশ হইয়াছিল,

সেইখানেই বিশাল ত্রিভুবন, আকাশ ও পৃথিবীর বিপুল অন্তরাল তুমি অবলোকন করিয়াছিলে।

এই ভাবে পর-দেহান্তর্গত স্বপ্ন-দর্শন-ব্যাপারে বহুকাল তুমি ব্যগ্র হইয়াছিলে। তখন তোমার দেহ, তুমি যন্মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিলে, সেই প্রাণীর দেহ এবং তোমার আশ্রম যেখানে অবস্থিত ছিল, সেই মহারণ্যে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়াছিল। ঐ অগ্নি মেঘাবৃত অম্বরোপম ধূম-রাশিতে ধূম্রবর্ণ হইয়াছিল। উহা রবি ও চন্দ্রমণ্ডলবৎ চক্রাকারে অনবরত ঘুরিতে থাকিলে উহা হইতে সবেগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছিল। নীলাকাশে এবং দগ্ধাকাশস্থ ভস্মময় ধূমরাশিরূপ কৃষ্ণকম্বলে অম্বরতল আবৃত হইয়াছিল। তখন দরীগৃহ-নিঃসৃত সিংহসমূহের তর্জ্জন-গর্জ্জনে এবং ভয়ঙ্কর চটচটারবে দিঙ্মধ্যভাগ যেন ভয়ে জড়ীভূত হইল। অগ্নিময় তাল ও তমালশ্রেণীর উৎপাতাগ্নি-পাতে সর্ব্বস্থান গহন হইয়া উঠিল। দূরস্থ ব্যক্তিবর্গ দূর হইতে ঐ অগ্নি স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় অবলোকন করিল। দ্রবীভূত তপ্ত কাঞ্চনময় কুট্টিমতলবৎ ব্যোমতল দৃষ্ট হইল। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বিস্তারে আকাশস্থ তারকানিকর দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল এবং বক্ষঃস্থিত জ্বালারূপিণী বালস্ত্রীর কটাক্ষবিক্ষেপে দর্শক-মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিল। অগ্নিজ্বালার 'ধমধম' ধ্বানে গগনোদর পরিপূর্ণ হইল। তাহাতে বনচরগণের নিদ্রাবিঘ্ন ঘটিল। তাহারা দরীগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সিংহ, মৃগ, ব্যাধ ও বিহঙ্গমেরা অর্দ্ধদগ্ধদেহে নানাদিকে দৌড়িতে লাগিল। সরিৎ সরোবর এবং স্রোতোজল উষ্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর বনেচরগণকে পক্ব-প্রায় করিয়া ফেলিল, প্রবল জ্বালাযোগে বালচমরীবৃন্দের লাঙ্গুলদেশ চুর-চুর রবে জ্বলিতে লাগিল। দহ্যমান বন্য প্রাণীদিগের মেদোগন্ধে মেঘমালা পরিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সর্পবৎ কুটিল গমনে প্রসর্পণশীল কল্পাগ্নির ন্যায় সমুত্থিত হইয়া সেই বনবহ্নি তোমার আশ্রম দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

ব্যাধ কহিল,—মুনিবর! সেই স্থানে তথাবিধ অগ্নিদাহের প্রকৃত কারণ কি? সেই বন এবং বনস্থ প্রাণিগণ কেন যুগপৎ দগ্ধ হইল?

মুনি বলিলেন,—সঙ্কল্পকারী ব্যক্তির মনঃস্পন্দন যেমন সঙ্কল্পাদির

ক্ষয়োদয়ের প্রতি কারণ, তেমনি ত্রিজগৎ সঙ্কল্পকারী বিধাতার চিরমনঃস্পন্দনই ত্রিজগৎ; অপিচ উহাই ত্রিজগতের ক্ষয়োদয় বিষয়ে কারণ। ভয়াদি উপস্থিত হইলে হৃদয়ে যে ক্ষোভ বা অক্ষোভ জন্মিয়া থাকে, তৎপ্রতি স্পন্দকেই যেমন হেতু বলা যায়, তেমনি ত্রিজগতের বনান্তরালে ক্ষোভ বা অক্ষোভোদ্রোকের প্রতি অচিরোৎপন্ন স্পন্দই হেতুভূত। এই ত্রিজগৎ যেন বিধাতার একটা মনোরাজ্য। অত্রত্য প্রজাদিগের উদয়, ক্ষয়, ক্ষোভ, বর্ষা এবং অবর্ষাদির প্রতি তাহার মনঃস্পন্দনই কারণ। এ জগতের হেতু ব্রহ্মাদিরূপ মনঃসমষ্টি; ইহাও অপর চিদম্বরে কল্পিত, শান্তস্বরূপ অদ্বিতীয় চিদাকাশে অশ্রান্তগতি। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা চিদাকাশে চিদাকাশের শোভাই সন্দর্শন করেন। এ জগৎ মুর্খেরা যেরূপ দেখে, সেইরূপই সত্য মনে করে; পরন্তু বস্তুতঃ ইহা সৎ নহে।

পঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

অপর অতিথি মুনি কহিলেন,—সেই অনলে নগ, নগর, নিকেতন, সমস্তই ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তোমার আশ্রমে অত্যন্ত অগ্ন্যুত্তাপ লাগিল। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলা পর্য্যন্ত স্ফুটিত হইল। সুতরাং সে উত্তাপে তোমাদের দুই ব্যক্তিরও সেই দুই সুপ্ত দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। সে অনলে সর্ব্বকানন সম্পূর্ণতঃ দগ্ধ হইল। সমস্ত দগ্ধ করিয়া পরে সে নিজ হইতেই শান্ত এবং সমুদ্রসলিলপানকারী অগস্ত্যর্ষির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অনল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে তদীয় ভস্মরাশিও শীতল হইল। বায়ু তখন পুষ্পপরাগপুঞ্জবৎ ঐ ভস্ম বিন্দু বিন্দু লইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। কাজেই সেই তোমার আশ্রম, সেই তোমাদের দেহদ্বয় কোথায় ছিল, কিম্বা সেই বহু জনাবাস নগরই বা কোথায় ছিল, তাহা আর এখন কিছুই বুঝা যাইতেছে না। জাগ্রদবস্থায় স্বাপ্ন নগরী যেমন অন্তর্দ্ধান

প্রাপ্ত হয়, ঐ সকলও অধুনা তেমনি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমাদের সেই উভয় দেহের অভাব ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভ্রমের ঘোরে তুমি যখন নিদ্রিত হইয়া পড়, তখন তদ্বিষয়ে তোমার একটা সম্বিন্মাত্র বিদ্যমান। সুতরাং এখন তদ্‌বিষয়ক চলাচল আর কৈ ? তাহা অধুনা বিরাট্ আত্ম-রূপে বিরাজ করিতেছে। সেই ওজের সহিত যে পুরুষ সুপ্ত ছিল, তাহার দাহ হওয়ায় সেই ওজঃসহ দেহও দগ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই হে মুনিবর! তুমি সেই দেহদ্বয় দেখিতে পাও নাই। এই অনন্ত স্বাপ্ন সংসারে তুমি এখন জাগ্রদবস্থায় অবস্থান করিতেছ। তাই স্বপ্নদশাতেই অধুনা তুমি জাগ্রদ্‌ভাবে উপনীত হইয়াছ। এই যে আমাদিগকে দেখিতেছ, আমরা সকলেও তোমার স্বপ্নপুরুষ। এই চিদাকাশরূপ আত্মা সর্ব্বাবস্থাতেই স্বস্বরূপে অবস্থিত। যদিও তুমি একটী স্বপ্নপুরুষ, তথাচ তদবধি জাগ্রৎ-পুরুষ হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মেই অনুরক্ত আছ। তোমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এই আমি সেই সমস্তই তোমার নিকট সম্পূর্ণতঃ বর্ণন করিলাম। এ সকলই আমার অনুভূত বিষয়। তুমি ধ্যানাবলম্বন কর; ধ্যানে এই সুদৃশ্য দর্শন করিতে পারিবে। গগনে যেমন সুবর্ণময় আতপ দেখা যায়, তেমনি সেই আদি-মধ্য-অন্তবিরহিত সম্বিদ্‌ঘন চিন্ময়াত্মা নিজা-বির্ভাবকারিণী শক্তির প্রাদুর্ভাবে চঞ্চল হইয়া আপনাতেই আপনি নানাবিধ সৃষ্টিস্বরূপে পরিস্ফুরিত হইতেছেন।

একপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

মুনিবর কহিলেন,—সেই মুনি আমায় এই সকল কথা কহিয়া স্বশয্যায় তূষ্ণীম্ভাবে নিশাতিপাত করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহা শুনিয়া বিস্ময়ার্ণবে ভাসিতে লাগিলাম। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। অনন্তর আমি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলাম,—হে প্রভো! সদাশয় মুনিবর! এই যে সকল

স্বপ্ন, ইহা তো আমার নিকট সৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। অতিথি মুনি বলিলেন,—যদি জাগ্রদ্ বস্তুর সৎস্বরূপতা সম্ভবপর হইত, তবে স্বপ্নকেও সৎ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া বিস্ময়রসে মগ্ন হওয়া অযৌক্তিক হইত না। পরন্তু যখন জাগ্রতের সত্তাই সংশয়-দোলারূঢ়, তখন স্বপ্নের মিথ্যাত্ব আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কি? স্বপ্নের ন্যায় এই সৃষ্টিও অগ্রে পৃথিব্যাদি-বিরহিত হইয়া পৃথিব্যাদির সহিতই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই পরিদৃশ্যমান ত্বদীয় অদ্যতন স্বপ্নাপেক্ষাও জাগ্রৎসৃষ্টিরূপ স্বপ্ন যে চৈতন্যাত্মক, ওহে ব্যাধগুরো! তাহা শ্রবণ কর। বর্ত্তমানে জাগ্রদবস্থায় যে পদ ও তদভিধেয় প্রত্যক্ষ করিতেছ, রাত্রিযোগে নিদ্রাবস্থায় সেই পদ ও পদার্থই স্বপ্নে তোমার অনুভূতিগম্য হয়। সৃষ্টির অগ্রে এই সৃষ্টিরূপ স্বপ্ন চিদাকাশে অনুভূত হইয়াই বিরাজ করিতে থাকে।

এইরূপে জাগ্রৎপ্রপঞ্চের একান্ত মিথ্যাত্ব যখন প্রতিপাদিত হইল, তখন আর স্বপ্নকে সদ্রূপে সন্দেহ কর কেন? তিনি এই সকল কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে আমি তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলাম, আপনি যে আমায় 'ব্যাধগুরু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সে গুরুত্ব কি প্রকার, তাহা বিবৃত করুন।

আগন্তুক তাপস কহিলেন,—ওহে প্রাজ্ঞবর! অধুনা আর একটী বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, ইচ্ছা করিলেই তাহা আমি বিস্তৃতরূপে বলিতে পারি; কিন্তু তাহাতে সে কথার উপসংহারই হইয়া উঠিবে না। যাহা হউক, আমি দীর্ঘতপা মুনি; তুমিও একজন অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তুমি যত দিন পর্য্যন্ত না ব্যাধগুরু হইবে, ততদিন আমি এইখানেই অবস্থান করিতেছি। অতঃপর মৎকর্ত্তৃক যে সকল সত্য বাক্য উক্ত হইবে, তাহা শুনিয়া তুমিও এই গৃহে থাকিয়াই প্রীতিলাভ করিতে পারিবে। আমি যতদিন এখানে থাকিব, তুমি আমার শুশ্রূষা হইতে নিবৃত্ত হইও না। এইরূপ আচরণে আমি তোমাদের সহিত এখানে অবশ্যই বাস করিতে থাকিব। ভবিষ্যতের কথা কহিতেছি, এইস্থানে বাস করিতে করিতে আমার কতিপয় বৎসর অতিপাতিত হইলে, একদা ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, তাহাতে তোমার

সমস্ত বন্ধুবান্ধবের বিনাশ ঘটিবে। তখন সীমান্তস্থ রণোন্মত্ত সামন্তগণের পরস্পর বিগ্রহ উপস্থিত হইবে। তাহাতে হতাবশিষ্ট গ্রামবাসীরা স্ব স্ব গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। তখন আমরা উভয়ে কোনই দুঃখ ভোগ করিব না; চিরকাল ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাসিত করিব। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইবে, আমরা সম-শান্তভাবে সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইব, এবং তুল্যাচার হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ রবি-শশীর ন্যায় একই স্থানে কচিৎ কোন ক্ষুদ্র বনে বাস করিতে থাকিব। বলিয়া রাখি, কিয়ৎকাল অতীত হইলে, এই অরণ্যাভ্যন্তরেই শাল, তাল ও লতাপ্রচয়ে অখিল ভূতল প্রচ্ছাদন করিয়া একটী উত্তম বন উদ্ভূত হইবে। সেই নবোদ্ভিন্ন বনের তাল ও তমাল দল অনিলভরে পরিচালিত হইয়া দিঙ্মণ্ডলের শোভা সম্বিধান করিবে। তরুনিচয়ের তলে তলে প্রফুল্ল পদ্মবনের অবস্থান এবং ফুল্ল কুসুমনিচয়ের পতন এই দুই কারণে তরুনিকর যেন পূজিত বলিয়া প্রতীত হইবে; কুঞ্জে কুঞ্জে চকোরনিকরের চারুকূজন শুনা যাইবে। সেই উজ্জ্বলচ্ছবি বনভূমি দেখিয়া মনে হইবে, যেন স্বর্গ হইতে নন্দনকাননই আপনাপনি ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

অতিথি মুনি কহিলেন,—আমরা সেই নবোত্থিত বনে বহুকাল ব্যাপিয়া দুইজনে তপস্যাচরণে নিবিষ্ট রহিলে একদিন এক ব্যাধ মৃগানুধাবনে পরিশ্রান্ত হইয়া সেইখানে আসিবে। তুমি তাহাকে পবিত্র বচনাবলী দ্বারা প্রবোধিত করিবে। সেই ব্যাধও সংসারবৈরাগ্যে উপনীত হইয়া সেই স্থানেই তপোনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। সে তপস্বিজনোচিত সমুদায় আচার অভ্যাস করিবে; শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইবে; আত্মজ্ঞানলাভে অভিলাষী হইবে; পরে তোমারই কথাবসরে স্বপ্নতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে,

তুমি স্বপ্নকথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সমস্ত আত্মজ্ঞান উপদেশ দিবে। ব্যাধ তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হইবে।

এই প্রকারে তুমি ব্যাধের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্যই তোমায় আমি ব্যাধগুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। এই সংসারভ্রম যে প্রকার, আমি যে প্রকার, তুমি যেরূপ এবং তোমার এই স্থানের ভাবী বিবরণ যাহা যাহা, তৎসমস্তই তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

মুনি কহিলেন,—ব্যাধ! আমি সেই আগন্তুক মুনির এই সকল কথা শুনিয়া বিস্ময়াকুল মনে তাঁহারই সঙ্গে দৃশ্যজালের আলোচনা করিতে করিতে উত্তরোত্তর আরও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলাম। অনন্তর রাত্রি যখন প্রভাত হইল, আমি সেই অতিথি মুনিকে যথোচিত ভক্তি সহকারে পূজা করিলাম। তাঁহার সবিশেষ পরিতোষ জন্মিল।

অতঃপর আমরা উভয়ে সেই বনমধ্যস্থ ও গ্রামস্থ গৃহে পরস্পরের প্রতি স্নেহানুরক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের বৎসর কাটিতে লাগিল। আমিও এইখানে অচলবৎ অচল ও অটল হইয়া সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যখন যখন যেমন যেমন অবস্থা আপতিত হইতে লাগিল, তখন তখন তন্মধ্য হইতে কোন কোনটিকে পরিহার বা কোন কোনটিকে গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার মৃত্যুকামনা নাই, বাঁচিবারও সাধ নাই; সর্ব্বাবস্থা-তেই ক্লেশবর্জ্জিতভাবে আমি অবস্থান করি। তার পর আমি সেইস্থানে থাকিয়াই এই দৃশ্য বিশ্বমণ্ডলের বিষয় বিচারালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম; ভাবিলাম কারণ কি? এই পদার্থপরম্পরার কি জ্ঞান আছে? এই অদ্বিতীয় ব্যোমস্বরূপ চিত্তে স্বপ্নবৎ প্রতিভাত পদার্থনিচয়ই বা কি? এই দৃশ্য পদার্থ সকলের নিমিত্ত কি? স্বর্গ, পৃথ্বী, পবন, গগন, নগ, নদী, বা দিঙ্মণ্ডল এই সমুদায়ই আত্মস্থ চিন্মাত্র আকাশস্বরূপ। চিদাকাশে চিচ্চন্দ্রিকা যে চতুর্দ্দিগ্-বিসারী প্রভা বিস্তার করে, এই বিচিত্র বিশ্বাকারে তাহাই স্ফুরিত হয়। এই পর্ব্বত, এই পৃথ্বী, এই আকাশ, এই আমি, এতৎসমস্ত বস্তুতই অকিঞ্চিৎ; এ সকল চিন্ময় আকাশেরই বিলাসমাত্র। এই সমস্ত পদার্থের কারণ বলিয়া কাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়? অবয়বসমষ্টির একত্র সম্মিলনে যদি

কোন হেতুই না থাকে, তবে পদার্থসমূহের উৎপত্তিই বা কিরূপে হওয়া সম্ভবপর ? আর যদি বলা হয়, উহা ভ্রমমাত্র ; তবে ভ্রমেরই বা কারণ কি ? কে ভ্রমের দর্শক বা জ্ঞাতা ? কিসের জন্যই বা তাহাদের ভ্রম দর্শন বা ভ্রমজ্ঞান ঘটিয়া থাকে ? আমি যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তদীয় হৃন্মধ্যস্থ সম্বিৎরূপে বাস করিতেছিলাম, সে তো আমার সহিত একেবারেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। অতএব যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, যাহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, কারণবর্জ্জিত ও ক্রমহীন, এই সকল বস্তু-পরম্পরা সেই জ্ঞান-ঘনস্বরূপ চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুই যদি চিদাকাশের বিকাশ মাত্র হয়, তবে ইহারা কিরূপে সুস্পষ্ট আকারবিশিষ্ট হইল ? চিন্মাত্রের যে এইরূপে বিবিধাকারে স্ফুরণ, তাহা তো অসম্ভব ; কেন না, চিৎ ব্যোমস্বরূপ ; ব্যোমস্বরূপের আবার স্ফুরণ কি প্রকার বা কীদৃশ ? কিরূপেই বা উহার সংঘটন হয় ? আকাশ কদাচ স্ফূর্ত্তি পায় না। অথবা এই অনন্ত চিদ্‌ঘন স্বভাবতই স্ফূর্ত্তিশীল। তাহার স্ফুরণই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টা বা দৃশ্য কোথাও কিছুই নাই। এই সমস্ত ভবন-কানন-শৈল-দিগন্তাদি বিবিধরূপে অনাদি অনন্ত অমেয় অমেধ্য কার্য্য-কারণ-ভাব-বর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় চৈতন্যই পরিশোভিত হইতেছেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।
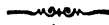
মুনি কহিলেন,—আমি এই দৃশ্য বিশ্বে এবম্বিধ নিশ্চয় করিয়া বীতরাগ, বিগতশঙ্ক, নিরহঙ্কার ও ক্লেশবিরহিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্তরূপে অবস্থিত আছি। অধুনা নিরাধার, নিরাধেয়, নিরহঙ্কার, নীরূপ ও স্বভাবস্থ হইয়াছি। আমার স্বতই শান্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমি সর্ব্বথা সর্ব্ব স্বস্থ বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছি। আমি ইচ্ছা করিয়া কোন কিছুই

করি না, যাহা না করিলে নয়, তাহাই আমি করিয়া থাকি। যাহার নিজেরই আকাশবৎ নিষ্ক্রিয়তা, তাহার আবার কর্ত্তৃত্ব কি? স্বর্গ, পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত ও নদী, এই সকলই একমাত্র সেই চিদাকাশ-স্বরূপ। অধুনা আমি শান্তিপ্রাপ্ত, লব্ধনির্ব্বাণ ও কেবল সুখেই অবস্থিত। এখন আর আমার পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই; বাহ্য-অভ্যন্তর নাই।

এইরূপে আমি জীবন্মুক্ত-অবস্থায় এইস্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, এই সময় তুমি আমার সম্মুখে অদ্য আসিয়া কাকতালীয় ন্যায় উপস্থিত হইয়াছ। ওহে ব্যাধ! আমরা, স্বপ্ন, জগৎ, তুমি, এ সকল যে যে রূপ, আর এই জগৎকে আমরা যেরূপ দর্শন করি, এতৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দ্রষ্টা, তোমার অন্তর, বাহ্য দৃশ্য, সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তি দ্বেষাদি মানসিক ভাব, ব্রহ্ম এবং এই সম্মুখস্থ জনসঙ্ঘ, এ সকল যে যে রূপ, তৎসমস্তই তোমায় বলা হইল। তুমি সমস্ত দৃশ্যকেই মিথ্যা জানিয়া শান্ত হও।

ব্যাধ বলিল,—সিদ্ধান্ত যদি এইরূপই হয়, তবে আপনি, আমি ও দেবাদি অন্যান্য জ্ঞানী প্রাণিগণ ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেই কি পরস্পর সদসদাত্মক স্বাপ্ন ব্যক্তি?

মুনি কহিলেন,—ব্যাধ! তোমার কথাই সত্য; ইহারা সকলেই পরস্পরের পক্ষে স্বাপ্ন পুরুষরূপে প্রতিভাত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আপনাতে সৎ, আর অন্যেতে অসৎ বুদ্ধি স্থাপন করিয়া থাকে। যেরূপ যাহার জ্ঞানোদ্রেক, সে এজগৎকে সেইরূপেই বুঝে। দেখ, একমাত্র ঘটরূপ বস্তু, তাহা কেহ কেবল ঘটরূপে দেখে, আর কেহ বা কপাল-কপালিকাদি অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবলোকন করে। এক বস্তু-দর্শীর নিকট নানা অসৎ, আর যে নানা বস্তুদর্শীর নিকট এক অসৎ; সুতরাং এক বস্তু না নানা, না এক, না সৎ, না অসৎ, না সদসৎরূপ, কিছুই নয়। যেমন জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট নগর, তেমনি উহা কেবল জ্ঞান-মাত্র। এই আমি সংক্ষেপতঃ তোমার নিকট সকলই বলিলাম, তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণতঃ প্রবোধশালী হইলে। তোমার জ্ঞানোদয় হইল; তুমি সমস্তই জানিলে। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয় কর। ওহে ব্যাধ! এমনতর

প্রবোধ তুমি প্রাপ্ত হইলে; তথাচ জগতের সত্যত্ব বুদ্ধি তোমার সমুদিত হয় কেন? এই প্রকার প্রবোধ হইতে বুদ্ধি তোমার নিবৃত্ত হইলেও পরব্রহ্ম হইতে তাহা বিরত নহে। কাষ্ঠ যেমন কর্ত্তনাদি ক্রিয়ায় কমণ্ডলুর আকারে পরিণত না হইলে জলধারণে সক্ষম হয় না, তেমনি অভ্যাসের অভাবে প্রবোধ কদাচ মনোমধ্যে অবকাশ পাইতে পারে না। অভ্যাসবশে প্রবোধ যখন মনোমধ্যে সুদৃঢ় হয়, আর গুরুশাস্ত্রসেবায় যৎকালে দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন শান্ত হইয়া যায়, তখন চিত্তের নির্ব্বাণ অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা মোহ-অহঙ্কারবর্জ্জিত, সঙ্গদোষ-বিরহিত, আত্মানু-শীলনে নিরত, কামশূন্য ও সুখ দুঃখ-দ্বন্দ্বের অতীত, তথাবিধ জ্ঞানিগণই অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

অগ্নি কহিলেন,—সেই সময় সেই বনাভ্যন্তরে ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে চিত্রিতবৎ নিশ্চল রহিল। তাহার অভ্যাসের অভাব ছিল; তাই তদীয় চিত্ত স্বপদে বিশ্রাম লাভে সক্ষম হইল না। সাগরে প্লবমানবৎ সে সমুদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। তাহার ধারণা হইতে লাগিল, যেন কোন সিদ্ধ পুরুষ তপঃপ্রভাবে 'ঘূর্ণা' বায়ু উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহাকে ঘুরাইতেছে; অথবা সে যেন কোন নক্র দ্বারা এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহার আর বলপ্রয়োগ করিবার অবসর ঘটিতেছে না। মূর্খতাপন্ন যুবক যেমন শান্তিলাভে সক্ষম হয় না, তেমনি সেই ব্যাধও তখন নির্ব্বাণের স্বরূপ-নির্ণয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া শান্তিলাভে সমর্থ হইল না। সে চিন্তা করিল,—এ জগৎ অবিদ্যাকৃত; পরন্তু এই জগৎই যে অবিদ্যা, তাহা তাহার মনোমধ্যে প্রতিবোধ হইল না। ব্যাধ হৃদয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে, আমি তপঃপ্রকর্ষবশে বিশিষ্ট দেহ লাভ করিয়া দেখিব—এই পৃথিবী কতদূর আর কত ঊর্দ্ধে গিয়া এ দৃশ্যের অন্ত হইয়াছে।

এই যে সদসদাত্মক দৃশ্য আছে, আমি ইহার অন্তে যাইব; যাইয়া শাশ্বত সুখে অবস্থান করিতে থাকিব। অতএব এই যে অনন্ত আকাশ; আমি, ইহারও অন্ত যেখানে, সেইখানেই যাইব।

এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে করিতে ব্যাধ মূঢ়াবস্থায় উপনীত হইল। যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা তাহাকে বলা হইয়াছিল, অভ্যাসের অভাব নিবন্ধন সে সকল যেন ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন হইতে সেই ব্যাধ স্বীয় ব্যাধভাব পরিহারপূর্ব্বক মুনিগণ সহ সেই বনে তপশ্চরণ করিতে লাগিল। সে তত্রত্য মুনিগণের ন্যায় মুনিগণের সহিত বাস করিতে করিতে বহু সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিল। তৎকর্ত্তৃক ঐ দীর্ঘকাল অতি মহৎ তপস্যা অনুষ্ঠিত হইল। এইরূপ তপোনিরত হইয়া ঐ ব্যাধ একদিন সেই মুনিবরকে জিজ্ঞাসিল, মহাত্মন্! আমার কি আত্মবিশ্রান্তি হইবে? তখন মুনি বলিলেন,—তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে; যেমন জীর্ণকাষ্ঠে অল্পাগ্নি থাকে, তেমনি তোমার হৃদয়ে তাহা অবস্থান করিতেছে বটে, পরন্তু উহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেন না, বিনাভ্যাসে শুভজ্ঞান তুমি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছ না। সুতরাং অভ্যাস করিতে করিতে কালবশে তোমার অত্যন্ত বিশ্রান্তি লাভ হইতে পারিবে। অধুনা তোমার ভাবী নিশ্চিত ঘটনার বিষয় বিবৃত করিতেছি। সেই শ্রুতিমধুর অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ কর। তোমার আত্মা অনববুদ্ধ; জ্ঞান দোলায়মান, তাই তোমাকে মূর্খ আখ্যা প্রদান করা যায় না। সুতরাং নিজের মনে সম্যক্ বিচারালোচনা করিয়া তুমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে। তোমার দীর্ঘ তপস্যায় শতযুগ যাপিত হইলে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া দেবগণ সহ তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তিনি যখন তোমায় বর দান করিতে চাহিবেন, তখন তোমার সংশয়নিরাসকারী এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে যে, হে বিভো! বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ কি কোথাও নাই;—যাহা আদর্শের সমন্তাৎ পরিদৃশ্যমান অবিদ্যাভ্রমের অন্তরালে প্রতিবিম্ব-স্বরূপ মনোদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে? এই চিদাকাশরূপ দর্পণ পরমাণু-ভূত হইলেও যে যেখানে অবস্থিত আছে, আমি দেখিতেছি—এ জগৎ সেই সেইখানেই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, এই অনর্থগন্ধ

দৃশ্য জগৎ কি পরিমাণে অনন্ত এবং এ জগতের সীমাবহির্ভাগেই বা চিদাকাশ বিশুদ্ধভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অবস্থিত, তাহা আমি একান্তই দর্শনোৎসুক হইয়াছি। দেবশ্রেষ্ঠ! আমি এতদর্থ অবগত হইবার জন্যই বর চাহিতেছি, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আমার তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আপনি সেইরূপ বর অর্পণ করুন। এ দেহ আমার নীরোগ হউক; ইহার মৃত্যু যেন ইচ্ছায়ত্ত হয়, বৈনতেয়বৎ বেগে বিস্তৃতাকাশে গমন করিতে ইহা সমর্থ হউক। ক্ষণে ক্ষণে এ দেহ এক এক যোজন বর্দ্ধিত হউক। ক্রমশঃ ইহা আকাশের বহির্ভাগে যাউক; যাইয়া আকাশরূপে বিরাজ করুক। হে পরমেশ! এই আকাশ-সমভিব্যাহারে অবস্থিত অনন্ত জগতের অন্ত যাহাতে আমার অধিগত হয়, সেই বরই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।

হে সাধো! যখন তুমি এইরূপ বর চাহিবে, তখন দেবদেব ব্রহ্মা দেবগণ সহ অন্তর্হিত হইবেন। তোমার কৃশ কলেবর চন্দ্রবৎ কান্তি-সম্পন্ন হইবে। অনন্তর তৎকালে তুমি যখন আমায় নমস্কার করিয়া সম্ভাষণ করিবে, তখন তোমার সেই শরীর ইষ্ট পদার্থের দর্শনলালসায় আকাশে উড়িতে থাকিবে। তোমার কলেবর তখন চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন দ্বিতীয় চন্দ্র সূর্য্যবৎ কিম্বা দ্বিতীয় বাড়বানলবৎ আকাশে উঠিয়া শোভা প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর তুমি এই দৃশ্য বিশ্ব ও আকাশমণ্ডলের অন্তলাভের জন্য বৈনতেয়-বেগে যাইতে যাইতে এই ত্রৈলোক্যের অন্তে যাইবে; নদীরয়বৎ তোমার শরীর প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহা কল্পান্তমত্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম অম্বরতল ব্যাপিয়া বিরাজ করিবে। অনন্তর দেখিবে, তোমার শরীর মহাকাশে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনন্ত গগন আক্রমণ করিয়া স্বীয় বৃহৎ কলেবর অবস্থান করিতেছে। পরমার্থমহাকাশ শূন্য; তাই দেখিবে, প্রাদুর্ভূত বাত্যাসমূহবৎ নৈসর্গিক দ্রবত্ববশতঃ চিৎ-সাগরের উদ্রিক্ত তরঙ্গততি সেই সঙ্গে প্রকট হইয়াছে। তখন তোমার দৃষ্টিপথে সম্বিন্ময় স্বপ্নাবস্থায় সম্বিভাত আকাশাত্মক সুরাদির ন্যায় নিরর্গল সৃষ্টিপ্রবাহ পতিত হইবে। শুষ্ক পত্রপুঞ্জ যেমন মহাকাশে ক্ষুভিত বায়ুবশে বিস্ফুরিত হয়, তুমিও

তেমনি স্থিরনিশ্চয় হইয়া স্ফুরণশীল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিবে। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ গবাক্ষবিবর দিয়া সভাস্থ সভ্যসমূহকে দর্শন করে, তাহাদের পক্ষে যেমন গবাক্ষাচ্ছাদন জাল থাকিয়া না থাকারই অনুরূপ; তেমনি যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়, তাঁহাদের নিকট এই জগদাত্মক বৈচিত্র্য, চিদাকাশে থাকিয়াও না থাকারই প্রায়। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট অন্য পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই; তাই সর্ব্বজগৎ একান্ত অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এক বিশ্বমণ্ডলের পর সুবিশাল নভোমণ্ডল, তদনন্তর আবার বিশ্বমণ্ডল, তৎপরে পুনরপি নভোমণ্ডল, এইরূপ দেখিতে দেখিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইবে। এত দীর্ঘকাল অতীত হইবে যে, সেই বিরাট বিশাল আকাশপথে সঞ্চরণ করিতে করিতে তুমি আপনা-আপনিই উদ্বেগ অনুভব করিবে। সে কালে নিজের তপঃপ্রভাব অনুভব করিয়াই উদ্বিগ্ন হইবে এবং সে সময় নিজ দেহকে অনন্তাকাশের পূরক-মাত্র বলিয়াই অবগত হইতে পারিবে। অতঃপর মনে মনে ভাবিতে থাকিবে, আমার এই ভারভূত দেহ কেন আছে? কেন এই লক্ষ লক্ষ সুমেরু ইহার নিকট তৃণবৎ লঘু বলিয়া অনুভূত হইতেছে। আমার এই অপরিমিত কলেবর; ইহা সমগ্র আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়াছে। এ দেহে এখনও আমি আকাশমণ্ডল পরিপূরণ করিতেছি। ইহার পর আরও যে কি ঘটিবে, তাহা তো আমার বোধগম্য হইতেছে না। অহো! এই ঘোরাকার অবিদ্যা অনন্তরূপে উপলব্ধ হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বা পরিমাণ যে কি, তাহা তো কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। সুতরাং এই আকাশমণ্ডলবিচারী দেহকে আমি বিসর্জ্জন দিব; কেন না, কোন সাধু বা সৎশাস্ত্রের সঙ্গতি ইহাতে ঘটে না; অন্য কোন প্রকার মোক্ষ-সাধক বস্তুর লাভও ইহাতে হইবার নহে। অনন্ত পার-পর্য্যন্তগামী নিরালম্ব অম্বরতল আশ্রয় করিয়া আমার এই শরীর বিদ্যমান। অতি দুর্ল্লভ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সঙ্গতি আমার এই দেহ দ্বারা হইবার নহে।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি প্রাণ-নির্গমকারিণী ধারণার আশ্রয় লইবে। পরে পক্ষী যেমন ফলের সরস ভাগ ভোগ করিয়া নীরস অংশ পরিত্যাগ করে, তেমনি তুমিও সেই দেহ বিসর্জ্জন দিবে। দেহ পরিহার-

পূর্ব্বিক প্রাণসহ জীবনরূপে স্থূল বায়ু হইতে সূক্ষ্মাকারে বায়ুরূপ হইবে; তখন সেইরূপে তুমি আকাশমণ্ডলে বিরাজ করিবে। তোমার পূর্ব্বদেহ তখন ছিন্নপক্ষ মহামেরুবৎ পড়িয়া যাইবে, তাহাতে সমগ্র ভূলোক ও পর্ব্বত প্রস্তরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তৎকালে শুষ্কমাংসা অতীব ভীষণা ভগবতী কালী তোমার সেই পরিত্যক্ত দেহ ভক্ষণ করিতে থাকিবেন। তাহাতে পৃথিবী দোষবর্জ্জিত হইবেন।

সুব্রত! শুনিলে তো তুমি সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত? এক্ষণে আজীবন তপস্যা করিয়া করিয়া তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, কর।

ব্যাধ বলিল,—ভগবন্! বড়ই কষ্টের কথা! আমাকে আজীবন দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে? আমি বৃথা অর্থ ভাবিয়া ভাবিয়া অনর্থের জন্য দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছি। মুনিবর! জিজ্ঞাসা করি, আমার উদ্ধার লাভের এ বিষয়ে কোন উপায় আছে কি? যদি না থাকে, যদি বা ইহার অন্যথা হইতে পারে, তবে তাহাও আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

মুনি কহিলেন,—যে অর্থ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কেহ কখন অন্যথা করিতে পারে না। বহু যত্ন, বহু চেষ্টা করিলেও উহা রক্ষিত হইবার নহে। যাহা বাম, তাহাকে দক্ষিণ, যাহা দক্ষিণ, তাহাকে বাম করিতে অথবা মস্তককে পদাভিমুখ করিবার শক্তি যেমন কাহারও নাই, তেমনি যাহা অবশ্যম্ভাবী বস্তু, তাহার অন্যথা করিবার শক্তি কাহারই নাই। সত্য বটে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যৎ অর্থের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তাহা ভিন্ন অন্য কোনই অপূর্ব্ব তাহাতে ঘটে না। যে সকল পুরুষ-প্রবর পূর্ব্বকৃত সুকৃত সাহায্যে ইদানীন্তন শমদমাদি সাধনপ্রাপ্ত ও ব্রহ্মভাবে প্রসুপ্ত, তাঁহারাই—সেই সকল মহাত্মারাই প্রাক্তন কর্ম্মবেদনাসমূহ সমূলে সমুচ্ছেদন করিয়া জয়যুক্ত হইয়া থাকেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

ব্যাধ বলিল,—প্রভো! তৎকালে আমার সেই দেহ অধস্তাৎ ক্ষিতি-পৃষ্ঠে পড়িয়া গেলে আমি আকাশে থাকিব; কিন্তু সেই আকাশস্থ অবস্থায় আমার কি দশা হইবে?

মুনি কহিলেন,—সাধো! তোমার সেই দেহপতন হইবার পর সেই মহাকাশে কি অবস্থা তোমার উপস্থিত হইবে, সপ্রণিধান শ্রবণ কর।

সেই কালে তোমার দেহ আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে প্রাণ-সমভিব্যাহারী জীবাত্মা তোমার বায়ুকণাকারে বিততাকাশে বাস করিবে। তুমি যেমন স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়া থাক, তেমনি তোমার সেই দেহের বাসনাময় বিশাল জগৎ তুমি দেখিতে থাকিবে। তদনন্তর চিত্তবৃত্তির মহত্ত্বগুণে জীব তোমার সঙ্কল্পিতার্থের ভাজন হইয়া এইরূপ বিবেচনা করিবে যে, আমি ভূপৃষ্ঠে রাজা হইয়াছি। এইরূপ বিবেচনাকালীন সহসা তোমার জ্ঞান হইবে যে, আমি শ্রীসিন্ধু নামে একজন অতি বড় সম্মানভাজন মহীপাল হইয়াছি। পিতা আমার বনে গিয়াছেন; যাইবার সময় তিনি আমায় এই চতুঃসাগরান্তা পৃথিবী প্রদান করিয়াছেন। আমি এক্ষণে পৃথিবী-রাজ্যের রাজা হইয়াছি। কিন্তু সীমান্ত দেশস্থ বিখ্যাত নরপতি বিদূরথ আমার শত্রু হইয়াছেন। প্রবল প্রযত্ন ব্যতীত তাঁহাকে জয় করা সম্ভব-পর নহে। পিতার বনগমনকালীন আমার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষ ছিল; এখন একশত বর্ষে উপনীত হইয়াছি। এই দীর্ঘকালাবধি আমি পুত্র-কলত্রাদির সহিত মহাসুখেই রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, অধুনা সীমান্ত-রাজের বড়ই বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সহিত ঘোর সংগ্রাম আমার অপরিহার্য্য দেখিতেছি।

এইরূপ চিন্তা করিবে; ক্রমে বিদূরথরাজের সহিত তোমার যুদ্ধ বাধিবে। সে যুদ্ধ চতুরঙ্গবলক্ষয়কর হইয়া উঠিবে। সেই ঘোর বিগ্রহে তুমি বিরথ থাকিবে; তথাচ করবাল প্রহারে বিদূরথ রাজের রথের জঙ্ঘা-চ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অনন্তর চতুরুদধি

পর্য্যন্ত বিশাল ভূমণ্ডলে তুমি এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবে যে, তোমার ভয়ে দিক্‌পালগণও ভীত হইবেন; এবং সাদরে তোমার আদেশ মান্য করিয়া চলিবেন। একদা নিখিল ভূমণ্ডলের একমাত্র অধীশ্বর সিন্ধু-নামধেয় নরনাথ তুমি—তোমার পাণ্ডিত্যশালী মন্ত্রিবর্গের সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা হইতে থাকিবে। মন্ত্রী কহিবেন,—মহারাজ! বলিতে কি আপনি বিদূরথ নরপতিকে পরাজিত করিয়া প্রেত-রাজ-ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা আমাদের নিকট একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। তখন তুমি বলিবে—আমার নিধন নাই। আমি কল্পান্তকালীন অর্ণবের ন্যায় প্রবল বাহুবলশালী। বিদূরথ রাজা কি আর আমার অজেয় শত্রুমধ্যে গণ্য হইতে পারে? মন্ত্রী বলিবে,—বিদূরথ-রাজের এক সাধ্বী পত্নী আছেন। তাঁহার নাম লীলা। লীলা অতীব সুদুঃসহ তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। যিনি নিরঞ্জনা জগদ্ধাত্রী সরস্বতী দেবী, তাঁহাকে সেই লীলা দেবী মাতৃরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। ভুবনভাবিনী বাণী দেবী রাজপত্নী লীলাকে স্বীয় কন্যারূপে গ্রহণপূর্ব্বক তন্নিমিত্ত মোক্ষাদি অতি দুষ্কর কার্য্যও অনায়াসে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষণমধ্যেই এই ত্রিজগৎকে একটীমাত্র কথায় বরদান-পুরঃসর অজগৎ করিয়া দিতে পারেন। অতএব আপনার তিনি বিনাশ সাধন করিবেন; সে পক্ষে তাঁহার সামর্থ্য বা প্রযত্নাতিশয্য কি! তুমি সিন্ধুরাজ বলিবে—মন্ত্রিন্! তুমি যোগ্য কথাই কহিয়াছ; ব্যাপার যদি এইরূপই হয়, তবে সেই বিদূরথ নরপতিকে জয় করা এক প্রকার অসম্ভবই; সুতরাং সমরে তাহার সংহার এক আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি রাজার প্রতি ভগবতীর এতই অনুগ্রহ, তবে আমার সহিত যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হইল না কেন? মন্ত্রী কহিবেন; হে নলিননেত্র নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা একাগ্রমনে দেবীর নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিতেন যে, এ সংসার হইতে আমার মুক্তি হউক। হে বিভো! এই জন্যই সেই সর্ব্বসংবিৎশালিনী দেবী রাজার তথাবিধ অভীষ্ট পূরণ করিলেন। তাই যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। তুমি সিন্ধুরাজ বলিবে—ঘটনা যদি এই-রূপই, তবে আমি তো সেই দেবীকে সর্ব্বদাই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। তিনি

আমায় কেন মোক্ষ দান করিতেছেন না! মন্ত্রী কহিবেন—সেই দেবী জ্ঞপ্তিস্বরূপা; তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বজন হৃদয়ে বিরাজমানা; তাঁহার নিকট যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। সেই দেবী আত্মহৃদয়বাসিনী; তৎসমীপে যে যেমন প্রার্থনা করে, অবিলম্বে তাহাকে তিনি তাদৃশ ফলই অর্পণ করেন। চিৎশক্তির অস্তিত্ব তাঁহাতেই অনুভূত হয়। হে অরিন্দম! আপনি তো কদাচ তাঁহার নিকট মোক্ষ কামনা করেন নাই; কেবল শত্রুসংহারের প্রার্থনাই তাঁহার নিকট আপনার করা হইয়াছে। তুমি বলিবে—সেই সরস্বতী বিশুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপা; তাঁহার নিকট কদাচ মুক্তি প্রার্থনা আমার করা হয় নাই কেন? মন্ত্রিবর! তিনি তো আমার আত্মভূতা; আমাকে তিনি মুক্তিবিষয়িণী ইচ্ছা প্রদান করিয়া কেনই বা না আমার মুক্তি নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন? মন্ত্রী বলিবেন,—মহারাজ! ভবদীয় প্রাক্তন জন্মের কুসংস্কার প্রবল ছিল বলিয়াই আপনি শত্রুসংহারেরই ইচ্ছা করিয়াছিলেন; সেই দেবীর নিকট প্রণতভাবে আপনার মুক্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করা হয় নাই। সৃষ্টির যেমন উপক্রম হইল, তখন হইতেই প্রাণিবর্গ স্ব স্ব বাসনানুরূপ স্বভাবসম্পন্ন হয়। বাল্য হইতে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তাহাকে অন্যথা করিবার শক্তি কাহার আছে! নিজ নির্ম্মল জ্ঞপ্তি দ্বারা নিজান্তঃকরণে যে পুরুষ নির্ম্মলস্বরূপ মোক্ষ কিম্বা অভ্যাসানুগুণ অন্য যাহা কিছু ভাবনা করে, সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, বাসনান্তর বিমর্দ্দনপুরঃসর তাহা নিরাপদে সেইরূপই অধিগত হইয়া থাকে।

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

সেই সিন্ধুরাজা [তুমি] বলিবে,—মন্ত্রিবর! পূর্ব্বে আমি কীদৃশ কুমতি বা অনার্য্যদেহ ছিলাম, যাহার জন্য সংসারবিষয়ক প্রাক্তন কু-সংস্কার আমার অবস্থিত আছে? মন্ত্রী কহিবেন,—মহারাজ! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি অনুরোধ করিতেছি, মদীয় অজ্ঞানোচ্ছেদী বাক্যে

দত্তাবধান হউন। ব্রহ্মনামধেয় এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু বিদ্যমান। উহা আদি-অন্ত-বিরহিত, সদসৎস্বরূপ এবং তুমি আমি ইত্যাদি নানাকারে বিদ্যমান। 'অহং'চিৎই সেই ব্রহ্ম; অতএব 'আমি সর্ব্বজ্ঞ' এইরূপ সঙ্কল্পাত্মক সম্বিৎ উপগত হইয়া তিনি অসংখ্য চিত্তরূপে পরিণত হন এবং সেই সেই চিত্তোপাধিতে যেন জীবত্ব লাভ করিয়া থাকেন—উপাধি পরিহার করেন। চিত্ত গগনবৎ নির্ম্মলাকার; উহাকে আতিবাহিক বলিয়া বিদিত হও। ঐ যে চিত্ত, উহাই বাস্তব পক্ষে সৎ; আধিভৌতিকাদি অন্য কোন কিছুই সৎ নহে। চিত্ত নিরাকার বটে; কিন্তু উহা ইহ-পরলোক-স্বপ্ন-জাগ্রৎ-মরণ-ভোগ-মোক্ষ, ইত্যাদি নানা সঙ্কল্পকারণ সৎ এবং সাকার জগৎরূপে প্রতিভাত। পবন ও স্পন্দনের যেমন অভিন্নতা, তেমনি চিত্ত নিরাকার যদিও, তথাচ বিশাল সাকার জগতের সহিত উহার অভিন্নত্ব, ইহাই পণ্ডিত-গণের স্থিরীকৃত। গগন ও শূন্যের একবস্তুতার ন্যায় এই জগৎ ও চিত্ত অভেদমূর্ত্তি। এই চিত্তে ও জগতে কিয়ন্মাত্রও ভেদ নাই। এ জগৎ অকিঞ্চিৎ সম্পূর্ণ অসত্য, বাসনাস্বরূপ মাত্র। তথাচ বহিরে কিঞ্চিৎরূপে প্রত্যয়গোচর হইয়া বিরাজিত। এ জগৎ বস্তুতঃ নিরাকার চিত্ত; ইহা বস্তুগত্যা একটী স্বাতন্ত্র্য পদার্থ নহে। সৃষ্টির যখন উপক্রম হয়, তখন পরব্রহ্ম হইতে মাত্র সত্ত্বময় বস্তুই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঐ বস্তু ক্রমে ক্রমে পরিণতি প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে উহা তামস-তামসরূপে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধুরাজ বলিবেন—প্রভো! 'তামস-তামস' এই শব্দযোগে কি বলা হইল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন; অপিচ ইহাও ব্যক্ত করুন যে, ভাবী বস্তুতে কোন্ ব্যক্তিই বা প্রথম হইতে এই এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছে? মন্ত্রিবর কহিবেন—নিরবয়ব আত্মার আতিবাহিকতা সাবয়ব-প্রাণীর করচরণাদি অবয়বেরই অনুরূপ। অনন্তর যখন স্বীয় আতি-বাহিক দেহ আধিভৌতিক নামে পর্য্যবসিত হইবে, তখন সেই আত্মা নিজেই ক্ষিত্যাদি নানা নাম করিবে। পরে এ জগতের স্বপ্নবৎ ভান হইবার পর আত্মা সঙ্কল্পকল্পিত নানারূপে নানানামে উহার ব্যবহার করিবেন। কেন না, সে কালে তুমি নানা ব্যষ্টিসৃষ্টিকল্পনায় অভিনব-রূপে প্রাদুর্ভূত; এ হেন তোমায় উদ্দেশ করিয়া সেই পূর্ব্বাভিভূত সত্ত্বময়

আত্মাই লোকে মহাতমস্করূপে প্রতীয়মান হইবে। তাই তোমার সেই আতিবাহিক জগতেই 'তামসতামস' নাম নিরূপিত হইবে। হে প্রভো! যখন স্বভাবনির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিকারিরূপে প্রত্যয়গোচর হয়, তখনই জীবভাবের আবির্ভাবে জাতিসমূহের সাত্ত্বিকাদি ত্রয়োদশবিধ সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম যখন আদিকল্পের অগ্রেই প্রথম জীবরূপে উৎপ্রেক্ষিত হন, তখন ঐ জন্মে ঔৎপত্তিক জ্ঞানৈশ্বর্য্যবিষয়ভোগীর মুক্তি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল বলিয়া সেই জাতিকে সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিক নামে নির্ব্বাচিত করা হয়। অনন্তর কিয়ৎ কালাবধি সংসারকারণ অজ্ঞানের বিদ্যমানতায় ঐ জন্মেই জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি সাংসারিক গুণসম্পন্ন জীবনিবহের মুক্তি ঘটিত বলিয়া জাতিতত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় জীবজাতিকে মাত্র সাত্ত্বিক নামে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যে সমস্ত জীবজাতি আদিকল্পে অভিনবরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও বহু জন্মাবধি বিষয় ভোগ করিবার পর মোক্ষমার্গে বিচরণ করিয়াছিল, জাতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'রাজসরাজস' নামে নিরূপণ করিয়াছেন।

এইরূপ সংসারের কারণ অজ্ঞান ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া যে সকল বিবেকাদি-গুণ-বিরহিত জীবজাতি পঞ্চ কি দশ জন্মান্তে মুক্তি পাইয়াছে, তাহারা কেবল রাজস নামে নিরূপিত হইয়াছে। আদিকল্প হইতে যে সকল জীবজাতি স্থাবর কীটাদি সংখ্যাতীত জন্মভোগের পর মোক্ষভাজন হইয়াছিল, জাতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'তামসতামস' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সকল রাক্ষস পিশাচাদি জীবজাতি বহুল নিকৃষ্ট জন্মোপভোগের পর মুক্তি লাভ করিয়াছিল, জাতিতত্ত্বাভিজ্ঞ সুধীগণের মতে তাহারা 'তামস'নামে নির্দ্দিষ্ট। এইরূপ ক্রমেই জাতিসমূহের বিবিধ ভোগ কল্পনা হইয়াছে। এই সকল বর্ণিত জাতির মধ্যে যাহা তামসতামসী জাতি, আপনি সেই জাতিতে জন্মিয়াছেন। বীরবর! ভবদীয় বহু বিচিত্র জন্ম যাপিত হইয়াছে, আমি সে সকলই অবগত আছি। পরন্তু আপনি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বিশেষতঃ আপনি যে একটা অনন্ত আকাশব্যাপী মহাশবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আপনার বহু কাল বৃথায় অতীত হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি যখন ঈদৃশ তামস-

তামস জাতিতে জন্মিয়াছেন, তখন এ সংসার হইতে মোক্ষলাভ আপনার পক্ষে একান্ত দুর্ঘট। এই কথার পর সিন্ধুরাজ কহিবেন—মহাত্মন্! বলুন আপনি, কিপ্রকারে এই প্রাগ্‌ভবীয় অধম জাতির অভিভব সাধন করিতে পারিব? ইহা সংশোধন করা যায়, এমন যদি কোন উপায় থাকে তো আমায় উপদেশ দিন। আমি তাহার যথোচিত অনুষ্ঠান করিব। মন্ত্রিবর বলিবেন,—এই ত্রিলোকাভ্যন্তরে এমন কোন কিছুই নাই, যাহা অবিচল পুরুষকার দ্বারা পাইতে পারা না যায়। এরূপ তো অহরহই প্রত্যক্ষ হয় যে, যাহা পূর্ব্বদিবসীয় গর্হিত কার্য্য, তাহা পরদিবসীয় সাধু কার্য্য দ্বারা প্রচ্ছাদিত হইয়া থাকে। তাই বলি, আপনি পূর্ব্ব অসৎ ক্রিয়া জয় করিয়া সৎকার্য্যনিষ্ঠ হউন। যে মানব যাহা কামনা করে, আর তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ন করে, সে যদি পরিশ্রম-বোধে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে তাহার অবশ্যই তাহা লাভ হইয়া থাকে। পুরুষ যে-যেরূপ যত্ন করে, যন্ময় হইয়া ভাবনা করে এবং যে যেরূপ হইতে অভিলাষ করে, সেইরূপই হয়, অন্যথা হইবার নহে।

মন্ত্রী কহিলেন,—সেই মন্ত্রিবর সেই সিন্ধুরাজকে এই এই কথা কহিলে, তিনি রাজ্যভার পরিহারে মনস্থ করিবেন। যেমন সেইরূপ মতি হইবে, অমনি তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর সেই সিন্ধুরাজ দূর বনে যাইবেন। মন্ত্রিগণের বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি আর সেই অসপত্ন রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। স্বীয় মন্ত্রীর বিবেকবাক্য-বৈভবে সিন্ধুরাজ সাধু পুরুষদিগের মধ্যেই বাস করিতে থাকিবেন। কুসুমসংসর্গে গন্ধোদ্রেকের ন্যায় তাঁহার তখন বিবেকোদয় হইবে। অনন্তর তিনি অনবরত বিচার করিতে থাকিবেন যে, এই জন্ম কিরূপে হইল? এই সংসারাগম কোথা হইতে ঘটিল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার মুক্তি লাভ হইবে।

সেই সিন্ধুরাজ নিয়ত এইরূপ বিচারনিষ্ঠ হইয়া সৎসঙ্গ গুণে পবিত্রপদ লাভ করিবেন। তাঁহার যে মোক্ষপদ প্রাপ্তি ঘটিবে, ব্রহ্মলোক লাভ হইতে যাবতীয় সম্পদই তাহার নিকট বায়ু-বিধূত শুষ্কপত্রবৎ অতিতুচ্ছ বস্তু।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ।

মুনি বলিলেন,—এই আমি অতীত ঘটনাপরম্পরার ন্যায় ভবিষ্য ঘটনা সকল কীর্ত্তন করিলাম। ওহে ব্যাধ! অধুনা তোমার যেরূপ ভাল বোধ হয়, কর।

অগ্নি কহিলেন,—সেই মুনির এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া ব্যাধ বিস্ময়াকুলচিত্তে কিয়ৎকাল চিন্তা করিল; অনন্তর সেই মুনির সহিত স্নান করিতে গেল। ব্যাধে ও মহামুনিতে এইরূপে আকস্মিক মিত্রতালাভ হইল। ব্যাধ তপঃ-শাস্ত্রনিপুণ মুনিগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মুনি অল্পকালাভ্যন্তরেই নিজ নির্দ্দিষ্ট আয়ুর অবসানে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাণলাভান্তে পরব্রহ্মে বিলীন হইলেন। ইহার পর এক শত যুগকাল অতীত হইল। তখন ব্যাধের ইষ্টবর অর্পণ করিবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগত হইলেন। স্বীয় বাসনাবেশ-নিরাসে অক্ষমতা নিবন্ধন ব্যাধ পূর্ব্ব হইতে জানিয়া-শুনিয়াও সেই মুনির বর্ণনানুরূপ বর প্রার্থনা করিল। তখন ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ব্যাধ আপন তপঃফল ভোগ করিবার নিমিত্ত বিহঙ্গবৎ আকাশে উড়িতে লাগিল। তাহার পর্ব্বতপ্রমাণ বর্দ্ধনশীল দেহ হইল। সে, সেই দেহে অপরিমিত কাল ধরিয়া জগৎপারস্থ মহানভোমণ্ডল পরি-পূরিত করিতে লাগিল। মহাবৈনতেয়বৎ বেগে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ চতুর্দ্দিকের আকাশপথ তৎকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইল। এই অবস্থায় তাহার বহুকাল কর্ত্তিত হইল। এতকালেও যখন ব্যাধের সেই অবিদ্যা জন্য ভ্রমের অবসান ঘটিল না, তখন তাহার মনে মনে উদ্বেগ সঞ্চার হইল। প্রাণপরিহারক্ষম প্রযত্ন বিশেষবশে আকাশেই তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। ব্যাধের শরীর শবাকারে নিম্নে নিপতিত হইল। আকাশমার্গেই তাহার চিত্ত সিন্ধুরাজরূপত্ব লাভ করিল। এই মহীপাল সিন্ধুরাজই বিদূরথের প্রতিদ্বন্দ্বি

পদে অধিষ্ঠিত হইল। তাহার দেহ শত সুমেরুসমষ্টিবৎ ছিল। তাহা তখন মহাশবাকারে পর্য্যবসিত হইল। সেই দেহ যেন একটা দ্বিতীয় পৃথিবী; উহা তখন আকাশদেশ হইতে বজ্রবৎ পতিত হইল। এ দেহ যখন পতিত হয়, তখন পৃথিবীর অবতরণমার্গবৎ এবং পতনানন্তর পৃথিবীর প্রচ্ছাদনবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। হে পণ্ডিতপ্রবর! আমি তোমার নিকট সেই মহাশব-বিবরণ সকলই কীর্ত্তন করিলাম। এই জগদভ্যন্তরে যথায় সেই শব পড়িয়াছিল, তাহা আমাদের স্বপ্ন-রমণীর ন্যায় প্রত্যয়গোচর হইয়াছিল। রক্তাক্ত অস্ত্রমণ্ডিতা শুষ্কমাংসা দেবী চণ্ডিকা সেই দেহ পাইয়া অত্যন্ত তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন। সেই হিমগিরিপ্রতিম শবদেহের মেদোরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় এই মেদিনীর মেদিনী নাম অনুগতার্থ হইয়াছিল। সেই মহামেদোরাশিই অবশেষে মৃত্তিকাকারে পরিণতি পাইল। তখন আবার নূতন করিয়া এ পৃথিবীতে বনরাজি প্রোদ্ভূত হইল; নানা পত্তন ও গ্রামসন্নিবেশ হইল; পাতালোদর হইতে ভূধর সকল প্রাদুর্ভূত হইল এবং পুনরপি বাণিজ্যশ্রী পরিপুষ্ট হইল।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

ঊনষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

অগ্নি কহিলেন,—হে পণ্ডিতাগ্রণী! যাও—তুমি আপন অভীষ্ট দিকে প্রস্থান কর। এই ভূমণ্ডল স্থির হইয়াছে; ইহাতে পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্যবহারাদি চলিতেছে। ভাস বলিলেন—এই কথার পর ভগবান্ বিভাসু তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন এবং বৈদ্যুতাগ্নিবৎ নির্ম্মল নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। এদিকে আমিও আপন চিত্তে আপনি প্রাক্তন সংস্কারসমূহ বহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিজ কর্ম্ম নির্ণয়ার্থ ব্যোমপথে থাকিতে লাগিলাম। পরে পুনর্ব্বার আকাশে দেখিলাম—নানাকারশালী জগন্মণ্ডল নানা গতিভঙ্গী

সহকারে আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও ছত্রাকৃতি পদার্থপুঞ্জ পরস্পর সংলগ্নভাবে শোভিত হইতেছে; চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া নানাদিকে ঘুরিতেছে; কোথাও মৃন্ময় দেহশালী শৈলপরিমিত ভূতবৃন্দ প্রতিভাত হইতেছে; কোথাও পাষাণময় দেহসম্পন্ন প্রভৃত প্রাণী অবস্থিত আছে। আকাশের কোথাও দেখিতে পাইলাম, একীভূত উপলখণ্ডময় দেহিগণ বিরাজ করিতেছে; তাহাদের আছে মাত্র বাক্‌শক্তি, তদ্ভিন্ন অন্য শক্তি নাই। আমি বহুকাল ধরিয়া মনোমাত্র দেহে এই এইরূপ দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু অবিদ্যার অন্তাবলোকন আমি করিতে পারিলাম না; সেই সমুদায় দৃশ্যপরম্পরায়ও আর আমার রুচি রহিল না। ইহার পর আমি যখন বিজন বনে মোক্ষসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতে উদ্যত হইলাম, তখন ইন্দ্র আকাশে আমার এই মৃগযোনি লাভের কথা কহিলেন। আমি আকাশে মন্দারবনে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ স্বর্গভোগার্থ মোহমগ্ন হইলাম।

ইন্দ্র আমায় পূর্ব্বোক্ত বিষয় বলিলে, আমি বলিলাম—হে দেব! সংসার হইতে খেদানুভব করিতে হইবে ভাবিয়া আমি বড়ই ভীত হইয়াছি; কি-রূপ সত্বর আমার মুক্তি লাভ হইতে পারে? এই কথার পর ইন্দ্র অগ্নির নিকট হইতে পূর্ব্বশ্রুত মদীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে বিশুদ্ধির কথা বর্ণন করিয়া আমায় অন্য বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে বরান্তর চাহিয়া লইলাম।

ইন্দ্র কহিলেন,—বহুকাল যাবৎ তোমার চিত্ত মৃগযোনিমধ্যে প্রবেশার্থ উন্মুখ রহিয়াছে। এই জন্য উহা যে অবশ্যই হইবে, এরূপ আমার মনে হয়। তুমি মৃগ হইবে; পবিত্র মহাসভায় যাইবে; তথায় আমার সাহায্যে তোমার অপ্রতিহত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি সংসারক্ষেত্রে মৃগরূপে জন্ম লও; তথায় তোমার নিখিল আত্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইবে। ঐ বৃত্তান্ত স্বপ্নের মত, ভ্রমের মত, অশেষ কল্পনাপ্রসবের মত এবং প্রসঙ্গতঃ পারলৌকিক অনুভূত বস্তুর স্মৃতি মত প্রতীত হইবে। যখন তোমার মৃগত্ব ঘুচিয়া যাইবে, তখন জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ দেহাবসানে তোমার হৃদয়স্থ সমস্ত বৃত্ত স্ফুরিত হইবে। তুমি অবিদ্যাখ্যায়

প্রখ্যাত চিরন্তন ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক নিষ্পন্দ বায়ুবৎ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এই প্রকারে দেববাণীর অবসানে আমার মনে এরূপ একটা নিশ্চিত প্রতিভার অভ্যুদয় হইল যে, আমি তৎক্ষণেই যেন বনের হরিণ হইয়াছি। তাহাই হইলাম। হরিণ হইয়া আমি মন্দার বনের কোন এক প্রদেশস্থ পর্ব্বতে তৃণ-দর্ভাঙ্কুর ভোজন করিতে লাগিলাম। অনন্তর একদা দেখিলাম, সীমান্ত প্রদেশের কোন নরপতি মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইলাম। অতঃপর হে রঘুবর! সেই সীমান্ত নরপাল আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দিবসত্রয় রাখিলেন, পরে ভবদীয় ক্রীড়ার্থ এই-খানে আনয়ন করিয়াছেন। হে শুদ্ধরূপ! এই আমি ঐন্দ্রজালিক-প্রায় সাংসারিক বিবিধ আশ্চর্য্য-রসপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত ভবৎসমীপে নিবেদন করিলাম। কি বলিব অবিদ্যার কথা, ইহা শাখাপ্রশাখাশালিনী অনন্তরূপিণী; ইহার শান্তির উপায় আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

বাল্মীকি কহিলেন,—বিপশ্চিৎ এই কথা কহিয়া ক্ষণেকের জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন প্রশস্তগতি রামচন্দ্র তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—প্রভো! যদি অপর সঙ্কল্পরূপ মৃগ আমাদের নেত্রাতিথি হইল, তবে যে পুরুষের সঙ্কল্প নাই, তাহার অন্য সঙ্কল্পস্থ বস্তু-পরম্পরার আত্মাতে দর্শন সুসম্পন্ন হয় কিরূপে? তাহা বিশদভাবে বিবৃত করুন।

বিপশ্চিৎ বলিলেন,—সেই পূর্ব্বোক্ত মহাশব যথায় পড়িয়াছিল, ইন্দ্র একদা যজ্ঞগর্ব্বে সেই ভূপ্রদেশ দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময় দুর্ব্বাসা মুনি আকাশপথে ধ্যানস্থ ছিলেন। ইন্দ্র যাইবার কালে তাঁহাকে গতাসুজ্ঞানে না জানিয়া পদাঘাত করেন। তাহাতে দুর্ব্বাসা কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ওরে ইন্দ্র! অচিরকালমধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ একটা ঘোর বিশাল শবদেহ পতিত হইয়া তোমার ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। তুমি আমায় শববোধে অবমানিত করিয়াছ বলিয়া মৎশাপে সত্বরই তোমায় ভূতলগত হইতে হইবে। সেই মুনি ইন্দ্রের মৃগভাবকল্পনাত্মক বাক্যে তথা অন্য বচনবিন্যাসে যাদৃশ কল্পনা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই কল্পনা তথাবিধরূপে বহিঃপরিস্ফুট হইয়া

মুনির উক্তি অনুসারেই আপনাদের দৃগ্‌বিষয়ীভূত হইয়াছে। ব্যবহারিক জগৎ সৎ আর সাঙ্কল্পিক জগৎ অসৎ, এরূপ অবশ্য বাস্তবপক্ষে হইবার নহে। কেন না, সৎই বল আর অসৎই বল, উভয় বিষয়েই তুল্য প্রতিভার উদয় হইয়া থাকে। এই যুক্তিযুক্ত সন্দর্ভের স্পষ্ট প্রতিপত্তির নিমিত্ত তোমায় অপর একপ্রকার যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

হে মহাভাগ! ব্রহ্ম পদার্থে কি না সম্ভবপর হইতে পারে! তিনি সকল, তাঁহাতে সকল, তাঁহা হইতে সকল, তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী। সেই সর্ব্বশক্তিযুক্ত ব্রহ্মপদার্থে সঙ্কল্পপরম্পরার অমিলন যেমন সম্ভবপর, তাহাদের পরস্পর মিলনসম্ভাবনাও সেইরূপই। সঙ্কল্পনিচয়ের যে পরস্পর মিলন হয়, ইহা মৃগদর্শনাদি ব্যাপারে প্রত্যক্ষতই অবগত হওয়া যাইতেছে। কেন না, যাহা সর্ব্বস্বরূপ, তাহাতে ছায়া এবং আতপ উভয়ই তো আছে। বিরুদ্ধ বস্তুপরম্পরার মিলন যদি না ঘটে, তবে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতা সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? অপিচ সঙ্কল্পময় নগরনিচয়ের পরস্পর মিলন কেনই বা ঘটিয়া থাকে। ফলে বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুসমূহের পরস্পর মিলন সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্মে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপে যিনি বিরাজ করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে যে, বলীয়সী মায়া তাঁহাকেও মোহিত করিয়া থাকে। বিধি-নিষেধ মিলিত হইয়া যাহাতে অবস্থিত হয়, সেই ব্রহ্মবস্তু আপনা দ্বারাই আপনি ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্ম পদার্থের সত্তায় অবিদ্যা সাদি ও অনাদি উভয়রূপেই অনুভূতিগোচর হয়। ত্রিভুবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উহা কেবল শুদ্ধজ্ঞানরূপে পরিস্ফুরিত হয় না। ব্রহ্মের সত্তার অভাবে মহাকল্প-ধ্বস্ত বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি হয় কিরূপে? আর অগ্নি, অনিল ও অবনির উৎপত্তিই বা হয় কি প্রকারে? সুতরাং এই যে জগৎ, উহা তাঁহার স্ফুরণ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বেদান্তাদি শাস্ত্র ও বিদ্বজ্জনের অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টান্তনিচয় প্রমাণরূপ গ্রাহ্য না করিয়া যে সমস্ত প্রতিবাদী কল্পাবধি বিবাদ-বিসম্বাদে দিন কাটাইতেছে, সেই সকল ব্যক্তির শান্ত সাধু পুরুষদিগের সহিত ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। চিৎশক্তির এবম্বিধ বিলাস বিভ্রম অবগত হইতে পারিলেই ক্ষণেকের মধ্যে সমস্তই সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মসত্তাই বিশুদ্ধজ্ঞানের

স্বরূপ ; ইহাই পণ্ডিতগণের সার প্রবোধ। যেমন স্পন্দন হইতে বায়ুশ্রী বিভাত হয়, তেমনি ব্রহ্মসত্তাই জগদাকারে পরিস্ফুরিত। এ সংসারে সকলই অনুৎপন্ন এবং সকলেই অমৃত ; আমি মরি ; আর আমি বিদ্যমান আছি, এ সকলই চৈতন্যেরই কেবল প্রতিভাস। ঐকান্তিক নাশ যদি মৃত্যুনামে নিরূপিত হয়, তবে তাহাও তো নিদ্রাসুখপ্রতিম। যদি পুনরায় উহা দৃগ্‌-গোচরীভূত হয়, তবে উহাই আবার জীবিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে ; তাই বলিতেছি—এ সংসারে মরণ বা জীবন কিছুই নাই। মাত্র একেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে ; দুয়ের বিদ্যমানতা বটে এবং অবিদ্যামানতাও বটে ; ফলে চেতনার বিলাসেই দুয়ের বিদ্যমানতা আর চেতনাবিলাস ব্যতিরেকে দুই-ই অবিদ্যমান। একমাত্র চিৎই সতত চেতিত হইতেছেন ; অতএব তাঁহারই অনন্ত জয়যোগ হউক। চৈতন্যই তো জীবন, তদ্ব্যতীত ইহা আর কি পদার্থ ? চিন্মাত্র জীবন নিসর্গতই অক্ষয় ও দুঃখবর্জ্জিত ; সুতরাং কোথায় কাহার দুঃখ থাকিতে পারে ? এ জগতে যত প্রকার নামরূপ দেখা যায়, সমস্তই চিদাকাশের বিকাশ মাত্র। উহা একটী, আর উহা আর একটী, এইরূপে একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতির কল্পনা হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ একত্ব দ্বিত্বাদি কি, তাহা একবার বল দেখি। জলে যেমন আবর্ত্তাদি পরব্রহ্মরূপ, চিতিতে দেহাদিও সেইরূপই। চিৎসত্তার সন্নিবেশরূপ কারণ ব্যতীত কারণান্তরের অভাবে সকলই আকাশস্বরূপ। এ জগৎ চিত্তের বিলাসমাত্র। এখানে অতীতের বস্তুও কিছুই নাই ; বর্ত্তমান অনুভববিষয়ী-ভূতও কিছুই নাই। জানিও, এই বর্ত্তমান অনুভূতিতেও শূন্যস্বরূপ আত্মাই প্রতিভাত হইতেছেন। এই চিদাকাশের শূন্যস্বরূপতার ন্যায় এই পরি-দৃশ্যমান জগতেরও তথাবিধ শূন্যস্বরূপতা। কেন না, ইতস্ততঃ যে আকাশ দর্শন করি, উহা চিন্মাত্রাকাশেরই স্ফূর্ত্তিমাত্র। একত্র ভূমি আছে, অন্যত্র বায়ু ও আকাশাদি অন্যান্য ভূতবৃন্দ আছে ; পরন্তু এ সকলই আকাশ বৈ আর কিছুই নহে। এ জগৎ চিত্তেরই ভান ; ইহাদের নাই ঐক্য, নাই ভেদ, কিছুই নাই ! ঐ জগতে প্রতিঘতা বা অপ্রতিঘতাও নাই। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার নিকট সমস্ত দৃশ্যপরম্পরাই অপ্রতিঘস্বরূপে প্রতিভাত হয়। এ সংসারে জ্ঞত্ব এবং অজ্ঞত্ব এই দুইটীকে যে সৎ বলিয় নির্দ্দেশ

করা যাইবে, তাহাও নহে। আর যে অসৎ বলিয়া বলা যাইবে, তাহাও নহে; কেন না, যখন পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সৎ অসৎ উভয়ই এক হইয়া যায়। সুতরাং যাবতীয় বস্তুই কাষ্ঠমৌনপ্রায়, ব্রহ্মই পরম পদ; এই অনন্ত দৃশ্যই পরব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং এই নিখিল জগৎপরম্পরা পরব্রহ্মের বিকাশমাত্র বলিয়াই সুসিদ্ধ। চিৎপদার্থের স্বরূপ যে কি, তাহা এই বলা হইল। ঐ চিৎপদার্থ আপনাতেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রেই এমন কি প্রতি অঙ্গুলি-মিত স্থানেই সংখ্যাতীত সৃষ্টি ও সংখ্যাতীত মৃত জীবপরম্পরা অদৃশ্য এবং অপ্রতিঘরূপে অবস্থিত আছে। উত্তরোত্তর সূক্ষ্মস্বরূপ সিদ্ধ লোকপরম্পরা স্ব স্ব সূক্ষ্মাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর সম্মিলিতভাবে সেই ব্রহ্ম পদার্থেই প্রোতভাবে অবস্থান করে, করিয়াও পরস্পরকে তাহারা দর্শন করিতে পারে না। এই গগনস্বরূপা দৃশ্যশ্রী আত্মাকাশেই প্রকাশমান। ইহা অনন্য-দৃষ্টা, চিৎস্বরূপা ও নিজেই নিজের দ্রষ্টা। এই দৃশ্যশ্রী অন্ধকারপ্রায়, সম্যক্ বিদিত হইলেও যথাস্থিত-রূপেই অবস্থিত। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন অশেষবিধ বিশেষ জ্ঞানের নিবর্ত্তনে প্রকৃত তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তখন এ জগৎ সৎই হউক বা অসৎই হউক, অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকে। সমুদ্রে কত জল-বিন্দু আছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কত বিশ্লেষ ও কত সঙ্গম হইয়া থাকে। এইরূপে যাহা সেই ব্রহ্মরূপ সমুদ্র, তাহাতেও জীবপরম্পরার পরস্পর কত বিশ্লেষ—কতই না সঙ্গম ঘটে। এই যে সৃষ্টিবিলাস দেখিতেছ, ইহা স্বপ্নের মত প্রতিভাত; ইহার আদিতে চিৎ কেবল আকাশময়ই ছিল। অতএব এই যাহা কিছু দৃশ্য দেখা যাইতেছে, এতৎসমস্তই সেই শান্ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ইহাই বটে স্থির সিদ্ধান্ত। এই জগৎপরম্পরা স্বকর্ম্মফল-বিজৃম্ভিত অনন্ত বিভবসম্পন্ন; ইহা আমি কত দেখিলাম, কত ভোগ করিলাম; কত যুগযুগান্তর ধরিয়া দিকে দিকে ভ্রমণ করিলাম; এক্ষণে বুঝিলাম—একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বিনা অন্য কোন উপায়েই এই দৃশ্য-দোষনিবৃত্তি সম্ভবপর নহে।

ঊনষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—বিপশ্চিৎ এই এইরূপ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ সহস্ররশ্মি যেন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবার জন্যই নিজ পাদ [রশ্মি] সকল দূরে প্রসারিত করিয়া লোকান্তরে উপনীত হইলেন। দিবাবসানজ্ঞাপক দুন্দুভিবৃন্দ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। যেন সমস্ত দিঙ্‌নিচয়ই সসন্তোষে জয়জয়কার ধ্বনি করিল। রাজা দশরথ বিপশ্চিতের পরিচর্য্যার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামচন্দ্রাদি রাজকুমারগণ এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পরস্পর পরস্পরকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। সভ্যগণ স্নান-ভোজনান্তে স্ব স্ব গৃহে গিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন রাত্রি প্রভাত হইল, অমনি সকলেই আসিয়া পুনর্ব্বার সমবেত হইলেন। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় আবার সভাধিবেশন হইল। তখন মুনিবর স্বীয় বদনপ্রভায় অন্তরের আহ্লাদ উদ্‌গিরণ করিয়া সেই পূর্ব্বপ্রস্তুত কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, সুধাকর যেন সুধাক্ষরণ করিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন,—নৃপবর! এই দেখুন, এই অবিদ্যা অসৎ হইলেও সৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিপশ্চিৎ এত যত্ন করিয়াছেন, তথাচ ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যে পর্য্যন্ত না এই অবিদ্যার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ততকাল উহাকে অনন্ত অবিনশ্বর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। পরন্তু যখন পরিজ্ঞাত হয়, তখন উহা মরীচিকাসলিলের ন্যায় সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। হে প্রশস্তমতে! এই বিপশ্চিৎ ভাসের ইতিবৃত্ত আপনি নিজে দেখিয়াছেন; আপনার মন্ত্রিগণও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার পর এই সকল কথায় যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে এবং তাহাতে অবিদ্যার শান্তি হইয়া যাইবে, তখন আপনাদের ন্যায় এই ব্যক্তিও জীবন্মুক্তপদে সমাসীন হইবেন। অবিদ্যাজ্ঞানকে সৎরূপে ধারণ ব্রহ্ম নিজেই নিজেতে করিয়াছেন। এইরূপ ভ্রমের ভরেই অবিদ্যার রূপ অসৎ হইলেও সৎরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অবিদ্যাই

ব্রহ্মরূপে পরিজ্ঞাত হয়, তাবৎ উহা অপরিজ্ঞাত থাকে। পরন্তু যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আর ইহার সত্তা থাকে না। এই অবিদ্যা মোহমাধব-মঞ্জরী, অনন্ত অশেষ ফলশালিনী, জড়রূপিণী, মনোহারিণী ও রসবিশেষময়ী। ইহা বন্য বেণুলতার ন্যায় অন্তঃসারশূন্যা, গ্রন্থিমতী, কোমলস্পর্শ-যুতা, কণ্টকময়ী, অঙ্কুরাকীর্ণা, জড়স্বভাবা ও সুবিস্তৃতা। ইহাতে ফলাশা বৃথাই হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা ইহা নিষ্ফলা অথবা মনোহরণক্ষমা। যেমন আকালিক পুষ্পমালা, তেমনি ইহা অশুভদায়িনী বলিয়া পরিগণিতা। যেমন সুদীর্ঘ তমোময়ী রজনী, তেমনি ঐ অবিদ্যা অকিঞ্চিৎরূপিণী হইয়াও নানা ভুবনব্যাপিনী। উহা কেশোণ্ড্রভ্রান্তির ন্যায় নানা গ্রন্থিশালিনী, উহাকে বৃথাই দেখা যায়, দেখা গেলেও উহা অকিঞ্চিৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়। ঐ অবিদ্যা চিদাকাশে বিচিত্র বর্ণময়ী, নির্গুণা, বিততাকারা এবং ঔৎপাতিক ইন্দ্রচাপবৎ বিরাজমানা। যেমন বর্ষাকালের নদী, তেমনি ঐ অবিদ্যা বহু জড়তরঙ্গ-যুতা। উহা কলুষিত, সফেন, চক্রবৎ আবর্ত্তযুক্ত ও অপায়সম্পন্ন। ঐ অবিদ্যায় শত শত জগৎস্বরূপিণী শূন্য মরীচিকা নদী অনবরত বহিয়া যাইতেছে। স্বপ্নপুরে পরিভ্রমণ করিয়া সুপ্ত ব্যক্তি যেমন সে পুরে অন্ত প্রাপ্ত হয় না, তেমনি জাগ্রদভিধেয় স্বপ্নপুরে অনন্তকাল ভ্রমণ করিয়াও কেহই ইহার শেষ সীমা পায় না। এক দৃশ্য জগতের দেহ পরিহারপূর্ব্বক যে সকল জীব জগদাকার ভাবনা সুদৃঢ় করিয়া রাখে, মৃত্যুর অনন্তর নিরাকার ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত জীবের সঙ্কল্পজালই পুনরায় অন্য জগৎ ও তত্রত্য দেহাকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাদের যে সেই চিদাকাশের কোষস্বরূপ সঙ্কল্পপরম্পরা, তাহাই নভোমণ্ডলে সিদ্ধ লোকরূপে প্রতিভাত হয়। ফল কথা, ঐ সমস্ত সঙ্কল্প-বিবর্ত্তময় সিদ্ধ নগরাদি দেখা না গেলেও সৎ আর সমীচীনরূপে দৃষ্ট হইলেও অসৎ হইয়া পড়ে। ঐ সিদ্ধ নগর মৃত জীবের সঙ্কল্প-বিবর্ত্তরূপ ; উহা ক্রমশঃ মণিমাণিক্য ও স্বর্ণমুক্তাদি বৈভবে সমাকীর্ণ হইয়া উঠে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, অর্থ, পানাদি, সুরাময় সরোবর, মধু, মদ্য, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, প্রভৃতির নদী, চন্দ্রবৎ সুন্দরী কামিনীকুল, সমস্ত ঋতুর সকলপ্রকার ফল-পুষ্প-পল্লব ও রমণীদিগের হাবভাব বিলাস, এই সকল দ্বারা ক্রমেই উহা

পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মৃতজীব যেমন সঙ্কল্প করে, অমনি আকাশেই সর্ব্ববিধ বিভবের সমাবেশ হইয়া উঠে। কোন কোন সিদ্ধপুরী সঙ্কল্প-বলে সহস্র সহস্র চন্দ্রমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া থাকে, কোন কোনটী শত সূর্য্য-সমুজ্জ্বল, কোনটী স্বর্ণময়, কোনটী অমৃতপরিপূর্ণ এবং কোনটী বা জলময়রূপে বিভাত। এইরূপে কোন কোনটী তমোময়, প্রকাশ-ময় ও আনন্দময় হয়। কোন কোনটী বা তুলরাশির ন্যায় অতীব লঘু হইয়া পবনবেগে স্বেচ্ছায় অন্যত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। কল্পনার প্রভাবে কোন কোন নগর প্রাদুর্ভূত হয়, আবার ক্ষণমাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন নগর বা দেবাবাসে পরিণত হইয়া চিরস্থায়ী হয়। তাহাতে অন্নপানাদি বস্তুর প্রভূত সমাবেশ ঘটে। বিচিত্র সমাবেশবশে ঐ সকল দেবনগরী পরিপূর্ণ, সর্ব্ব ঋতুর সর্ব্ববিধ গুণগ্রামে সর্ব্বদাই সুশোভিত ও সর্ব্বকামনার ফলপূরক হইয়া থাকে। বল দেখি, শাস্ত্র-সুবিহিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তত্তদ্ভোগ্য ফলাকারে পরিণত মৃতজীব-চিত্ত কিরূপে পূর্ব্বোক্ত স্থূলভাবে পর্য্যবসিত হইবে? মনোরথ-কল্পিত বস্তুতে যেমন চিন্মাত্রসত্তাই কেবল পরিলক্ষিত হয়, তেমনি জগৎ যদি কেবল ব্রহ্মচৈতন্য মাত্র হইয়া পড়ে, তবে আমার কথা সঙ্গত হওয়াই সম্ভবপর। বস্তুতঃ সঙ্কল্পে, ভ্রমে ব্রহ্মচৈতন্যই যে জগদ্রূপে বিবর্ত্তমান হইতেছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহা বলিলাম, ইহা ভিন্ন যদি অন্য প্রকার থাকে, তবে বল দেখি—জগৎ কীদৃশ? সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় তো এ জগৎসত্তা মোটেই ছিল না এবং ইহার কারণের তো সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কাজেই এ জগৎকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পৃথক্রূপে স্বীকার করিয়া বিশেষ আর কি একটা বলিতে ইচ্ছা কর? ফল কথা, জানিয়া রাখ, এ জগৎ একান্তই অসত্য; উহা সঙ্কল্পগুণেই ব্রহ্মচৈতন্যে আকাশকুসুমাদিবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বলিতে পারো,—আমরা তো সঙ্কল্প করি; সে সঙ্কল্পবলে স্বেচ্ছায় দেখিতে বা কার্য্য করিতে পারি না কেন? এ কথার উত্তর এই যে, তাদৃশ তীব্র বাসনা তোমাদের নাই; তাই সঙ্কল্প হইলেই যে ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, তাহা পারিয়া উঠ না। সঙ্কল্পের যদি তীব্র বাসনা-

বেগ থাকে, তবে তুমি এখনই ইচ্ছায় আকাশে নগর নির্ম্মাণে সমর্থ হইতে পার। এমন কি এই অধুনাতন দেহ পরিহারপূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যেই সেই কল্পিত নগরের অপর এক দেহশালী অধিবাসী হইয়া তাহা ভোগ করিবার তোমার সামর্থ্য হইতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ় সঙ্কল্পবলে পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধনগরাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার অনুসরণ করে, মরণের পর সে ঐ কল্পিত নগরে বাস ও সুখভোগাদি নিশ্চয়ই করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সঙ্কল্পের প্রভাবে যে যাহাই সম্যক্ ধারণা করিয়া রাখে, তাহাই অবিকল প্রাপ্ত হয়। যেরূপ কল্পনাবলে স্বর্গ ও স্বর্গবাসীরা জীবের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, নরকাদি দুঃখানুভবও তাদৃশ কল্পনাপ্রকর্ষেই ঘটিয়া থাকে। সঙ্কল্পের তীব্রতায় মনোমধ্যে যাহা কিছু আঁকিয়া রাখা হইবে, দেহের থাকা বা না থাকা, উভয় অবস্থাতেই তাহা অনুভবগম্য হইবে; কেন না, দেহ হইল মনোময়, মনের কল্পনা হইতে দেহ আপনাপনি উৎপন্ন হয়। সঙ্কল্পের প্রভাবে জীবের যেমন এক দেহভাবনা পরিত্যক্ত হয়, তেমনি সঙ্কল্পগুণে অন্য আর একটী দেহ তৎক্ষণাৎ সে দর্শন করে। আকাশময়ী শুভ ভাবনার উদয়ে আকাশই শুভ লোকরূপে লক্ষিত ও অনুভূত হয়, আর যদি অশুভা হইয়া দাঁড়ায়, তবে আকাশই অশুভ লোক-রূপে দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ চিৎ সিদ্ধ-নগরাদি সাক্ষাৎ করে, আর অশুদ্ধা চিৎ অশুভ নরক দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ-চিৎব্যক্তি মরণান্তে মনে মনে অনুভব করে,—আমি যেন দুইটা ঘূর্ণমান শিলাচক্রের মধ্যে পড়িয়া পিষ্ট হইতেছি। অন্ধকূপমধ্যে পতনোদ্যত হইয়াছি; আমার বুঝি আর উদ্ধার কিছুতেই হইবে না! দারুণ শীত বোধ হইতেছে; আমার শরীর যেন শীতে জমিয়া গিয়াছে। আমি অঙ্গাররাশি-পরিব্যাপ্ত মরুস্থলীতে বিচরণ করিতেছি। ভস্মবর্জ্জিত জ্বলদঙ্গারময় মেঘ হইতে আমার গাত্রে অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে। উত্তপ্ত নারাচাস্ত্র মদীয়গাত্রে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পাষাণ, চক্র ও অস্ত্ররাশি নদী-স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে; আমি গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতেছি; এ পথ অতীব দুর্গম। আমার বক্ষের উপর কুঠারের আঘাত পড়িতেছে; তাহাতে আমার বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে। আমি উত্তপ্ত লৌহপাত্রে নিপতিত

হইয়া ছম্ ছম্ শব্দে ভর্জ্জিত হইতেছি। বিকট অস্ত্রযন্ত্রে পড়িয়া গিয়াছি; কট্ কট্ রবে নিপীড়িত হইতেছি। মদীয় গাত্রোপরি চক্র, বজ্র, গদা, প্রাস, শূল, খড়্গ ও শরধারাবৃষ্টি হইতেছে। শাল্মলীতরুর কণ্টকাচিত গাত্রে আমার গাত্র ঘর্ষিত হইতেছে। আমি পাশাস্ত্রে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছি। কত শত শত প্রখর শক্তি-অস্ত্র আমার গাত্রে আসিয়া পড়িতেছে; আমি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছি। আতপোত্তপ্ত রাশি রাশি বালুকাস্তূপে পড়িতেছি; পাতালে ডুবিয়া যাইতেছি; দীপ্তোজ্জ্বল উল্কানলে দগ্ধ হইতেছি; ভয়ঙ্কর জ্বলদঙ্গার মধ্যে পড়িয়া গিয়া তাহা হইতে আর নিক্রান্ত হইতে পারিতেছি না। কত শর, শক্তি, গদা, প্রাস, ভুশুণ্ডী ও চক্রাস্ত্র দ্বারা আমি অনবরত আহত হইতেছি। আমার প্রেতাবস্থা হইয়াছে; আমি প্রেত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় অন্যান্য প্রেতসহ একযোগে পরস্পরের গাত্র চর্ব্বণ করিতেছি। তালবৃক্ষাপেক্ষাও অত্যুচ্চ স্থান হইতে আমার পতন ঘটিতেছে। আমি কঠিন শিলাতলে পড়িতেছি। শোণিত-পঙ্ক-পূযময় নদীতে পড়িয়া আমি হাবুডুবু খাইতেছি। গজাশ্বপদতলে পতিত হইয়া পিষ্ট হইতেছি। জলময় অন্ধকার-গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছি; পেচক আসিয়া আমার দেহমাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। যম-কিঙ্করেরা মদীয় গাত্রে মুষলাঘাত করিতেছে। শকুনিকুল আমার করচরণাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতে চাহিতেছে।

অশুদ্ধচিৎ ব্যক্তি এইরূপ আলোচনা করে; আর নিজের সমস্ত পাপকর্ম্ম একে একে স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে থাকে; ভাবে,—আমি সেই সেই কর্ম্ম করিয়াছিলাম; তাই এই ফল পাইতেছি। পূর্ব্বেও বহুবার আমি ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সে সকল কর্ম্মেরও ফল ভোগ আমার পূর্ব্বে পূর্ব্বে হইয়াছে। আমার চিত্তাকাশে যাহা যাহা প্রতিভাত হইয়াছে বা হয় নাই, সে সকলই কল্পনার প্রভাবে মন হইতেই হইয়াছে। সকলই মনোময়; সঙ্কল্পের মহিমায় যাহা কিছু অনুভূত হয়, যদি ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা সঙ্কল্পগুণে একেবারেই চিরস্থায়ী করা যায়।

ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই যে শত শত সুখ-দুঃখদশাময় মুনি-ব্যাধ বৃত্তান্ত আপনার মুখে শুনিলাম, ইহা কি অহরহ পরিদৃশ্যমান স্বপ্নাদি বৃত্তান্তের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ? অথবা অন্য কোন কারণে সঙ্ঘটিত?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই প্রকার আকাশময় প্রতিভানরূপ তরঙ্গ পরমাত্মরূপ-মহাসাগরে নিয়তই স্বতঃ প্রবর্ত্তিত আছে। স্পন্দরূপ হইতে অনবরত স্পন্দকণার উদয়ের ন্যায় চিদাকাশের চিৎসত্তায় এইরূপ প্রত্যয় প্রত্যহই হয়। যে পর্য্যন্ত না প্রকারান্তরে পর্য্যবসান ঘটে, ততকাল নিখিল পদার্থই স্বাকারে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। এ কথার দৃষ্টান্ত-স্থলে ঘট ও মৃত্তিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, মৃত্তিকা যে পর্য্যন্ত না ঘটাকার ধারণ করে, সে পর্য্যন্ত উহা মৃৎপিণ্ডাকারেই প্রতিভাত হয়। যে কালে ঘটাকার ধারণ করে, তখন উহা মৃৎপিণ্ডরূপে পরিণত বলা যায় না। বিবিধাকার-বিশিষ্ট একমাত্র অবয়বীর ন্যায় চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র আকাশময়রূপেই বিবিধাকারে প্রতিভাসিত হইতেছেন। এই যে বিবিধাকৃতির বিকাশ হইতেছে, এতন্মধ্যে কোন কোনটী স্থির, আবার কোন কোনটী অস্থির; ফলে, সকলই আকাশময় ব্রহ্মের অঙ্গীভূত; তাঁহাতেই অবস্থিত। স্বপ্নাবস্থায় আত্মায় পুরপ্রতীতির ন্যায় চিদাকাশেই এবম্বিধ বিচিত্রভাব সকল প্রতিভাত হয়। ফলে ইহাতে সার, অসার, সৎ অসৎ কি? এই সমগ্র জগৎ যখন যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন সকলই সেই চিদাকাশরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কাজেই ইহাকে সৎ বলা যায় কিরূপে? আর অসৎই বা বলি কিপ্রকারে? হে তত্ত্বজ্ঞানিগণ! জানিবে,—এ সংসার একমাত্র শান্তিময় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহা সতত চিদাকাশরূপেই প্রতিভাত। ইহাতে আস্থাই বা কি! আর অনাস্থাই বা কি! তোমরা ইহার যথাযথ স্বরূপ অবলম্বন কর; করিয়া নিরাকুলভাবে অবস্থিত হও। সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালার যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি এই সদা সমুজ্জ্বল আত্মা হইতেই স্বাত্মরূপ বিবিধ বিকার

পরিস্ফুরিত হইয়া কার্য্যকারণ-ভাব উপগত হইয়াছে। ইহারা যদিও বস্তুতঃ কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন নহে, তথাচ কার্য্যকরণভাবে বিলসিত হইতেছে। স্বসঙ্কল্পবশে আকাশই যেমন সৃষ্টিরূপে বিরাজিত হয়, তেমনি পরমাত্মাও নিজ সঙ্কল্পগুণে নিজেকেই জগদাকারে জ্ঞান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ক্ষিত্যাদি পদার্থ ইহাতে আবার কি হইতে পারে? এই ভ্রমময় জগৎ পরব্রহ্মেই পরিস্ফুরিত হইতেছে; অথচ কোন কিছুই হইতেছে না। ব্রহ্মে ব্রহ্মই আছেন; ব্রহ্মই স্বয়ং অবিদ্যাখ্যা অধিগত হইয়াছেন। পরব্রহ্মে ঘনীভাব চিদ্‌ঘনরূপেই আছে; অন্য কোনরূপে নাই। এই সমস্ত জগৎ চিদাকাশমাত্রই; এইরূপ জ্ঞানের নামই পরম জ্ঞান। যখন ধারাবাহিকরূপে এবম্বিধ জ্ঞান হয়, তখনই মুক্তি হইয়া থাকে। শূন্য-স্বরূপ আকাশের যেমন নীলিমরূপ, তেমনি অজ্ঞানরূপ অবলম্বনপূর্ব্বকই চিদাকাশ বিশাল ভ্রমরূপে পর্য্যবসিত হইয়া জগদাকারে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। বাস্তবপক্ষে তিনি শান্ত ও পরিঘবর্জ্জিত। যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন; দেহভাবের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক সাক্ষী চিদ্রূপের ভাবনা করিতেছেন; চিৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য জগদ্ভাব দর্শনে তাঁহার সামর্থ্য থাকিতে পারে কি? এ কথা আমায় প্রকাশ করিয়া বল দেখি? চিৎপদার্থ আকশস্বরূপ; তাঁহার আকাশাংশের অববোধ আর অনববোধ, নিসর্গতঃ যথায় যেরূপে যে ভাবে পরিস্ফুরিত হয়, সেখানে তাহা তেমনি ভাবে প্রত্যয়গোচর হইয়া থাকে। ফল কথা, অজ্ঞানস্বভাবে জগৎস্বরূপে এবং জ্ঞানস্বভাবে চিৎস্বরূপে প্রতিভাসিত হয়। যে ব্যক্তি জন্ম হইতে তিমিররোগগ্রস্ত, তাহার চক্ষে যেমন দ্বিচন্দ্র প্রতীতি হয়, তেমনি এই দৃশ্যভ্রান্তি যদিও আকাশময়, তথাচ অবিবেকীর নিকট সর্ব্বথা অপ্রশমিত। পক্ষান্তরে প্রশমিতই বা আর কি হইবে? যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলই যখন একমাত্র সেই নিরাময় অনাদি অনন্ত চিদাকাশ, তখন আর প্রশমনই বা কাহার কি প্রকার? স্বীয় জ্ঞানস্বরূপের অপরিহারেই আত্মার স্বপ্নপ্রায় দৃশ্যাকারে প্রতিভান হয়। সেই যে প্রতিভান, তাহাই এই জগৎ। অধ্যাত্মশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার করিয়া স্বীয় বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে হয়, পরে সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে আত্মাকে

যদি সুপ্তবৎ নিশ্চল ও বিকল্পবর্জ্জিত করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃত চিদ্রূপ কি, তাহা অবগত হওয়া যায়। তোমাদের নিকট যে অব্যভিচারিণী সম্বিদ্ অবিদ্যা বা জগদাকারে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে, আমাদের নিকট তাহার তথাবিধ প্রতিভান, নদীনিক্ষিপ্ত ধূলিমুষ্টির ন্যায় সম্পূর্ণতই নাই। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নভূমি নিজের অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু তাহার যেমন বাস্তবপক্ষে কুত্রাপি অস্তিত্ব নাই,তেমনি এই যে সকল দৃশ্যভাব, ইহা নিজের অনুভবে আসিলেও অসৎস্বরূপই; বেশ করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দেখিবে—কোথাও ইহা নাই। স্বপ্নাবস্থায় চিদাকাশই যেমন বাহ্য বস্তুপ্রকাশক বহ্নি-প্রভার ন্যায় দীপ্যমান, তেমনি জাগ্রৎকালেও জাগ্রৎসাক্ষী চিদাত্মার স্বপ্র-কাশরূপই পরিলক্ষ্যমাণ। ইহা জাগ্রৎ আর ইহা স্বপ্ন, এইরূপ একটা ভেদ প্রত্যয় হইয়া থাকে বটে; কিন্তু প্রতীত্যংশে ধরিলে তাহা একই হইয়া পড়ে। সুতরাং একথা নিশ্চয়ই যে, সত্যজ্ঞান স্বরূপে উক্ত ভেদ-প্রত্যয় একেবারেই নাই। স্বপ্নে যাহা দেখায়, জাগ্রতে তাহা প্রতীয়মান হয় না; এই জন্য স্বপ্নের দেখা বস্তু যেমন মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত হয়, তেমনি যখন জাতিস্মর প্রবুদ্ধ যোগী মৃত্যুর পর গর্ভান্তরে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার জন্মান্তরীণ ঘটনাপরম্পরার অবিদ্যামানতায় তাহা অপ্রত্যয়যোগ্য মিথ্যা বলিয়াই ধারণা হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইত্যাকার যে ভেদ-বুদ্ধি, ইহা মাত্র কালের অল্পতা ও দীর্ঘতা ভেদেই হইয়াছে। অনুভব-অংশে বুঝিয়া দেখ, উভয়ই তুল্য মূল্য। যদি বল, জাগ্রদ্ভাবটা বাহিরে এবং স্বপ্নভাবটা অন্তরে হয়,এইরূপে স্বপ্ন-জাগ্রতের পার্থক্য হইয়া দাঁড়ায়। উত্তরে বলিব,—না এমনটী বলা যাইতে পারে না; কেন না, বাহ্যত্ব এবং আভ্য-ন্তরত্ব এই দুইটি ভাবই জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন, এই উভয় অবস্থাতে বিদ্যমান। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইটি যেন এক! ফলের বেলায় যাহা জাগ্রৎ,তাহাই স্বপ্ন, যাহা স্বপ্ন, তাহাই জাগ্রৎ। ক্রমে কাল এরূপ হইয়া দাঁড়ায়, যখন জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই উভয়েরই বাধ হইয়া যায়। জীবনের যত দিন স্থায়িত্ব, তত দিন ধরিয়া যেমন শত শত স্বপ্ন দর্শন ঘটে, তেমনি অমুক্ত জীবের অজ্ঞান-নিদ্রার ঘোরে শত শত জাগ্রৎ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় উৎপন্ন ও পরক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বহুতর স্বপ্ন যেমন জাগরিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া

থাকে, তেমনি সিদ্ধ যোগিগণও স্বীয় শত শত পূর্ব্বজন্ম স্মরণপথে আনয়ন করিতে থাকেন। এইভাবে অনুভবরূপী আত্মার যখন সর্ব্বাংশেই সমতা, তখন আর বৈষম্য আছে কোথায়? সকলই তো এক জাগ্রৎস্বপ্নবৎ পরিস্ফুরিত হয়। যাহা স্বপ্ন, তাহাও জাগ্রতের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহা দৃশ্য, তাহাই জগৎ; উভয় শব্দের অর্থ যেমন একই, তেমনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন এই দুই শব্দেরও একার্থতাই। সুবৃহৎ স্বপ্নপুরী যেমন এক-মাত্র চিন্ময়াকাশ বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি জগৎও চিন্ময়াকাশই। সুতরাং অবিদ্যার আবার অস্তিত্ব কোথায়? আকাশস্বরূপ ব্রহ্মই অবিদ্যা, এইরূপ মত যদি প্রকাশ করিতে হয়, কর; আমাদের একথায় বিবাদেচ্ছা নাই। আমরা বলিতেছি, নিখিল ভ্রান্তিরূপ শান্ত হইলে যাহা থাকে, 'আমি' বলিতে তাহাই; আর আমাদের কাছে যে কল্পনা ছিল, তাহারই নাম বন্ধন; এক্ষণে এ সব বন্ধন আমাদের ঘুচিয়া গিয়াছে। সার কথা এই যে, আত্মা নিত্যমুক্ত পদার্থ, তিনি কখনই বদ্ধ নহেন। তাই বলিতেছি, অনর্থক সেই আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া ধারণা করিও না। বল দেখি, যাহা নিরাকার নির্ম্মল চিন্ময় আকাশ, তাহার আবার বন্ধন কি? এই দৃশ্যাখ্য অবিদ্যা সেই চিন্ময় আকাশই; সুতরাং ইহাঁর বন্ধন মোচন কি? আর হইবেই বা তাহা কোথা হইতে? বস্তুগত্যা অবিদ্যা বলিয়া একটা কোথাও কিছুই নাই, আর বন্ধই বল, মোক্ষই বল, তাহাও কাহারই নাই। বিদ্যা আর অবিদ্যা, এ সবও কিছুই নাই। একমাত্র অজ অবিনাশী চিৎ, তিনিই কেবল প্রতিভাত হইতেছেন। স্বপ্নে যেমন আকাশই নগরাদিরূপে প্রত্যয়সিদ্ধ হয়, তেমনি চিৎই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এক দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তি মধ্যে সম্বিদের যে নির্ব্বিশেষ আকার উপলব্ধ হয়, জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্বরূপে দৃশ্যের স্বরূপ তাহাই। ইহাই হইল নিশ্চিত কথা। বাহ্যাভ্যন্তর দৃশ্যনিচয়ের প্রকাশার্থ নিয়ত জাগ্রৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্মার যে আকার, তাহাই জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থার প্রকৃতরূপ। সুতরাং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ভেদজ্ঞানকেই উক্ত উভয়ের সাক্ষিচৈতন্যরূপে পরিজ্ঞাত হও। কেন না, জাগ্রৎ বল, স্বপ্ন বল, সুষুপ্তি বল, এই যে তিন অবস্থা, এতদনুগত সাক্ষী চৈতন্য ভিন্ন অন্য আর কে ঈদৃশ চিৎপার্থক্য দেখিবে? অতএব

ভেদাভেদ জ্ঞান, দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান, সকলই সেই শান্ত অখণ্ড একাদ্বয় চিদাকাশ। বোধ ও বোধ্যরূপে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সদংশ যেমন একই, তেমনি দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান একই বস্তু; চিদংশে দেখিলে পার্থক্য কিছুই নাই। কেন না, যাহা দৃষ্ট বা জ্ঞানবিষয়ীভূত হইবে, তাহাকেই দৃশ্য বলিয়া বর্ণন করা হয়। জ্ঞান বা চিৎসহ অভেদ ব্যতিরেকে বিষয়-বিষয়িভাব কাহারও নিরূপিত হইবার নহে। একমাত্র সৎ ব্রহ্মই দ্বৈতাকারে যখন প্রতিভাত হয়, তখন দ্বৈতাদ্বৈত সমস্তই সেই ব্রহ্মমাত্র; এ জন্য অবশ্য এরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে যে, ব্রহ্মই দ্বৈতাদ্বৈত সমষ্টিস্বরূপ। যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে অগ্রে দ্বৈতাদ্বৈত যাবতীয় প্রপঞ্চকেই ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর তন্ন তন্ন বিচারে নিখিল দ্বৈতমার্জ্জনা-পুরঃসর শুদ্ধ সুনির্ম্মল প্রত্যগাত্মভাবে চিদাকাশে জল-গলিত সৈন্ধববৎ একীভাব উপগত হইবে; পরে সেই আনন্দঘন চিদাকাশেই পাষাণবৎ নিশ্চলীভাবে অবস্থান করিবে।

হে সুন্দর! এইরূপে চিন্ময় ব্রহ্মে তুমি পাষাণবৎ নিশ্চলীভাব প্রাপ্ত হও, সঙ্কল্পবর্জ্জিত হও, এবং অন্তশ্চেষ্টারহিত হও, হইয়া যথারীতি নিজ বর্ণা-শ্রমোচিত কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট দেশে যাও এবং পান ভোজনাদি যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।

একষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই দৃশ্যপরম্পরার স্ফুরণ ব্যাপারে চিদাকাশই যখন কারণ, তখন এই যথাবস্থ জগৎ—বাহ্যস্বরূপের দর্শন ও জ্ঞানবশে বাহ্যাভ্যন্তরের যাবতীয় দৃশ্য লইয়া সেই একমাত্র চিদাকাশই; তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নহে। স্বপ্নে যে পুর প্রত্যক্ষ হয়, তৎপ্রতি তদুপভোগকারীর চৈতন্যই পুরাকার পরিগ্রহ করে। এইরূপে জানিবে—এই জাগ্রদবস্থায়

পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চও আকাশবৎ শূন্যস্বরূপ। স্বপ্নের দেখা পুরী, আকাশনগরী ও গন্ধর্ব্বপুরী, এই সমুদায়ের ন্যায় এই নিখিল দৃশ্যমান নানাস্বরূপ—অনাত্মাই; ফলে উহার স্বরূপাভাব; কেবল স্বসাক্ষিভূত আত্ম-নিবন্ধনই তাহার আত্মা। অতএব একমাত্র চিদাভাসই অনানা হইয়াও নানা-স্বরূপে পরিলক্ষিত। সৃষ্টির আদ্যাবস্থার ন্যায় এখনও এ জগৎ স্বপ্নাকাশ-পুরবৎ প্রতিভাত হইতেছে। বাস্তব পক্ষে ইহা অসৎ, কিন্তু সত্যবৎ অবস্থিত আছে। যাহারা কেবল তত্ত্বজ্ঞ—অন্তর্দ্দর্শী, তাঁহাদের যাহা অল্প-জ্ঞাত, মূর্খদিগের তাহা জ্ঞাত নহে; আর বাহ্য দৃষ্টিশালী অজ্ঞদিগের যাহা কিঞ্চিৎজ্ঞাত, তাহা আবার প্রাজ্ঞদিগের পরিজ্ঞাত নহে। এইরূপে অজ্ঞবিজ্ঞের অনুভূতি-বিসংবাদবশতঃ এই জগৎপ্রপঞ্চেরও বিসংবাদ এবং সর্গপদার্থ সত্যমিথ্যাময়রূপে বিরাজমান। ফলে বলা যায়, এই কারণেই প্রাজ্ঞ বা অজ্ঞ কাহারই অনুভবানুসারে এই প্রপঞ্চের কোন কিছু ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে; কেন না, তাহাদের পরস্পরানুভূতির বিসম্বাদিতা বশত বাস্তবত্ব কাহারই পরিজ্ঞাত নাই। কারণ, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞগণ কেবল অন্তর্দৃষ্টিশালী আর অজ্ঞগণ বহির্দৃষ্টিশালী; উল্লিখিত অজ্ঞ-বিজ্ঞের বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে, তাহা উহারা নিজে বুঝিয়া উঠিতে বা তোমায় বুঝাইয়া উঠিতে সক্ষম নহে। স্বস্ব বুদ্ধিতে থাকিয়াই সর্গশব্দার্থ স্ফুরিত হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। এ অবস্থায় সত্ত বা অসত্ত, ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত পরস্পর সকলেরই অন্তর্বুদ্ধিগম্য বলিয়া ঐ প্রপঞ্চরূপ অন্তঃস্থিত; ইহাই বটে যুক্তিসিদ্ধ। তন্মধ্যে এই মাত্র ভেদ যে, বিদ্বানের বুদ্ধি সর্ব্বদার জন্যই স্থিরত্বে জাগ্রৎ; তাই তিনি স্থির আত্মতত্ত্ব অবলোকন করেন, আর অজ্ঞের বুদ্ধি অস্থির-ব্যাপারে জাগরূক; তাই অস্থির বাহ্য বিষয়ই তাহার অবলোকনীয় হয়। পরন্তু বুদ্ধিগত যে প্রপঞ্চস্বরূপ, তাহা একান্ত পক্ষে না অন্তরে, না বাহিরে; এই নিমিত্ত তাহা জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, উভয়েরই অগোচরস্থ; এই তত্ত্বই অবগত হইবে। দ্রব বলিয়া জলে যেমন তরঙ্গ আছে, তেমনি আত্মসত্তাবশতই এই সৃষ্টিলহরী চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব জানিবে,—এ জগৎ চিচ্চমৎকার ভিন্ন কিছুই নহে।

স্বপ্নপুরাদিতে বাস্তব অদৃশ্যও যেমন দৃশ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমনি ঐ চিৎস্বরূপের উৎকর্ষেই বাস্তব যাহা অদৃশ্য, তাহাও দৃশ্য হইয়া থাকে। অথবা মায়াপতিত চিৎপ্রতিবিম্বই জীব জগদাখ্যায় অভিহিত। ঘট-পটাদি দ্রব্য প্রতিবিম্বের মূর্ত্তি অসত্ত্বেও যেমন মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়, তেমনি ঐ চিৎ-প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবজগদাদি বাস্তবপক্ষে মূর্ত্তিবিরহিত হইলেও মূর্ত্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহা পিশাচদর্শনবৎ ভ্রান্তিময় ও মিথ্যাস্বরূপ, সেই এই দেহাত্মতা-ভ্রান্তিই অত্যন্ত ক্লেশ-কারণ। দেখ, যাহা মনোরাজ্যবৎ মিথ্যা, পতনোন্মুখ জলবিম্বসম সুচঞ্চল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেরই অনুভবে অসৎ বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহাতে আত্মতা প্রসক্তি আবার কীদৃশ? পৃথিবীতে স্থূলবংশ রাখিয়া বিদারণকালে মনে হয় যেন তাহার অভ্যন্তর হইতে শব্দ নির্গম হইতেছে, বস্তুতঃ তাহাতে কিন্তু শব্দ নাই, বা তাহা হইতে নির্গতও হয় না, অপিচ জলে তরঙ্গরাজি হইতে বা অগ্নিতে শিখাদি হইতে আকাশে প্রতিধ্বনি এবং পবন হইতে কণ্ঠতাল্বাদি প্রদেশে বর্ণ, পদ ও বাক্যের স্ফোট নিঃসরণ প্রতীয়মান হয়; পরন্তু তৎপূর্ব্বে তৎসমস্ত শব্দ যেমন থাকে না, তেমনি বাসনাময় অর্থও অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদিবৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থায় আত্মা হইতে নির্গত বলিয়া অনুভূত হয়; বস্তুতঃ কিন্তু আত্মায় সে সকল অর্থ নাই। সৃষ্ট্যাদিকালে স্বাত্ম-চিৎ স্বপ্নশৈলের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন; প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কিন্তু শব্দ অর্থ বা দৃশ্যতা কিছুরই সম্ভাব নাই। এই যাহা বর্ত্তমানে আছে বা পরিস্ফুরিত হইতেছে, এ সকলই পরমার্থ সত্য, আর সদ্‌ব্যতিরেকে অন্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় কারণাভাবে অনুৎপন্ন ছিল। তাই বলিতেছি, নিখিল শব্দার্থ-বর্জ্জিত নিখিল অর্থপরিশূন্য একরূপী সচ্চিদা-কাশস্বরূপই পরম শান্তিনিলয়ে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে; নিজেকে তুমি এইরূপই অনুভব করিতে থাক। যাহা শুদ্ধবোধৈকরূপ আত্মবিশ্রাম, তাহা তুমি লাভ কর; করিয়া জীব প্রসিদ্ধ স্বতঃসমুৎপন্ন অসত্য মনো-বিক্ষেপ পরিত্যাগ কর। দেখ, আত্মাই আত্মবন্ধু এবং আত্মাই আত্মরিপু; এমতাবস্থায় যদি আত্মার সাহায্যে আত্মোদ্ধার না হয়, তবে আর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। যতদিন যৌবনসামর্থ্য আছে তাহার মধ্যেই শুদ্ধ বুদ্ধি-

নৌকার আশ্রয় লইয়া সংসার-সাগরের অপর পারে প্রয়াণ কর। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হইবে, তাহা এখনই করা সমুচিত। নতুবা বৃদ্ধ হইয়া আর কিরূপে করিবে বল দেখি? তখন নিজের দেহটাও ভার বলিয়া বোধ হইবে। শৈশব এবং বার্দ্ধক্য এই দুই অবস্থাই পশুত্ব বা মরণাবস্থার সমান। উহার কোন অবস্থাতেই জ্ঞানসাধন সম্ভবপর নহে। জীবের যে যৌবনাবস্থা, তাহাই জ্ঞানসাধনের যোগ্য। তদবস্থায় বিবেক থাকিলেই জ্ঞান সাধন করিতে পারা যায়। সবিবেক যৌবনই জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এ সংসার অচিরপ্রভার বিলাসবৎ বিচঞ্চল; এখানে আসিয়া জীব সৎশাস্ত্র সেবা ও সৎসঙ্গ করিয়া পঙ্ক হইতে শরগ্রহণের ন্যায় মোহ-পঙ্ক হইতে সারাৎসার আত্মার উদ্ধার সাধন করিবে। অহো রে, মানবগণের কি ক্রূরতা! এই ক্রূরদিগের গতি হইবে কি? ইহারা মোহপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছে; তথাচ নিজ আত্মার উদ্ধারোপায় একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না! অল্পমতি গ্রাম্যজন মৃন্ময়ী বেতালসভা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মৃন্ময়ত্ব অবগত হইতে পারে না—না পারিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকে, পরে ঐ বৈতালী সভাই যেমন তদীয় ভয়কম্পজ্বরাদি দুঃখের নিদান হইয়া দাঁড়ায়; পরন্তু যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, অথবা যদি ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিরই তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে যেমন আর ঐ মৃন্ময়ী বেতালসভা তাহার ভয়জ্বরাদির নিদান হয় না, তেমনি এই যে ব্রহ্মময়ী দৃশ্যলক্ষ্মী, ইহা অজ্ঞেরই দুঃখাদিভঙ্গের কারণ হয়। ইহাতে যখন যথাযথ জ্ঞান জন্মে, তখন একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট রহেন। সে কালে আর দুঃখাদিভঙ্গ কিছুই থাকে না।* কেন না, যাহার নিবৃত্তি ছিল না, সেই সর্ব্বদুঃখনিদান বিষয়াদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেই নিবৃত্ত হয়; সর্ব্বদা যাহার সত্তানুভব হয়, তাহারও বিলয় ঘটে। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটিলে তখন আর দৃশ্য পদার্থ দৃষ্টিপথে থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বপ্নাবস্থায় স্পষ্টানুভব হইলেও জাগ্রদবস্থায় স্বাপ্নজগৎ যেমন অসত্যতাই উপগত হয়, তেমনি অনুভূতিক্রমে সত্যতা লাভ করিলেও তত্ত্ববিজ্ঞানোদয়ে এই সৃষ্টিসংবেদনা চিন্ময় অম্বরে শূন্যস্বরূপেই পর্য্যবসিত হয়। এই জীবন

* ৪৪সংখ্যায় পত্রাঙ্ক মুদ্রাঙ্কন ভ্রম হইয়াছে, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

যেন জঙ্গল; জন্ম-জ্বর-কামক্রোধাদিরূপ দাবানলে ইহা নিয়ত দগ্ধ; এখানে মৃতমৃগের তৃণপর্ণাদি আহরণের ন্যায় কখন প্রাপ্তি, কখন্ অপ্রাপ্তিরূপ ক্রম নিবন্ধন এই যে ইন্দ্রিয়বর্গ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহাদিগকে মত্ত মন ও প্রাণাদি বায়ুর বহিঃসঞ্চার সহ জয়পূর্ব্বক জ্ঞানবলে বিদ্যা লাভ কর। এইরূপ হইলেই মুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম-নিবারণে সমর্থ হইবে। তাই বলি, তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—অজ্ঞতার উপশান্তি ইন্দ্রিয়জয় ব্যতীত হইবার নহে। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়জয় কিরূপে সুসম্পন্ন হয়, তাহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জ্বলন্ত প্রদীপ যেমন ক্ষীণদৃষ্টি পুরুষের সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের সাহায্য করে না, তেমনি যে জন প্রভূত ভোগাসক্ত, নিজ পুরুষত্ব প্রখ্যাপনে সচেষ্ট, বা নিজ জীবনোপায় ধনাদি-অর্জ্জনে ব্যসনাপন্ন, তৎ-পক্ষে শাস্ত্রাদি সাধন ব্রহ্মদর্শনের উপযোগী নহে এবং ঐ সকল তাহার ইন্দ্রিয়জয়-ব্যাপারেও অনুকূল নহে। এই জন্য আমি তোমায় ইন্দ্রিয়-জয় ব্যাপারে অবিকল যুক্তি ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যে যুক্তি কহিব, ইহা অবলম্বন করিলে, অত্যল্প সাধনসম্পত্তিও মোক্ষফলা-বাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। জানিবে—পুরুষ চিন্মাত্র; সে চিন্তায়ুক্ত হইয়া জীব নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই জীবাখ্য—চিন্তা-ধীন পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহায়তায় যাহা প্রথিত করিয়া দেয়, তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া ক্ষণমধ্যে আসক্ত হইয়া থাকে। অতএব মানব চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার প্রয়াসে বাহ্যাকারতা নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মাকারতা প্রবোধরূপ তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রয়োগ করিবে। তাদৃশ অঙ্কুশ প্রয়োগ করিয়া মত্ত মনোমাতঙ্গের

জয় সাধনান্তে ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে পারিবে; নচেৎ তাহা হইবার আর উপায় নাই। চিত্ত হইল ইন্দ্রিয়বর্গের অধিনায়ক; তাহার জয়ই জয়। দৃষ্টান্ত দেখ, চর্ম্মপাদুকা দ্বারা চরণ যদি আবৃত করা হয়, তবে সকল পৃথিবীই চর্ম্মাবৃত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় চর্ম্ম দ্বারা একমাত্র চরণাবরণ করায় সমস্ত কণ্টকই যেমন জয় করিতে পারা যায়, তেমনি একমাত্র চিত্তাবরণ করিলেই সর্ব্ব জয় সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্তা-বচ্ছিন্ন সম্বিদাকার জীবকে যদি নির্ম্মলাকাশে আরোপিত ও একেবারে তাহাতে পরিণত করিয়া থাকা যায়, তবে শরৎকালীন তুষারবৎ মন স্বতই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রকার সম্বিৎকে যদি যত্নসহকারে জীবসম্বিদে সংরুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চিত্ত যেরূপ শান্ত হয়, কি তপস্যা, কি তীর্থাটন, কি বিদ্যাভ্যাস, কি যজ্ঞাদিক্রিয়া, তৎসমুদায় দ্বারা সেরূপ হয় না। যে যে বিষয়ের স্মরণ করা হয়, সেই সেই বিষয় তত্তদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসম্বিদে বিলয় কারণ সম্বিদ হেতু অবশ্যই ভুলিতে পারা যায়। ফল কথা, তত্তৎ সংস্কারের যখন উচ্ছেদ হয়, তখন আর তাহা স্মৃতিপথে সমু-দিতই হয় না। উল্লিখিত উপায়ে ভোগজয় এইরূপেই হয়। এইভাবে স্বসম্বেদনরূপ যত্ন দ্বারা সম্বিৎকে যদি বিষয়ামিষ হইতে দিবারাত্র রুদ্ধ রাখিতে পারা যায়, জানিবে—তাহা হইলেই তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুভবসিদ্ধ স্বরাজ্য-পদ লাভ সেই উপায়েই সংঘটিত হয়। যখন বৈতৃষ্ণ্য সিদ্ধি হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়জয় ঘটিয়া উঠিবে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ দেহযাত্রা বিধানে যে জন ইচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক শম ও সন্তোষ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছে, এ সংসারে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয়-পদ-বাচ্য। যাহার সম্বিৎ অন্তরে রসি-কতায় বা বাহিরে বিরসতায় বিরক্ত হয় না, তাহারই মনঃশান্তি সংঘটিত হয়। যদি সম্বিৎপ্রযত্নের নিরোধ করিতে পারা যায়, তবে মন বিষয়ানুধাবন-রূপ দুর্ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ বিষয়ানুসরণরূপ যে দুর্ব্যসন, তাহাই মনের চাঞ্চল্য। চিত্ত যদি ঐ চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিবেকের অনুধান করিয়া থাকে। উদার বিবেকসম্পন্ন আত্মাই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এ হেন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই ভব-সাগরে বাসনারূপ তরঙ্গবেগে পরিচালিত হয় না। সতত সাধুসঙ্গ ও

সৎশাস্ত্রানুশীলন করিয়া ঐইরূপে যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারা যায়, তবে জগতের যাহা সারাৎসার পদার্থ, সেই ব্রহ্মেরই কেবল সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। এইরূপ সাক্ষাৎকার যখন হয়, তখন সত্যজ্ঞানে মরুভূমিতে যেমন জলভ্রমজ্ঞান নিরাকৃত হয়, তেমনি ভবভ্রমেরও অবসান ঘটিয়া থাকে। এ জগৎ অচেত্য; একমাত্র চিন্মাত্রই অবস্থিত, এরূপ সত্যবোধ যাহার হইয়াছে, তাহার আর বন্ধন-মোচন কোথায়? জল শুষ্ক হইলে জলাশয় যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই কারণবিরহিত দৃশ্যও জ্ঞানাদি দ্বারা ছিন্ন হইলে পুনরুদ্ভূত হয় না। কেন না, শূন্যমাত্র বেদনই নিজ অবিদ্যাবশতঃ 'তুমি আমি' ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, এই যে স্বাধ্যস্ত 'তুমি আমি' ইত্যাদি স্বরূপ জগৎ, ইহাকে জ্ঞানপ্রভাবে পরিহার-পূর্ব্বক অধ্যস্ত বিলক্ষণ অধিষ্ঠানমাত্র হইয়া যাইবে। অতএব জানিবে—অবিদ্যামাত্রে পর্য্যবসিত ইহা 'তুমি আমি' এই এই প্রকার জগৎ মিথ্যা বলিয়া আপনা হইতেই শান্তভাবে শূন্যস্বরূপ চিদাকাশ তাত্ত্বিকরূপে বিরাজিত। চিচ্ছায়াই চিদাকাশে জগদাকারে প্রতিভাসমান। ঐ চিৎই জগৎ; সুতরাং উহা শূন্যস্বরূপ। কেন না, চিৎ শূন্য, তাই জগৎও শূন্য। এইরূপে উভয়েরই শূন্যতা স্থিরীকৃত। স্বপ্নদর্শনই উক্ত উভয় শূন্যতাবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ্য। কেন না, স্বপ্ন অসত্য হইলেও অনুভূত; উহা অসন্ময়, তাই শূন্য আর অনুভূত, তাই শূন্যাশূন্য, কেন না, যাহা অনুভূত, তাহাও অসন্ময় পদবাচ্য। স্বপ্ন যে যে, রাজ্য-বিভবাদিরূপে বহু মত হয়। তত্তৎ সমস্ত চিতেরই স্বরূপমাত্র। কেন না, উহাতে যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, কিছুরই অপেক্ষা নাই, এই জাগ্রৎ জগৎও ঐরূপই। কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, এই তিনের অপেক্ষা যাহাতে যাহাতে নাই, তাহা তাহাই চিদ্ঘনমাত্রক 'অহং'স্বরূপ। সৃষ্টির অগ্রে এই স্বসংবেদরূপ জগতের যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ্যই হইতে পারে না। ইহার প্রতি-পাদন পূর্ব্বেই হইয়াছে; সুতরাং যাহা অহং স্বপ্রাশ আত্মস্বরূপ, তাহাই তুমি হও। স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যু অনুভূতিগোচর হইলেও তাহার যেমন অস্তিত্ব নাই, অথবা ভ্রান্তিক্রমে মরুস্থলীতে যে জল বিলোকিত হয়, তাহা তখন বিদ্যমানরূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্ব নাই, তেমনি ঐ

অবিদ্যার প্রতীতিবশে বিদ্যমানতা বোধ হইলেও জ্ঞানতঃ দেখিতে গেলে বস্তুগত্যা তাহার অস্তিত্বাভাব। চিদাকাশ শূন্যস্বরূপ; শূন্যস্বরূপেই তাহার প্রতিভাসবিস্তার; ঐ প্রতিভাসবিস্তারই জগৎ বলিয়া ব্যাখ্যাত; অতএব উহা কাকতালীয়বৎ ভিত্তিবিরহিত। এই বিমল জগৎ বাস্তবপক্ষে প্রতিভাত নহে, তথাচ উহা প্রতিভাত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকাশহেতু যে চিৎ অপরোক্ষভাবে প্রথিত, সেই নিত্য অপরোক্ষ বস্তুই পরম পদ বলিয়া নিরূপিত। এই যে জীবাদি বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহাও সেই পরম পদ। জলের যেমন আবর্ত্ততরঙ্গাদি বৃত্তি সকল জল মাত্র বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি ঐ যে আকাশাদি বস্তুপরম্পরা, উহাও শূন্য-মাত্রই। অবয়বীর রূপ যেমন এক সাবয়ব, তেমনি জীবাদিরও অবয়ব সেই এক ব্রহ্মমাত্র; ব্রহ্মের কিন্তু অবয়ব কিছুই নাই। অথবা জীবাদি ব্রহ্মাবয়ব; আর সেই যে এক ব্রহ্ম, তিনিই মাত্র অবয়বহীন। যেমন গিরি-নদী-নগাদির প্রতিবিম্ব দ্বারা স্ফটিক শিলার অভ্যন্তরে একটা আভাস দেখা যায়, তেমনি এই যে দৃশ্যপরম্পরা, ইহাও একটা আভাসমাত্র। অতএব ইহাকেও সেই শান্ত স্বচ্ছ অব্যয় ব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। যিনি চিদ্ব্রহ্ম, তাঁহার স্বভাবই যখন জগদ্রূপে ভাসমান, তখন আর স্বস্বভাবে বিচারই বা কি আছে? আদি-অন্ত-মধ্য কোন কিছু কল্পনাই পরম পদে নাই। এই যে অবিদ্যা, ইহা তৎস্বরূপ মাত্র বলিয়াই বিজ্ঞেয়। সুতরাং অবিদ্যা নামে অন্য কোন বস্তুই এ জগতে নাই। স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই দুই অবস্থার যে কোন অবস্থাতেই জীব অবস্থান করুক, সেই জীব যেমন এক এবং একইরূপে বিরাজমান, তেমনি এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা যে-ভাবাপন্নই হউক না কেন, নিখিল বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই এক ব্রহ্ম-মাত্র। জগৎতত্ত্ববিজ্ঞান এইরূপ হওয়াই সমুচিত। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থার মধ্যগত যদীয় বুদ্ধি বুদ্ধ, সে কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, উভয় অবস্থাকেই একই তুল্য বলিয়া বিদিত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই তিন অবস্থাই তত্ত্ববোধীর নিকট তুর্য্যবস্থায় অবস্থিত। কেন না, তত্ত্ব-বোধীর অবিদ্যা নাই; কাজেই তিনি দ্বয়স্থ হইলেও অদ্বয় বলিয়াই বিখ্যাত। কারণ যাঁহারা অবিদ্যার পারে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বৈত

আবার কি? আর 'তুমি আমি' ইত্যাদি কল্পনাবসরই বা তাঁহাদের কৈ? যাহাদের তত্ত্ববোধের বিকাশ হয় নাই, দ্বৈতাদ্বৈতাদি ভেদখ্যাপক বচন-প্রবন্ধ-বিভ্রম লইয়া তাদৃশ তরলমতি শিশুগণই ক্রীড়া করিয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্ববোধী প্রবীণ পুরুষ, তাঁহারা ঐ অপরিপক্ক বুদ্ধি অতত্ত্বজ্ঞদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকেন। অবশ্য প্রবুদ্ধ মহাত্মগণও দ্বৈত বিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের এই বিবাদপ্রবৃত্তি মাত্র শিষ্য প্রবোধ নিমিত্তই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রবোধরূপ হৃদাকাশের নৈর্ম্মল্য দ্বৈত-বিবাদেচ্ছা ব্যতীত প্রকাশ পায় না, তাই আমি সুহৃদ্ভাবে উপস্থিত হইয়াছি; হইয়া তর্ক বিবাদ উত্থাপন করিয়া দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিয়াছি। গৃহের যেমন মার্জ্জনী, তেমনি এই বিচার হৃদয়মন্দিরের ভস্মমার্জ্জনা করিবে। এইরূপে যখন অবিদ্যা-ভস্ম মার্জ্জিত হয়, তখনই অধিকারী হইতে পারা যায়। তখন চিত্ত ব্রহ্মগত হয়, প্রাণ ব্রহ্মময় হয়, তদবস্থায় পরস্পরকে বোধ প্রদানপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত সেই ব্রহ্মবিষয়িণী কথা কহিতে কহিতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ঘটিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দে রতি হয়। এইভাবে যাহারা প্রীতিসহকারে ভজনা করে, সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হয়, তাদৃশ ব্যক্তি-বর্গেরই কালে ঐ মদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ দৃঢ় হইয়া উঠে। ঐ বুদ্ধিযোগ যখন সমুদিত হয়, তখনই তাঁহাদিগের মোক্ষাখ্য পরম পদ লব্ধ হইয়া থাকে। দেখ, অগ্নি, জল ও পশ্বাদি হইতে সামান্য তৃণ গাছটীকে রক্ষা করিতে হইলে যত্নসাধ্য উপায় অপেক্ষা করে, আর এই ত্রৈলোক্যের যে ব্রহ্মভাব-সম্পাদনে আত্যন্তিক রক্ষারূপ তত্ত্ব জ্ঞান, তাহা বিনা প্রযত্নে সিদ্ধ হইতে পারিবে কিরূপে? যে সকল জগজ্জীব মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভানন্দ পর্য্যন্ত পর পর শত শত গুণোৎকৃষ্ট সুখভোগ-লিপ্সায় চতুর্দ্দশ ভুবনভেদে সুবিস্তীর্ণ, হৃদ্গত নিকৃষ্ট কামজয়ে অসমর্থ, ও আধ্যাত্ম বিষয়ে আসক্তিবিরহিত, তাহারা তুচ্ছ ভোগাসক্ত বলিয়া যে নিরতিশয় আনন্দরূপ উত্তম স্থিতির নিকট উপহাসাস্পদ, তাদৃশ সর্ব্বোত্তম স্থিতির জন্য কে না প্রয়াসী হইবে? ফল কথা, তাহা পাইবার জন্য সকলেরই অবশ্য প্রযত্ন করা বিধেয়। এই যে চিন্তাঙ্কুরস্বরূপ রাজ্যাদি সুখ, ইহার কথা আর কি কহিব? যাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভরূপ সর্ব্বোত্তম পরম বিশ্রাম, তাহার

নিকট স্বর্গীয় ইন্দ্রপদও তৃণবৎ তুচ্ছ বস্তু। যাহারা অজ্ঞাননিদ্রায় অভিভূত থাকে, দৃশ্য ভোগবিষয়-ভোগেই নিরত হয়, তাহারা সর্ব্বদাই যেমন উহাতে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এই দৃশ্যপরম্পরার দর্শনেই নিমগ্ন হইয়া রহে, তেমনি যাহারা শান্ত তত্ত্বজ্ঞ সাধু পুরুষ, তাঁহারা দৃশ্যব্যাপারে অনাসক্ত ও প্রসুপ্ত প্রায় থাকিয়া সেই যে নিরতিশয় আনন্দপদ, তাহাতে প্রবুদ্ধ অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক নিরত কেবল তাহাই দর্শন করিতে থাকেন। ফল কথা, জ্ঞানিগণ যাহাতে সুপ্তবৎ দর্শনবিমুখ, অজ্ঞানী তাহাতে প্রবুদ্ধ রহেন; আর অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে সুপ্তাবস্থ, জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্ম-পদে জাগ্রৎ থাকিয়া সতত তাহার দর্শনানন্দ উপভোগে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। এই প্রকার যে নিত্যাপরোক্ষ নিরতিশয়ানন্দরূপ মোক্ষপদ, তাহা যত্নাতিশয্য ব্যতীত কদাপি সিদ্ধ হইবার নহে। যাহা সেই পরম পদ, তাহা অতি বড় অভ্যাস পাদপেরই ফলস্বরূপ। আমি বারম্বার ভঙ্গ্যন্তর অবলম্বন করিয়া কিম্বা যুক্ত্যন্তরের আশ্রয় লইয়া অথবা কথাখ্যানাদির বাহুল্যক্রমে এই যে একই কথা পুনঃপুন বলিয়া আসিলাম, ইহা তোমাদিগের অভ্যাসদার্ঢ্যেরই জন্য। পরন্তু একই কথা বহুবার বলিয়া বা বহু সহস্র বার পুনরুক্তি দ্বারা পল্লবিত করিয়া গ্রন্থবাহুল্য বিধানের প্রয়োজন কি? অশ্রদ্ধা একটা দুর্ম্মতি-বিশেষ, তাহা অবলম্বন করা তোমাদের পক্ষে অবৈধ। কেন না, যাহারা বিশেষ জ্ঞানশালী, তাঁহাদের মধ্যেও দুই এক জনেরই মাত্র অভ্যাসাপেক্ষা থাকে না। যাহার বুদ্ধি অজ্ঞতাময়, এবম্বিধ বিস্তৃত উপদেশ বাক্য প্রদান করিলেও এই দুরূহ আত্মতত্ত্ব তাহার হৃদয়ে তো স্থান পাইবার নহে! এই মদুক্ত শাস্ত্রের পুনঃপুন আবৃত্তি করিতে করিতে চিরদিন ধরিয়া যদি কেহ ইহার আস্বাদ লয়, অপিচ ইহার শ্রবণ কিম্বা কথন দ্বারা আলোচনা করিতে থাকে, তবে সে জন অজ্ঞ হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়; এ কথা নিশ্চিতই। পক্ষান্তরে যে জন ইহা একবার মাত্র দেখিয়াই মনে করে যে, আমার দেখা হইয়াছে আর সেইরূপ স্থির করিয়াই ইহা পরিত্যাগ করে, সে অধম—শাস্ত্রসমূহ হইতে ভস্মমুষ্টিও অধিগত হয় না। এই আখ্যান পুরুষার্থফলজনক; বেদের ন্যায় ইহা সর্ব্বদা অধ্যয়ন করা

কর্ত্তব্য। ইহাকে পূজা করিতে হয়; ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ আবশ্যক হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল বেদবচন বলিয়াই বিদিত। পরন্তু এই শাস্ত্র যদি পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তবে বেদের পূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ড ও উত্তরক্রিয়াকাণ্ড এই উভয়েরই অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে। ঐ উভয়ার্থবোধেই আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারণ হয় এবং ফলসিদ্ধি ঘটে। তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক তর্ক দ্বারা বেদান্তের যে ব্যবস্থা আছে, এই শাস্ত্রজ্ঞান ফলে তাহাই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই এই যে আখ্যান, ইহাই শাস্ত্রমধ্যে উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। আমি যে ইহা কাপট্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নহে। ফলে কিন্তু ইহা কারুণ্যবশেই বলিলাম। এই দৃশ্যপরম্পরা যে একটা মিথ্যা মায়া, ইহা তোমরাও বিদিত আছ। তাই বলিতেছি, এই শাস্ত্রের বিচারালোচনা তোমরা করিতে থাক। এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, লবণ দানে ব্যঞ্জনের ন্যায় ঐ জ্ঞান রুচিকর হইয়া থাকে। ভোগা-সক্তমনা মানব এই আখ্যানকে যেন কাব্য কথা বলিয়া বোধ না করে এবং বারম্বার মৃত্যুপরম্পরা ভোগপূর্ব্বক আত্মাকে যেন মোহগর্ত্তে পাতিত করিয়া আত্মঘাতী না হয়। অপিচ ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া পুনঃপুন যেন জনম-মরণ-যন্ত্রণা তাহারা না পায়। কাপুরুষেরাই দুরভিমান পোষণ করে। তাহারা ভাবে, নিজের পিতার কূপ থাকিতে অন্যত্র কেন যাইব? এইরূপ দুষ্টাভিমানক্রমেই তাহারা সন্নিহিত গঙ্গাজল পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে। কূপের ক্ষারোদক খাইবে, তথাচ পবিত্র গঙ্গাবারি পান করিবে না। এই যাহাদের কথা কহিলাম, এইরূপ অনেক মানব আছে, যাহারা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই তপস্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে তার্কিক এবং অনেকেই মীমাংসক ছিলেন। আমরা তাঁহাদেরই বংশে জন্মিয়াছি। সুতরাং তাঁহারা যে যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেই পথই আশ্রয় করিব। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন তাঁহারা যখন করেন নাই, তখন আমরা কেন করিব? এইরূপ বিচার বিবেচনার আশ্রয় লওয়া উচিত নহে। তোমরাও এরূপ করিও না। ইহাতে

ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, পুনঃপুন জন্মপরম্পরার ভোগ করিবে, আর উত্তরোত্তর মূর্খতাই প্রাপ্ত হইবে। তাই বলিতেছি, মূর্খতালাভের নিমিত্ত কেহ যেন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকার বিচার অবলম্বন করিয়া মৎ-প্রকাশিত এই শাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করিও না।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চিদাদিত্য-মণ্ডল সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ; তাহাতেই এ জগৎ পরিস্ফুরিত; তাই জীবাণুপুঞ্জরূপ কত অনন্ত অবয়ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বৎ তাহাতে প্রকাশ-স্বরূপে বিদ্যমান। চিদাদিত্যের নিরবয়বাত্মতা সিদ্ধি এইজন্যই। এইরূপ সমপ্রকাশ স্বভাবদর্শনে নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পর অভেদ ও অবয়বরাহিত্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, নক্ষত্রভেদ-বৎ জীবব্রহ্মের ভেদ নাই। ঘটাকাশাদির উপাধি নিমিত্তই জীব ব্রহ্মভেদ; উক্ত ভেদক পদার্থ ও অন্তঃকরণাদি উপাধি পদার্থ সকলই পরমাখণ্ডাকার 'অহং' ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রাপ্তি সত্ত্বে স্বীয় উপাধিরূপ ও স্বকৃত ভেদ পরিহার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীবের অবিদ্যাজনিত পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব পূর্ব্বে প্রকাশ পায় এবং ব্রহ্মৈক-বাক্যতার বিচ্ছেদবশতঃ ভেদভঙ্গ ও অনর্থবৎ প্রতিভাসমান হয়। তখন বিদ্যার প্রকর্ষে অবিদ্যার নিরাস হয়, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নিরাকরণ দ্বারা পুনরপি ব্রহ্মৈকবাক্যতা নিষ্পাদিত হয়। তখন আর 'অবয়ব' 'অবয়বী' এই এই প্রকার ভাব দ্বারা ভেদক বা ভেদকাতিরিক্ত কি হইবে? এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, অবিদ্যান্তঃকরণে দেহভেদাদি অবস্থায় পূর্ব্বে জীব ভিন্ন হইয়াই থাকেন। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মৈকভাব হয়; কেন না, ব্রহ্মবস্তু তত্ত্বজ্ঞেরই বিষয়, উহা সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই ভেদাদি মলবিরহিত একরসীভূত; উহাতে দ্বৈতভাবরূপ মল কখনই নাই। অতত্ত্বজ্ঞই অতত্ত্বজ্ঞের বিষয় অবগত আছে। আমরা তাহা জানি না। কেন না, 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি রূপ

মলিন বস্তু সকল তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ীভূত নহে; এমন কি উহাদিগকে কোন বস্তু মধ্যেই ধার্য্য করা যায় না। কেন?—তাহার কারণ এই যে, সেই আমি, এই অজ্ঞ, ইহা সত্য, উহা সত্য নহে; ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞের সম্ভবপরই হয় না। যে ব্যক্তি পিপাসাক্রান্ত, তাহারই নিকট মৃগতৃষ্ণা প্রথিত; পরন্তু স্বর্গভূমিতে বা সুমেরুতে পিপাসাদি নাই; সেখানে মৃগতৃষ্ণা কৈ? ইহা স্থাণু, ইহা শুক্তি, ইত্যাদি রূপ দ্রব্যতত্ত্ব নিশ্চয় যাহার আছে, তাহার যেমন উহা স্থাণু বা পুরুষ, ইত্যাকার সংশয় কিম্বা ইহা শুক্তি নহে,—রজত, ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তেমনি যখন পরমতত্ত্ব নিশ্চিত হয়, তখন আর ভেদভ্রম জ্ঞান থাকে না। এ জগৎ অগ্রে ছিল না, ইহার উৎপত্তিও হয় নাই, ইহা বর্ত্তমানে যে আছে, তাহাও নহে, আর যে হইবে, তাহাও নহে। তবে যে এ জগৎ এ ভাবে আছে, বুঝিতে হইবে, ইহা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই এরূপে বিরাজিত। এই ভাবে মার্জ্জন-গৃহীত চিদাকাশ-প্রতিভাস শুদ্ধ ব্রহ্মভাবেই অবস্থান করিতেছেন। তদবস্থায় শুদ্ধ ব্রহ্মই জগৎ, এইরূপই জীবন্মুক্তগণ অবগত হইয়া থাকেন। তৎকালে কোন জড় বস্তুই তাঁহাদের জ্ঞানগোচরে আইসে না। স্বপ্নে কিম্বা মনোরাজ্য-কল্পিত নগরে যেমন সেই একমাত্র অমল চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই, তেমনি এই জাগ্রৎ জগতেও চিন্মাত্র ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই উপাধি-স্বরূপ নাই। এই প্রকার উপাধিবর্জ্জন অঙ্গীকারে রূপ-বর্জ্জিত জীবেও রূপান্তর কিছুই নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে উপাদান কারণ বা নিমিত্ত কারণ, কোন কিছুই যেখানে নাই, সেখানে আর জগৎরূপ বস্তুর বিদ্যমানতার কথা কি হইতে পারে? অতএব কিছুরই উৎপত্তি নাই; অপিচ যাহা উদ্ভূতবৎ প্রতিভাত, তাহা অনাদিপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশই চিৎ-স্বভাবের প্রভাবে আপনা হইতেই তাদৃশরূপে আভাত। অতএব এ লোকে কেহ নাই; কোন চিৎপ্রপঞ্চও নাই। এই যে অজ্ঞজন-পরিজ্ঞাত ব্রহ্মাদি ব্যষ্টিসমষ্টি জীব ও জীবোপাধি, কিছুরই অস্তিত্ব নাই; পরন্তু সেই স্বয়ম্ভূ ও প্রপঞ্চ ব্রহ্মসান্নিধ্যবশে শূন্য এবং বিশাল বিস্তৃত চিদ্‌গগনই স্বচিৎপ্রভাবে তথারূপে বিভাত।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জাগ্রৎ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন, জাগ্রৎ-সুষুপ্তি; স্বপ্ন-জাগ্রৎ, স্বপ্ন-স্বপ্ন, স্বপ্ন-সুষুপ্তি; এবং সুষুপ্তি-জাগ্রৎ, সুষুপ্তি-স্বপ্ন, সুষুপ্তি-সুষুপ্তি; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী পর পর পরস্পরানুপ্রবেশে প্রত্যেকতঃ ঐরূপে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের নিরপেক্ষতায় নিখিল বস্তু কেবলী মনোময় হয়; তাই স্বপ্নোপমায় স্বপ্নই জাগ্রদ্ভাব উপগত হইয়া থাকে। এতকাল আমি ঘুমাইয়াছিলাম; এখন জাগিলাম; স্বপ্নেও এরূপ প্রতীতিসদ্ভাব-দৃষ্টি প্রসিদ্ধ। স্বানুভবসিদ্ধ জাগ্রৎই স্বপ্ন-জাগ্রতে স্বপ্নত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নের যেমন জাগ্রৎপ্রবেশ, জাগ্রতের তেমনি স্বপ্ন হইতে প্রবোধ; এবং স্বপ্নরূপ জাগ্রৎ হইতে প্রবোধানন্তর জাগ্রৎরূপ স্বপ্নে প্রবেশ; এইরূপ পরস্পরানুপ্রবেশবৎ পরস্পর নিমিত্ততাও লক্ষিত হয়। জাগ্রৎ স্বপ্নশালী সর্ব্বদা স্বপ্ন স্বপ্ন বলে এবং স্বপ্ন জাগ্রৎবান্‌ও জাগ্রৎ জাগ্রৎ এইরূপ উক্তি করে, ফলের বেলায় উক্ত উভয়ের ব্যপদেশসাঙ্কর্য্যও দেখা যায়। সেই স্বপ্নাবস্থার জাগ্রৎ এই সাধারণ জাগ্রদবস্থাবৎ অনুভূত হয় বলিয়া উহা জাগ্রৎই, স্বপ্ন নহে। অপিচ জাগ্রৎস্বপ্নে মনোরাজ্যে যে অনুভবকারী, তাহার জাগ্রৎ—স্বপ্নই; উহা কখন জাগ্রৎ নহে। ফলে জাগ্রতে সদাই লঘুকালাত্মক স্বপ্ন ও স্বপ্নে সদাই লঘু কালাত্মক জাগ্রৎ বিরাজিত। এবম্বিধ পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়ের কদাচ কোন ভেদভিন্নতা নাই। একে অপরের প্রবেশ আছে বলিয়া উভয়েরই পরস্পরানুপ্রবেশ বিদ্যমান। কাজেই যুক্তিপূর্ব্বক দেখিলে উভয়ই অসন্ময় হইয়া পড়ে। ইহা তোমার অনুভব হয় না যে, স্বপ্নাবসান জাগরণে এবং স্বপ্নদৃষ্টার্থ জাগ্রদবস্থায় সাদৃশ্য মাত্রই; পরন্তু জাগ্রতেরও স্বপ্নবৎ অনিবৃত্তি এবং সেই অবস্থায় দৃষ্টপদার্থের সত্তাও সর্ব্বদাই। সুতরাং স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ্‌বৈধর্ম্ম্য স্পষ্টতই প্রতীত; উহার কারণ জাগ্রৎ লক্ষণ স্বপ্নের—মৃত্যুকালীন পরলোক প্রবোধ এবং আত্যন্তিক দ্বৈতনাশ

লক্ষণ তত্ত্ব প্রবোধে নিবৃত্তি আছে। অপিচ অহরহ স্বপ্নানুভূতিরূপ স্বপ্নার্থ বোধকালে ও সুষুপ্তিকালেও ঐ জাগ্রৎ শূন্যভাবের হইয়াই অবস্থিত হয়। তাই বলিতেছি, আছে মাত্র সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য নাই। অন্যচ্চ তোমার ইহাও বলা উচিত হইবে না যে, অদ্য যে স্বপ্ন দেখা গেল, তাহার অর্থ আগামী দিবসের স্বপ্নে নাই; পরন্তু জাগ্রদবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তদর্থ আগামী দিনের জাগ্রৎকালেও থাকিবে; এ বৈষম্য নিবার্য্য নহে। কেন না, বিভিন্ন জন্মের সেই সেই দৃষ্ট বস্তুর অনুবর্ত্তন নাই। জীবদ্দশায় স্বপ্নে মৃত্যু বোধোদয় ব্যতীত পরলোকাত্মক জাগ্রৎ কিছুই দেখা যায় না। এইরূপে অদ্যতন স্বপ্নে জীবনাদি সর্ব্ব পদার্থ শূন্য হইলেও ভ্রমের বশে নানা মায়াত্মক হইয়া যখন জীবিত হইলাম, ইত্যাকার জ্ঞানোদ্রেক হয়, তখন আগামী দিবসীয় বা পূর্ব্বদিবসীয় স্বপ্ন পরলোকাত্মকপ্রায় দেখা যায় না, বা সেই পরলোকের কোন পদার্থ ইহলোকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, লক্ষিত হয় না। স্বপ্নাবস্থায় এই ত্রিজগৎ যেমন চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মক, তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও সর্গ হইতে অন্তঃকরণে এই জগত্রয় চিচ্চমৎকৃতিমাত্রাত্মকরূপে প্রতিভাসমান। জানিবে—এই দৃশ্যমান উর্ব্বী প্রভৃতির আকারবত্তা জাগ্রদবস্থায় প্রকৃতরূপে প্রকাশ পাইলেও স্বপ্নের দেখা বস্তুর ন্যায় অসত্যরূপেই বিদ্যমান। তেজঃপদার্থের আলোকবৎ এই জগদাকাশে সম্পূর্ণতঃ প্রকাশমান রহিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে চিদাকাশেরই স্বভাবমাত্র। গগনে, ভবনে, ভিত্তিতে, স্থলে, জলে, সর্ব্বত্রই সেই চিতের স্বাভাবিক জগদভিধেয়া চমৎকৃতি অত্যন্ত উদ্যোতিত হইতেছে। তাই বলিতেছি, এই কেবল শূন্যস্বরূপা অসত্যাকারা ভ্রান্তিই যখন সত্য বস্তুবৎ বিরাজমানা, তখন আর এই ভ্রমে আগ্রহ আবার কি? গ্রাহ্য, গ্রাহক, গ্রহণ, এই ত্রিপুটী জগৎরূপ অসত্যমাত্রই; অধিষ্ঠানসত্তায় এ জগৎ সৎই হউক, আর অসৎই হউক, সত্যাসত্যের একতর নির্ণয়রূপ দুরাগ্রহে প্রয়োজন আছে কি! ইহা এইরূপ বা অন্যরূপ যাহাই হউক বা না হউক, এ বিষয় তোমাদের আবার ইতর পক্ষাশ্রয়ের অভিমানসম্ভ্রম কি? কেন না, অজ্ঞান হয়, অজ্ঞান হইতেই একতর পক্ষাভিমান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে

তোমরা যখন বস্তুগত্যা সকলই অবগত হইতে পারিয়াছ, তখন তোমাদের এতদন্তর্ভূত ভোগলক্ষণ ও ইহার সত্যত্ব-প্রতিষ্ঠারূপ ইতর অসারফলে আগ্রহ উচিত নহে।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বাদি-ভেদ-সম্মতা চারিপ্রকার খ্যাতি; যথা অখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি, ও আত্মখ্যাতি। এই খ্যাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ খ্যাতিতে এই চিচ্চমৎকৃতি প্রতিভাত আছেন? তোমার বোধ হয় এইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে! তবে শোনো, বলিতেছি—ঐ যে বাদিগণের ভেদ-সম্মত চারিটী খ্যাতিভেদ, বিদ্বান্‌গণের দৃষ্টিতে ঐ সমস্তই শশশৃঙ্গসদৃশ অলীক বস্তু। পঞ্চমী খ্যাতির নাম আত্মখ্যাতি; উহা অলৌকিকী; ঐ অলৌকিকী খ্যাতিই সার্থক্যশালিনী। জানিবে—উহাই বক্ষ্যমাণ শিলোদরপ্রতিম নিরন্তরঘনা। ঐ খ্যাতি বাচ্যার্থযুতা, অন্যবিধ খ্যাতিশব্দ-বিরহিতা এবং অখণ্ডার্থক পদদ্বয়-লক্ষ্যা। এইরূপ একটা আশঙ্কা তোমার হইতে পারে যে, 'আত্মাই খ্যাতি' এই পদযুগলের সামানাধিকরণ্য দ্বারা যদি অন্বয় করা যায়, তবে আত্মাই বা কি? আর খ্যাতিই বা কাহার হইবে? এ আশঙ্কানিরাসের কারণ—চিদাকাশ আদি সৃষ্টি হইতেই এইরূপভাবে বিস্তীর্ণ; অতএব আত্মাই আত্মায় স্বচৈতন্য-মহিমায় এই সর্গত্ব খ্যাপন করিয়াছেন; তাই আত্মারই সর্গতাবিষয়িণী খ্যাতিসিদ্ধি সুনিষ্পন্ন হইল। এ জগতে নদীপ্রবাহ নাই; এবং উন্মজ্জন-নিমজ্জনও নাই! সেই নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপ ব্যোম ব্যোমস্বরূপেই খ্যাতি-প্রাপ্ত; উহা কদাচিৎ খ্যাতিশব্দ-বর্জ্জিত, ও একেবারেই ভাবকল্পনা-বিরহিত। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, উহার উত্তর পদ খ্যাতিশব্দ ও তদর্থ ব্যতীত স্বপ্রকাশ আত্মাই স্বাত্মক সৃষ্টিপ্রখ্যানাত্মক; তাই উহা আত্মখ্যাতি আখ্যায় অভিহিত। এই নিখিল জগৎ যখন একমাত্র আত্মাই,

আর সেই আত্মা স্বপ্রকাশাত্মাই; তখন তিনি তো কদাচ স্বাতিরিক্ত খ্যাতি দ্বারা খ্যাপিত হইবার নহেন। এইরূপে এই অখ্যাত বাক্যেরই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত; পরন্তু ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া যে অখ্যাতি শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আত্মায় প্রযোজ্য নহে। এতাবতা বুঝিয়া দেখ, প্রথমে যে অখ্যাতিপ্রভৃতি শব্দ সমুল্লিখিত হইয়াছে; উহা চিন্মাত্রসর্গে সঙ্গতিবিরহিত। কেন না, খ্যা-ধাতুর অর্থ—প্রথাভাব; তদুত্তরের প্রত্যয়ার্থ সত্তা; তবেই খ্যাতি শব্দের অর্থ হইল খ্যানাত্মিকা সত্তা, এ ক্ষেত্রে আত্মায় খ্যাতি কি! আর তদ্বিপরীতার্থ-শালী অখ্যাতি বাক্যযুক্তির বাস্তবত্বই বা তাহাতে কি? অপিচ ণিচ্-প্রত্যয় দ্বারা খ্যাপনার্থ নিষ্পাদন করিলে দীপ দ্বারা দীপান্তর খ্যাপনবৎ সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার খ্যাপন-আখ্যাপনের সম্ভবপরতাই বা কি? এইরূপে এতদ্দ্বারা অসৎখ্যাতি এবং অন্যথাখ্যাতিরও নিরাস নিশ্চিত। যদি এরূপ অঙ্গীকার কর যে, স্বপ্ন মনোরাজ্যাদি দৃশ্যাভ্যন্তরে অখ্যাতি, অন্যখ্যাতি বা অসৎখ্যাতি—চিন্মাত্ররূপচিত্ত চমৎকৃতিই সমানভাবে ভাসমান আছে; তাহা হইলে আমাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ঐ চিন্মাত্র ব্যোমভাস্করের যে চিদংশুপুঞ্জ, তাহা যখন যেমন যেমন-ভাবে প্রত্যয়গোচর হয়, তখন তাহা সেই সেইরূপেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। তবেই হইল, ঐ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, ও অন্যথাখ্যাতি, এ সমুদায় চিচ্চমৎকৃতিযোগে আত্মখ্যাতিরই বিভূতি। উহা আদি-অন্ত-বিরহিত, বর্ণনাতীত ও একমাত্র ঘনাকারে প্রতিভাত। এ সম্বন্ধে এক শ্রুতিমধুর উপাখ্যানের অবতারণা করিতেছি! শ্রবণ কর। ইহা দ্বৈতদৃষ্টির প্রতিষেধক ও বোধ-বিভাকরের প্রকাশকর। এক বিমল বিশাল শিলা বিদ্যমান। উহার পরিমাণ এক সহস্র যোজন এবং নীল গগনভিত্তির ন্যায় উহা বিরাজমান। উহাতে অবয়ববিশ্লেষ-ঘটনা নাই। উহা আকাশবৎ নির্ম্মল নিবিড় বজ্রসারসন্নিভ ও বিস্তীর্ণ। ঐ শিলার গর্ভ অতীব পুষ্ট ও অত্যন্ত কাঠিন্য-সম্পন্ন। সংখ্যাতীত কল্পকাল অতীত হউক, তথাচ উহার বিনাশসম্ভাবনা নাই। উহা দেখিতে ঘনাবয়ব, মনোহর ও নির্ম্মলতায় গগনবৎ ভাসমান। উহার সজাতীয় পদার্থান্তর নাই; তাই উহা বিশিষ্ট; অপিচ উহা কোথায় কিরূপে অবস্থিত বা

উৎপন্ন, এ হেন দেশ-কাল প্রকারও উহার একান্তই প্রসিদ্ধি-বর্জ্জিত। ঐ শিলা সর্ব্বদা একই ভাবে বিরাজিত। উহার অন্তর্গর্ভ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুদ্‌বর্জ্জিত; চিত্রময় স্ফটিকশিলাগর্ভের চিত্রবৎ অঙ্গস্বরূপ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-খড়্গ-খট্বাঙ্গাদি উহাতে বিরাজমান। সেই শিলার উদরে আকাশ, বাতাস, ইত্যাদির কোনই সম্ভাব নাই। পরন্তু উহাই তথাবিধ দৃশ্যমান স্বগর্ভগত চিত্রনিচয়ের আকাশ, বাতাস, জল, তেজ, ইত্যাদি নানা নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহার দেহ নাই; কাজেই নিজের জীব নাম প্রতিপাদন করে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার বর্ণিত বিষয় শিলা; শিলা তো অচেতন বস্তু বলিয়াই লোক-প্রসিদ্ধ। উহার চেতন সম্ভাবনা কিরূপ, তাহা ব্যক্ত করুন। যদি উহার অচেতনত্বই সিদ্ধ, তবে স্বগর্ভগত চিত্রের আকাশ, বাতাস প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশে সক্ষম হইল কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—উল্লিখিত শিলা চেতন বা জড়, কিছুই নহে। উহা আকারে প্রকারে অতি বিপুল ও অত্যুজ্জ্বল। উহার জাতিতত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, এরূপ অন্য কেহ বা বিদ্যমান আছেন?

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি অন্য কাহারও সত্তা নাই, তবে তদ্‌গর্ভস্থ আকাশ-বাতাসাদির লেখা কে দেখিয়া থাকে? ঐ শিলায় টঙ্কাস্ত্র দ্বারা কেহ বা চিত্ররেখা আঁকিয়া রাখিল? ইহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঐ শিলা অতি দৃঢ়া—অভেদ্যা; উহার বেত্তা কেহই নাই। উহা আপন দেহে আপনিই সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহার অভ্যন্তরে শত শত সংখ্যাতীত চিত্রময় গিরি, তরু, নগর, পুর বিরাজমান। উহাতে দেব-দানব সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম সাকার নিরাকাররূপে প্রতিমাবৎ চিত্রাকারে প্রতিভাত। উহাতে আকাশ নামে এক চিত্র আছে, তাহা অনন্ত বিস্তীর্ণ। তন্মধ্যে রবিশশি-নামে বহুল উপলেখাও বিরাজ করিতেছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কে সেই শিলাঙ্কিত লেখারাজি নিরীক্ষণ করিয়াছে? সেই লক্ষিত লেখা সকলই বা কি প্রকার আর সেই অতি-কোষবর্ত্তী লেখা সকল কি করিয়াই বা দেখা যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ঐ যে লেখার কথা বলা হইল, আমিই তো তাহা দেখিয়াছি। তোমারও যদি দেখিবার সাধ থাকে, তবে সমাধি অবলম্বন কর; দেখিতে পাইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—আপনারই তো মুখে শুনিলাম যে, সেই শিলাখণ্ড বজ্রবৎ কাঠিন্যযুক্ত; তাহা ভগ্ন করিতে পারে, এরূপ সাধ্যই কাহারও নাই। তথাচ আপনি তাহার উদরে অঙ্কিত লেখা দেখিতে পাইলেন কি প্রকারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি বশিষ্ঠ, আমিই তো রেখারূপে ঐ শিলার উদরে বিরাজমান রহিয়াছি, তাই তাহার অন্তর্গত লেখারাজি আমি দেখিতে পারিয়াছি। একথা সত্যই বটে যে, কাহার সাধ্য—কে সেই শিলা ভঙ্গ করিতে পারে? আমি তাহার অভ্যন্তরে রহিয়াছি, আর তাহার অন্তরের সেই সেই সকল দেখিতে পাইয়াছি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—গুরুদেব! ঐ শিলা কি? আপনিই বা কে? কোথায় আপনি আছেন? কি এ শিলার কথা কহিতেছেন? আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনি কি সত্য সত্যই উক্ত শিলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! আমি উক্ত প্রকার বাক্যভঙ্গী দ্বারা পরাত্ম-মহাসত্তার কথাই তোমার নিকট বলিয়াছি। জানিবে—উহা যে সত্য সত্যই মহাশিলা, তাহা নহে। কি আকাশ, কি বাতাস, ইত্যাদি চারিটী ভূতিই উহার অঙ্গ। অপিচ ক্রিয়া, শব্দ, বাসনা, কাল ও কল্পনা, এ সকলও সেই শিলার অঙ্গীভূত। বিশদ কথা এই যে, ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সমুদায়ই সেই শিলার অঙ্গস্বরূপ। এই যে আমারা আছি, আমরা সকলেই সেই পরমাত্ম-মহাসত্তার মাংস-স্বরূপে রহিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে আমাদের ভেদ নাই। তবে যে আমরা ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করি, এটা কেবল ভ্রান্তির বশেই। এই বিশালা চিন্মাত্রাত্মিকা শিলার অতিরিক্ত আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। এই যে কিছু ঘটপটাদি, এতৎসমস্তই বিশুদ্ধ বেদনমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যেমন একই জল

তরঙ্গাকারে পৃথক প্রতীয়মান, তেমনি এ সমুদায়ও স্বপ্নবৎ প্রতীতি-গোচর। ফলে সকল দৃশ্যই ব্রহ্মঘন, সকলই চিন্মাত্রঘন, সকলই পরমার্থ-ঘন, সকলই একমাত্র ঘনাকার। যত কিছু দেখ, সকলই সেই মহা-চিৎশিলার নীরন্ধ্র উদর। উহার আদি-অন্ত-মধ্য নাই। একমাত্র সেই ব্রহ্মাত্মাকর্ত্তৃকই স্বস্বরূপে এই জগৎ ভুবন ইত্যাদি পর্য্যায়নামে প্রথিত দৃশ্যাখ্য কল্পনা অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বোল্লিখিত খ্যাতিচতুষ্টয়—আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি, এই শব্দার্থ দৃষ্টিগুলি তত্ত্বজ্ঞানীর বিচারে শশশৃঙ্গবৎ অলীক পদার্থ। জগৎখ্যাতি থাকিলেই সে খ্যাতি—কিমাত্মক অথবা উহা কি অসৎখ্যাতি, ইত্যাদি বিকল্পকল্পনা হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যখন তাহারই অভাব, তখন চাতুর্ব্বিধ্য হইবে কাহার? জানিবে—কদাচ কোন খ্যাতিসম্ভাবনাই নাই; সমস্তই শান্ত শিব। একমাত্র আত্মাই আছেন; তিনি ব্যপদেশ-বর্জ্জিত, খ্যাতি প্রভৃতি কল্পনার মূল চিত্তবেষ্টা-রহিত এবং জ্ঞানময়। ঐ যে আত্মখ্যাতি প্রভৃতি ভ্রান্তি, চিন্মাত্র হইতেই উহার উদয় হয়। উক্ত চিন্মাত্র কিন্তু পরমার্থতঃ শুদ্ধতর ব্যোমস্বরূপ। আমি দেখিতেছি, সর্ব্বকল্পনাই চিন্ময়ীরূপে বিভাত! এই আত্মা, এই খ্যাতি, ইত্যন্ত কল্পনাভ্রম উক্ত চিৎস্বরূপে সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছি, এ সকল শব্দ পরিহারপূর্ব্বক যাহা পরমার্থ, তাহারই ভজনা কর। এই যে জগৎ দেখিতেছি, ইহা গতি, স্থিতি ও ভক্ষণক্রিয়াশালী হইলেও সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি-বিরহিত, আকাশপ্রায় শূন্য, নিস্তব্ধ, নির্ম্মল ও অখণ্ড। উহা যদিও নানাশব্দ-সমষ্টি-ময়, তথাচ শিলাবৎ মৌনভাবে অবস্থিত; যদিও নিয়ত গমনাগমনশীল, তথাচ আকাশ ও অচলবৎ সর্ব্বদাই অচলভাবে

অধিষ্ঠিত; যদিও নানারম্ভশালী, তথাচ মহাশূন্য; যদিও পঞ্চভূতময় তথাচ আকাশবৎ শূন্য; এবং যদিও পঞ্চভূতবিরহিত সঙ্কল্পনগরবৎ সচেষ্ট, তথাচ চেষ্টারহিত আকাশপ্রতিম শূন্য এবং স্বপ্ননারী-সঙ্গবৎ ভ্রান্তিপূর্ণ। যেমন প্রতিবিম্বগত নারীমূর্ত্তি, তেমনি উহা অনুভূত হইলেও ব্যর্থ। অপিচ নানানুভব ও নানা নির্ম্মাণের আস্পদ হইলেও বস্তুতঃ উহা বস্তু-বর্জ্জিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এই যে জাগ্রৎস্বপ্নাত্মক জগৎ আছে, এতৎ-প্রতিভানের প্রতি আমার প্রতীতি হয়, স্মৃতিই একমাত্র কারণ; ভ্রান্তি উহার কারণপদবাচ্য নহে। কেন না, অধিষ্ঠানদোষে বা সাদৃশ্য সম্প্রয়োগাদির কারণে ঐ স্মৃতি সম্ভূত হয় না; তৎকালানবস্থ সৎ বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং স্মৃতিবশেই এই জগৎ অবলোকিত হইতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ইহা সেই চিদধিষ্ঠানমূলক ভ্রান্তিই; ইহাকে স্মৃতি বলা যায় না। অপিচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভবপরম্পরার সদৃশ প্রতিকৃতি স্মৃতি হইয়া থাকে; এ জগতের তো পূর্ব্বানুভব অসিদ্ধ। ঐ যে ব্যোমাত্ম সত্তামাত্র ও চিৎচাকৃচিক্যবশে ভিত্তিবিরহিত কাকতালীয়প্রায় শরীর পরিস্ফুরিত হয়, উহাই এই জগৎপদবাচ্য। এই যে নির্নিমিত্তাত্মক জগৎ, ইহা সর্ব্বাত্মক হইলেও মহা নির্ব্বাণ এবং ব্যোমাত্মা হইলেও যাহা আত্মবর্জ্জিত, তথাবিধ পরমাত্মরূপাধিষ্ঠানে বিদ্যমান। যে কোনকালে যথাকথঞ্চিৎ প্রকারে বা নিয়ত অনিয়ত স্থানে যে কোনরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, অথচ বস্তুগত্যা যদীয় ভান কিছুই নয়, সেই স্বচ্ছ স্বভাব ব্রহ্মভানেরই—সেই স্বস্বভাব-পরিহারবর্জ্জিত পরমার্থ ব্রহ্মই স্বচৈতন্যবশে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুর্য্য, ব্রহ্ম ও আত্মা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা নামে স্বয়ংই স্বাভায় করিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে নাই স্বপ্ন, নাই জাগ্রৎ, নাই সুষুপ্ত-তুর্য্য বা তুর্য্যাতীত; কিছুই নাই। সকলই একমাত্র শান্ত পরম নভোভাব। পক্ষান্তরে উহাকে সকলই বলা যায়। দেখ, চিৎস্বরূপের স্বপ্ন কদাচ নাই বলিয়া সর্ব্বদাই উহা জাগ্রৎস্বরূপ; যাহা দেখা যায়, তাহা ভ্রমমাত্র, কাজেই উহা সর্ব্বদাই স্বপ্নরূপ, অবিদ্যার আবরণ বলিয়া সর্ব্বদাই উহা সুষুপ্ত; কিম্বা সতত জাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান বলিয়া

উহা সর্ব্বদাই তুর্য্য; অথবা উহা তুর্য্যাতীত; কেন না, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উহা সেই শান্তস্বরূপই। ইহা সেই কি না, এবং শূন্য স্বরূপ জলময় চিদাকাশ-মহার্ণবের মহোদরে ইহা কেন কি অকিঞ্চিৎ, বুদ্বুদ কি তাহা নয়, ইত্যাদি বিকল্পনায় কিছুই আমরা অবগত হইতে পারি না; কাজেই এই সকলই যে সর্ব্বদা জাগ্রদাদি সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত, ইহা নিশ্চিতই। কল্পজ্ঞানদৃষ্টিতে যাহার যাহা জ্ঞানগম্য হয়, সে সেইরূপই অনুভব করে। আকাশবৎ স্বপ্নাবস্থায় সৎ বা অসৎ যাহাই প্রতীত হয়, তাহা সেইরূপই সৎ বা অসৎ হইয়া থাকে। এই যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই সম্বিৎ-কচন বিততাত্মা; চিদ্‌ব্যোমে চিদ্‌ব্যোমের যেরূপ ভান হয়, তাহা সেইরূপেই বিভাত হইয়া থাকে। ঐ সম্বিৎকচন ভানানুসারে তাহাতেই ভাসমান। ঐ সম্বিৎ চিদ্‌ব্যোমবিষয়ক মাত্র; তদ্ব্যতীত উহাকে আর কিছুই বলা যায় না। সেই সম্বিৎ সতত এইভাবে আছে; এই জগৎ সম্বিদেরই অঙ্গস্বরূপ; কাজেই সম্বিৎ ব্যতীত যখন কিছুই নাই; এবং এই জগৎই যখন সম্বিন্ময়, তখন উহার উদয়াস্ত কিছুই নাই; উহা একইভাবে আছে। মহাপ্রলয়সৃষ্টি প্রভৃতির আদিম কালবিভাগ, তন্মধ্যস্থ মহাপ্রলয়রূপ রাত্রিসমূহ এবং সৃষ্টিরূপ দিবসনিচয়, সমস্তই সেই সম্বিদের কেশ নখ প্রভৃতির ন্যায় অবয়ববিভাগ। সেই সম্বিদের ভানই চিৎস্বরূপ আর অভানই মায়া। এ সকলই সমীরণের ন্যায় মহাচিতের স্পন্দনমাত্র। তাই বলিতেছি, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিই বা কি? আর তুর্য্য স্মৃতি এবং ইচ্ছাই বা কি? এই সমুদায় কিছুই কিছু নহে; সকলই কুদৃষ্টি-বিজৃম্ভিত। যখন বাহ্যার্থরূপে চিৎস্বভাবের অন্তঃসম্বেদনই প্রতিভান পাইতেছে, তখন কি দ্বৈত, কি অর্থশ্রী, কে কোথায়? এইরূপ হইতে স্মৃতিই বা কোথায় কি! তবে এ জগৎ আখণ্ডাকারে ভাসমান, ইহা অভূতাত্মক স্বভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, ঐ নিরালম্ব অম্বরে বিভাকরের ভূতবিরহিত দীপ্তিচ্ছটাই ভান; সেই ভান ভাস্য বস্তুর অপেক্ষা রাখে না; বাস্তবপক্ষে বাহ্য পদার্থের সত্তা থাকিলে তদনুভবজন্য স্মৃতিই এই জগৎসৃষ্টির আদিম স্থিতির নিদান হইতে পারে। কিন্তু কথা এই, যত কিছু বাহ্য পদার্থ আছে, তাহার কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কেন না, ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি-

প্রাগবস্থায় কারণভাবে তাহার অস্তিত্ব একান্তপক্ষেই অসম্ভব। শশকের বিষাণ নাই, আকাশে পাদপ নাই, বন্ধ্যার তনয় নাই, কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রমা নাই; এই যেমন, অর্থাৎ এ সকলের যেমন একান্তই অসম্ভাবনা, তেমনি সৃষ্টির আদিতে অজ্ঞজনসমীপে প্রতিভাত এই 'অহ'মাদি অর্থ অতত্ত্ব দর্শনেই আছে, আর তত্ত্বদর্শনে কিছুই নাই।

রামচন্দ্র! অজ্ঞজনের দর্শনে এই জগৎ যেমন মহাকারে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলে ইহার আবার মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত কোনরূপই থাকিবার নয়। তত্ত্বজ্ঞ জনের নিকট ইহা কেবল অখণ্ড চিদেকঘনই অখণ্ডভাবে বর্ত্তমান। উল্লিখিত সম্বিদ্‌ঘন চিদাকাশের মজ্জা যে যে কালে যে যে ভাবে প্রকট হয়, ব্যবহারিক উপচারক্রমে তখনই উহার উদয় এবং অপ্রকটতায় অস্ত কল্পনা হয়। অজ্ঞ জন যখন শূন্যকেই অলীক ক্ষিত্যাদির আকারে অবগত হয়, তখন ঐ শূন্য নিজ ভানেরই ক্ষিত্যাদি কল্পনা ধারণ করেন। আকাশ মাত্রই উক্ত মহাচিতের স্বীয় ভান; ঐ মহাচিৎ পরে শূন্যস্বরূপ ভানকেই ক্ষিত্যাদি ব্যপদেশে ব্যবহার-পথে উপনীত করিয়া থাকেন। বালকের যেমন মনঃকল্পিত পুরী, তেমনি ঐ অব্যয় চিন্মাত্রই নভঃসন্নিভ নিজাত্মায় 'এই ইহা পৃথ্বী বা অন্য কিছু' এইরূপ সম্বিৎ আশ্রয় করেন। এরূপ আশঙ্কা তোমার হইতে পারে বটে যে, ঐ চিন্মাত্রই যদি জগদাকার ভান হয়, তবে আর অভান কি? এ পক্ষে বলি, এরূপ বিকল্পনা অবৈধ; কেন না, ঐ যে ভান ও অভান, উহা আকাশে সমীরণবৎ প্রাণশক্তিতে স্পন্দ ও চিৎশক্তিতে অস্পন্দস্বভাব। বাসনার উদয়ে উক্ত চিদাকাশ যেমন যেমন স্ফুরিত হয়, এ জগৎ সেই সেই-রূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। ফল কথা, এই পৃথ্ব্যাদির আকার কিছুই নাই; ইহা শূন্যে শূন্য আছে; উহার সত্তাও কিছুই নাই। যে ভাবে উহা প্রতিভাত হয় হউক। উহা বিকাশস্বরূপ; তাই উহা না সৎ, না অসৎ; উহার প্রপঞ্চরূপও কিছুই নাই। উহা এক অনির্ব্বচনীয়স্বরূপেই প্রতিভাত। ইহা এইরূপ, বা এইরূপ নহে; ইহা সৎ কিম্বা অসৎ, যেরূপ ভাবেই আছে; প্রাজ্ঞই তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। কেন না, যে কিছু লোকপর্য্যায়-বৃত্তান্ত, তাহা প্রাজ্ঞেরই পরিজ্ঞাত, অজ্ঞের নহে। সেই

প্রাজ্ঞই সকলের হৃদাকাশে আত্মাকারে বিরাজমান। সুতরাং তদ্রূপ-স্ফুরিত দৃশ্য সম্বিৎ নিবন্ধন এই আন্তর দেহ ও বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভেদ কল্পনার প্রয়োজন নাই। ঐ যে এ জগতের মহাচিৎ, উহাতে বাহ্যই বা কি আর আভ্যন্তরই বা কি? শিব শান্ত ওঙ্কারস্বরূপ সকলই। এই এই প্রকার অভেদকল্পনায়, সমুদায় বিলীন কর—করিয়া শান্তির পথে উপনীত হও। বিচার ফলে সমস্তই অসৎ হইয়া পড়ে, তথাচ বাচ্য বাচক দৃষ্টি ভিন্ন শাস্ত্রীয় বিচার সুসম্পন্ন হয় না। উক্ত বিচার যদি বিষয়াদি সিদ্ধ পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়, তবেই সিদ্ধির উপযোগী হইয়া থাকে। রাত্রিকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দীপের আবশ্যক; দীপ ব্যতীত যেমন উহা হয় না, তেমনি তথাবিধ বিচার ব্যতীত সিদ্ধি লাভ কখনই হইবার নহে। তাই বলিতেছি, সম্যক্ বিচারের আশ্রয় লও, তাহা দ্বারা নিজ বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য সম্পাদন কর—করিয়া তাহার সাহায্যে অন্তরের সঙ্কল্প-কল্পনারূপ অনল্প বিকল্পজাল অপসারিত কর। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমার্থই ঐ সকল শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত; অতএব একান্ত মনে উহাতেই মনকে তুমি মগ্ন করিয়া ফেলো; একনিষ্ঠা অবলম্বন কর; সংসার হইতে উৎপতিত হও; যাহা পরমোত্তম মোক্ষপদ, তাহাই লাভ কর।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরমাত্মা জন্মাদিবিকার-বিরহিত; তিনিই আকাশ-কল্প স্বীয় আত্মায় এই শূন্যাত্মক বিচিত্র সর্গাভাস করিয়া থাকেন। বৃক্ষের যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্বক শাখাবৈচিত্র্য প্রকটন, তেমনি ঐ পরমাত্মারও অবুদ্ধিপূর্ব্বকই এই প্রপঞ্চ ধ্যান সম্বিধান। সমুদ্র যেমন আমি করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধি না করিয়া স্বসলিলে আবর্ত্তাদি প্রকটন করে, শূন্যাত্মা

সর্ব্বেশ্বরও স্বীয় ব্যোমদেহে তেমনি জগৎ প্রতিভাস করেন। অতঃপর সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তদীয় জগদাকার-প্রাপ্ত সম্বিদের নানাবিধ নাম নিজেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন ; ঐ সকল নাম যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইত্যাদি। সাগরের যেমন তরঙ্গাদি, তেমনি চিত্তের দৃশ্যরূপ সমারম্ভ বুদ্ধ্যাদি-সিদ্ধি পর্য্যন্ত অবুদ্ধিপূর্ব্বকই ; অপিচ বুদ্ধিসিদ্ধির পর যে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সমারম্ভ, উহা তাহার বুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। যেমন আবর্ত্ত কণ-কল্লোল-বীচি প্রভৃতির সমুদ্র হইতেই আবির্ভাব হয়, তেমনি মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সেই চিন্মাত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। জানিবে—যেমন চিত্রার্পিত জগৎ একটা ভিত্তি মাত্র বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি এই চিৎস্বরূপে আভাসমাত্রক আকাশ চিদাকাশমাত্রাত্মকই। পূর্ব্বে যে বৃক্ষ ও সমুদ্রাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যেমন অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্বব্যাপারে নিরত হইলেও শাখা ও আবর্ত্তাদির আরম্ভনিয়তি নিমিত্ত সম-সন্নিবেশই ধারণ করে, তেমনি চিৎস্বরূপেও অবুদ্ধিপূর্ব্বকই সর্গাত্মক সমারম্ভের সমান সন্নিবেশ ঘটে। বৃক্ষে যেমন গুচ্ছাদি নামান্তর নিরূপণ অপর ব্যক্তিই করে, তেমনি এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদির উত্তরকালিক যে চিৎপাদপ-প্রসূত পুষ্পাদিতুল্য পৃথ্বী প্রভৃতি নাম, ইহা বুদ্ধি-সমষ্ট্যাত্মক ব্রহ্মাদিরূপ অন্যকর্ত্তৃকই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহাবৃক্ষের পত্র পুষ্পাদি নাম নামতঃ ভিন্ন হইলেও যেমন অভিন্ন, জানিবে—তেমনি এই পরমাত্মা চিদাকাশেরও পৃথ্বী প্রভৃতি নাম তাহা হইতে ভিন্ন নহে। বৃক্ষাবয়বের যে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, তাহা অন্য ব্যক্তিই দিয়া থাকে। এইরূপে বলা যায়, চিদাকাশে আকাশস্বরূপ স্বপুত্রাদি ও বৃক্ষাদি সমুদায়েতেই যে ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম, তাহা সেই চিদাত্মাই অন্য ব্যষ্টি জীববৎ হইয়া প্রদান করিয়া থাকেন। সেই চিৎপাদপই স্বপ্নের ন্যায় স্বয়ং কার্য্যকরণবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। রঘুনাথ! তোমার এইরূপ একটা আপত্তির বিষয় হইতে পারে যে, যদি সর্গাদিরই অভাব, তবে তো পরলোকেও সেই চিৎকর্ত্তৃক সেই সর্গাদি মিথ্যানুভূত হইবারই সম্ভাবনা। উত্তরে বলি, এরূপ আপত্তি অযৌক্তিক হইয়া পড়ে! কেন না, তাহাই যদি হয়, তবে বৈধাবৈধ কর্ম্মফলের প্রতি অযুক্তি প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে। সুতরাং সর্গাদির মিথ্যাত্ব হয় কিরূপে? এরূপ বলিলে ভ্রমাদিতে রজ্জু-

সর্প ও মৃগতৃষ্ণাদি অনুভবমধ্যে যথার্থতারূপ অপহ্নব কাহার হইয়া থাকে ? কেন না, সেই যে অনুভব, তাহারও স্বপ্নে ভোগজনক কর্ম্মফলত্ব-বশতঃ বিশেষত্ব কিছুই নাই। সাকারাধ্যাসে বৃক্ষাদি হইতে ইহাই চিত্তের বিশেষত্ব যে, বৃক্ষ সাকার, তাহাতে সাকার কল্পনারূপ অধ্যাস কল্পিত, আর চিৎস্বরূপ নিরাকার, তাহাতে এই জগদধ্যাস কল্পনা-কল্পিত। কুসুমে গন্ধাদি, গগনে শূন্যতাদি ও বায়ুতে স্পন্দাদি যেমন, তেমনি উক্ত পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পিত হয়। উক্তবিধ উপমাসমষ্টি প্রদর্শনেই বলা যায়, ঐ পরম চিৎস্বরূপে বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পিত। আকাশের শূন্যতা, বায়ুর স্পন্দ এবং পুষ্পের গন্ধদৃক্ যেমন অনুভূতিগোচর হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত শূন্যতাস্বরূপ, তেমনি জানিবে—চিৎস্বরূপে সৃষ্টি-স্থিতিও শূন্য স্বরূপমাত্র। শূন্যতা যেমন আকাশ হইতে অভিন্ন, দ্রবত্ব যেমন জল হইতে অপৃথক্, গন্ধ যেমন কুসুম হইতে অনতিরিক্ত, স্পন্দন যেমন পবন হইতে অশূন্য,উষ্ণতা যেমন অগ্নি হইতে অব্যতিরিক্ত এবং শৈত্য যেমন হিম হইতে অস্বতন্ত্র, তেমনি এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাও সেই স্বচ্ছ চিদাকাশমাত্রস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অপৃথক্। সৃষ্টির অগ্রে চিদাকাশে ও স্বপ্নে হৃদয়ে যাহা দেখা যায়, তাহার কারণ কিছুই নাই। অতএব চিদাকাশ হইতে উহা পৃথক্ হইবে কিরূপে ? এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে নিত্য-নিরীক্ষিত স্বপ্নের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুমি তাহাই মাত্র বিচারালোচনা করিয়া দেখ, দেখিয়া বল, তাহাতে চিন্মাত্র ব্যতিরেকে অন্য আর কি সার আছে ? যদি এরূপ বল যে, স্বপ্ন তো স্মৃতিমাত্রই ; আমিও তাহাই বলি বটে ; কিন্তু বুদ্ধিজন্য সংস্কার দৃশ্য স্বপ্নে ও স্মৃতিতে একই বস্তু, এরূপ শঙ্কা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, 'তত্তা' আর 'ইদন্তা' এক হওয়া অসম্ভব। ফল কথা, যাহা 'তাহা' তাহা কখনই 'ইহা' হইতে পারে না। এ জগৎ চিৎস্বরূপ আবর্ত্তবৃত্তিতে কাকতালীয়বৎ প্রতিভাত, পরে তাহাতেই স্বপ্নাদি নানা কল্পনা বিকাশমান। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পন্ন সর্গে এই স্থিতিসন্নিবেশ পরে আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ নাই; অথচ যাহা উৎপন্ন, তাহা উৎপন্ন হইলেও অনুৎপন্ন ; তাই বলিতেছি, যাহার উৎপত্তি নাই,

তাহাই আদ্য, তাহাই সম এবং তাহাই একভাবে অবস্থিত। যেমন রত্নাদির দ্যুতি অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্বতই সমুদিত হইয়াছে, তেমনি জগৎ পদার্থের সন্নিবেশ-বিশেষবেশে ব্রহ্মসত্তাই পরিস্ফুরিত রহিয়াছেন। প্রথমে যেমন কোন অনির্ব্বচনীয় মায়া কারণে এই জগৎ সম্পন্ন হয়, তেমনি সমুদ্রে আবর্ত্তবৎ আত্মায় তাহা অর্থক্রিয়ানিয়তিরূপে সত্যতা আদান করে। এই স্বপ্নজালোপম চিজ্জগৎ চিদাকাশে কারণ ব্যতিরেকেই প্রবৃত্ত হয়; অপিচ ইহা শূন্য শূন্যাত্মক হইলেও অকারণেই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এ জগৎ শূন্যময় হইয়াই আবির্ভূত, শূন্যস্বরূপেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং একান্ত শূন্যতারূপে নাস্তি বলিয়াই নষ্ট। যাহা শূন্য, তাহাই অশূন্যের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই অসতের স্ফুরণ বিষয়ে যে ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিদ্রানুভূত স্বপ্নের অপলাপ করে, তাহাকে তাদৃশ মেষপালকের সহিতই তুলিত করা যায়—যে স্বসাক্ষাতে বৃক কর্ত্তৃক মেষ গৃহীত হইলেও তাহার অপলাপ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি; এখনও বলিতেছি এ জগৎ অসৎই; ইহা একটা ভ্রমমাত্র ও একান্তই কৃত্রিমতাপূর্ণ। এই চিরসঙ্কল্পাত্মক প্রপঞ্চধাতুই সৃষ্টিপ্রলয় বিভ্রম; ইহার যাহা তাত্ত্বিক স্বভাবস্ফুরণ, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান এবং ভ্রান্তিরূপে বিজৃম্ভণই অজ্ঞান। যিনি ব্রহ্মাত্মা, তিনিই মায়োপহিত হইয়াই ঝটিতি দৃশ্যাকার ধারণ করেন; করিয়া কারণ ব্যতিরেকে সমুদিত হন। যেমন দৃশ্যবর্জ্জিত আত্মার সুষুপ্তির পর স্বপ্ন দেখা যায়, তেমনি ঐ দৃশ্যরূপ দেহধারী ব্রহ্মাত্মা তৎপরে অর্থক্রিয়াপ্রয়োগে কার্য্য-করণ-ভাবাদি নিয়তি উপগত হইয়া থাকেন। সাগরে যেমন আবর্ত্তাদি আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়, তেমনি চিত্তবশতই এই দৃশ্য কাকতালীয়বৎ আপনা হইতেই চিৎস্বরূপে প্রকট হয়। এ ব্যাপারে নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা নাই। উহার নিমিত্ত বা নিবন্ধন চিৎস্বভাবমাত্রই। চিদ্ধাতু আকাশমাত্রক, উহার এরূপই স্বভাব যে ঐ চিৎকলেবর এই জগদাকারে অকস্মাৎই প্রস্ফুরমাণ হয়। অগ্রে যখন অবুদ্ধিপূর্ব্বক দৃশ্যাকারের প্রতিভাস হয়, তখন ঐ বিদ্রূপীই দৃশ্যস্বরূপে পরিণত হন। অনন্তর যখন অতীতের ভান হয়, তখন তিনি স্মৃত্যাদি কল্পনাত্মক সংজ্ঞাকল্পনা করেন। পরে বর্ত্তমানের প্রতিভানে পৃথ্ব্যাদি

ও বুদ্ধ্যাদি সংজ্ঞা কল্পনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ অবিভক্ত তাৎকালিক প্রতিভানক্রমে নিখিল বিভাগই কল্পনামাত্র হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো!, স্মৃতিকে যদি পূর্ব্বানুভূত বিষয়-সম্বন্ধীয় বলিয়া না স্বীকার করা হয়, তবে ভবদুক্ত রীতি অনুসারে এ জগৎ তৎকালভব কল্পনামাত্র সিদ্ধান্তে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোদ্ভূত বুদ্ধির প্রামাণিক অনুভব হইতে উৎপন্ন সংস্কারই স্মৃতি হয়; এই যে একটা শিষ্ট-পরম্পরার অনুভবসিদ্ধ নিয়ম, ইহা তখন কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা প্রকাশ করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তৎশ্রবণে বলিলেন,—রামচন্দ্র! প্রশ্নে তোমার আপত্তি হইয়াছে। আমি তোমার ঐ আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিতেছি। জানিবে,—জগতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত করিয়া দিণমণি যেমন নিজালোক প্রতিষ্ঠা করেন, আমিও তেমনি অদ্য দ্বৈত-ভ্রমতিমির অপাকৃত করিয়া অদ্বৈত আত্ম-তত্ত্ব মত স্থাপন করিতেছি। এ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থাকে না; ইহা ক্ষণিক প্রতিভাসেই সমুৎপন্ন; এ কথা তো আমি বলি নাই। আমি বলিতেছি যে, এ জগৎ নিত্য ব্রহ্ম-সত্তাত্মকই; নিত্য চিদাত্মক প্রতিভাস দ্বারা যদিও ইহা সদাপ্রকাশার্হ, তথাচ অবিদ্যারূপ আবরণ বিক্ষেপশক্তির বৈচিত্র্যচমৎকারবশতঃ কদাচিৎ আবির্ভূতবৎ, কদাচিৎ তিরোভূতবৎ, কদাচিৎ ঘটপটাদি আকারবিশেষবৎ, কচিৎ কারণনির্ম্মিতবৎ, কখন অপ-রক্ষোবৎ, কদাচিৎ একবৎ, কচিৎ নানাবৎ, কখন কখন ভিন্নাভিন্ন, কচিৎ ক্ষণিকবৎ, কখন স্থায়িবৎ, কদাচিৎ অতীতানাগত-বর্ত্তমানবৎ, এই এইরূপ নিয়তানিয়ত তুল্যাতুল্য বৈচিত্র্যচমৎকার দ্বারা প্রতিভাসমান। ইহাতে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞানাদি সমস্তই সম্ভবপর হয়। এই কারণেই বলি, বনস্থ বৃক্ষসমূহের সংখ্যাতীত শালভঞ্জিকা যেমন অনুৎকীর্ণ অবস্থায় অবস্থিত, তেমনি এই অনন্ত জগদাত্মক দৃশ্যপরম্পরা চিন্মাত্র-কোটরে বিরাজমান। যখন ইচ্ছা হয়, তখন কারুকার্চবিৎ ব্যক্তিই যেমন বৃক্ষের আবরণ কাষ্ঠাবয়ব কাটিয়া তাহাতে শালভঞ্জিকা প্রকট করে, তেমনি এই জগৎরূপ শালভঞ্জিকা—স্বয়ং চিদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ 'কর্ত্তাদি' কারকবর্জ্জিত চিৎস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং জানিবে—এই জগৎশালভঞ্জিকার প্রকাশ বৃক্ষোৎকীর্ণ প্রতিমার ন্যায় নহে। শুষ্ক জড়

পদার্থ; তাহাতে উৎকীর্ণ না করিলে ঐ শালভঞ্জিকার প্রকাশ ঘটে না। পরন্তু জগৎরূপ শালভঞ্জিকার আধার চিদাকারে আবরণের নিবৃত্তি ঘটিলেই ইহা চিদাত্মায় স্পষ্ট প্রকট হয়। চন্দ্রান্তর্গত সৈংহিকেয়বৎ সেই নিরাবরণ চিদ্‌ঘনেই এই জগৎরূপিণী শালভঞ্জিকা চিদাত্মায় তদন্তর্গত ভাবে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। তুমি বলিবে, তবে প্রলয় ও সুষুপ্তি সময়ে ইহার প্রকাশ নাই কেন? আমি বলিব, তোমার এ আপত্তি উত্থিত হইতে পারে না; কেন না, সেকালেও প্রকাশভাব নাই। তবে বিশেষত্ব এই যে, তৎকালে ঐ জগৎ-শালভঞ্জিকা অনুৎকীর্ণ দশায় শূন্য-রূপে চিন্মাত্রস্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়া সত্তাসামান্যাত্মভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক উল্লিখিত চিদাত্মাতেই অবস্থিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদ্যা-বস্থায় উক্ত চিৎ অগ্রে পূর্ব্ববর্ণিত নির্ব্বিকল্প কল্পনাময়ী হন; অনন্তর ভোজকের অদৃষ্টানুসারে স্বীয় শূন্যময় আত্মাতেই সমুদ্ভূত বিবিধ মনোবি-কল্পবিচিত্র সৃষ্টি কল্পনা করিয়া থাকেন। স্বীয় আত্মারূপ হৃদাকাশে স্বপ্ন-প্রায় আদ্যোদিত কল্পনার ন্যায় নিজেই সেই পরমাকাশরূপিণী চিৎ এই জগৎশালভঞ্জিকার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। ঐ স্বস্বরূপ ব্রহ্মকলাতেই এই সত্তাসামান্যরূপিণী জগদ্‌বীজভূতা ব্রহ্মকলা চিন্মাত্রকল্পনাময়ী হইয়া সতত অনাবৃত স্বভাববশে প্রতিবিম্বচিৎরূপে বিরাজমানা। উহাই যখন প্রাণাদি-সম্বলিতা হয়, তখন জীবাখ্যায় অভিহিতা হইয়া থাকে। অনন্তর যখন অধ্যবসায়প্রবণ হইয়া উঠে, তখন বুদ্ধি হয়; ক্রমে ঐ নিয়ম-হেতু চিত্ত, কাল, আকাশ, এই, সেই, আমি, ক্রিয়া, তন্মাত্র-পঞ্চক, ইন্দ্রিয়নিচয়, পুর্য্যষ্টক, আতিবাহিক ও আধিভৌতিক দেহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তর্ব্বহিঃ সৃষ্টি, জগৎ, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগ সৃষ্ট্যাদিতে উহার সঙ্কল্প করা হয়। অতএব এই সকলই যে কল্পনাময় অতি স্বচ্ছ চিদ্ব্যোম, সে পক্ষে আর সন্দেহাবসর নাই। সুতরাং দেখ, এই অজ্ঞজন-কল্পিত জড় পদার্থপুঞ্জই বা কৈ? আর স্মৃতিই বা কোথায়? আর কি দ্বৈত, কি একত্ব, কোথায়ই বা কি? এতাবতা জানিবে—এইরূপে কারণ ব্যতিরেকেই সৃষ্টির আদিতে এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রায় ভাসমান। উহা শূন্যে শূন্যাত্মাই প্রকাশমান হইতেছে। সুতরাং শূন্যেই শূন্য

প্রস্ফুরমান ; যখন চিন্ময়স্বরূপেই চিন্ময়-স্বরূপের ভান, তখন তৎকর্ত্তৃকই তাহা পরিজ্ঞাত। বিশদ কথা এই যে, এই চিন্ময় জগৎ যখন চিন্ময়স্বরূপেই স্বয়ং বিরাজমান, তখন সেই যে চিন্ময়স্বরূপ, তিনিই স্বাত্মচিন্ময়স্বরূপ এই জগৎকে অবগত আছেন, অতএব যদি জগতের প্রকৃত জ্ঞান হয়, তবে আর এ জগৎ থাকে কোথায়? যদি একমাত্র চিদাকাশই স্ফুরিত আছেন, তবে কোথায় স্মৃতি, কোথায় স্বপ্ন, কোথায় কাল, আর কোথায়ই বা কল্পনা? কেবল একমাত্র শান্ত চিন্তানই চিদম্বরে প্রতিভাসমান হইতেছেন। বাহ্যিক ভূতাকার ধারণ করিয়া চিদ্‌ঘনস্বরূপে অন্তঃসত্তাই আছেন। চিদ্‌ঘনের অন্তঃসত্তা ব্যতীত উহা বাস্তবিক বাহ্য কিছুই নহে। হে অতত্ত্বদর্শী বাদিসম্প্রদায়! জানিবে—নিরবয়ব নিরাখ্য শান্তস্বরূপ হইতে যাহা প্রবৃত্ত, সেই কারণবিহীন কূটস্থ, সবিকার হইতে পারে কিরূপে? তাই বলিতেছি, পরব্রহ্মের ন্যায় এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও পরম জাড্যবর্জ্জিত চিন্মাত্রস্বভাব। বুঝিয়া দেখ, স্বপ্নে যাহা চিদাকাশ, তাহাই আবার স্বপ্নপুরী। কিছুই নাই ; কেহই কিছু নহে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অল্পমাত্রও নাই। জলধি পরিপূর্ণ আছে ; ইহাতে আবার অনার্দ্র রজঃসম্পর্ক কোথায়? এইরূপে এই যে জগৎ আছে, এখানে চিজ্জলানার্দ্র অণুমাত্রও নাই। যাহা পরমাকাশ, তাহাতে দৃশ্যই বা কৈ? পক্ষান্তরে এই যৎকিঞ্চন-স্বরূপে সেই চিন্মাত্রই প্রতিভান প্রাপ্ত ; সুতরাং যৎকিঞ্চিৎস্বরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, উহা অচেত্য চিন্মাত্রই। অতএব যাহা অদৃশ্য, অন্যের অপ্রকাশ্য ও অননুভাব্য, তাহা অচেত্যরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিলেও স্বমাত্রপ্রকাশ হইয়াই বিরাজিত। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ পূর্ণস্বরূপে প্রতিভাসমান, ইহা পূর্ণব্রহ্ম হইতে যদিও অনুদ্ধৃত, তথাচ উদ্ধৃতবৎ প্রতিভাত। বাস্তবপক্ষে ইহা কিন্তু সেই পরমাত্মমাত্রই। বলিব কি দুঃখের কথা! আমি স্বয়ং অনুভব করিয়া, পুনঃপুন বাদ বিতর্ক করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি, তথাচ মন্দাধিকারীদিগের মূর্খতা এই স্বপ্নোপম জগৎ-কলেবরে অদ্যাপি জাগ্রৎ সত্য বোধ পরিত্যাগ করিতেছে না। অপিচ যাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাও সহজে উহা পরিহার করিতে অনিচ্ছুক। অহো, মোহের প্রাবল্য এমনই বটে।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

ঊনসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! এক্ষণে মন্দাধিকারীর অবোধনাশ অবগত হইবার প্রকার কহিতেছি। যাহার গতি সর্ব্বদাই প্রত্যাগাত্মায় প্রসক্ত; যাহার সুখসাধন বিষয়নিচয় সুখের বা দুঃখসাধন বিষয় দুঃখের কারণ নয়; তাদৃশ পুরুষকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যাহার চিদাকাশে অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এই সুবিস্তৃত ভোগসমূহে যদীয় বুদ্ধি আসক্ত বা ভোগদর্শন-লালসায় বিচলিত নয়, সেই পুরুষকেই মুক্ত নামে নিরূপিত করা হয়; ফলে যদীয় চিত্ত অচঞ্চলভাবে চিন্মাত্রাত্মায় লব্ধবিশ্রাম হইয়াছে, একবারের পর দ্বিতীয় বার আর এই দৃশ্যপরম্পরায় যে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া রমণ করে না, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যাহার সুখসাধন সুখের বা দুঃখসাধন দুঃখের কারণ নয়, সে মানব তো চেতনাবিহীন, উহাকে তো জড়মধ্যেই গণ্য করা হয়। ফল কথা, উন্মত্ত, মূর্চ্ছিত বা জড় জনেরও তো ঐ প্রকারভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে কি তাহাদিগকেও জীবন্মুক্ত বলা যাইবে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বে আমি জীবন্মুক্তের একটা বিশেষণ দিয়াছি, 'অন্তর্ম্মুখ মতি'; এই বিশেষণ দ্বারাই তোমার আপত্তি খণ্ডন করা গেল। যে ব্যক্তি শুদ্ধ বোধাত্মভাবে চিদাকাশে একনিষ্ঠতা হেতু প্রযত্নাভাবেই সুখানুভব করে না, তাহাকেই মুক্ত বা বিশ্রান্ত নামে নির্দ্দেশ করা হয়। সর্ব্ব সন্দেহের মূল একমাত্র অজ্ঞানই; সেই অজ্ঞানের বিনাশে বিবেকের উদয়ে বাস্তবপক্ষে যাহার সর্ব্ব সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পরম পদে লব্ধবিশ্রাম বলা যায়। যিনি ব্যবহারমার্গে আছেন, থাকিলেও যাঁহার কখনই কোন বিষয়ে প্রসক্তি নাই, জানিবে—সেই ব্যক্তিই পরম পদে লব্ধবিশ্রাম হইয়াছে। যত কিছু আরম্ভ, সকলই যাহার ইচ্ছা-সঙ্কল্প-বিরহিত, যিনি কামসঙ্কল্পবিহীন হইয়াই যথালব্ধ বিষয়ের পথে বিহার করেন, তাদৃশ পুরুষকেই প্রকৃতপক্ষে লব্ধবিশ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সুদীর্ঘ-সংসার-পথ বিশ্রান্তিবিহীন ও অবলম্বনহীন; হেথায়

আত্মায় চিন্মাত্রতার সাক্ষাৎকারে যদীয় আত্মবিশ্রান্তি ঘটে, সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃত জয়ী বলা যায়। যাঁহারা চিরকাল ধরিয়া বিষয়-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, হউন না তাঁহারা ব্যবহারনিরত, তথাচ সুষুপ্তবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ পুরুষের স্থান কোথায়? তিনি দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-বিরহিত স্বচিত্তাকাশেই নিত্যোদিত শুদ্ধ চিৎস্বরূপ ভাস্কররূপে বিরাজ করিতে থাকেন। এই সংসারপথে কদাচ যাঁহারা অবস্থান করেন না, সেই সকল উৎকর্ষোপগত উত্তমেরা দেহ ধারণপূর্ব্বক ব্যবহারপথে থাকেন; থাকিলেও সুপ্ত বা বিদেহবৎ পরিদৃষ্ট হন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে জড়ের ন্যায় দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাঁহারা জড়-পদ-বাচ্য নহেন। শয্যায় সুপ্ত ব্যক্তিবৎ স্বপ্ননগরে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা নিদ্রার অনধীন বলিয়া কথিত। যিনি সুদীর্ঘ বিষয়-পথ হইতে নিবর্ত্তনপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভান্তে বাহ্যত বাক্যোচ্চারণ করেন না, তাঁহাকে সুখমৌনস্থ নামে নির্দ্দেশ করা হয়। তিনি জড়াকার নহেন; জড়াকার কখন সুখমৌনস্থ হইতে পারে না। যাহারা অবিদ্যান্ধকারে ব্যবহার-নিরত, সেই সকল ভূতের অবিদ্যাবসানই পরম বোধ, তাহাই পরম শান্তি এবং তাহাতেই ঐ মুক্ত সুপ্ত পুরুষ একরসাবলম্বনে বিরাজিত। হে রঘুবর! কর্ম্মসমূহে অনাদরপূর্ব্বক যে পুরুষ স্বাত্মায় অবস্থান করেন, তাঁহাকে আত্মারাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। সে পুরুষকে জড় কিছুতেই বলা যায় না। তিনিই দুঃখাতিক্রমে সক্ষম হইয়াছেন; ভবপারাবারের পারে তিনিই গমন করিয়াছেন এবং তিনিই ভব্যরূপে আত্মাতে বিশ্রামসুখ অনুভবপূর্ব্বক বিরাজমান রহিয়াছেন। আহা! এই জন্ম-জঙ্গলের মৃগ বৃথাই ব্যগ্রভাবে বিহার করিতেছে। বঞ্চনচতুর বিষয়ের প্রলোভন উহাকে দূর পথে আনয়ন করিয়াছে; পথশ্রমে উহার অশেষ পরিশ্রম হইয়াছে ও হইতেছে। পরিশেষে ভোগের অভাবে কাতর হইয়া পড়িতেছে; দশাবিপর্য্যয় ভোগ করিতেছে, ক্রমে জরারূপ হিমাশনি পাতে জড় ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িতেছে। যে স্থান দুঃখকণ্টকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই সুদুর্গম, সুখের ছায়া একান্তই যেখানে দুর্লভ, এ হেন সংসার-পথের পথিক অসহায় অবস্থায় প্রতিনিয়ত নিজ সাহায্যেই চলিতেছে।

ইহার এ পথের পাথেয় একমাত্র পাপই; কাজেই পাপ-পাথেয় লইয়া ঐ পথিক প্রতিপদক্ষেপে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; ভূতলে পড়িয়া তাহার কলেবর কখন কখন লুটাপুটি খাইতেছে। এইরূপে এই যে অর্থানর্থময় সঙ্কটপথ, এখানে ঐ পান্থ একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। পান্থ এরূপ পরিশ্রান্ত হইলেও যদি সে স্বীয় সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া অথবা সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কিম্বা সদ্‌গুরুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করত প্রবুদ্ধ হইতে পারে, তবে সংসার-পারাবারের পর-পারে গগনপূর্ব্বিক আত্মবান্ হইয়া থাকে। তাহার শয্যাসম্ভাব না থাকিলেও সে সুখে স্বচ্ছন্দে শয়নক্ষম হয়। আত্মবান্ ব্যক্তির সেই সুখশয়ন বড়ই আশ্চর্য্যকর। তদবস্থায় পর্য্যঙ্কাদির অভাব হইলেও শয়নে বাধা নাই। তখন ঐ আত্মবান্ প্রাণাদি-চেষ্টাশূন্য হইয়া আত্ম-স্বরূপে জাগরূক থাকে; নিদ্রানামক বাহ্যিক পদার্থান্তরের অভাব হয়; সে স্বপ্ন সুষুপ্তি অতিক্রমপূর্ব্বিক সুখেই শয়ন করে। আরও আশ্চর্য্য যে, তখন ঐ আত্মবান্ লোকালয়েই হউক বা অরণ্যেই হউক, অশনে শ্বসনে গমনে কথনে যে অবস্থাতেই হউক, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সুখসুপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই নিদ্রা অশ্বের ন্যায় হয়। অশ্ব অশনে গমনে অবস্থানে নিদ্রান্বিত হইলেও সর্ব্বদাই কেবল জাগরিত থাকে। তত্ত্বদর্শীর তথাবিধ গাঢ় নিদ্রা অলৌকিকী; কেন না, প্রলয়ের পয়োধরগর্জ্জনই হউক কিম্বা হস্তিমর্দ্দনই হউক, কিছুতেই তাহা অপগত হইবার নহে। আত্মবান্ ব্যক্তি পরমার্থমদে মত্ত হইয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহার বিষয়মত্ততা থাকে না। এই সমগ্র জগৎই আত্মবান্ ব্যক্তির আত্মসাৎ হইয়া পড়ে। তিনি পরিপূর্ণভাব প্রাপ্ত হন—হইয়া আতৃপ্তি অপরিচ্ছিন্ন আনন্দরস পান করিয়া পরম সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। যাঁহার বিষয়ানন্দ না থাকিলেও অদ্বৈত সুখ সদাই বিদ্যমান এবং আলোকা-ন্তরের অপ্রকাশ্য-স্বাত্মাতেই যিনি প্রকাশমান, তথাবিধ আত্মবান্ ব্যক্তিই সুখশয়নে অবস্থান করেন। যাঁহার লোভান্ধকার নিরস্ত হইয়াছে; যিনি অখণ্ড লোক-লাম্পট্য লাভ করিয়াছেন, এবং অমূর্ত্ত আনন্দরসের ঘনঘনা-স্বাদন যাঁহার ঘটিয়াছে, জানিবে—সেই আত্মবান্ ব্যক্তিই সুখ সুপ্ত।

এমন যে আত্মবান্ পুরুষ, তিনি চারিদিকের অনন্তদুঃখানুভব হইতেই বিরত থাকেন; বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিহার করেন এবং অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিতে করিতে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। আত্মবান্ আত্মাকে অণু অপেক্ষা অণুতম ও স্থূল হইতে স্থূলতম করিয়া লয়েন এবং চিদাকাশ-শয়নে আত্মাকে শায়িত করিয়া সুখে নিদ্রানুভব করেন। তথাবিধ আত্মবান্ ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম চিদ্দেহে প্রতি পরমাণুতে-পরমাণুতে অনন্ত জগদ্ধারণ-সুখে শয়ান হইয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিসংহারাদি করেন—করিয়াও আবার কিছুই করেন না। কেবল পরমালোকই তাঁহার শয্যা; সেই শয্যাতেই তিনি সুখ শয়ন করিয়া থাকেন। এই সংসারপ্রবাহ আত্মবানের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। তিনি সুষুপ্তিকে পূর্ণ প্রকাশে প্রকটিত করিয়া সুখে শয়ন করেন। আত্মবান্ পুরুষই সদ্রূপে নিখিল জগৎপদার্থসমূহের অনুগমনপূর্ব্বক সত্তাসামান্যভাব লাভ করেন এবং আকাশাপেক্ষাও সমধিক ব্যাপক ভাব ধারণপূর্ব্বক সুখ শয়ান হন। তিনি অগ্রে জগৎকে বিলীন করিয়া আকাশময় করেন; নির্ম্মল চিদম্বরতা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রশান্তশব্দ-শ্বাস অবস্থায় সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। এই অস্মৎপ্রত্যক্ষ জগৎকে প্রত্যগাত্মস্বরূপ চিদাকাশের একটি কোণে দেখিয়া আত্মবান্ ব্যক্তি নিজে নির্ম্মল গগনোদরবৎ নির্ম্মলাত্মভাব ধারণপূর্ব্বক সুখে নিদ্রাপ্রাপ্ত হন। তিনি প্রবাহপতিত ব্যবহাররূপ তৃণময় কটাস্তরণে বিশ্রাম লাভপূর্ব্বক সুখসুপ্ত থাকেন। নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া নিদ্রাবস্থায় অনুভূত স্বপ্ন সযত্নে অনুসন্ধান করিলে যেমন তাহা স্মৃতিযোগ্য হইয়া পড়ে, তেমনি আত্মবানের চিত্ত সযত্নে কিঞ্চিৎ বহির্ম্মুখীন হইলে দেহাদি ক্ষণিকস্বরূপ ধারণ করে। তৎকালে ঐ দেহাদি দ্বারাই সেই আত্মবান্ জীবন ধারণ করিতে থাকেন। নিরবকাশে থাকিতে অসমর্থ আকাশ যেমন দ্বিতীয় বস্তুবৎ কল্পিত নিজ আকাশস্বরূপকেই অবকাশ পাইয়া তাহাতেই সত্তা প্রাপ্ত হয়, উল্লিখিত আত্মবানের যে দেহাদি লইয়া জীবন ধারণ, তাহাও ঐরূপই। আত্মজ্ঞানশালীর জ্ঞান আকাশস্বরূপ, তাহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত অসত্তাবশতঃ গগনোপম জীব-জগৎলক্ষণ ধর্ম্মসমূহকে প্রযত্নসম্পাদিত স্বজ্ঞাতৃভাবে সম্যক্ অবগত থাকেন।

ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞ প্রবুদ্ধ পুরুষের এক সুহৃদের কথা পরে বলা যাইতেছে। এই সুহৃদ্ জাগ্রৎস্বপ্নার্থে ভোগে ঐ প্রবুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের চিরসহায়ভূত; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সেই সুহৃদের সহিতই নিরন্তর রমণ করিয়া থাকেন। যখন সুষুপ্ত অবস্থা, তখনও তিনি সেই সুহৃদের সহিত সুষুপ্ত থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শম-দম-তিতিক্ষা বৈরাগ্য সন্তোষাদি চিত্তানুবৃত্তি দ্বারা তাঁহার সেই চিরসুহৃৎ সমভিব্যাহারে বক্ষ্যমাণরূপে রমণ করিতে করিতে তদীয় সমস্ত আয়ুঃশেষ দিবস যাপনপূর্ব্বক পরমোত্তম নিরতিশায়ানন্দরূপ বিদেহ-কৈবল্য-পদে বিশ্রাম লাভ করিতে থাকেন।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

সপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কে সেই সুহৃৎ, যাহার সহিত ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ রমণ করেন? উঁহার সহিত উঁহার ঐ সুহৃদের রমণই বা কি? ঐ রমণ কি স্বাত্মস্বরূপে অবস্থান? অথবা উহার স্বরূপ কি রম্য ভোগ স্থানে বিহার বশতঃ প্রীতি? ইহা আপনি বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! লোকহিতকর শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, স্বপ্রযত্নে শাস্ত্রাভ্যাস, শমদম তিতিক্ষা, পরম শৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বর প্রণিধান ও সংযমাদি স্বকর্ম্ম, এই অনবদ্য অনিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম্মই উক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের অকৃত্রিম সুহৃৎ; উল্লিখিত ত্রিবিধ কর্ম্ম একই, কেবল উপাধিভেদেই উহার নাম-ত্রৈবিধ্য। উহা পিতার ন্যায় আশ্বাসদাতা এবং দুরন্ত সংকটেও কলত্রবৎ অব্যভিচরিতভাবে সাহায্যকারী। ঐ সুহৃৎ ক্রোধ করিলেও অক্রুদ্ধভাবে সামপ্রয়োগ করিয়া ক্রোধকারণ নিরাসপূর্ব্বক বিরোধভঞ্জনরূপ সুধা প্রদান করে। দুর্গে দুর্গম পথে বা দুর্ব্বার বৈরকলহাদি দোষে আসক্তিদর্শনে ঐ সুহৃৎই তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে তৎপর হইয়া থাকে। নিখিল বিশ্বাসরূপ রত্নের ঐ সুহৃৎই কোষস্বরূপ। বহুল জন্মপরম্পরার অভ্যাস

বশে অনুবর্ত্তন করিতেছে, তাই আশৈশব উহারই সঙ্গে জীবন্মুক্ত পরি-পোষিত; জীবন্মুক্তের বাল্য হইতেই ঐ মিত্র সাথের সাথী; এক সঙ্গে ধূলা খেলা পর্য্যন্তও ঐ মিত্র করিয়াছে। উহা সর্ব্ববিধ দুশ্চেষ্টার নিবারক হইয়াছে এবং পিতৃবৎ নিয়তই রক্ষণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। বহ্নির যেমন উষ্ণতা, পুষ্পের যেমন সৌগন্ধ্য এবং সূর্য্যের যেমন দিবস, তেমনি ঐ নির্ম্মলস্বভাব মিত্র কোন কালের জন্যই বিযুক্ত হয় না। ঐ মিত্র নগর-জনবৎ অনবদ্য কথায় আহ্লাদজনক এবং সাধু চেষ্টারূপ মণিমাণিক্যরাশির আগার! উহা লোক-পরিপালনে একনিষ্ঠ এবং সর্ব্ববিধ সঙ্কট-সঙ্ঘর্ষণে অদ্বিতীয় রক্ষণোন্মুখ। সূর্য্য যেমন অন্ধকার-নিরসনে তৎপর, ঐ মিত্রও তেমনি অপ্রিয় নিরাকরণে ব্যাপৃত। যেমন অনুরাগিণী মহিলা, তেমনি ঐ মিত্র ব্যক্তি নিয়তই প্রিয়প্রদর্শক। উহা সর্ব্বজনকেই প্রিয়ম্বদ করিয়া তোলে; এবং সকলের যাহাতে প্রিয় হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ অনুষ্ঠানই ঐ মিত্র করিয়া থাকে। ঐ মিত্রের হৃদয়টী বড়ই কোমল,—বড়ই স্নিগ্ধ-মধুর; উহা প্রমাদের দিকে যায় না; কিছুতেই উহার ক্ষোভ হয় না। সঙ্গত সাধু সজ্জনের সর্ব্বদাই শুশ্রূষা করে; সর্ব্বদাই স্মিতপূর্ব্বক অভিভাষণ করিয়া থাকে। উহা সর্ব্বকাম হইতে বিরত, তাই সতের রূপের ন্যায় উহার রূপ। উহা প্রাপ্ত হইবার কারণ একমাত্র পরমার্থ। ঐ সুহৃৎ সকলেরই পূজার্হ। অজ্ঞান হইতে সমর-সম্ভাবনা হইবার পূর্ব্বেই ঐ সুহৃৎ প্রহারোদ্যত হয় এবং অলৌকিক ক্রীড়া-হাস্যাদি উৎপাদন করিয়া বিলাস প্রকাশ করে। সৎস্বভাব, শ্রী ও কুল ঐ মিত্র দ্বারাই রক্ষিত হয়। উহা আধিব্যাধি-সমাক্রান্ত চিত্তের উজ্জীবক অমৃত ও রোগহরণক্ষম ঔষধস্বরূপ। উহার এমনই পাণ্ডিত্য যে, তাহা দ্বারা উহা প্রভু গুরু প্রভৃতি মান্য জনের কৌতুকজনক। ভূপাদি প্রভু লোকদিগকে অনুরাগী করিয়া তাঁহাদিগকে বদান্য ও সাধুস্বভাব করিয়া লওয়াই উহার নিত্য কার্য্য। সর্ব্বদা যজ্ঞ-দান-ব্রত-তপস্যা ও তীর্থ-পর্য্যটনে এবং ন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতে ঐ মিত্র সর্ব্বদাই সমুৎসুক। পুত্রকলত্র-দ্বিজাতি-ভৃত্য-বন্ধুবর্গ, সর্ব্বজন সমভি-ব্যাহারেই ঐ মিত্র সুপেয় ও সুভোজনভাগী। ঐরূপ মিত্র হইতেই উত্তম

ও মহতের সঙ্গলাভ হয়। ঐ মিত্র যদি সহায় থাকে, তবেই দুঃখমূলক ভোগবদ্ধ তৃষ্ণা আর তিষ্ঠিতে পারে না। সুস্নিগ্ধ আলাপ-আপ্যায়নে উঁহার ঔদার্য্য পরিস্ফুট এবং উহাই আশ্বাসদানের একমাত্র প্রধান আস্পদ। পুত্রকলত্রাদি-পরিবারবৃন্দ-পরিবৃত এতাদৃশ স্বকর্ম্মাখ্য মিত্র সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব-বর্ণিত জীবন্মুক্ত সহজবৃত্তিতেই রমণ করিতে থাকেন। তিনি যে কাহারও প্রেরণায় ঐরূপ করেন, এ কথা ঠিক নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! কাহারা ঐ পুত্রকলত্রাদি পোষ্য-পরিজন-সমভিব্যাহারী মিত্র ব্যক্তির পুত্রকলত্রাদি? তাহারা কীদৃশ গুণ-বিশিষ্ট? ইহা আমার নিকট সংক্ষেপতঃ ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সুবুদ্ধে! ঐ মিত্রের মহাত্মা পুত্রবর্গের নাম স্নান, দান, তপ ও ধ্যান। নিখিল প্রজামণ্ডলীই উঁহাদের গুণানুরক্ত। উঁহার হৃদয়বল্লভা ভার্য্যার নাম সমতা; ঐ ভার্য্যা যেন চন্দ্রলেখা,—দৃষ্টি-মাত্রেই সকলের আনন্দাবহা। সে সর্ব্বদাই অবিযুক্তা, সর্ব্বদাই সন্তোষযুতা; এবং সর্ব্বদাই স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। সেই অব্যভিচারিণী মনোহারী ভার্য্যা স্বাভাবিক দয়াগুণে সর্ব্বত্রই ধন বিতরণ করে। তাহার অবিনয়-ভাব নাই। সে সুখদায়িনীরূপে সর্ব্বদাই ভার্য্যার অগ্রে বিনীতভাবে দ্বারপালিকার ন্যায় সম্মুখে অবস্থান করে।

হে সাধো! ধৈর্য্যে এবং ধর্ম্মে যাদৃশ বুদ্ধি নিহিত হয়, সে বুদ্ধি ঐ ধীর ধন্য মিত্রের অগ্রে অগ্রে সর্ব্বদাই ধাবমানা। মিত্র রাজা; এ রাজার অপর পত্নীর নাম মৈত্রী; মৈত্রী স্বামীর বিষয় ও অরিজয় ব্যাপারে সর্ব্বদাই মন্ত্রণাদাত্রী। সপত্নী সমতার সহিত একযোগে নিয়তই এই মৈত্রী স্কন্ধ-বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ মান্যবর মিত্র মহাশয়ের এক ধনাধ্যক্ষা আছেন। উঁহার নাম সত্যতা। তিনি প্রশংসনীয় মর্য্যাদা-চাতুর্য্য-যুতা ও কার্য্যবিষয়ে উপদেশকর্ত্রী। এই এই প্রকার পোষ্য-পরিজনবর্গ-সমভিব্যাহারী মন্ত্রণাদায়ক সুহৃদ্ বা মিত্রস্বরূপ স্বকর্ম্মের সাহায্যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্যবহারনিষ্ঠ রহিয়া ঐ জীবন্মুক্ত পুরুষ লাভে কিম্বা অলাভে কোন সময়েই সানন্দ বা নিরানন্দ হন না। ঐ নির্ব্বাণমনা মুনি নিয়ত লৌকিক ব্যবহারে যদিও নিয়ত থাকুন, তথাচ চিত্রাঙ্কিত যোদ্ধ্ পুরুষের

যেমন যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যবহার-তৎপরতা অঙ্কিত রহিলেও তাহা একইভাবে থাকে, তেমনি ঐ জীবন্মুক্ত মুনি যথাস্থিতভাবেই বিরাজ করেন। তিনি অবাস্তব বাদানুবাদে প্রস্তর-প্রতিমাবৎ মূক হইয়া রহেন। যে সকল অনর্থক শব্দ, তাঁহাতে তিনি বধিরভাবে অবস্থান করেন। যে সকল কথা লোকাচার-বিরুদ্ধ, তাহাতে ঐ জীবন্মুক্ত মৃতকল্প হইয়া রহেন। কিন্তু আর্য্যজনোচিত যে সকল আচার ব্যবহার, তাহাতে তিনি বাসুকি বা বৃহস্পতিকল্প হইয়া উঠেন। পুণ্য প্রস্তাবে মৌন পরিহার করেন ও তদালাপে নিরত থাকেন। তিনি নিজের এবং পরের কৌটিল্যাদি দোষ উন্মেষণ করেন; নিমেষাভ্যন্তরেই দুরূহ সন্দেহপদ নির্ণয়পূর্ব্বক তাহা ভঞ্জন করিয়া দেন এবং অতি সত্বরই বহু বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন। উল্লিখিত নির্ব্বাণমনা মুনি সর্ব্বত্রেই সমদৃষ্টিশালী; তিনি উদার, বদান্য, পেশল, স্নিগ্ধমধুর ও সম বিচার-নিপুণ। এই যে সকল গুণ বর্ণন করা হইল, জানিবে—প্রবুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ইহা স্বভাবসিদ্ধই! কোনরূপ কৃত্রিম উপায়ে এই প্রকার গুণগণ হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির প্রকাশভাব-ধারণই স্বভাব; পরের প্রেরণায় বা প্রযত্নে ঐ ভাব ধারণ তাঁহারা কখনই করেন না।

সপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সম্বিদাকাশের যে স্ফুরণ, তাহাই জগদাকারে প্রতিভাসমান। বাস্তবপক্ষে না জাগ্রৎ, না জগদাভান, না শূন্য, না বৃত্তি-সম্বিৎ, কিছুই নাই। শূন্যত্ব যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি এই জগৎ নামে প্রতিভাত চিদ্ব্যোম অজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে অন্যস্বরূপে অবস্থিত হইলেও চিদাকাশ হইতে অপৃথক্। নির্ব্বিষয় চৈতন্যের বিষয় হইতে বিষয়ান্তর-প্রাপ্তিকালের অন্তরালে যে একটা সম্বিৎ দেহ থাকে, তাহাই দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হয়। পূর্ব্বে সন্মাত্র পরিশেষরূপ মহাপ্রলয় সম্পন্ন

হইয়া যাইবার পর পুনর্ব্বার আদি সৃষ্টি হয়, ইহাই বটে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তখন থাকেন একমাত্র সৎই। 'সদেব সৌম্যেদমিত্যাদি' বেদ বাক্যই ইহার প্রমাণ। অতএব সেই অবিকার পর অপেক্ষা কারণান্তরের অসদ্ভাবে কিরূপে দৃশ্য সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? তৎকালে এমন এতটুকু মাত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দৃশ্যবীজও ছিল না,—এই মূর্ত্তপরম্পরা যাহা হইতে পুনঃপ্রবর্ত্তিত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। তাই বলিতেছি, এই দৃশ্য জগৎ একেবারেই অনুৎপন্ন; জানিবে,—যেমন বন্ধ্যানন্দনের অসত্তা, তেমনি দৃশ্যবুদ্ধিরও একান্তপক্ষে অসদ্ভাব। তবে সমন্তাৎ এই দৃশ্যপরম্পরা আছে বলিয়া যে প্রতিবোধ হইতেছে, তাহা সেই সুনির্ম্মল চিদাকাশ মাত্র পরমপদ বৈ আর কিছুই নহে। শ্রুতিতাৎপর্য্য-বেদিগণের ইহাই বটে নির্দ্দেশ। ঐ যে চিন্মাত্র পরমপদের উল্লেখ করিলাম, উহা কদাচ আপনার স্বচ্ছ অনাময়স্বরূপ পরিত্যাগ করে না। ঐ আত্মা আত্মাই ছিলেন; অনন্তর সেই ব্যোমাত্মা স্বয়ংই স্বাত্মায় এই দৃশ্যস্বরূপে অবভাসমান হইতেছেন। মন যেমন সঙ্কল্প-মন্থররূপে পুরাকারে প্রকাশ পায়, তেমনি সৃষ্টির আদ্যাবস্থায় ঐ পরম চিদাকাশই দৃশ্যাকারে প্রতিভাসিত হন। বায়ু যেমন স্পন্দযুক্ত হইয়া চক্রাবর্ত্তের ন্যায় বেষ্টিত হয়, ঐ চিদাত্মা তেমনি সৃষ্টির আদ্যাবস্থায় আকাশ-স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক অজ্ঞাতসারেই আত্মায় দৃশ্যস্বরূপে অবস্থিত হন। যখন স্বরূপ-পরিজ্ঞান হয়, তখন আর দৃশ্যত্রিজগৎ প্রতিভাত হয় না! তৎকালে পরব্রহ্মই প্রতিভান প্রাপ্ত হন; অপিচ তিনিই স্বাত্মায় এ ভাবে অবস্থিত হন; তাঁহারই ভান হয়। মূর্ত্ত পৃথ্ব্যাদি কুত্রাপি কিছুই নাই। পক্ষান্তরে অজ্ঞদর্শনে মূর্ত্ত বা প্রাজ্ঞ দর্শনে অমূর্ত্ত যাহাই কেন হউক না, একমাত্র ব্রহ্মই সেই ভাবে বিদ্যমান; ইহাই হইল চরম সিদ্ধান্ত। স্বপ্নের দেখা পর্ব্বত যেমন জাগ্রদবস্থায় নিরাকার আকাশেই পর্য্যবসিত হয়, তেমনি যখন আত্মবোধের আবির্ভাব হয়, তখন এই ত্রিজগৎ শান্ত চিন্মাত্র আকাশেই অবশেষে বিভাসিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রবুদ্ধ পুরুষ, তাহাদের নিকট এ জগৎ বিভাগবর্জ্জিত পরব্রহ্ম মাত্রই; এতদন্যথা-বোধ যে কি বা কি প্রকার, তাহা আমাদের চিন্তা দ্বারাও অজ্ঞেয়। দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তিকালের অন্তরালে যে একটা শূন্য সম্বিদাকার দেখা

যায়, ভূতবৃন্দের স্ব স্বভাব তাহাই এবং তাহাই বটে পরম পদ। দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তিকালে অন্তরালে যে সম্বিদাকারের প্রকাশ, তাহারই নাম সেই পরমাকাশ এবং তাহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। তাই বলিতেছি, সর্ব্বাধিষ্ঠান ও নির্ব্বিষয় চিন্মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এই অধ্যাসভূত সদসদাত্মক জগৎ ঐ উক্ত পদেরই সমান। কেন না, ভূতপঞ্চক ব্যতিরেকে অন্য আর কিছুই নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়জনিত রূপ, আলোক ও মনস্কার সকলই ঐ পরম পদস্বরূপ। উক্ত পররূপ মহাবারিধির দ্রবতাজনিত যে সকল আবর্ত্তপরম্পরা, এ সমুদায় তাহাই। এক দেশ হইতে দেশান্তর প্রাপ্তিতে অন্তরালে যে সম্বিদয়ব, তাহাই বটে জগৎ; এতদতিরিক্ত জগদ্ভাব কখনই নাই। রাগ-দ্বেষাদি যে কিছুভাব ও ভাবাভাব পদার্থ, সমস্তই উক্ত পদের স্বরূপ। পূর্ব্ব কোটি ও অপর কোটি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরালে যে সম্বিদের নির্ব্বিষয় অবয়ব প্রথিত, তাহাই বটে স্বভাব এবং তাহাই জগদ্রূপ মরুমরীচিকাসলিলে অধিষ্ঠানসংজ্ঞাধারী। আমি বারম্বারই ঘোষণা করিতেছি যে, জাগ্রৎ দেশ হইতে স্বপ্ন দেশ প্রাপ্তির অন্তরালে সুষুপ্তিদশায় যে সম্বিদবয়ব, সৃষ্টিদেশ হইতে অপর সৃষ্টিরূপ দেশ প্রাপ্তির অন্তরালে প্রলয়ে যে সম্বিদবয়ব এবং ইহলোকরূপ দেশ হইতে পরলোকদেশ প্রাপ্তির অন্তরালে মূর্চ্ছাবস্থায় যে সম্বিদবয়ব, তাহা সতত সেইভাবেই অবস্থিত হয়। কূটস্থতা হেতুস্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুতাত্মায় জগৎ ইত্যাকার নামান্তর অজ্ঞ-কল্পিত মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। আদি সৃষ্টি হইতে দৃশ্যপরম্পরার উৎপত্তি ঘটে নাই। তবে যে ইহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে, ইহা জগন্মায়াস্বরূপ ঐন্দ্রজালিকের একটা আড়ম্বরমাত্র বৈ আর কি? বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহার বাস্তবিকই অভাব, তাহারই অস্তিত্ব আছে; আর যিনি সত্য সত্যই রহিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মেরই অস্তিত্বাভাব বোধ হইতেছে। ফলতঃ ইহা কেবল মূঢ়জনেরই ভ্রম। আমি অবশ্য এরূপ দেখিতেছি না। মূঢ় লোকেরা অসৎ দৃশ্যকে সৎ বলে। ঐরূপ বলিয়া তাহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন দৃশ্যই কোথাও উৎপন্ন নহে, এবং কুত্রাপি আভাত হয়ও না; তবে যে এই প্রতিভান দেখা যাইতেছে, ইহা দৃশ্য প্রতিভান নহে; ইহা

সেই আকাশস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্ফুরণ মাত্র। তিনি এরূপে স্বয়ং স্ফুরিত হইতেছেন। আপনা হইতে স্বীয় অব্যতিরিক্ত দীপ্তিচ্ছটায় মণি যেমন স্বতই পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি চিদ্‌ব্যোমও আত্মাভিন্ন সৃষ্টি দ্বারা স্ফুরিত হইতেছেন। ঐ দিবাকর প্রকাশ পাইতেছেন ও তাপ দিতেছেন, তাঁহার ঐ ঐ কার্য্য সেই শান্ত পদে অবস্থিত থাকিয়াই হইতেছে। সেই তিনি সংসামান্য; ঐ দিবাকর তাহারই এক দেশমাত্র; উনি তাঁহাতেই থাকেন, থাকিয়াও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। নিশাকরের সে ক্ষমতা নাই। অর্কাদিকে প্রকাশ ঐ দেবই করেন; অর্ক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল তাঁহারই দীপ্তিতে দ্যোতমান। চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, যত কিছু জ্যোতিষ্ক পদার্থ, সকলেরই সেই চিৎদেবতাই দীপক। যেমন জগদ্‌দ্রষ্টা সূর্য্যের তেজে গবাক্ষরন্ধ্রে একটী অণু বিভাত হয়, তেমনি সেই যে অপরিচ্ছন্ন চিৎপ্রকাশ ব্রহ্ম, তাহাতেই ঐ সূর্য্যাদি প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মের যে সূর্য্যাদি-সমন্বিত সৃষ্টি প্রভা, তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিরূপে বলা যাইবে? ঐ ব্রহ্মপদ সর্ব্বাতিরিক্ত অথচ সর্ব্বার্থ-সমন্বিত; তাঁহাতে পৃথ্বী প্রভৃতি সকলই বিদ্যমান, অথচ তাঁহাতে কিছুরই সদ্ভাব নাই। কোন জীবই তাঁহাতে নাই বটে, অথচ কোন্ জীবগণই বা তাঁহাতে নাই? তাহাতে না দ্বৈত, না ঐক্য কিছুই নাই; তাহা হইতে কিছুই 'কিছু' নহে। ফলে কিঞ্চিৎ বা অকিঞ্চিৎ ইত্যাদি-কলনা তাঁহার নিকট হইতে অতিদূরে বিদ্যমান। যাহা অনবচ্ছিন্না সনাতনী চিদ্ব্যোমসত্তা, তাহাই আত্মায় অতি বিশাল জগদাকারে বর্ত্তমানা। এই যে নানাবৎ জগৎ দেখা যাইতেছে, উহা অনানাই। এই বিস্তীর্ণ জগৎ চিদ্‌ব্যোমমাত্রই। স্বপ্নে যেমন জীবচৈতন্য নানাভাব ধারণ করে, ঐ চিদ্‌ব্যোম তেমনি ভূত-পঞ্চকরূপে অবস্থান করে। সুষুপ্তি হইতে যৎকালে স্বপ্নাবস্থা লাভ হয়, তখন জীবচৈতন্য সুষুপ্তিতেই থাকে—থাকিয়া যথাস্থিতরূপে স্বপ্নতা আশ্রয় করে। এইরূপে চিৎও প্রলয়ের পর হইতে সৃষ্টিস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যেমন সুষুপ্তি, স্বপ্নতাও সেইরূপই এবং যাহা জাগ্রৎ তুর্য্য, তাহাও তৎস্বরূপই; সুতরাং জগৎ আকাশপ্রায়। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সকলই তুর্য্যস্বরূপে বিরাজিত। ঈশ্বর জড়াজড়

জগজ্জীবপরম্পরার অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক অলক্ষ্যভাবে জগৎ পরিণামিত করিতেছেন। অথচ তাঁহার মন-বুদ্ধি প্রভৃতি নাই। তিনিই শুদ্ধ চিত্তের পারমার্থিক রূপ; এই জগৎপদার্থ-পরম্পরা তন্ময়ীই। বাস্তবপক্ষে যে সকল জগৎ পদার্থ সৎস্বরূপে বিদ্যমান নাই, সেই সমুদায়ের পারমার্থিকরূপ-স্বরূপ, ঈশ্বরই জগদাকারে বিদ্যমান। ইহাই হইল চরম সিদ্ধান্ত।

হে অনঘ রামচন্দ্র! পৃথ্ব্যাদিপরম্পরা যদি চিদ্রূপই হয়, আর তাহা হইতে পৃথ্ব্যাদি যদি পৃথক্ই নয়, তবে চিত্তের অন্তর্য্যামিরূপে জগৎপরিণামকারিতা কিরূপে হওয়া সম্ভবপর? এ কথা তুমি বলিতে পার না! কেন না, এ জগতের পরিণামাদিদর্শীদিগেরই উপদেশার্থ প্রবৃত্ত উক্তির—পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তানুসারে বাস্তবপক্ষে এ জগতে গন্ধমাত্রও নাই। একই চিন্মাত্র পরমাকাশ মহাসত্তারূপে আদি সৃষ্টি হইতে আত্মায় বিদ্যমান। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁহাদিগের পরিপূর্ণ আত্মায় অনুভবই তাহার প্রমাণ। সেই চিৎ সর্ব্বব্যাপিনীরূপে বিরাজমানা এবং তিনিই অজ্ঞ নিমিত্ত নিজাত্মায় জগৎ ইত্যাদি অভিধান আরোপণ করিয়াছেন। স্বপ্নপ্রবোধে অপ্রবোধের ন্যায় যদ্বিধ আত্মা পরিশিষ্ট হয়, তদঙ্গীকারে যাহা যাহা জগৎ কৌতুকসুখ—সে সকল সুখই হইয়া দাঁড়ায়, আর অপ্রবোধে তদনঙ্গীকারে যাহা যাহা জন্ম মরণ জরাদি দুঃখময়রূপে অনুভব হয়, তৎসমুদায়ই দুঃখ হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ,—গমন, অবস্থান, শয়ন, জাগরণ, সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই তাঁহার এক নিত্য সুখ বিদ্যমান। ভেদেও যাহার অভেদনিষ্ঠা আছে, যাহার দুঃখেও সুখস্থিতি, অপিচ যিনি বহিঃসংসারে থাকিলেও অন্তর্মুক্ত—বলিয়া সংসারে আর নাই, তথাবিধ প্রাজ্ঞ পুরুষের আর অন্য কি সাধ্য এবং কিই বা পরিহার্য্য হইয়া থাকে? তাদৃশ পুরুষ যদি বাহ্যিক ব্যাপারে ব্যাপৃতও থাকেন, তথাচ কিছুই আদান বা বিসর্জ্জন করেন না। কেবল ব্রহ্মেই তাঁহার অবস্থিতি হয়। যেমন হিমের শৈত্য ও অগ্নির উষ্ণতাই স্বভাব, তেমনি ঐ পুরুষের এরূপ স্থিতি তাঁহার স্বভাব বলিয়াই বিদিত। যিনি এই প্রকার স্বভাবসম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎ আখ্যা প্রদান করা

যায় না। যে ইচ্ছা আত্মাতিরিক্তবিষয়িণী, তাহাই অজ্ঞতার লক্ষণ। যিনি বিদিতবেদ্য হইয়া সর্ব্বাবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই অন্তঃকরণের সমাশ্বাসনা লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার শত্রু মিত্রাদি বিকল্প-জাল ছিন্ন হইয়াছে; তিনিই স্বাত্মসুখসর্ব্বস্ব হইয়া পরম শান্তিসুধায় পরম পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

একসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! শ্রুতিবাক্যানুসারেই এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; অথচ কিরূপে আমি ইহাকে স্বপ্নোপম চিৎকচনমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এরূপ একটা আশঙ্কা তোমার হইতে পারে; কিন্তু তাহা যেন হয় না। কেন না, প্রজাপতি বিরাট হইলেও ঐরূপ অনাদি জীবন্মুক্ত বলিয়া নিরাবরণ চিদাকাশই; আমি তাঁহাকে মনঃসমষ্টি হিরণ্যগর্ভমাত্র বলিয়াই অবধারণ করি। এইরূপে ব্রহ্মার চিন্মাত্রত্বই সিদ্ধ। যখন মননাকার কল্পনা হয়, তৎপূর্ব্বে চিন্মাত্রই ছিল। মননাকার-কল্পনা হইবার পর জলের আবর্ত্ত-বিবর্ত্তাকারে জলোত্থানে বিবর্ত্ততাকল্পনার ন্যায় মনোনামক অভ্যাস কল্পনা হয়। এ কল্পনা স্বয়ং চিৎই করিয়া থাকেন। যাহা সত্তামাত্রাত্মতা, তাহাতে বুদ্ধি প্রভৃতি কোথায়? পৃথ্যাদির অসদ্ভাবে অনন্তাকাশের আর রজঃসম্পর্ক সম্ভাবনা কোথায়? ঐ যে সত্তামাত্রাত্মতা, উহাতে না চিত্তাদি না বাসনাদি কিছুই নাই। হে বিজ্ঞ! শ্রবণ কর, কারণের অসদ্ভাব নিবন্ধন সৃষ্টির আদ্যাবস্থায় ঐ সমুদায়ের কিছুই নাই। অপিচ প্রাক্তন প্রজাপতি যে পরবর্ত্তী প্রজাপতির কারণ হইতে পারেন, তাহাও নহে। কেন না, প্রাক্তন প্রজাপতির স্থিতিকালের অবসানেই মুক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং যিনি অভিনব প্রজাপতি হন, তদীয় জগৎরচনানুকূলা স্মৃতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। সেই যিনি প্রাক্তন ব্রহ্মা ছিলেন, তাঁহার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব

ঘটনা। সংসারগত আবর্ত্তনশীল জীবের যেমন পুনঃপুন দেহোৎপত্তি হয়, যাহারা বিদেহমুক্ত, তাঁহাদের সংসারস্মৃতি বা পুনরায় দেহোৎপত্তি সেরূপ হইবার নহে। অপিচ দেশান্তরেই কি আর কালান্তরেই কি, কখনই তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি নাই। পূর্ব্বকল্পীয় বাসনাবশে 'অহং'-ভাবগোচর সংস্কারপ্রভাবে তথাবিধ স্মৃতিতে যদি বা প্রজাপতির কিঞ্চিৎ দেহাদির সম্ভাবনা ঘটে, সে কেবল উপাসনাত্মক মনঃকল্পনার সংস্কারস্বরূপ; এজন্য তাহা কেবল মানস অভৌতিক তুচ্ছ সঙ্কল্পনগরোপম অসত্যস্বরূপই। তোমার অবশ্য ঐরূপ একটা কথা আছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ড বিরাট-দেহ ভৌতিক বলিয়াই দেখা যাইতেছে; ইহার ভৌতিকতার অসম্ভাব হইল কি করিয়া? এতদুত্তরে বলিতেছি, সঙ্কল্পশৈলের রূপ এক প্রকার একটা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে যেরূপ, তাহাতে যেমন পৃথ্ব্যাদি সম্পর্ক নাই; সেই যে বিরাটদেহ, তাহাতেও উহার অভাব সেইরূপই জানিতে হইবে। শ্রুতিবাক্যানুসারে পৃথ্ব্যাদি-ঘটিতত্ত্ব ও পূর্ব্ব-স্মৃত্যাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু সেই যে প্রজাপতি, তাঁহার আদিসৃষ্টিতে পূর্ব্বানুভবের অভাব-প্রযুক্ত কোনরূপ স্মৃতির সম্ভবপরতা কদাচ হইতে পারে না। তবে যে শ্রুতিবাক্যে বোধ, তাহা কেবল জগৎকেই যাহারা সত্য বলিয়া দেখে, তথাবিধ অজ্ঞদিগের বুদ্ধিতেই হয়। শ্রুতির যাহা উপদেশ, তাহা কেবল অনাদি-সিদ্ধ কর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত পরবুদ্ধি অনুসারেই প্রদত্ত। ফলতঃ সেই যে তত্ত্বদর্শী প্রজাপতি, তাঁহার বুদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত স্মৃতি নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে স্মৃতিমৎপ্রবর! তাঁহাদিগের স্মৃতির সম্ভবপরতা নাই কেন? তথাবিধ স্মৃতির অসম্ভাবে নির্ম্মাণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পীয় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগুণ কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? হে গুণাশ্রয়! তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কল্পনাভ্রম-সংস্কার-জনিত ব্যর্থ স্মৃতির কথা আমার বক্তব্য নহে। কিন্তু যাহা সত্যার্থানুভব স্মৃতি, তাহার কথাই আমি কহিতেছি। দেখ, পূর্ব্বকল্পীয় পৃথিব্যাদি দৃশ্যপরম্পরার বাস্তব সত্তা যদি থাকিত, তবেই তাহার ভাবাভাব সম্ভবপর হইতে পারিত। কিন্তু

উঁহার স্মৃতিরই তো অসম্ভবতা; কেন? তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত কোনরূপ দৃশ্যই যখন যথার্থপক্ষে নাই, তখন কোথায় কিরূপে কীদৃশ স্মৃতির সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? কাজেই সেই তত্ত্বজ্ঞ বিরাট পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান প্রতিহত হওয়ায় সকল প্রপঞ্চই তো মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, তাহা কখনই বস্তুগত্যা স্মৃতি সম্ভাবন রা সেই স্মৃতির সাহায্যে সত্য সৃষ্টির প্রতি কারণ হইতে পারে না।, দৃশ্য বস্তুর যদি পরমার্থপক্ষে উৎপত্তির পর বিদ্যমানতা থাকে, তবেই প্রমাণযোগে অনুভবপূর্ব্বক কালান্তরে স্মরণ করা হইলে তাহাই স্মৃতি আখ্যায় প্রখ্যাত হয়। শাস্ত্রজ্ঞগণ এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অপিচ যথায় দৃশ্যই নাই, তথায় আর এ সকল কলনার অবসর কৈ? যত কিছু দৃশ্য বস্তু, সমুদায়েরই সদা অত্যন্তাভাব। 'সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম' এই কথাই সত্য; সুতরাং স্মৃতির কল্পনা সম্ভবপর হয় কিরূপে? এখন দেখ যে, প্রজাপতির আদ্য স্মৃতির সম্ভবপরতা নাই; অপিচ ঐ যে শুদ্ধজ্ঞানাত্মা, তাঁহার আকারবত্তাও নাই। প্রাগ্‌ভবীয় উপাসনাত্মতায় নিজের যে জগৎশরীরত্বভাবনা, তাহারই জন্য উপাসনা ফলসিদ্ধিকল্পে ইত্যাকার স্মৃতি তাঁহার অবশ্যই হইতে পারে যে, আমি জগৎশরীরাত্মক। কিন্তু লৌকিক স্মৃতিবৎ অর্থ-প্রমাজন্যা স্মৃতি তাঁহার গোটেই নাই। লৌকিক স্মৃতিতে মাতৃ দুহিতৃ ও অন্যান্য কুটুম্বাদির এবং গৃহক্ষেত্রাদির বিদ্যমানতা; আর উপাসনাবিষয়ক স্মৃতি মনোরাজ্যের ন্যায় অস্তিত্বহীন। এক্ষণে শুন— প্রজাপতির স্মৃতি নাই কেন, বলিতেছি। সংস্কারনিবন্ধন অতীত পদার্থের স্মরণই স্মৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট। পরন্তু প্রজাপতি সম্বন্ধে কল্পাদিতে পদার্থ সত্ত্বেও কার্য্যতঃ তাহা নাই, কখন যে ছিল এরূপও নহে, আর ভবিষ্যতেও থাকিবার নয়; সুতরাং স্মৃতি হইবে কি? এইরূপে সমুদায়ই আদ্যন্ত-বর্জ্জিত কূটস্থ পরব্রহ্ম, কাজেই স্মৃত্যাদির আর সম্ভাবনা কি? যদি কোন সর্ব্বাত্মদর্শী বলেন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বলিয়া স্মৃত্যাত্মকও হউন, এরূপ কথার উত্তরে বলিব, আপত্তি কি? ব্রহ্ম তাহাই হউন। এ কথা আমিও যে পূর্ব্বে না বলিয়াছি, তাহা নয়। যে সকল পদার্থ চিদ্‌ব্যোমকচন, ব্যবহারের উপযোগী হইলেও যাহা একান্তই শান্ত, পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা

আমিও তাহাকে স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মভাবের অপরোক্ষভাবে কচনই স্মরণ; ঐ যে ব্রহ্মাত্মা, উনিই উপাসনাস্বরূপে বারম্বার অভ্যস্ত হইয়া উপাসনাফলীভূত বাহ্যার্থবৎ উপাসনা করেন; সাদৃশ্যে আভাসমান হইয়া থাকেন। ভ্রমের বশে স্মৃতির সাহায্যে অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্মরূপ জীব পরস্পর যাহা যাহা অজ্ঞানোপহিত-ভাবে স্বজ্ঞানবিষয়ীভূত বা প্রকাশিত করে, সে সকল স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া তদাকারে কালান্তরে যে তদ্ভাবাশ্লিষ্ট-প্রায় প্রতিভাসমান হয়, তাহারই 'স্মৃতি' নাম স্বস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যমান দৃশ্যও যেমন ভ্রান্তানুভবে প্রতিভাত হয়, তেমনি স্মৃতিতে স্থিতিনিচয় অবিদ্যমান হইয়াও মৃগতৃষ্ণায় প্রকাশমান হইয়া বিরাজমান হইয়া থাকে। সত্যস্বরূপ সর্ব্বাত্মাতে অবস্থিত হইয়া যে সকল সম্বিৎ পরিস্ফুরিত হয়, তাহাই ভ্রান্তাভ্যাসবশে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—হইয়া ভ্রান্তানুভবে সমান বিষয়ত্বরূপ সাদৃশ্যহেতু 'স্মৃতি'নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাকতালীয়বৎ হঠাৎ উদ্‌বোধক্রমে সেই সর্ব্বাত্মায় যে কিছু সম্বিৎ প্রকাশমান হয়, চিত্তের অঙ্গীভূতের ন্যায় বৈষয়িকতায় পরোক্ষভাবে বিকৃত হইলেও স্বতঃ অপরোক্ষতা হেতু অবিকৃতবৎ প্রতীতিগোচর তাহাই স্মৃতিরূপে প্রখ্যাত। যেমন ব্যজনাদিহেতু পাওয়া যাউক, আর না যাউক, পবনস্পন্দন হয়ই, তেমনি কোন উদ্‌বোধক হেতু লব্ধ হউক বা না হউক, সম্বিৎসমূহের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। সেই যে অনুভববৃত্তি-লক্ষিত সম্বিৎ, তাহাই কালান্তরে স্মৃতি বলিয়া বিদিত। যেমন তোমার এই সমস্ত অবয়ব মনঃ-প্রবণ হইলেই স্ফুরিত হয়, আর অন্য প্রবণ না হইলে স্ফুরিত হয় না, তেমনি উদ্‌বোধকের কদাচিৎ অবধানহেতু ঐ কাকতালীয়বৎ অবয়বীভূত সম্বিৎ-নিচয় কাকতালীয়ন্যায়েই প্রতিভাত হয়। কাজেই উহার যে সর্ব্বদা স্ফুরণ আছে, তাহা নহে। সুধীগণের মতে উহাই স্মৃতিনামে নিরূপিত। স্বপ্নেন্দ্রজালাদিতে মিথ্যা জ্ঞানময় ঘটপটাদি যেমন বিদ্যমান, তদ্বৎ আত্মাতে সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বসম্বিৎই বর্ত্তমান, উক্ত স্বপ্নেন্দ্রজালাদিতে ঘটপটাদি যেমন মিথ্যাজ্ঞানময়, তেমনি ভ্রমাত্মক স্মৃতিপদার্থের বিচারিত আর কি হইবে? তাই বলিতেছি, দৃশ্যের একান্তই অভাব; দৃশ্যাভাব বলিয়া সেই অভ্রান্ত

তত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির স্মৃতি একেবারেই নাই; এই জগৎ সৃষ্টিকে সেই তত্ত্ববিৎ নিজ দৃষ্টিতে একঘন চিদ্ব্যোমমাত্ররূপে দেখেন। কাজেই সেই তত্ত্ববিৎ আপনিও একঘন বলিয়া-একই নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত হন। এই দৃশ্য অজ্ঞ জনের নিকট যেমন দেখায়, সেই সেই ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই অতত্ত্বজ্ঞের স্থিতি বা মোক্ষের বিষয় আমি কিছুই অবগত নহি; সুতরাং অজ্ঞ জন যদি দৈবক্রমে সাধনচতুষ্টয় লাভ করিয়া সন্দেহক্রমে জিজ্ঞাসুর ন্যায় হয়, তবে যাবৎ না উহার দৃশ্য, স্মৃতি বা সংস্মৃতির নিবৃত্তি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত গুরুই মোক্ষ কথা উপদেশ দিবেন এবং দিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞবর্গের স্থিতি-ব্যাপারে অজ্ঞেরা যেমন কিছুই অবগত নহে, তেমনি যদ্যপি আমরা তত্ত্বজ্ঞ, তথাচ অবিদ্যা, মূর্খতা বা মোহের ঐকান্তিক অসম্ভবতা হেতু অজ্ঞ-জনের নিশ্চয় পরিজ্ঞাত নহি। কেন না, যাহার বিষয়ে যাহা নাই, তাহার তাহা অনুভূতিগোচর হয় না। বল দেখি, দিনমণির নিশানুভব কি করিয়া হইতে পারে? সংস্কার স্মৃতির হেতু; এক্ষণে সেই সংস্কারের স্বরূপ কি, তাহাই অগ্রে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। অন্তঃকরণোপহিত চিন্মাত্রে যে কিছু বাহ্য বস্তুর প্রতিফলন হইবে, তাহা যদি ব্যবহারতঃ অভ্যস্ত হয়, তবে তথাবিধ সাদৃশ্যক্রমে যে বাসিত বা বাসনাময় চিত্ত, তাহার নামই সংস্কার। পরিকল্পনাযোগ্য সমস্ত বাহ্য বস্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে আত্মস্বভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখন বাধিতানুবর্ত্তন দ্বারা পটন্যায়ে উহা আভাসমান হইলেও বস্তুগত্যা উহার অবস্থান হয় না, কাজেই তত্ত্বজ্ঞের চিত্তে সংস্কার মার্জ্জিত হওয়ায় তাহার আর স্থান নাই। তাই বলিতেছি, তাহার সংস্কার আর তত্ত্বজ্ঞদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এইরূপে জগৎপদার্থও কোন কিছু সম্ভবপর নহে। যেমন মৃগতৃষ্ণার জল, তেমনি এতৎসমস্তই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; পরমার্থপক্ষে দেখা যায় না। এইরূপ অর্থই যখন স্থির, তখন স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্ট্যাদিতে সেই যিনি স্বাত্মস্বভাবস্থিত পরম চিদাকাশ, তিনিই সৃষ্টিপর্য্যায়গত হইয়া এই জগদাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন। সুতরাং চিদ্ব্যোমই এই জগদাকারে আভাত হইতেছেন; জগৎ কদাচ সৎস্বরূপ হইতে প্রচ্যুত নহে। এইরূপে এ জগৎ অসৎস্বরূপ হইলেও ব্রহ্মরূপেই বিরাজিত। পক্ষান্তরে সর্গাদি স্ফুরিত হইলে উহা মিথ্যা

স্ফুরিতবৎ হয়—হইয়া অসৎস্বরূপে থাকিলেও উহা সেই সৎস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই হেয়োপাদেয়াদি প্রতিভাস কোথায় কিপ্রকারে বা কি নিমিত্ত হইবে? এই জগদ্‌বস্তু সাকার নয়, অথবা ইহা যে মৃত্যাত্মক, তাহাও কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনই কারণ নাই বলিয়াই ইহা পরমাত্মস্বরূপেই প্রতিভাসমান। এই নিমিত্তই মৃত্যাত্মকতার প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, যদি বস্তুর আকার থাকে, তা হইলেও যাদৃশ দুঃখ, মরণ ঘটিলেও তাহাই হয়। পঞ্চভূতের অন্যতম আকাশ; সেই আকাশপ্রতিম শূন্যস্বরূপ চিদাকাশে ভুবন, দিনকর ও অচলাদি স্ব স্বরূপের পরিহার না করিয়াই যথাস্থিতরূপে অবস্থান করে। এই দিগ্‌দেশ কাল-সম্পন্ন জগৎ স্বস্বরূপের অপরিহারেই ঐ চিদাকাশে অবস্থিত আছে। দৃষ্টান্ত দেখ, যাহার স্বরূপ স্বানুভব মাত্রই, সেই প্রমাতৃ স্বপ্নগরও স্বস্বরূপের অপরিহারক চিদাকাশকোশস্থ উক্ত চিদ্‌ব্যোমেরই স্বরূপ মাত্র। এখন দেখ, উহাতে পৃথ্ব্যাদির অভাব বা পৃথ্ব্যাদি কোথায় আছে? উহা তো কেবল শান্ত চিদাকাশই—শান্ত আত্মায় অবস্থিত। সর্গাদিতে এবং স্বপ্নাদিকালে পৃথ্ব্যাদির সম্ভাবনা একেবারেই নাই। ব্রহ্মসত্তা যেন জগৎস্বরূপ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজে নিজ স্বরূপে পৃথ্ব্যাদি নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনন্তর তাহাই সত্যার্থপ্রদরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরন্তু বাস্তবপক্ষে, তাহা নহে; উহা মৃত্যাত্মক বা সাকার কিছুই নহে। কেন না, পৃথ্বী প্রভৃতির অসম্ভাবনা সম্পূর্ণতই। সুতরাং উহা না ভ্রান্তি না বিবর্ত্তাদি কিছুই নহে। জানিবে—এই জগৎ কেবল ব্রহ্মাত্মমাত্রই। সুন্দরস্বরূপে ব্রহ্মই পরিস্ফুরিত হইতেছেন। তিনিই সর্গে ও প্রলয়ে আত্মাধিকৃত স্বভাবনিষ্ঠ একাদ্বয়ই। যদিও এই ব্রহ্ম দৃশ্যাভ হইয়া প্রতিভাত ও দৃগ্‌বিষয়ীভূত, তথাচ উহা নির্ম্মলনভোমাত্রই। জানিবে—উহা অনাদি অনন্তকাল হইতে অজ্ঞানবশেই সর্গ-প্রলয়াত্মক হইয়া সমুদীয়মান।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! স্বপ্রকাশ চিচ্চমৎকারই যদি এই জগৎ হয়, তবে তো সেই সর্ব্বানুভবরূপী সর্ব্বাত্মক আত্মতত্ত্বের 'অহং' ভাবে আগ্রহ সর্ব্বত্র হওয়াই বিধেয়। কেবল দেহেতেই তাঁহার অভ্যস্ত অহং-ভাবাভিনিবেশ কেন? আর অন্যত্রই বা এরূপ নহে কি জন্য? চিৎস্বরূপ স্বীয় চিদ্ভাব পরিহার করিতে সমর্থ নহেন এবং চিদতিরিক্ত রূপও তাঁহার অঙ্গীকার করা যায় না; এ ক্ষেত্রে স্বপ্নাদিতে চিদ্ব্যতিরিক্ত দারু-পাষাণাদিভাব গ্রহণ বা সেই সেইরূপে আগ্রহ কিরূপে চিদ্রূপের হইল? আর এক কথা এই যে, সেই চিদ্রূপ যখন সর্ব্বাত্মক, তখন এই দারু-পাষাণাদিতে তদীয় অস্তিত্বের অভাব কিরূপে হয়? চিতের অপহ্নব তো অসম্ভব কথা। আর তাহাতে অস্তিত্ব অঙ্গীকারে সেই সর্ব্বাত্মক চিদ্‌বিরুদ্ধ অবিদ্যাকার জড় পাষাণাদির রূপের অস্তিত্বসিদ্ধিই বা কি প্রকারে হয়? আর যদি চিদ্‌বিরুদ্ধ অঙ্গীকার করা হয়, তবে তো ঐ চিতের সর্ব্বাত্মকতার অভাব হইয়া পড়ে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শরীরীর হস্তেই যেমন হস্ততার আগ্রহ, তেমনি জানিবে—সেই সর্ব্বাত্মার দেহেই দেহাবচ্ছিন্ন 'অহং'ভাবের আগ্রহ। কেবল প্রাণিসম্বন্ধে কথা নহে; তরুগগনাদিতেও সেই অবিনাশী জীবের সত্তা আছে বলিয়া তরুর পত্রে পত্রতার এবং আকাশের শূন্যে শূন্যতার আগ্রহ হয়। স্বপ্নপুরী উপাদানীভূত অরূপ চিত্ত হইতে প্রাদুর্ভূত; তাই উহা অরূপ হওয়াই বিধেয় হইলেও উহাতে সাকারতায় যেমন স্বপ্নভোক্তার আগ্রহ, তেমনি সেই সর্ব্বাত্মাতেও স্বপ্নজাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থার আগ্রহ জানিবে। চেতনারূপাভিমত শরীরের কোথাও যেমন অচেতনত্ব, তেমনি চিদ্রূপের সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধি সত্ত্বে কচিৎ দারুপাষাণাদিতে অচেতনত্ব আগ্রহ। যেমন স্বপ্নাবস্থায় চিত্তসান্নিধ্য হইতে দারুপাষাণাদি ভাব হয়, তেমনি সৃষ্টির আদিম অবস্থায়ও চিদাকাশের অবয়বাদিভাব হইয়া থাকে। অপিচ মায়াশবল পুরুষের একই দেহ চেতনাচেতন উভয়াত্মকত্ব নিবন্ধন তদীয় ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্তভাবে উভয় ব্যবহারেই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। সুতরাং

তাহাতে যেমন কোন বিরোধ নাই, তাহা যেমন একই বস্তু; তেমনি সেই সর্ব্বাত্মার একই দেহ; চেতন অচেতন উভয়াত্মক হইয়া স্থাবর জঙ্গমময় হইয়াছে। উহা নিত্য কাল একই; সর্ব্বকালেই তাহার আকারাভাব। যিনি সম্যক্ জ্ঞানবান্, তাঁহার নিকট এই যথাস্থিত জগৎ শান্ত; আর এই যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত জগৎ, ইহাও তাহার নিকট থাকে না। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির প্রান্তে যে প্রবোধোদয় হয়, তাহা "সমস্তই মৌন চিন্মাত্রাকাশ; পৃথক্ দ্রষ্টা বা দৃশ্যতা নাই" এইরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া থাকে। এইভাবে সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প সৃষ্টি যাতায়াত করিতেছে। জলধির জল যেমন তরঙ্গাদি উদ্ভাবন করিয়া নিজাঙ্গ নানা বৈচিত্র্য-স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তোলে, তেমনি চিদ্রূপই স্বীয় মায়াশবল চেতনে এই সৃষ্ট্যাদি নানা নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতত্ত্বজ্ঞ জনগণের নিশ্চয় ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞের প্রতি এই যথাবস্থ বিশ্ব সর্ব্বদাই সেই অনাময় ব্রহ্ম। জল হইতে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ যদি বুঝিতে পারে যে, আমি জলই—তরঙ্গ নহি; তাহা হইলে তাহার আর তরঙ্গত্ব থাকে কোথায়? ব্রহ্মেরই যখন তরঙ্গত্ববৎ ভাব, তখন জানিবে—তরঙ্গতা কি অতরঙ্গতা, উভয়ই ব্রাহ্মী শক্তি স্থিরতা লাভে অবস্থিত। স্বস্বরূপী চিদাকাশের অন্যান্য ধর্ম্মবিনিময়ে চেতনাভাবের ব্যতিক্রমে যে মনঃসমষ্টি উপহিতরূপ প্রকাশ পায়, রামচন্দ্র! তাহাই মনঃ, ব্রহ্মা, ইত্যাদি নানানামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে! ঐ সকলই পিতামহের নাম। সেই যিনি আদ্য প্রজাপতি নিরাকার নিরাময় চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহাই সঙ্কল্পনগরবৎ কারণ বিরহিত। যে হেমাঙ্গদ স্বীয় অঙ্গদত্বের অনস্তিত্ব, অবগত হইতে পারে, কোথায় তাহার অঙ্গদত্ব? শুদ্ধ হেমতাই তাহার বিদ্যমান। যে সঙ্কল্পমাত্রাত্মক 'অহং'ভাব জগদাদি সেই চিন্মাত্র শূন্যদেহে বিরাজিত, সেই ব্যষ্টি অস্মদাদিও সমষ্টির চিন্মাত্রতা নিবন্ধন চিন্মাত্রস্বরূপই। যে সমস্ত বিচ্ছমংকৃতি চিদাকাশে প্রতিভাত হয়, তাহা শূন্যতামাত্রই। জানিবে—সেই সমুদায়ই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহৃতি ব্যাপার জ্ঞান মাত্র। চিন্মাত্রাকাশের স্বয়ং সুবিমল কচন, আপনা হইতেই স্বপ্নসন্নিভ এবং ইহাই চিত্ততামাত্র; অপিচ ইহাই হিরণ্যগর্ভ পিতামহ। এই যে অনাদি অনন্ত সৃষ্টি-প্রলয়-বিভ্রম, ইহা তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা

সেইরূপেই স্ফুরিত হইতেছে। চিদাকাশের কত্র কচনই বিরাড়াখ্যায় অভিহিত। সেই বিরাটের মনঃস্বরূপ হিরণ্যগর্ভও যে ভুবনভূত গ্রামাদি প্রকট করিবেন, জানিবে—তাহাও স্বপ্ননগরের ন্যায়ই। সেই যে বিরাট, তিনিই সৃষ্টি এবং সেই বিরাটই স্বপ্ন; আর সেই যে স্বপ্ন, তাহাই জাগ্রদ্-ব্যাষ্টিসমষ্টি দেহ। প্রলয় তিমিরাবৃত আত্মাই সর্গ-সম্বেদন হন। অবান্তর প্রলয়রূপিণী চতুরানন-রজনীই প্রথম বলিয়া তাহাই সেই বিরাটবেশী পরমাত্মার কেশপাশরূপে সমুদিত। দিন ও রাত্রি এবং কাল ও ক্রিয়া তদীয় অঙ্গসন্ধি; বদন তাঁহার অগ্নি; মূর্দ্ধা তাঁহার স্বর্গ; নাভি তাঁহার আকাশ; পাদদ্বয় তাঁহার পৃথ্বী; নেত্রযুগল তাঁহার রবিশশী; এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় দিক্ তাঁহার উভয় কর্ণ। এই প্রকার নিয়মে মনঃকল্পনাই বিরাড়াকারে বিজৃম্ভমাণ। এই ভাবে সেই বিশালাকার বিরাট পুরুষ যখন সমীচীনরূপে পরিদৃষ্ট হন, তখন তিনি অস্মদীয় সঙ্কল্পশৈল-সন্নিভ স্বপ্নাকারাবস্থিত ব্যোমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। চেতনাত্মক জীবভাবাপন্ন হইয়া চিদাকাশে যাহা স্বতই দেদীপ্যমান হয়, এই জগৎ তাহাই; অতএব আত্মাই অনুভূতিগম্য হইয়া থাকেন। যিনি সেই বিশাল চিন্ময়াকাশ, তিনিই এইরূপে বিরাট্স্বরূপে প্রতিভাত। এই যে শৈলসাগরাদিময় জগৎ দেখা যায়, ইহা শৈলসাগরাদিময়াত্মক স্বভাব স্বপ্ননগর মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। স্বপ্নাবস্থায় নট যেমন স্বাত্মাকেই স্বাতিরিক্ত নাট্যদর্শীর সমাজে পূর্ণ স্বপ্নদেশ কল্পনাপুরঃসর তাহাতে নিজ নাট্য নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকে, তেমনি অনুভবকারী চিদাত্মাই স্বস্বরূপকে অনুভবৈকরস সত্যাত্মাকে মায়ার আবরণে অস্তিত্বপরিবর্জ্জিত সত্যবৎ করিয়া লইয়া তাহাকে—সেই স্বীয় আত্মাকেই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চরূপে অনুভবগোচর করেন। বেদব্যাস, অর্হৎ, কপিল, পতঞ্জলি, বুদ্ধ, পশুপতি, আগমশাস্ত্র-প্রণেতা ভৈরব ও অন্যান্য আগমশাস্ত্রোপদেষ্টৃগণ স্বস্ব আগমে যে যে দৃক্ প্রতিপাদিত করিয়াছেন, তত্তাবৎরূপে অস্মদভিমত ব্রহ্মাই আত্মকলায় সেই সেই বাসনা-রূপ লক্ষণ তদাত্মকরূপে নিত্যকাল পরিস্ফুরিত হইতেছেন। উল্লিখিত মতবাদিগণের নিজ নিজ নিশ্চয়ানুসারে স্বর্গ, পারলৌকিক সুখ এবং অখিল ঐহিক সুখরূপ যে সকল ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্ত ফলই তত্ত্ববিদ্গণের

অতে ব্রহ্মই হইতেছেন। কেন না, উক্ত বাদিগণের কি অভিমত এই যে, তাদাত্ম্যরূপেই সেই সেই ফল হইয়া থাকে। ব্রহ্মের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ এইরূপই; যে হেতু ব্রহ্ম মায়াশবলরূপী সর্ব্বাত্মক।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সৃষ্টির প্রাক্‌কালে চিৎই কেবল স্বপ্নবিৎ সম্বেদনে জগৎ এই অবভাস হইতেছে। সুতরাং এই ত্রিজগৎ ব্রহ্মই; এইরূপ প্রবোধোদয়ে কৈবল্য সিদ্ধি ঘটিলে সৃষ্টি ব্রহ্মাম্বুধির তরঙ্গ আর তাহাতে সম্বেদন দ্রব হইয়া থাকে। তবে তৎপরেও যে জীবন্মুক্তগণের ব্যবহারার্থ জগৎ প্রসিদ্ধ, তাহা মাত্র আনন্দসচ্চিদেকরস সর্গান্তর; উহা সুখাদি-পরিপূর্ণ; উহাতে দ্বৈত বা ঐক্যাদি অন্যান্য অসুখরূপ কি কারণ হওয়া সম্ভবপর? স্বপ্নদশায় যেমন সুষুপ্তি, স্বপ্ন, ইত্যাদি ভেদাভাস সত্ত্বেও তাহাতে নিদ্রৈকরসতার ক্ষতি কিছুই নাই, তেমনি উক্ত বিদেহমুক্তি-জীবন্মুক্তি যদিও ভেদ প্রতিভাস, তথাচ তাহাতে সুখৈকরসতার হানি কিছুমাত্রই নাই। যত কিছু দৃশ্য এবং যত কিছু অদৃশ্যাংশ, সকলই সেই চিদাকাশের একাত্মরূপ। জাগ্রৎকালে স্বপ্ন-সমবলোকিত নগরাদির যেমন বাধ ঘটে, তেমনি এই জগৎ যখন বিবেকী জনের কর্ত্তৃত্বে পরিজ্ঞাত ও বাধিত হইয়া যায়; এইরূপ হওয়ায় বিবেকীর কি তখন তাহাতে আস্থা বন্ধন হইতে পারে? অতএব বিদ্বান্ যাহা বাধিত করেন, তদ্বিষয়ে অনাস্থাই দুঃখাভাবের কারণ। জাগ্রদবস্থায় যেমন নানা স্বপ্ন-নগর বাসনা সত্যত্বে জাগ্রৎ রহিলেও তাহা অসত্য হইয়া যায়, তেমনি এই জাগ্রদবস্থায় ভোগাভোগার্থ প্রকটিত বাসনাও সত্য হইয়াও অসত্যমাত্রই। ফল কথা, দগ্ধবস্ত্রবৎ, বাসনামাত্রাবস্থিত ভোগ প্রভৃতি কদাচ দুঃখের

কারণ হইতে পারে না। জগতের স্বরূপ যদি ভ্রান্তিমাত্র হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের ফলে সেই ভ্রান্তি-নিদান অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া গেলে তাহা বাধিত হইতে পারে। পরন্তু প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি অঙ্গীকারে যদি অন্যপ্রকার উপপত্তি করা যায়, তথাচ ভ্রান্তিময়তার কল্পনা বিনা তো তত্ত্বজ্ঞানে জগদ্বাধা হওয়া সম্ভবপর নহে। আর তাদৃশ কল্পনায় তো দুঃখ নিবৃত্তি হইবার নহে; দুঃখ হইবেই। তুমি যদি এইরূপ বল, কিন্তু আমি তাহা বলি না; কেন না, তোমার ঐরূপ অন্যথা উপপত্তিযোগে কারণ কল্পনা করিলে যাহা স্বপ্ন জগৎ-প্রসিদ্ধ, যাহা লাঘব এবং যাহা "বাচারম্ভণ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা সত্বর সমুপস্থিত হয়; তাই একান্ত সন্নিহিত জগতের ভ্রমমাত্রতাই কল্পনা কর না কেন? ঐ শ্রুতিদর্শিত ন্যায়ের পর্য্যালোচনায় মৃৎসূত্রাদি বিনাও ঘটপটাদি দৃষ্ট হয় না। এ জন্য স্বপ্ন-জগৎপ্রায় তৎসম্বন্ধে ইহা প্রত্যক্ষতই অনুভবগম্য হইয়া থাকে—'এই স্বীয় ভ্রম।' পরন্তু কারণ অনুমান সাধ্য; যাদৃশ অনুমান প্রভাবে প্রকৃতি-পরমাণু প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষ অনুভবাপেক্ষা সেরূপ বলবত্তর অনুমান কোথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে? অপিচ এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা স্বপ্ন-পর্ব্বতবৎ অন্ত-র্ভ্রান্তিময়; এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কারণীভূত লক্ষণেরও অসদ্ভাব নাই। কারণ, দ্রষ্টা পুরুষ আত্মার ইষ্ট পদার্থের সৃষ্টি বা অনিষ্ট-সৃষ্টি নিবারণ এতদুভয় ব্যাপারে প্রভুত্ব প্রদর্শন করাইতে অক্ষম। ঐ পুরুষ এরূপও অনুভব করেন যে, আমি সমর্থ নহি। আবার পূর্ব্বে তিনি যাহা নিরূপণ করেন, তাহাও তিনি যে অবশ্যই দেখেন, সেরূপ নহে। কেন না, সহসা যৎকিঞ্চিৎ আবির্ভূত দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি কারণা-ন্তরের অধীন হইলে তাদৃশ কারণ সম্পত্তিতে সকলেই স্ব স্ব অভীষ্ট সৃষ্টি করিতে পারিত, অনিষ্ট সৃষ্টিরও নিবারণ তাঁহাদের দ্বারা হইত; অপিচ আকস্মিক দৃশ্যও তাহারা দেখিত না। সুতরাং উল্লিখিত লক্ষণত্রয়ের অন্যথোপপত্তি যখন নাই, তখন স্বপ্নশৈলবৎ উহার অন্তর্ভ্রমাত্মকত্বই সিদ্ধ হইল। সুতরাং জগৎ অবাধিত করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিযাবৎ ধ্যান মাত্রেই যাঁহারা নিস্তার পাইবেন বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ যোগী-দিগের নিরাশ হইল। কেন না, যোগীদিগের আত্মা আনন্দ চিৎস্বরূপ

শূন্যাবস্থায় থাকে। উহা সাক্ষাৎ অনুভবেও পুরুষার্থহীন বলিয়া তৎসাক্ষাৎ-কল্পনায় প্রয়োজনাভাববশে নিত্যানুমেয় সেই নিত্য পরোক্ষ ভ্রমজ্ঞান-কল্পে জড়তারই অবশেষ থাকে। তদবস্থায় চিত্ত নির্ব্বিকল্প-সমাধিনিষ্ঠ হইলেও তাহা একান্ত জড়তামাত্রেই পর্য্যবসিত, আর যদি সবিকল্প সমাধি সম্পন্ন হয়, তবে তো তাহা সংসারই; অতএব উক্ত ধ্যান ও ধ্যানে সম্পন্ন সমাধি কোনরূপ পুরুষার্থস্বরূপই বলা চলে না। যাহা সচেত্য বা সাকার ধ্যান তাহার নাম সংসার, আর যাহা অচেত্য বা নিরাকার ধ্যান আর বৈশেষিকাভিমত মোক্ষপর্য্যবসায়ী জ্ঞান, তাহা তো মোক্ষ আখ্যানেই অভিহিত। যাহা বিকল্পাত্মক সচেত্য জ্ঞান, তাহা তদপেক্ষা মোক্ষেতর; ইহা এবং বন্ধন এ উভয়ে ভেদ কিছুই নাই। জড়শিলা-প্রতিম নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে সাংখ্যাভিমত ব্যতীত অপর কিছুই অস্ম-দাদির অভিমত-লভ্য হয় না। এখন কথা এই, তাহাতে যাহা লব্ধ হয়, তাহা তো নিদ্রাতেও লব্ধ হইয়া থাকে। কেন না, উল্লিখিত উভয় অবস্থাতেই চিত্তচাঞ্চল্যের নিরাস এবং অজ্ঞানাবরণের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, সম্যক্ পরিজ্ঞাত সর্ব্বসৃষ্টি প্রভৃতিই ভ্রান্তিমাত্র; কেন না, যিনি তত্ত্বজ্ঞানশালী বিবেকী ব্যক্তি, তাঁহার নিকট সৃষ্টি বিস্তার একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। সেইরূপ জ্ঞানে ভ্রমের অজ্ঞান বিনাশ করিয়া উল্লিখিত বিবেকী ব্যক্তির যে জীবন্মুক্তভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি-পদ-বাচ্য হয়। অনন্ত নির্ব্বাণ, যথাবস্থ অবিক্ষুব্ধ সর্ব্বভাসন আসন, অনন্ত সুষুপ্ত তুরীয় নির্ব্বাণ ও মোক্ষ আখ্যায় তাহাকেই অভিহিত করা হয়। ঐ যে সমীচীন বোধৈকঘনতা, উহাই ধ্যানাখ্যায় সমাখ্যাত। আর ঐ যে বোধ, উহাই শ্রুতিসিদ্ধ দৃশ্যবর্জ্জিত পরম পদ। গৌতম কণাদাদি যে মুক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বৎ ঐ পরমপদ শিলা হেন জড়তাময় নহে, অথবা হিরণ্যগর্ভাদির অভিমত যে প্রাকৃত প্রলয়, তদ্বৎ সুষুপ্তপ্রায় নহে। অপিচ উহা যে পাতঞ্জলাদি-কথিত নির্ব্বিকল্পমাত্র, তাহাও নহে; কিম্বা পঞ্চরাত্র ও পাশুপতাদির অভিমত যে মুক্তি, তদ্বৎ উহা সবিকল্পও নহে, অথবা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অভিমত যে অসৎ বা শূন্য, তাহাও উহা নহে। তবে ঐ পদ কি, তাহা বলিতেছি

শোনো; যাহাতে দৃশ্যের অত্যন্তাভাব, উহা তদাত্মক আদ্য বেদন বলিয়া পরিচিত এবং শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বময়। 'নান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতি বচন দ্বারা যে অকিঞ্চিৎ আখ্যান করা হইয়াছে, উহা তাহাই। রাম হে! ঐ যে পদ, উহাই সম্যক্ প্রবোধোদয়ে নির্ব্বাণ; আবার উহাতেই যথাবস্থ বিশ্ব বিলীন হয়। অতএব উহাই সর্ব্ব, উহাই অকিঞ্চিৎ, উহাতে এই নানা বৈচিত্র্য আছে; অথচ কিছুই নাই। উহাকে কিছুই বলা যায় না; অথচ উহাই বটে কিঞ্চিৎ। উহা কিঞ্চিৎ; তাই জগৎও কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সদ্‌বস্তুই নিখিল সদসদ্‌ভাবের শেষ সীমায় পর্য্যবসিত। এ পক্ষে একখানি বস্ত্রকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্ত্র সৎ কি অসৎ, ঈদৃশ নির্ণয়স্থলে সূত্রই তাহার শেষ সীমা হইয়া দাঁড়ায়। অন্যদিকে সূত্রের সদসদ্ভাব নির্ণয় করিতে যাও, কার্পাস আসিয়া পড়িবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বীজকে, জলকে, তেজকে, আকাশকে, নিরস্ত করিতে করিতে অবশেষে সেই চিদাত্মমাত্রই চরম পর্য্যবসান হইয়া দাঁড়াইবেন। নিখিল দৃশ্যজালের একান্তই যাহাতে অসম্ভবপরতা এবং নিখিল বিক্ষেপ হইতে যাহা বিবর্জ্জিত, তথাবিধ শুদ্ধ বোধোদয়ময় শান্ত সাতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থিতিই পরম পদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে পদপদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ! এই শাস্ত্রের সাহায্যে যাহার বোধ বিকাশ ঘটিয়াছে, তথাবিধ বোধ-সম্পন্ন পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ বোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি সর্ব্বদা এই মোক্ষোপায়-মূলক শাস্ত্রের কীর্ত্তন বা শ্রবণ করান হয়, তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞানরূপ উপায় লাভ দুর্ঘট হয় না। ঐ উপায়ঘটনায় সর্ব্বোত্তম ধ্যানরূপ শুদ্ধ বোধ লাভ ঘটিয়া থাকে। অন্য যে কোন উপায়ই আশ্রয় কর, তাহাতে উহা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। তীর্থপর্য্যটনই কর, দান, স্নান বা ব্রহ্মবিদ্যাতিরিক্ত বিদ্যার্জ্জনই কর, অথবা ধ্যান, যোগ, তপস্যা বা যজ্ঞ যজন যাহাই কর, কোন কিছুতেই উহা লাভ হইবে না। কেন না, এই সমুদায়কে সৎ বলিয়া অবধারণ ভ্রম-মাত্র; ভ্রমবশতই অসৎও সৎরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অনিদ্র চিদম্বর,—শূন্যই তাহাতে জগদাকারস্বরূপ; কাজেই ঐ সমস্ত স্বপ্নোপম তপস্যা ও তীর্থাদির অনুষ্ঠানে কদাচ ভ্রান্তির নিরাস হয় না। তপস্যা

এবং তীর্থাদি দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; পরন্তু মুক্তিলাভ হয় না। সম্যক্ বুদ্ধিযোগে এ সংসারে যদি মোক্ষোপায়ভূত আত্মজ্ঞানময় শাস্ত্রার্থ অবলোকিত হয়, তবে ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। অন্য কোন কিছুতেই ঐরূপ হয় না। আলোকপ্রদর্শক অমল শাস্ত্রার্থজ্ঞান হইতেই অখিল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ শান্তি ঘটে। যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখনই তামসী রাত্রির অবসান ঘটিয়া থাকে। জানিবে—জলে যেমন দ্রবত্ব, আর পবনে যেমন স্পন্দন, তেমনি চিদাকাশেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের প্রতিভাস প্রতিভাত। যেমন বটবীজাদি দ্রব্যের অভ্যন্তরে বটবৃক্ষাকৃতি ধৃতিচমৎকৃতি বিদ্যমান এবং পবনের অন্তরালে যেমন স্পন্দন-চমৎকৃতি বর্ত্তমান, মায়াশবল চিদাকাশের অভ্যন্তরে এই যথাস্থিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতিও অনন্যরূপে সেইরূপই অবস্থিত। অপিচ ঐ চিদাকাশের গর্ভেই ইহার লয়প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭৪॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সৃষ্টি-স্থিতির চিদাকাশে অনন্যরূপে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা তুমি উহাকে চিতের শরীর বলিয়া আশঙ্কা করিতে পার না। কেন না, আদ্য চিদাকাশ যিনি, তিনি নিজ অবিদ্যার প্রভাবে স্বপ্নকল্প হইয়া জীবভাবে সংসরণপূর্ব্বক কাম, কর্ম্ম ও বাসনা দ্বারা 'আমি সুর, আমি নর' ইত্যাদি দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসের কারণ বলিয়া বিদিত হন। অপিচ সেই জীবোপাধি সিদ্ধির পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহালয়ে স্বপ্নাভত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃশ্যান্তরের অসম্ভবপরতা হেতু নিমিত্ত সিদ্ধি নাই; কাজেই কি নিমিত্ত সেই সৃষ্টিরূপ দৃশ্য তথাবিধ চিদ্ব্যোমের শরীর হইতে পারে? হে অনঘ! দেখ, স্বপ্নসম্বিত্তিরূপেই জীবভাব-সমকালে সৃষ্ট্যাদির সিদ্ধি; অন্য নিমিত্ত নহে। অপিচ যাহা চিদাকাশ, তাহার বাস্তবপক্ষে জীব-জগদ্ভাব নাই। এইরূপ অসৎ জগৎ হইয়া সেই অনুভবৈকরস চিদাত্মা স্বাবিদ্যায় ভাসমান হইয়া

থাকেন। উহা স্বপ্নাঙ্গনা-সঙ্গমবৎ কিছুই নহে—শান্তস্বরূপ, কেবল চিদাকাশ মাত্র। জগদাকার শূন্যাত্মাই জগদ্রূপে বিভাত। যাহা অনাদি-নিধন সুবিমল চিদ্ধাতু, তিনিই এইরূপে বর্ত্তমান। তিনি পরমাত্মা, যে পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত থাকেন, সেই পর্য্যন্ত অবিদ্যাই তাঁহার মলস্বরূপ হয়। তদবস্থায় তিনি সংসরণ করিয়া জীববৎ পৃথগাকার হন। আর যখন তিনি পরিজ্ঞাত থাকেন, তখন সুনির্ম্মল ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হন। কেন না, অনাদি-নিধন পরমাকাশে কোথায় কিরূপে আর মল সম্ভাবনা করা যাইবে? যাহা শুদ্ধ বেদন, তাহাই স্বপ্ন নগর এবং তাহাই সর্গাদিতে জগৎ হইয়া থাকে। কেন না, পৃথ্ব্যাদির উৎপত্তিসম্ভাবনা সর্গাদিতে আর কোথায় কিরূপে হইবে? কারণের অসম্ভাব, তাই স্বপ্নের সহিত জগতের সমতা। যিনি আকাশস্বরূপ চিদ্‌ব্যোমাত্মা, তাঁহার অবভাসেরই এই সৃষ্টিরূপিণী পৃথ্ব্যাদি কল্পনা ও মনোবুদ্ধি-আদিভাব বিহিত। জলাবর্ত্ত ও বায়ুস্পন্দবৎ চিদাকাশে অবুদ্ধিবশে যাহা প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারই নাম জগস্থান। এই জগস্থানের ভিত্তি কিছুই নাই। উক্ত জগস্থানের পর জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমি জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ এই প্রকার ঐশ্বর্য্যাখ্যায়ী হইয়া বুদ্ধ্যাদি ও পৃথ্ব্যাদি নামরূপ বিভাগ মূর্ত্তামূর্ত্ত বহুল সত্য মিথ্যাময় কল্পনা করা হয়। যাহা হইতে আর নির্ম্মল নাই, যিনি নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মলতর, সেই মহাচিৎ নিজেই জগদাকারে আভাসমান হইয়া থাকেন। ইহার নাম সর্গ; সুতরাং জগৎ যে চিদাকাশ ভিন্ন অন্য নহে, এই কথাই স্থির সিদ্ধান্ত।

রামচন্দ্র! এই প্রকার আলোচনার ফলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেই মহাচিৎ সর্ব্বদাই সুনির্ম্মলা। তদিতর অন্য কিছুই পরিস্ফুরিত হয় না। এক যে চিন্মাত্ররূপ বস্তু, তাহারই কলন স্বাত্মায় স্বতঃ সুবিস্তৃত। যাহা চিদাকাশ, তাহাতে চিদাকাশই বিরাজিত। তবে যে উহা এই দৃশ্যবৎ ও চিৎপ্রায় পরিস্ফুরিত হয়, তাহা উহার পূর্ণস্বরূপই; কেবল স্বপ্নবৎ চিত্তদৃশ্যাদিবৎ অবস্থিত কোন বাদীই যখন প্রকারান্তরে সৃষ্টির উপপাদনে সমর্থ নহে, তখন ইহাই শেষ নিষ্কর্ষ; অপিচ যখন সত্যপদার্থ বা কারণান্তরের অভাব, তখন স্বীয় আত্মাই সর্গাদিতে নিজ আত্মাকেই দর্শন

করেন, ইহা চিৎস্বরূপ হইতে কোন অংশেই ভিন্ন নহে। অতএব ইহা নিশ্চয়ই চিদ্‌ব্যোমবৎ শূন্যতামাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যাহা এইরূপ, সর্ব্বরূপ-বিরহিত পরব্রহ্ম তাহাই ; ঐ পরব্রহ্মই এক এবং এই দৃশ্যরূপ ; অতএব উহা সর্ব্বভাবেই বিরাজিত এবং উহা একরূপী হইলেও ঐ সর্ব্ব-স্বরূপে সংস্থিত। এই যে স্বপ্নানুভবগম্য বিষয়, ইহাতে আত্মাই স্বপ্ন-স্বরূপে বিরাজমান। এই যাহা নানা বোধময় বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা অনানা এবং নির্ম্মল ব্রহ্মমাত্ররূপই। স্বীয় চিদ্ভাব চৈতন্যবশত ব্রহ্মই আত্মায় জীবভাববৎ কল্পনাকর হন এবং নিজ নির্ম্মলরূপ পরিহার না করিয়াই মনস্তাকে যেন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনিই মনঃসমষ্টিরূপে এই নিখিল প্রপঞ্চ বিস্তার করেন। তিনি শূন্যাত্মক, শূন্যই বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি নিজে অবিকারী হইয়াও বিকারি জগদাকারবৎ হন। সেই যে মনঃ-সমষ্টি, তাহাই স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। তিনিই সর্গহৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক অনবরত সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। পৃথ্ব্যাদি-বিরহিত মনোরূপ ব্রহ্মা নিজাঙ্গবর্জ্জিত হৃদয়েই বিরাজ করেন, স্বপ্নে স্বাত্মায় ভাবান্তর গ্রহণ-বৎ তিনিও সেই হৃদয়স্থিত জগৎ হইতে অন্য ত্রিজগদ্‌ভাব গ্রহণপূর্ব্বক আপনা-আপনিই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বস্তুগত্যা তিনি নিরাকারই। সেই একই নিরাকার মন, নিজাবিদ্যায় পরাভূত হন—হইয়া 'অহ'-মাকারে দেহ-জগদাকারে অনন্তাত্মক হইয়া বোধাবোধরূপে অবস্থিত হন এবং নিজেই নিজাবস্থান অনুভব করিতে থাকেন। এ সংসারে না পৃথ্ব্যাদি, না দেহাদি, না দৃশ্যভাব কিছুই নাই, কেবল আছে সেই একই শূন্যস্বরূপ মন এবং সেই মনই জগৎস্বরূপে দেদীপ্যমান। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিবে, এ সকল কিছুই নাই। কেবল এক মাত্র আতঘন চিন্মাত্রই আছেন। তিনিই আত্মায় আপনাপনি প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছেন এবং হইয়াই রহিয়াছেন। যদি অবাঙ্মনসগোচর আনন্দ লাভ করা যায়, তবে অবশেষে একমাত্র নিশ্চলতাই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যখন ব্যবহারকাল উপস্থিত হয়, তখন ঐ নিশ্চলতা তাহারই ন্যায় শূন্যরূপে মূকবৎ বিদ্যমান থাকে। যাহা অনন্ত পার পর্য্যন্ত-বর্জ্জিত চিন্মাত্ররূপ পরম প্রেমাস্পদ, সেই নিরতিশয় আনন্দঘনতা, আপনা হইতেই হইয়া

থাকে। অপিচ উক্ত প্রবুদ্ধ পুরুষপ্রবরই কারণ বিনা নিভৃতে নীরবে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচৈতন্য অবিদ্যাবৃত হইয়া অজ্ঞানের বশে যেমন দ্রবজলাদি ভাব উপগত হন—হইয়া আবর্ত্তাদি বিকল্প করিয়া থাকেন, তেমনি সেই ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের বশে জড়চিত্ত বুদ্ধ্যাদি উদ্ভাবন করেন। স্পন্দন যেমন পবনরূপী আত্মা হইতে অপৃথক্, তেমনি চিদাভাসরূপ জীবনিবহও, প্রত্যক্‌রূপী পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

হে জ্ঞানিপ্রবর! জানিবে—চিদ্‌ব্যোম, ব্রহ্ম, চিন্মাত্র, আত্মা, চিতি, মহান্ ও পরমাত্মা, এই যে সকল ব্রহ্মপর্য্যায়, এ সকল জীবেরও পর্য্যায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্ম নয়নবৎ উন্মেষনিমেষাত্মক কিম্বা বায়ুবৎ স্পন্দা-স্পন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের যেমন প্রলয়াত্মক নিমেষ, তেমনি তাঁহার সৃষ্ট্যাত্মক উন্মেষ। এই উন্মেষই জগৎ বলিয়া বিদিত। অতএব দৃশ্যই তাঁহার উন্মেষ এবং দৃশ্যাভাবই নিমেষ। যেমন নিমেষেও যে চক্ষুর্গোলক এবং উন্মেষেও সেই চক্ষুর্গোলক থাকে, তেমনি যখন এই উন্মেষ নিমেষের ক্ষয় হয়, তখন একমাত্র সেই নিরাকার ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং নিমেষ এবং উন্মেষের একইমাত্র পরমরূপ। দৃশ্যের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের চিতি হইতেই স্ফুরণ হয়; তাই এই দৃশ্য সদসদাত্মক। কিন্তু যাহা চিতি, তাহা সর্ব্বদাই একরূপে অবস্থিতা। নিমেষোন্মেষরূপ সৃষ্টিদেহাত্মক ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আর সেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া নিমেষ উন্মেষ হইতে অভিন্ন; উন্মেষও নিমেষ হইতে অভিন্ন। তাই বলিতেছি, এই যে যথাস্থিত জগৎ, ইহা সম্পূর্ণ শান্তরূপই। ইহার না আছে জন্ম, না আছে জরা; কিছুই নাই। ইহা আকাশের ন্যায় সৌম্য এবং ইহা নিমেষোন্মেষ সামান্য প্রতিভাসমান একরস। আকাশ যেমন স্বস্বরূপাধ্যস্ত নীলরূপে ভাসমান হয়, তেমনি ব্যোমাকৃতিচিৎও অচিদাত্মকবৎ দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। সেই যে চিৎ, তাহাই এই জগদাখ্যায় প্রথিত। অতএব এই যে জগৎ, ইহা সেই চিৎস্বরূপেরই অবয়ব। উহার না আছে নাশ, না আছে উদ্ভব; অথবা এই দৃশ্যানুভবও নাই। সেই একমাত্র চিৎই অন্তরে আপনা হইতে চমৎকৃত হইতেছেন। ভানুকিরণের উষ্ণতা যেমন তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তেমনি এই যে দৃশ্যাত্মক মহাচিৎ-স্বরূপ মণির দীপ্তি

ইহা নিদ্রাকারমণি হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহা সুষুপ্তি, তাহাই স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান হইয়া থাকে। এইরূপে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সমস্তই সেই এক শান্তস্বরূপ; সেই একই বস্তু নানাবৎ স্ফুরিত রহিয়াছেন। সৎ কিম্বা অসৎ যাহাই যখন চিৎ-প্রকাশ্য হয়, তাহাই চিদাভাস অনুভব করিয়া থাকে। জগজ্জড়তার অন্যথোপপত্তি দ্বারা তদনুগুণ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি যদি কল্পনা করা হয়, তবে স্বপ্ন-সংভাত প্রপঞ্চ প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবে না। তাই বলিতেছি, জগদ্ভাব ব্যতীত আত্মার কিছুতেই অন্যরূপে উপপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। প্রমাতীত পরস্বরূপ হইতেই এই বিশ্ব যখন ভিন্নভাবে সমুদিত হইতেছে, তখন ইহা প্রমাতীতই এবং ইহা তখন কিছুতেই সমুদিত নহে। যে রসে যাহার চিত্ত আপ্লুত থাকে, তাহার সেই বস্তু সেই ভাবই উপগত হইয়া থাকে। এক মাত্র ব্রহ্মরসে যে চিৎ রসিক হইয়াছে, সেই চিত্ত সাকল্যেই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। লোকে যে কারণ তদ্গতচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ হয়, তাহাকেই সে বস্তু বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে এবং তাহাকেই সম্যক্ বিদিত হয়। যে মনের ব্রহ্মৈকরসতা সমুৎপন্ন হইতে পারে, সেই মন ক্ষণাভ্যন্তরে সেই ব্রহ্ম হইয়াই পড়ে। কেন না, যদীয় চিত্ত যেরূপ রসের রসিক হইয়া উঠে, তাহার সে চিত্ত তদ্বস্তুকেই সৎ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সুদৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা যাহার চিত্ত যে বস্তুতে উপনীত ও বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সেই যে বস্তু, তাহাই পরমার্থ সৎ হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলিতেছি,—ব্রহ্মজ্ঞ নাস্তিক লোক নিজ নিশ্চয়ের অতিরিক্ত যে যজ্ঞ-দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা কেবল লোকরক্ষার্থ ব্যবহার-নির্ব্বাহ নিমিত্ত যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়াই করিয়া থাকে। এই মদুল্লিখিত উপায় দ্বারা জগৎকে যদি সম্যক্‌রূপে পরিদর্শন করা যায়, তবে আর এ জগতের দ্বিত্ব একত্ব কল্পনা কিছুই থাকে না। অদৃশ্য, দৃশ্য, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, সৎ, অসৎ, এইরূপই যাহাদের জ্ঞান, এ জগতে তাহাদের কর্ত্তা ভোক্তা জীব কুত্রাপি কেহই নাই। নাই—এ কথাও ঠিক বলা যায় না; কেন না, কর্ত্তাই বল আর ভোক্তাই বল, সবই তো সেই ব্রহ্ম। ঐ যে সেই আদ্যন্ত-

বিরহিত ব্রহ্ম, তিনিই তো নিজাত্মায় এবম্বিধ জগৎ পর্য্যায় গ্রহণপূর্ব্বক বিরাজমান। যেমন অজ্ঞ পথিকের ঘোর সংদেহ বিষয়ে পথিমধ্যে স্থাণুর অবস্থান হয়, তেমনি সেই এক ঘন শান্ত ব্রহ্মই ঐ স্থাণুবৎ আত্মায় বিদ্যমান। যাহা বুদ্ধিসমষ্টি হিরণ্যগর্ভাদি জগৎ, তাহাই নিরঞ্জন ব্রহ্ম; আর জানিবে—যাহা গগন, তাহাই শান্ত শূন্য। যেমন নভোমণ্ডলে কেশোণ্ড্রকাদি সদ-সদাত্মকভাবে বিরাজমান, তেমনি সেই যে পরস্বরূপ, তাহাতেই বুদ্ধি-আদি দ্বৈতভাব উপগত হইয়া প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছে। আকাশে যেমন শূন্যতা, তেমনি সেই যে সর্ব্বসামান্যাত্মক ব্রহ্ম, তাঁহাতে বুদ্ধ্যাদি, বেদনাদি ও ঘটপটাদির অভাবসমষ্টি বহু হইলেও অনন্যভাবে বিরাজমান। যখন একমাত্র নিদ্রাত্মা ব্যক্তি সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নদশায় উপনীত হয়, তখন সে স্বপ্নাবস্থ হইলেও তাহার যেমন দ্বিত্ব ঘটনা হয় না, অথচ একত্বও তিষ্ঠিতে পারে না, ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেইরূপই অবগত হইতে হইবে।

হে রাঘব! এইরূপে এই মহাচিতের অবিদ্যা প্রকাশমান হয়, অথচ কিছুই প্রকাশ পায় না। এই মহাচিৎ-কান্তি সর্ব্বদা একই বিমল-ভাবে অবস্থিত। চিদাকাশে নিজ নির্ম্মল নিশ্চল চিদাকাশই স্বপ্নবৎ যথাস্থিত এবং চেত্য দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান। যাহারা সদ্ব্রবাদী, তাহাদিগেরও যখন সদ্বস্তু ছাড়া অতিরিক্ত বস্তুর উপপত্তি বিধানে সাধ্য নাই, আর সত্য-পদার্থেরও যখন কারণাভাব, তখন চিদাকাশ আপনা হইতেই আপনাকে সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই যে শূন্যাত্মা, তিনিই সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন। বাস্তব পক্ষে উহা কিন্তু নিরাকার; সেই যে ভান স্বপ্নসঙ্কল্প, উহা মিথ্যাজ্ঞানাদিবৎ সর্ব্বথা সম্যক্ ভ্রমমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। সেই যে দৃশ্য স্বপ্নপ্রায় সর্ব্বধর্ম্মশূন্য চিদ্ব্যোম, উহাই বটে কারণ; তাহাতে অল্পমাত্র ধর্ম্মও অবিদ্যমান। চিদাকাশ স্বপ্নপুরবৎ প্রতীতি-ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও তাহার সর্ব্বধর্ম্মাভাব; অথচ তাহার অধিষ্ঠান যখন সন্মাত্র, তখন অনন্যার্থ সৎস্বরূপ হইতে তাহার ভেদ নাই। কেবল অজ্ঞ দর্শনে এই জগদাকারে নিয়ত ইহা অবস্থিত। এই যে দৃশ্যস্বপ্ন, ইহা স্বচ্ছ শূন্যস্বরূপ। নিজের অধিষ্ঠান হইতে ইহা স্বল্পমাত্রও বিভিন্ন

হইবার নহে। সুতরাং এক চিদাকাশ মাত্রে পরিশিষ্ট ভূতাকাশ হইতে অতি সূক্ষ্মতাই সুসিদ্ধ। যিনি সর্ব্বরূপ-বিরহিত, তিনি সর্গ বা সৃষ্টিরূপে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বরূপ-বিরহিত ভাবেই বিরাজিত। অথবা সেই পরম ব্রহ্মবস্তু তথাবিধ সর্ব্বরূপ-বর্জ্জিতভাবেই এই সৃষ্টির আকারে স্থিত। তুমি এ কথাও অবশ্য বলিতে পার না যে, প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য অনুসারে স্বপ্নদশাতেই জীব সত্য নগরাদি বিরচন করুন না কেন? ঐ কথা না বলার প্রতি কারণ এই যে, স্বপ্নে যে সকল পুর প্রভৃতির অনুভূতি হয়, তাহাতে আত্মাই ঐ স্বপ্নযোগে পুরাদিরূপে প্রতিভান প্রাপ্ত হন। সুতরাং সে কালে সৎ পুরাদির বিরচন ঐ আত্মা দ্বারা কৃত হয় না। শ্রুতি সূত্র বিশেষ দ্বারা স্বপ্নে সৃষ্টির প্রতিষেধই করা হইয়াছে এবং মায়ামাত্রত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে সকল অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান, তাহা দ্বারাও ঐ সেই দেবদত্ত, এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মদ্‌গৃহ, ইত্যাদি স্বপ্ন পদার্থ সত্য হইতে পারে না। কারণ এই যে,—'ইহাই সেই' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞান-বিষয়ীভূত অর্থ উক্ত স্বপ্নাবস্থায় একান্তই অসম্ভবপর বলিয়া তৎকালে হৃদয়, কণ্ঠ ও নাড়ী-ছিদ্রাদিতে প্রত্যভিজ্ঞানও অসম্ভব, অপিচ তৎপদার্থের অসম্ভবতায় তদ্‌গোচরীভূত সংস্কার স্মৃতিরও অসম্ভবতা, তাহাও বিস্পষ্ট-ভাবে বোধ হইতেছে। অতএব স্বপ্নকালে প্রত্যভিজ্ঞান, সংস্কার বা স্মরণ কাহারও অস্তিত্ব নাই; সমস্তই অসম্ভব ব্যাপার। যেহেতু অসম্ভব, সেই হেতুই সিদ্ধ স্মৃত্যাদিত্রয় পরিহারান্তে নিদ্রাদোষবশে ব্রহ্মসম্বিত্তির যে অন্যথাভান হয়, তাহারই জাগ্রদবস্থাবলোকিত অর্থসহ সাদৃশ্য ও অনুভব ব্যবহারাভ্যাসবৎ স্মৃতি প্রভৃতি সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া মূঢ়গণ স্মৃত্যাদি ভাবের আরোপ করিয়াছে এবং করে। যে জলে যেরূপ তরঙ্গের উদয় হয়, সে জলে সেইরূপই পুনঃপুন হইয়া থাকে; ফলে সাদৃশ্য-হেতু 'এই সেই তরঙ্গ' এই এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান-ভ্রম লোকসমাজে প্রথিত আছে বটে, বস্তুতঃ ঐ তরঙ্গ অধিষ্ঠান জল হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ নহে। সর্গা-দিতে যে ঐ পরম চিদাকাশ ও জগৎরূপ কল্পনা, তাহা উক্ত প্রকারই অবগত হইবে। কল্পনা বিষয়ে উহার ভেদ আছে বটে, কিন্তু কল্পনার অধিষ্ঠান যে চিদাকাশ বিষয়, তাহা ভিন্ন নহে। 'সদাধার পৃথিবীম্' এবং

'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি জগৎবিধি ও জগৎপ্রতিষেধ সকলই সর্ব্বদা কল্পনামাত্র বশেই ঐ পরব্রহ্মে বিভিন্ন হইয়াও মিলিতভাবে অবিরোধে অবস্থিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, উক্ত সৎব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ; কেন না, তাঁহাতে কিসেরই বা না বিদ্যমানতা আছে? ফলে সকলই তাঁহাতে বিদ্যমান। সেই যে ব্রহ্মসত্তা, তাহাই সর্ব্বাত্মিকা; সুতরাং সর্ব্ব বস্তুই সৎ ও সর্ব্বাত্মক। বালক ক্রীড়ার নিমিত্ত ভ্রমণ করে; তাহার নিকট যেমন নগ-নদীশৈলাদি সমস্ত বস্তুর সহিতই পৃথিবী ঘুরিতে থাকে, পরন্তু অন্যের চক্ষে পৃথিবীর সন্নিবেশ যেমন তেমনি রহিয়া যায়, পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সেরূপ বোধ হয় না, অপিচ ভ্রমণে পৃথিবী সত্য সত্যই ঘুরে না, বালকের ইহা জানা থাকিলেও তাহার যেমন সেই পূর্ব্বাভ্যাস বিহনে পৃথিবীর সেই ভ্রমণ দর্শন ঘুচে না, জানিবে—জগদ্‌ভ্রান্তি দর্শনও ঐরূপই। এই দৃশ্যভ্রমে কোন্ অভ্যাস অবলম্বন করা বিধেয়, তাহা বলা যাইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর সেবা করিবে, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে, তিনি যাহাতে বাধ্য হন, তাহা করিবে। এই সকল করিয়া পরে তাঁহার দ্বারা মোক্ষোপায়-ভূত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাইবে। গুরুকৃত সেই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে যে একটা অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইবে, তাদৃশ অভ্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অভ্যাসই দৃশ্য ভ্রমশান্তির যোগ্য হইতে পারে না, বা হয় নাই। যোগশাস্ত্রে যে চিত্ত নিরোধের কথা প্রসিদ্ধ আছে, দৃশ্যের অদর্শন-রূপ ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে ঐ চিত্তনিরোধই প্রশস্ত উপায়। যদি বল, যোগশাস্ত্র সত্ত্বে এই শাস্ত্রাভ্যাসে ফল কি? তদুত্তরে বলি যে, ওরূপ বলা সঙ্গত নহে। কেন না, যোগানুশাসন দ্বারা চিত্তের নিরোধ হইতে পারে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু সেই চিত্ত সংসার হইতে অপৃথক্ থাকে বলিয়াই জাগ্রৎ-স্বপ্নে জীবিত বা মৃত যাহাই থাকুক, তাহা সযত্নে রোধ করিতে গেলেও রুদ্ধ হয় না। এই শাস্ত্রের অভ্যাস হইতে যে একটা বোধের উদ্রেক হয়, তাহাতে বাধিত হইয়া গেলে, এ সংসার আর দৃগ্‌বিষয়ীভূত হয় না। তাই বলিতেছি, এই শাস্ত্রাভ্যাসই দৃশ্য শান্তির অদ্বিতীয় উপায়। এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভে যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না ঘটে, যদি এ বোধ সম্যক্ সমুদিত হয়, তবে ইহ জন্মেই তত্ত্ববোধের প্রভাবে এই দৃশ্যদেহ

প্রশান্ত হইয়া যায়। আর প্রতিবাদ সত্ত্বে জন্মান্তরে প্রতিবাদক্ষয়ে বোধবিকাশ দ্বারা প্রশান্ত হয়। পবনের স্পন্দন এবং তৎপ্রেরিত মেঘ যেমন তৎপ্রযোজক শুক্রের উদায়াস্তরূপ কারণের অভাবে নিরস্ত হয়, তেমনি চিত্ত, দৃশ্য ও দেহ, এই তিনটীই বোধোদয়ে প্রশান্ত হইয়া থাকে। ঐ যে চিত্তাদিত্রয়, উহার কারণ অবিদ্যাই। অতএব এই শাস্ত্রচর্চ্চায় কিঞ্চিন্মাত্রও বুদ্ধি, সংস্কার যাহাদের জন্মিয়াছে বা জন্মে, উক্ত চিত্তাদির মূল অবিদ্যার নাশ তাহাদেরই হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রের বাচন-শ্রবণ হইতে যদি বিরাম না ঘটে, তবে বাচনমাত্রেই পদ পদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। অপিচ ইহার উত্তর গ্রন্থ হইতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ বোধগম্য হয়। এতাবতা জানিবে—ভ্রম-নাশ বিষয়ে এই শাস্ত্রই অদ্বিতীয় উপায়। ইহার সমকক্ষ শাস্ত্র প্রায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই মহাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ দুই ভাগ বা অর্দ্ধাংশ যথাসাধ্য বিচার করিয়া দেখিবে। এই রূপ বিচারে দুঃখক্ষয় অনিবার্য্য। এই গ্রন্থ ঋষি-প্রণীত; সুতরাং ইহার মূলীভূত যে শ্রুতি, তাহাই বিচার্য্য। যদি প্রমাদবশে এই বুদ্ধিতে এই শাস্ত্র অভিমত না হয়, তবে অন্যান্য শ্রুতি উপনিষদ্‌ভাষ্যাদি রূপ কেবল আত্ম-জ্ঞানমাত্রেরই বিচার করিবে। অবশ্য এই কার্য্য লইয়াই যে যাবজ্জীবন কাটাইবে, এমন আগ্রহ কিছুই নাই। তবে কথা এই যে, আত্মশাস্ত্র হইতে বিমুখ হইয়া রহিবে না। কতকগুলি অনর্থ-পরম্পরার বিচার করিয়া নিজের পরমায়ু বৃথাক্ষেপ করিও না। শ্রবণাদি উপায় বা জ্ঞানসার তত্ত্ব বোধ দ্বারা নিখিল দৃশ্যই বাধমুখে আত্মসাৎ করিয়া লইবে। যদি রাশি রাশি স্বর্ণের সহিত নিখিল রত্ন প্রদান করা যায়, তাহা হইলেও ক্ষণমাত্র আয়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এমন আয়ুষ্কাল যে বৃথা কাটাইয়া দেয়, তাহার বিষম প্রমাদ নিশ্চিতই। এই দৃশ্যনিচয় প্রত্যক্ষতঃ অনুভূতিগোচর এবং অন্তঃকরণোপহিত জীবসমন্বিত রহিলেও স্বপ্নাবস্থায় দৈবাৎ অবলোকিত নিজের মৃত্যুতে চতুর্দ্দিক্ হইতে বান্ধবগণের রোদনবৎ সৎরূপে পরিস্ফুরিত হইতে থাকিলেও এ সমস্ত মিথ্যা সৎ নহে।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন—ভগবন্‌! দৃশ্য অসৎ, তাই দৃশ্যবাধে যে চিন্মাত্র পরিশেষ, তাহাই হইল পুরুষার্থ। এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান নিখিল সমূল দৃশ্য জগৎই বন্ধনের হেতু হইতে পারে, সুতরাং তন্মার্জ্জনই সমুচিত হয়। পরন্তু অপ্রতীয়মান অতীতানাগত জগৎপরম্পরা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না; ঐরূপ অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান আছে। সেই সকল অতীতানাগত জগতের কথা উত্থাপন করিয়া কেন আমায় প্রবোধ প্রদান করিতেছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছ, তাহার নিষ্কর্ষ এই যে, বর্ত্তমান দৃশ্যই উপন্যস্ত হইবার যোগ্য; পরন্তু অতীত বা ভবিষ্যৎ এখানে উল্লেখনযোগ্য নহে। কিন্তু তোমার এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। দেখ, পদপদার্থ-সম্বন্ধ ব্যপ্তিগ্রহ ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধি প্রভৃতি অতীত ব্যবহারেরই অধীন; কাজেই অতীতোল্লেখ যদি না করা হয়, তবে বিচারাত্মক শাস্ত্র-প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। সুতরাং অতীতানাগত ব্রহ্মাণ্ড ও বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড শব্দার্থ-সম্বন্ধ-গ্রহাদিতে অনুপযোগী বলিয়া উপন্যস্ত হইবার অযোগ্য; এই বলিয়া যদি অতীতানাগতের উল্লেখ বিষয়েঁ ব্যর্থতার আপত্তি উত্থাপন কর, তবে এই শাস্ত্র শ্রবণাধিকারীর তাহা বলা ব্যর্থ হইয়া যায় না কি! ব্যর্থ হয় হউক; পরন্তু শব্দার্থের যখন বাচ্য-বাচকভাব নিশ্চিত হয়, তবে ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে; তদিতর নহে। যদি কেবল লৌকিক বুদ্ধি লইয়া আলোচনা করা হয়, তবে তোমার আপত্তি অযথার্থ হয় না। যখন তুমি বিদিত-বেদ্য হইবে, ত্রিকালমল দেখিবে, তখন তোমারও সেই সকল দৃষ্টিগোচর হইবে। কি অতীত কি অনাগত, সর্ব্ব জগদাদিতেই চিন্মাত্রই স্বয়ং স্বপ্নের ন্যায় জগদাকারে প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন। তাহাতে এই অংশমাত্রই উপযোগী; তদ্‌ব্যতীত প্রকৃতোপযোগিরূপে অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কেন? শূন্যস্বরূপ প্রতি অণুতে অণুতে সংখ্যা-তীত জগৎ বিদ্যমান; তাহাদের যত কিছু ব্যবহার, তাহার সংখ্যা করিতে

পারে কে ? আমার পিতা পদ্মপরাগ-রঞ্জিত পদ্মযোনি ; আমি এ বিষয় তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিতেছি, শুন।

পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রহ্মার সমীপে আমি জিজ্ঞাসিয়াছিলাম,—পিতঃ! এই জগৎপুঞ্জ কিয়ৎপরিমাণ-বিশিষ্ট এবং কোথায়ই বা ইহা প্রতিভাত ? তাহা আমার নিকট পরিব্যক্ত করুন। তখন পিতৃদেব ব্রহ্মা আমায় বলিলেন,—বৎস! একমাত্র ব্রহ্মাই নিখিল জগৎরূপে অবভাসমান রহিয়াছেন। এই জগৎপরম্পরা যদিও অসৎ, তথাচ সেই সৎস্বরূপের সত্তামাত্রে ইহা অনন্ত ; ইহার দুই আখ্যা,—এক ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড, অপর ব্রহ্মাণ্ড। আকাশে শূন্যরূপ ও অনিলে শুদ্ধ স্পন্দনবৎ চিদাকাশে সেই চিদাকাশ হইতে অপৃথক্‌রূপী চিদ্ব্যোম-পরমাণু বিদ্যমান। আকাশ যেমন বস্তুভূত হইয়াও আত্মাকে অসৎ শূন্যরূপে অবলোকন করে এবং বায়ুর সাহায্যে নিজেকে যেমন স্পন্দনরূপে দেখে; তেমনি সেই যে চিদ্ব্যোম-পরমাণু, তিনি স্বতত্ত্বের অদর্শনরূপ নিদ্রার আবেশে স্বপ্নবৎ আত্মায় সমষ্টি জীবভাব দর্শন করেন। উহা পরিণামী নহে, উহা অসঙ্গতা অবিকারিতা প্রভৃতি স্বভাব ত্যাগ না করিয়াই জীবসমষ্টিভাবাবস্থায় 'আমি জীব' এইরূপে নভোনিভ নিজরূপ অবলোকন করিয়া থাকেন।—ঐ 'অহঙ্কারস্বরূপ অহং' জীব আত্মায় 'বুদ্ধি'রূপ দেখেন। ঐ বুদ্ধি এক-নিশ্চয়-নির্ম্মাণময়ী হইয়া অসদর্থ ভ্রম-দাতৃত্ব হেতু মায়ানুধাবিনী হয়। তৎপশ্চাৎ ঐ বুদ্ধি বিকল্পাভাসের আরোপণপূর্ব্বক নিজেই নিজ অবিকল্প আত্মায় উপনীত করিয়া 'অহং মনঃ' এই অসন্ময় রূপ স্বপ্নে সন্দর্শন করেন। অনন্তর ঐ মন স্বপ্নে ঐরূপ নিরাকার অথচ ঘনাকার পঞ্চেন্দ্রিয় অবলোকন করিয়া থাকে। এই প্রকারে সেই চিদ্ব্যোম পরমাণু মনোদেহসমষ্ট্যাত্মক হইয়া স্বয়ং শূন্যাত্মা হইলেও স্বীয় শূন্য ত্রিভুবনাত্মক বিরাট দেহ দেখিলেন। দেখিলেন,—তাহাতে বহুভূত বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান। নানাবিধ চরাচর তাহাতে কৃতাধিষ্ঠান। উহা কল্পনাকাল-কলিত এবং উহাতে অপরাপর জঙ্গম জীবও কল্পিত। উক্ত বিরাট-দেহ-স্থিত সমষ্টিজীব স্বপ্নে ব্যষ্টিজীব হইয়া স্বপ্নবৎ সেই বিরাট শরীরেরই মুকুরপ্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিত দ্রষ্টা, দৃশ্য, দৃষ্টি, ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই নবধা

ত্রিপুটীরঙ্গ-শোভন ত্রৈলোক্য-নগর স্বপ্নের ন্যায় সন্দর্শন করিতে থাকেন। অতঃপর এই বহির্জগতে প্রত্যেকেই উক্ত নবরঙ্গসুন্দর ত্রিজগৎ দর্পণ-প্রতিবিম্ববৎ স্বস্ব হৃদয়ে বিদিত হইয়া থাকে। এইরূপে কল্পিত এই বিশাল বিশ্ব সকল বিরাজ করিতেছে। ঐ জীবসমষ্টি পৃথ্ব্যাদি ঘন দ্বারা ঘনবৎ প্রতীয়মান। স্বতত্ত্বের অজ্ঞানলক্ষণা অবিদ্যাই এই সকলরূপে বিভাত, অবিদ্যা হইতেই এই সমস্ত চেতিত। উহা জ্ঞানে নিবারিত হইয়া ব্রহ্মত্বে যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন সুনির্ম্মল ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্মত্বে সমবলোকিত হইলে, জগৎ স্বপ্নপরম্পরার দ্রষ্টাও অকিঞ্চিৎ এইরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এ জগতে তৎকালে কে দ্রষ্টা, কোথাই বা দৃশ্য, কোথায় দ্বৈত, আর কোথাই বা কারণ? এইরূপই সমাধান হয়। অতএব এই যে দৃশ্যপরম্পরা প্রতিভাত হইতেছে, ইহা শান্তস্বরূপ, ভিত্তিহীন ও শূন্যাত্মক। উহা একই মাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম-স্বরূপে বিরাজিত। কাজেই সমস্তই স্বচ্ছ এবং সমস্তই আদি-অন্ত-বিরহিত। অপ্রতিহতগতি তরঙ্গরাশির সবেগ ধাবনে সমুদ্রের সলিলরাশি যখন চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন তাহার পরমাণু সমষ্টি সংখ্যাবর্জ্জিত হইয়া থাকে। এইরূপে পরমাত্মায় যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্ববর্ণিতরূপে থাকে এবং রহিয়াছে। উহারা অনন্য হইয়াও অন্যবৎ অবস্থিতি করে।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এই জগৎ যদি স্বপ্ন সঙ্কল্পাদিবৎ কারণ বিনাই সেই পরম পদ ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, তবে শস্য ধান্যাদি অন্যান্য যে সকল বস্তু আছে, তাহা কৃষীবলদিগের কর্ষণ বীজ বপনাদি কারণ বিনা উৎপন্ন হয় না কেন? সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সকল বস্তু নাই বা হউক, কোথাও কোন বস্তু কোন কালে উৎপন্ন না হইবার প্রতিবন্ধক হয় কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এ জগতের সত্যতা প্রতিপাদনে তত্ত্বজ্ঞানের বৈয়র্থ্য-বিধায়ক শ্রুতিবিরুদ্ধ পরমাণু প্রভৃতি কারণ কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, এ স্থানে আমি তাঁহাদিগেরই মত নিরাস করিতেছি। দেখ, অনাদি ব্যবহার বিষয়ে দৃঢ়াধ্যাস দ্বারা যে যাহা যাদৃশরূপে কল্পনা করে, তাহার তাদৃশ কার্য্যকারণ-ভাবই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং কল্পনা-কারীর বুদ্ধি অনুসারে যে বস্তু যেরূপে ব্যবস্থিত হয়, তাহা সেইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। এই দৃশ্যসকল তাহাতেই যেরূপে মনের কল্পিত হয়, তদনুরূপই জ্ঞাত হওয়া যায়। অপিচ অন্যের কল্পনাতেও যেরূপ হয়, সেও সেইরূপই অবগত হইয়া থাকে। চেতন পুরুষের কেশ-নখাদি অচেতন-ঘটিত প্রতীতিগম্যতার ন্যায় এই জগতেরও কল্পনা ও অকল্পনা এই উভয় ঘটিতাত্মকতা প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে যাহা অচিদংশ, তাহাই কল্পনাত্মক আর যাহা চিদংশ, তাহাই অকল্পনাত্মক; অপিচ যাহা কল্পনাত্মক, তাহা কেবল ব্রহ্মস্বভাব বশতই হইয়া থাকে; সুতরাং যিনি বস্তু-তত্ত্বদর্শী, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহার অকারণ-পদার্থতা হয় আর যিনি কল্পনাদর্শী, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহার সকারণ-পদার্থতা হইয়া থাকে। এই প্রকারে সর্ব্বশক্ত্যাত্মকতা নিবন্ধন উক্ত উভয়ই অবিরোধে ব্রহ্মে বিদ্যমান। ব্রহ্মের যদি উভয়াত্মকতাই সিদ্ধ হইল, তবে আর আমি কিজন্য অকারণ-পক্ষেরই সমর্থন করি? এইরূপ একটা আপত্তি তোমার হইতে পারে। তৎপক্ষে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে কদাচিৎ অন্য যে কিছু কচিৎ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ বিকল্পনমাত্রই; তাহাতেই ব্রহ্ম হইতে তদুৎপত্তির সম্ভাবনা করা হয়। পরন্তু এই জগদাদি নানা-ত্মক বস্তু সকল যাহাতে অনন্তরূপে ভাসমান, যিনি নানা অথচ অনানাত্মক, সেই অনাদ্যনন্ত শান্ত একাত্মক ব্রহ্মে অন্য আর কে কারণ হইতে পারে? যদি যথাযথরূপে দেখা যায়, তবে বুঝা যাইবে, এ জগতে কিছুই প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তিনি ব্যোমাত্মক, অনাদি-নিধন। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন উক্ত অকারণত্বপক্ষই মৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে আর কি কাহার কারণ হয় এবং কোথায়ই বা কোন্ বস্তু কাহার দ্বারা উৎপাদিত

হইয়া থাকে? আর যদি কল্পনার চক্ষে দেখা যায়, তবে কিই বা কারণ নয়, আর কোথায় কোন্ বস্তুই বা না কাহার দ্বারা উৎপাদিত হয়? এ জগতে শূন্য বা অশূন্য কিছুই নাই; কোন কিছু সৎও নাই, অসৎও নহে। সমস্তই শূন্যাশূন্য; শূন্য অশূন্য এই উভয়বিধতা নিবন্ধন সকলই মহাশূন্য-স্বরূপ। দেখ, অভাবের অভাব, তদভাব, তাহারও অভাব, সমস্তই শূন্য। ফলে কিছুই হউক, না হউক, থাকুক, আর না থাকুক, সমস্তই ব্রহ্মমাত্র! কেন না, ব্রহ্ম বস্তু অধ্যারোপক্রমে সর্ব্বানুগত আর অপবাদক্রমে নিখিল দৃশ্যাদি হইতে ব্যপেত; অতএব সমস্তই সেই ব্রহ্মমাত্র।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! অতত্ত্বজ্ঞকে বলিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ যেমন অধ্যারোপ ও অপবাদ অঙ্গীকার করেন, তেমনি প্রধান পরমাণু প্রভৃতি বশতঃ কার্য্য-কারণ সম্ভাবনা কেন না অঙ্গীকার করিয়া থাকেন? অতএব পৃথ্ব্যাদি কার্য্য এবং তদবয়বের পরপর সূক্ষ্মতা অবধিস্বরূপ পরমাণু ও সত্ত্বাদিগুণরূপ কারণের সম্ভাবনা যদি হয়, তবে কি প্রকারে অন্য দ্রব্য কারণবিরহিত হইতে পারে? আর কি প্রকারেই বা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত অতত্ত্বজ্ঞ থাকিত, আর সেই অতত্ত্বজ্ঞ প্রধান পরমাণু প্রভৃতির কল্পনাকারী হইত, তবেই এইরূপ হইতে পারিত; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার নিকট অতত্ত্বজ্ঞের নামই অপ্রসিদ্ধ; যাহার অস্তিত্বের অভাব, তাদৃশ আকাশপাদপের আর বিচারালোচনা কিরূপ হইতে পারে বল দেখি? তত্ত্বজ্ঞগণ বোধময় শান্ত, বিজ্ঞান ঘন-স্বরূপ; অতএব অসৎ স্বরূপার্থে তাঁহাদের আর বিচারালোচনা হইবে কিরূপে? তোমার আশঙ্কা হইতে পারে যে, তার্কিক ও পামরেরা তো 'আমি ব্রহ্ম নহি বা আমি ব্রহ্মজ্ঞ নহি' এইরূপে অতত্ত্বজ্ঞত্ব ব্রহ্মত্বের প্রত্যক্ষানুভব করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত অতত্ত্বজ্ঞ নাই; ইহা কিরূপে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে? কিন্তু এরূপ আশঙ্কা যদি তোমার উপস্থিত হয়, তবে তাহার নিরাসার্থ বলি, যেমন 'স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নিদ্রার অঙ্গস্বরূপতা প্রাপ্ত কেবল নিদ্রামাত্রেই; উহাদের যেমন নিদ্রাতিরিক্ত স্বরূপ কিছুই নাই, তেমনি যদি বোধপূর্ব্বক বিচার করা যায়, তবে

অতত্ত্বজ্ঞ ও অন্তরে সেই ব্রহ্মাঙ্গত্বরূপেই প্রতিভাসমান হয়। যিনি এইরূপ অনুভব করেন যে, আমি অজ্ঞ, তথাবিধ তার্কিক আত্মাতেও ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত। কেন না, অজ্ঞতা প্রবোধরূপ আত্মাতেই অবগম্য; ইত্যাদি অনুভব-প্রভাবে ব্রহ্মত্ব অক্ষুণ্ণ। অপিচ অবলোকন কর, জ্ঞান-স্বভাব আত্মায় স্বভাববিরুদ্ধ অজ্ঞান অনারোপক্রমে হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রকারে জগদারোপের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মত্বের সিদ্ধি এইরূপ অনুভবেই হয়। এই নিমিত্ত অজ্ঞানাদি অখিল জগদারোপের অধিষ্ঠান চিন্মাত্রত্বই ব্রহ্মলক্ষণ, অপিচ জ্ঞানেই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধি আর অজ্ঞানে তো সকলেই অব্রহ্ম। এ কথাও তোমার বলিবার নহে; কেন না, মূর্খ জনের বোধ-জননার্থ মূর্খ-বুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত সর্ব্বাত্মতা প্রতিপাদনক্রমে তটস্থ লক্ষণরূপ মূর্খ নির্ণয় নির্দ্দেশ করিয়াছি। জানিবে—যাহা শুদ্ধ নিরাময় আনন্দৈকরসতা, তাহাই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। ইহা অজ্ঞদিগের অনুভূতির পথে উপগত হয় না। এ জগৎ অজ্ঞবুদ্ধির অনুসরণক্রমে কল্পিত; ইহার কারণ স্বীকার করিতে গেলে মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মায়াই কারণ হইয়া দাঁড়ায়, আর সেই কারণতার স্বীকার করিলে বাস্তব অদ্বৈত-ভাবের কোন হানিই হয় না। এ জগতে কারণবিরহিত এবং কারণজাত অনেক ভাব বিদ্যমান। শুক্তি-রজত, মরু-নদী ও রজ্জু-সর্পাদিকে কারণ শূন্যভাব বলা যায়। ফল কথা, সম্বিৎ যে প্রকার কল্পিত হয়, সেইরূপই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সম্বিৎবশতঃ কারণজরূপে কল্পিতই সকারণভাব আর তদ্বিপরীতরূপে উক্ত হইলেই অকারণভাব হয়। যাঁহারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন; তাঁহাদের দৃষ্টিতে অখণ্ড অদ্বয় চিন্মাত্রই সদা বিদ্যমান। এতদ্বিপরীত ভাব অণুমাত্রও নাই। অতএব সর্ব্বকারণের নিবৃত্তি নিমিত্ত তাঁহাদের আর সৃষ্টি কারণ কিছুই নাই, অপিচ তাহা কেহ নিরূপণ করিতেও সক্ষম নহে। তাই বলিতেছি, সৃষ্টি কারণবর্জ্জিতই। বৈশেষিকাদি বিজ্ঞগণ এই মরু মরীচিকাদিপ্রতিম জগতের সত্যতা প্রতি-পাদনে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রুতিসিদ্ধ মায়োপহিত ব্রহ্মাতিরিক্ত তটস্থ ঈশ্বরপ্রধান পরমাণু প্রভৃতি কোন কারণ কল্পনা করেন। কিন্তু উহা শ্রুতিবিদ্‌গণের অনুভববিরুদ্ধ ও অযুক্তিসঙ্গত বলিয়া ব্যর্থ; কাজেই

অভিজ্ঞবর্গের উহা হৃদয়ঙ্গম নহে; উহাকে বৃথা কণ্ঠশোষী বাগ্‌জাল-মাত্রই বলা যায়। প্রবোধোদয় হইলে জগৎ বাধিত হয়; অন্যথা উপপত্তি কখনই হয় না। অতএব এ জগৎ স্বপ্নপ্রায়ই; স্বপ্নকল্পনা বিনা স্থূলাকারাত্মিকা কোন দৃশ্যতাই নাই। তাই বলিতেছি, এ নিমিত্ত কারণ কল্পনার আর অবকাশ বা প্রয়োজন কি আছে? চিৎস্বভাব ব্যতিরেকে স্বপ্নার্থ কীদৃশ? স্বপ্নের দেখা বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে অপরিজ্ঞাত থাকে, ততক্ষণ যেমন তাবৎ উহা মহামোহাতিশয্য বিস্তার করিয়া থাকে, আর যখন বাস্তবপক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আর উহা মোহের হেতু হয় না; এই যে সর্গ বা সৃষ্টি, ইহাও সেইরূপই জানিবে। অবিবেক-সংস্কৃত অভিনিবেশ দ্বারা যাহা কিছু অনুভববহির্ভূত কারণ কল্পিত হয়, তাহা কেবল মূর্খতার অভিধ্যানমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। অনলের উষ্ণতা, সলিলের শীততা ও নিখিল তেজঃপদার্থের প্রকাশশক্তি, এ সমুদায়ের কারণাপেক্ষা একান্ততঃই হইয়া থাকে। যিনি অজ্ঞানোপহিত আত্মা, তাঁহার অজ্ঞাত ব্রহ্মস্বভাবই কারণ; ইহা ভিন্ন কারণান্তর আর কি হইবার সম্ভাবনা? মনোরথ-কল্পিত নগরের ন্যায় ধ্যাতৃভেদে বিভিন্নাকারে ব্যবস্থিত একই ধ্যেয়বস্তুর সর্ব্বসাধারণ একই কারণ কিরূপেই বা হওয়া সম্ভবপর? দেখ, গন্ধর্ব্বনগরে, স্বপ্নপুরে বা ভিত্তি প্রভৃতিতে কাহারই বা কারণতা হইতে পারে? পরলোকে এই দেহাদির কারণ ধর্ম্মাদি হইতে পারে না। কেন না, সেই যে ধর্ম্মাদি, তাহাও অমূর্ত্ত; কোন মূর্ত্তদেহাদির কারণ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবে না। সুতরাং সর্গাদি ভোগকারী দেহের কারণ কি হইবে বল দেখি? অপিচ বিজ্ঞানবাদীদিগের মতসিদ্ধ যে ক্ষণিক বিজ্ঞান, তাহারও এই মূর্ত্ত দেহের কারণ হওয়া সম্ভবে না। যাহার অন্ত নাই, যাহা বারম্বার উৎপন্ন হইতেছে, ধ্বংস লাভ করিতেছে, তথাবিধ অক্ষণস্থায়ী অনন্ত বস্তুর প্রতি একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞান কারণ হইবে কি প্রকারে? এতাবতা নিখিল ভাব পদার্থ ও তৎকারণ সমস্তই অজ্ঞ সমীপে অকারণ ভ্রমমাত্রই; অপিচ ঐ সকল কর্ম্মজ্ঞানীর নিকট সন্মাত্রস্বরূপেই বিদ্যমান এবং উহা তাঁহাদের প্রান্তে সেই সন্মাত্র কারণবশেই চিচ্চমৎকাররূপে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে। সন্মাত্র ব্যতীত তাঁহাদের নিকট

অণুমাত্রও বিদ্যমান নাই। স্বপ্নে অনুভব করা গেল, তস্করে সম্পত্তি হরণ করিতেছে, বন্ধন করিতেছে, তাড়ন করিতেছে, কিন্তু যখন প্রবোধ জন্মিল, তখন যেমন ঐ সমুদায়ে অলীকতা উপলব্ধি হওয়ায় সে সকল আর ক্লেশজনক হয় না, তেমনি জ্ঞানীরও তত্ত্বদর্শন হইবার পর এ জীবন আর দুঃখাবহ হয় না। সর্গ বা সৃষ্টির আদিতে এই দৃশ্যাদি কিছুই প্রাদুর্ভূত হয় না। চিদ্‌ঘনই এই দৃশ্যাকারে স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন; সুতরাং ইহাতে কোন কিছুই দুঃখনিদান হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি বিনা অপর কোন যুক্তি দ্বারাই বাদিগণের কোন কল্পনাই উপপত্তিগর্ভরূপে পরিদৃষ্ট হয় না। তাই বলিতেছি, এই যে জগৎ-কলনার অনুভব, ইহা ব্রহ্মানুভব হইতেই প্রাদুর্ভূত। যেমন সাগরে তরঙ্গাবর্ত্তাদিরূপে শুদ্ধ জলমাত্রই ভাসমান, তেমনি ব্রহ্মই এই সর্গাদি নিখিলরূপে বিরাজমান। পূত পবনে যেমন স্পন্দ ও আবর্ত্ত-বিবর্ত্তাদি বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মপবনে এই সৃষ্টিস্পন্দ প্রতিভাসমান। অনন্ততা, ছিদ্রত্ব ও শূন্যত্বাদি যেমন মহাকাশে বিরাজমান, তেমনি ব্রহ্মচিদাকাশেও এই পরস্পর সর্গ আসন্ন বোধাত্মকরূপে প্রতিভাত। নিদ্রাদিতে যথাযথ উপলব্ধিগোচর হইলেও এই সকল স্বপ্নলব্ধ ভাব অসৎস্বরূপই; কেন না, উহা নিদ্রাভিন্নাত্মক নহে। জানিবে—সেই চিদ্‌ঘন সৌম্য আত্মাতেই সৃষ্টি-লয়-স্থিতি। লোকে যেমন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর উপগত হইয়া তদাত্মক অবস্থায় অবস্থান করে, তেমনি জন্মাদি-বর্জ্জিত পরমাত্মা আপনাপনিই এক সৃষ্টি হইতে অপরাপর সৃষ্টিতে তদাত্মকভাবে বিরাজ করেন। স্বপ্নানুভূতিক্রমে যাহা যদ্বিশিষ্ট নয়, তাহা যেমন তদ্বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়, তেমনি এই যে পৃথ্বী প্রভৃতি-বিরহিত নিরাময় ব্রহ্মাকাশ, ইহা পৃথ্বী-আদি-সম্পন্ন না হইলেও তদ্বিশিষ্টরূপে বিভাত হন। আধুনিক সর্ব্বদর্শনাত্মায় ঘটপটাদি শব্দ যেমন বিরাজমান, তেমনি মহাচিদাত্মাতেও এই ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান সৃষ্টিসমষ্টি বিদ্যমান। যখন শব্দ ও সর্গ বা সৃষ্টি সকলই চিন্ময়, তখন সে বিষয়ে আর শাস্ত্রই বা কি? আর তাহাতে কথাবিচারেরই বা আবশ্যক কি? কেন না, যে জীবন বাসনাবিহীন, তাহাই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। ইহাই বটে শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত।

উল্লিখিত প্রকারে কারণের অভাব নিবন্ধন সর্গ বা সৃষ্টিরও যখন অভাব, তখন এই নিখিল প্রপঞ্চরচনা প্রত্যক্ষতঃ সৎ বলিয়া অনুভূত হইলেও কোন রচনারই অস্তিত্ব নাই। যাহা এ জগতে প্রপঞ্চ বীজরূপে বিরাজমান, এই সেই বাসনা—স্বপ্নে যেমন একই চিৎ পুরুষাদিরূপে প্রতিভাত, তেমনি নানাত্বরূপে সমুদ্ভাসমান হইলেও জানিবে—উহা নানাত্বরহিতা একই বোধসত্তা বিভাত।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ত্রিভুবনে মূর্ত্তামূর্ত্ত দ্বিবিধ পদার্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কিয়দংশ সপ্রতিঘ এবং কিয়দংশ অপ্রতিঘ। পরস্পর যাহারা অসংশ্লিষ্ট, তাহারা অপ্রতিঘ বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট, আর যাহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তাহারাই সপ্রতিঘ। সপ্রতিঘ পদার্থসমূহেরই সংসারে পরস্পর সংশ্লেষ দৃষ্ট হয়। অপ্রতিঘ পদার্থপরম্পরার মধ্যে কাহারও কোনই সংশ্লেষ ঘটে না। ইহাতে সম্বেদনাখ্যায় প্রসিদ্ধ বস্তুই অপ্রতিঘ; উহা অমূর্ত্ত, ইহা সমস্ত চন্দ্রদর্শীরই অনুভবগম্য। আমার প্রশ্ন শ্রবণে আপনি বলিতে পারেন যে, আমি এইরূপ আক্ষেপ—প্রবুদ্ধদৃষ্টিতে করিতেছি, কি অপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টিতে করিতেছি? কেন না, প্রবুদ্ধদৃষ্টিতে তো মূর্ত্ত প্রসিদ্ধই নহে আর অপ্রবুদ্ধ-দৃষ্টি যে অপ্রবুদ্ধ চিৎ-দেহাদির প্রবর্ত্তক, ইহাও তো প্রসিদ্ধ নহে। কেন না, লৌকিক ব্যক্তিগণ দেহাদি অহঙ্কারান্ত সমুদায়কেই আত্মা নামে অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি যে এই প্রশ্ন করিতেছি, ইহা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ তৃতীয়-চতুর্থ-ভূমিকার অন্তরালস্থ সাধুগণেরই সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বৈত-কল্পিত এই জগৎ অঙ্গীকার করিয়াই করিতেছি। পরন্তু যাহা বোধদৃষ্টিস্থিত চিন্মাত্র, তাহা অঙ্গীকারপূর্ব্বক এরূপ প্রশ্ন

করিতেছি না। মূর্ত্তদেহের অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু অবস্থিত; যদি সেই বায়ুই প্রবেশ নির্গম-বৃত্তিভেদে ক্ষুব্ধ হইয়া দেহের প্রবর্ত্তক হয়, তবে কেইবা প্রাণপবনের ক্ষোভ উৎপাদন করে? আর কিরূপেই বা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে? আপনি যদি এ কথা বলেন যে, জীবাত্মক চিদাভাসই সেই ক্ষোভের হেতুভূত, তবে তাহাই বা হয় কি প্রকারে? কারণ দেখাই, ভারবাহী ব্যক্তি যেমন এক দেশ হইতে দেশান্তরে ভার লইয়া যায়, তেমনি উক্ত অপ্রতিঘ বেদনই বা কি প্রকারে এই প্রতিঘাত্মক দেহ পরিচালিত করিতে পারিবে? যদি তাহা পারে, তবে পর্ব্বত গমন করুক, এইরূপ পুরুষ-সঙ্কল্প-মাত্রেই পর্ব্বত কেন না চালিত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভস্ত্রায় প্রবেশ-নির্গম দ্বারা বাহ্য বায়ুর যেমন চালকতা শক্তি অনুমিত হয়, তেমনি প্রাণ-পবনেরও কণ্ঠাদিনালী-বিলাকার সঙ্কোচ বিকাশ অনুমিত হইয়া থাকে। প্রবেশ ও নির্গম নিবন্ধন তদীয় দেহাদির চালকতা প্রত্যক্ষগোচর হয়। জানিবে—হৃদয়াদি প্রবেশও এইরূপই। এক্ষণে ইহাই বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শুন। হৃদয়স্থ নালী যে কালে সঙ্কোচ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ু তখন ছিদ্র দ্বারা যাতায়াত করিয়া থাকে। নিখিল দ্রব্যের অন্তঃসঞ্চারস্বভাব বাহ্য বায়ু যেমন বাহ্য ভস্ত্রায় প্রবিষ্ট হয়, আবার নির্গত হয়, জানিবে—হৃদয়ে স্পন্দসঞ্চারও ঐরূপই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বায়ুই চালনা করে, এ কথা সত্যই বটে; পরন্তু যে লৌহকার, সে-ই সঙ্কোচ এবং প্রসারণ দ্বারা ভস্ত্রায় বায়ু যোজনা করিয়া থাকে। সুতরাং চেতনই যে নিয়ত অচেতনের ব্যবহারচেষ্টার নিমিত্ত, এই কথাই বলিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে আন্তর চালনা বিষয়ে কোন্ চেতন চালক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ীকে চালিত করে? শ্রুতি-বাক্য এই যে, একশত নাড়ী চতুর্দ্দিকে প্রসৃত রহিয়াছে; সেই শত নাড়ীর প্রত্যেক শাখায় দ্বিসপ্ততি দ্বিসপ্ততি করিয়া নাড়ী আছে। এইরূপে সহস্র সহস্র নাড়ী বিদ্যমান। এই সকল নাড়ীরন্ধ্রে ব্যানবায়ুর সঞ্চার। সর্ব্বনাড়ীর ব্যান-বায়ু যদি দেহাদি চালনের নিমিত্ত হয়, তবে সর্ব্বাঙ্গ বিচলিত হইয়া থাকে। এরূপ হওয়ায় একক করচরণাদির উদ্যম ব্যবস্থার অভাব হইয়া পড়ে।

এইরূপ একটা কথা আছে বটে যে, এক অঙ্গের উদ্যম সময়ে শত নাড়ী এক হইয়া উঠে, আর সর্ব্বাঙ্গ যখন চলিত হয়, তখন একই নাড়ী শতসংখ্যক হইয়া থাকে। এরূপ কথায় আমার জানিবার বিষয় এই যে, শত—এক হয় কি করিয়া? আর একই বা শত হয় কিরূপে? আরও এক কথা, যিনি চৈতন্য, তিনি অমূর্ত্ত; দেহেও সে চৈতন্যের সংশ্লেষ বিদ্যমান নাই। যাহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, তাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট-প্রস্তরাদিতেও বিদ্যমান। কাজেই তাহাদিগকেও সচেতন বলা হয়। তাহাদের এই সচেতনত্বই বা কি প্রকারে সম্ভবে? এইরূপ যদি স্থাবর তরু-লতা-কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি বস্তু সচেতনই হয়, তবে ইহারা স্পন্দনশীল নয় কেন? অপিচ দেহবৎ ভোগোপ-যোগে চমৎকৃতই বা না হয় কেন? অথবা উহারা কি পরিচালক কুম্ভকারাদি-সমধিষ্ঠিত চক্রাদিবৎ নিয়ত কালবর্ত্তী জঙ্গম পদার্থ? এ বিষয় আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—লৌহকার যেমন বাহিরে ভস্ত্রাকে পরিচালিত করে, তেমনি সংবেদনই দেহান্তরালে নাড়ীনিচয়কে চালিত করিয়া থাকে। এ জগতে এই অনুসারেই বাহিরে সকলে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করত চেষ্টা-শীল হইয়া রহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! শরীরে যে সকল বায়ু ও অস্ত্রাদি আছে, তৎসমুদায়ই সপ্রতিঘ; যাহা সপ্রতিঘ, তাহাকে কিরূপে অপ্রতিঘ সম্বিৎ চালিত করে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। যদি এমনই হইত যে, অপ্রতিঘাকারা সম্বিৎ সপ্রতিঘাত্মক বস্তুকে পরিচালিত করিতে পারিত, তবে তো তৃষাকুল পথিকের ইচ্ছানুসারে দূরস্থ জলও আপনাপনি নিকটে আসিতে সমর্থ হইত। সপ্রতিঘ ও অপ্রতিঘ পদার্থের পরস্পর সংশ্লেষ যদি সম্ভবপর হয়, তবে ইচ্ছাই বাহ্যভাবে বাক্‌প্রয়োগ এবং গ্রহণ-বিহারাদি করিতে পারিত। এইভাবে বাহ্য ব্যবহারে সর্ব্ব প্রাণীর ইচ্ছানুসারেই যদি সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে আর কর্ত্তা বা কর্ম্মাদির প্রয়োজন কি আছে? অপ্রতিঘের বাহ্য সংশ্লেষ নাই ইহা যেরূপ আমি বুঝি, এইরূপ অন্যযুক্তি প্রকাশ করিয়া বলুন। কেন না, আপনার যাহা পূর্ব্বযুক্তি, তাহা তো উল্লিখিত প্রকারেই নিরস্ত হইয়া গেল। পক্ষান্তরে

আপনি যোগী পুরুষ; আপনি নিজে যেমন এই অমূর্ত্তের, মূর্ত্তসংশ্লেষ একান্ত অপ্রসিদ্ধ হইলেও যে উপায়ে যোগপ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন, তাহা আমায় সত্বর প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অধুনা আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। ইহা শ্রুতিসুখাবহ; ইহাতে সমগ্র সন্দেহ-পাদপের মূলোৎপাটন হইয়া যাইবে; আমার এই বাক্যসমস্তের একতানুভবরূপ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অনুভব হইবে; এই নিমিত্ত তোমায় আমার বাক্য শুনিতে অনুরোধ করিতেছি। এ জগতে সকলই সদা শান্ত অপ্রতিঘ সুবিস্তৃত; কুত্রাপি কিছুই সপ্রতিঘ নাই। এই যে ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থ-পুঞ্জ আছে, এ সকল স্বপ্নসঙ্কল্পিত পদার্থবৎ শান্ত শুদ্ধ সম্বিন্ময় ও অপ্রতিঘাত। ইহাদিগের কারণ কিছুই নাই; সেই জন্য কি আদি, কি অন্ত, সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে এই পদার্থ-পুঞ্জ নাই। চিৎ স্বস্বভাবে রহিলেও স্বপ্নাবস্থা-লাভের ভ্রান্তিস্বরূপ হইয়া জগদাকারে প্রতিভাসমান হইতেছেন। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিজ বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রবণ-মননাদি প্রযত্নসাধ্য উপায় দ্বারা বাসনাময় মূর্ত্তাকার মার্জ্জিত করত ভূ, স্বর্গ, পবন, আকাশ, গিরি, নদী ও দিক্-প্রমুখ সমগ্র জগৎই অপ্রতিঘ বোধমাত্র বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃৎ-কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি সমস্তই শূন্য অথচ অশূন্য-স্বরূপ। সমুদায়ই চেতনমাত্র, অন্য কিছুই নয়। এ সম্বন্ধে তোমার নিকট একটা উপাখ্যান বলিতেছি, এই উপাখ্যানের নাম ঐন্দব উপাখ্যান। এই মনোহর উপাখ্যান তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বেও তোমার নিকট ইহা একবার বলা হইয়াছে; পরন্তু পূর্ব্বে উৎপত্তিপ্রদর্শনার্থ মনোমাত্র জগতের কথাই বলিয়াছি, এক্ষণে 'চিন্মাত্রই জগৎ' এইরূপ নির্ব্বাণনিষ্কর্ষার্থই উক্ত উপাখ্যান বলিতেছি। ইহা পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইলেও সম্প্রতি কথিত সাম্প্রতিক প্রশ্নের উত্তর অবগত হইবার নিমিত্ত তাহা শ্রবণ কর। এই পর্ব্বতাদি যে অমূর্ত্ত চিৎই, ইহা দ্বারা তুমি তাহাই অবগত হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে কোন এক জগতে তপস্যা ও বেদক্রিয়ার আধার ইন্দুনামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই আকাশের যেমন দশটী দিক্, তেমনি তাঁহার

দশটী পুত্র বিদ্যমান ছিল। সেই পুত্রগণ সকলেই মহাত্মা, মহাশয়, মহৎ ও সত্যাস্পদ ছিলেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন যেমন একাদশ রুদ্রের মধ্যে দশ রুদ্রকে রাখিয়া এক রুদ্র অন্তর্দ্ধান করেন, তেমনি দশ পুত্রের পিতা সেই ইন্দুবিপ্র কালের বশে তিরোধান করিলেন। দিবসের যেমন সন্ধ্যা, তেমনি একতারাকল্প-নয়না তদীয় অনুরাগবতী বনিতা বৈধব্যভয়ে ভীতা হইয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। সেই পরলোকপ্রাপ্ত দম্পতীর পুত্রগণ শোকবেগ সম্বরণপূর্ব্বক তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন এবং নিখিল সংসারব্যবহার পরিহারপূর্ব্বক সমাধিনিমিত্ত কাননাশ্রয় করিলেন। তাঁহারা কাননে গমন করিবার পর তাঁহাদের অন্তরে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, ধারণা বিষয়াকৃষ্ট চিত্তের স্থিরত্ব-সম্পাদনের হেতুভূত; কিন্তু ধারণাসমূহের মধ্যে কোন্ ধারণা উত্তম সিদ্ধিপ্রদা? আমরা কাহাকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভের সমান হইতে পারিব? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই দশ ভ্রাতাই সেই কাননের এক শ্বাপদোপদ্রব-বিরহিত গুহাগৃহে বদ্ধপদ্মাসনে থাকিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—এই যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড—যাহা পদ্মযোনি ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত, ইহাই আমার; যদি আমরা এইরূপ ধারণায় নিশ্চল হইয়া আত্মস্থাপন করিতে পারি, তবেই নির্ব্বিঘ্নে আমরা কমলযোনিসহ জগৎস্বরূপ হইয়া উঠিব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ব্রহ্মাসহ সমগ্র জগৎ ধারণাপথে আনীত করত চিত্রার্পিতবৎ নিমীলিতনেত্রে বহু কাল অবস্থান করিলেন। এতাদৃশ ধারণা হইতে তাঁহারা কখন বিচ্যুত হন নাই; তদবস্থায় বদ্ধচিত্ত হইয়া এক বর্ষ ছয় মাস কাল যাবৎ তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। সে কালে তাঁহাদের দেহ শুষ্ক কঙ্কালরূপ হইয়াছিল, শবদেহের ন্যায় পড়িয়াছিল। মাংসভুক্ রাক্ষসেরা তাঁহাদের দেহমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল; তাহাতে এমন হইয়াছিল যে, আতপে যেমন ছায়া নাশ হয়, তেমনি তাঁহাদের দেহ নাশ হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন, 'অহং ব্রহ্মা' 'আমরা ব্রহ্মা' 'এই যে জগৎ, ইহাও আমরা' এবং 'এই যে ত্রিভুবনান্বিত সৃষ্টি, ইহাও আমরা' এইরূপ সার্ব্বত্রিক ঐক্য দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা দীর্ঘকাল

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ঐরূপে একনিষ্ঠ ধ্যানে অবস্থিত হইবার পর তাঁহাদের সেই দশ চিত্ত ধ্যানপরিপাক বশতঃ বিভিন্ন দশ ব্রহ্মাণ্ডা-কার জগৎ ও বিভিন্ন দশ দেহ ধারণ করিল। তাঁহাদের ইচ্ছারূপিণী হইয়া চিৎই জগতে পরিণতা হইয়াছিলেন। তোমার আশঙ্কা হইতে পারে, তবে কি চিতের কিঞ্চিৎ স্বভাবক্ষতি হইয়াছিল? আমি বলিব—না, তাহা হয় নাই। চিৎ স্বস্বভাবে থাকিয়া একান্ত স্বচ্ছরূপা আকারবিবর্জ্জিতাই ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সর্ব্বজগৎই সম্বিন্ময়; তাই ভূমি-ভূধর-প্রভৃতি সমস্তই চিদাত্মক। এইরূপ যদি না হইবে, তবে সেই ইন্দুনন্দন-গণের সেই ত্রিজগৎপরম্পরা কিমাত্মক হইবে বল দেখি? সুতরাং ইহাই স্থির যে, উহা সম্বিদাকাশমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। জলের তরঙ্গ যেমন জল ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তেমনি সম্বিৎতত্ত্ব ব্যতিরেকে চলনাদি কিছুই কিছু নহে। উল্লিখিত ইন্দুনন্দনগণের জগৎ যেমন কেবল শূন্যে চিন্ময়-মাত্ররূপেই প্রতিভাত, তেমনি এই যে দৃশ্য জগৎপরম্পরা, এতৎসমূহ-মধ্যেও কাষ্ঠলোষ্ট শিলাদি সকলই সেই চিন্ময়মাত্র। ইন্দুনন্দনগণের সঙ্কল্পই যেমন এই জগদ্ভাব উপগত হইয়াছিল, তেমনি কমলযোনির যাহা সঙ্কল্প, তাহাই এই দৃশ্য জগদ্ভাব উপগত হইয়াছে। সুতরাং এই যে সকল ভূমি, ভূধর, নিবিড়নিবেশ পাদপ ও মহাভূতবৃন্দ দেখা যাইতেছে, এতৎ-সমস্তই চিন্ময়মাত্ররূপেই বিস্তীর্ণ আছে। এই যাহা কিছু দৃশ্যমান হইতেছে, এই যে বৃক্ষ, পৃথ্বী, স্বর্গ, আকাশ ও পর্ব্বতপ্রকর দেখা যাইতেছে, এতৎ-সমস্তই সেই চিৎ। ঐ ইন্দুনন্দনগণের জগৎ-প্রায় কুত্রাপি চিদ্ব্যতিরিক্ত-তার সম্ভাবনা নাই। চিন্মাত্রাকাশ যেন কুলাল; সে স্বীয় দেহরূপ ঘূর্ণিত চক্রোপরি স্বীয় শরীররূপ মৃদুপাদান লইয়া নিয়তই এই সর্গ বা সৃষ্টি বিরচন করিতেছে। এই যে সর্গাদি, ইহা আর কোথায় আছে বল দেখি! ফলে সকলই মিথ্যা, সকলই অসম্ভব। সঙ্কল্পসঙ্কলিত সৃষ্টিব্যাপারে প্রস্তরাদির যদি চৈতন্য নাই, তবে আর এই সকল দৃশ্য লোষ্ট-শৈলাদি কি, বা কিরূপ বল দেখি! অনুভবই বল, স্মৃতিই বল, আর স্মৃতিজন্য সংস্কারই বল, অথবা ইচ্ছাকৃত সংস্কারই বল, সকলই সম্বিৎবিশেষ; ইহাদের অভ্যন্তরে অর্থপ্রকাশ পায় এবং নিজ অভ্যন্তরে অভিব্যক্ত চিন্মাত্রকেই ইহারা ধারণ করিয়া

থাকে। অতএব সর্ব্বার্থই যে চিন্ময়, ইহাই স্থির কথা। কেন না, পূর্ব্বেও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নিরর্থক কল্পনাদির স্থিতি অন্যবিধ; আর অর্থকলা-সম্পন্ন তত্ত্বাবগাহী চমৎকারশালীর চমৎকৃতি অন্য প্রকার। যাহা অজ্ঞাত বিষয়, তাহাতেই চক্ষুরাদি দ্বারা 'অনুভব হইয়া থাকে; আর যাহা জ্ঞাত বিষয়, তাহাতেই স্মৃতি ও সংস্কারই জ্ঞানসমান হয়; সুতরাং তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাত বিষয়ের সিদ্ধি বলিতেই হইবে। অপিচ তৃণকাষ্ঠাদি যদি অচিদ্রূপ হয়, তবে তাহাদিগকে অজ্ঞাতও বলা যায় না। কেন না, জড়েই অজ্ঞানা-বরণের প্রয়োজন; সুতরাং জড় হইতে অপর ব্রহ্ম সমস্তই তৃণাদির তত্ত্ব, আর সেই ব্রহ্মসত্তাই অন্যথাবোধ স্মৃতিসংস্কারে ভ্রমের বশে জড়াকারে বিভাত। পরে যে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহাতেও কাষ্ঠ-লোষ্টাদিকে চেতন বলিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। কেন না, সেই যে পরম চিৎতেজ, ইহাই সর্ব্বাত্মক সম্বিৎস্বরূপ ব্যষ্টিসমষ্টি-চিত্তে মণিবৎ মণিরাশিতে দেদীপ্য-মান হইয়া অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক তৃণকাষ্ঠাদি পদার্থরূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশ-মান হইয়া থাকে। তৃণ-কাষ্ঠাদি যে চেতন, তাহা এই কারণেও বলিতে হইবে যে, তৎসমস্ত তৃণকাষ্ঠাদি সেই কার্য্য-কারণ-বর্জ্জিত ব্রহ্মেরই সৃষ্টিস্বরূপ। সুতরাং ঐ ব্রহ্ম হইতে কোথাও বা কদাচ ঐ তৃণাদি ভিন্ন নহে। যেমন সূর্য্যের প্রভাই সূর্য্যের স্বভাব অপ্রকাশ নয়, তেমনি চেতনই ব্রহ্মের সত্তায় অচেতনত্ব নহে। এতাবতা সমস্তই চেতন ব্রহ্ম, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। যেমন কোন কারণ নাই, অথচ নিম্ন ভূমিতে প্রবহমাণ জল আপনা হইতে আবর্ত্ত-তরঙ্গাদি বৈচিত্র্যবৎ অবস্থিত হয়, এই চিদ্বারিও তদ্বৎ নানা বৈচিত্র্যে স্বতই বর্ত্তমান। ইহাতে অপরের কিছুমাত্র সাহায্যই নাই। পদ্মকল্পে ভগবানের যে নাভিপদ্মলীলা, তাহাই যেমন জগদাকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনি চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎপরম্পরা প্রকাশিত। অতএব সেই চিদ্‌ব্রহ্ম হইতে উহা কিছুমাত্রই স্বতন্ত্র নহে। তাই বলিতেছি, এই জগৎপরম্পরা যদি সেই ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্রই হয়, তবে ইহাই নিশ্চয় যে, এই জগৎ চিন্মাত্র শূন্যাত্মক ব্রহ্মমাত্র এবং ভাবাভাবের নিরাকরণবশে ভাবাভাবের অন্তরালবর্ত্তী চিৎস্ফুরণমাত্রেই পর্য্যবসিত। অতএব এই সঙ্কল্প-জগতে অবস্থিত,

সম্বিন্ময় পর্ব্বতাদিকে যাহারা অসম্বিন্ময় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই সকল মূঢ় নর বুধ-জনসমাজে উপহাসাস্পদই হয়। এই জগৎ যখন চতুরানন ব্রহ্মার সঙ্কল্প হইতেই প্রাদুর্ভূত, তখন ইহা মনোরাজ্যবৎ চিন্মাত্রই; এই নিখিল জগৎই স্বয়ং ব্রহ্মবৎ অবস্থিত। ইহা শূন্যে শূন্যাত্মক সঙ্কল্পস্বরূপ বলিয়াই বিজ্ঞাত। যে যে কালে যত শীঘ্র এই প্রপঞ্চ দৃষ্টি চিদ্‌দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয়, সেই সেই কালেই এই দুঃখেরও অচিরাৎ নাশ হইয়া থাকে। অপিচ যখন যখনই জগৎদৃষ্টি চিদ্‌দৃষ্টিতে বিলম্বে না দেখা যায়, তখন তখন হইতেই উহা ঘন হইতেও ঘনতর হইতে থাকে। যাহারা চিদ্‌দৃষ্টিতে না জগৎ দর্শন করে, তাহারা চিরপাপবিজড়িত মূর্খ; তাহাদের নিকট এ সংসার বজ্রসার-সদৃশ সুদৃঢ়রূপেই অবস্থিত; তাহাদের ভাগ্যে কদাচ সংসার শান্তি ঘটিতে পারে না। সুতরাং মহাফলপ্রদ মনে করিয়া উক্ত চিদ্‌দৃষ্টিই সুদৃঢ় করা কর্ত্তব্য! এ জগতে কোন আকৃতি নাই কিম্বা ভাবাভাব বা জনন-মরণাদি বিকল্প কিছুই নাই। কেবল আছেন একমাত্র পরম শান্ত ব্রহ্ম; তিনিই স্বীয় পরমার্থ চিৎস্বভাবে এইরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত বচন একেবারেই নাই। কেবল সেই ব্রহ্মই স্ফটিকস্তম্ভের ন্যায় অন্তরে পুত্তলিকা সকল রহিলেও আদি-অন্ত-বর্জ্জিত জন্ম-নাশ-বিরহিত অতি স্বচ্ছ, অন্তবিহীন চিদানন্দঘনৈকরূপে নিত্যই বিরাজিত। উহাঁর হস্ত সকল অসংখ্যরূপে বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, কণ্ঠ, উদর ও পদাদি অঙ্গনিচয় উহাঁর বিরাজমান। অপিচ যখন উক্ত ব্রহ্মের মুক্ত-স্বরূপ, তখন উনি আত্মাকাশাত্মক সন্মাত্র, অজ 'ইদমহং' রূপে পর্য্যবসিত।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

ঊনাশীত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই কারণেই বলিতেছি, এই ত্রিজগৎ একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব চিন্মাত্রস্বরূপই। ইহাতে মূর্খজনের বোধগম্য সপ্রতিঘরূপে ভূতবৃন্দাদি কিছুরই সম্ভবপরতা নাই। অতএব শরীরাদিই বা কে? আর সপ্রতিঘ বস্তুই বা কে? এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে,এতৎসমস্তই অপ্রতিঘ ব্রহ্ম বিস্তৃত। যাহা বৈষম্যবর্জ্জিত শান্ত চিদাকাশ, তাহাই শান্ত চিদাকাশে বিদ্যমান। আকাশেই আকাশ আছে এবং জ্ঞপ্তিতে জ্ঞপ্তিই বিজৃম্ভিত হয়। স্বপ্নবৎ জাগ্রদবস্থাতেও সমস্তই শান্ত সম্বিন্ময় হইয়া অপ্রতিঘাকারে অবস্থিত। সপ্রতিঘা স্থিতি কোথায়? অপিচ এই জগতে দেহাবয়ব, নাড়ীবেষ্টনী বা অস্থি-স্থিতিই বা কি? সকলই অপ্রতিঘ ব্যোমস্বরূপে বিরাজিত। এ দেহ সপ্রতিঘ স্বপ্নদেহ-সদৃশ; করযুগ্ম, মস্তক, আর ইন্দ্রিয়নিচয়—সমস্তই সম্বিৎ; সমস্তই শান্ত,অপ্রতিঘ; কিছুই কোথাও সপ্রতিঘ নাই। জগৎস্থিতি বিষয়ে ব্রহ্মাকাশের স্বপ্নরূপ স্বভাব নিবন্ধন এই সকলই যদিও প্রমাণসিদ্ধ, তথাচ অপ্রমাণ, আর যদিও সকারণ, তথাচ অকারণই। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবে না; কাজেই তত্ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব ও অদ্বয়ত্ব বশতঃ কারণান্তরের অভাবে উৎপত্তির অভাব নিবন্ধন এই অপলাপেরই উপপত্তি হয়। আর ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সৃষ্টির অনাদিত্ব হেতু কারণপরম্পরার সম্ভাবনা ও ব্রহ্মের অপ্রসিদ্ধিবশে উৎপত্তি প্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে স্বপ্ন নির্ণয় ক্রমে উভয়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর। ফল কথা, যে যাহা নির্ণয় করে, সে তাহাই অবলোকন করিয়া থাকে। কিন্তু কারণ বিনা লৌকিক দৃষ্টিতে সম্বিদাত্মকরূপে উপলব্ধ এই জগৎ সম্পূর্ণ অসৎ বা সৎও নহে। পরন্তু সতের ন্যায় ইহা উপপন্ন হইয়া থাকে। যখন স্বপ্ন দেখা যায়, তখন সর্ব্ববস্তুই যেমন সর্ব্বত্র সর্ব্বথা উপলব্ধ হয়, তেমনি চিন্ময়ত্ব নিবন্ধন জাগ্রদবস্থাতেও সর্ব্বাত্মরূপতা ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত ইন্দুনন্দনগণের সঙ্কল্প জগতের অনুরূপ একও সহস্রসংখ্যক হয়, আর সঙ্কল্প-জগৎপরম্পরার

সহিত লক্ষভূত ভাবও উপগত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সহস্র সম্বিৎও আবার এক হইতে পারে। দৃষ্টান্ত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির সাযুজ্য পূর্ব্বোল্লিখিত বিপশ্চিতের উপাখ্যাননিষ্কর্ষস্থলেই বর্ণিত। সিদ্ধান্তক্রমে উপাধি মেলনে ঐক্যাপত্তি হওয়ায় সৃষ্টিসহ সকলই একীভূত হইয়া যায়। পৃথগ্‌ভাবে কৃতাবস্থানের যে একীভাব, তাহা লৌকিক ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দেখ, শত শত সরিৎ প্রবাহক্রমে বিভিন্ন হইলেও মিলনে সেই একই সাগর, আর ঋতু-সম্বৎসরপরম্পরায় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ফলে সেই এক কালই। সচ্চিদাকাশ একই; উহা স্বপ্নের ন্যায় নানা দেহে সমুদিত হয়। এইভাব অনুভবক্রমে স্পষ্টতঃ প্রত্যয়গোচর হইলেও স্বপ্নশৈলবৎ নিরাকরই। সেই যে অনুভবাত্মিকা সম্বিত্তি, তিনিই দৃষ্টিদৃশ্য-দৃষ্টিরূপে প্রতিভাসমান হন। এই জন্যই বলিতেছি, এ জগৎ একমাত্র চিদাকাশই। যেমন একই নিদ্রা স্বপ্নদশায় বেদনাত্মিকা ও সুষুপ্তি অবস্থায় অবেদনাত্মিকা হয়, তেমনি জানিবে—এই জগৎও বেদন ও অবেদনাত্মক হইয়া একই। যেমন বায়ু ও তাহার স্পন্দ, তেমনি চিৎসম্বিৎ ও জগৎ অভিন্নমাত্রই; সুতরাং জগৎ একমাত্র চিদ্ব্যোমস্বরূপই; উহা বস্তুতঃ একই। দৃষ্টি-দৃশ্য-দর্শনরূপ ত্রিপুটী চিৎস্বরূপেরই ভানমাত্র। উক্ত সমস্তই শূন্যাকাশ-স্বরূপ। ঐ ত্রিপুটী স্বপ্নোপম শূন্যমাত্রেই প্রতিভাসমান। সুতরাং জানিবে—এই জগৎ একমাত্র সেই চিদ্ব্যোমই। এই যে জগদ্ভাব, ইহা পরমেশ চিদ্ব্রহ্মে অসৎই; স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্রাদি ভয়, তেমনি ইহা প্রথম সৃষ্টি হইতেই ভ্রান্ত দৃষ্ট; অতএব যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদি ভয়, তেমনি উহা যথার্থ জ্ঞান হইলেই নিবৃত্তি পায়। স্বপ্নাবস্থায় একই সম্বিদের যেমন অনেকরূপে ভান হয়, তেমনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মেও নানা পদার্থরূপে ভান হইয়া থাকে। গৃহমধ্যে বহু দীপপ্রভা যেমন একবৎ প্রতিভান প্রাপ্ত হয়, তেমনি সর্ব্বশক্তির যে একই মায়াশক্তি, তাহা অনেক প্রকারে ভান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশে ভ্রান্তিবশেই যেমন পাদপসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে, তেমনি শিবাখ্য সাগরে যে জলকণাস্ফূর্ত্তি, তাহাই সৃষ্টি; পরন্তু ইহাই বিশেষত্ব যে, আকাশে দৃষ্ট পাদপনিচয় আকাশধাম শূন্যতায় অনুবিদ্ধ হইয়া স্ফুরিত হয় না বলিয়া আকাশ হইতে ঐ সকল ব্যতিরিক্ত-স্বরূপ;

পরন্তু ব্রহ্মাম্বুনিধিতে স্ফুরিত যে সৃষ্টিবিন্দু, তাহা ব্রহ্মাম্বুনিধি হইতে অণুমাত্রও অব্যতিরিক্ত-স্বরূপ

একোনাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! সৌরতেজ যেমন জাগতিক যাবতীয় ভাবপদার্থের সম্যগনুভব-জনিত অন্ধকারপুঞ্জ অপহরণ করে, আপনিও তেমনি মদীয় যথার্থ বোধার্থ এই সংশয়াপনয়ন করিয়া দিন। এক সময় আমি যখন বিদ্যালয়ে বিদ্বজ্জন-সমাজে বাস করিতেছিলাম, তখন একদিন জনৈক তাপস বিদেহ দেশ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই তাপস ব্রাহ্মণ যেমন বিদ্যাবান্, তেমনি রূপবান্ ছিলেন। তিনি একজন মহাতপস্বী; তাঁহার দেহকান্তি অসাধারণ। তিনি দর্শনে দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় অতীব দুঃসহ। সেই তেজস্বী-তপস্বী তথায় প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য দীপ্ত দ্বিজসমিতিকে নমস্কারপুরঃসর একটী আসনে উপবেশন করিলেন। আমরা সকলেই বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। আমি ঐ সময় বেদান্ত ও সাংখ্যসিদ্ধান্তবাদ পাঠ করিতেছিলাম; সেই দ্বিজবরকে তথায় সমাগত, সুখোপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত দেখিয়া তৎকালে সেই পাঠ উপসংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলাম যে, হে বক্তৃবর! দেখিতেছি আপনি বহু পথ-পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, কোন একটী বিষয় জিজ্ঞাসার জন্যই সযত্নে এখানে এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। বলুন, অদ্য আপনার কোথা হইতে আগমন হইল? মদীয় প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক সেই তাপস দ্বিজ বলিলেন,—ওহে মহাভাগ! তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমি একটা বিষয় জানিবার জন্যই প্রয়াসী হইয়াছি। যাহা হউক, আমার যে জন্য হেথায় আগমন হইয়াছে, তাহা কহিয়া এখনই তোমার সংশয় নিরাস করিতেছি। তুমি মৎকথা শ্রবণ কর। শুনিয়া থাকিবে, বৈদেহ নামে এক সর্ব্বসৌভাগ্যশালী দেশ আছে। সে দেশের সমৃদ্ধির পরিচয়

আর অধিক দিব কি, উহা যেন স্ফটিকময় প্রদেশে স্বর্গীয় প্রতিবিম্ববৎ বিরাজমান। সেই বৈদেহ দেশে আমি জন্মিয়াছি এবং সেইখানেই আমি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি। আমার দন্তপঙ্ক্তি কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র; সেই জন্য আমি কুন্দদন্ত নামে পরিচিত। বিদ্যাভ্যাস করিবার পর আমার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। আমি দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হই। পথে যাইতে যাইতে গগনসন্ত্রমে যখন যখন আমার শ্রান্তিবোধ হইতে লাগিল, তখন তখন আমি শ্রমাপনোদনার্থ দেব-দ্বিজ-মুনীন্দ্রগণের আশ্রমে আশ্রয় লইতে লাগিলাম। এইরূপে যাইতে যাইতে ক্রমে আমি শ্রীপর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া অত্যুগ্র তপস্যা করিলাম, বহুকাল বাস করিলাম। ঐ পর্ব্বতে একটা অরণ্য আছে। সেখানে তৃণবনাদি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সে অরণ্যে না আছে তেজ, না আছে আঁধার, না আছে মেঘ, কিছুই নাই; ঐ অরণ্য এমনই শূন্য, যেন উহা ভূতলে বিভাত নভঃস্থলী! ঐ শূন্যারণ্য মধ্যে একটী মাত্র কোমল কিসলয়-দলশালী বৃক্ষ আছে। সে বৃক্ষের বহু শাখা থাকিলেও পরিমাণে তাহা অতি বৃহৎ নহে। শূন্যময় নভস্তলে ঐ বৃক্ষ যেন মন্দপ্রভ প্রভাকরের ন্যায় বিভাত। সেই বৃক্ষের শাখাগ্রে এক পবিত্রাকার পুরুষ প্রলম্বমান আছেন। তদীয় চরণযুগল নাভ্যাধার-রজ্জুতে এবং দেহ সেই বৃক্ষের চারিদিকে রশ্মিযোগে আবদ্ধ। মনে হয়, যেন সূর্য্যদেব স্বীয় রশ্মিমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই পুরুষের মস্তক নিম্নাভিমুখে এবং পাদযুগল মৌনদাম-নিবদ্ধ অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত। যে বৃক্ষে সেই পুরুষ লম্বমান, তাহার নাম শাল্মলী বৃক্ষ; সেই শাল্মলী মহাপর্ব্বগ্রন্থিশালী।

একদা আমি সেই বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। ঐ বৃক্ষস্থিত কৃতাঞ্জলিপুট বিপ্রকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এই বিপ্র যাবজ্জীবন এই বৃক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক অক্ষতদেহে জীবন ধারণ করিতেছেন। কেন না, দেখিতেছি, এখনও ইহাঁর শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। ইনি কি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা, শীত, গ্রীষ্ম সকলই সহ্য করিয়া রহিয়াছেন? এই ভাবিয়া আমি সেই লম্বমান পুরুষকে সেবা করিতে লাগিলাম। তাঁহার সেবায় বহুদিন ধরিয়া শীতাতপ-ক্লেশ সহ্য করিলাম। ক্রমে মৎপ্রতি তাঁহার

বিশ্বাস জন্মাইলাম। বলিলাম,—হে বিভো! কে আপনি? কি জন্যই বা এই তীব্র তপস্যা করিতেছেন? দেখা যাইতেছে, আপনি দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়াই এইভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। আমার এই কথার পর সেই বৃক্ষ-বিলম্বিত তাপস আমায় বলিলেন,—ওহে তাপস! আমার এ সকল বিষয় অবগত হইয়া তোমার কি ফল হইবে? জানিবে—এ জগতে যত শরীরী আছে, তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা এক নহে।

তাপস এই পর্য্যন্ত বলিলেন। আমি অতি নির্ব্বেদসহকারে তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম। তিনি এবার আমার কথার উত্তরে বলিলেন,—মথুরাপুরী আমার জন্ম স্থান। আমি পিতৃগৃহে পিতৃপ্রযত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। আমার যখন বাল্য ও যৌবনের মধ্যাবস্থা, তখন আমি শব্দ ও অর্থশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলাম। এইবার আমার নব যৌবন উপস্থিত হইল। আমি ভোগার্থী হইলাম! জানিলাম, রাজাই সমগ্র ভোগসামগ্রীর আস্পদ। ইহা বুঝিয়া আমি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কিসে আমি সপ্ত মহাদ্বীপশালিনী ধরণীর উদার অধীশ্বর হইয়া অর্থিসাধারণের মনোরথসার্থ পূরণ করিতে পারিব? আমার এই চিন্তানুরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই আমি এইখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছি। এ স্থানে অদ্য আমার দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে। ওহে, আমার অকারণসুহৃৎ! এই তো তোমার প্রশ্নের আমি উত্তর দিলাম। তুমি এক্ষণে গন্তব্য স্থানে যাও। আমি যে পর্য্যন্ত স্বাভীষ্ট লাভ না করি, তাবৎকাল এইভাবেই সুদৃঢ় স্থিতি অবলম্বন করিয়া থাকিব। তিনি আমায় এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে যাহা কহিলাম,—শুন। আমার কথা শ্রবণে তুমি বোধ হয় নিশ্চয়ই কষ্টানুভব করিবে না। কেন না, যাঁহারা ধীমান্, তাঁহারা আশ্চর্য্য বাক্য শুনিয়া কদাচ কষ্টবোধ করেন না। আমি কহিলাম, হে সাধু-বর! যতক্ষণ না আপনি স্বাভীষ্ট লাভ করিতেছেন, ততক্ষণ আমিও ভবদীয় অভীষ্ট রক্ষণ ও সেবা নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থিত হইব। আমি এই কথা কহিবার পর সেই সাম্যাবলম্বী পুরুষ পাষাণ হেন মৌনবান্ হইলেন। তাঁহার দুইটী চক্ষু মুদ্রিত হইল। তদীয় বাহ্যিক ক্রিয়াকল্পনা কিছুই দেখিলাম না। সুতরাং তাঁহার সেই দেহ যেন মৃতের ন্যায়

হইয়া রহিল। তখন আমিও সেই মৌন পুরুষের সম্মুখে ছয় মাস যাবৎ শীতোষ্ণাদি সহিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলাম। একদা দেখিলাম, সূর্য্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জময় পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক সেই প্রদেশে আসিলেন। তখন আমরা উভয়েই কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সৎকার করিলাম। সেই আগন্তুক পুরুষ, পীযূষ-নিষ্যন্দি-সুন্দর এইরূপ বাক্য বলিলেন যে,' হে শাখাবলম্বিন্ ভগবন্! আপনি তপস্যা হইতে বিরত হউন; আপনার যেরূপ বর অভিমত হয়, গ্রহণ করুন। আপনি এই বর্ত্তমান শরীরে আপনার তপোধর্ম্মপ্রভাবে সপ্ত সহস্র বৎসর যাবৎ সপ্ত সাগর দ্বীপ-সমন্বিতা পৃথ্বীর পরিপালক হইয়া রহিবেন।

এইরূপ অভীষ্ট প্রদানপূর্ব্বক সেই দ্বিতীয় দিবাকর হেন পুরুষ যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতেই প্রবেশপূর্ব্বক তিরো-ধান করিলেন। এইরূপে সেই তরুশাখাবলম্বী তপস্বী শাস্ত্রে যাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, সেই বরেণ্য আদিত্য পুরুষকে অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বরদান ব্যবহারে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই পুরুষ তিরোহিত হইবার পর আমি সেই লব্ধবর তাপসকে জিজ্ঞাসিলাম,—ভগবন্! আপনার তরুশাখাবলম্বনরূপ তপস্যার ফল ফলিয়াছে। আপনি অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত গৃহগমনাদি ব্যবহার আচরণ করুন। আমি এই কথা যেমন বলিলাম, অমনি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগল বন্ধন হইতে মুক্ত হইল।—যেন করিশাবকের চরণ বন্ধনস্তম্ভ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। অনন্তর তিনি স্নান করিলেন, পবিত্রহস্তে অঘমর্ষণ জপিলেন, এবং সৎসহ পারণ-কার্য্য সমাধা করিলেন। আমরা উভয়েই পুণ্যবলপ্রাপ্ত ফলসিদ্ধি দ্বারা সে স্থানে তিনদিন যাবৎ নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিলাম। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সাগর-পরিবৃতা সমগ্রা ধরণীর ভোগলিপ্সায় সেই বৃক্ষাগ্রে লম্বমান ও ঊর্দ্ধপাদ হইয়া তপস্যা করিতে করিতে সূর্য্য-পুরুষের নিকট হইতে ইষ্ট বর অধিগত হইলেন। অতঃপর তিন দিন তরুতলে বিশ্রাম, পরে পদপীড়া-নিবৃত্তির

পর মাদৃশ সুহৃৎ সমভিব্যাহারে মথুরাপুরীস্থ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিক শততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—সায়ং সময়ে রবিশশী যেমন নিজাবাসাভিমুখে যাইবার জন্য ইস্টদিকে প্রধাবিত হইতে থাকেন, আমরাও সেইরূপ সায়ং-কালে গমন করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলাম। অনন্তর বোধাখ্য নগরে প্রয়াণ করিলাম। সেখানে এক আম্রবন-মনোহর অচল আছে। আমরা সেই অচলে বিশ্রাম করিয়া দুই দিন যাবৎ উক্ত নগরে বাস করিলাম। অনন্তর পুলকিতচিত্তে যাইতে যাইতে বহুপথ অতিবাহিত করিলাম। তৎপর দিবস বিপুল ভূভাগ প্রাপ্ত হইলাম। সেই সমস্ত ভূভাগে প্রচুর শীতল জল এবং অসংখ্য স্নিগ্ধচ্ছায়াবিশিস্ট বনতরু আছে। তত্রত্য নদীতীরে যে সকল লতারাজি বিরাজ করিতেছে, তাহা হইতে কুসুমরাশি নিপতিত হইয়া সেই ভূবিভাগকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দিতেছে। জল-স্থলীর ইতস্ততঃ যে সকল তরঙ্গঝঙ্কার উত্থিত হইতেছে, তাহাতে পথিকগণ আনন্দানুভব করিতেছে। সুস্নিগ্ধ তরুবনচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া মৃগ-বিহঙ্গমদল রব করিতেছে, তথাকার শাদ্বল শ্যাম দেশে তৃণরাজির স্থূলদলোপরি হিমশীকরশ্রেণী মুক্তাবলীর ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। সেই ভূভাগ সকল কচিৎ অরণ্যপ্রায়, কচিৎ পর্ব্বতসঙ্কুল, কচিৎ নগরগ্রামবৎ শোভোজ্জ্বল, কোথাও বিবরাকারে বিরাজমান এবং কচিৎ কচিৎ জলময়। আমরা সেই ভূভাগ অতিক্রম করিলাম; ক্রমে স্রোত ও সরোবর সকলও অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর আমরা উভয়ে এক নিবিড়তর কদলীবনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের তখন বড়ই পরিশ্রম হইয়াছিল; তাই সেখানে তুষার-শীতল কদলীদলের শয্যা বিরচনপূর্ব্বক তদুপরি শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিলাম। অনন্তর তৃতীয় দিনে এক কমলগুল্মদল-বিমণ্ডিত কানন

প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। যেমন মেঘবিচ্ছেদ-বিভক্ত আকাশ দেশ, তেমনি ঐ কাননভাগ তৃণকাষ্ঠাদি সঞ্চয়নকারী জনগণ কর্ত্তৃক বিভাগ ক্রমে সুবিভক্ত হইয়াছিল। এই স্থানে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনান্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশকালে আমায় এই কথা বলিয়া গেলেন যে, দেখ, আমরা আট ভাই; আমাদের ভ্রাতৃগণমধ্যে সকলেরই রাজ্যভোগেচ্ছায় বহু মনোরথ হইয়াছিল। তাই সকলেই আমরা তপস্যার্থ একসম্মিলায় ও একবিধ সঙ্কল্পে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম। আমার অপর সাত ভ্রাতারও সেইরূপ নিশ্চয় অবলম্বনীয় হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা এই গৌরী আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক প্রভূত তপস্যাচরণে নিষ্পাপ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বে আমিও আমার সেই সকল ভ্রাতার সহিত এই গৌরী আশ্রমে তপস্যার্থ বাস করিয়াছিলাম, সুতরাং প্রথমে যে আশ্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, অদ্য সেই আশ্রমই ঐ সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। ঐ আশ্রমই নিশ্চয় সেই আশ্রম, একথা নিশ্চিতই। দেখ, দেখ, ঐ আশ্রমের কুসুমসমূহ-সমুদ্ভাসিত তরুতলে মুগ্ধ মৃগশাবক শুইয়া আছে। ঐ আশ্রমে যে পর্ণশালা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রান্তে শুকপক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে এবং উহারা নানাবিধ শাস্ত্রীয় বাক্য উচ্চারণ করিতেছে; কাজেই সেই আশ্রমসম্বন্ধে এক্ষণে আর সন্দেহাবসর নাই। অতএব এস এস, আমরা উভয়ে এক্ষণে ঐ ব্রহ্মলোক-প্রতিম আশ্রমে শ্রেয়োলাভার্থ গমন করি। ঐ আশ্রমের পুণ্য প্রভাবে আমাদের সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইবে, চিত্ত অতি নির্ম্মল হইবে। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহারা পূর্ণমনা হইয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনলাভার্থ ধীরচেতা বিদ্বান্‌গণেরও মন ব্যগ্র হইয়া থাকে।

তাঁহার এই কথার পর আমরা সেই আশ্রমে উপনীত হইলাম; দেখিলাম,—সেই আশ্রমস্থ তাপসগণ সেই মহারণ্যে সংহারাকারে শূন্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। তথায় না বৃক্ষ, না পর্ণশালা, না গুল্ম, না মনুষ্য, না মুনি, না মুনিবালক, না বেদী, না ব্রাহ্মণ, কিছুই নাই। সেই অরণ্য কেবল শূন্য, কেবল অনন্ত; তাহার চতুর্দ্দিক তাপতপ্ত। সে অরণ্য এমনই শূন্য, যেন ভূতলে আকাশবিকাশ হইয়াছে। আমার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে বলিতে লাগিলেন,—আহা কি কষ্ট! একি দর্শন করিতেছি!

অনন্তর আমরা উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম; ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে এক স্নিগ্ধচ্ছবি ঘনচ্ছায় বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, সেই বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ তাপস সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া আছেন। আমরা উভয়েই সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় শাদ্বলক্ষেত্রে মুনির সম্মুখে উপবেশন করিলাম, বহুকাল রহিলাম; কিছুতেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না। তাহাতে আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলাম। পরে চাঞ্চল্য-বশে উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম,—মুনে! ধ্যান-ভঙ্গান্তে নয়ন উন্মীলন করুন, আমার সেই উচ্চ স্বর শ্রবণে মুনির ধ্যান-ভঙ্গ হইল। মেঘধ্বনি শ্রবণে সিংহ যেমন জৃম্ভণ করে, তেমনি সংকৃত সেই শব্দে তিনি জৃম্ভণ করিয়া কহিলেন,—কে তোমরা সাধুদ্বয়? পূর্ব্বে যে গৌরী-আশ্রম ছিল, তাহা এখন কোথায় আছে? এই শূন্য অরণ্যে কে আমায় আনয়ন করিয়াছে? এই যে কাল চলিতেছে, এ কোন্ কাল? তাঁহার এই কথার পর আমি কহিলাম,—ভগবন্! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় আপনিই বিদিত আছেন, আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি। আপনি যোগপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, অথচ আপনি স্বয়ং কিছুই অবগত হইতেছেন না কেন?

আমার এই কথা শুনিয়া তিনি পুনর্ব্বার ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং নিজের এবং আমাদের সমস্ত বৃত্তান্তই প্রত্যক্ষ করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যেই ধ্যান হইতে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—হে সাধুযুগল! সেই বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত তোমরা শ্রবণ কর। এই যে এই কামিনীর কেশবেণীর ন্যায় কুসুমালঙ্কৃত কদম্বপাদপ দেখিতে পাইতেছ, এই পাদপই আমার আবাসস্থল,—পুত্রের ন্যায় কৃপাপাত্র। পূর্ব্বে কোন এক কারণবশতঃ সতী গৌরী বাগীশ্বরীরূপে এই বনে দশবর্ষ যাবৎ বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সমস্ত ঋতুই তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই হেতু এই নিবিড় বন তখন হইতে গৌরীবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সেই হইতেই এখানে মধুকরীনিকরের মধুর গীতঝঙ্কারে চঞ্চল হইয়া কোকিলকুল কলনাদ করিতেছে। পুষ্পপ্রকরবর্ষী পাদপরাজি দ্বারা গগনবিতান শত শত চন্দ্রান্বিতবৎ প্রতিভাত হইতেছে এবং পদ্মপরাগ-কণায় দিগ্‌দিগন্তরাল পরিব্যাপ্ত করিয়া অভূতপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। সেই হইতে মন্দারকুন্দ-কুসুম-মকরন্দে

দিগ্‌দিগন্ত সুগন্ধিত করিতেছে; সমন্তাৎ বিকসিত প্রসূনস্তবকরূপ চন্দ্রবিম্ব-গণে শোভার পর্য্যাপ্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সন্তানকাখ্য সুরতরুর স্তবকা-বলীর হাস্যচ্ছটায় এ বন মনোরম হইয়াছে। আমোদময় সমীরণে লতা-বনিতা সকল কতই না শোভা পাইতেছে। সেই হইতেই এই বসন্তাবাস বনভূমি সতত ভ্রমরনিকরের নবসঙ্গীতে মুখরিত হইতেছে; ভ্রমরীযুত কুসুমময় মণ্ডপনিচয় বিরাজিত হইতেছে, অপিচ সেই সময় হইতেই এই বনে সুর-সিদ্ধ-বধূগণ সুধাকর-কিরণ-কোমল কুসুমদোলায় দোলক্রীড়া করিতেছে। এ বনে হারীত হংস, শুক, কোকিল, কোক, কাক, চক্রবাক, গৃধ্র, ভাস ও চটকাদি পক্ষি-সঙ্ঘ সেই হইতেই শোভা বিস্তার করিতেছে। ভীষণ কুক্কুট, কপিঞ্জল, ময়ূর ও বক বিহঙ্গেরা সেই হইতেই ক্রীড়া করত এ বন মনোরম করিয়াছে। তখন হইতেই দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণকে এই বনের ঐ কদম্বসরস্বতীর চরণকমল-কর্ণিকায় প্রণত হইতে দেখা যাই-তেছে। এখানে সমীরণের গতি সর্ব্বদাই আছে, তাই নক্ষত্রলোক ও মেঘ-লোক সর্ব্বদাই কনককোমল চম্পকদল হইতে গন্ধ গ্রহণ করে। সেই হইতেই মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে কোমল কিশলয়সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতারাজি হইতে নিপতিত হইতেছে। লতা সকল বিস্তৃত হইয়া কুঞ্জপুঞ্জ আরও সমাবৃত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিতেছে, তাহাতে এ বন অতীব শীতল হইয়াছে। কদম্ব, করবীর, নারিকেল, তাল ও তমালাদি তরুনিকরের পুষ্পপরাগপুঞ্জ পতিত হইতেছে, তাহাতে এ বনভূমি সততই পীতবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতেই এ কাননে কমলসহ কুমুদোৎপলমণ্ডিত কমলাকরে চকোর, চক্রবাক ও হংসশ্রেণী প্লুতগতিতে চলিতেছে এবং সেই হইতেই এই বনভূমিতে তাল, গুগ্‌গুল, চন্দন, পারিজাত ও কদম্বাদি উত্তম তরুর অভ্যন্তরে সর্ব্বাভিলাষ-পূরণশক্তি বিরাজ করিতেছে। কোন এক কারণ বশতঃই এ বনে হরার্দ্ধাঙ্গী গৌরী কদম্বসরস্বতীরূপে শিবশিরোদেশে শশিকলাবৎ বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছেন।

একাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮১ ॥

দ্বাশীত্যধিক শততম সর্গ।

সেই বৃদ্ধ তপস্বী বলিলেন,—এই বর্ণিত বনের কদম্বপাদপে গৌরীদেবী স্বেচ্ছানুসারে দশবর্ষ বাস করিয়া, পুনরায় দেবদেব মহাদেবের বামদেহার্দ্ধ-রূপ আত্মমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারই স্পর্শসুধায় সিক্ত হইয়াছিল বলিয়া এই তৎসুতোপম কদম্বপাদপ অদ্যাপি জীর্ণদশায় উপনীত হয় নাই। দেবী গৌরী সে অবধি এই মহাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন হইতেই ইহা জনসাধারণের ফল কুসুম-কাষ্ঠাদি জীবিকার আশ্রয়রূপে সাধারণ ভোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি নিজে শলব নামক দেশের রাজা ছিলাম। একদা রাজ্যশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা আশ্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বন-প্রদেশে আগমন করি। এখানকার আশ্রমবাসীরা আমার সৎকার করেন। আমি এই কদম্বপাদপের তলদেশে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করিতে থাকি। এই অবস্থায় আমার কিয়দ্দিন অতীত হইলে তুমি স্বীয় সপ্ত ভ্রাতার সহিত তপস্যার্থ এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলে। তোমরা অষ্টভ্রাতা পরম তাপস হইয়াছিলে; তোমাদের আচরণে অন্যান্য তাপসগণও তোমাদের পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে একমাত্র তুমিই শ্রীপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তপস্যার্থ স্বামী কার্ত্তিকের সমীপে গমন করেন। তৃতীয় ব্যক্তি বারাণসীধামে গিয়াছিলেন এবং চতুর্থ জন তপস্যার্থ হিমালয়প্রদেশে গমন করেন। তোমার অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় এইখানে থাকিয়াই অতিমাত্র তপস্যাচরণ করেন। তোমাদের সমস্ত ভ্রাতারই একমাত্র মনোরথ এই যে, যেন সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর অধী-শ্বরত্ব প্রাপ্ত হই। অনন্তর দেবগণ তুষ্ট হইলেন এবং উত্তরোত্তর বর প্রদান করিয়া তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা যেমন ভূতলে ধর্ম্মময় কৃতযুগ ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন, তেমনি তোমার ভ্রাতৃগণ ও তুমি নিজে, তপস্যাচরণ করিতে থাকিলেও তোমার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন। হে সাধুপুরুষ! তোমার সেই ভ্রাতৃবর্গ প্রত্যক্ষ স্বেষ্ট-দেবতার নিকট সযত্নে

এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেবি! এই সপ্ত দ্বীপে আমাদের আধিপত্য যাবৎকাল থাকিবে, তত কাল সমস্ত প্রজাই যেন সত্যবাদী হয় এবং সমস্ত সপ্ত দ্বীপাবলীই যেন স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান করে। ইষ্টদেবতা তাঁহাদের প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলেই এবং তাঁহাদের আশ্রমবাসীমাত্রেই স্ব স্ব গৃহে প্রস্থিত হইলেন। একা আমিই এইখানে রহিলাম; তাঁহাদের সঙ্গে গেলাম না। আমি এই বিজন প্রদেশে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া এই বাগীশ্বরী-কদম্বতলে শৈলের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তার পর ক্রমে ঋতু-সম্বৎসরাত্মক এই কালপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। এই বনের প্রান্তবাসী লোকেরা এ বন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ছেদ-ভেদ যতই চউক, এই কদম্ব-পাদপের কিন্তু ম্লানভাব কিছুতেই নাই। ইহা নিত্য কাল একইভাবে আছে। ইহাকে সকলেই 'বাগীশ্বরী গৃহ' বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আমি সমাধি-অবলম্বন করিয়া এই বৃক্ষতলে তদ্গতমনে অবস্থান করিতেছি। ইহা দেখিয়া লোকে আমাকেও সসম্ভ্রমে পূজা করে। এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে, ইতিমধ্যে তোমরা দুইজন কঠোরতপা পুরুষ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এই সমস্তই ধ্যানযোগে দেখিয়া তোমাদিগকে কহিলাম। তাই বলি, হে সাধু যুগল! তোমরা এই স্থান হইতে উঠিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন কর। তোমার যে সকল ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব কলত্র ও বন্ধুবর্গ সহ পূর্ব্বেই সম্মিলিত হইয়াছেন। দেবলোকে যেমন অষ্টবসুর সম্মিলন হয়, তেমনি তোমরা মহাত্মা, তোমাদিগের অষ্টভ্রাতারও নিজ নিকেতনেই সমাগম ঘটিবে।

সেই বৃদ্ধ তাপস এই কথা কহিলে, আমার সন্দেহ হইল। আমি সেই অদ্ভুত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কি জিজ্ঞাসিলাম?—হে সভ্যগণ! তাহা কহিতেছি, শুনুন। আমি বৃদ্ধ তাপসকে বলিলাম,—ভগবন্! জগতে সপ্ত দ্বীপশালিনী পৃথিবী একই বিদ্যমান। সুতরাং আমার ভ্রাতৃগণ একই সময়ে কিরূপে সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য লাভে সক্ষম হইল?

সেই বৃদ্ধ তাপস কহিলেন,—এইরূপ যুগপৎ অধীশ্বরত্ব অসম্বদ্ধ প্রলাপ নহে; আর ইহাই যদি অসম্বদ্ধ হয়, তবে ইহা অপেক্ষাও অসম্বদ্ধ

ঘটনার কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ তপস্বী অষ্টভ্রাতা দেহাবসানে সকলেই সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিবে। ইহারা যেরূপ মহাপীঠ-গৃহে সপ্ত দ্বীপাধিপতি হইবে, তাহা বলি শুনিতে থাক। উক্ত অষ্টভ্রাতার সুন্দরী অষ্ট ভার্য্যা যেন পূর্ব্বাদি অষ্টদিকের অষ্টতারার ন্যায় বিরাজমানা। ভ্রাতৃগণ তপস্যার্থ গমন করিলে, উক্ত ভার্য্যাগণ সকলেই অতি দুঃখাভিভূতা হইলেন। কেন না, স্ত্রীজাতির পতিবিরহ সর্পদংশনের ন্যায় অসহ্য। তখন ঐ ভার্য্যাগণ পুনঃপুন স্ব স্ব পতিকে স্মরণ করিয়া শত চান্দ্রায়ণ-সদৃশ দারুণ তপস্যা করিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইলেন। সেই পরমেশ্বরী ভগবতী তাঁহাদের অন্তঃপুরালয়ে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সকলকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বলিলেন যে, হে বালিকাগণ! তোমরা স্বামীর এবং নিজের জন্য বর গ্রহণ কর। আহা! নিদাঘতাপে মঞ্জরী যেমন ক্লিষ্ট হয়, তেমনি তোমরা বহুকাল ক্লেশভোগ করিয়াছ।

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া সেই ভার্য্যাগণের মধ্য হইতে চিরণ্টিকা দেবীর পাদ-পঙ্কজে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় বাসনানুসারে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত আনন্দ-জড়তায় পূর্ণ হইল। পরে ময়ূরী যেমন কাদম্বিনী দেখিয়া কেকাধ্বনি করে, তেমনি তিনি সেই আকাশবাসিনী দেবীকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন,—হে দেবি! দেবাদিদেব শঙ্করের সহিত আপনার যেমন অবিচল প্রেম, মৎপতি সহ আমারও তেমনি প্রেম হউক; আর এক কথা, আমার পতি যেন অমর হইয়া চিরদিন জীবন ধারণ করেন।

দেবী কহিলেন,—অয়ি বালে! আদি-সৃষ্টি হইতে নিয়তির দৃঢ় নিশ্চয় নিবন্ধন তপস্যা বা দানাদি দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে না। সুতরাং তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করিয়া লও। তৎশ্রবণে চিরণ্টিকা কহিলেন,—যদি উক্ত বর লাভ করিতে আমি একান্তই অনধিকারিণী হই, তাহা হইলে আমায় এরূপ বর দান করুন যেন আমার স্বামীর মরণ ঘটিলে তদীয় জীবাত্মা গৃহমধ্য হইতে ক্ষণেকের তরেও বাহিরে গমন না করে। মৎ-পতির দেহপাত হইলেই যেন এইরূপ হয়। হে দেবি অম্বিকে! অন্ততঃ পক্ষে এইরূপ বরই আমায় অর্পণ করুন।

দেবী কহিলেন,—ইহাই হইবে; অপিচ তোমার পতির দেহান্ত হইলে তিনি সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিবেন এবং তৎকালে তুমিই তাঁহার পত্নী হইবে। এ কথা নিঃসংশয় জানিবে। জগতের আনন্দনার্থ গগনগর্ভোৎপন্ন মেঘধ্বনির ন্যায় সেই গৌরীবাক্য এই বলিয়া বিরত হইল। দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর অন্যান্য সকলেও মহাবর প্রাপ্ত হইয়া দিগন্ত হইতে সমাগত হইল। তখন এক দিকে পতিজন স্ত্রীজন-সমীপে সমাগত হইতে লাগিল; ভ্রাতৃগণ এবং বন্ধু-বান্ধবগণেরও পরস্পর সমাগম ঘটিল। অন্য দিকে উহাদিগের যে এক সৎকর্ম্মফলের বিঘ্নস্বরূপ সামঞ্জস্য-হীন ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলি, শুনিতে থাক। উহারা যখন তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহাদের জনক-জননী পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তীর্থ-সমূহ ও মুনিবৃন্দের আশ্রম সকল দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। শারীরিক সুখভোগের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য রহিল না; পুত্রগণের হিত নিমিত্ত তাঁহারা কলাপগ্রাম নামক তীর্থে যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে এক কপিলবর্ণ ভস্মানুলিপ্ত ঊর্দ্ধকেশ সস্ত্রীক পুরুষ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা মুনিবোধে ভ্রান্ত হইলেন; অপিচ সৎকারাদি না করিয়াই বরং সত্বর-গমনে ধূলিজাল সমুৎক্ষিপ্ত করত গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেই মুনির ক্রোধোদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন,—ওরে মূঢ়! তুই স্ত্রী ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থ যাত্রা করিয়াছিস্; আর আমি দুর্ব্বাসা এখানে বর্ত্তমান থাকিতে তুই আমাকে পূজা না করিয়াই চলিয়া গেলি! এই অপরাধে তোর পুত্র ও পুত্রবধূগণের তপস্যার্জ্জিত মহা বর বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে।

মুনিবর এইরূপ বলিলে, সেই অষ্টভ্রাতার পিতা স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ-সহ যখন তাঁহার সৎকারে সমুদ্যত হইলেন, সেই মুনি তখনই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এই ঘটনায় সেই পতিপত্নী পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে হতাশায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের হৃদয় গভীর দুঃখে কাতর হইল। তাঁহারা ম্লানমুখে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, তাহা-দের কোন ব্যাপারেই সামঞ্জস্য নাই; পরন্তু গৃহাভ্যন্তরে সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত

রাজ্যের কল্পনা করিলে, তদন্তর্ভূত গিরিসাগরাদির কল্পনা অসামঞ্জস্য লক্ষ্যের অন্তর্গত নহে বলিয়া অসামঞ্জস্য লক্ষ্যেরও প্রসক্তি হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু বলিতে কি, গলে গণ্ড, তদুপরি স্ফোটক, আর সেই স্ফোটকের আবার স্ফোটন হইলে, যাদৃশ অনিষ্টোপরি অনিষ্ট এবং তদুপরিও অনিষ্টপাত ঘটিয়া উঠে, এই বর্ণিত ব্যাপারও সেইরূপই বুঝিবে। যেমন একমাত্র শূন্য-স্বরূপ আকাশ; তাহাতে উৎপাতবশে গন্ধর্ব্বনগর, ধূমকেতু ও উল্কাদি-দৃশ্য সম্ভবপর, তেমনি এই শূন্যমাত্র স্বরূপ সঙ্কল্পময় চিদ্ব্যোম মহাপুরে ঈদৃশ কোটি কোটি বিচিত্র অসামঞ্জস্যও অসম্ভবপর নহে।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮২॥

ত্র্যশীত্যধিক শততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—অনন্তর আমি সেই গৌরী-আশ্রমবাসী তাপস ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাপসের কেশকলাপ পলিত হইয়া তাপশুষ্ক কুশাগ্রের ন্যায় তখন জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমার জিজ্ঞাসার বিষয় এই হইল যে, যথায় একইমাত্র সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী বিরাজিত, তথায় তাহারা অষ্ট ভ্রাতাই কিরূপে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইল? যে জীব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় না, তাহারই বা কিরূপে দিগ্‌বিজয় ব্যাপারে ক্ষমতা হইল? অপিচ বরদাতৃগণ বর দিলেন, অথচ সে সকলই বা কেন শাপফলে বিপরীত ভাব উপগত হইল? বস্তুতঃ যাহা শীতল ছায়া, তাহা কিরূপে নিদাঘের প্রখর আতপ হইয়া থাকে? একই ধর্ম্মীতে কিরূপে বিরুদ্ধ বর-শাপ-ফলতাবচ্ছেদক শুভাশুভ ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? আর, এক-ধর্ম্মীতে যদি স্থিতি অসম্ভব হয়, তবে তাহাদের পরস্পর নিজ নিজের আশ্রিতত্ব হওয়াও অসম্ভব; কেন না, যাহা আধার, তাহাই বা কিরূপে নিজেতে আধেয়-ভাব নিষ্পাদন করিবে?

গৌরী-আশ্রমের সেই তাপস কহিলেন,—হে সাধো! ইহাদের এই অসামঞ্জস্য দেখিতেছ কেন? তোমার এই প্রশ্ন সমাধান—এতৎপরবর্ত্তী ঘটনা শ্রবণেই হইয়া যাইবে, অতএব তুমি তাহা শ্রবণ কর। তোমরা এই দুইজনে অদ্য হইতে অষ্টম দিনে স্বীয় বন্ধুজনাধিষ্ঠিত মথুরাদেশে উপস্থিত হইবে এবং তথায় বন্ধুজনগণ সমভিব্যাহারে কিয়ৎকাল সুখে বাস করিবে। তদনন্তর সেই আট ভ্রাতাই একে একে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। বন্ধুবর্গ অগ্নিতে তাহাদের দাহ-সংস্কার করিবে, তাহাদের সম্বিদাকাশ জীব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া মুহূর্ত্তকাল যাবৎ সুষুপ্ত জড়বৎ অবস্থিত হইবে। তখন তাহাদের সেই যে বর-শাপাত্মক কর্ম্মসমূহ, তাহা ফলের অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ একত্র চিত্তাবচ্ছিন্ন আকাশে সম্মিলিত হইবে এবং সেই সেই ফলপ্রদ অধিষ্ঠাতৃ দেবরূপে স্ব স্ব অনুকূল বিষয়-ঘটিত বিভিন্ন সম্পুট করিবে। পরে সেই সম্পুটীভূত বর ও শাপ ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিবে। তখন বর সকল সুশোভন, পদ্মহস্ত, ব্রহ্মদণ্ডায়ুধ, চন্দ্রধবলাঙ্গ ও চতুর্ভুজধর হইবে, আর শাপ-সমূহ হইবে—ত্রিনেত্র, শূলহস্ত, ভীষণ, কৃষ্ণনীরদ-নিভ, দ্বিভুজ ও ভ্রূকুটী-বক্র। তৎকালে উল্লিখিত বরসমূহ বলিবে,—হে শাপসকল! তোমরা দূরে চলিয়া যাও; বসন্তাদি ঋতুসমূহের অভ্যুদয়কালের ন্যায় আমাদেরই আগমন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহার আছে? তৎশ্রবণে শাপসমূহ বলিবে,—তোমরাই দূরে পলায়ন কর, এক্ষণে আমাদিগের উপস্থিতির সময় হইয়াছে। বর সকল পুনর্ব্বার বলিবে,—হে শাপগণ! তোমাদের আবির্ভাব মুনি হইতে, আর আমাদের দিবাকর হইতে। দেবগণ মুনিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা বিধাতাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেন না, মুনিগণের পূর্ব্বেই দেবগণ বিধাতৃ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। বরগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণে শাপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিবে—সূর্য্য হইতে তোমরা উৎপন্ন হইয়াছ; আর আমরা রুদ্রাংশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছি। দেবগণের মধ্যে রুদ্র শ্রেষ্ঠ দেব; সেই শাপবিধাতা মুনি রুদ্রাংশ হইতেই উৎপন্ন। শাপগণ ইহা কহিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গোৎক্ষেপণবৎ ত্রিশূলাগ্র উত্তোলন করিলে তদ্দর্শনে বরগণ হাস্যপূর্ব্বক শত্রু শাপগণকে মনে মনে প্রণামান্তে প্রকাশ্যে কহিবে,—হে শাপসকল! অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ

কর; কার্য্যের যাহা পরিণাম, তাহারই বিচারে মনঃসংযোগী হও। দেখ, কলহ করিয়া শেষে যাহা করিতে হইবে, অগ্রে তাহাই বিচার করা কর্ত্তব্য। বিবাদ করিয়া পরিণামে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট যাইতে হইবে; সেখানে গিয়া যেরূপ হয়, একটা মীমাংসা করিতে হইবে। যাহা পরিণামে করা যাইবে, তাহা অগ্রেই কেন করা হউক না! বরসমূহের এইরূপ উক্তি শুনিয়া শাপগণ তাহাতে অঙ্গীকার করিবে, বস্তুতঃ মূর্খ হইলেও যুক্তিযুক্ত বাক্য কাহার না অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে? অনন্তর শাপ সকল বরসমূহসহ ব্রহ্মালয়ে যাত্রা করিবে; কেন না, সন্দেহ-দূরীকরণ ব্যাপারে মহাত্মগণই একমাত্র গতিস্থানীয়। যাহা হউক, শাপ ও বরসমূহের ব্রহ্মার নিকট উপস্থিতির পর তাহারা প্রণাম করিবে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই প্রকাশ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিবেন,—হে বর ও শাপাধীশ্বরগণ! তোমাদের মধ্যে শাস্ত্রানুশীলন ও দৃঢ়াভ্যাস নিবন্ধন যাহাদের আকার দৃঢ়তা আছে, তাহারাই অন্তঃসারশালী; এবং জয়ী হইতে তাহারাই হইবে। এখন তোমরা নিজেরাই পরস্পর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা অন্তঃসারসম্পন্ন? ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বর ও শাপ এই উভয় পক্ষই পরস্পরের সারবাত্তা দেখিবার নিমিত্ত পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ শাপহৃদয়ে বরগণ এবং বরহৃদয়ে শাপগণ প্রবিস্ট হইবে। তাহারা উভয় পক্ষই পরস্পরের হৃদয়সার পর্য্যালোচনা করিয়া জানিবে এবং সকলেই একমত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিবে। তন্মধ্যে অগ্রে শাপগণ কহিবে,—হে ব্রহ্মন্! আমরা পরাভূত হইয়াছি; কেন না, আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অন্তঃসার কিছুমাত্র নাই। এদিকে এই বরগণই পর্ব্বতবক্ষের ন্যায় অন্তঃসারশালী এবং বজ্রসম স্থিরতর। প্রভো! আমরা শাপ ও বর উভয়ই সম্বিন্ময়; আমাদের যে একটা স্বরূপ কিছু আছে, তাহা নাই। বরদাতার 'এই বর দান করা হইয়াছে' এইরূপ সম্বিৎ আছে, এই সম্বিৎই যাচকের নিকট 'আমি বর প্রাপ্ত হইয়াছি' এই জ্ঞানাকারে বিরাজ করে। উক্ত বরের ফল সুখভোগের আয়তনস্বরূপ হয়। উহাও আবার জ্ঞানমাত্রেরই কলনাত্মক কচনমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। তদনন্তর সম্বিৎই দেহাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দেশ-

কালাদি কল্পনার শত শত ভ্রমে সেই সেই ভোগ বিষয় বিলোকন করে, অনুভব করে এবং সেই সম্বিৎই যাহা খাদ্যাকারে প্রাপ্ত হয়,তাহা খাইয়া থাকে। তাহাতে যখন শাস্ত্রীয় তপস্যার সময় দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা বশীকৃত সম্বিদাত্মা হইতে গৃহীত হইয়া বরকল্পনাবিৎ ফলকালে পরিপুষ্ট হয়, তখনই তাহারা অন্তঃসার সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং তখনই দুর্জ্জয় হইয়া উঠে; কিন্তু যাহা শাপ জন্য সম্বিৎ, তাহা সেরূপ নহে। বরদাতৃগণ হইতে যাহারা বরপ্রার্থী হয়, তাহারা যখন বরদাতৃগণের বরদান বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস করে, তখনই উহা অন্তঃসারসম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, সম্বিৎ দ্বারা যাহা বহুকাল ধরিয়া অভ্যস্ত হয়, তাহাই সম্বিদের সারাকাররূপে পরিণতি পায়, এবং সম্বিৎও সত্বরই তন্ময়ী হইয়া উঠে। যে সমস্ত শুদ্ধ সম্বিৎ শাস্ত্রীয় বলিয়া খ্যাত,তন্মধ্যে যাহা অতীব শুদ্ধা, তাহাই সমধিক ফলপ্রদা; আর যাহা অশাস্ত্রীয় সম্বিৎ, তন্মধ্যে অতি অশুদ্ধা সম্বিৎই কালে অত্যধিক প্রবল হয়; সুতরাং ফলব্যাপারে উহাদের সমত্ব কিছুই নাই। ক্ষণাংশেও জ্যেষ্ঠই ন্যায়পূরক হয়; তাহারই প্রাবল্য হইয়া থাকে। এই কারণ জ্যেষ্ঠত্ব নিমিত্ত বর সম্বিদেরই প্রাবল্য হয়, অন্যায়কার্য্য সম্বন্ধে শাপের কোন অংশই প্রাবল্যকারণ নহে। তাই বলিতেছি, পরস্পরবিরুদ্ধ বর-শাপের যখন সাম্য হইবে, তখন দুগ্ধমিশ্র জলের ন্যায় শুভাশুভ উভয় কোটিস্থিত মিশ্রফলই ঘটিবে। স্বপ্নাবস্থায় পুরাত্মিকা চিৎ যেমন পুরবাসীদিগের দেহভেদে বিভক্ত আছে বলিয়াই প্রত্যয়গোচর হয়, তেমনি একই সময়ে বিভিন্ন দেশভোগ্য সমতাগত বর-শাপও বিপশ্চিদুপাখ্যানোক্ত প্রকারে উপাধিভেদে একইকালে দেহ ভেদ দ্বারা দ্বিবিধাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং নিজেই তাহা অনুভব করে।

শাপগণ ব্রহ্মার নিকট এইরূপ তত্ত্বাখ্যান প্রকটিত করিয়া কহিবে,—ব্রহ্মন্! আপনার নিকটেই যাহা শিখিয়াছিলাম, তাহা আবার আপনার নিকট বলা নিতান্তই ধৃষ্টতাসূচক; কাজেই ইহা অশোভনই বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমাদের এই ধৃষ্টতা আপনি ক্ষমা করুন। আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, এই বলিয়া সেই শাপগণ কোথায় চলিয়া যাইবে। মনে হইবে, নয়নের তিমিররোগ উপশান্ত হওয়ায় আকাশে ভ্রমজন্য কেশো-

শুক যেন আর রহিল না। শাপগণ গমনকালে আপনাদিগকে বৃথাপ্রয়াসী ও নিজ মূঢ়তাখ্যাপক বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে যাইবে। শাপগণের অন্তর্দ্ধান হইবার পরই দেবী গৌরী তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণকে পূর্ব্বে যে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল বর আসিয়া শাপস্থান পূরণ করিয়া বসিবে। অনন্তর তাহারা তখন ব্রহ্মসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিল,—হে দেববর! এই সমস্ত ভাবী সপ্ত দ্বীপাধীশ্বররূপে নিরূপিত জীবনিবহের শবগৃহ হইতে বহির্গমন কি প্রকারে হইবে, তাহা আমাদের অবিদিত; কেন না, আমরাই তো তাহার রোধকরূপে আদিস্ট আছি। এই সমস্ত বীর বরশ্রেষ্ঠই সপ্ত-দ্বীপাধীশ্বরদির্গকে সংগ্রামে দ্বিগ্‌বিজয়ী করাইবে। সুতরাং এ কার্য্যে বিরোধ সংঘটন নিশ্চিতই; এই জন্য আপনাকে সবিনয়ে বলিতেছি, হে সুরেশ্বর! এ ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের মঙ্গলার্থ আপনি তাহা আদেশ করুন।

ব্রহ্মা কহিবেন,—হে সপ্ত দ্বীপাধিপ বরগণ, আর হে গৃহরোধ বরগণ! তোমাদের উভয় পক্ষেরই অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। যে হেতু তোমরা এ ব্যাপারে পরস্পরাপেক্ষী রহিয়াছ। অপিচ বহুকাল ধরিয়া তোমাদের এ বিষয়ে পরস্পর ইচ্ছাবিরোধ ও অভিলাষের অভাব রহিলেও সেই অস্ট ভ্রাতা মৃত্যুর পরক্ষণ হইতেই নিজ গৃহাভ্যন্তরে বহুকাল যাবৎ সপ্তদ্বীপেশ্বররূপে বিরাজ করিবে। তাহাদের যেমন যেমন দেহাবসান হইবে, অমনি তাহারা নিজ নিকেতনে সপ্ত দ্বীপাধিপ হইবে। সুতরাং দেবীদত্ত সমস্ত বরই তাঁহাদের সুসিদ্ধ হইয়াছে। বরগণ তৎশ্রবণে সকলেই এক সঙ্গে বলিবে—সত্যই যদি তাহারা সপ্তদ্বীপের অধীশ্বরত্ব লাভ করে, তবে সেই অস্টভূমণ্ডল কোথায় আছে? আর সপ্তদ্বীপাত্মক অস্ট সম্পত্তিই বা কোথায় রহিয়াছে? আমরা জানি, এ জগতে একই ভূমণ্ডল বিদ্যমান আছে এবং বৈদিক এবং লৌকিক উক্তিতেও ঐরূপই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যদিই বা বিভিন্ন ভূমণ্ডল থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে সে সকল ঐ ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে?—সূক্ষ্ম পদ্মকোষে হস্তীর অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হয়! এ সকল বলুন।

ব্রহ্মা কহিবেন,—তোমরাই কি, আর আমরাই কি, সমস্তেই ব্যষ্টি-

সমষ্টি সমন্বিত সমগ্র জগদ্‌ব্যোমাত্মক হইয়া একমাত্র চিৎপরমাণুমধ্যে অব-স্থিত, অতএব [illegible]; সুতরাং ঐ সকলও সেই পরমাণুর অন্তর্গত স্বগৃহ মধ্যে প্রতিভাত; এতদন্যান্য পরমাণুর অন্তঃস্থিত গৃহান্তরালে পরি-মিত, তাহার স্ফুরণে অপূর্ব্বত্বই বা কি আর বিস্ময়াবহত্বই বা কি? যেমন স্বপ্ন হইয়া যায়, অমনি এত যথাবস্থ জগৎ ঘনাকারে প্রতিভাত হয়। চিৎ-স্বরূপের অণুর অভ্যন্তরস্থ গৃহাভ্যন্তরে এই জগৎ পর্য্যন্ত পরিমিত হয়, কাজেই এই সপ্তদ্বীপা বসুধা যে স্ফূর্ত্তি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহা জগত্তত্ত্বরূপে প্রতিভাত, তাহা চিৎই। শূন্যত্বে প্রতিভাত আকাশের ন্যায় চিন্মাত্রই এই জগদাকারে প্রতিভাত। এ অব-স্থায় কুত্রাপি এ জগৎ মূর্ত্তাকারে নাই, যাহা দেহে পরিমিত হইবার নহে।

বরদ বরেণ্য ব্রহ্মা যখন এই কথা কহিবেন, তখন সেই বীরগণ সেই পূর্ব্বকল্পিত আধিভৌতিক ভ্রান্তিময় দেহনিচয়কে তত্ত্ব বিচার দ্বারা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে এবং তথা হইতে অবিরোধে সকলেই মিলিত হইয়া যুগপৎ ভ্রাতৃগণের তত্তৎ মনঃ-কল্পিত সপ্তদ্বীপে তত্তৎ দেবতার গৃহকোষে প্রয়াণ করিবে। তখন সেই অষ্ট ভ্রাতা সকলেই সেই গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মপুরঃসর বন্ধুবর্গে পরিপুষ্ট হইয়া আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনুগণের কুলে সপ্তদ্বীপের অধিনায়ক-রূপে বিরাজ করিবে। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না; প্রত্যেকেই বন্ধুভাবে পরস্পর অবস্থান করিবে। তাহাদের রাজ্যভেদ নিমিত্ত সকলেই আধিপত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রহিবে! পরস্পরের ভূমণ্ডলে পরস্পর গমন করিবে, কেহই কাহারও বিরুদ্ধ চেষ্টায় লিপ্ত রহিবে না। তাহাদের কেহ যৌবনশোভনরূপে মহানগরী উজ্জয়িনীর সিংহাসনে মহাসুখে বাস করিতে থাকিবে, কেহ বা শাকদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া পাতালতল জয় করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিবে এবং সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিতে থাকিবে। কেহ বা প্রকৃতিপুঞ্জের সাহায্যে দিগ্বিজয় করিয়া কুশদ্বীপ রাজধানীতে সুখে রাজ্য করত বাস করিবে। কেহ শাল্মলিদ্বীপের গিরিরাজ-শিখরস্থিত নগরীর কেলি-সরোবরে বিদ্যাধরীবৃন্দ সমভিব্যাহারে জলক্রীড়ায় নিরত রহিবে। কেহ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়া তত্রত্য সপ্তদ্বীপা সমৃদ্ধি

বর্দ্ধিত সুবর্ণপুরে আট দিন যাবৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে থাকিবে এবং কেহ বা দিগ্‌গজগণোৎপাটিত দন্ত দ্বারা কুলাচল সকল আকর্ষণপূর্ব্বক দ্বীপান্তরচারী রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইবে। উক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অর্থাৎ অষ্টম ভ্রাতা গোমেদদ্বীপের অধিবাসী হইয়া কামবশে পুষ্করদ্বীপাধিপতিকে পরাজয়পূর্ব্বক তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণার্থ সৈন্য প্রেরণ করত শক্রদেশ উৎপীড়িত করিতে উদ্যত হইবে এবং অপর একজন পুষ্করদ্বীপের অধিবাসী হইয়া লোকালোকাচলে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক নিধির আকর দেখিবার নিমিত্ত দূত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিবে। ইহারা এইরূপে স্বীয় গৃহকোষে স্ব স্ব প্রতিভাবিত দ্বীপাধিপত্য করিতেছে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বরই সেই আতিবাহিক দেহে আভিমানিক আকার পরিহারপূর্ব্বক সেই অষ্ট ভ্রাতার অষ্ট জীবসম্বিৎসহ আকাশে আকাশের সহিত সম্মিলিত হইবে। এইরূপে সেই অষ্ট ভ্রাতা আনন্দময় রাজ্য ও অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি নিমিত্ত বহুকাল পরিতোষ লাভ করিবে। তাহাদের বরলাভ বশতঃ তৎফলস্বরূপ কার্য্যার্থের বিকাশ-ঘটনায় সেই ভ্রাতৃগণ উক্ত প্রকার সপ্তদ্বীপাধিপত্য প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রত্যক্‌চৈতন্যের অন্তরে দৃঢ় নিশ্চয়াত্মরূপে যাহার স্ফুরণ হয়, বাহিরে তাহাই প্রকট হইয়া থাকে। সুতরাং তদুপযোগী তপোজপাদি কর্ম্ম দ্বারা কাহার না উহা লব্ধ হইয়া থাকে ?

ত্র্যশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। ১৮৩॥

চতুরশীত্যধিক শততম সর্গ।

—*—

কুন্দদন্ত কহিলেন,—সেই বৃদ্ধ তাপস এই সকল কথা কহিলে আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কিরূপে সেই গৃহান্তরালের অল্পাবকাশ মধ্যে প্রত্যেকতঃ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল প্রতিভাত হইবে ? কদম্বতাপস প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—চিদ্ধাতু সর্ব্বব্যাপী ; তাঁহার স্বরূপই এই যে, সে নিষ্প্রপঞ্চ ব্যোমস্বরূপ হইলেও স্বীয় সর্ব্বগামিত্ব বশতঃ যত্র

যত্র অধিষ্ঠান করেন, তত্র তত্রই আত্মায় আপনি আত্মাকে স্বীয় শূন্যাত্মক স্বরূপের অপরিহারক্রমে তত্তৎত্রৈলোক্যরূপে বা অন্য সুষুপ্ততুর্য্যাকারে দেখিয়া থাকেন। তৎশ্রবণে কুন্দদন্ত কহিলেন—যাহা বিমল, শান্ত শিব-স্বরূপ, একমাত্র পরম কারণ পদার্থ, তাহাতে এই স্বভাবসিদ্ধ বাস্তবরূপে প্রতীত, নানাভাব কি করিয়া বিরাজমান ?

কদম্বতাপস কহিলেন,—এই যে নানাভাবের কথা কহিলে, ইহা বাস্তব নহে। কিন্তু যাহা কিছু ভ্রান্তিকৃত, সকলই শান্ত চিদাকাশমাত্র; এ জগতে নানাত্ব কিছুই বিদ্যমান নাই। জলের যেমন আবর্ত্ত, তেমনি উহা স্পষ্টতঃ সুবিস্তৃতরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও উহা বাস্তব পক্ষে কিছুই নহে বা নাই। এই পদার্থ সমস্তই অসৎ; ইহাতে যাহা 'পদার্থ' এই নামে ও স্বরূপে প্রতিভাত হয়,তাহা চিদাকাশমাত্রই। চিদাকাশই স্বপ্ন সুষুপ্তবৎ বিস্মৃত স্বীয় যথাযথ স্বভাবাত্মক হইয়া বর্ত্তমান; উহা তাহারই নিজ অজ্ঞাত-স্বরূপই। চিত্ত যেমন স্বপ্নাবস্থায় সস্পন্দ হইলেও নিস্পন্দ থাকে, অন্যদিকে পর্ব্বতাকার-প্রাপ্ত বা পর্ব্বতবৎ অচল হইলেও পর্ব্বতাকার উপগত বা পর্ব্বতের ন্যায় অচল থাকে না, তেমনি যাহা সন্মাত্রবিস্তার, তাহাও কল্পিতার্থের অন্তর্গত হইলেও একই সেই সন্মাত্ররূপে অবস্থিত; উহা সস্পন্দ হইলেও স্পন্দ-বর্জ্জিত এবং পর্ব্বতপ্রায় অচল হইলেও পর্ব্বতের ন্যায় অচল নহে। যাহা সর্ব্বাত্মক চিৎস্বভাব, তাহার বাস্তবরূপে সর্গাদি-স্বভাব অথবা সর্গাদিকৃত পদার্থ কিছুই কখন নাই। তবে কথা এই, যাহা সর্গাদিতে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, তাহাই সেইভাবে অবস্থান করে। এই যে কচন বা কচনাভাব, ইহাকে পরম রূপ বলা যায় না কিম্বা যাহা দ্রব্যাত্মক, তাহাও পরম রূপ নহে। অথবা এই যে চিদ্‌ব্যতিরিক্তাত্মা, ইহাও পরম রূপাখ্যায় উক্ত নয়। এইভাবে কোন চিদ্‌ব্যোমই একইরূপে অবস্থিত আছে। স্বপ্নে সেনাসঞ্চয় দেখা যায়; তাহাতে একই নির্ম্মল চিৎ যেমন লক্ষ লক্ষ জনভাব-প্রাপ্তির ন্যায় প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এই চিৎস্বরূপের যে পদার্থভাব, তাহাও তেমনি জানিবে। আত্মায় চিদাকাশ আপনা হইতেই স্ফুরিত হন, উনি সেই স্ফুরণেই জগদাকারে অনুভূত হইয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় প্রকৃতপক্ষে অগ্নি নাই, তথাচ যেমন উষ্ণত্ব আভাসমান হয়, তেমনি সেই যে সম্বিন্মাত্রা-

ত্মক আকাশ, তাহাতে পদার্থরাজি প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও উহারা আপনা-পনি প্রকাশমান হইয়া থাকে। স্বপ্নাকাশে প্রকৃত পক্ষে স্তম্ভ নাই, তথাচ যেমন তাহাতে স্তম্ভজ্ঞান হয়, তেমনি ঐ চিৎও নানা ভাবের অসদ্ভাবেও নানা-রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ঐ নানাত্ব যদিও চিদ্‌ভিন্ন নহে, তথাচ যেন ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। অর্থক্রিয়া নিয়তির কারণ এই যে, সেই স্বভাব-সুবিমল চিদাকাশই আদিসৃষ্টিতে পদার্থাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। চিদাকাশ কর্ত্তৃক সেই আদ্য সৃষ্টিকালে যাহা যেরূপে বিদিত হয়, তাহা অদ্যাপি তেমনি ভাবে লব্ধ হইয়া থাকে। পুষ্পেই কি, পত্রেই কি, আর ফলেই কি, যেমন সর্ব্বত্র একই বৃক্ষ তত্তদাকারে ব্যস্ত থাকে, তেমনি এই সমগ্র জগতে সেই সর্ব্বাত্মক পরম চিদাকাশই বিস্তীর্ণ আছে জানিবে। পরমার্থাকাশ যেন সমুদ্র; তাহাতে সর্গপরম্পরাই জলস্থানীয়। পরমার্থ মহাকাশে যে শূন্যতা; তাহাই সর্গপ্রতিভাস বলিয়া বিদিত হইবে। যথার্থ জ্ঞানে পরমার্থ ও সর্গ—তরু ও বৃক্ষের ন্যায় একেরই পর্য্যায়। আর অযথার্থ জ্ঞানে এই দ্বৈতজ্ঞান—কেবল দুঃখেরই নিদান। অধ্যাত্মশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইলে পরমার্থ ও জগৎ যে একই পদার্থ, ইহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। সেই যে নিশ্চয়, তাহারই নাম মুক্তি। সঙ্কল্পকরী চিদাবৃত্তির যে সঙ্কল্পশরীর, তাহা ব্রহ্মই; জগতের রূপ—তাহাই; অতএব এ জগৎ ব্রহ্মাত্মক বৈ আর কিছুই নহে। বাক্যের অতীত বলিয়া যাহা হইতে বাক্যের নিবৃত্তি হয়, অপিচ নিষিদ্ধ শব্দও তন্নিষ্ঠ বলিয়া ঐ বাক্য নিবৃত্তও হইবার নহে, অন্যদিকে বিধিই কি, প্রতিষেধই কি, আর ভাবাভাব দৃষ্টিই কি, সকলই যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, যাহা মৌনামৌন জীবাত্মস্বরূপ, পাষাণ-বৎ দৃঢ়াবস্থিতিস্বরূপ এবং যাহা সৎ হইয়াও অসদাভাসস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতেই যাহা একমাত্র অধিষ্ঠান; সেই নিরাময় সর্ব্ব-ময় এক ব্রহ্মে ভাবাভাবাদি বস্তুরূপা সৃষ্টির প্রবৃত্তিই বা কি? আর প্রলয়-রূপিণী নিবৃত্তিই বা কি? একমাত্র অবিচিত্র নিদ্রায় যেমন চিত্রবৎ নিয়ত নানা সৃষ্টি-প্রলয়-বিভ্রম প্রতীত হয়, তেমনি অবিচিত্রা এক চিদাকাশসত্তায় এই প্রভূত বীজভূত প্রলয়-স্থিতি-পরম্পরা চিত্রবৎ প্রতিনিয়ত প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। যেমন দধি প্রভৃতি দ্রব্য শর্করাদি নানা দ্রব্য সহ সংযুক্ত

হইয়া প্রত্যেকে রুচি, পুষ্টি ও পিত্তোপশমাদি গুণান্তর সংঘটন করিয়া দেয়, তেমনি প্রাণিপুঞ্জের অন্তঃকরণাভিব্যক্ত প্রমাতৃ চিৎসার বাহ্যিক বিষয়ে চক্ষুরাদি যোগে বহির্গত হইয়া অন্তরনির্ণীত চিদাবরণের বিনাশ-ঘটনায় পরস্পর মধ্যে ত্রিপুটীস্ফুরণ প্রতিপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং ঘটাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তও স্বাধিষ্ঠান চিদধীন সত্তায় পরিস্ফুরিত হয় বলিয়া ঐ সমুদায় পদার্থ চিৎসার মাত্র এবং উহা সদাই অপ্রতিঘ। উহার একমাত্র আত্মা চিন্মাত্রই; তাই ঐ সমস্ত ঘটাদি পদার্থ সর্গাদিতেও যেমন প্রকট, এখনও তেমনি প্রকট বলিয়া বিদিত হইবে। জানিবে—একমাত্র চিন্মাত্রসার বলিয়া ঐ সমুদায় পদার্থের স্থিতিও সম্বেদনা-নুযায়িনী। সর্ব্ব দ্রব্যশক্তিরও নিস্পন্দ চিৎই একমাত্র অধিষ্ঠান; তাই তাহারা স্বাশ্রয় হইতে অবিচলিত বা অহ্রাস-প্রাপ্ত। তাহাদের স্ফুরণ কেবল মানস দ্বৈতাকার গ্রহবিরহিতভাবেই হয় মাত্র। এই যে বিশাল জগৎ দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্র সহ এতৎসমস্তই স্বপ্নোপম, ইহার বিদ্যমানতা একেবারেই নাই। কেন না, ঐ চরাচরাত্মক চিৎ-সলিলে হর্ষামর্ষ-বিষাদ-জনিত বিচিত্র স্পন্দরীতি স্বপ্নপ্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মকতায়—অহো! এই বিশাল জগৎ জনন-মরণাদি সহস্র কোটীরূপে কিরূপই না সুসম্পন্ন হইয়াছে! নেত্রদোষ-দুষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিতেই আকাশে কেশোণ্ডুক পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই রূপ নিদর্শনায় বলা যায়, অজ্ঞানাবৃত চিদ্দৃষ্টিরই স্বাত্মাকাশে এই জগদ্ভ্রম প্রতিভাত হয়। যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প, সেই পর্য্যন্তই ঐ ভ্রান্তির অবস্থিতি হয়। যেভাবে সঙ্কল্পনা হয়, তদনুসারেই ঐ ভ্রান্তির রূপ; ফল কথা এই, সঙ্কল্প-নগরী যেরূপ প্রকাশমান হয়, এই জগৎও সেইরূপ সঙ্কল্পানুসারে প্রকাশমান হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত সঙ্কল্পনগরে সঙ্কল্পসমূহের স্থিতি, সেই পর্য্যন্তই যেমন সেই সঙ্কল্প-নগরের অবস্থান, তেমনি এই জগদ্ভ্রান্তি প্রকৃত পক্ষে যদিও অসদ্রূপা, তথাচ অনুভবপথে থাকিয়া সদ্রূপার ন্যায় বর্ত্তমানা। উহাই বিধাতার সঙ্কল্পরূপিণী নিয়তি; এই নিয়তিই নিয়মানু-ভূতার্থ-প্রদায়িনী হইয়া অদ্যাবধি প্রবহমাণা। উহা প্রথমেও প্রবাহিত ছিল, ভবিষ্যতেও প্রবাহিত হইবে। ঐ নিয়তি অনুসারেই স্থাবরাদি প্রাণিবৃন্দ

যথাক্রমে নিয়মবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান। সেই নিয়তিবলেই জঙ্গম জীব হইতে জঙ্গমোৎপত্তি এবং স্থাবর হইতে স্থাবরোৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। সেই জন্যই জল নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয় এবং অগ্নি ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। এই দেহযন্ত্র নিয়তিপ্রসাদেই পরিচালিত হয়; জ্যোতিঃপদার্থ তন্নিমিত্তই তাপ দান করে, বায়ু সকল সদাগতি হয় এবং শৈলাদি স্থিরভাবে অবস্থান করে। সেই নিয়তির নিয়মবশেই জ্যোতির্ম্ময় কালচক্র দাক্ষিণায়নরূপে পরাবৃত্ত হয় এবং বর্ষাকালে গগনতল ধারাসারে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। উক্ত কালচক্র যুগসম্বৎসরাদি-স্বরূপ হইয়াও নিয়ত নিয়তির প্রভাবেই ঘুরিতেছে। উল্লিখিত নিয়তির বলেই ভূতলে দ্বীপভেদভিন্ন সমুদ্র সকলের ও পর্ব্বতপুঞ্জের সন্নিবেশবিশেষ স্থিরবৎ প্রত্যয়গোচর হইতেছে। অপিচ ভাব, অভাব, গ্রহণ, বর্জ্জন, ইত্যাদিরূপ দ্রব্যশক্তিও অবস্থিত আছে।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—অস্মদাদি জনসাধারণের ব্যবস্থাক্রমে বিধাতার সঙ্কল্পরূপ নিয়তিতে না হয় না-ই ব্যস্থিত হউক, পরন্তু যখন পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারের অতিরিক্ত হেতু সম্ভাবনা নাই, তখন পূর্ব্বানুভবের অপ্রসিদ্ধি নিমিত্ত তদীয় সঙ্কল্পব্যবস্থা সিদ্ধ হয় কিরূপে? কেন না, যাহা পূর্ব্বদৃষ্ট, তাহাই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, অনন্তর তাহাই আবার তদনুগত সঙ্কল্প হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় স্বসঙ্কল্প হইতেই নিয়মবদ্ধ সৃষ্টি প্রকট হইতে থাকে। এই যাহা, ইহা দ্বিতীয়াদি কল্পসৃষ্টিতেই হওয়া সম্ভবপর; পরন্তু আদি কল্প-সৃষ্টি ব্যাপারে প্রথম সৃষ্টি প্রকাশ কাহার প্রথিত,—যাহা বিধাতার জিজ্ঞাস্য বা স্মর্ত্তব্য?

সেই তাপস কহিলেন,—বিধাতার যে সঙ্কল্প, তাহা স্মরণায়ত্ত নহে; পরন্তু তাঁহার দিব্যজ্ঞানে যে অতীত ও অনাগত নিখিল বস্তু দর্শন, উহা তাহারই আয়ত্ত। সেই যে প্রথম সৃষ্টিক্ষণ, তাহাতে নিখিল অতীতানাগত জগৎ প্রথমতঃ না থাকিলেও বিধাতা স্বীয় দিব্য জ্ঞানবৈভবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই দর্শনানুযায়িনী চিদ্‌বিবর্ত্তরূপা সাঙ্কল্পিকী সৃষ্টিই প্রবর্ত্তমান হয়। এইরূপ হয় বলিয়া তাহাতেই 'ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট' এই প্রকার অধ্যাস হইয়া থাকে। সেই অধ্যাস-অভ্যাসেই স্মৃতি হয়। চিদাকাশে

জগৎরূপ সঙ্কল্পনগরের প্রকাশ চিদ্‌ভাবপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। উহা না সৎ, না অসৎ, কিছুই নহে। কেন না, চিদ্‌ভাব নিবন্ধন চিদাকাশে উহা কখন স্বতই প্রতিভাত হয় এবং কখনও বা হয়ও না। প্রসন্নতাগুণে যে চিৎ স্বপ্ন সঙ্কল্পমাত্রেই অনুভবলভ্য হয়, সেই শুদ্ধ চিদাকাশ সঙ্কল্প-নগর স্মৃত হইবে না কেন? এই জন্যই গুণদোষাদির অস্মরণ হেতু হর্ষামর্ষশূন্য তত্ত্বজ্ঞগণ কুলালচক্রের ন্যায় সুখদুঃখাত্মক প্রারব্ধ পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যখন নিদ্রাপগম হয়, তখন যেমন স্বপ্ননগরের স্মরণ করিলে অধিষ্ঠানভূত চিদাকাশাত্মকতা-মাত্রই পরিশেষে পর্য্যবসিত হয়, এই যে ত্রিজগদ্‌ভ্রম, ইহাও তেমনি অবগত হইবে। এই জগৎ সম্বিতের অভ্যাসমাত্রই; সুতরাং ঐ জগৎ কেবল সংশান্ত সম্বিদ্‌ব্যোম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেন না, সমস্ত পদার্থ চিৎস্বরূপেই অবস্থিত। উক্ত চিৎ হইতেই সমুদায় সমুৎপন্ন। ঐ চিৎই সকল, সকল পদার্থেই চিৎ অবস্থিত। সর্ব্বত্ব নিবন্ধন সর্ব্বপদার্থই সর্ব্বস্বরূপ। অতএব সেই যে সংশান্ত চিদাকাশ, তাহাই সর্ব্ব এবং সর্ব্বদার জন্য বিরাজিত; সুতরাং সেই ব্রহ্মবিষয়ক সংসার যাদৃশ ও যৎস্বরূপ এবং দৃশ্যের ভানও যে প্রকার, তৎসমুদায়ই তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে হে ব্রাহ্মণযুগল! গাত্রোত্থান কর। প্রভাতে ভ্রমরদ্বয় যেমন পদ্মাশ্রয় করে, তোমরাও তেমনি নিজ গৃহে গিয়া আশ্রয় লও। সেখানে উপস্থিত হইয়া তোমরা তোমাদের নিজ অভিমত কার্য্য সম্পাদন কর। এদিকে আমার সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় আমিও অতি দুঃখে বাস করিতেছি। আমার সেই দুঃখ প্রশমনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমি সমাধি অবলম্বন করি।

চতুরশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮৪॥

পঞ্চাশীত্যধিক শততম সর্গ।

কুন্দদন্ত কহিলেন,—ঐ কথা কহিয়া সেই জরাতুর মুনি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে চিত্রবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। আমরা সপ্রণয় উদার বাক্যে বারম্বার প্রার্থনা করিলেও তিনি আর আমাদিগের কোন কথারই উত্তর প্রদান

করিলেন না। কেন না, তখন তাঁহার বাহ্যবৃত্তি শান্ত হইয়াছিল। সংসার-বিষয়ে তিনি আর তখন কিছুমাত্রই অনুসন্ধানপর ছিলেন না। আমরা মুনির তথাবিধ অবস্থায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর কিয়দ্দিন পরেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের বন্ধুগণ আমাদিগকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন। পরে কুলদেবতার আরাধনা করিলাম, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি উৎসবব্যাপার সমাধা করিলাম, কত প্রাচীন কথা কহিলাম, এইভাবে বহুকাল গৃহে বাস করিলাম। অতঃপর কাল-ক্রমে একে একে সেই সপ্ত ভ্রাতাই প্রলয়ের দ্বাদশাদিত্য-তাপে সপ্ত সমুদ্রবৎ লয় প্রাপ্ত হইলেন। আমার সখা—তাঁহাদের সেই অষ্টম ভ্রাতাই মাত্র রহিলেন। কিন্তু কালের বশে আমার সেই সখাও দিনাবসানের দিবসকরবৎ অস্তমিত হইলেন। তৎকালে বন্ধুবিয়োগে আমার বড়ই দুঃখ হইল; সে দুঃখে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। অনন্তর দুঃখিত-চিত্তে পুনর্ব্বার সেই কদম্বরুক্ষলম্বিত তাপসের নিকট গমন করিলাম। নিজ দুঃখ দূর করাই আমার অভিপ্রায় ছিল; সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে সেই মুনিসমীপে গিয়া তৎকথিত যে আত্মজ্ঞান শুনিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার্থ তৎসমীপে আবার গমন করিলাম। একে একে তিন মাস অতীত হইল, পরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন আমি প্রণতিপুরঃসর তাঁহার নিকট সেই আত্মজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি এবার আমায় বলিলেন,—আমি সমাধিনিষ্ঠ হইয়া ক্ষণ-কালও থাকিতে পারি না; সুতরাং সত্বরই আবার আমি সমাধিনিষ্ঠ হইতেছি। আর এক কথা, বিনা অভ্যাসে পরমার্থ উপদেশ তোমাতে সংক্রামিতও হইবার নহে। তাই বলিতেছি, ওহে অনঘ! মৎকথিত এই পরম যুক্তি শ্রবণ কর। অযোধ্যা নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নগরী আছে। তথায় দশরথ নামে জনৈক রাজা আছেন। সেই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে প্রথিত। তুমি সেই রামের নিকট যাও। রামচন্দ্রের কুলগুরু মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সভাস্থ হইয়া তাঁহাকে মোক্ষোপায়-কথা কহিবেন। হে দ্বিজ! তুমি যদি তাহা শুনিতে পার, তবে আমারই ন্যায় পূত পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। সেই মুনি এইমাত্র বলিয়াই সমাধিরূপ সুধাসাগরে মগ্ন হইলেন। তৎপরে আমিও এই এক্ষণে ভবৎসমীপে

আগমন করিলাম। এই তো যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট, যথা-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথরূপ আপনার নিকটে কথিত হইল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—সেই বাক্যকোবিদ কুন্দদন্ত এইরূপ বাক্য বলিয়া সেই হইতে মৎসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। এই সেই কুন্দ-দন্ত দ্বিজ; ইনি মৎসমীপে থাকিয়া এত দিন এই মোক্ষোপায়-সংহিতা শুনিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর সংশয়-নাশ হইয়াছে কি না, আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

বাল্মীকি কহিলেন,—রঘুকুলপ্রদীপ রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, সেই বাগ্মিবর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কুন্দদন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—হে অনঘ দ্বিজাগ্রণী কুন্দদন্ত! আমি যে এতকাল এই পরম মোক্ষপদ উপদেশ করিলাম, তাহা তুমি বুঝিয়াছ কি? বুঝিয়া থাকো, তো বল?

কুন্দদন্ত কহিলেন,—এক্ষণে মদীয় চিত্ত সমস্ত সংশয়চ্ছেদী হইয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিয়াছে। আমি সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি, এখন আর আমার কোনই সংশয় নাই। সর্ব্বজ্ঞাতব্যই আমি জ্ঞাত হইয়াছি; সুতরাং আমার আর এখন মোহমাত্র নাই। দ্রষ্টব্যই কি, আর প্রাপ্তব্যই কি, কিছুই আর আমার অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, সকলই আমি দেখিয়াছি; যাহা প্রাপ্তব্য, পাইয়াছি। এক্ষণে আমি সেই পরম পদে বিশ্রাম লইতেছি। আত্মচিৎ কাহাকে বলে, তাহা কিরূপ, তাহা আমি ভবৎপ্রসাদে অবগত হইয়াছি। এই সকলই পরমার্থঘন বলিয়া ঘন; সেই যে পরমার্থ-ঘন, তাহাই স্বীয় অভিন্ন জগদাকারে স্বাত্মাকাশে পরিস্ফুরিত। ঐ যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপী, উহাঁরই সর্ব্বাত্মকতা নিমিত্ত সকলের দ্বারা সমস্তই সর্ব্বত্র সদা সম্ভবপর। এ কথায় সন্দেহমাত্র নাই। শ্বেত শর্ষপকণার অন্তর্গত অবকাশেও অধিষ্ঠান চিত্তের সর্ব্বকল্পনাশক্তি পূর্ণভাবে আছে; সেই নিমিত্ত মায়াদৃষ্টিতে তদন্তরে জগৎপরম্পরা সম্ভবপর, আর যদি পরমার্থদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে কুত্রাপি উহা সম্ভবপর হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। অপিচ ইহাও আমার জানা হইয়াছে যে, গৃহাভ্যন্তরে সপ্তদ্বীপা বসুধাও সম্ভবপর হইয়া থাকে।

অপিচ তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে শূন্যেই যে গৃহের পর্য্যবসান, ইহাও সত্য এবং নিঃসংশয়িত। যে বস্তু যে কালে যাদৃশভাবে উদিতাকরে প্রতিভাত হয়, তাহাই এ জগতে সাধারণের অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। কেন না, সেই সেই বস্তু—সে কালে সেই সর্ব্বঘন আত্মভাবেই নিখিল জনের সার্ব্বকালিক বোধ বিষয়ে সর্ব্বভাবে বিদ্যমান থাকে; তদ্‌ব্যতীত কখন কাহারও অণুমাত্রও অনুভবগম্য হয় না।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিক শততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—যেইমাত্র কুন্দদন্তের কথার অবসান হইল, অমনি ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি এই পরমার্থোচিত বাক্য বলিলেন যে, অহো! ইহা আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এই মহাত্মার শাস্ত্রশ্রবণজনিত জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে এই মহাপুরুষ করতলগত আমলকফলবৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্মময় দেখিতেছেন। 'এই ভ্রান্তিমাত্রাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মই' এই মহাত্মার নিকট এক্ষণে এইরূপই প্রতিভাসমান হইতেছে। কেন না, ভ্রান্তিও ব্রহ্ম, আর সেই ব্রহ্ম যে একমাত্র শান্ত নিরাময়স্বরূপ, ইহাই বটে প্রতিভাসমান হইতেছে। ব্রহ্মনিষ্কর্ষ-দৃষ্টিতে ইনি যাহার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যথার্থই বটে; যাহা দ্বারা যাহা যেরূপ, যাহা হইতে যেখানে যখন যেরূপভাবে বিদ্যমান, তাহা দ্বারা তখনই তাহা তথা হইতে তথায় তৎকালে তদ্রূপেই বর্ত্তমান। অপিচ তাহা যে মায়াবিকার ব্যতীত শিব, শান্ত, অজ, মৌন, অমৌন, অজয়, শূন্য, শূন্যান্তর, অনাদিনিধন, ধ্রুববস্তুই বিতত, এ বর্ণনাও সমীচীন। মায়াশবল চিৎ কর্ত্তৃক যে যে অবস্থায় সঙ্কল্পাতিশয় কৃত হয়, সেই সেই অবস্থাই লতাবিশেষবৎ সহস্রশাখাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডই পরমাণু; কেন না, তাহা চিদাকাশের অন্তরে বিরাজমান। অন্যদিকে পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ড; কেন না, তদভ্যন্তরেই জগৎ অব-

স্থিত। তাই বলিতেছি, এতৎসমস্তই যখন আদি-মধ্য-বিরহিত, নির্ব্বাণ-স্বরূপ সৌম্য চিদাকাশই হইল, তখন শরীরাদিবৈচিত্র্যরূপ বন্ধনবর্জ্জিত ও নিরাময়াত্মা হইয়া যথাবস্থ ব্রহ্মরূপেই তুমি অবস্থান কর। ব্রহ্ম আপনি দ্রষ্টা, আপনি দৃশ্য, আপনি চিত্ত, আপনি জড়, আপনি কিঞ্চিৎ, আপনি অকিঞ্চিৎ ; এ সকল অবস্থা তাঁহার ব্যবহারদৃষ্টিতে হয়। অন্যদিকে পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, স্বস্বরূপে বিরাজমান। এ জগতে শান্ত ব্রহ্মাকাশ যথায় যদ্বাসনায় যদাকার হন, তথায় তিনি স্বস্বরূপের অপরিহারক্রমেই আত্মায় স্বয়ং সেই ভাবেই অবস্থিত হইতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার আত্মার স্বরূপ পরিহার হয় না। মায়াক্রমে ব্রহ্ম এই দৃশ্য জগৎ হইয়াছেন বলিয়া এক্ষেত্রে তাঁহার দ্বৈতভাব মন্তব্যই নয়। কেন না,ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বকালেই যথাবস্থ অবিকৃতভাবে বিরাজিত ; জানিবে—শূন্যত্ব আকাশত্ববৎ ব্রহ্ম ও দৃশ্যের একত্বই। যাহা দৃশ্য, তাহাই পরব্রহ্ম, আর যাহা পরব্রহ্ম, তিনি না শান্ত, অশান্ত, কিছুই নহেন। তদীয় নানাকারময়ত্বও সিদ্ধ বটে, অপিচ তাঁহার কোন আকারই বিদ্যমান নাই। দেহাদি প্রতীত হয় বটে ; কিন্তু যেমন জাগ্রৎ হওয়া গেল, অমনি স্বপ্নাদি যেমন কিছুই না হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি ঐ দেহাদিরও কোনরূপ আকার-অস্তিত্ব নাই। ঐ দেহাদি যদিও সম্বিন্মাত্রাত্মক, অপ্রতিঘ ও অনুভবগম্য, তথাচ উহা অসন্ময়ই। যত কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই যদি অসন্ময়ই হইল, তবে তো চেতনেরই সমস্ত হওয়া সম্ভবপর। এক্ষণে জড় কিরূপে স্থাবর হয়, বলিতেছি ; যেমন দেহী ব্যক্তি নিদ্রা আসিলে জড়ভাব ধারণ করে, তেমনি সম্বিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবরাখ্যায় অভিহিতা হয়। সুষুপ্তাত্মা জীবের শত শত জগৎকল্পনায় স্বপ্ন জাগ্রদ্ভাব-প্রাপ্তির ন্যায় চিৎও জড়-স্থাবরভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিত্ত বা চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, স্থাবরভাবের অবসানে চিত্তের জঙ্গমভাবে অভিব্যক্তি হয়। পৃথিবীতে, জলে, অনিলে, অনলে বা আকাশে স্বপ্নকল্প শূন্যাত্মক লক্ষ জগতে জীবের মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপই স্থিতি প্রকাশ পাইতে থাকে। মানবের নিদ্রাস্থিতিদশায় জড়প্রায় চিত্তের যে জড়তা ঘটে, তাহা অধ্যাসমাত্র ; এরূপ ঘটনাতেও চিত্তের চিদ্ভাব অক্ষুণ্নরূপে অবস্থান-

করে। ঐ প্রকার অধ্যস্ত জড়তা হয় বটে; তাহা হইলেও চিত্তের চিদ্ভাব জড়তাকে গ্রহণ করে না। জাড্যবেদন-বেত্তা জীবের প্রতি চিৎ যেমন স্থাবর শরীর করিয়া থাকে, জঙ্গমবেদনবেত্তা জীবের প্রতিও তেমনি জঙ্গম-শরীর করে। যদিও এইরূপ হউক, তথাচ নখ-পদাদি অঙ্গভেদ থাকিলেও পুরুষের যেমন একই শরীর, তেমনি ঐ যে স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর, উহা চিত্তের একই অপ্রতিঘ কলেবর। জানিবে—মহাচিত্তের স্বস্বরূপে অধ্যস্ত চেতন অচেতনাদি সকলই ঐ নখ-পদাদি অবয়বের ন্যায় অবয়ব। হিরণ্যগর্ভের প্রাথমিক সৃষ্টি হইতে সঙ্কল্পবশে যে বস্তু যাদৃশাকারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা সেইভাবেই এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেইরূপে জগৎ চিত্তেরই স্বরূপ। এইরূপে যদি চিরকালও উক্ত জড়রূপে থাকে, তথাচ ঐ চিৎস্বরূপ শান্ত অপ্রতিঘ ও যথাস্থিতভাবেই বিরাজিত। সৃষ্টির অন্ত তদপবাদেই কথিত। বস্তুতঃ জগতে কিছুই নিবদ্ধ নাই বা ছিল না; কিছুই ছিল না বলিয়া কখনই কিছুই নিবদ্ধ নহে। এইরূপ জ্ঞানই হিতজনক। যেমন নিদ্রাকোষ্ঠেই স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সুষুপ্তি-প্রবোধ প্রপঞ্চ ভাব কল্পিত হয়, পরন্তু প্রবোধকোষ্ঠে হয় না, তেমনি চিদ্‌-ঘন-নিদ্রার সুষুপ্ত স্বপ্নকোষ্ঠেই সৃষ্টির এই আদি, এই অন্ত, ইত্যাকার অসত্য জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ সৃষ্টির ত্রৈকালিক সত্তারই অভাব; তাই অখণ্ড কল্পনা মিথ্যামাত্রই। একমাত্র পরমার্থ মনই যখন আদি-অন্ত-বিরহিতভাবে বর্ত্তমান, তখন অস্মাদৃশ প্রবুদ্ধ জনসমীপে তো সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নাম পর্য্যন্তও নাই, সত্তার কথা ?—সে তো দূরান্তাং। যদি যথার্থ-দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। চিত্রন্যস্ত চিত্রবধূ যেমন চিত্র হইতে অভিন্ন, তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদিও আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। চিত্রকর-চিত্রিত চিত্র সেনা যেমন সেই চিত্র-করের বুদ্ধিস্থ চিত্র হইতে অভিন্ন, তেমনি এই মূর্ত্তা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্তত্ব বশতঃ নানা হইলেও অনানা; এই প্রলয়, এই সৃষ্টি, এই স্বপ্ন, এই জাগ্রদ্ভাব, এতৎসমস্ত প্রজ্ঞানঘনতারূপ সুষুপ্তিযুক্ত চিৎসহস্রপ্রভ আত্মসূর্য্যের প্রকাশভেদ; তন্মধ্যে চিন্নিদ্রা-সমুদ্ভূত স্বপ্নভাগই উপাধিভাগ-প্রাধান্যে চিত্ত, আর চিদংশপ্রাধান্যে জীব; সেই জীবই সুরাসুরনরাদি

অধিকারীদিগের শরীর পরিগ্রহপুরঃসর তত্ত্বজ্ঞানতঃ নিদ্রার অপনোদনক্রমে মুক্ত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিকায় পরিজ্ঞাত হইলে উহাই ষষ্ঠ ভূমিকায় সুষুপ্ত হইয়া থাকে। সপ্তম ভূমিকায় উহাই মোক্ষার্থিগণের মোক্ষ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সুরাসুরাদি ভেদে চিত্ত কিয়ৎপ্রমাণ এবং কিয়দাকৃতি? চিৎ-নিদ্রা ও চিত্তোদরান্তর্গত জগৎ কিয়ৎপ্রমাণ? উহা কিয়ৎকালই বা অবস্থিত থাকে? অপিচ আত্মদর্শনই বা কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জানিবে, সুরাসুর-নর-নারী স্থাবর-সরীসৃপ-শৈল-বৃক্ষ-পক্ষি-কীট ও পতঙ্গাদি সমস্তই চিত্ত। এই চিত্তের প্রমাণ অনন্ত; উহাতে পরমাণু হইতে আব্রহ্মস্তম্ব যাবৎ সহস্র সহস্র জগৎ সহস্র সহস্রবার যাইতেছে। ঊর্দ্ধ দৃষ্টিপাত করিলে ঐ আদিত্যপথ হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুবান্ধকারাদি দেশে যাহা চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাবৎপরিমাণ ভূতই চিত্তভূমি। ইহার একটা সীমা নির্দ্দেশ নাই। উহা অমলাকার বলিয়াই সর্ব্বানুভূতি সিদ্ধ। এই চিৎরূপ দুঃসহ সংসার দুঃখবহুল, তাই উগ্র; এই সমষ্ট্যাত্মায় অন্তরে ভুবনসমৃদ্ধি সকল যখন ব্রহ্মাণ্ডকল্পনায় উপস্থিত হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিই আমরা চিত্ত হইতে আগত বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বিধাতার ইচ্ছানুসারে আদি-অন্ত বর্জ্জিত বিভুরূপেই চিত্ত নিখিল দেহে বিরাজিত; যদি ব্যষ্টিরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়, তবে কোন দেহেই উহা বিরাজিত নহে।

রামচন্দ্র! নদীপ্রবাহ যেমন একবার নতোন্নত ভূভাগ আশ্রয় করে, আবার পরিহার করে, তেমনি মনও দেহের আশ্রয় লয়, এবং পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভ্রম দূরীভূত হওয়ায় যখন যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন যেমন মরুপ্রদেশের বারিপ্রত্যয় অপগত হয়, তেমনি চিত্তের যখন আত্মজ্ঞান উদ্ভূত হয়, তখন দেহাদি ভ্রম অচিরাৎ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এই ভাবে পরমাণুই জগদ্গর্ভিত মনের স্বরূপ। গবাক্ষপথে সৌর কিরণাদি প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই অণুই উক্ত প্রসিদ্ধ চিত্তের পরিমাণ এবং তাহাই বটে জীব। এই জীবনিবহের অন্তরালেই জগৎ প্রবিষ্ট; এই যে স্বপ্নস্থানস্থিতবৎ অখিল দৃশ্য, ইহা চিত্তমাত্রই; এবং সেই যে চিত্ত,তাহাই জীব। সুতরাং জগৎ এবং আত্মার ভেদভিন্নতা কি?

জীব ও জগতে যখন ভেদ নাই, তখন এই পদার্থ-পরম্পরা চিদ্‌ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। যদি চিদ্‌ভিন্ন স্বীকার করা হয়, তবে সত্তাস্ফূর্ত্তির অসত্তাবতায় তাহাতে অলীকতাপত্তিই হইয়া দাঁড়ায়। সুবর্ণে যেমন কটকত্বাদি পৃথক্‌পদার্থতা অসিদ্ধ, তেমনি উহাও অলীকমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। সাগরের এক দেশে যেমন স্ফীত জলরাশি ভিন্নাকারে পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি চিৎও ব্রহ্মপদে দৃশ্যাত্মক হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্ফুরিত হন মাত্র; বস্তুতঃ উহা অন্য কিছুই নহে; একমাত্র ব্রহ্মেই উহার নিত্যাবস্থান। পরব্রহ্মে সম্বিদই পদার্থপুঞ্জরূপে পরিস্ফুরিত; পদার্থ-পরম্পরা তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। এই আদি-অন্ত-বিরহিত চিৎই নিস্পন্দ অচলভাবে বিরাজিত। স্বপ্নস্থানগতের ন্যায় এই সমগ্র বিশ্ব সম্বিদাকাশস্থিত শান্ত ও বন্ধনস্বরূপের অপরহারী। এই সমগ্র বিশ্বই যে শান্ত, তাহা বিশ্ব সম্বিদের পরস্পর সমত্ব, সত্যত্ব, একত্ব ও অবিকারিত্ব, এই পঞ্চবিধ ভেদবিভাবনার অভাবেই অবগন্তব্য। অপিচ উহাদের পরস্পর আধার এবং আধেয়ভাব হেতু স্তম্ভ ও শালভঞ্জিকার ন্যায় ব্যবহারতঃ প্রাতিভাসিক ঈষৎ ভেদবশে উহারা স্বরূপ পরিহার করে না। এই প্রকারে বিশ্ব ও সম্বিদের পরস্পর সমত্ব, সত্যত্ব, সত্তা, একতা, নির্ব্বিকারত্ব ও আধার-আধেয়ভাব বিদ্যমান। প্রাতিভাসিক নদীর দেবভাব, আর মনুষ্যের সর্পভাবের ন্যায় জগতের বরশাপাদি সম্বন্ধে যদি বাস্তবপক্ষে বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে প্রাতিভাসিক ভেদ ভেদমধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—দেবদেহের উপাদানভূত চন্দ্রামৃত ভোগ নদীর নাই, আর দেব দেহে সর্পদেহের উপাদানভূত তদস্থাদিভাবও নাই। এ অবস্থায় বরশাপার্থ সম্বিত্তিতে কার্য্য-কারণতা সিদ্ধি কিরূপে ঘটিল? কেন না, উপাদান ব্যতীত কুত্রাপি কার্য্য হয় না, অথচ কিরূপে উক্ত উভয়ের দেব-সরীসৃপদেহ সিদ্ধ হইল? ইহা আমায় বলিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সাগরে যদি সলিলস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে যেমন আবর্ত্তাকার ধারণ করে, তেমনি অতীব নির্ম্মল চিদাকাশের সত্য সঙ্কল্পানুরূপ স্ফুরণই জগৎনামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কথা বারবারই বলিয়া আসিতেছি। সমুদ্রসলিলের শব্দবৎ বিধাতার

আত্মচিৎস্বরূপে এই যে জগদভাবের বিকাশ, ইহা চিদাত্মকতারই ভান মাত্র। 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, মহর্ষিগণ ঐ ভানেরই সঙ্কল্পনাদি নাম নিরূপণ করিয়াছেন। কালের বশে অভ্যাসের ফলে তত্ত্ব-বিচার, শত্রু-মিত্র-উদাসীনে সমান দর্শন, দেবাদি জাতির সাত্ত্বিক ভাব, কিম্বা সাত্ত্বিক নৈর্ম্মল্য নিবন্ধন যখন সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়, তখনই তাহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির যথার্থ বস্তুদৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই সেই জ্ঞানবানের বুদ্ধি চিন্মাত্ররূপা হয়, ইহাতে দ্বৈতাদ্বৈত থাকে না; কোন আবরণ থাকে না, উহা বিজ্ঞানময়ী প্রকাশমাত্ররূপা, দেহাদেহ-বিরহিতা চিদ্‌ব্রহ্মরূপিণী হইয়া বিরাজ করে। সেই ঐ নিরাবরণ বিজ্ঞানপুরুষ যাহা যাহা সঙ্কল্পরূপে দর্শন করেন, তৎসমস্তই পরমার্থতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অন্যথোপপত্তি কদাচ হয় না। কেন না, তাহা শান্ত আত্মপ্রতিভাস মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এবম্বিধ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সঙ্কল্পকল্পিত নগরবৎ বা স্বপ্ন-সংদৃষ্ট মহাপুরবৎ জানিবে—এ জগৎ সঙ্কল্পমাত্রই। হিরণ্যগর্ভ ব্যতীত অন্য নিরাবরণাত্মক পুরুষও যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, সেইরূপই হয়। বালক তাহার সঙ্কল্পনগরে শিলা উড়িতে দেখে, দেখিয়া তাহা যেমন সত্য মনে করে, এবং সত্বরই ইচ্ছানুসারে তাহা নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, তেমনি হিরণ্যগর্ভাদি নিরাবরণ বিজ্ঞান-পুরুষের সঙ্কল্পস্বরূপ ত্রিভুবনে যে বর-শাপাদি, তাহা সেই হিরণ্যগর্ভাদি আত্মমাত্রই। বালক যেমন স্বীয় সঙ্কল্পনগরে সিকতা হইতে তৈলোৎপাদন করে, তেমনি এই সকল হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষের বরশাপাদি অর্থ উপাদানবর্জ্জিত হইলেও এ জগৎ তাঁহার সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া সুসিদ্ধ হয়। অপিচ যাহারা নিরাবরণ জ্ঞানবিহীন অজ্ঞ পুরুষ, তাহাদের ভেদবুদ্ধি কিছুতেই শান্ত নহে, সেই নিমিত্তই দ্বৈতসঙ্কল্প হইতে বরাদি সিদ্ধি ঘটে না। নিরাবরণ জ্ঞানীদিগের যে যে কল্পনা একবার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, কল্পনান্তরের আবির্ভাব যে পর্য্যন্ত না তাহার পরিবর্ত্তন ঘটায়, সে পর্য্যন্ত তাহা একইভাবে বিদ্যমান থাকে। আজ পর্য্যন্ত তাহা ঐ একইভাবে আছে। যাহা সাবয়ব তত্ত্ব, তাহাতে যেমন বিচিত্রাবয়বক্রম বর্ত্তমান, তেমনি সেই যে

নিরবয়ব নিরাবরণ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্ম, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতও নিশ্চলভাবেই বিদ্যমান।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি এইরূপই হয়, তবে তো নিরাবরণ-জ্ঞানহীন কঠোরতপা তাপসদিগের শাপাদি মিথ্যা হওয়াই সম্ভবপর। সুতরাং কিরূপে সেই নিরাবরণজ্ঞান-বর্জ্জিত ধর্ম্মমাত্র-আচরণশীল ব্যক্তিগণ শাপ-দানাদি করিয়া থাকেন, বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সৃষ্টির আদিতে বিধাতা ব্রহ্মা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপের অনুকূলে যে যে প্রকার সঙ্কল্প করেন, সেই সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকেন; এইজন্য তাহার অন্যথা ঘটে না। ঐ ব্রহ্মার সঙ্কল্প অসত্য না হইবার প্রতি কারণ এই যে, তিনি আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপেই বিদিত হন; এই জন্য জল হইতে দ্রবভাবের ন্যায় তিনিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং সেই প্রজাপতি অগ্রে যে নাম-সঙ্কল্প করেন, তৎসমস্তই আশু সুসিদ্ধ হয়। এই কারণে এই যে জগৎকল্পনা, ইহাও সুসিদ্ধ হইয়াছে। সে কল্পনার আধার অবলম্বন কিছুই নাই; উহা ব্যোমাত্মক মাত্র। দৃষ্টিদোষ-সমন্বিত ব্যক্তির নিকট কেশোণ্ডুক যেমন মুক্তাবলীবৎ প্রতিভাত হয়, তেমনি উহা ব্যোমদেশেই বিদ্যমান। ধর্ম্ম, দান, তপঃ, গুণ, বেদ, শাস্ত্র, ভূতবৃন্দ, ত্রয়ী, সাংখ্য এবং পাশুপত ও বৈষ্ণবমত, চতুর্ব্বেদ ও স্মৃতি, এই সকল জ্ঞানোপদেশের কল্পনা সেই প্রজাপতিই করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার এইরূপ কল্পনা হয় যে, বেদবেদী তপস্বিগণ সহজ বৃত্তিতে কিম্বা বাদ দ্বারা যাহা কহিবেন, তৎসমস্ত নিশ্চিতই সম্পন্ন হইবে। অনন্তর সেই প্রজাপতির এইরূপ আর এক কল্পনা হয় যে, ব্রহ্ম—চিৎস্বভাব, আকাশ—ছিদ্রস্বভাব, পবন—চেষ্টাস্বভাব, অনল উষ্ণতাস্বভাব, জল—দ্রবস্বভাব, আর ভূমি কাঠিন্যস্বভাব। এবম্বিধ সমস্ত কল্পনাই প্রজাপতি-বেশী চিদ্ধাতুর কল্পনা। ঐ চিদ্ধাতু শূন্যাত্মা হইলেও যে যে কিছু পরিজ্ঞাত হন, সকলই সত্যসঙ্কল্পরূপে 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতির ন্যায় অনুভবগম্য করিয়া থাকেন। 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি সদাত্মক হইলেও স্বপ্নে যেমন অসত্য এবং অসদাত্মক ও সত্যরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঐ চিদাকাশ যাহা যাহা বিদিত হন, তাহা তাহাই হইয়া থাকে। সঙ্কল্পপুরে শিলানর্ত্তনও যেমন

সত্য হয়, তেমনি জগৎ-সঙ্কল্পপুরে ব্রহ্মার অধিকারভোগার্থ অভিপ্রেতার্থও সত্য হইয়া থাকে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে যাহা বোধ হয়, এবং সেই নিমিত্ত যাহা যেরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিৎস্বভাব, সে কীটবৎ তাহার অন্যথা করিতে পারে না। সেই শুদ্ধ চিৎস্বভাবের কল্পিতার্থের বিরুদ্ধ কল্পনায় স্বাতন্ত্র্য নাই। কেন না, অধিক অভ্যস্তের যে অন্যথা দৃষ্টি, তাহা সম্বিদের পক্ষে অল্পই ঘটিয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় যে ব্যক্তি এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে, আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ আছি; তাদৃশ সংস্কারশালীর স্বপ্নেও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে। এই ভাবে সেই চিদাকাশ স্বস্বরূপ চিদাকাশে সতত স্বীয় দৃষ্ট-দৃশ্যাদি স্বরূপ প্রকাশিত করিলেও চিৎস্বরূপের ঔদাসিন্য-স্বভাববশে সাক্ষিরূপে সর্ব্বদাই দেখিতেছেন, ইহাই প্রত্যয় হইতেছে; তদ্‌বিপরীত আর দেখা যাইতেছে না। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য একই পদার্থ; চিদাকাশ সর্ব্বগামী ও সর্ব্বত্রই অবস্থিত; সুতরাং যথায় যাহা দৃষ্ট হয়, সকলেরই সত্তা সম্ভবপর। স্পন্দ যেমন বায়ুর অঙ্গরূপে ও দ্রবত্ব যেমন জলের অঙ্গরূপে অবস্থিত এবং ব্রহ্মে যেমন ব্রহ্মত্ব বিরাজিত, তেমনি এই যে জগৎ, ইহাও সেই অজ বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গরূপে অবস্থিত। সেই বিরাট দেহ ব্রহ্মা—আমিই। এই যে জগৎ, ইহাও সেই বিরাট দেহ। শূন্যত্ব ও আকাশের যেমন কোনই পার্থক্য নাই, তেমনি ব্রহ্ম ও জগতের সম্পূর্ণ পার্থক্যাভাব। পর্ব্বত হইতে জলস্রোত নিম্নাভিমুখে নিপতিত হইতে থাকিলে জলকণা সকল যেমন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি এই বিচিত্র দেশকাল-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে নিপতিত বা উৎপতিত হইতেছে। জলপ্রবাহ যেমন ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ সহস্র সহস্র কণাকারে বিভক্ত হয়, আবার ভূ-পতিত হইয়া সমস্তই একীভূত হইয়া প্রবাহরূপে বহিতে থাকে, তেমনি ব্রহ্ম হইতে চৈতন্যের কলাকলাপ বিনির্গত হইয়া সেই ব্রহ্মাকারে প্রতিভাত হয়। যৎকালে অগ্রে ঐ চৈতন্যাকাশনিচয় নির্গত হয়, তখন মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি তাহাতে থাকে না। ঐ চৈতন্যাকাশ সকল যখন স্ব স্ব দেহে মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা করে, তখন সৃষ্টিকে ভোগ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। এইরূপে এই জগতের উৎপত্তি অজ্ঞান হইতেই হইয়াছে। আমি অজ্ঞানে অনাচ্ছন্ন, তাই মৎসমীপে

জগতের কোন কারণই বিদ্যমান নাই। বস্তুতঃ জগৎনামক কোন কর্ম্মেরই উৎপত্তি হয় নাই। সেই যে একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই দেহের যখন মৃতাবস্থা, তখন বুদ্ধি ও মনঃ প্রভৃতির সত্তা কিছুই থাকে না। শরীরের শবাকার অবস্থা এবং পাষাণাদির জড়তা যেরূপ যেরূপ অনুভব করিয়া থাক, জানিবে—পরমাত্মার সত্তাও সেইরূপই। একমাত্র নিদ্রায় যেমন সুষুপ্তি ও স্বপ্নভাব বিদ্যমান, তেমনি পরব্রহ্মে সৃষ্টি ও সংহার বর্ত্তমান। একই নিদ্রায় যেমন সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এবং তাহাতে যেমন যথাক্রমে প্রকাশ ও তমঃ অনুভূতিগম্য হয়, জানিবে—পরব্রহ্মেও সৃষ্টি ও প্রলয় সেইরূপই। মনুষ্য যেমন নিদ্রাবস্থায় পাষাণসত্তা অনুভব করে, পরমাত্মাও তেমনি জড়সত্তা অনুভব করিয়া থাকেন। যে জন অন্যমনস্ক-ভাবে বসিয়া থাকে, তাহার অঙ্গুষ্ঠে বা অন্য অঙ্গুলিতে বায়ু, আতপ ও ধূলি-স্পর্শে তাহার যেরূপ অনুভব হয়, পরমাত্মার পাষাণসত্তার যে অনুভব, তাহাও অবিকল সেইরূপই। ফল কথা, যে ব্যক্তি অন্যমনস্ক, তাহার অনুভব হইলেও হয় নাই বলিয়াই প্রতীত হয়। পাষাণসত্তার যে অনুভব, তাহাও অবিকল তদনুরূপই। আকাশ, প্রস্তর ও জলাদির দেহানুভূতি যেরূপ হয়, প্রলয়ের অনন্তর চিত্তভাব-বিরহিত অস্মদাদিরও সৃষ্টিসময়ে চিত্তভাবের প্রাপ্তিতে অবিকল তেমনি অনুভব হয়। কালপ্রবাহ অখণ্ড; ইহাতে ব্রাহ্মদিবসরূপ কল্পদশায় অস্মদাদির দিনযামিনীর পার্থক্যানুভব যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টিসংহার-সম্বিৎ পরমাত্মায় পরিস্ফু-রিত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে জলময় জলধিবক্ষে স্বভাবতই আবর্ত্ত, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি নানাবিধ ভেদ প্রতীতি উল্লেখ্য। না দর্শন, না দৃশ্য, না তদ্‌বিষয়ক সঙ্কল্প, না তদীয় ভোগরূপ অনুভব, না তাহাতে অনুরাগ, না ইচ্ছা প্রভৃতি, কিছুই যাহাতে নাই, সেই শান্ত পরমাত্মায় স্বভাবতই সৃষ্টিসংহারাদি ভেদ প্রত্যয়গম্য হইয়া থাকে।

ষড়শীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮৬॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জাগতিক পদার্থ-সম্বন্ধে আপনি যে প্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাতে জগতের কোন পদার্থে যে কার্য্য-কারণ-ভাব নিয়ন্ত্রিত আছে, এরূপ তো অঙ্গীকার করা যায় না। অথচ দেখা যাইতেছে, জাগতিক সর্ব্বপদার্থই কার্য্য-কারণভাবে নিয়মিত আছে। এই কারণে আমার সংশয় হইতেছে যে, কোথা হইতে এই কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম আসিল? কি প্রকারেই বা প্রত্যেক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব নিয়মিত হইল? দেবতা অসংখ্য আছেন, তন্মধ্যে এক সূর্য্যই বা কেন এত বড় উগ্রতেজা হইলেন? অপিচ দিবসসমূহই বা কখন দীর্ঘ এবং কখন হ্রস্ব হইল কি জন্য? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সৃষ্টিকালে বিধাতৃ-সঙ্কল্প স্বতই যেমন কাকতালীয়-ন্যায়ে নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল, অনন্তর উহা অবিকল তেমনিভাবে শক্তিশালী হইয়া তাদৃশ কার্য্যকারিত্ব উপগত হইয়াছিল। ফল কথা, কার্য্য-কারণরূপ নিয়মে নিবদ্ধ হইয়া উহাই জগৎনামে নিরূপিত হইয়াছে। সেই যে কার্য্য-কারণ-ভাবরূপ নিয়ম, তাহাই নিয়তিনামে নির্দ্দিষ্ট। সকলেই সেই নিয়তির নিদেশবর্ত্তী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিশালী; তদীয় যদ্‌বিধ সঙ্কল্প যেরূপভাবে প্রতিভাত হয়, তাহা সেইরূপেই সত্য হইয়া যায়। অস্মদাদির স্বপ্ন ও মনোরথ-কল্পিত সম্বিদ্ হইতে তদীয় সম্বিদ্ সারবতী বলিয়া তাহার অন্যথা কোন প্রকারেই হয় না। পরব্রহ্ম চিন্ময়ভাব হইতে পৃথগ্‌ভূত হন— যেরূপ নিয়মবদ্ধভাবে যাদৃশরূপে প্রতিভাত হন, তাঁহার সেই প্রতিভান মায়ার অঙ্কস্থ হইয়া তদীয় সৃষ্টিকালেই হয়। যখন তিনি মায়াবিচ্যুত হন, তখন আর তাঁহার তথাবিধ প্রতিভান থাকে না। তাঁহার যে সেই নিয়মবদ্ধ প্রতিভান, তাহাই নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট। "ইহা এইরূপ" আর 'ইহা এই প্রকার' ইত্যাকার নিয়মে ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার যে সেই সৃষ্টিসংহাররূপ নিয়ম, তাহাই নিয়তি আখ্যায় অভিহিত। এই প্রকার নিয়মের অব্যভিচারও বিস্ময়কর নহে।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে যে প্রতিভান চিদ্রূপী ব্রহ্মে স্বতই সমুদিত হয়, জলের দ্রবত্ববৎ ঐ নির্ম্মল চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম উহা হইতে অভিন্ন। আকাশে শূন্যতা, কর্পূরে সৌরভ ও আতপে উষ্ণতা যেমন অপৃথগ্‌ভাবে বিরাজিত, তেমনি এই যে জাগ্রদাদি প্রপঞ্চ, ইহাই চৈতন্যে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত। যাহার সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই, সেই জগৎ-প্রপঞ্চ চিদাকাশাত্মক ব্রহ্মেই অভিন্নভাবে বিরাজিত। 'এই সৃষ্টি' এই প্রকার জ্ঞান ঐ চিন্ময় ব্রহ্মেরই স্ফুরণমাত্র, অপিচ 'এই প্রলয়' এই প্রকার জ্ঞানও ঐ চৈতন্যের ক্ষণিক স্ফুরণ। চিতের স্ফুরণ যাহা হইবে, কার্য্য-প্রপঞ্চও অবিকল তদনুরূপ হইবে। চিতের স্বপ্নপ্রায় যে স্বাভাবতই বিকাশ ঘটে, কালই কি, ক্রিয়াই কি, আকাশই কি, বা দ্রব্যাদিই কি—সকলই সেই চিদাকাশ আকার-বর্জ্জিত চিদ্‌ভাবের বিকাশ। আর সেই যে বিকাশ, তাহাই রূপ, আলোক, জল, দেশ, কাল, ক্রিয়া ইত্যাদিরূপে প্রকাশমান। বিশদ কথা এই যে, পর-ব্রহ্মে যে কোন কল্পনা যেরূপভাবে প্রবর্ত্তমান হউক, তাহাই নিয়তি নামে নিরূপিত। নিখিল কল্পনা আকাশরূপা, জগতের সৃষ্টি হইতে প্রলয়ান্ত সমগ্র পদার্থের যে একরূপ বিকাশ, স্বভাবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহা বস্তুস্বভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দেখ, একই অনল—দেশ কাল ভেদে বিভিন্নাকার হইলেও তাহার নিজের যাহা উষ্ণতাস্বভাব, তাহা যেমন একইরূপে থাকে, তেমনি চিদংশ জীবের সর্ব্বানুগত এক যে চিৎস্বরূপ, তাহাই হইতেছে—স্বভাব। চিন্ময়ী বৃত্তিপরম্পরাতেও যে সমস্ত চিদাভাস-সম্বিদের বিকাশ হয়, তৎসমুদায়ও স্বভাবমাত্র। ক্ষিতি ও জলাদি বিষয়ে সেই সমস্ত আভাস সম্বিৎ দ্বারা তাহাদের দেহপ্রায় নানা বৃত্তির অন্তরালে যে যে বৃত্তির যে যে আকার কল্পনা হয়, তাহাও সেই চিদাকাশেরই স্বভাব মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। ক্ষিতিই কি, জলই কি, তেজই কি, স্পন্দই কি, শূন্যত্বই কি, সকলই সেই চিৎ এবং এতৎসমস্তই স্বস্বকার্য্যের আকর। ফলে যত কিছু পার্থিব পদার্থ আছে, সমুদায়ের স্বভাব ঐ পৃথ্বী। এইরূপে যত সব জলীয় পদার্থ আছে, জলই তৎসকল পদার্থে সম্বদ্ধ। অন্য দিকে এই যে ক্ষিত্যাদি যাবতীয় পদার্থ, এতৎসকলেরই আকর সেই

চিদাকাশ; ফলে ক্ষিতি প্রভৃতি সমগ্র পদার্থেই সেই চিদাকাশ সুসম্বদ্ধ। এতন্মধ্যে যত কঠিনস্বভাব পার্থিব পদার্থ, তৎসকলের আকর—এই লোক-পরম্পরার আবাসস্থলী বিশাল ভূমণ্ডলী। এই নিমিত্ত এই সমগ্র ভূমণ্ডল পদার্থ-পরম্পরার রাজার ন্যায় সুশোভন। গঙ্গা প্রভৃতি যত কিছু প্রধান প্রধান জলময় পদার্থ, তৎসমবায়ের আকরস্থানীয় একমাত্র সমুদ্র। যে কিছু তেজঃপদার্থ বিদ্যমান, সে সমুদায়ের আকরস্বরূপ ঐ সূর্য্যদেব। এইরূপে বায়ু স্পন্দনের ও আকাশ শূন্যতার আকর; এইরূপ নিয়মযোগে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও সেই ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রই। কেন না, সেই যে ব্রহ্ম-চৈতন্য, তিনিই ক্ষিতি প্রভৃতিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত। অতএব অসংখ্য দেবনিবহমধ্যে সূর্য্যদেবই উগ্র তেজঃসম্পন্ন কেন? তাহা বোধ হয় তুমি এখন বুঝিতে পারিলে। যিনি চিৎ বা সম্বিৎ, তিনি সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বরূপিণী ও সর্ব্বগামিনী; এই নিমিত্তই প্রকাশতারূপ স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রভাবেই তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বভাবময়ী নিয়তিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হন; ইহা বিজ্ঞমাত্রেই বিদিত হইতে পারেন। সেই যিনি চতুরানন ব্রহ্মরূপ বালক, তিনি স্বয়ং আকাশ-ময় রহিয়া স্বীয় চিদংশের বিকাশরূপ পট্টবস্ত্রাবৃত পৃথ্বীরূপ আকৃতি বিস্তার করেন। যৎকালে সেই মায়াশবলিত সম্বিৎ চতুরানন ব্রহ্মসম্বিৎসহ স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল প্রপঞ্চের উপসংহার করিয়া থাকেন, তৎকালে ঐ সর্ব্বজ্ঞ সম্বি-দের অঙ্গীভূত চতুরাননে সম্বিৎ ও তদঙ্গীভূত সূর্য্যাদির ভ্রমণ স্বভাব ক্ষণ-মাত্রেই বিধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়; আর কখনই উদ্ভূত হয় না। লূতা-নির্ম্মিত মশকবন্ধনজালবৎ বিধাতা সঙ্কল্পপ্রভাবে যে জ্যোতিশ্চক্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই জ্যোতিশ্চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথে সূর্য্যের আবর্ত্ত-গমনে দিনে দৈর্ঘ্য ও রাত্রিতে হ্রাস বিধান করিতেছে। উল্লিখিত জ্যোতি-শ্চক্রে যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান, ঐ সকল একরূপ নহে; উহারা বিচিত্র প্রকার। উহাদের মধ্যে কতক উজ্জ্বল, কতক অল্পোজ্জ্বল, কতক বা একেবারেই অনুজ্জ্বল। এই পদার্থপরম্পরা প্রকৃত পক্ষে জগৎ বা দৃশ্য কিছুই নহে। যিনি তত্ত্ববিৎ, তাঁহার বিদিত আছে যে, এতাবৎ সমস্ত জগৎ নয়। যেমন স্বপ্নকালীন দৃশ্য বস্তু, তেমনি এ সকল অলীক পদার্থ; বস্তুতঃ ইহা চিদাকাশই। যিনি চিন্ময় সর্ব্বেশ্বর আত্মা, তিনিই 'তুমি' 'আমি' ইত্যা-

কার অখিল দৃশ্যরূপে প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন। পুরুষ যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তখন তৎসমুদায়ের কিছুই থাকে না; কিছুই অনুভূয়মান হয় না! যেন মনে হয়, সকলই নাশ পাইয়া গিয়াছে। তৎকালে সমস্তই স্বপ্নদর্শনবৎ প্রতীত হয়। তখন একমাত্র চিদাকাশে চিদাকাশই প্রতিভাসমান হইতে থাকেন। এ কথা প্রকৃতই যে, চিদাকাশতা ভিন্ন জগতের রূপান্তর কিছুই নাই। যে পর্য্যন্ত চিন্ময় ব্রহ্মে ঘটাদি নশ্বর পদার্থ পারমার্থিক সৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে, ততদিন যাবৎ উক্ত ঘটাদি চিদাকাশ সমভিব্যাহারে অভিন্নরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই বিকাশের নামই স্বভাব ও নিয়তি প্রভৃতি। সেই ব্রহ্মসত্তা আকাশরূপ প্রথমোৎপন্ন অবয়ব মধ্যে শব্দ তন্মাত্ররূপে অবস্থানপূর্ব্বক কুশূলমধ্যস্থ ধান্যাদি বীজের ভাবী অঙ্কুরশক্তির মধ্যভাগে অবস্থিতির ন্যায় বায়ু প্রভৃতি জাগতিক বীজ শক্তিরূপে অপ্রকট হইয়া অবস্থান করে। তদনন্তর সেই ব্রহ্মসত্তা হইতে বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিত্যাত্মক জগৎ ক্রমশঃ সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ কল্পনা কেবল অজ্ঞদিগের তত্ত্বজ্ঞানার্থ মাত্র। শাস্ত্রেও এই সৃষ্টিকল্পনার যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কেবল এই নিমিত্তই। সৃষ্টিকল্পনার সত্যত্ব প্রতীতি করাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। কেন না, যাহা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহার উদয় বা অস্ত কিছুই নাই; তাহা সতত শিলাগর্ভবৎ কঠিন, নিরবকাশ, শান্ত এবং নিত্য। উক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সত্তায় এই জগৎ সত্য হইলেও স্বীয় পৃথক্‌সত্তায় অসৎ বৈ আর কিছুই নয়। এ জগতের পৃথক্ সত্তা বাস্তবিকও নাই। আমাদের এই আকাশে আকাশের ন্যায় ব্রহ্মাকাশে এই জগদাকাশ অবস্থিত; সুতরাং এ আকাশের উদয়াস্ত আবার কিরূপে হইবে? সেই চৈতন্যরূপমণি অনন্ত প্রকাশময় ও সতত বিততস্বরূপ; তদীয় সত্তা স্বরূপের স্বভাবতই যে সার্ব্বকালিক বিকাশ, তাহাই অগৃহীতস্বরূপে অবস্থিতি পর্য্যন্ত কল্পনার সূচক হইয়া নিজেই যেন চিদ্‌ভাব উপগত হইয়া থাকে। কল্পনারূপ-প্রাপ্ত আকাশের সেই যে সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম সত্তা-বিকাশ, তাহা ভাবী জাগ্রৎপ্রপঞ্চের পর্য্যালোচনাপুরঃসর সর্ব্বত্র তাহার উদ্বোধক হইয়া থাকে। সেই যে বিকাশপ্রাপ্ত পরমা ব্রাহ্মী সত্তা, তাহা ক্রমশঃ পর্য্যালোচিত বিষয়ের চেতনা বিষয়ে উন্মুখ হইয়া অনুভব করিতে থাকে। ক্রমে উক্ত অনুভব ঘনীভূত হইলে

ঐ কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা ভাবী জীবাদি নামে নিরূপিত হয়। অনন্তর যখন আবার অধিকারী-জন্ম লাভ করিতে পারে, তখন পরম পদ পাইবার অধিকারী হয়। সেই কল্পনা যখন জীবভাবে অবস্থান করে, তখন স্বীয় চিদাকাশভাবের আবরক অবিদ্যাগর্ভে নিপতিত থাকে। তাই তাহার পরম পদস্বভাবত্ব অস্ফুট থাকিয়া যায়। তোমার উক্ত কল্পনা সম্প্রতি বিশুদ্ধ পরম পদে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এখন সেই অখণ্ড একত্ব হইবার সময় আসিয়াছে। সেই কল্পনারূপিণী ব্রহ্মসত্তা অবিদ্যাবৃত অবস্থায় আপনা হইতে অভিন্নাকারে দেহেন্দ্রিয়াদির ভাবনায় উন্মুখ হইয়া স্বস্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং অনর্থক সংসারাভিমানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। শূন্যরূপিণী ঐ সত্তা যখন শব্দাদিগুণে অন্বিত হয়, তখন সবিকাশ চিতের ভাবনাক্রমে ভবিষ্য আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি কারণ হইয়া অবস্থান করে। তদনন্তর লিঙ্গদেহের উৎপাদক প্রাণস্পন্দ জন্য কালসত্তাসহ অহম্ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই যে অহম্ভাব, তাহাতেও কালসত্তা ভবিষ্যজগতের প্রধান বীজাকারে অবস্থিত হয়। পরাৎপর চিৎশক্তির যাহা আত্মবিষয়ক অনুভব, তাহারই নাম জগৎ। সেই জগৎ বাস্তব পক্ষে সত্য নহে। তবে তাহাতে চৈতন্যের বিকাশ থাকে বলিয়াই তাহা সত্য হইয়া উঠে। এবম্বিধ ভাবনাত্মিকা চিৎই সঙ্কল্পপাদপের বীজ; উল্লিখিত চিৎই ক্ষণমধ্যে নিজের অন্তরে অহম্ভাব ভাবনা করে। সেই অহম্ভাব-ভাবিত চিৎ জীবনামে নির্দ্দিষ্ট হয়—হইয়া, তরঙ্গরূপে জলে জললীলার ন্যায় অন্যবিধ ভাব ও অভাবভ্রমে পতিত হইয়াছে এবং মায়াশবলিত ব্রহ্মের পদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই প্রকার ভাবনাবতী চিৎ আকাশতন্মাত্র-ভাবনাকে আপনা হইতেও অধিক ঘনীভূত করে এবং ক্রমশঃ আকাশতন্মাত্র অনুভব করিতে থাকে। সেই যে অনুভূত আকাশ-তন্মাত্র, তাহাই শব্দসমষ্টিরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাবী রূপ ও পদবাক্যরূপ প্রমাণযুক্ত বেদার্থরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই যে আকাশতন্মাত্ররূপ শব্দতত্ত্ব, তাহা হইতেই নিখিল জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপ বিচিত্র সঙ্কল্পময় ব্রহ্মচৈতন্যই জীবনামে নিরূপিত হয় এবং ভাবী শব্দার্থরূপে পর্য্যবসিত হওয়ায় অগ্রে নিখিল ভূতবৃন্দরূপে বৃক্ষের বীজ-

স্বরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। সেই যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচৈতন্য, তাহা হইতেই চতুর্দ্দশবিধ জীবজাতি প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য যে পর্য্যন্ত শাব্দ ব্যবহার বা শারীর ব্যবহার রূপ না অধিগত হয়, ততদিন চিৎস্বরূপেই অবস্থিত হইয়া কাকতালীয় ন্যায়ে আপনা হইতেই স্পন্দচৈতন্য অনুভব করিতে থাকে। সমগ্র ভূতের স্পন্দক্রিয়া উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই প্রাদুর্ভূত; ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রকাশবিষয়িণী অনুভূতি, তাহাই রূপতন্মাত্রাখ্যায় অভিহিত। উক্ত রূপতন্মাত্রই ভাবী বস্তুনামের কারণ। উল্লিখিত ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রকাশবিষয়িণী ভাবনা, তাহাই তেজ নামে নির্দ্দিষ্ট। তদ্ব্যতীত তেজোনামে পদার্থান্তর কিছুই নাই। ঐ তেজের যে স্পর্শবিষয়ক ভাবনা, তাহারই নাম স্পর্শ, যাহা শব্দবিষয়িণী ভাবনা, তাহাই শব্দ; আকাশে আকাশ যেমন স্বতই অবস্থিত, তেমনি সেই শব্দ স্বতই অনুভূত; তদিতর শব্দকর্ত্তা অন্য কেহই নাই। আর এক কথা, সে অবস্থায় শব্দকর্ত্তাই বা আর কাহার হইবার সম্ভাবনা? কেন না, তৎকালে সম্বিৎ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। সেই সম্বিৎ আপনা হইতেই শব্দাদি-রূপে নিজে যে সেই সেই-আকারে অনুভবগোচর হইয়াছিল, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য; না হইলে উপায় তো কিছুই নাই। কেন না, শব্দাদির অসম্বিৎরূপে সম্বিদের যে একত্বরূপ তাদাত্ম্য, তাহা কোন ক্রমে আজও সম্ভবপর হয় নাই। এইরূপে রসতন্মাত্র কিম্বা পঞ্চতন্মাত্র সকলেই উল্লিখিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সম্বিৎসহ অভেদ-প্রত্যয়ে বিষয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই যে অভেদ জ্ঞান, তাহাও ভ্রমমাত্র; ফলে ইহা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নহে। স্বপ্নে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ঘটনা, তেমনি উহা ভ্রমনেত্রে সত্যস্বরূপে জ্ঞান হয় মাত্র। পূর্ব্বে যে তেজের কথার উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত তেজ আলোকতরুর বীজভূত। উক্ত বীজভূত তেজ হইতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহের বিকাশ হয়। ঐ তেজ হইতেই রূপ প্রকাশ হইবার পর সংসার হইয়া থাকে। উল্লিখিত ব্রহ্ম-চৈতন্য আকাশ-বৎ বিকারশূন্য; তাঁহা হইতে ভাবী বিষয়সমূহের যে মাধুর্য্য জ্ঞানরূপ আস্বাদ জন্মে, সেই আস্বাদকেই রসতন্মাত্র বলা হয়। ঐ ভাবী প্রপঞ্চের সঙ্কল্প-স্বরূপ সমষ্টিভূত জীব সঙ্কল্পরূপে গন্ধাদি তন্মাত্রের অনুভব করিয়া থাকে।

উক্ত সঙ্কল্পরূপী সমষ্টি-ভূত জীবই ভাবী ভূগোলোকরূপে পর্য্যবসিত হয়, এই নিমিত্ত উহা সর্ব্বাধার ; উক্ত আকৃতি-তরুর বীজস্বরূপ জীব হইতেই সংসার-প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ গন্ধাদি-তন্মাত্রগণ বাস্তবপক্ষে অনুৎপন্ন হইলেও কল্পনার বশে উৎপন্ন এবং নিরাকার হইলেও সাকাররূপে প্রতীত হইয়া থাকে। উল্লিখিত তন্মাত্র সকল কাকতালীয় ন্যায়ে আপনা হইতেই যে স্থান দ্বারা রূপ জ্ঞান করে, তাহা চক্ষুনামে নিরূপিত হয়। যে স্থান দ্বারা শব্দ জ্ঞান করে, তাহাকে কর্ণ, যে স্থান দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান করে, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয়, যে স্থান দ্বারা রসজ্ঞান করে, তাহাকে রসনেন্দ্রিয়, আর যে স্থান দ্বারা গন্ধ জ্ঞান করে, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। উক্ত জীব এই প্রকারে সর্ব্বাবয়বান্বিত ও আকৃতিসম্পন্ন হইয়া দিক্‌ ও কালকল্পনা করে। এইরূপে ক্রমশঃ এতই পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণপূর্ব্বক অসর্ব্বস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা নিখিল রসগন্ধাদি জ্ঞানে সমর্থ হয় না। বলিতে কি, ঐ জীব ব্যষ্টিভূত ভাবে নিখিল শরীর যোগেও নিখিল ভোগ্যানুভবে সক্ষম হয় না। এই অনন্ত জগৎকল্পনা আত্মা হইতে অস্বতন্ত্র ; ঐ সকল আত্মান্তর্গত আত্মস্বরূপেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে উহার অস্তোদয় কিছুমাত্রই নাই। ইহা পাষাণোদরবৎ ঘন-কঠিন নিস্পন্দভাবেই বিরাজিত।

সপ্তাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সর্ব্বাগ্রে যে চিদাভাসাত্মক জীবোৎপত্তি হয়, আমি এক্ষণে তাহাই কহিলাম। চিদাভাসাত্মক জীবকে যে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্ব্বাচন করা গেল, তাহা কেবল তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই ; বস্তুগত্যা ইহা কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র। কেন না, ঐ জীব পরব্রহ্মেরই ঔপাধিক অঙ্গবিশেষ। ব্রহ্মের চেত্য-ভাবোন্মুখ আভাস-চৈতন্যই জীব আখ্যায় অভিহিত।

হে রাঘব! ঐ জীবের কতকগুলি বিচিত্র আখ্যা নির্দ্দেশ হইয়াছে। তোমার নিকট সেই গুলির উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়নিচয়ের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের ধারণবশতঃ উক্ত চেত্যোম্মুখ চিদাভাসকে জীব-আখ্যায় অভিহিত করা হয়। অতীত ও ভবিষ্য চেত্য বিষয়ে উন্মুখ হইয়া থাকে বলিয়া উহার নাম চিত্ত, আর বর্ত্তমান সন্নিহিত চেত্য বিষয়ে উন্মুখতা নিবন্ধন উহার নাম চিৎ। যখন এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ধারণা করে যে, 'ইহা এই প্রকারই' তখন উহাকে বুদ্ধি-নামে নির্দ্দেশ করা হয়। উহা কল্পনা ও তর্কবিতর্কবিষয়ক জ্ঞানের আধার, এই নিমিত্ত মন নামে নিরূপিত। 'আমি' ইত্যাকার অভিমান অন্তরে হয় বলিয়া উহাকে অহঙ্কার বলা হইয়া থাকে। উহাকে যে চিত্ত বলিয়াছি, তাহা সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগের ব্যবহারার্থই বলা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্ব *বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ জ্ঞানময় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকেই* চিত্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত জীব ক্রমশঃ সঙ্কল্পজালে জড়িত হইয়া পূর্য্যষ্টক নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সৃষ্টির বা সংসারের মৌলিক আদি কারণ বলিয়া কাহার কাহার মতে উহা প্রকৃতিসংজ্ঞক হয়, যখন পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন উহা থাকে না; তাই পণ্ডিতবর্গ উহাকে অবিদ্যাখ্যায় অভিহিত করেন। সেই চিদাভাসাত্মক জীবের এই সমস্ত নাম তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। এই জীবের আদি, অন্ত পর্য্যন্ত সমস্তই নিরাকার অনাময় ব্রহ্ম। বুধগণের মতে উহা আতিবাহিক দেহ বলিয়া উল্লিখিত।

এইরূপে এই জীব হইতেই স্বপ্ন-দৃষ্ট বা সঙ্কল্পকল্পিত পুরবৎ এই ত্রৈলোক্যরূপ ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভ্রম যদিও ভোগমোক্ষরূপ কার্য্যকারী, তথাচ নিরাকার শূন্য-স্বরূপই। ইহার ঘাত-প্রতিঘাত কুত্রাপি নাই। ওহে দেহধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ! ঐ মদুক্ত আতিবাহিক দেহই চিত্ত। এই চিত্ত আকাশ হইতেও শূন্য। যে পর্য্যন্ত না মুক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততদিন ইহা জগতে অস্তোদয়-বিরহিতভাবেই অবস্থান করে। চতুর্দ্দশবিধ জীবজাতির একমাত্র উৎপত্তি নিদান এই আতিবাহিক দেহই। এই দেহেই লক্ষ লক্ষ সংসার কালের নিয়মে নির্দ্দিষ্টকালে ফলবৎ প্রাদুর্ভূত

হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই চিত্তময় দেহই দর্পণ প্রতিবিম্ববৎ অন্তরে বাহিরে জগৎ নাম গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু ইহা সেই শূন্যাকাশ বৈ আর কিছুই নয়। যখন মহাপ্রলয়কাল আসিলে নিখিল বস্তু এককালে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নিরাময় ব্রহ্ম মহাশূন্য পদেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া থাকেন। তৎকালে চিন্ময় ব্রহ্মে চিদাবরক অজ্ঞানের বশে আত্মার চিৎস্বরূপের বিকাশবৎ স্বতই যে একটা ঘনীভাব বিকাশ হয়, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহাই আতিবাহিক দেহবৎ চেতিত হইয়া থাকে। সেই যে আতি-বাহিক দেহ, তাহাই সৎকথিত জীব; উহা আত্মার জগদবলোকনালোকে উদ্ভাসিত হয়। ঐ যে আতিবাহিক দেহ, উহার কোন অংশ নারায়ণ, কোন অংশ বিরাট, কোন অংশ সনাতন, কোন অংশ ঈশ এবং কোন অংশ প্রজাপতি; ইহাই শাস্ত্রের সমুল্লেখ। ঐ দেহের পঞ্চভাগে পঞ্চেন্দ্রিয়-সম্বিৎ প্রতিভাত হয়। উহা কাকতালীয়ন্যায়েই হইয়া থাকে; যখন হয়, তখনই তাহা যথার্থ হইয়া থাকে। এইরূপে এই দৃশ্যপরম্পরা যদিও সম্পন্ন হউক, তথাচ প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই সম্পন্ন হয় না। একমাত্র শূন্য আত্মতত্ত্ব, তাহাই কেবল সদা বিরাজ করিতেছেন। পরব্রহ্ম অনাদি, তাহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই। কেন না, তিনিই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-বিরহিত হইয়া সদসৎ উভয়াকারেই অবস্থান করেন। যে বিরহী ব্যক্তি সতত কামিনী-চিন্তায় তন্ময়, তদীয় স্বপ্নদৃষ্ট কান্তা যেমন প্রকৃত কান্তাজনবৎ কার্য্যকারী হয়, তেমনি এই জগৎ প্রপঞ্চও আতিবাহিক দেহের স্বানুভবক্রমে যথার্থ হইয়া থাকে। স্বপ্নে অথবা সঙ্কল্পকালে নিরা-কার শূন্য স্থান যেমন ঘটাকারে অনুভূতিগোচর হয়, ঐ যে আতিবাহিক ও জগৎ, জানিবে—উহাও সেইরূপই। উক্ত আতিবাহিক দেহ যদিও আকাশস্বরূপ, তথাচ কঠিন পদার্থবৎ প্রতীতিগোচর হইয়া স্বপ্নবস্তুবৎ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। যদিও ঐ আতিবাহিক দেহ স্বপ্নবৎ শূন্য নিরাকার ও অসৎ হউক, তথাচ ক্রমশঃ আপনা আপনি এইরূপ অনুভব করিতে থাকে যে, এই জন্মগ্রহণ করিলাম; এই আমার স্থূলাস্থি ও করাদি অবয়ব; এই মদীয় পৃষ্ঠস্থ শিরা, স্নায়ু ও লোমরাজি যথাস্থানে সংযোজিত আছে। এই তো আমি কার্য্য করিতেছি, আমার ঈষৎ পরিমাণ বয়স হইয়াছে।

এইখানে এতকাল আমি রহিলাম, এই ত সকল বিষয় আমার ভোগ করা হইল। এই আমায় জরা আসিয়া গ্রাস করিল, এই আমি মৃত্যুগ্রস্ত হইলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি অশেষবিধ অনুভব উহার হইয়া থাকে। ঐ আতিবাহিক দেহস্বরূপ পুরাণ পুরুষ স্বকল্পিত উল্লিখিত স্থূল দেহে ক্ষিতি, জল, আকাশ, ইত্যাদি নানারূপে উহাদিগকে আপনার আধার করিয়া লয়েন এবং স্বয়ং তাহাতে আধেয়ভাবে থাকিয়া সতত জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়-ভাবাত্মক সংসার-স্বপ্ন অবলোকন করিতে থাকেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

ঊননবত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আদি প্রজাপতির উল্লিখিত আতিবাহিক দেহ চিন্ময়ত্ব বশতঃ কাকতালীয়-ন্যায়ে যে যে ভাবে চেতিত হয়, সেই সেই রূপেই কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। অহো! এই বিশ্ব একমাত্র সত্য সঙ্কল্প-বশেই প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু ইহা সর্ব্ব প্রকারেই মিথ্যা; দ্রষ্টাই কি, দৃশ্যই কি, আর দর্শনই কি, সকলই অসত্য পদার্থ। যদি এরূপ জ্ঞান করা হয় যে, সমস্তই ব্রহ্ম, তাহা হইলে অবশ্য সকলই সত্য, সন্দেহ নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! সেই আদি প্রজাপতির আতিবাহিক দর্শন দৃঢ় হইল কিরূপে? কিরূপেই বা স্বপ্ন সত্য হইয়া দাঁড়ায়? ইহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রজাপতির যে সেই আতিবাহিক দর্শন ভ্রম, তাহা স্বতই সতত অনুভূত হইতেছে। এই নিমিত্ত ঐ আতিবাহিক দেহ পরি-পুষ্টবৎ প্রতীতিলভ্য হয়। যদি বহুক্ষণ অনুভব করা হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন যেমন পরিপুষ্টরূপে অতীব সত্য বলিয়া প্রত্যয়গোচর হইতে থাকে,

তেমনি সেই যে আতিবাহিক ভাব, তাহাও স্থিরানুভবে স্থায়ী ভাব ধারণ করে। উক্ত আতিবাহিক দেহবিষয়ক অনুভব যখন চিরপ্রথিত হইয়া সুদৃঢ় হয়, তখন তাহাতে মরীচিকাজলবৎ আধিভৌতিকতা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। এই জগৎ যদিও সত্য বলিয়া প্রত্যয় জন্মায়, তথাচ যেমন স্বপ্নভ্রম, কিম্বা যেমন মরীচিকাজল, তেমনি ইহা অসৎ ; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আতিবাহিক দেহেই আপনা হইতে আধিভৌতিকতা বুদ্ধির উদয় হয়। সেই আধিভৌতিকতা যদি একান্ত অসত্য, তথাচ অবিবেকী ব্যক্তিরা উহা সত্য বলিয়াই অঙ্গীকার করে। আমি, আমার, এই গিরি, ঐ আকাশ, এই এই প্রকার বিশাল মিথ্যাভ্রম স্বপ্ন-শৈলবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে। আদ্য সৃষ্টিবিধাতার উক্ত আতিবাহিক দেহ ভাবনাপ্রভাবেই আধিভৌতিক ভাব ও ক্ষিতি-দেহাদি পিণ্ডাকৃতি দর্শন করে। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ যথাযথ জ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক 'এই দেহই আমি' 'এই ক্ষিত্যাদি আমার আধার' এই প্রকার বিপরীত ভাব দেখিয়া তাহাতেই আস্থাসম্পন্ন হয়। ঐ চিৎ অসত্য বিষয়কে সত্যরূপে ধারণপূর্ব্বক ভাবনার প্রাবল্যে তাহাতেই বদ্ধ হইয়া থাকেন এবং পুনঃপুন উল্লিখিত সত্য বিষয়ের ভাবনা করিতে করিতে অন্তরে নানাত্ব অনুভব করেন। তিনি প্রথমতঃ বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন ; পরে সেই শব্দের আর্থিক সঙ্কেত করিয়া দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ওঙ্কারধ্বনি করা হয়, পরে তিনি বেদরূপ শব্দসমূহের সৃষ্টি করেন। অনন্তর সেই শব্দসমূহ দ্বারা লৌকিক ব্যবহার কল্পনা করিয়া থাকেন। উহাঁর মনস্বরূপে যাহা কল্পিত হয়, তাহাই উনি অনুভব করিয়া থাকেন। ফলে যে, যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহার তাহা দৃষ্ট হইবে না কেন ? সে তাহা তো অবশ্যই দর্শন করিবে। এইরূপে এই অসত্য জগদ্ভ্রান্তি প্রসিদ্ধ সত্য হইয়াছে। এইভাবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সেই আতিবাহিক দেহেরই চিরস্বপ্ন ও ইন্দ্রজালবৎ আধিভৌতিকভাবে স্ফুরণ হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আধিভৌতিক নামে যে একটা পৃথক্ পদার্থ কোথাও আছে, তাহা অবশ্য নাই। সুদৃঢ় অভ্যাসের গুণে আতিবাহিক—আধিভৌতিক ধারণা করে। যিনি সর্ব্বমূলীভূত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাঁহা হইতেই এই প্রকার মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান প্রকট হইয়াছে। এই নিমিত্ত

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদেরও যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত এই জগদ্দর্শন ভ্রম থাকিয়া যায়।

রামচন্দ্র! চিদাত্মবিষয়ক এহেন দুর্দ্দশাপুঞ্জ পিণ্ডীভূতভাবে কোথায় আছে? ফলতঃ ইহা কোথাও নাই। ইহা ভ্রান্তি! কেবলই ভ্রান্তি! পক্ষান্তরে সেই পরব্রহ্মই বা এই এই প্রকারে প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছেন। এই জগতের যদি কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে একমাত্র সেই শাশ্বত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকে কারণ বলা যাইবে? যদি ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তবে সেই ব্রহ্মের আবার কারণ কি? তাহা বল দেখি? অগ্রে নিজে অন্য কাহারও কার্য্য হইতে হয়; তা না হইয়া অপরের কারণ হইতে পারে না। প্রকৃত কথা, তিনি অনাময় পরব্রহ্ম; তাঁহাতে কার্য্য-কারণ ভাব কোন ক্রমেই সম্ভবপর হয় না। অতএব এই যে জগৎ, ইহাকে ভ্রান্তি বৈ আর কি বলা যাইবে?

উননবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তিই বন্ধন; আর সেই জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তিই মুক্তি।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রশমন হয় কিরূপে? সেই দৃঢ়াভ্যস্ত জ্ঞেয়ভাবের নিবৃত্তিই বা কিরূপে হয়? ইহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যৎকালে সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখনই জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব প্রাপ্তিরূপ ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভ্রম নিবৃত্ত হইলেই নিরাকার শান্ত মুক্তি সমাগত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বোধ বা জ্ঞান তো কেবলীভাব বা কৈবল্য, তাহাতে আবার সমীচীন জ্ঞান কি?—যে জ্ঞান হইলে অখিল জীব বন্ধনমুক্ত হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব নাই ; যাহা অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় জ্ঞান, তাহাই একমাত্র বিদ্যমান। অন্তরে যে এবম্প্রকার বোধোদ্রেক হয়, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! চিদেকরসরূপ জ্ঞানের অন্তরালে চিৎ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ জ্ঞেয়তা আর কি? আমার আরও এক কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি যে জ্ঞানের কথা কহিলেন, ঐ জ্ঞান শব্দ কোন্ বাচ্যে সম্পন্ন হইয়াছে? উহা কি ভাববাচ্য বা কারণ বাচ্যের রূপ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বোধমাত্রই জ্ঞান ; সেই জ্ঞান শব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন। পবন ও স্পন্দের যেমন পার্থক্যভাব, তেমনি সেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানেরই মায়িক বিকল্প।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এইরূপ হইলে তো এই জ্ঞান জ্ঞেয়াদি বিকল্প শশশৃঙ্গবৎ নিতান্তই অলীক পদার্থ। কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই ইহা অব্যবহার্য্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ ভ্রমবুদ্ধি কেবল বাহ্যবস্তুরূপ ভ্রমের বশেই হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কি বাহ্য, কি আভ্যন্তর কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! এই 'তুমি' 'আমি' প্রভৃতি পদার্থনিচয় তো সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অথচ আপনি ইহাতে নাই বলিলেন কি করিয়া? ইহা আমায় বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! সৃষ্টির উপক্রমে বিরাড়াত্মা প্রভৃতি কোন পদার্থই যখন প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন জ্ঞেয় পদার্থের সত্যতা সম্ভাবনা কিরূপে করা যাইবে? ফল কথা, সৃষ্টিকালে মায়া ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না ; কাজেই এ জগৎ যে একটা ভ্রমমাত্র, ইহাই বলিতে হইবে। তত্ত্ববিষয়িণী শ্রুতিকেই এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা হয় ; তা'ভিন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষাদি একটা প্রমাণই নহে।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—মুনিবর! ভূতই কি, ভবিষ্যৎই কি, আর বর্ত্তমানই কি, তিনকালেই আমরা জগৎ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু আপনি এ জগৎকে অলীক বলিয়া বর্ণন করিলেন কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, মরীচিকায় বারি, দ্বিতীয় চন্দ্রমা, সঙ্কল্প-কল্পিত বস্তুচয় অথবা নেত্রদোষে আকাশে দৃশ্যমান কেশগুচ্ছ, তেমনি 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি জগৎ মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বিভো! 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদিরূপ জগৎ যখন স্পষ্টই অনুভবগম্য হইতেছে, তখন সৃষ্টির আদ্যাবস্থায় ইহাকে উৎপন্ন বলায় কি দোষ হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেখ, কার্য্যের উৎপত্তি কারণ হইতেই হয়; অকারণে তো আর কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চিতই। এই যে জগতের কথা বলিতেছ, ইহার উৎপত্তি ব্যাপারে তো কোনই কারণ নাই। যেকালে মহাপ্রলয় ঘটে, তখন তো সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, সেকালে কিছুই তো আর রহে না। কাজেই জগৎকে যদি উৎপন্ন বলা হয়, তবে তাহার কারণ বলা হইবে কাহাকে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! মহাপ্রলয়ে সকলই যায়; থাকেন মাত্র—এক অজ অব্যয় পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মই কেন সৃষ্টির কারণ রূপে প্রথিত হইবেন না?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাহা কারণ, কার্য্য তাহাতে সূক্ষ্মভাবে থাকিবেই; কারণে কার্য্য থাকিয়া পরে তাহা প্রকাশ পায় মাত্র; পরন্তু হে রামচন্দ্র! সেই যিনি ব্রহ্ম, তাঁহাতে তো কার্য্য অতি সূক্ষ্মভাবেও নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্ম হইলেন সৎ, আর জগৎ হইল অসৎ; সৎ হইতে অসৎ বস্তুর উৎপত্তি কুত্রাপি হয় না। যে বস্তু বিসদৃশ, তাহা হইতে কি বিসদৃশ বস্তুর কখন উৎপত্তি হইয়া থাকে? ভাবিয়া দেখ, ঘট হইতে কি কোথাও পটোৎপত্তি হয়?

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি একথা বলি যে, মহাপ্রলয় হইয়া যাইবার পর এ জগৎ সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মেই অবস্থান করে; অনন্তর আবার যখন সৃষ্টিকাল আইসে, তখন তাহাই আবার প্রকট হইয়া পড়ে। একথায় দোষ কি আছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! প্রলয় হইয়া যাইবার পর সৃষ্টির অস্তিত্ব কে কোথায় অনুভব করিয়াছে? আর সেরূপ অনুভবে আস্থাই বা কি আছে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি এ কথা বলা যায় যে, মহাপ্রলয়ের অন্তে যে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বিরাজ করেন, এই সৃষ্টিও সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মে মিশিয়া জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করিতে থাকে; ইহা সম্পূর্ণভাবে শূন্য হইয়া যায় না। কেন না, যাহা সর্ব্বরকমে শূন্য অসৎ পদবাচ্য, তাহা কখনই সৎ হয় না; এরূপ বলায় দোষের হয় কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! এরূপ বলিলে জ্ঞানই তো জগৎ হইয়া দাঁড়ায়। যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহাই জগৎপ্রপঞ্চ, এবং তাহাই তদ্গত জীবের দেহ হইয়া পড়ে। এরূপ ব্যবস্থায় জনন-মরণ আবার কি হইতে পারে ? কেন না, সকলই তো নিত্য পদার্থ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে এ সৃষ্টি ছিল না; এখন ইহা আসিল কোথা হইতে ? ভ্রান্তিই বা হইল কিরূপে ? ইহা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকারণভাব যখন নাই, তখন তো ভাব বা অভাব নামে কোন পদার্থেরই সম্ভাব নাই। তবে যে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ইহা সেই আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ব্রহ্মমাত্রই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যদি এরূপ হয়, তবে তো বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। দ্রষ্টা যিনি, তিনিই দৃশ্য; ঈশ্বর চেতনরূপী, নিজেই তিনি জড়দৃশ্য হইলেন, ইহা কি কখন সম্ভব হয় ? নিয়ম তো ইহাই যে, বহ্নি দাহকর্ত্তা, আর কাষ্ঠ তাহার দাহ্য; কিন্তু কাষ্ঠ কিছুতেই দাহকারী হইয়া বহ্নিকে দাহ করিতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দ্রষ্টা বস্তুতঃ দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হয় না; কেন না, দৃশ্য বস্তুর সম্ভবপরতা একেবারেই নাই। দ্রষ্টাই কেবল সর্ব্বস্বরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। ইহাতে তো বৈপরীত্য কিছুই দৃষ্ট হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে শুদ্ধ চৈতন্য জগৎকে চেত্যরূপে অনুভব করেন, একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে; না বলিলে, এ জগতের প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চেত্যের অসম্ভবতা কিরূপে, তাহা আমায় বলুন দেখি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কারণের অসদ্ভাবেই চেত্যের অসম্ভবপরতা হইয়াছে। চেতন ব্রহ্ম সততই মুক্ত এবং অনির্ব্বাচ্য।

রাম জিজ্ঞাসিলেন,—আত্মা যদি সর্ব্বদাই মুক্তস্বভাব, তবে এই অহম্ভাবাদিই বা কি? ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে কিরূপেই বা হইল? জাগতিক জ্ঞান বা স্পন্দাদি জ্ঞানই বা হয় কিরূপে? এ কথা আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কারণের অভাব; তাই কিছুই জন্মে নাই। সুতরাং চেত্যসৃষ্টি অকিঞ্চন—কিছুই নহে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যিনি জগতীত নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ নির্ম্মল ব্রহ্ম, তাঁহাতে ভ্রমই বা কাহার কিরূপে হয়, তাহা আমায় ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কারণের অসদ্ভাবে পরব্রহ্মে ভ্রমও বস্তুতঃ নাই। 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি সকলই শান্ত; একমাত্র সেই যে অনাময় ব্রহ্ম, তিনিই সত্য।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এরূপ হইলেও আমি যেন ভ্রমেই পড়িতেছি। আপনাকেও অধিক কিছু জিজ্ঞাসিতে পারিতেছি না। এখন পর্য্যন্ত আমি পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইতেও পারি নাই; সুতরাং কি আর জিজ্ঞাসিব?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যে পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ের সংশয় নিরাস না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া লও। অনন্তর যখন তোমার নিখিল সংশয় দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখন তুমি—যাহা সেই অনির্ব্বচনীয় পরম পদ, তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—কারণ নাই বলিয়া সৃষ্টি পূর্ব্ব হইতেই নাই; ভবদীয় এরূপ সিদ্ধান্ত আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি; তথাচ এই চেত্য-চেতন-বিভ্রম কাহার? এ সংশয় আমার কিছুতেই অপনীত হইতেছে না কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদিও তুমি এইরূপ বুঝিতে পারিয়াছ যে, কারণ বিনা সকলই শান্ত; জগদ্‌ভ্রম কোথাও নাই। তথাচ অভ্যাস নাই বলিয়া

এক্ষণে এ প্রকার বোধ তোমার সুদৃঢ় হইতেছে না; তাই পরম পদে বিশ্রামলাভও তোমার পক্ষে ঘটিয়া উঠিতেছে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! অভ্যাস না হয় কেন? আর যাহা অভ্যাস, তাহাই বা হয় কোথা হইতে? যথায় জগদ্‌ভ্রমেরও কারণ বিদ্যমান নাই, তথায় একটা অভ্যাসরূপ ভ্রান্তিই বা কি কারণে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়? এ রহস্য আমায় বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ব্রহ্ম অনন্ত; তাহাতে কোনও প্রকার ভ্রমই নাই; এ কথা নিশ্চিতই। তথাচ জীবন্মুক্ত যোগী পুরুষদিগের যেমন চিন্ময়বোধে নিখিল বস্তুতেই ব্যবহারপ্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি তোমারও অভ্যাসপ্রবৃত্তির অস্তিত্বে দোষ কি আছে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনারা তো জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ; আপনাদের সর্ব্ব জগদ্-ভ্রম অপগত হইয়াছে। তথাচ এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান, আর পর-কায়প্রবেশাদি দ্বারা পরের প্রবোধ জন্মান, এই দুই ব্যাপারের কারণ কি? ইহা আমায় বুঝাইয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! উপদেশ্য, উপদেশ, ইত্যাদি ইত্যাদি নিখিল ব্যবহাররূপেই একমাত্র সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মে বিরাজ করিতেছেন। যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ হইতে পারিয়াছেন, যাঁহার ভ্রান্তি বলিয়া কোন কিছুই নাই; বন্ধনই কি, আর মুক্তিই কি, তাঁহার তো কোন কিছুই নাই। এ কথা নিঃসংশয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—দেশই কি, কালই কি, ক্রিয়াই কি, আর দ্রব্যই কি, ইত্যাদি ভেদ যখন একান্তই অসম্ভবপর, তখন জগৎসত্তা আসিল কোথা হইতে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাহারা দেশ-কাল-ক্রিয়া-দ্রব্যাদি ভেদ জ্ঞান করে, তাদৃশ অজ্ঞানীদিগের অজ্ঞানেই জগৎসত্তা প্রতীয়মান হয়। তদ্‌ব্যতীত জগৎসত্তা কোন কালেই নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কারণ নাই বলিয়া দ্বিত্ব বা একত্ব যখন সম্ভবপর নহে; তখন বোধ্য-বোধকভাবেরও অভাব হইয়া পড়ে।

সুতরাং তত্ত্ববোধকেই বোধরূপে নির্দ্দেশ করেন কি প্রকারে? যাহা বোধ, তাহা তো আর অকর্ম্মক নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অবুদ্ধ ব্রহ্মই স্বীয় অবোধক্ষয়ফলের আশ্রয়-রূপে বোধের কর্ম্ম হন। ফল কথা, তদ্গত অজ্ঞানক্ষয়ই বোধ্য হইয়া পড়ে। সেই নিমিত্তই বোধশব্দ সকর্ম্মক হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এই যাহা বলিলাম, ইহা তোমাদের পক্ষেরই কথা; আমাদের পক্ষের কথা এরূপ নহে; তাহার কারণ এই যে, আমরা হইলাম জীবন্মুক্ত, আমাদের জ্ঞানই নাই; কাজেই আমাদের কাছে বোধের কর্ম্মও নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে আমাদের পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, ইহাতে তো আপনারা জীবন্মুক্ত হইলেও আপনাদের একটা অহম্ভাবই দেখান হইল। এই যে অহম্ভাব, ইহাকে অবশ্য অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া নিদে'শ করা যায় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্ববোধও অহম্ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমার সন্দেহ এই যে, তৎকালে তত্ত্ববোধ ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকে না; আপনিও অনন্ত অমল চিৎস্বরূপ, অথচ আপনাতে এই অহম্ভাবের আগমন কোথা হইতে হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমরা বোধরূপী; আমাদের যে বোধ, তাহাকেই আমরা—যেমন পবনকে স্পন্দ বলা হয়, তেমনি ভাবে 'অহম্ভাব' বলিয়া বিবৃত করি। অজ্ঞ যেমন অহঙ্কার-অভিমানে বলে, সেরূপ ভাবে আমরা বলি না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—অগাধ জলধিমধ্যে তরঙ্গ-বুদ্বুদাদি কত কি উত্থিত হয়; ঐ সকল তরঙ্গাদি ও জলধির জলরাশি যেমন একই পদার্থ, জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের বোধ্য ও বোধ অহম্ভাব প্রভৃতি কি তেমনি একই পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহাই বটে; উহা একই পদার্থ। এইরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা রাখিতে পারিলে, তোমার যে দ্বিত্বাদি-প্রসক্তি নিমিত্ত দ্বৈতহানিরূপ দোষের আপত্তি হইয়াছিল, সে আপত্তি আর টিকিবে না। তুমি ঐরূপ জ্ঞানকেই দৃঢ় করিয়া লও; লইয়া যাহা অনন্ত শান্ত পূর্ণ ব্রহ্মপদ, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে থাক।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! যাহা সেই বিশুদ্ধ অদ্বৈত পক্ষ, তাহাতে যে পবনস্পন্দবৎ 'তুমি' 'আমি' ভাব প্রকট হয়, এ ভাবের কল্পনাই বা করে কে? আর ভোগই বা করে কে? যদি সেরূপ কল্পনা স্বীকার করা হয়, তবে তো আবার সেই অনন্ত জগদ্ভ্রমই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অপিচ সেই যে বন্ধ-মোক্ষ-কল্পনা, তাহাও আসিয়া উপস্থিত হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাহা জ্ঞেয় বস্তু, তাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়া লইলেই আবার সেই বন্ধন-প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানে বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহার নিকট তো জ্ঞেয় পদার্থ সত্য হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয়; তাই তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট অসত্য বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে। প্রারব্ধের পূর্ণক্ষয় ঘটে না, তাই এক মাত্র বোধই তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সর্ব্বপদার্থাকারে প্রকট হয়; সুতরাং তাঁহাদিগের বন্ধ-মোক্ষ আবার কিরূপ কথা?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান সর্ব্বপদার্থাকারে প্রতিভাত হইবে কিরূপে? দীপালোকের বিকাশে নীলপীতাদি বর্ণ যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানবৈভবে বাহ্য ঘটপটাদিও তেমনি প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। সুতরাং যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি-সিদ্ধ বাহ্য বস্তু, তাহা তো তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞানবৈভবে সত্যই হইয়া দাঁড়াইবে, আপনি ইহার অপলাপ করিবেন কি প্রকারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অকারণোৎপন্ন বাহ্য বস্তুরূপ কার্য্যের সত্যতাই ভ্রান্তি; উহা অসত্য। ঐ ভ্রান্তির মূলীভূত যে অজ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নাই। কাজেই তাঁহাদের নিকট উহা অসত্য বলিয়াই প্রতীত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, যখন দেখা যায়, তখন তো স্বপ্ন দুঃখোৎপাদন করিয়া থাকে। তেমনি এই যে জগদ্ভ্রম, ইহা সত্য মিথ্যা, যাহাই হউক, ইহার দুঃখদান-সামর্থ্য কোথায় যাইবে? এ তো দুঃখ দান করিবেই; অতএব যে উপায়ে ইহার দুঃখদানশক্তি লোপ পাইতে পারে, তাহা আমায় বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সত্যই বলিয়াছ, স্বপ্ন ও জগৎ একই প্রকার বটে। ইহাকে পূর্ব্বাপর-সঙ্গত এক-ঘটনাকারে প্রত্যয় করাটাই ভ্রম;

সেই ভ্রম তত্ত্বজ্ঞানবলে অপাকৃত করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ দুঃখের শান্তি হইয়া যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এরূপ হইলে কল্যাণোদয় আর কি হইল? স্বপ্নাদিকালীন প্রতীত বস্তুপরম্পরার এক-ঘটনাকারে জ্ঞান বা পিণ্ডাকারতা উপশান্ত হয়ই বা কিরূপে? আমায় তাহা বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যদি পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে পদার্থপরম্পরার পিণ্ডাকারতা-জ্ঞান নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ঐরূপ বিচার-করণেই স্বপ্নকালীন দৃশ্য পরিমার্জ্জিত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—পূর্ব্বাপর বিচার করায় যদীয় স্থূল জগদ্ভাবনা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তথাবিধ জীবন্মুক্ত যোগী পুরুষ জগৎকে কিরূপভাবে দেখিয়া থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভাবনা বা বাসনা যাঁহার ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তিনি এ জগৎকে অসদাকারেই দর্শন করেন। তাঁহার ঐ দর্শন গন্ধর্ব্বনগরবৎ অথবা জলসেক-প্রোঞ্ছিত আলেখ্যপটবৎ অসৎ বলিয়াই প্রতীত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বাসনার অবসান ও বাহ্য বস্তুসমূহের পিণ্ডাকার জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে এবং জগৎকে স্বপ্নবৎ অসত্যরূপে ধারণা করিলে তাদৃশ যোগীর অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়ায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তদীয় সঙ্কল্পরূপ জগদ্বিষয়িণী বাসনাও ক্রমে তাহার লয় প্রাপ্ত হয়। তৎকালে সেই যোগী বাসনাবর্জ্জিত হইয়া সত্বর নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—বহু জন্মজন্মান্তর হইতে যাহা সুদৃঢ় ভাবাপন্ন হইয়া আসিয়াছে, বহুবিধ বহুতর শাখাপল্লবে যাহা সুবিস্তৃত হইয়াছে, তথাবিধ সংসারবন্ধনকরী ঘোর বাসনার শান্তি কিরূপে হয় বলুন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভ্রান্তিময়; ইহা প্রকৃত পরমার্থ-জ্ঞানে শান্ত হইয়া গেলে প্রারব্ধের অবসানে ক্রমে ক্রমে বাসনাক্ষয় সিদ্ধ হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! এই দৃশ্যচক্র যখন ক্রমশঃ পিণ্ডভাব হইতে মুক্ত হইয়া মিথ্যাকারে প্রতীত হয়, তখন কি আর হইয়া

থাকে? তৎকালে শান্তিই বা সংঘটিত হয় কিরূপে? তাহা আমায় বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যোগীর যখন জাগতিক সত্যতা ভ্রম শান্ত হয় এবং ক্রমশঃ চিন্মাত্রে পরিণতি ঘটে, তখন সংসারের প্রতি তাঁহার আর কিছুমাত্র আস্থাই থাকে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এ জগৎ বালসঙ্কল্পরূপ বিচঞ্চল; ইহাতে আস্থাই বা কি, আর ইহার শান্তিই বা কি? ইহাতে আস্থাবন্ধনই যদি দুঃখের নিদান হয়, তবে অস্থির-সঙ্কল্প বালকের দুঃখানুভব হয় কেন? বালকের তো কোন বিষয়েই আস্থাপ্রতিষ্ঠা হয় নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সঙ্কল্পমাত্রেই যাহার সিদ্ধি হয়, তাহার নাশের দুঃখ হইবার কারণ কি? বিচারপূর্ব্বক দর্শন করিলে তো তাহাতে দুঃখ না হইবারই কথা। দেখ, বালক ব্যক্তির বিচারাভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই সে দুঃখ পায়। এতাবতা বুঝিবে—সঙ্কল্পই চিত্ত; এ কথা তুমিও বিচার করিয়া দেখ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! চিত্ত কীদৃশ? কি উপায় অবলম্বনেই বা তাহার বিচার হইয়া থাকে? সে বিচারে কি ফল হয়? এ সকল আমায় বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চিত্তের চেত্যোন্মুখী ভাবকেই চিত্ত বলা হয়। আমি যাহা বলিতেছি, যাহা শুনিতেছি, ইহারই নাম চিত্তবিচার; বিচারেই বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! চিত্তসত্তায় চিত্তের নিরোধে চিত্তের যে অচেত্যভাবোন্মুখতা, তাহার স্থায়িত্ব কত দিন? চিত্তনির্ব্বাণকারী অচিত্তভাবই বা কিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়? আমাকে ইহা বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চেত্যের সত্তবপরত্তা একেবারেই নাই; সুতরাং চিৎ কি নিমিত্ত উহার অনুভব করিবেন? চেত্য নাই; সুতরাং চিত্তও নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যাহা অনুভব করা যাইতেছে, তাহাকে আপনি অসম্ভব বলিয়া বর্ণন করিলেন কিরূপে? অনুভবের অপলাপ, সে কেমন কথা?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তোমার কথিত এই অনুভব তো অজ্ঞ ব্যক্তির অনুভব। অজ্ঞের অনুভূত জগৎ তো আমাদের মতে মিথ্যা। তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা অনুভূত বিষয়, সেই অদ্বয় ব্রহ্মপদই সত্য।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এই ত্রিজগৎ অজ্ঞ জনের নিকট কি প্রকার? ইহার সত্যত্বই বা নয় কেন? তত্ত্বজ্ঞানী এই জগদ্বিষয়ে যেরূপ ধারণা করেন, তাহা কি বাক্যদ্বারা পরিস্ফুট করা যায় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাহা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন বাস্তব পরিচ্ছেদশালী জগৎ, তাহা অজ্ঞ জনের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট তাহা প্রতীত হয় না। তাঁহার ধারণা এই যে, এ জগৎ আদৌ অনুৎপন্ন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—যাহা মূলেই অনুৎপন্ন, তাহা তো কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। যাহা অসত্য, যাহার প্রকাশাভাব, তাহা অনুভূতিগোচর হইবে কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই জগৎ জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নসম কারণবর্জ্জিত, অনুৎপন্ন ও অসৎ হইলেও ইহা সদা সমুৎপন্ন সতত প্রতিভাত ও নিয়ত কার্য্যকারী বলিয়াই অনুভূত হইতেছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—স্বপ্নাদি ও কল্পনাদি এই উভয় স্থলে যে দৃশ্যানুভব হয়, তাহা জাগ্রদ্ব্যবহারের অনুভূতিক্রমে জাগ্রৎসংস্কারেই হইয়া থাকে, ইহাই আমার মনে হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও মনোরাজ্য এই তিন ক্ষেত্রে যে দৃশ্যানুভব হয়, তাহা কি জাগ্রৎস্বরূপ? অথবা অন্য কোনরূপ? বিশদ কথা এই যে, স্বপ্নাবস্থায় সংস্কারবশে যে দৃশ্যানুভব হয়, তাহা কি জাগ্রদ্দশায় প্রথিত দৃশ্যেরই অনুভব? না—অন্য কোনরূপ?

রামচন্দ্র কহিলেন,—স্বপ্নেই কি, কল্পনাদি মনোরাজ্যেই কি, আর ভ্রান্তিস্থলেই কি, সর্ব্বত্রই জগৎপ্রসিদ্ধ অর্থই সংস্কাররূপে প্রতীয়মান হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সংস্কারবশে জাগ্রৎই যদি স্বপ্নাকারে পরিস্ফুরিত হয়, তবে স্বপ্নে দেখা গেল যে, তোমার গৃহখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আর প্রভাতে উঠিয়া দেখিলে তাহা ভাঙ্গে নাই। এরূপ হয় কেন?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভবদীয় উপদেশ ক্রমে বুঝিলাম যে,

স্বপ্নের দেখা বস্তু জাগ্রদ্বস্তু নহে। স্বপ্নে পরব্রহ্মই দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ বুঝিলেও এখনও আমার সন্দেহ নিরাস হয় নাই। আমার এই সন্দেহ হয় যে, পরব্রহ্ম স্বপ্নে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য জগদাকারে প্রতিভাত হন? না—জাগ্রতের ন্যায় হইয়া থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—স্বপ্নাবস্থায় পরব্রহ্ম যে সর্ব্বত্রই অপূর্ব্ব বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, এরূপ অবশ্য কোন নিয়ম নাই। তবে কথা এই, যেখানে অননুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের অনুভব হয়, সেইখানেই অপূর্ব্ববৎ প্রত্যয়সিদ্ধ হইয়া থাকেন, আর যথায় অনুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের অনুভব হয়, তথায় তাঁহাকে আর অপূর্ব্ব বলিয়া অনুভূত হয় না। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যথায় যে যেরূপে উক্ত অনুভব অভ্যস্ত করিবে, সেই সেই আকারেই উহা প্রতিভাত হইতে থাকিবে। সুতরাং যদি উহাকে ব্রহ্মাকারে অভ্যাস করিতে পার, তবে উহা ব্রহ্মরূপেই প্রতিভান প্রাপ্ত হইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভবদুপদেশে এখন বুঝিলাম, জাগ্রৎ জগতেরও স্বপ্নরূপে প্রতিভান হইয়া থাকে। তথাচ এই জগদ্‌যক্ষ অতীব ভয়াবহ; ইহা কুপিত দুষ্ট গ্রহের ন্যায় অত্যন্ত ক্লেশদায়ক; কিসে ইহার চিকিৎসা করা যাইতে পারে, বলিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এই সংসার-স্বপ্নের কারণ কি? সংসার-স্বপ্নকে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এ কার্য্যের কারণ অবশ্যই একটা-না-একটা থাকিবেই। কারণ কার্য্য হইতে অভিন্ন, ইহা তোমার অবিদিত নহে; অতএব তুমিই এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ না যে, এ কার্য্যের কারণ কি আছে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—বুঝিতেছি, চিত্তই স্বপ্নদর্শনের কারণ; ঐ চিত্তই বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বিচার-দৃষ্টি বুঝাইয়া দিতেছে যে, ঐ চিত্তই সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মপদ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মতিমন্! তোমার যাহা বোধগম্য হইয়াছে, তাহাই সত্য; চিত্তই মহাচৈতন্য, সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। স্বপ্নাদি অন্য কোন কিছুও বিদ্যমান নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—এ কথা বলিবার আবশ্যক কি যে, স্বপ্নাদি অন্য কিছুই নাই? দেখুন, বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখা সকল এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যেমন বিভিন্ন, তেমনি পরব্রহ্মাই কি, জগদাদিই কি, আর চিত্ত ও স্বপ্নাদিই কি, এ সকল বস্তুতত্ত্ব এক হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে ভিন্ন, এরূপ বলায় দোষ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এরূপ কল্পনা অসম্ভব কল্পনা; কেন না, যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে, এ জগৎ মূলেই অনুৎপন্ন; যাহা আদৌ অনুৎপন্ন, তাহার কল্পনাপুরঃসর একটা অঙ্গাঙ্গিভাব অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং যিনি সেই অখণ্ড অজর শান্ত ব্রহ্ম, তিনিই সকল; তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—দ্রষ্টৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সমেত এই যে সৃষ্টিপ্রবাহ, ইহা বোধ হয় তবে সেই পরম পদে কাকতালীয়-ন্যায়ে ভ্রান্তিমাত্র।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—দৃষ্টি তিন প্রকার বলিয়া উল্লিখিত; যথা—অজ্ঞ সাধারণ-দৃষ্টি, যুক্তিদৃষ্টি, আর তত্ত্বদৃষ্টি; এই সমুদায় দৃষ্টির মধ্যে অজ্ঞ সাধারণ-দৃষ্টি উল্লেখনীয় নহে! যাহা যৌক্তিক-দৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টি, তাহাই উল্লেখার্হ। শেষোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টির মধ্যে যাহা রসজ্ঞ কবিগণের নবীন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তাহাই যৌক্তিক দৃষ্টি, আর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের যে পরমার্থ-বিষয়িণী দৃষ্টি, তাহা তত্ত্বদৃষ্টি; এই দ্বিবিধ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক আমি তোমার কাছে কিছুকাল ধরিয়া এই নিখিল বিশ্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

নবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! এই জগৎ যদি এরূপে পরমাত্ম-ময়ই হয়, তা'হলে সকল সময়ের জন্যই তো ইহা সর্ব্বভাবস্বরূপ; ইহার

আর অস্তোদয় কিছুই নাই। যদি যৌক্তিক দৃষ্টি লইয়া দেখা যায়, তবে বোধ হয় ভ্রান্তিই জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছে; আর তত্ত্বদৃষ্টি ?—তাহাতে তো তাহা বোধ হয় না; সে দৃষ্টিতে কেবল ব্রহ্মসত্তাই প্রতিভাসমান, এইরূপই প্রত্যয় হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্ম আপনাতে আপনিই বিকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার এই বিকাশ কাকতালীয়-ন্যায়েই হয়। ঐ বিকাশ হইতেই তিনি অনির্ব্বচনীয় বিদ্যাবৈভবে জীবভাবাপন্ন হইয়া আপনাকেই জগদাকারে অনুভব করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! আপনিই বলুন না, অবলম্বন বিনা দীপপ্রভার বিকাশ হইতে পারে কিরূপে? সে অবস্থায় উহার বিকাশ যেমন অসম্ভব, তেমনি চিদাত্মার সত্তা সম্ভাবনার অভাব একটা আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ইহা আশ্চর্য্য হইলেও তুমি একবার প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে—অসম্ভব কিছুই নহে। যখন অন্ধকার উপস্থিত হয়, তখন সূর্য্যাদির প্রভা যেমন আপনা-আপনি আপনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি ঐ চিৎপ্রভা আপনা হইতেই প্রকাশমান। ভিত্তিরূপ অবলম্বন পাইয়াই সূর্য্যাদির প্রভা প্রকাশ পায়, এইরূপ অনুভব হয় বটে, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে; বাস্তব কথা এই যে, উহা অবলম্বন বিনাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন ভিত্ত্যাদির সহিত সম্বন্ধঘটনার পূর্ব্বেও আকাশে সৌরী প্রভা প্রকাশমান হয়, তেমনি সৃষ্টির প্রাক্‌কালে বা মহাপ্রলয়ে বক্তা শ্রোতা আত্মা নির্ব্বিষয়ই; এইরূপেই তাঁহাকে দেখিও। সত্য কথা এই যে, দ্রষ্টা দৃশ্য কিছুই নাই; আছেন মাত্র কেবল সেই অনাময় ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভা আপনা হইতে প্রকাশমান। স্বপ্নাদি ব্যাপারে চিৎপ্রভাই যেমন দ্রষ্টা ও দৃশ্যাকারে পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি একমাত্র সেই ব্রহ্মচৈতন্যপ্রভাই দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারে আপনাপনি দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। সুতরাং সৃষ্টির প্রাক্‌কালেও চিৎ প্রতিভাত হন। তৎপরে তিনিই সৃষ্টিস্বরূপ হইয়া বিরাজিত হইয়া থাকেন। চৈতন্য স্বয়ম্প্রকাশ; তিনি সৃষ্টিকালে আপনিই প্রকাশ্য ও

প্রকাশাকারে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। ঐ সময় চিৎ নিজেই চেত্তা, চেতয়িতা ও চেতনরূপ হইয়া সৃষ্টির আকারে প্রতিভান প্রাপ্ত হন। আপনাপনি প্রতিভাত হওয়াই উক্ত চিতের স্বভাব। ইহার স্পষ্টানুভব স্বপ্ন বা সঙ্কল্প-নগরাদিতেই হয়। চিৎপ্রভা প্রথমোদয় হইতে ঐ রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আকাশ-রূপিণী চিৎ আকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন; ইহারই নাম এই জগৎপ্রতিভা। ইহা ব্যতীত এ জগৎ আর কিছুই নহে। চিতের যে সৃষ্টিরূপে বিকাশ, তাহারই নাম সৃষ্টি; তাঁহার ঐ রূপ বিকাশের আদি-অন্ত কিছুই নাই; উহা চিরকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যাহাদের জ্ঞানমাত্র নাই, তাহারাই উহাকে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করে। আমাদের কিন্তু এ বিষয়ে একটা নৈসর্গিক বোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাস্য ও ভাসক জ্ঞান যখন রূঢ় হইয়া যায়, তখন তত্ত্বানুসন্ধানে সত্বরই উহার নাশ হইয়া থাকে; সৃষ্টির প্রাক্কালে ভাস্য বা ভাসক কিছুই ছিল না। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে স্থাণুতে যেমন পুরুষ বলিয়া ভ্রম প্রতীতি হয়, তেমনি আত্মায় দ্বৈতভান হয় বলিয়া চিত্তেও দ্বৈতভানের উদয় হইয়া থাকে। ফলের বেলায় কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে ভাস্যই কি, ভাসকই কি, আর দ্বৈতই কি, কারণ নাই বলিয়া কিছুই নাই। কেবল চিদাকাশ; বল দেখি, তাহাতে দ্বৈতভানের প্রকৃত কারণ কি থাকিতে পারে? বাহ্য পদার্থরূপে সৃষ্টির অস্তিত্ব মোটেই নাই; ইহা চিতেরই এইরূপ প্রকাশভাব। এই জগদ্ভানকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি, এতত্রয়ের কোন কিছুই বলা যায় না। বাস্তবিকই ইহা কিছুই নহে। দৃশ্যমাত্রই অসম্ভব; একমাত্র সেই ব্রহ্মই প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে চিদাকাশের বিকাশ এইরূপই। চিৎ তাঁহার নিজ অবয়বকেই জগৎ বলিয়া অবগত হন। ফলে কিন্তু তাহা জগৎ নহে; সৃষ্টির প্রাক্কালে কেবল মাত্র চিদাকাশেরই বিদ্যমানতা। এই যে জগৎ প্রতিভা পাইতেছে, জানিবে—ইহা আকাশেরই শূন্যতাপ্রায়। আমার এইরূপ উপদেশ মত পরম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করত ক্রমশঃ ইহা যখন স্থিরভাবে অনায়াসে অনুভূয়মান হইবে, তখন পাষাণবৎ নিশ্চল নির্ব্বিকল্প-ভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তুমি মগ্ন হইয়া রহিবে। মূর্খ অজ্ঞান লোকে

যাহা বারবার ভোগ করিয়া বৈরাগ্যোদয়ে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, দুষ্ট লোকের পরামর্শানুসারে তাদৃশ বাহ্য বিষয় সকল গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

একনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—অহো! এত দিন আমি আত্মতত্ত্ব কি, তাহা বুঝি নাই; না বুঝিয়া নিরন্তর এই অনন্ত সংসারাম্বরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এখন সেই আত্মতত্ত্ব আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমি আর এ জগদ্ভ্রমে পড়িতেছি না; এ ভ্রম পূর্ব্বেও নাই; পরেও কখন হইবে না। এখন আমার নিকট সকলই শান্ত; একমাত্র নিরালম্ব বিজ্ঞানপদই পরিশিষ্ট। যাহাতে রঞ্জনা নাই—কল্পনা নাই, এ হেন অনন্ত চিদাকাশই কেবল পরিশেষতঃ বিরাজিত। অহো! আমি জানিতে পারি নাই বলিয়া এই পরমাকাশই আমার চক্ষে সংসাররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। যাহা নিত্য নির্ম্মল পরমাকাশ, তাহাই এতকাল আমার নিকট অনির্ম্মলরূপে এই দ্বৈত, এই পর্ব্বতবৃন্দ, এই লোকনিবহ, ইত্যাদি ভাবে উপলভ্যমান হইয়াছিল। সুষুপ্তিই কি, পরলোকই কি, আর স্বপ্নই কি, সর্ব্বত্র একমাত্র চিৎই চেত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অতএব প্রকৃত দৃশ্যবুদ্ধি ইহাতে কোথা হইতে আসিবে? পুরুষের যদি এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, আমি স্বর্গে বা নরকে বাস করিতেছি, তাহা হইলে তাহার স্বর্গ বাস জন্য সুখ এবং নরকবাস জন্য ক্লেশ, উভয়ই যুগপৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। কেন না, যে কিছু দৃশ্য, সকলই জ্ঞানময়; জ্ঞান যেমন হইবে, দৃশ্যও অবিকল তেমনই হইবে। নাই দৃশ্য, নাই কেহ, নাই জগৎ, কিছুই তো নাই; যাহা কিছু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সিদ্ধ, সমস্তই অসৎ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি বিশেষ বিচারালোচনা করিয়া দেখা যায়,—এই ভ্রান্তি কি? কোথা হইতে ইহার সমাগম? তবে তো ইহার অস্তিত্বই অনু-

ভূত হইবার নহে। ভ্রান্তি কুত্রাপি কিছুই নাই, ইহাই তো বোধ হইবে। এই যে কিছু দৃশ্যপ্রপঞ্চ, সকলই বিচারে নাস্তি হইয়া পড়িবে। যাহা নির্ব্বিকার পরাৎপর পরম পদ, তাহাতে তো ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভবপর। তবে এই ভ্রান্তি-জ্ঞান কি? উহা জ্ঞানমাত্রই। ফলের বেলায় উহা কিছুই কিছু নহে। যাহার আদি নাই, অন্তরাল নাই বা অন্ত নাই, তথাবিধ আকাশে, পর্ব্বতাভ্যন্তরে বা বিকার-বিহীন পরম পদে অন্যবিধ কল্পনার আগম কোথা হইতেই বা হইবে? স্বপ্নে যেমন স্বীয় মৃত্যু-অনুভব, তেমনি ভ্রমের অনুভব সম্পূর্ণই মিথ্যা; পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে সকলই শান্ত হইয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে, এই কয়টা বস্তু একেবারেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যথা—মরীচিকাজল, গন্ধর্ব্বনগর, নেত্রদোষ-প্রতীত চন্দ্রযুগ্ম, আর এই অবিদ্যাভ্রম। বালকের বেতাল-ভ্রমবৎ এই জগদ্ভ্রম জাগ্রদ্দশায় প্রত্যক্ষ হইলেও ইহা যথার্থ পদবাচ্য হইতে পারে না। অবিচারপ্রভাবেই এই ভ্রম সত্যরূপে রূঢ় হইয়া যায়। কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে সবই শান্ত হইয়া যাইবে।

মুনিবর! এই ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, এরূপ প্রশ্নসঙ্গতি হয় না; কেন না, প্রশ্ন তো বিচার করিয়া দেখিবারই নিমিত্ত; কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। এই ভ্রমের মূলীভূত অজ্ঞান বিচার করিয়া দেখিবার নহে; কেন না, উহা অসৎ। যাহা অসৎ, বা অসত্য, বিচার দ্বারা তাহা তো লভ্য হইবে না। যাহা সৎ বা সত্য, বিচার দ্বারা নির্ণয় তাহারই হইয়া থাকে। প্রামাণিক বিচার দ্বারা দেখিতে গিয়া যাহা পাইবে না, জগন্মূলীভূত সেই অজ্ঞান অসৎই। সেই অজ্ঞানের যে অনুভব, তাহাও ভ্রান্তি বৈ আর কি বলা যাইবে? প্রমাণ দেখাইয়া বিচার করিয়া যাহা নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আকাশকুসুমোপম—শশশৃঙ্গসন্নিভ অজ্ঞান কিরূপে লভ্য হইবে বলুন দেখি? চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও কুত্রাপি যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই বন্ধ্যানন্দনপ্রতিম অজ্ঞানের আবার অস্তিত্ব কি প্রকার? সুতরাং ভ্রান্তি কখনই কোনওরূপে সম্ভবপর নহে। যিনি কেবল বিরাজমান আছেন, তিনি সেই নিরাবরণ বিজ্ঞানঘন অনন্ত আত্মামাত্রই। অদ্য আমার চক্ষে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু

প্রতিভাত হইতেছে, ইহা সেই ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে। সেই যে নিরতিশয় আনন্দ-পূর্ণ পরব্রহ্ম, তাঁহাতে কেবল পূর্ণব্রহ্মই বিরাজিত। এই ব্রহ্মে অন্য কিছুই কদাচ প্রতিভাত হয় না, সেই শান্ত স্বচ্ছ শুদ্ধ ব্রহ্মই এই জগদাকারে বিরাজমান। আমি এক্ষণে সেই পরব্রহ্মই হইয়াছি—যাহা অপরের অহার্য্য, সুধীগণের সেব্য এবং নিরাময় শুদ্ধ অদ্বয় সদা-বিকাশময়। আমার যে অহম্ভাব ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—দেবগণই কি, আর ঋষিগণই কি, কেহই সেই অনাদি অমধ্য অনন্ত পরমপদ পরিজ্ঞাত নহেন; কিন্তু আজ সে পদ আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এখন আর জগৎ কৈ? কিছুই নাই; সব গিয়াছে। এখন আর দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ লইয়া বাদবিতণ্ডার প্রয়োজন কিছুই আমাদের নাই। আমার সর্ব্বসন্দেহ ছিন্ন হইয়াছে। আমার এখন তাদৃশ রূপ প্রকট হইয়াছে—যাহা অনাময়, অনাদি ও শান্তিময়। কেশগুচ্ছ ও গন্ধর্ব্বনগরাদির যেমন আকাশে ভান হইয়া থাকে, এই সুবিশাল ত্রিজগদাকাশের ভানও চিদাকাশে অবিকল সেইরূপই হইতেছে। যেমন আকাশে আকাশত্ব, পাষাণে পাষাণত্ব এবং জলে জলত্ব, সেই চিদাকাশেও জগত্ত্ব সেইরূপই। অহম্ভাবাদি নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ যদিও দিগন্ত অনন্তব্যাপী হউক, তথাচ উহাকে মহাচৈতন্যের অন্তরাল-বর্ত্তী বলিয়াই অবগত হওয়া সমুচিত। যদিও উহা অসংখ্যেয়রূপে সুবিস্তৃত, তথাচ ইহা শূন্যভাবে সমুদিত আকাশমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। উদয়-পরিধি-পরিবর্জ্জিত পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মাত্রেই জীবের সংসারপিশাচ প্রশমিত হইয়া যায়। তৎকালে ব্যবহারদশাবস্থিত জীব জড় হইলেও অজড় হইয়া যায়। তখন জলে জলতরঙ্গবৎ সমস্ত ভেদজ্ঞানই নিরস্ত হয়।

ত্রিতাপজনক অজ্ঞান-বিভাকর যখন অস্তমিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সংসার-দিবসেরও অবসান ঘটিয়া থাকে এবং মোক্ষ-সুখে বিশ্রামরূপ রজনীর সমাগম হয়। জীব পরমতত্ত্ব অধিগত হইলে ভাবাভাব, জন্ম, জরা, মরণ ও অন্যান্য ব্যবহারদশায় থাকিয়াও সে থাকে না। তৎকালে মনে হয়, অবিদ্যাই ভ্রান্তি; সুখ দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। বিদ্যায় বা অবিদ্যায় যাহা সুখোদয় হয়, বস্তুতঃ তাহা সুখ নহে—দুঃখ! সুখস্বরূপ বলিতে একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মকেই বলা যায়। সেই যে নির্ম্মল সৎ ব্রহ্ম, তাহাই অধুনা অবগত হইয়াছি। এখন আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমরা যাহা জানি না, তাদৃশ ব্রহ্মেতর বস্তু কিছুই নাই। আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি; আমার সর্ব্ব কুদৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিজগৎকে শান্ত দ্বৈতরূপ বৈষম্য-বিরহিত আকাশাকারেই আমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি। যৎক্ষণ হইতে আমার সমীচীনরূপে প্রবোধ জন্মিয়াছে, সেইক্ষণ হইতেই আমার নিকট এ জগৎ কেবল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাসমান হইতেছে। যে পর্য্যন্ত আমি আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হই নাই, ততকাল অন্যপ্রকারে আমার অবস্থান ছিল; এক্ষণে আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে; তাই 'আমি যে ব্রহ্মই' ইহাই আমার প্রতিবোধ জন্মিয়াছে। একমাত্র আকাশই যেমন শূন্যত্ব, নীলত্ব ও একত্বরূপে অবস্থিত, তেমনি এক সেই অজর ব্রহ্মই মৎ-সমীপে জ্ঞানাজ্ঞানাদি নিখিলরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ইহার স্বরূপাতিরিক্ত জ্ঞানাজ্ঞানবিকাশ নাই। আমি সম্প্রতি নির্ব্বাণস্বরূপ লাভ করিয়াছি, নিঃশঙ্ক ও নিরীহ হইয়াছি; সেইভাবে আমার পরম সুখা-বস্থান হইতেছে। আমি অধুনা যথাবস্থিত নিত্য অনন্তরূপে অবস্থান করিতেছি; প্রবুদ্ধ হইয়াছি। অতএব এখন আর আমার ব্রহ্মস্বরূপে থাকিবার প্রতি-বন্ধক কি আছে? সর্ব্বদাই আমি সর্ব্বস্বরূপ; অথবা আমি অতীব শান্ত, আমাতে কিছুই তিষ্ঠিয়া নাই। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই আমি অবস্থান করিতেছি। অথবা আমি কোথাও বিদ্যমান নাই। আহা! যাহা সেই নির্ব্বাণাখ্য অত্যাশ্চর্য্য শান্তি, তাহা আমার লাভ হইয়াছে। অধুনা যাহা প্রাপ্য, তাহা পাইয়াছি। অন্যে যাহা পাইতে পারে নাই, তাহাও আমার আয়ত্ত হইয়াছে। যত কিছু বাহ্য বস্তু আছে, আমার নিকট হইতে তাহা

দূরীভূত হইয়াছে। যথায় অস্তোদয়ের নাম মাত্র নাই, সেই স্বপ্রকাশ বোধের উদয় আসার হইয়াছে।

ত্রিনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিক শততম সর্গ।

—*—

রামচন্দ্র কহিলেন,—চিদাত্মা স্বপ্রকাশ; তিনি নিখিল জীবের নিখিল মনো-বৃত্তিতে যে ভাবে যখন বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেইভাবই তখন তাঁহার আপনা হইতে অনুভবগম্য হয়। অনন্ত-বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড, একমাত্র পরমস্বভাবেই সম্মিলিত আছে। নানাবিধ রত্নকিরণ যেমন একটী গৃহের অভ্যন্তরে অসঙ্কীর্ণভাবে বিরাজ করে, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা সেই পরব্রহ্মে অসঙ্কীর্ণভাবেই বিরাজমান। পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে এই জগৎপুঞ্জ পরমাত্মায় অবাধে প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতেছে। প্রদীপ-প্রায় প্রজ্বলিত নানা সৃষ্টির অন্তরালে কোন দৃষ্টিতে জীবনিবহের অনুভব পরস্পর সমান এবং কোথাও বা তাহার বিপরীত হইতেছে। জলধিজলের প্রত্যেক জলবিন্দুতে যেমন রসসঞ্চার বিদ্যমান, তেমনি প্রতি সৃষ্টির প্রতি পরমাণুতেই আবার সৃষ্টি বিরাজমান। জলপরমাণুর অভ্যন্তরে যেমন রসস্থিতি, তেমনি চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়বে কত যে সৃষ্টি নিহিত, কে তাহার সংখ্যা করিতে সক্ষম? ব্রহ্ম ও সৃষ্টি এই দুইটী মাত্র শব্দভেদ; নতুবা পরব্রহ্ম ও সৃষ্টিতে অর্থতঃ কোন ভেদই নাই। এই জগতের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের অস্তোদয় কিছুমাত্র নাই; ঘটপটাদির প্রকাশক হইলেও সৌর কিরণ যেমন তৎপ্রকাশের প্রকৃত কর্ত্তা নহে, তেমনি সেই চিৎ অখণ্ড জ্ঞেয়ভাবের সৃষ্টি করিলেও তাহার কর্ত্তা নহেন। যখন তত্ত্বজ্ঞানবৈভবে নিখিল ভাবের বাধঘটনায় স্বয়ং পরব্রহ্ম দেহাদির প্রতি তাদাত্ম্যাধ্যাস হইতে পরিমুক্ত হন, তখন তাঁহার যে নির্ম্মলস্বরূপে অবশেষ, তাহাই সমাধান বা নির্ব্বাণ নামে নিরূপিত হয়। উক্ত অবশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ পরম-পুরুষার্থ হয় কিরূপে? অনুভূয়মান বস্তুই পুরুষার্থ; যাহার অনুভব হইবার

নহে, তাহাকে পুরুষার্থ বলা কিরূপ কথা ? এরূপ বলিলে বলা যায়, যাহাকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া বুঝিয়াছি, পরম সাক্ষাৎকারবৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা সেই বোধ বুদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যাহা সাক্ষাৎকারবৃত্তি, তাহা জড়; জড়ের তো বোধশক্তি নাই। অপিচ বোধ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হওয়া অসম্ভব। বন্দিগণকর্ত্তৃক নিদ্রিত ভূপতির প্রবোধনের ন্যায় ঐ বোধ পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ করে না কেন ? এ কথায় বলা যায়—বোধের বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে সেই পরমাত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবে কিরূপে ? আমরা যাহাকে পরম পুরুষার্থ পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তিনি তো স্বয়ং বোধস্বরূপ; বোধের কর্ম্ম হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবে না। কেন না, তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকারমূর্ত্তি; তিনি আপনিই বোধস্বরূপ; অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া সুপ্তবৎ তিনি থাকিলেও ঐ অবিদ্যার যখন প্রক্ষালন হইয়া যায়, তখন প্রবুদ্ধ হইয়া মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডা-তপবৎ স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার যে সেই নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপের অভিব্যক্তি, তাহাই পরম পুরুষার্থ। তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মফলের প্রতি যাঁহাদের বিতৃষ্ণা হইয়াছে, যাঁহারা ইচ্ছাশূন্য হইয়াছেন, নির্ব্বাণ তাঁহাদের আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ধ্যানমগ্ন-অবস্থায় কেবলীভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন বিষয়েই আগ্রহ থাকে না; অথবা তিনি কোন বিষয়েই অবজ্ঞা বা অবহেলা করেন না। তিনি মনের ক্রিয়া সম্পাদন করিলেও বাহ্য বিষয়ে তাঁহার আসক্তি থাকে না বলিয়া যেন তাঁহার মন ক্রিয়া-বিরহিত; অতএবই দীপবৎ প্রকাশ হইলেও তিনি প্রকাশক্রিয়া-বর্জ্জিত। তাঁহার যে অব-স্থাতেই অবস্থিতি হউক, সর্ব্বদাই সেই একভাব। তিনি ব্যুত্থানদশায় বিশ্বরূপ হন এবং সমাধি-অবস্থায় পরব্রহ্মরূপ হইয়া অবস্থান করেন। সৃষ্টিরূপেই কি, আর অসৃষ্টিরূপেই কি, যেরূপে তিনি থাকুন না কেন, তাঁহার যে সত্য-চিৎস্বরূপতা, তাহাই সর্ব্বত্র সমুদ্দীপিত আছে। এই সংসারবন্ধন হইতে কাহার মুক্তি ঘটিয়া থাকে ? যিনি সমাধিভঙ্গেও সমাধি-সমাকৃষ্ট হইয়া একাদ্বয় সত্যজ্ঞানস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সমাধি ও ব্যুত্থানকে একীভাবে দেখেন, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত তিনিই হইয়া থাকেন। এক-মাত্র শূন্যতা ভিন্ন আকাশের যেমন সত্তান্তর নাই, তেমনি একমাত্র জ্ঞান-

পরিনিষ্ঠা ব্যতীত এই জাগতিক যাবতীয় পদার্থেরও অপর কোন সত্তাই নাই। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, কেবলমাত্র অনন্তবোধ-রূপতাই তাঁহাদের প্রকাশমান। সেই বোধরূপতাও পূর্ণস্বভাবে পরিণত হয়—হইয়া অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে। তাদৃশ বোধরূপে বিশ্রান্ত হওয়ায় কেবল মাত্র পরম সত্তারই অবশেষ হয়, অথবা সে সত্তাও থাকিবার নয়। যাঁহাদের পূর্ণ শান্তিলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের সত্তা অবিনশ্বরগোচর। যাহা 'তত্ত্বমসি' বাক্যের শোধিত 'তৎ'পদার্থ, তাহাই বোধের সত্তা। 'আছে' 'প্রকাশ পাইতেছে' এইরূপে সত্তানুভব সকলেরই হইতেছে। সুতরাং সেই অনুভবও সত্তাবোধ-কর। সর্ব্বপরিশোধিত হইয়া থাকিতে একমাত্র সেই অব্যয় শান্ত ব্রহ্মই থাকিতেছেন। স্বচ্ছ শীত বোধরূপ নির্ব্বাণ লাভ-লালসায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি মহেশ্বরও সর্ব্বদা উক্ত সত্তারই স্পৃহা করিয়া থাকেন। তদিতর অন্যান্য ব্যক্তির কথা আর কি বলিব? সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যই সর্ব্বদা সকলের স্পৃহণীয়; তিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-পদার্থ-রূপে সমুদিত হইয়া সর্ব্ব-সময়ের জন্য দেদীপ্যমান। ঐ চৈতন্যের নাশ ক্ষণেকের তরেও নাই। সংসার অতি উত্তপ্ত, নির্ব্বাণ অতি শীত; অধুনা মৎসমীপে যাহা অতি শীত, তাহাই বিদ্যমান; যাহা অতি তপ্ত, তাহার আর অস্তিত্ব নাই। অখোদিত শিলাভ্যন্তরে শালভঞ্জিকা যেমন যথেচ্ছভাবে পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি অপরিচ্ছিন্ন ও অখণ্ডভাবে অবস্থিত হইয়াই ব্রহ্ম এই জগদাকারে বিভাসিত হইতেছেন। নিবাত-নিষ্কম্প জলপ্রবাহ যেমন পবনযোগে তরঙ্গভঙ্গাকারে স্ফুরিত হয়, পঞ্চকোষস্থ মহাচৈতন্য তেমনি আপনা হইতেই চেত্যাকারে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। এই জীবনিবহ পরমার্থ সদ্বস্তুর কৃত্রিম বেশধারী, পরিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত; ইহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাই জড়প্রায়। এই অসংখ্যেয় জীবপ্রবাহ নিজ আত্মাকে যেরূপ ভাবে ভাবনা করে, আত্মাও তাহাদের ভোগ বা মোক্ষপ্রযত্নে সেইরূপ ভাবেই চিরদিনের তরে প্রকাশমান হন। স্বপ্নে বন্ধুর মৃত্যু দৃষ্ট হইলে তাহার সত্যতা ভাবনায় যেমন শোকোদয় হয়, পরন্তু জাগিয়া উঠিলে মিথ্যা-জ্ঞানে আর শোকসঞ্চার হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দৃশ্য বিষয়ে অসত্যতা বুদ্ধি হইলে, সে জন্য আর শোক-হর্ষাদি কিছুই ঘটে না। এই দৃশ্যমান

নিখিল দৃশ্যই শান্ত, শিব; অন্তরে যখন এইরূপ ভাবনার উদয় হয়, তখন ভ্রান্তি কিসের? জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নের দেখা বস্তুর প্রতি যেমন আর আস্থা থাকে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান যখন লব্ধ হয়, তখন আর এই ভৌতিক দেহভোগ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহাতিশয্য থাকিবার নহে; প্রত্যুত তৎপ্রতি বিতৃষ্ণাই আসিয়া পড়ে। বিতৃষ্ণা আসিলে বোধবৃদ্ধি হয়, আবার বোধ-বৃদ্ধি হইলে বিতৃষ্ণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বোধ আর যে বিতৃষ্ণা, এ দুইটী ভিত্তি ও দীপপ্রভাবৎ পরস্পরের সহায়তায় প্রকাশমান হয়। বলা বাহুল্য, বোধটা যে যে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি হইবে। দেখ, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি বোধ বাড়াইলে ঐ রূপ আসক্তিই বাড়িবে; আবার বিতৃষ্ণার প্রতি আগ্রহবুদ্ধি বাড়াও, তাহাই বাড়িবে; অন্যদিকে জড় পদার্থের প্রতি আগ্রহ বাড়াইলে, তাহাই বাড়িয়া উঠিবে। এইজন্য বুঝিতে হইবে, যাহাতে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি না জন্মে, তাহাই যথার্থ বোধ। সাংসারিক ব্যাপারে যদীয় বিতৃষ্ণার উদয় হয় নাই, তাহার পাণ্ডিত্যও মূর্খতামধ্যে গণ্য। বিতৃষ্ণা ও বোধ এই দুইটা বস্তু পরস্পর যদি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তবে তাহা যে চিত্রিত অসত্য অনলবৎ কার্য্যক্ষম হইবে না, এরূপ মনে করা উচিত নহে। কেন না, বোধ ও বিতৃষ্ণা যদি চরম সীমায় উপনীত হয়, তবে তাহাই মোক্ষ-আখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে। যদি সেই বোধ ও বিতৃষ্ণার চরমসীমারূপ অনন্ত পরমপদে অবস্থান করিতে পারা যায়, তবে আর শোক করিতে হয় না। আমি এখন যেখানে যাইবার যাইয়াছি, যাহা করিবার, করিয়াছি, যাহা দেখিবার, দেখিয়াছি, যাহা সেই শান্ত শিব অনাময় ব্রহ্মপদ, আমি সেই পদেই রহিয়াছি। অধুনা আমি তৃষ্ণাবিরহিত অহঙ্কার-বর্জ্জিত আত্মারাম হইয়াছি। আমার স্থিতি অধুনা সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বর্জ্জিতা, ও আকাশবৎ সুনির্ম্মলা। সিংহ যেমন লৌহপিঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, তেমনি সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দুই একজন লোকমাত্র বাসনার বিষম জাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে। বাসনার জাল ছেদন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিয়া অন্তরে প্রকাশময় হইলে শারদ শিশির-বিন্দুবৎ সত্বরই উপশান্ত হওয়া যায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞাতব্য বিজ্ঞাত হইয়াছেন,

বাসনারে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং সর্ব্ব সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সঙ্কল্পাতীতমনে বায়ুবৎ ব্যবহারদর্শী হইয়া থাকিতেও পারেন, নাও পারেন। নিখিল বস্তুকে একমাত্র পরমতত্ত্বজ্ঞানে তদ্‌ব্যতিরিক্ত সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র-নিশ্চয়ে আকাশের ন্যায় যে অবস্থিতি, তাহাই বাসনাবর্জ্জিত অবস্থিতি বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট। অন্তঃকরণ যাঁহার বিশুদ্ধ হইয়াছে, বাসনা-বর্জ্জিত ভাবের উদয় হইয়াছে, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্ম। এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তথাবিধ স্থির নির্ব্বাণমতি পুরুষেরই অনন্ত-মোক্ষ-নামক শান্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে।

চতুর্নবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিক শততম সর্গ।

—•:•—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! অদ্য তোমার সমীচীনরূপ প্রবোধোদয় হইয়াছে। এখন তুমি এমন ভাবে উপদেশদানে শিক্ষিত হইয়াছ যে, সে উপদেশ শ্রবণে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিরও প্রবোধ জন্মে, পাপক্ষালন হয়। আর প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণের কথা কি বলিব? তাঁহারা ইহা শুনিয়া পরমানন্দপ্রবাহেই মগ্ন হন। তুমি সত্যই বুঝিয়াছ, এ জগৎ অসৎই; যদি সঙ্কল্পনাশ হয়, তবেই ইহার শান্তি হইয়া থাকে। এই শান্তির নামই নির্ব্বাণ; এই নির্ব্বাণই পরমার্থনামে নিরূপিত। স্পন্দ আর অস্পন্দ এই দুইটী যেমন পবনের রূপ, তেমনি কল্পনা আর অকল্পনা এই উভয় ব্রহ্মেরই রূপ; অর্থাৎ বন্ধ এবং মোক্ষ এই দুইটা বস্তু যথাক্রমে অপ্রবুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ব্রহ্মেরই রূপান্তর। ঐ দুই রূপ অন্যের নহে; উহাতে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবও কিছুই নাই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহারই কি, আর সমাধিই কি, উভয় দশাতেই যে পাষাণবৎ নিশ্চলাবস্থান, তাহাই সুবিমল মুক্তিনামে নিরূপিত। হে রঘুনাথ! এই পাপঘ্ন পরম পদে আমরা অবস্থানপূর্ব্বক কি সমাধি, কি ব্যবহার, উভয় অবস্থাতেই একই-

ভাবে অবস্থান করিতেছি। হরি-হর-বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণও ব্যবহার-দশায় থাকেন,—থাকিয়াও সতত প্রবুদ্ধ ও শান্তভাবে এই পরম পদেই বিরাজ করিতেছেন।

রামচন্দ্র! তুমি পাষাণোদরবৎ নিশ্চল নিস্পন্দভাবে অবস্থিত ও প্রবোধপ্রাপ্ত হইয়া এই অস্মদাদি-গম্য অনাময় পদ অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—আমি বুঝিতে পারিয়াছি, যেরূপে পরব্রহ্মে এ জগৎ প্রতিভাত, সেরূপ অসৎ, অনুৎপন্ন, অনারম্ভ ও নিরাকার; ফলে পরব্রহ্ম হইতে এ জগৎ অভিন্নাকারেই অবস্থিত। যেমন মরীচিকার জল, তরঙ্গাকার-পর্য্যবসিত সলিল, সুবর্ণে কটকাদি এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট বা সঙ্কল্প-কল্পিত শৈলাদি, তেমনি আমার নিকট ইহা প্রতীয়মান।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সত্যই যদি তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া থাক, তবে এক্ষণে আমিই তোমার নিকট সংশয়নিরাসার্থ জিজ্ঞাসিতেছি; তুমি আমার সংশয় খণ্ডন কর। এইরূপ করিলে তোমারও বোধ উপচিত হইবে। এই যে জগদাখ্য আভাস, ইহা সর্ব্বোপরি দেদীপ্যমান; সর্ব্বদা সকলেরই ইহা অনুভূত হইতেছে। সুতরাং ইহা যে নাই, এরূপ বলা যায় কিরূপে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—যখন ইহা পূর্ব্ব হইতেই কদাচ উৎপন্ন নহে, তখন এ জগৎ তো বন্ধ্যানন্দনবৎ একান্ত পক্ষেই অলীক বস্তু। ইহার সত্তা খুঁজিতে গিয়া একমাত্র কল্পনা বা ভ্রম বৈ তো আর কিছুই পাওয়া যায় না। যাহা হইতে এই জগদ্‌ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে, এমন কারণই বা ইহার কি হইবে? অন্তদিকে কারণ বিনাও তো কার্য্যোৎপত্তি কুত্রাপি সম্ভবে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার অজর, তিনি ইহার কারণ হইতে পারেন না; সুতরাং এ জগতের তো বাস্তবিক কারণ কিছুই নাই। বলিতে পারেন, নির্ব্বিকার ব্রহ্মই এতৎপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপে বিরাজিত হইয়া মায়ার বশে জগদাকারে বিবর্ত্তমান হন। এরূপ বলিলে তো জগৎশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি থাকে না। জগৎশব্দার্থ তা'হলে মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। এক যে সেই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং সেই অনাখ্য পরম পদে

প্রথমোদ্ভাবিত হিরণ্যগর্ভ-নামধেয় আংশিক চৈতন্য ক্ষণ অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধ কাল বিবর্ত্তরূপে অবস্থিত হইয়া যেন আতিবাহিক-দেহেই অবস্থান করেন; সেই নিমিত্ত তিনিই জগদ্ভ্রমের কারণ হইয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় আপনি ক্ষণকালকে বৎসর জ্ঞান করেন, এইরূপ তিনিও ক্ষণকে বৎসর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কাকতালীয়-ন্যায়ানুসারে তাহাতেও তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যাদি দর্শন হইয়া থাকে। সেই সঙ্কল্পস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ-সবিধে আকাশেই দেশ-কালক্রিয়া-সম্পন্ন জগৎ আপনাপনি প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই ভাবে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইলে সেই মিথ্যাভূত পুরুষ মিথ্যাময় সংসারসৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে করিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকেন। তিনি স্বকল্পিত জগতের অন্তরালে ব্যষ্টিভূত জীবাকারে পাপের ফলে কদাচিৎ ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে গমন করেন; কখন বা পুণ্যের প্রকর্ষে অধো-দেশ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকেন। এই ভাবে তিনি অনন্ত পদ-পদার্থ-ভ্রান্তিরূপ কল্পনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার যে ঐ সঙ্কল্প, উহা কাকতালীয়-ন্যায়ে পূর্ব্বেও যেরূপ হইয়াছিল, পরেও সেইরূপই অবিকল হইতেছে। ফল কথা, এ জগৎ মিথ্যা, পাষাণ-রমণী স্বীয় স্বামী বন্ধ্যানন্দনের দুঃখে আকাশে চুন লেপিয়া দিতেছে, ইত্যাদি বাক্যপ্রবন্ধের অর্থ যেমন মিথ্যা, এই জগতের মিথ্যাত্বও সেইরূপই। বলিতে পারেন, এ জগৎ তো সত্যই, ইহার মিথ্যাত্ব হইবে কোথা হইতে? এ কথায় বলা যায়, এ জগৎ না সত্য, না মিথ্যা, পরন্তু অনন্ত অজ ব্রহ্ম। আরও কথা, এ জগৎ আকাশকোষবৎ স্বচ্ছ এবং পাষাণোদরবৎ ঘন, নিশ্চল, শান্ত ও অক্ষয় ব্রহ্মই। চিদাত্মার মায়া হইতে সমুৎপন্ন সঙ্কল্পরূপ বিরাট আতিবাহিক দেহে যে সম্বিদাকাশ, তাহাই জগদাকারে প্রতিভানপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহা কিছু প্রতিভাসমান হইতেছে, সকলই সেই ব্রহ্ম মহাকাশ; জগতের কথামাত্রও কুত্রাপি নাই, সকলই সম, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, একাদ্বয় ব্রহ্ম। জলে তরঙ্গস্তোমের উৎক্ষেপণ বা সঙ্কলন যাহাই হউক, তাহাতে যেমন জলের ভাবান্তর কিছুই হয় না, তেমনি এই ভাবাভাবাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চের আবির্ভাবে বা তিরোভাবে পরব্রহ্মের ভাবান্তর কিছুই ঘটে না। জলে যেমন জলবিন্দু মিশিয়া যায়, তেমনি কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ ঐ বিশুদ্ধ

পরম পদেই মিলিয়া থাকেন। এই জগৎ ও জীব পরব্রহ্মে অপরবৎ প্রতীত হইতেছে; বস্তুগত্যা ইহা সেই পরব্রহ্মেরই স্বভাব বৈ আর কিছুই নহে। শান্ত নির্ম্মল পরব্রহ্ম, তাঁহাতে এই জগৎ বা জগদ্‌ব্যবহার কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। স্বপ্নকে যদি স্বপ্ন, দৃশ্যকে যদি পরব্রহ্ম, আর মরীচিকাজলকে যদি সামান্য মরুস্থলী বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তবে কে আর তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি স্থাপন করিতে যায়? ব্রাহ্মণ যেমন মদ্যের আস্বাদ বিদিত নহেন, তেমনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তিও অশুচি-জন-ভোগ্য প্রপঞ্চের রসাস্বাদে অভিজ্ঞ নহেন। এইরূপ যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ, পরমার্থ ব্রহ্মানন্দ-রসের আস্বাদ যে কি, তাহা তাহার বিদিত নহে। এই স্বাত্মাকে বাহ্য বস্তু হইতে পরাবৃত্ত করত'চেত্যোন্মুখীভাব হইতে মুক্ত ও সমাহিত করিয়া চরম সাক্ষাৎকারবৃত্তিযোগে দেখিবে—ইনি নিত্যমুক্ত, এবং স্বয়ংই শান্ত-স্বভাবে অবস্থিত।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন অলক্ষিতভাবে বীজাভ্যন্তরে অঙ্কুরের অবস্থান, তেমনি ব্রহ্মরূপ কারণের অন্তরালে দৃশ্যপরম্পরাও অলক্ষ্যে বিরাজমান। পরে কালক্রমে তাহা প্রকাশমান হইয়া থাকে। এইভাবে সৃষ্টি-সত্তার উপপত্তি হয় না কেন?

রামচন্দ্র কহিলেন,—অঙ্কুরোদয়ের পূর্ব্বে বীজাভ্যন্তরে যে অঙ্কুরের স্থিতি, সে অঙ্কুর অঙ্কুরাকারে উপলব্ধিগোচর হয় না; বীজাভ্যন্তরের সত্তা তো বীজেই থাকিবে। এইরূপে পরব্রহ্মের অন্তরালে যদি জগদ্‌-ভাবেরও উপলব্ধি হয়, তথাচ তাহাকে জগৎসত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বলি তো, তাহাকে ব্রহ্মসত্তা বলিয়াই বর্ণন করিতে হয়। প্রলয়ে ব্রহ্মাভ্যন্তরে যদি সেই জগদ্ভাবের অঙ্গীকার হয়, তবে তো তাহাকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মমাত্র বৈ আর কি বলা যাইবে? কেন না, তৎকালে তাহা তো লক্ষ্যীভূত হইবার নহে। অপিচ যাহার বিকার বা আকার নাই, তাহা হইতে সবিকার সাকার পদার্থের আবির্ভাব তো আমরা কুত্রাপি দর্শন করি নাই এবং সেরূপ আবির্ভাবের কথা আমাদের শ্রুতও হয় নাই। পরমাণুর অন্তরালে সুমেরুস্থিতি যেমন একান্তই অসম্ভব, তেমনি সেই নিরাকার পদার্থের অভ্যন্তরে সাকার পদার্থের স্থিতিও তো কোনক্রমেই সম্ভবপর

নহে। পেটিকাভ্যন্তরে যেমন রত্নস্থিতি, তেমনি পরব্রহ্মের অভ্যন্তরে জগৎ বিদ্যমান। নিরাকার পদার্থ-মধ্যে একটা বৃহদাকার বস্তু আছে, ইহা তো উন্মত্ত-প্রলপিত। এই সাকার জগতের আধার সেই শান্ত পরম ব্রহ্ম, এ কথা বলা তো কোন প্রকারেই সমীচীন হয় না। সাকার বস্তু বিনশ্বর; কিন্তু সেই বস্তু অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে, ইহা কোথাও দেখিয়াছেন কি? অপূর্ব্ব স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান আকারবোধই ক্ষণেকের নিমিত্ত সাকার হইয়া থাকে, এইরূপ কল্পনার যৌক্তিকতা নাই। কেন না, স্বপ্নান্তরে জাগ্রদ্দশার অনুভব করিলে সংস্কারে যাহা পরিণত হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই যে স্বপ্ন, ইহা অপূর্ব্ব; ইহাতে অননুভূতপূর্ব্ব বিষয়ই অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নবৎ বোধকে সাকাররূপে যে বৌদ্ধদিগের কল্পনা, সে কল্পনাও সঙ্গত নহে। জাগ্রৎই স্বপ্ন, জাগ্রৎ-স্বপ্নের এইরূপ অভেদকল্পনাও অসমীচীন। কেন না, স্বপ্নে যে পুরুষ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, প্রভাতে তাহাকে দেখা যায় কেন? এতাবতা এই জাগ্রৎপ্রপঞ্চ জ্ঞানময় আত্মপদে স্বপ্ন হেন অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহা জ্ঞানময় আত্মায় স্বপ্নবৎ অবস্থিত। যিনি সেই নিরাকার পরমাত্মা, তিনিই এই বিবর্ত্তাকারে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই চরম নিষ্কর্ষ। সেই যিনি আত্মচৈতন্য, তিনিই স্বপ্নে পর্ব্বতাদিরূপে অবস্থান করেন। আমাদের যে এই আত্মা, ইনি নিখিল বন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্ম বস্তুই। আর এই জগৎপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, ইহা অজ্ঞানের বশে স্বপ্নবৎ সমুদ্ভাবিত। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া যদি স্বীয় ব্রহ্মভাব উপলব্ধি-গোচর করিতে পারা যায়, তবে আর এ প্রপঞ্চে অস্তিত্ব কিছুই অনুভূত হয় না। অনুভবের কর্ত্তৃত্বেও অনুভব কিছুই থাকিবার নহে। কেবল একমাত্র স্বানুভববেদ্য ব্রহ্মই পরিশিষ্ট থাকেন; তিনি অনির্ব্বচনীয়—স্বীয় সত্তামাত্রেই সমুদিত। তৎকালে অভাবরূপী ভাবপদার্থ আর ভাবরূপী অভাব পদার্থ সকলেই পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মে ব্রহ্মের এবং আকাশে আকাশের বৃদ্ধি হইতে পারে; পরন্তু ব্রহ্মাকাশে জগদাকারের বৃদ্ধি কোনরূপেই সমাচীন নহে। এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দৃষ্টিরূপী অহম্ভাব এবং সৃষ্টি প্রভৃতির বিস্তার শান্ত চিদাকাশে কোন প্রকারেই প্রাদু-

স্ফূর্তি হয় না। স্বীয় সঙ্কল্প-কল্পিত নগরের ও তদ্গত দেহভিত্তির মিথ্যাত্ববৎ এই জগতেরও মিথ্যাত্ব নিশ্চিত। তবে সত্য কি?—সত্য সেই একমাত্র অনাময় ব্রহ্মই। আমি অধুনা সেই স্বপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অধিগত হইয়াছি; উহা—পূর্ণা শান্ত, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, অজর, অজ, অবিনশ্বর, নিরুপাধি ও নিরাকার। আমিই সেই জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছি। কোন একটা শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া আমি যে ইহা কহিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই নহে; আমি ইহা স্পষ্টতই অনুভবপূর্ব্বক বলিতেছি। যাদৃশ অনুভবের স্ফুরণ অন্তরে হয়, তাহাই বাক্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। যে বীজ পৃথিবীগর্ভে নিলীন থাকে, তাহাই অঙ্কুরভাব ধারণ করে। অধুনা আমি শুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বয় আত্মা হইয়া রহিয়াছি; দ্বিত্ব বা একত্বভাব আমাতে একেবারেই নাই। দ্বৈতই কি, আর একত্বই কি, কোন কিছুর লেশমাত্রও আমার অনুভূতিগোচর হইতেছে না। এই সভাস্থ লোক সকল অজ্ঞানাবৃত হইলেও আমি ব্রহ্মজ্ঞানে ইহাঁদের সকলকেই মুক্ত দেখিতেছি, ইহাঁরা বাহ্য বিষয় হইতে বিরত ও শান্ত হইয়া সকলেই আকাশে আকাশ-ভাবের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। যেমন আকাশভিত্তিতে কৃত অপূর্ব্ব চিত্র, সঙ্কল্প-কল্পিত মনোরাজ্য, প্রস্তর হইতে সহসোৎকীর্ণ প্রতিমাদি, কথা-বর্ণিত বিষয়রাশি, ঐন্দ্রজালিকের ঘটনা সকল এবং যেমন স্বপ্নপরম্পরা, তেমনি ত্বগাদি ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আমার এক্ষণে বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, এ জগৎ সৃষ্টিকাল হইতেই ভিত্তিবিরহিত এবং স্বপ্নবৎ প্রতিভাত। অতএব এ জগতের আবার সত্যত্ব কি আছে? অজ্ঞ লোকেরাই এই জগৎকে সত্য সন্দর্শন করে; কিন্তু বিবেকী ইহাকে মিথ্যা বলিয়াই নিরূপণ করেন। যিনি সকলই দেখেন ব্রহ্মময়, তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্ম, আর যিনি মোক্ষভূমিকায় আরূঢ় হইয়া পরব্রহ্মে মিশিয়া শান্ত হন, তাঁহার নিকট সমস্তই শান্ত পরমাকাশরূপ প্রতীয়মান। কি তুমি, কি আমি, কি ঘট, কি পট, ইত্যাদিরূপে এই চরাচরাত্মক সমগ্র জগৎই তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে আকাশমাত্রই। আমিই কি, আপনিই কি, জগৎ কি, আর আকাশই বা কি, সকলই আকাশ—শুধুই আকাশ! এইরূপ জ্ঞান করত চিদাকাশ সহ একত্ব পাইয়া সকলেই আকাশস্বরূপ হও।

গুরুদেব! আপনি আকাশভাবে স্থিত, মানবশ্রেষ্ঠ; আমি আপনাকে আকাশস্বরূপ-জ্ঞান-পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম সহ অভেদ জ্ঞানে নমস্কার করিতেছি। এই জগৎ চিৎস্বরূপ হইতেই সমুদিত এবং পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এই অস্তোদয়ের কারণ কিছুই নাই। সুতরাং ইহা সর্ব্বদাই সেই সুবিমল পরমাকাশ। আপনি এক সর্ব্বপদের অতীত সমস্ত শাস্ত্রযুক্তির পারবর্ত্তী নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া আকাশময় হইয়াছেন। আমি, বা আমার করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা ঘট-পটাদি অন্যান্য বস্তুপরম্পরা কিছুরই অস্তিত্ব নাই। সকলই আকাশ—সকলই সুনির্ম্মল চৈতন্যাকাশ! আমি ভবৎসমীপে এই যে বাহ্য বস্তুবিলোপের বর্ণন করিলাম, তার্কিক-দিগের মতে ইহা তর্কদুষ্ট হইতে পারে; তা হউক; তাহাতে আমার ক্ষোভ কিছুই নাই, তবে যাঁহারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার এ কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন। বাহ্য বস্তু-পরম্পরার অপহ্নবপূর্ব্বক কাষ্ঠবৎ নিশ্চলীভাব লাভ—তর্ক করিয়া করা যায় না; তর্কে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি কখনই ঘটে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের যিনি গোচর নহেন, যাঁহার কোন প্রকার উপাধি নিদর্শন নাই, যিনি একমাত্র স্বীয় অনুভব দ্বারা উপলভ্য, সেই ব্রহ্মকে কি কখন তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়? পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, একমাত্র চিদাত্মক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রার্থের অতীত, নিশ্চিহ্ন, নির্ম্মল, নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত, অজ ও বিশুদ্ধ। তদীয় অস্তিত্ব পক্ষে স্বীয় অনুভূতিই প্রমাণ; এই সংসাররূপের অস্তিত্ব তাঁহাতে সম্ভাবনা করা সর্ব্বথা অবৈধ।

পঞ্চনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ষণ্ণবত্যধিক শততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—মতিমন্ ভরদ্বাজ! অম্বুজাক্ষ রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া মুহূর্ত্তমাত্র পরম পদে বিশ্রাম লইলেন এবং তাদৃশ বিশ্রামে পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তথাচ শ্রবণ-

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসিলেন,—প্রভো! আপনি সংশয়রূপ বারিধরের শরৎকাল-স্বরূপ। ফল কথা, শরৎকালে যেমন মেঘ তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি আপনার নিকট প্রশ্ন করিলেও কোন সংশয় থাকে না। আমার মনে আর একটা সংশয় আছে, আপনি তাহা খণ্ডন করিয়া দিন। উল্লিখিত মহাজ্ঞান এইরূপে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। নিখিল বাক্যপ্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া ঐ মহাজ্ঞান অবস্থিত। হে মানদ! সেই স্বানুভব-বেদ্য পরব্রহ্ম মহৎদিগেরও বাক্যাতীত। এইরূপ হইলে যিনি নিখিল সঙ্কল্প-বিরহিত, স্বসম্বিৎস্বরূপ ও ত্রিবিধ অবস্থার অতিবর্ত্তী, গুরূপদেশ বা শাস্ত্রানুশীলন ভিন্ন যাঁহাকে পাওয়া যায় না, এবং যিনি স্বপ্রকাশ বস্তু, সেই পরব্রহ্মকে—প্রতিযোগী ব্যবচ্ছেদ ও সংখ্যাভেদের অনুসন্ধায়ক ব্যক্তিবর্গের তুচ্ছ শাস্ত্রচর্চ্চায় কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আমার অবশ্য এইরূপই বিশ্বাস যে, কল্পনামাত্র-সার শব্দাড়ম্বরময় শাস্ত্র দ্বারা পরম জ্ঞান কিছুতেই লাভ করা যায় না। সুতরাং বৃথা গুরূপদেশ ও শাস্ত্র শ্রবণাদির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন থাকে তো আমার নিকট নিশ্চয় করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তোমার কথাই সত্য; জ্ঞানের জন্য শাস্ত্র-সেবার প্রয়োজন নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, শাস্ত্র বহুল শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ; যিনি পরম জ্ঞান—পরব্রহ্ম, তাঁহাতে শব্দাড়ম্বরের নামমাত্রও নাই। তাঁহার না আছে নাম, না আছে রূপ, কিছুই নাই। এইরূপ হইলেও যেরূপে ঐ শাস্ত্র ও গুরুবচনাদি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইয়া উঠে, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! এক স্থানে কতকগুলি কীরকজাতি বাস করিত। তাহারা বড় দরিদ্র; গ্রীষ্মের প্রভাবে বৃক্ষ যেমন জীর্ণ হয়, দারিদ্র্যের বিষম তাড়নায় তাহারাও তেমনি জীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা এত দরিদ্র যে, এক একখানি ছিন্ন জীর্ণ কন্থাই মাত্র তাহাদের সম্বল। তাপ-শুষ্ক সরোবরে কমলকুল যেমন ম্লান ও শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি তাহাদেরও বদনরাজি ম্লান হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া এক সময় তাহারা জীবিকা-

নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, ভাবিল—কি উপায়ে এক্ষণে আমরা আমাদের জঠরজ্বালা নিবারণ করি! এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে তাহারা স্থির করিল,—আমরা প্রত্যহ বনে যাইব; সেখান হইতে কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনিব; পরে তাহা বিক্রয় করিয়া স্ব স্ব উদর পূরণের উপায় করিয়া লইব। এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহারা কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনে গেল। বস্তুতঃ বিপদে যে কোন উপায়ে জীবিকার্জ্জনই শ্রেয়স্কর।

ক্রমে কীরকেরা কাননে গেল; সেখান হইতে কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তাহারা যে বনে কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ গমন করিত, তথায় গুপ্ত অগুপ্ত বহু স্বর্ণ-রত্নাদিও থাকিত। ভারবাহী-দিগের মধ্যে কাহার কাহার ভাগ্যে সেরূপ রত্ন প্রায়শঃ মিলিত। কোন কোন হতভাগ্যকে মাত্র কাষ্ঠরাশিই কুড়াইয়া আনিতে হইত। ঐ কীরক-দিগের মধ্যে কেহ চন্দন কাষ্ঠ, কেহ পুষ্প এবং কেহ কেহ বা ফল বিক্রয় করিয়া জীবিকা যাপন করিত। কাষ্ঠসংগ্রহার্থ সকলেই তাহারা নিবিড় বনে যাইত; কিন্তু সৌভাগ্যগুণে কেহ কেহ তথায় এরূপ গুপ্ত রত্নাদি পাইল যে, অচিরেই তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান ঘটিল।

এই প্রকারে তাহারা প্রতিনিয়ত সেই মহাবনে যাতায়ত করিতে লাগিল। দৈবক্রমে এক দিন চিন্তামণি নামক মহামণি তাহাদের হস্তগত হইল। সেই চিন্তামণি লাভে তাহারা অপার ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া মহাসুখে বাস করিতে লাগিল। কীরকেরা কাষ্ঠসংগ্রহার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন সর্ব্বাভীষ্টপূরক চিন্তামণি পাইল। তাহাতে স্বর্গীয় দেবগণের ন্যায় তাহারা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। দেখ একবার, সামান্য কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে গিয়া তাহাদের হঠাৎ কিরূপ সৌভাগ্যোদয় হইল। তৎকালে তাহাদের ভয়, মোহ, বিপদ, দুঃখ সমস্তই দূরীভূত হইল। তাহাদের পরমানন্দ আসিল। তাহারা সর্ব্বত্র সমত্ব লাভ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

ষণ্ণবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মানদ, মুনীন্দ্র! আপনি এই যে কাষ্ঠ-ভারবাহী কীরকজাতির কথা কহিলেন, আমি তো উহা কিছুই বুঝিলাম না; দয়া করিয়া উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করুন। আমি তা'হলে ঐ উপাখ্যানের বিষয় বুঝিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মদ্বর্ণিত ঐ ভারবাহী কীরকেরা এই পৃথিবীস্থ মানবজাতি। কীরকদিগের যে দারিদ্র-দুঃখের বর্ণন করিয়াছি, তাহা ঐ মানবজাতির অজ্ঞানজন্য সংসারতাপ। আর যে সেই বর্ণিত মহাবন, তাহা গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চাদি। সেই যে বলিয়াছি, কীরকজাতি জীবিকানির্ব্বাহার্থ চেষ্টান্বিত হইল, তাহার অর্থ এই যে, আমার ভোগ সকল সিদ্ধ হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া মানব অপর কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়াই বৈধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল এবং ভোগ-বাসনার চরিতার্থতা সাধনের জন্য শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্র-সঙ্গত বৈধ কর্ম্মে নিরত হইয়া অবশেষে পরম পদ লাভ করিল। শাস্ত্রালোচনা করিয়া আর বিশেষ কি ফলোদয় হইবে, অথবা একবার তাহা করিয়াই দেখি না? এই প্রকার সন্দেহের বশে অনেকে কৌতুহল-সহকারে শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়; পরে ঐরূপ কার্য্যের বশে সহসা এক দিন উত্তম ফল লাভ করিয়া বসে। মানুষ পরতত্ত্ব খুঁজিয়া পায় না; তাই সন্দেহক্রমে শেষে শাস্ত্রালোচিত কর্ম্মে অর্থলোভার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরে সেই পরতত্ত্ব তাহার লব্ধ হয়। মূঢ় মানবসকল বাসনার বশে কর্ম্মে নিরত হয়; কিন্তু পরে ভারবাহীদিগের চিন্তামণিলাভের ন্যায় তাহারা হয় তো পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া বসে। যিনি নিসর্গতঃ পরোপকারে প্রবৃত্ত হন, তিনি প্রকৃত পক্ষেই সাধু ব্যক্তি; সে পক্ষে তাহার সাধু ব্যবহারই প্রমাণ। তথাবিধ সাধু ব্যবহারক্রমে লৌকিক ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রালোচনায় নিরত হন—হইয়া শাস্ত্রীয় প্রকৃত অভিপ্রেত বিষয় অধিগত হইয়া থাকেন। যে মানব তত্ত্ব জানে না, তাহার শাস্ত্রোক্ত ফলে সন্দেহ হইলেও সে, ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বুঝা যায়, কাষ্ঠভারবাহী

ব্যক্তি যেমন কেবল কাষ্ঠাহরণার্থ বনে গিয়া চিন্তামণি প্রাপ্ত হইল, তেমনি ভোগের আশায় শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্ট হইয়া মানব ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করে। বনে কাষ্ঠাহরণার্থ গমন করিয়া কেহ যেমন চন্দনকাষ্ঠ পাইল, কেহ সাধারণ রত্ন লাভ করিল এবং কেহ বা চিন্তামণি প্রাপ্ত হইল, তেমনি শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে গিয়া কেহ কাম, কেহ অর্থ, কেহ ত্রিবর্গ, কেহ মোক্ষ এবং কেহ বা সম্পূর্ণ চতুর্ব্বর্গ ফল অধিগত হয়।

হে রঘুনন্দন! সর্ব্বশাস্ত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উল্লেখ স্পষ্টভাবে রহিয়াছে; কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রাপ্তির বিষয় অধ্যাত্মশাস্ত্রেও বিশদরূপে বর্ণিত নাই। কারণ এই যে, ব্রহ্ম-বস্তু অনির্ব্বচনীয়; পদ ও বাক্যের মুখ্য বৃত্তি দ্বারা সেই ব্রহ্মবিষয়ক উল্লেখ একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। যেমন ফল-কুসুমাদির উদ্গমে বসন্তাদি ঋতুসমূহের আবির্ভাব প্রকটিত হয়, তেমনি শাস্ত্রীয় নিখিল বাক্যার্থ দ্বারা সংসূচিত পরব্রহ্ম কেবল স্বীয় অনুভব দ্বারাই অবগম্য হইয়া থাকেন। যেমন রমণীরত্নের লাবণ্য—মণি,মুকুর ও সুধাংশু প্রভৃতি রম্য দ্রব্য সকল হইতেও স্বচ্ছ, তেমনি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত দৃশ্য বস্তু হইতে পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত। শাস্ত্রেই কি, গুরূপদেশেই কি, দানেই কি, আর ঈশ্বরার্চ্চনাতেই কি, এই সর্ব্বপদাতীত ব্রহ্মজ্ঞান কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হে রঘুবংশাবতংস! শ্রবণ কর; ঐ শাস্ত্রাদি যদিও পরমাত্ম বিশ্রান্তি-লাভের প্রতি কারণ নহে, তথাচ উহাই তৎপ্রতি কারণ হইয়া উঠিতেছে। কিরূপে হইতেছে? বলিতেছি। দেখ, শাস্ত্রালোচনার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে পবিত্র পরম পদ দর্শন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঘটিয়া থাকে। অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে অবিদ্যার সাত্ত্বিক অংশের পরিপুষ্টি হয়। শাস্ত্র-সলিলে মল-ক্ষালনপূর্ব্বক অচিন্তনীয় শাস্ত্রপ্রভাবে পুরুষ পরম শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সাগরের সন্নিধিগোচর হইলে সাগরবারির স্বচ্ছতা নিবন্ধন সাগরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদীয় স্বচ্ছপ্রকাশতা হেতু সূর্য্যে এক সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশাল প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনি মুমুক্ষু ও শাস্ত্র এতদুভয়ের যখন পরস্পর

সম্বন্ধ ঘটে, তখনই সর্ব্ব জ্ঞানপদাতীত স্বসম্বেদ্য আত্মজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া থাকে। সূর্য্য ও সমুদ্র এই দুইটী পদার্থ দেখিলে স্বতই যেমন মনে হয়,উহারা পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধধর্ম্মী; উহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও কোনই সাধর্ম্ম্য নাই, তেমনি শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে স্বভাবতই এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণ-রূপেই স্বতন্ত্র; আত্মসহ দেহের সম্বন্ধ কিছুমাত্রই নাই। বালক লোষ্টে লোষ্টে ঘর্ষণ করে, করিয়া তাহা জলে ধৌত করিতে গিয়া লোষ্ট-ক্ষয়-সাধনান্তে কেবল হস্তেরই নৈর্ম্মল্য বিধান করে। এই দৃষ্টান্তে বলা যায়, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় বিবেকবশতঃ আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে শাস্ত্রীয় বিকল্পে বিকল্পজাল ক্ষালনপুরঃসর পরমা শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন নিজানুভব দ্বারা ইক্ষুরস হইতে মধুরাস্বাদ উপলব্ধ হয়, তেমনি সেই শাস্ত্রাদির সাহায্য লইয়াই 'তত্ত্বমসি'ইত্যাদি মহাবাক্যের তাৎ-পর্য্যরস-স্বরূপ আত্মজ্ঞান স্বীয় অনুভূতি দ্বারাই উপলভ্যমান হইতে থাকে। দীপপ্রভা ও ভিত্তির সংযোগ-সম্বন্ধবশে আলোকানুভূতির ন্যায় শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞানের সন্নিকর্ষেই আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র দ্বারা কামাদি ত্রিবর্গ সিদ্ধি হয়, তাহাকে অবশ্য মোক্ষের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়ের যাহা উপদেশ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নিজে নিজে শাস্ত্রচর্চ্চা করা উহার নিকট কিছুই নহে। যাহার আলোচনায় পরম জ্ঞান লব্ধ হয়, সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র; যে পরম জ্ঞানের ফলে সমতা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত পরম জ্ঞান; আর যে সমতার গুণে জাগ্রদ-বস্থাতেও সুষুপ্ত-জাগ্রৎ অবস্থান ঘটে, তাহাই যথার্থ সমতা। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ শাস্ত্রাদি হইতে করা যাইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বথা শাস্ত্রাদি অভ্যাস কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র! যিনি সর্ব্বজনের ঈশ্বর; যাঁহার আদি অন্ত নাই; যিনি পরমোত্তম সুখস্বরূপ; সেই ব্রহ্মকে উল্লিখিত রূপ শাস্ত্রানুশীলন, গুরূপ-দেশ, সাধুসঙ্গ, নিয়ম ও শম দ্বারাই লাভ করা যায়।

সপ্তনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯৭॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! শ্রবণ, কর, তোমার বোধ সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত আরও কিঞ্চিৎ কহিতেছি। যাহা কহিব, ইতিপূর্ব্বে যদিও তাহা বহুবার বলিয়াছি, তথাচ তোমাকে উহা বিশেষরূপে বুঝাইব বলিয়াই আবার বলিতেছি। তোমার নিকট ইতিপূর্ব্বে আমি স্থিতিপ্রকরণ বর্ণন করিয়া আসিয়াছি; তাহাতে এই উদ্ভূত জগৎ ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থিতির পর উপশম প্রকরণ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে বলা আছে—এ জগতে উৎপন্ন হইয়া পরমশান্ত হইবে। এ পক্ষে যুক্তিও যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। এ কথা বিশেষ করিয়াই বলা আছে যে, পরম উপশান্ত হইয়া বিজ্বরভাবে বিরাজ করিবে। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে সাংসারিক ব্যাপারে কি প্রকারে চলিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমার নিকট তোমার কিয়ন্মাত্র শ্রোতব্য আছে; এক্ষণে আমি তাহাই বলিব, তুমি শ্রবণ কর। প্রথমে এ জগতে জন্মগ্রহণ, পরে তোমার ন্যায় অল্প বয়সেই জাগতিক স্থিতি বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান, তদনন্তর সর্ব্বপ্রাণীর সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে প্রবৃত্তি ও সর্ব্বজনে আশ্বাস প্রদানে ইচ্ছা, এইরূপ সমত্ব সংশ্রয়েই সংসারে তত্ত্বজ্ঞানীকে চলিতে হয়। কেন না, সমতারূপিণী শুভলতিকার ফল বড় মধুর; বড় উপাদেয়। উহার পবিত্রতা অপূর্ব্ব; উহা সর্ব্বসম্পদের আকর ও সর্ব্ব সৌভাগ্যের বর্দ্ধক। যিনি সমতাগুণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতের হিতচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন ও নিজের কার্য্য করিয়া যান, এই সমগ্র জগৎই ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার বাধ্য হইয়া থাকে। সমতাগুণের প্রসাদে যে এক অবর্ণনীয় অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুবিশাল রাজ্যলাভেও তাদৃশ আনন্দ লাভ করা যায় না বা শত সুন্দরী কামিনী সম্ভোগেও সেরূপ আনন্দ উদ্ভূত হয় না।

রামচন্দ্র! জানিবে—দুঃখরাশি যেন আতপ; আর সমতাগুণ যেন তাহার মেঘস্বরূপ; উহাতে সর্ব্বদুঃখ নিরবশেষে শান্ত হইয়া যায় এবং উহা ক্রোধরূপ জ্বরের পরম ঔষধস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি সমতা-

সুধায় সংলিপ্ত, সর্ব্বশত্রুই তাহার মিত্র হয়। তিনি প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিতে পারেন; তাঁহার ন্যায় লোক এ জগতে প্রায়শই মিলে না। জনকাদি যে সকল মহাত্মা আছেন, তাঁহারা স্ব স্ব প্রবুদ্ধ চিত্ত-চন্দ্র-নিঃসৃত সুধানিষ্যন্দরূপ সমতার আস্বাদন করিতে করিতেই জীবিত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি সমতা-অভ্যাসে ব্যাপৃত, তাঁহার নিকট তদীয় নিজ দোষরাশিও গুণবৎ গণ্য হয়, দুঃখও সুখবৎ হয়, আর মরণও জীবনবৎ হইয়া থাকে। যে পুরুষ সমতারূপ সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছেন, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা প্রভৃতি কামিনীরা চিরানুরাগিণীর ন্যায় সেই মহাত্মাকে আসিয়া আলিঙ্গন করে। যিনি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই সর্ব্বদা সর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন। সম ব্যক্তি কোন চিন্তারই আস্পদ নহেন। তাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বসম্পদই আয়ত্ত হয়; কোন সম্পদই তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। যাঁহার সর্ব্ব কার্য্যেই সমত্ব, যিনি অপরাধী জনেও ক্ষমাশীল, তাদৃশ প্রকৃত কর্ম্মী ত্যাগী পুরুষকে সুর-নরগণ চিন্তামণির ন্যায় প্রার্থনা করেন। যাঁহার সদাচারনিষ্ঠা আছে, সর্ব্বজনে হিতৈষণা আছে, যিনি সর্ব্বত্র সমচিত্ত হইয়া সর্ব্বদাই আমোদে আছেন, তিনি অগ্নিতেও দগ্ধ হইবার নহেন, জলেও ক্লিন্ন হইবার নহেন; যেরূপে যাহা করিতে হয়, যিনি তাহা সেইরূপেই করেন;—যাহা করেন, তাহা হর্ষবিষাদাদি-বিরহিত হইয়া সমভাবেই দেখেন, তাঁহার তুলনা কোথায় আছে? যিনি শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান যথাযথভাবে করেন এবং পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকেন, শত্রুই কি, মিত্রই কি, রাজাই কি, ব্যবহারীই কি, আর মাহাজ্ঞানীই কি, সকলেরই তিনি বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা অনিষ্টভয়ে কুত্রাপি পলায়ন করেন না বা ইষ্টলালসায়ও তুষ্ট নহেন; নিজের যে কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই তাঁহারা নির্ব্বাহ করিয়া যান। যাঁহারা গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অক্লেশকর সমতাবলে লোভশূন্য সন্তোষগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ নিরাময় মহাত্মগণের নিকট সর্ব্ব জগৎই উপহাসাস্পদ; তিনি নিখিল জগদ্‌বাসীকেই সদুপদেশ দিয়া উজ্জীবিত করেন। সমচিত্ত ব্যক্তি যদি পরহিতৈষণার্থ নিজাননে কোপচিহ্নও ধারণ করেন, তথাচ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

সমতামৃধায় পরিলিপ্ত থাকে। সমদর্শী পুরুষ যাহা করেন, যাহা খান, যাহাকে আক্রমণ করেন এবং অনুচিত বোধে যে কর্ম্মের নিন্দা করেন, তত্তৎ সমস্তই সর্ব্বজনসমীপে প্রশংসার্হ হইয়া থাকে। সমদর্শী জন কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা শুভাশুভ যাহাই হউক, বহু দিন পূর্ব্বের করা হউক, বা সদ্যই কৃত হউক, সে কর্ম্মের প্রশংসা সকলের নিকটই হইয়া থাকে। সুখেই কি, দুঃখেই কি, আর সঙ্কটেই কি, সমদর্শী কুত্রাপি বিরসভাব ধারণ করেন না। রাজা শিবি সমদর্শী ছিলেন; সমতাগুণেই তিনি কপোতকে অকাতরে নিজ গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। ঐ গুণেই সম্রাট্ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী দ্রৌপদীকে স্বসমক্ষে শত্রুগণকর্ত্তৃক অপমানিত দেখিয়াও মোহাপন্ন হন নাই। ঐ গুণেই ত্রিগর্ত্তাধিপতি স্বীয় বহুকামনালব্ধ পুত্রকে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া গিয়া অকাতরে রাক্ষসের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ গুণেই রাজর্ষি জনক স্বীয় সুসজ্জিত নগরী দগ্ধই হউক, অথবা কোন উৎসবব্যাপারই অনুষ্ঠিত হউক, কিছুতেই বিচলিত হন নাই। সাম্বরাজ ঐ গুণেই ব্রাহ্মণের নিকট ন্যায়তঃ বিক্রীত নিজ মস্তক পদ্মপত্রবৎ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ সৌবীর ঐ সমতাগুণেই কৈলাসশৈলবৎ ধবল বৃহৎ ঐরাবত গজকে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের কথানুসারে জীর্ণ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে অনায়াসে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কুণ্ডপ নামে এক মাতঙ্গ ছিল, সে আপন সমতা-গুণেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানান্তে বিমানযোগে স্বর্গে গিয়া দেবতা হইয়াছিল। কদম্ববনবাসী জনৈক রাক্ষস প্রচুর সমতাগুণ অর্জ্জন করিয়াছিল; তাই সর্ব্বভূতক্ষয়করী রাক্ষসীবৃত্তি তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। জড় ভরত উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ছিলেন। তিনি একমাত্র সমতাবুদ্ধির গুণেই ভিক্ষা দ্রব্য সহ ভিক্ষাপাত্রে আগত অগ্নিখণ্ডকে গুড়মোদকবৎ অক্লেশে খাইয়াছিলেন। ধর্ম্মব্যাধ নামে এক ব্যাধ ছিল, সে প্রথমে ক্রূর কর্ম্ম করিত; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাহার সমতা বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল; সে পরে পরম পদ লাভ করিয়াছিল। নন্দনকাননে কপর্দ্দন নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। সুরনারীগণ অনুরাগভরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত; তিনি নিজে তাহাদিগের সকলকেই সম্ভোগ

করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন; তথাচ কিন্তু সমতাগুণে তাহাদের প্রতি তাঁহার স্পৃহামাত্রে হয় নাই। তিনি সমবুদ্ধিতার গুণেই নিজ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির দুর্গম করঞ্জকাননাভ্যন্তরে সমাধিমগ্ন হইয়া চিরতরে বাস করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক কঠোরতপা মুনি, ঋষি ও সিদ্ধগণ—তপঃক্লেশ ও বিষয়ভোগ উভয়ত্রই সমদৃষ্টিবশে কোনরূপ কষ্টানুভব করেন নাই। এই প্রকারে বহু রাজা এবং ধর্ম্ম-ব্যাধের ন্যায় নীচ জাতীয় লোকেরাও সমদর্শিতার অভ্যাস নিবন্ধন অতি বড় মহাত্মগণের নিকটও পূজাস্পদ হইয়াছেন। উত্তম বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ ঐহিক-পারত্রিক সিদ্ধি লাভার্থ পরম পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হন—হইয়া সতত সমদৃষ্টি লইয়াই বিচরণ করিতে থাকেন। সমদর্শী ব্যক্তির কাহারও প্রতি হিংসা হয় না; মরণও তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে, আর যে চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও তিনি রাখেন না। তিনি কেবল অবশ্যনিষ্পাদ্য প্রাপ্ত ব্যবহারই সমাধা করিয়া চলেন। সমতার গুণে দোষ-গুণ উভয়ই যাঁহার নিকট সমান দর্শনীয়; সুখ-দুঃখ, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, সকলকেই যিনি তুল্য-জ্ঞান করেন এবং যিনি স্বীয় অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাসক্তভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া কালাতিপাত করেন; তিনি জীবন্মুক্ত; তাঁহার দেহই পবিত্র; সাধুসমাজে তিনিই শ্রেষ্ঠাসনের অধিকারী।

অষ্টনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥

নবনবত্যধিক শততম সর্গ।

—*—

রামচন্দ্র কহিলেন,—মুনিবর! যাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মায় বিশ্রামলাভে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেন কর্ম্মত্যাগ করেন না?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হেয়োপাদেয় দৃষ্টি যাহার ক্ষয় পাইয়াছে, কর্ম্ম-ত্যাগ আর কর্ম্ম-সম্পাদন, এ উভয়ের কোন্‌টী করা হউক, আর না হউক, তাহাতে তাহার কি? দেখ, তত্ত্বজ্ঞানীর যাহাতে উদ্বেগ জন্মাইতে পারে,

এমন তো কোন কর্ম্ম আছে বলিয়া দেখি না; সুতরাং সে কর্ম্ম পরিত্যাগে ফল কি? অপিচ এমন কোন উপাদেয় কর্ম্মও তো দেখি না, যাহা তত্ত্বজ্ঞানীর অনুষ্ঠেয় হইতে পারে? ফল কথা, তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্ম পরিত্যাগই করুন, আর গ্রহণই করুন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, উভয়ই তিনি সমান দেখিয়া থাকেন। সুতরাং স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত যে যে কার্য্য তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি তাহা সমাধা করিতে থাকেন। দেখ, রাম! এই শরীর আছে; ইহাতে যতদিন জীবন সঞ্চার থাকিবে, ততদিন ইহা অবশ্যই স্পন্দিত হইবে—হউক, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? স্পন্দ পরিত্যাগেই বা ফলসিদ্ধি কি আছে? স্বগৃহবাসে প্রতিবন্ধক না থাকে তো স্থানান্তরে থাকিবার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানী যখন শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম্মই সমান দেখেন, তখন চিরপরম্পরাগত শাস্ত্রোক্ত সদাচার-পরিহারে তাঁহার প্রয়োজন কি? ফল কথা, সম নির্ম্মল নির্ব্বিকার বুদ্ধিতে যাহা কিছুই করা হউক, তাহা কখনই দোষের হয় না। হে মহাভুজ! এই ভূমণ্ডলে বহু সমদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সমদর্শিতাবশতঃ অনেক দুষ্ট কর্ম্মও করিয়া বসেন। তাহাতে তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবার নহে। তাঁহারা অনাসক্তমনে যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারে নিরত রহিয়াই গৃহস্থোচিত সদাচার পরিপালন করিতে থাকেন।

রামচন্দ্র! তুমি যেমন এইরূপ বীতরাগ, অনাসক্তচিত্ত, জীবন্মুক্ত অন্যান্য রাজর্ষিগণও এইরূপ বিজ্বর হইয়াই রাজ্যপালনে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বৈদিক বিধির অনুসরণক্রমে যজ্ঞাবশেষে ভোজনপূর্ব্বক সর্ব্বদা অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন। কেহ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, দেবার্চ্চনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। আবার এমনও অনেক তত্ত্বজ্ঞানী আছেন, যাঁহারা অন্তরে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে নিরত হইয়া অজ্ঞজনবৎ কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ কেহ বা মৃগগণাধ্যুষিত গভীর অরণ্যে কাল কাটাইতেছেন। এমন অনেক তত্ত্বজ্ঞানী আছেন, যাঁহারা পুণ্যাত্মগণাধিষ্ঠিত শান্তিময় লোকব্যবহারসম্পন্ন পবিত্র তীর্থ বা পুণ্যময় মুনিতপোবনে থাকিয়া দিন যাপন করিতেছেন। অনেক সমবুদ্ধি মহাত্মা

রাগ দ্বেষ পরিহারার্থ স্বদেশ পরিহারপূর্ব্বক বিদেশে গিয়া পরম পদাবলম্বনে কাল কাটাইতেছেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সংসারোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এ বন হইতে সে বন, এ গ্রাম হইতে সে গ্রাম, এ পর্ব্বত হইতে সে পর্ব্বত, এ স্থান হইতে অন্য স্থান, এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পুণ্য পুরী, কাশী, পবিত্র প্রয়াগ, শ্রীপর্ব্বত, সিদ্ধনগরী, বদরিকাশ্রম, মহেন্দ্রাচলের বনপ্রদেশ, গন্ধমাদনের সানুদেশ, দর্দ্দুরাচলের তটভূমি, বিন্ধ্যাদ্রির কচ্ছদেশ, মলয়াদ্রির মধ্যভূমি, কৈলাসশৈলের কানন দেশ, ঋক্ষ-বান্ গিরির গুহাস্থান, মহা পবিত্র শালগ্রাম ক্ষেত্র, কলাপগ্রাম, মথুরা, কালঞ্জরগিরি, এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক পবিত্র স্থানে, পবিত্র বনপ্রদেশে অবস্থান করিয়া বহুদর্শী তাপসগণ কাল কর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও স্ব স্ব কুলাচার পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেহ কেহ বা কৌলিক আচারপরম্পরা পালন করিতেছেন। অনেক প্রবুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানী উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়াছেন; কেহ কেহ বা একেবারেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একবার এ দিকে একবার সে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ বা চির দিন একই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল মহাত্মা এবং গগনচারী ও পাতালবাসী গন্ধর্ব্ব-দৈত্য-কিন্নরদিগের মধ্যে অনেক প্রবুদ্ধ ব্যক্তি লোকাচার পরিজ্ঞাত আছেন; উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অপিচ সম্যক্-দৃষ্টিহেতু নির্ম্মলচেতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সমুদায়ের মধ্যে অনেকে অপ্রবুদ্ধ মুমুক্ষু সংশয়দোলায় দুলিয়া পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সাধু সজ্জনের অনুগত হইয়া বাস করিতেছেন। কোন কোন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি আছে, তাহারা জ্ঞানগর্ব্বে স্বীয় সদাচার বিসর্জ্জন দিয়া এদিক্ ওদিক্ দু'দিক্ হারাইয়াছে।

রঘুনন্দন! এই অখিল জগতে অনেকেই সংসার হইতে পার পাইবার বাসনায় বহুদর্শী ও সমদৃষ্টি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। বনে বা গৃহে বাস, কিম্বা কষ্টকর তপস্যা বা কর্ম্মবর্জ্জন এ সকলের কোন একটীই সংসার হইতে পার পাইবার উপায় নহে। কর্ম্ম করিলেই যে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তাহাও নহে; সৎকর্ম্ম দ্বারা বহুপুণ্য অর্জ্জনেও যে সংসার

হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এমন কথাও ঠিক নহে। ফলে একমাত্র স্ব-ভাব অর্থাৎ আত্মবস্তুর প্রকৃত জ্ঞানই সংসার তরণের কারণ। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানলাভও ভোগ্য বিষয়ে একান্ত অনাসক্ত না হইলে হইবার নহে। যাঁহার মন বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য, তাদৃশ মুনি শুভাশুভ কর্ম্মের পরিহার করুন, আর নাই করুন, সংসারে তাঁহাকে কখনই আর আসিতে হইবে না। মন যাহাঁর বিষয়াসক্ত, তথাবিধ শঠ দুর্ম্মতি ব্যক্তি যদিও শুভাশুভ ক্রিয়াসমূহের পরিহার করুক, তথাপি সংসারে সে মগ্ন হইয়া থাকে; সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবে না। মন যদি একবার বিষয়ের স্বাদ পায়, তা'হলে মধুকুম্ভের প্রতি ধাবমান মক্ষিকা যেমন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তেমনি তাহাকেও নিবারণ করা যায় না; অপিচ তাহাকে যে মারিয়া ফেলা যাইবে, তাহাও পারিয়া উঠা যায় না; সে বিষয়রসের আস্বাদ লইয়া লইয়া দুঃখ দান করিবেই। মনের যে আত্ম-সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি, তাহা সৌভাগ্যগুণে কদাচিৎ আপনা হইতেই ঘটে। লব্ধনৈর্ম্মল্য চিত্তই আত্মসাক্ষাৎকারে তত্ত্বলাভ করিয়া দ্বন্দ্বদুঃখবিরহিত নিরাময় ব্রহ্ম হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! তুমি চিত্তকে অচিত্ত করিয়া সত্ত্বরূপে পরিণামিত করিয়া লও। পরে সমভাবে পরমাকাশরূপে অবস্থান করিতে থাক। তোমা কর্ত্তৃক বিষয়াসঙ্গাদি নিখিল দোষ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে; তাহাতে তুমি পরমার্থ-লাভে সমর্থ হইয়াছ; তোমার সমবুদ্ধি সমুদিত হইয়াছে, তুমি আত্ম-স্বরূপে রহিয়াছ; এক্ষণে বীতশোক হও এবং নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান কর। তুমিই এখন সেই জনন-মরণাতীত পূত পরম পদ। জানিবে—এ জগৎ নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপ; ইহাতে প্রকৃতরূপ মল, বিকাররূপ উপাধি ও তদ্‌বিষয়ক বোধরূপ ইচ্ছাদি কিছুই নাই; কেবল অকৃত্রিম ব্রহ্মই সুস্পষ্ট বিরাজমান। 'আমি নিজেই সেই ব্রহ্ম' তুমি এইরূপ জ্ঞান করিয়া নিঃশঙ্করূপে একইভাবে অবস্থিত হও। তোমার জ্ঞানোদয় জন্য তোমাকে আর অধিক উপদেশ দিবার কিছুই নাই; সত্যসত্যই তোমার সেই আদি ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। অধুনা তুমি সর্ব্বজ্ঞাতব্যই বিজ্ঞাত হইয়াছ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এই উপদেশ শুনিয়া রামচন্দ্র

নির্ম্মল বোধে বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া ব্রহ্মপদ-লাভ করিলেন। সভার সভ্যগণ সকলেই যেন সে কালে ধ্যানস্থ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। ভ্রমর যেমন অগ্রে কমলকুলোপরি ঝঙ্কার করিয়া পরে নিস্পন্দভাবে কমল-মধু পান করিতে থাকে, তেমনি তৎকালে সেই বশিষ্ঠদেবও মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদ লইতে লাগিলেন।

নবনবত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ॥

দ্বিশততম সর্গ।

—•:•—

বাল্মীকি কহিলেন,—যখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নির্ব্বাণবিষয়িণী কথা পরিসমাপ্ত হইল, তখন তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এদিকে মুনিবরের তাদৃশ মধুর উপদেশ শ্রবণে সভাস্থ সকলেরই তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইল। তাঁহারা তখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন ও সমত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সুনির্ম্মল চিত্তবৃত্তি শান্তভাব অবলম্বন করিল। সেই সভাস্থিত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত শ্রোতারই সম্বিত্তত্ত্ব নির্ব্বিকল্পসমাধিগুণে সন্মাত্রের শেষসীমায় উপনীত ও পরম পূত হইল। তখন গগনবিহারী সিদ্ধগণ উচ্চরবে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সভাস্থ বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ মুনি-গণও অত্যুচ্চ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎকালে তথায় একটা দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। যেমন সমীর-সংযোগে বংশ হইতে সুমধুর শব্দ সমুত্থিত হয়, তেমনি সেই সভা হইতে উত্থিত সাধু সাধু বাক্যের কোলাহল সকলেরই নিকট অতি মধুর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। অনন্তর আকাশে শুনা গেল, সেই সিদ্ধবৃন্দের সাধুবাদধ্বনির সহিত হঠাৎ দেবদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত পৃথ্বী ও পর্ব্বত পরিপূরিত করিয়া ফেলিল। স্বর্গীয় দুন্দুভিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক্ হইতে তুষারবৃষ্টিবৎ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাশি রাশি পুষ্পপতনে সমস্ত স্থান ভরিয়া গেল।

কোলাহল-শব্দে গিরিদরী পরিপূর্ণ হইল। পুষ্পসমূহের পরাগ-প্রসর্পণে আকাশ আরক্ত ছবি ধারণ করিল। কুসুমসৌরভে সুরভিত হইয়া সমীরণ দিকে দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। সেই সকল সাধুবাদ-ধ্বনি, দেবদুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টিধ্বনি, এক সঙ্গে মিশিয়া গেল—মিশিয়া অত্যন্ত মধুর হইয়া উঠিল। সভার সভ্যগণ ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহাদের নেত্রজ্যোতিতে নভোমণ্ডল শ্যামল হইয়া গেল। বলিতে কি, পশু-পক্ষিগণও উৎকর্ণ হইয়া সেই কোলাহল শুনিতে লাগিল। বালক ও বিলাসিনীগণ সেই অভূতপূর্ব্ব কোলাহল শ্রবণে ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সভাগত অন্যান্য রাজন্যবৃন্দও বিস্ময়ের সহিত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। জলধারার ন্যায় অবিরল পুষ্পাঞ্জলি বৃষ্টির মধুর শব্দে ভূতল ও নভোমণ্ডলের অন্তরাল অতি অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইল। সেই সভা-সন্নিহিত আকাশদেশও পুষ্পবৃষ্টিরূপ সুধায় ক্ষালিত হইয়া এবং সাধুবাদকারী ভূতবৃন্দের পবিত্র শব্দে পরিপূরিত হইয়া যেন সেই সভাগৃহের তুল্য হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই সভাগৃহাভ্যন্তরে শত শঙ্খ নিনাদিত হইতে লাগিল। নিখিল ভুবনতল কোলাহলনাদে নাদিত, কুসুমসমূহে মণ্ডিত এবং সুরবন্দিবৃন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া মহোৎসবময়রূপে প্রতীত হইতে লাগিল। প্রবল পবন-পরিচালিত সাগরোর্ম্মিমালা যেমন সাগরতীরস্থিত পর্ব্বতে গিয়া প্রতিহত হয়, তেমনি সেই সুরদুন্দুভিনাদ, সিদ্ধবৃন্দের সাধুবাদ ও পুষ্প-পতনের প্রবল শব্দ একই কালে ধীরে ধীরে ভূতল, নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডলের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সুরগণের কুসুমবর্ষণের কোলাহল যখন শান্ত হইয়া গেল, তখন আকাশস্থ সিদ্ধসমূহের এই সকল কথা সভাসদ্‌গণের কর্ণগোচর হইল। সিদ্ধগণ কহিতে লাগিলেন,—আমরা এ জগতের আদি আবির্ভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকবার অনেক মোক্ষ-বিষয়িণী কথা শুনিয়াছি, আমরা নিজেরাও অনেকের নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছি; কিন্তু কৈ কোথাও তো আমরা এমন মধুর উপদেশ শ্রবণ করি নাই! বলিব কি, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এই সারগর্ভ মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বালকবালিকারা এমন কি পক্ষী ও হিংস্র জন্তুরাও পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত, হেতু ও যুক্তি

প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ উপদেশদানে রামচন্দ্রের প্রতি যাদৃশ স্নেহ দেখাইলেন, নিজের যিনি প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী—সেই পুণ্যশীলা অরুন্ধতীর উপরও তাদৃশ স্নেহ ইহাঁর প্রদর্শিত হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। অহো! এই মোক্ষোপদেশক বাক্য শুনিয়া তির্য্যগ্জাতিরাও মুক্ত হইল; মর্ত্ত্যবাসী মানবগণের আর কথা কি? আমরা শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা এই জ্ঞানামৃত পান করিয়াছি; ইহাতে বোধ হইতেছে, আমাদের পূর্ব্বতন সিদ্ধি নূতন হইয়া উঠিল। মনে হইতেছে, নূতন সিদ্ধি লাভ করিলে যেমন প্রফুল্লভাব উপস্থিত হয়, তেমনি প্রফুল্লভাব আসিয়াছে।

এইরূপ অলক্ষ্য বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকই বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্র হইল এবং সেই কমলকুসুম-সমাকীর্ণ সভার সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। সেই সভার আস্তরণসকল মন্দারাদি স্বর্গীয় পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল; প্রাঙ্গণভূমি পারিভদ্রলতায় পরিবৃত হইয়াছিল। সভাগৃহের তলদেশ পারিজাতকুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছিল। সভ্য-বৃন্দের করে এবং শিরে সন্তানক পুষ্প বিরাজ করিতেছিল। সভাস্থলে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মৌলিরত্নোপরি হরিচন্দন শোভা পাইতেছিল। সভার চন্দ্রাতপ জলভরলম্বিত মেঘমালার ন্যায় পুষ্পভরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এ হেন সভার সভ্যগণ সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তৎসময়োচিত প্রশংসাবাক্যে অতীব বিনয়সহকারে একাগ্রমনে বশিষ্ঠ মুনির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। একে একে সকলেই তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

ক্রমে রাজন্যগণ ও অন্যান্য সভ্যগণের প্রণামাদি কার্য্য যখন পরিসমাপ্ত হইল, তখন নরপতি দশরথ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া মুনিবর বশিষ্ঠকে অর্চ্চনা করিতে করিতে কহিলেন,—হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহে অদ্য আমাদের অন্তঃকরণ একেবারে অক্ষয় পরম জ্ঞানময় পরমার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমাদের নিকট, এমন কি স্বর্গে দেবগণের নিকটও সেরূপ কোন উপকরণ নাই, যাহা দ্বারা ভবাদৃশ পূজ্য জনের পূজা করিতে পারি। তথাচ গুরুপূজা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য; আমি সেই পূজারূপ সদাচার সফল করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট এক বিষয় নিবেদন করিব, আপনি

তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি পত্নীর সহিত উভয় লোকজিগীষায় যে কিছু সুকৃত অর্জ্জন করিয়াছি, আমার যত রাজ্য, ভৃত্য ও অন্যান্য বিভব বিস্তার আছে, আমি সেই সকল আপনাকে প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিতেছি। ভবদীয় নিজাশ্রমের ন্যায় এতৎসমস্ত আপনার আয়ত্ত। এক্ষণে আমাকেও আপনি যথেচ্ছ কর্ম্মে নিয়োগ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নরপতে! প্রণামমাত্রেই আমাদের সন্তোষ হইয়া থাকে। আমরা ব্রাহ্মণজাতি; আমাদের নিকট প্রণত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। যে প্রণামে আমাদের সন্তোষ, তাহা তো আপনি করিয়াছেন। রাজ্য লইয়া আমরা কি করিব? রাজ্যরক্ষা কিরূপে করিতে হয়, তাহা তো আমাদের অভ্যাস নাই। আপনি রাজ্যরক্ষায় অভ্যস্ত, রাজ্য আপনাতে এবং আপনার সহযোগিবর্গেই শোভা পায়। সুতরাং উহা আপনারই থাকুক। আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ রাজত্ব করিতেছেন, এ দৃশ্য কোথাও আপনি দেখিয়াছেন কি?

দশরথ কহিলেন,—আপনি দয়া করিয়া পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ আমাদিগকে দান করিলেন। আপনার এই দত্ত বস্তুর নিকট রাজ্য একান্তই তুচ্ছ বস্তু। আপনি যে মহোপকার করিলেন, তাহার বিনিময়ে এই তুচ্ছ রাজ্যার্পণ নিতান্তই লজ্জাকর। প্রভো! আমরা, আমাদের বিভব-বিস্তর, সমস্তই আপনার অধীন; এক্ষণে আপনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপই করুন।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! নরপতি দশরথ এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এই সময় রামচন্দ্র পুষ্পাঞ্জলি লইয়া গুরুদেব বশিষ্ঠের চরণপঙ্কজে প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রণতভাবে কহিলেন,—ভগবন্! মদীয় পিতৃদেব মহারাজকে আপনি নিরুত্তর করিয়াছেন। কিন্তু বিভো, ভবদুপদেশক্রমে আমি এক্ষণে প্রণামকেই আপনার অর্চ্চনায় সার বলিয়া বুঝিয়াছি; সুতরাং ভবচ্চরণপঙ্কজে আমি প্রণামই করিতেছি। রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া হিমালয়োপরিস্থিত কাননের তৎপাদমূলে তুষার-বর্ষণের ন্যায় বশিষ্ঠদেবের চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিলেন। নীতিজ্ঞ রামের নয়নপঙ্কজ আনন্দাশ্রুজলে পরিপ্লাবিত হইল। তিনি পরম

ভক্তিযুক্ত হইয়া বারম্বার গুরুদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণাদি অন্যান্য যে কেহ ছিলেন, সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণাম করিলেন। দূরস্থ সভাস্থানে যে সকল রাজা, রাজপুত্র বা অন্যান্য মুনি ছিলেন, তাঁহারা স্বস্ব আসনে থাকিয়াই বশিষ্ঠ মুনির প্রতি প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। হিমাদ্রি যেমন তুষারপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন থাকে, চতুর্দ্দিক হইতে নিপতিত কুসুমসমূহে বশিষ্ঠদেবও তখন সেইরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেলেন; অবিরল পুষ্পপাতে তিনি অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর যখন সকলের প্রণামকার্য্য শেষ হইল, সভা কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল; তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ স্বীয় উপদিষ্ট বিষয় কে কিরূপ বুঝিয়াছে, কাহারও তাহাতে অতৃপ্তি আছে কি না, রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া কেহ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করে কি না, এই সকল জানিবার নিমিত্ত বাহুযুগল দ্বারা কুসুমরাশি সরাইয়া দিয়া শুভ্র অভ্রমধ্য হইতে চন্দ্রমার ন্যায় স্বীয় মুখমণ্ডল প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধসমূহের প্রশংসাবাদ নিবৃত্ত হইল, দুন্দুভিধ্বনি ক্ষান্ত হইল, কুসুমরাশি বর্ষণ বিরত হইল এবং সভার কোলাহল শান্ত হইল। তখন সভাস্থ সকলে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বায়ুর বিরামে স্তব্ধ মেঘের ন্যায় জনগণ নিস্তব্ধ হইল।

এই সময় মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সভ্যগণের সাধুবাদ শ্রবণান্তে সভাস্থ মুনি-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে গাধিনন্দন! হে বামদেব! হে ক্রতো! হে নিমে! হে ভরদ্বাজ! হে পুলস্ত্য! হে অত্রে! হে নারদ! হে শাণ্ডিল্য! হে ভৃগো! হে ভাস! হে ভারুণ্ড! আপনারা আমার কথাগুলি শ্রবণ করিলেন তো? আমি যাহা যাহা কহিলাম, ইহা যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে অসঙ্গত বা কদর্থযুক্ত হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা তাহা আমায় বলুন। তখন সভ্যবৃন্দ উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মন্! বশিষ্ঠদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অসঙ্গতি থাকিবে, ইহা তো আমরা একটা নূতন কথাই শ্রবণ করিলাম, কত কত জন্ম গিয়াছে, সেই সেই জন্মে আমাদের যে মলপ্রক্ষালন হয় নাই, অদ্য ভবদুপদেশে তাহা মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। হে বিভো! সুধাকর-করস্পর্শে কুমুদ-কুসুম যেমন ফুটিয়া উঠে,

তেমনি আপনার এই ব্রহ্মপ্রদর্শক মধুর বচনামৃতে আমাদের জ্ঞানকুসুম বিকাশ পাইয়াছে। হে মুনীন্দ্র! আপনি মহাজ্ঞান প্রদান করিয়া মাদৃশ-জনের একমাত্র গুরুপদে সমাসীন হইলেন। আমরা আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করিতেছি।

বাল্মীকি কহিলেন,—এই কথা কহিয়া মুনিগণ সকলেই এককালে মেঘ-গম্ভীরস্বরে 'নমস্তে' বলিয়া বশিষ্ঠদেবকে নমস্কার করিলেন। এই সময় আকাশ হইতে সিদ্ধবৃন্দ আবার পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পুষ্পাবৃত বশিষ্ঠদেব তুষারপরিবৃত হিমাদ্রির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। অনন্তর রামকে যাঁহারা ভগবন্নারায়ণাবতার বলিয়া জানেন, তাঁহারা অগ্রে দশরথনরপতির, পরে চতুর্দ্ধাবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ রামচন্দ্রের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সিদ্ধবৃন্দ কহিলেন, যিনি চতুর্ম্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ,আমরা সেই ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারী জীবন্মুক্ত রাজকুমার রামচন্দ্রকে প্রণাম করি। যিনি সাগরাম্বরা ধরিত্রীর পালন করিতেছেন, যাঁহার সুকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী, আমরা সেই দশরথ নরপতিকে নমস্কার করি। যিনি মুনিসমবায়ের শ্রেষ্ঠ, সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বশিষ্ঠদেবকে এবং তাঁহার সমীপস্থ তপস্বী বিশ্বামিত্রকে আমরা প্রণাম করি। অদ্য ইহাঁদের প্রভাবেই আমরা সকলে সংসারভ্রমনাশিনী জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী শুনিয়া ধন্য হইলাম।

বাল্মীকি কহিলেন,—সিদ্ধগণ এই সকল কথা কহিয়া আকাশ হইতে আবার পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অনন্তর সেই সভাস্থ সকলেই সানন্দচিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিমানবিহারী সিদ্ধগণ যেমন সেই সভ্যগণের প্রসংশা করিলেন, সেই সভ্যগণও তেমনি তাঁহাদিগের বহুধা প্রশংসা করত সম্মান করিলেন। আকাশস্থ দেব ও মহর্ষিগণ এবং ভূতলস্থ দ্বিজ, রাজা ও মুনীন্দ্রগণ এইরূপে পরস্পর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপুরঃসর সকলের সমাদর ও সৎকার করিতে লাগিলেন।

দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! কিয়ৎকালের মধ্যেই সেই সাধুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইল। রাজন্যগণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে পরমানন্দ-লাভ করিলেন। জনগণের সংসারভ্রম তিরোহিত হইল। তাহাদের চিত্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদে অনুধাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে অজ্ঞানদশায় তাহারা যে যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল আচরণের নিন্দা করিতে লাগিল। সভাস্থিত বিবেকী ব্যক্তিরা প্রত্যক্চিত্তে চিদানন্দ-রসের আস্বাদ লইতে লইতে যেন ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নরনাথ দশরথ যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্তজনবৎ অতি পূতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের অর্চ্চনা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া স্পষ্টবাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে সূর্য্যবংশ-ভূষণ, রামচন্দ্র! এখন তুমি আর কি শুনিতে চাও; বল। অদ্য তোমার অবস্থিতি কিরূপ হইতেছে, আর এই ভ্রান্তি-গম্য জগৎকে তুমি কিরূপ দেখিতেছ, তাহাও প্রকাশ করিয়া বল।

মুনিবর বশিষ্ঠের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজকুমার রাম গুরুদেবের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মৃদু অথচ স্পষ্টবাক্যে অব্যা-কুলতার সহিত কহিলেন,—ভগবন্! ভবৎপ্রসাদে আমি শারদাকাশবৎ অত্যন্ত নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছি। মদীয় অখিল মল প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। আমার জনন-মরণাবহ নিখিল ভ্রম নিরস্ত হইয়াছে। আমি বিশুদ্ধরূপে স্বচ্ছাকাশবৎ বিরাজ করিতেছি। আমার ভববন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সমস্ত উপাধি লয় পাইয়াছে; আমি স্ফটিকময় গৃহের অন্তরালস্থ স্ফটিকমণিবৎ নির্ম্মল হইয়া রহিয়াছি। মদীয় মন অধুনা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তবৎ অবস্থিত হইয়াছে; অন্য আর কোন বিষয় শুনিতে বা করিতে চাহিতেছে না। মুনিকল্প! আমার মন এখন শান্ত হইয়া সর্ব্ব-

সঙ্কল্প পরিহার করিয়াছে। আমি অধুনা সর্ব্বথা লব্ধনির্ব্বাণ ও শান্ত হই-য়াছি; আমার অন্তরে বাহিরে বিষয়ালোচনা রহিত হইয়াছে। আমি এখন আমার সেই আদ্য আশা-বিকশিত দেহস্থিতির প্রতিই অন্তরে অন্তরে উপহাস করিতেছি। ভবদীয় মধুময়ী উপদেশবাণী মনোমধ্যে সতত সমুদিত হওয়ায় আমার কাল স্বচ্ছভাবেই কাটিয়া যাইতেছে। আমার এখন উপদেশে, অর্থে, বন্ধুজনে বা শাস্ত্রে কিম্বা এ সমুদায়ের পরিহারে কোন কিছুতেই প্রয়োজন দেখি না। আমার এই যে ইদনীন্তন প্রত্যঙ্মুখী জীবন্মুক্তস্থিতি, ইহাকে আমি অসুরোপদ্রব-রহিত নিরাপদ স্বর্গরাজ্য হেন অনুভব করিতেছি, বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও আমি চক্ষুরাদি অবয়ব-যুক্ত আছি, তথাচ সমুদায়কেই আকাশাপেক্ষাও অতি স্বচ্ছ চিন্মাত্র বলিয়াই দেখিতেছি। এ জগৎ যে একমাত্র চিদাকাশই, এরূপ নিশ্চয়ই এক্ষণে আমার সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যনামধেয় জগৎ আমার নিকট ক্ষয় পাইয়াছে; ইহা এক্ষণে আকাশমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ আকাশে আমি অক্ষয় হইয়া জাগ্রৎ রহিয়াছি। আপনি আমাকে ভাবী কার্য্যবিষয়ে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বিষয়ে যথাপ্রাপ্ত কার্য্যানু-ষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, এবং অতীত বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই করিতে কহিয়াছেন, আমি এক্ষণে নিরিচ্ছ হইয়া অবাধে তাহাই করিতেছি। এখন আমি না তুষ্ট, না হৃষ্ট, না পুষ্ট কিছুই নাই; আমার কোন বিষয়ে ক্রন্দন নাই; আমি অবশ্যকর্ত্তব্য লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মসমূহ সমাধা করিয়া যাই। আমার ভ্রমজাল বিদূরিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাউক, কিম্বা প্রলয়পবন প্রবাহিত হউক, অথবা সমস্তই শূন্য হইয়া যাউক, আমার তো ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুতেই নাই। আমি স্বচ্ছ হইয়া আমাতেই থাকি। মুনিবর! আমি বিশ্রান্ত হইয়াছি, বহিরেন্দ্রিয়ের অলক্ষ্য হইয়াছি, মনেরও দুর্লক্ষ্য হইয়াছি এবং নিরাময় হইয়া রহিয়াছি। মুষ্টি দ্বারা আকাশকে যেমন আবদ্ধ করা সম্ভব হয় না, তেমনি অধুনা আশা আমাকে বাঁধিতে পারিতেছে না। যেমন তরুগত কুসুম হইতে গন্ধ বিচ্ছুরিত হইয়া আকাশে অবস্থান করে, তেমনি আমি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গন্ধস্বরূপে আকাশে থাকিতেছি। যেমন কি প্রবুদ্ধ,

কি অপ্রবুদ্ধ, সকল রাজারাই স্ব স্ব রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করেন, তেমনি আমি আশা-হর্ষ-বিষাদ-বিরহিত হইয়া স্থির সমদর্শন ও নিঃশঙ্কভাবে আত্মাতেই বিহার করিতেছি। এ জগতে যত প্রকার সুখ আছে, আমি এখন সেই সকল সুখ হইতেও উচ্চতর সুখে সুখী হইয়াছি। আমার এই যে সুখ, ইহা অপেক্ষা আমি আর অন্য সুখ চাহি না। সর্ব্বদা আমি সকলের প্রতি সমভাবে রহিয়াছি। এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে আপনি আমাকে ভবদীয় সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত করুন।

হে সাধুবর! বালক যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে খেলিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি একমাত্র নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইয়া আজীবন অশঙ্কিতভাবে এই সংসারস্থিতির পালন করিতেছি। আপনার প্রসাদাৎ আমার সর্ব্বশঙ্কা গিয়াছে। এক্ষণে যথেচ্ছ পান ভোজন ও বিশ্রামাদি করিতে থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অদ্যকার দিন বড়ই আনন্দের দিন! কেন না, যাহা আদি, মধ্য, অন্তবিরহিত, যথায় গেলে আর শোক করিতে হয় না, সেই মহাপবিত্র পরমপদ তুমি অধিগত হইয়াছ। যাহা আকাশবৎ স্বচ্ছ, শান্ত, সম, সেই পরমাত্মায় তোমার বিশ্রাম লাভ হইয়াছে। সৌভাগ্য-যোগেই অদ্য তুমি শোকবর্জ্জিত, সৌভাগ্যগুণেই এখন তুমি সমস্বরূপে অবস্থিত; সৌভাগ্যবশেই আজ তোমার ইহপরকালের অনিষ্টাশঙ্কা নষ্ট হইয়াছে। তোমার সৌভাগ্য, তুমি রঘুনন্দন নাম গ্রহণপূর্ব্বক তোমার অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পুরুষপরম্পরাকে আজ তত্ত্বজ্ঞানবৈভবে পবিত্র করিয়া তুলিলে। বৎস! এখন তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পূরণ এবং পিতৃসহায়ে এই পৃথ্বীরাজ্য পালন করিতে থাক। হে সুন্দর! অদ্য তোমার সাদৃশ্য গুণে তোমার বন্ধুবান্ধবাদি, এমন কি গজাশ্বাদিও নিরাময় ও নির্ভয় হইয়া সতত স্থির অভ্যুদয় অধিগত হউক।

একাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

বাল্মীকি কহিলেন,—সভাস্থ রাজন্যবর্গ বশিষ্ঠদেবের ঐ কথা শুনিয়া অন্তরে যেন অমিয়-ধারায় অভিষিক্ত হইলেন। অম্বুজাক্ষ রামচন্দ্র পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে দুগ্ধাব্ধির ন্যায় বদনচন্দ্রমার শোভায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। বামদেবাদি তত্ত্বজ্ঞ ঋষিমণ্ডলী একবাক্য হইয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন,—অহো, ভগবান্ বশিষ্ঠ কি অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশই করিলেন! এদিকে রাজা দশরথের অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইয়া গেল। তিনি পরমানন্দ সহকারে রোমাঞ্চিত-কলেবরে পরম শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায় বশিষ্ঠদেবকে বহুতর সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম-চন্দ্রের সমস্ত অজ্ঞান নিরস্ত হইয়া গেল। তিনি পুনরপি বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! হে ভূত-ভবিষ্যতত্ত্বজ্ঞ! বহ্নিযোগে কনকের মালিন্য যেমন মার্জ্জিত হয়, আমার অখিল অজ্ঞানমল তেমনি আপনি মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে আমি এই নিজ দেহকেই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিতাম, এখন আর আমার সে ধারণা নাই; আমি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই এক্ষণে আত্মা বলিয়া অবলোকন করিতেছি। আমি সর্ব্ব ও সম্পূর্ণ হইয়াছি। আমি নিরাময় ও নিঃশঙ্ক হইয়া রহিয়াছি। আমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। আমি জাগ্রদ্‌ভাবেই অবস্থান করিতেছি। আমার চিরানন্দ ও চিরসুখ হইয়াছে। আমি আর কস্মিন্ কালেও দুঃখভাগী হইব না। যাহা শাশ্বত পরমার্থ বস্তু, তাহা এক্ষণে আমার আবির্ভূত হইয়াছে। আমি চিরদিনের তরে অক্ষতভাবে রহিব। আর কখনই অস্তপ্রাপ্ত হইব না। আজ আমার কি আনন্দই না উপস্থিত! আপনি শীত পূত জ্ঞানসলিল দ্বারা আমায় অদ্য অভিষিক্ত করিলেন! অন্তরে আমি কমলবৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, ভবৎপ্রসাদে অদ্য আমার সেই পদ্ধতি লাভ হইয়াছে, যাহাতে থাকিয়া নিখিল জগৎ আমি অমৃতময় বোধ করিতেছি। আমার সর্ব্বশোক নষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান অপগত হওয়ায় আমি নির্ম্মল আত্মানন্দ-লাভে পরম শ্রী ধারণ করিয়াছি। আমার এই

নির্ম্মলতালাভ আপনাপনিই হইল। অতএব আমি আমাকেই এক্ষণে নমস্কার করিতেছি।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিক দ্বিশততম সর্গ।

—*—

বাল্মীকি বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও রঘুবর রামচন্দ্র উভয়ে ঐরূপ আত্মবিচারে নিরত আছেন, এই সময় ভগবান্ ভানুদেব তাঁহাদের সেই বিচার শ্রবণার্থই যেন অম্বরমধ্যে সমুদিত হইলেন। দিকে দিকে সৌরাতপ বিচ্ছুরিত হইয়া রামচন্দ্রের মহতী বুদ্ধির ন্যায় প্রখরভাব উপগত হইল। শোভা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেই সভার পুরোভাগে যে সকল কমল-সরসী কল্পিত ছিল, এক্ষণে তাহার নিখিল কমল বিকসিত হইল; কাজেই সেই সরসীকুল যেন সেই সভা-সমাসীন ফুল্লহৃদয় রাজন্যবর্গবৎ বিরাজিত হইতে লাগিল। সেই সভাভবনের স্ফটিক বাতায়নে মুক্তামালা বিলম্বিত ছিল; সূর্য্য-প্রতিবিম্বপাতে তাহা ঝলমলায়িত হইয়া যেন বশিষ্ঠোক্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণেই আনন্দে আকাশে লম্ফ দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দিবাকরের প্রখরকর সেই সভাস্থলীর পদ্মরাগমণিময় প্রদেশে পতিত হইয়া স্বচ্ছ বুদ্ধিপতিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশবৎ আরও অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উল্লিখিতরূপে লব্ধপরমানন্দ স্ববংশকৈরবস্বরূপ রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের বদন-চন্দ্রালোকে যেন বিকসিত হইতে লাগিলেন। দিনমণি বাড়বানলবৎ আকাশাম্বুধির অভ্যন্তরে থাকিয়া অনলশিখাবৎ প্রখর তাপ প্রদান করিতে করিতে সমগ্র রস পান করিয়া লইলেন। অম্বর তখন রজঃশূন্য নীলোৎপলবৎ সুশোভিত হইতে লাগিল। স্বয়ং দিবাকর যেন নীলোৎপল-কলিকারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন। সৌর কিরণাবলী ঐ আকাশরূপ নীলোৎপলের কেশরবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। মনে হইল, ঐ অম্বররূপ নীলোৎপল যেন জগৎলক্ষ্মীর অলঙ্কারস্বরূপ, অথবা উহা যেন ত্রিলোকীর কর্ণকুণ্ডলস্বরূপ; উহার অভ্যন্তরভাগে নানা নক্ষত্ররূপ

রত্নরাজি বিরাজিত। সেই মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকান্ত-মণিময় ভবনের সমীপস্থ আকাশদেশ সূর্য্যের সন্নিদিগত না হইলেও সূর্য্যকান্তমণি-বিনির্গত অগ্নিজ্বালায় দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খ কল্পান্ত-বাতালোড়িত সমুদ্রবৎ ভীষণরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ডাতপের প্রসারণকালে সভ্যবৃন্দের বদনমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু সুশোভিত হইতে লাগিল। উহা কমলে তুষারবিন্দুর ন্যায় অথবা যেন এক একটী মুক্তার ন্যায় প্রতিভাত হইল। বৃষ্টির এবং নদীর জল যেমন সাগরগর্ভ পরিপূরণ করে, তেমনি সেই উচ্চ শঙ্খধ্বনি সভ্যবৃন্দের কর্ণবিবর পরিপূরিত করিল। ঐ ধ্বনি তত্রত্য সভাগৃহের ভিত্তিদেশে প্রতিহত হইল, প্রতিধ্বনি-রূপে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং সমুদায়ের সসম্ভ্রম গাত্রোত্থান জন্য কোলাহলসহ মিশ্রিত হইয়া উচ্চ হইতে ক্রমশঃ আরও উচ্চ হইল। তৎকালে পুরন্ধ্রীগণ নিদাঘতাপ শান্তির নিমিত্ত কর্পূরবারি সিঞ্চন করিতে লাগিল। মনে হইল যেন, মেঘমালা হইতে বারিপাত হইতে লাগিল। সেই সময় নরপতি দশরথ, বশিষ্ঠ মুনি, রামচন্দ্র, অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ, মুনিগণ এবং অপরাপর সভাসদ্‌গণ সকলেই সভা হইতে উত্থিত হইলেন। রাজপুত্র, মন্ত্রী ও মুনিবৃন্দ সকলেই পরস্পর অভিবাদনাদি করত আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে বারম্বার তালবৃন্ত পরিচালিত হইতে লাগিল। তালবৃন্ত-বাত-সমুদ্ধূত কর্পূর-পরাগ-পুঞ্জে গৃহাভ্যন্তরগত অম্বরে যেন নব-মেঘের সঞ্চার হইল।

অতঃপর সেই মধ্যাহ্ন তূর্য্যনাদ সভাভিত্তিতে অভিহত হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে রঘুবর! যাহা যাহা শুনিতে ও জানিতে হইবে, সকলই তুমি শুনিয়াছ এবং জানিয়াছ। তোমার আর এখন জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তুমি আমার উপ-দেশ যাদৃশ ভাবে শুনিয়াছ, সেইরূপে আমার একটি কথাও এক্ষণে রক্ষা কর। আমি বলি, হে মতিমন্! তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। এই মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়া যায়, আর বসিয়া থাকা আমাদের এক্ষণে উচিত হইতেছে না, আইস, আমরা গমন করি। হে

সাধো! তোমার যদি আরও কিছু শুনিবার এবং জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আগামী কল্য তাহা শুনিও এবং জানিও।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই কথা কহিবার পর নরনাথ দশরথ স্বয়ং সভাস্থ সমস্ত সাধুগণকে বিধিমত অর্চ্চনা করিলেন। বশিষ্ঠ-দেবের উপদেশানুসারে নরনাথ দশরথ রামচন্দ্রসহ সভাস্থ মুনি, বিপ্র, রাজন্য-গণ এবং গগনবিহারী সিদ্ধগণকেও মণি, মুক্তা, সুরভি কুসুম, রত্ন ও মুক্তা-হার অর্পণ করিলেন; আসন, বসন, অন্ন পানীয় ও স্থান দিলেন, এবং গন্ধ, ধূপ ও মাল্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণামান্তে যথানিয়মে পূজা করিলেন। অনন্তর আকাশ হইতে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় সেই মানদ বশিষ্ঠাদি দেববৃন্দ সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সুরগণ প্রচুর পুষ্পরাশি বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল পুষ্পের মকরন্দরসে জানুপ্রমাণ কর্দ্দম সঞ্চিত হইল। সকলে ত্বরান্বিত হইয়া যাইবার সময় পরস্পরের গাত্রঘর্ষণে কেয়ূরস্থ রত্নরাজি চূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই রত্নচূর্ণপতনে ভূতল অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। পর-স্পরের সঙ্ঘর্ষণে সকলের হার ছিন্ন হইল; সেই ছিন্ন হার হইতে মুক্তা-পুঞ্জ ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাতে মুক্তায় মুক্তায় ভূতল আকীর্ণ হইয়া গেল। সেই মুক্তাকীর্ণ ভূমিতল নৈশ নক্ষত্রখচিত গগনতলের শোভা পরাজিত করিল। দেবর্ষি, মুনি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের যাতায়তে সমস্ত পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। ভূপালগণ পথের উপর দিয়া প্রস্থান করিলে ভৃত্য ও পরিচারিকাগণ ব্যগ্রভাবে তাঁহাদিগকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। লোক সকল ত্বরাসহকারেই যে সেকালে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া যাইতেছিল, তাহা নহে; বশিষ্ঠোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানচিন্তনেই সকলে তন্ময়; বাহ্যিক জ্ঞান বড় একটা কাহারও ছিল না, কেবল অভ্যাসবশে সত্বর গমনেই তাঁহাদের ঐরূপ গাত্রঘর্ষ ঘটিতেছিল। দশরথপ্রমুখ রাজ-গণ ও মুনিগণ সকলে যখন সভাভূমি পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন পথি-মধ্যে মিষ্টসম্ভাষণ করিয়াই যাইতে লাগিলেন। সপ্তলোকবাসী সুরগণ যেমন সুরেন্দ্রসভা হইতে পরস্পর মিষ্টালাপ করিতে করিতে স্ব স্ব লোকে গমন করেন, তেমনি সেই সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত সাধুগণও সন্তুষ্টমনে পরস্পর মধুরালাপ করিতে করিতে স্ব স্ব আশ্রমে চলিলেন। তখন সকলেই সেই

সভাস্থ বশিষ্ঠ দেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরস্পর যথাযোগ্য সম্ভাষণ নমস্কারাদি করিলেন এবং পরে স্ব স্ব ভবনে গিয়া সকলেই দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনিগণ এবং দশরথাদি রাজন্য-গণ সকলেই স্ব স্ব দিনকৃত্য সম্পাদন করিলেন। এ দিকে আকাশ পথের পথিক ভগবান্ ভাস্করদেব অস্তাচলশিখরের আশ্রয় লইলেন। মহাত্মা রামচন্দ্রের জ্ঞানময়ী কথার আলোচনা করিতে করিতেই সকলে সে রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিলেন। যখন প্রভাত হইল, তখন দিবা-কর অন্ধকাররূপ ধূলি ও তারকারূপ কুসুমসমূহ অপসারিত করিয়া জগদ্-রূপ গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে সমাগত হইলেন। সূর্য্যদেব প্রথমে উঠিলেন,—উঠিয়াই করবীর ও কুঙ্কুমবৎ লোহিতাভ কিরণ ছটা প্রসারণে চারিদিক্ রক্তবর্ণ করত গগনসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। রাজা,রাজকুমার, মন্ত্রী ও বশিষ্ঠাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ সকলেই পুনরায় একে একে দশরথ-সভায় আগমন করিলেন। অহরহ অম্বরে যেমন যথাযথরূপে নক্ষত্ররাজি সমুদিত হইয়া থাকে, তেমনি সেই সভ্যগণও সকলেই সভাক্ষেত্রে আপনাদের যথাযথ আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এই সময় বশিষ্ঠ মুনি স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। দশরথাদি রাজন্যগণ ও সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠদেবের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন পদ্মপত্রাক্ষ ধীমান্ রাম বশিষ্ঠ ও পিতৃদেবের সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক কোমল স্বরে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মই জানেন; নিখিল জ্ঞানের মহাসাগররূপে আপনি বিরাজমান; যত প্রকার সন্দেহ আছে, সেই সকল সন্দেহচ্ছেদনে আপনি কুঠারস্বরূপ; শত্রুবর্গেরও শোকভয় নাশ আপনা হইতে হইয়া থাকে। আমি আর এ সম্বন্ধে অধিক কি কহিব, আমার শ্রোতব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু আছে কি না, জানি না। যদি থাকে তো আপনি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তোমার এখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে; সুতরাং শ্রোতব্য আর কিছুই তোমার নাই। যাহা প্রাপ্তব্য বিষয়, তাহা পাইয়া তোমার বুদ্ধি এখন কৃতার্থ হইয়াছে, তুমি এক্ষণে আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছ। বলিব কি, নিজেই তুমি একবার অনুভব করিয়া দেখ দেখি;

আত্ম তোমার আত্মাকে তুমি কি প্রকারে উপলব্ধি করিতেছ? আর শ্রোতব্য বিষয়ে তোমার অবশিষ্টই বা কি আছে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আমার অনুভব হইতেছে, আমি কৃতার্থ, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও শান্ত হইয়াছি; কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার আর নাই। বক্তব্য সকলই আপনি বলিয়াছেন। শ্রোতব্য সকলই আপনি শুনাইয়াছেন, জ্ঞাতব্য সকলই আমার জ্ঞাত হইয়াছে। আপনার বাক্য সফল হইল। এখন আপনি বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। প্রাপ্তব্য বা জ্ঞাতব্য কিছুই আমার আর অবশিষ্ট নাই। জীব ও ব্রহ্মের যে একটা পার্থক্য বোধ ছিল, সে বোধ আমার এখন নাই। একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া সকলই আমার জ্ঞান হইয়াছে। দৃশ্যভেদে আমার যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। আমি বিশেষরূপে বিচার করিয়াছি; তাহাতে সংসারের প্রতি আমার যে একটা আস্থা ছিল, তাহা আর এখন নাই।

ত্র্যধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিক দ্বিশততম সর্গ।

—•:•—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! মদীয় যুক্তিময় বাক্য পুনরপি শ্রবণ কর। দেখ, যদি বারম্বার মার্জ্জনা করা যায়, তবে দর্পণ সাতিশয় পরিষ্কার হইয়া থাকে। জানিয়া রাখ, রূপ ও নাম ভেদে দৃশ্য দুই প্রকার; রূপ বলিতে অর্থ, আর নাম বলিতে শব্দ পাওয়া যায়। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যভেদে শব্দার্থও আবার চতুর্ব্বিধ; মনে কর, যেমন একটী গাভীর নাম ভদ্রা; সেই ভদ্রা চঞ্চল, তাহার বর্ণ নীল; এ স্থলে গাভী শব্দের—জাতি, ভদ্রা শব্দের—দ্রব্য ও চঞ্চল শব্দের অর্থ ক্রিয়া; আর সেই গাভীর যে নীলবর্ণ, তাহা তাহার গুণ। এই ক্ষেত্রে এই যে ভেদকল্পনা হইল, ইহা সেই একই গাভীতে হইতেছে। কেন না, এখানে প্রকৃত পক্ষে বস্তুচতুষ্টয় নাই। কাজেই শব্দার্থ আর কিছুই নহে; উহা জ্ঞানের একটা সঙ্কেতমাত্র।

সেই জ্ঞানের মূল কি?—ভ্রান্তি। সুতরাং অর্থ যথার্থ পক্ষে অকিঞ্চিৎ; উহা যদি অকিঞ্চিৎই হয়, তবে শব্দও জলপাতধ্বনিবৎ ব্যর্থ হইয়া একই পদার্থে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ বিচারালোচনা দ্বারা যৎকালে শব্দার্থরূপ নামরূপ মার্জ্জিত হইয়া যায়, তখন এই দৃশ্য জগৎও চিদাভাসে পরিণতি প্রাপ্ত হওয়ায় স্বপ্নপ্রায় হইয়া পড়ে। এই প্রকারে জাগ্রতের মিথ্যাত্বে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েরও মিথ্যাত্বই হইয়া পড়ে। বিশদার্থ এই যে, স্বপ্নে যাহা দেখা গিয়াছিল, তাহাই সংস্কারের মুখে স্মৃতিরূপে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা ভিন্নাকারে প্রত্যয়গোচর হইলেও একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহে। সুনির্ম্মল চিদাকাশে স্বপ্ননগরীর ন্যায় প্রতীতিলভ্য হইয়া রূপযুক্ত হইলেও বস্তুগত্যা উহা রূপবর্জ্জিত। এই যে ত্রিজৎ, ইহাও জানিবে—সেইরূপই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কিরূপে এই পৃথিবী সম্পন্ন হইল? কিরূপে পর্ব্বত, কিরূপে জল, কিরূপে পাষাণ, কিরূপে তেজঃ, কিরূপে ক্রিয়া, কিরূপে বায়ু, কিরূপে শূন্য এবং কিরূপেই বা চিদাকাশ সম্পন্ন হইল? এ সকল আমি যদিও বুঝিয়া লইয়াছি, তথাচ আমার বোধবৃদ্ধির জন্য পুনরপি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, স্বপ্নে তোমার দৃষ্টিতে যে পুরী দৃষ্ট হয়, তাহাতে পৃথ্বী কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে? অপিচ আকাশ, জল, পাষাণ, তেজ, দিক্, কাল ও ক্রিয়া এ সকলই বা কিরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে? স্বপ্নের পুরী, তাহাতে এ সমুদায় সম্ভবপর হয় কিরূপে? ইহার কারণ কি, প্রকাশ করিয়া বল দেখি! সেই পৃথিবী প্রভৃতির নির্ম্মাণ, দাহন, আনয়ন, উৎপাদন বা প্রকাশন—কেইবা করিয়া থাকে? উহার স্বরূপ কি, কার্য্যই বা কি? বল দেখি?

রামচন্দ্র কহিলেন,—কেবল আকাশই এ জগতের স্বরূপ; অত্রত্য ক্ষিতিভূধরাদি কিছুই সৎ নহে। এই স্বপ্নস্বরূপ জগতের আকার বা আস্পদ কিছুই নাই। তবে ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? ইহা কেবল আকাশই; ইহা নিরাকার ও নিরাধার। যাহার আকার নাই, তাহার আধারে আবশ্যক কি? বস্তুগত্যা জগদভিধানে কোন কিছুই সম্পন্ন হয়

নাই। তবে এই জগৎস্বরূপে যে কিছু প্রতিভাসমান হইতেছে, তাহা চিত্তেরই স্বপ্নবৎ মনোরূপে অবস্থিতি। এই যে দিক্, কাল ও পর্ব্বতাদি, সকলই চিদাকাশ মাত্র। দ্রবভাব হইতে কাঠিন্যে পরিণত হইয়া জলই যেমন পাষাণাকারে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি সম্বিৎ আকাশভাব উপগত হইয়া আকাশাকারে অবস্থান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথ্বী প্রভৃতি কিছুরই অস্তিত্ব নাই; দৃশ্যভাবও কোথাও কিছুই নাই; তবে এ সকল কি? সকলই একমাত্র সেই অনন্ত চিদাকাশ। প্রশান্তপয়োধির তরল জল যেমন এক হইয়াও আবর্ত্ত, ঊর্ম্মি ও ফেনাদিরূপে নানাকার হয়, তেমনি চিদাকাশও পরমাত্মায় এক হইয়াও নানাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। চিৎ আপনাকে কঠিনরূপে জ্ঞান করিয়া পর্ব্বতভাব ধারণ করিয়া থাকেন। আবার তিনি যখন আপনার শূন্যতাজ্ঞান করেন, তখন আপনাকে শূন্য আকাশ বলিয়াই পরিজ্ঞাত হন। এইরূপে তিনি দ্রবত্বজ্ঞানে আপনাকে জল, স্পন্দজ্ঞানে পবন এবং ঔষ্ণ্যজ্ঞানে বহ্নি জ্ঞান করেন। পরন্তু ঐ ঐরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের সময় তিনি স্বীয় চিৎস্বরূপতা পরিত্যাগ করেন না। এই গগনস্বরূপ চিৎপদার্থের স্বভাবই এই যে, উনি কারণের অভাবেও উক্তপ্রকারে প্রকট হইয়া থাকেন। আকাশে শূন্যতা এবং সমুদ্রে সলিল ব্যতীত যেমন অন্য কিছুই নাই, তেমনি ঐ চিদাত্মা বিনাও জগতের আর সার কিছুই নাই। 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ভাবসমষ্টিও চিদাকাশ বিনা সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং শান্তভাবে অবস্থিতি করাই কর্ত্তব্য। এই দেখুন, আপনি এই গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন বা সঙ্কল্প বলে যেমন গিরি ও বহ্নি প্রভৃতি দূরস্থ বস্তুরও প্রত্যক্ষজ্ঞানে সমর্থ হন, তেমনি নিরাকার চিদাকাশও সঙ্কল্পের প্রভাবে আকার দর্শন করেন। সৃষ্টির যখন উপক্রম, তখন চিদাকাশ দেহাকারে প্রত্যভিজ্ঞায়মান হন। বাস্তবপক্ষে দেহের যখন একান্তই অভাব, তখন চিৎই কারণ বিনাও অসত্য অজ্ঞান নিবন্ধন দেহাকারে সমুদিত হন। এই বিষয়টার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। মনই কি, বুদ্ধিই কি, অহঙ্কারই কি, ভূতই কি, পর্ব্বতই কি, আর দিক্‌ই কি, সকলই সেই একমাত্র চিদাকাশ বৈ কিছুই নয়। পাষাণের অভ্যন্তর প্রদেশ যেমন নিস্পন্দ, তেমনি সেই চিদাকাশ নিস্পন্দস্বরূপ।

এইরূপ বিচার দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, কিছুই উৎপন্ন বা নষ্ট নহে। একমাত্র সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যথাবস্থ জগৎস্বরূপে স্ব স্ব ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই জগদ্‌ভান ভানই নহে; পরমার্থতঃ বিচার করিয়া দেখিলে ইহা শূন্য চিদাকাশই। অজ্ঞ জনের উদ্দেশে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, আমি তত্ত্বজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের কথাই কহিতেছি। তাঁহার ধারণা—এ জগৎ শূন্য চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে।

চতুরধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিক দ্বিশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এই পরমাকাশই স্বপ্নে যেমন, জাগ্রদ্দশাতেও তেমনি দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহাবসর নিশ্চয়ই কিছুই নাই। পরন্তু ভগবন্! দেহবিরহিতা চিৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন-দশায় সদেহা হন কিরূপে? এ সম্বন্ধে আমার মহাসন্দেহ বিদ্যমান। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা নিরাশ করিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—জাগ্রৎই কি, স্বপ্নই কি, সর্ব্বাবস্থায়ই দৃশ্যপদ আকাশময়; উহা আকাশ হইতে আবির্ভূত এবং আকাশ উহার আধার। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সর্ব্ববস্তুর কারণতাবর্জ্জিত পরব্রহ্মে সৃষ্টির আদ্যাবস্থা হইতেই ক্ষিতিপ্রভৃতি কোন ভূতের সম্ভাবনা নাই। দেহের গঠন ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতপঞ্চকে হয়; কিন্তু ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই যখন অলীক, তখন দেহের অস্তিত্বও তো নাই। কেবল চিদাকাশের স্বরূপই প্রতিভান প্রাপ্ত হইতেছে। চিদাকাশের যে স্বরূপবিকাশ, তাহাই স্বপ্নবৎ এই আকারাভাস অবলোকন করিয়া থাকে। যেন তাহাতেই সাকার ও আকুল হইয়া পড়ে। চিদাকাশের বিকাশই স্বপ্নভান এবং সেই বিকাশই জগদাকার; চিদাকাশের অভ্যন্তরে আকাশবৎ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপের মধ্যেই স্বপ্ন ও জগৎ ইত্যাকাররূপ বিরাজমান। চিদাত্মাই রূপভেদের

কল্পনাকারী; তিনিই এই অনন্ত স্বভাব বিকাশবশে ক্ষিতিপ্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার কল্পনা করেন। চিদ্‌ভানকেই স্বপ্ন বলা যায় এবং উহাকেই জগদাখ্যায় অভিহিত করা হয়। চিতের ভাব কি? চিৎস্বরূপই চিদ্ভান। তাহার স্বরূপ আকাশ; উহার নাশ কখনই নাই। আকাশে যেমন অনন্ত শূন্যতা আছে, তাহার যেমন ইয়ত্তা নাই, তেমনি ব্রহ্মাকাশেও যে কত ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি আছে ও লয় পাইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। বস্তুতঃ ঐ সৃষ্টিপ্রবাহ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্; উহা ব্রহ্ম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—গুরুদেব! এই যে সংখ্যাতীত সৃষ্টিবৃত্তান্ত, ইহা আপনি পূর্ব্বেও বলিয়াছেন। তৎকালে এ সকল কথা বিশেষরূপেই আপনার মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল। আপনি বলিয়াছিলেন,—কোন কোন সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডাকাশের অন্তরালে অবস্থিত; কোন সৃষ্টি অসীম অনন্ত; কোন কোন সৃষ্টি আকাশোপরি অধিষ্ঠিত; উহাতে পিপীলিকাদলবৎ সুসংলগ্ন উর্দ্ধাধোবর্ত্তী দেবদৈত্য-মানবাদি সকলেই মনে করে যে, আমরাই উপরিভাগে অবস্থান করিতেছি। বাস্তবিকই ঐ সকল সৃষ্টির ভূভাগ-নিম্নতল উপরে আর উপরিভাগ নীচে আছে। এই নিমিত্ত দেখিবামাত্র তত্রত্য প্রাণিবৃন্দ উর্দ্ধপদে ও অধোমস্তকে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। আর যে সকল বন ও পর্ব্বত, তৎসমস্ত অধোমুখে লম্বমান। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিবৃন্দ মাত্র বায়বীয় দেহ ধারণ করে; কোন কোন সৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নাই। এমনও অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে যে, তত্রত্য জীবদেহ আকাশময়, আবার এমনও অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, যাহা কেবল কৃমিকুলেই পরিব্যাপ্ত, কোন কোন সৃষ্টি আকাশ-কোষের অভ্যন্তরে বিরাজিত এবং কোন সৃষ্টি আকাশে বিহঙ্গমবৎ অবস্থিত। হে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বরেণ্য! ভবদুক্ত ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড যাদৃশ, তাহা আপনি বিশেষভাবে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বর্ণন করিতে হয় তাহাই; দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হয় তাহাই এবং শ্রোতাকেও শুনাইতে হয় তাহাই,—যাহা কখন দেখা যায় নাই, কুত্রাপি শুনা যায় নাই বা যাহা কখন হয়ই নাই। কিন্তু বলিব কি, তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা দেব ও

মুনিগণ শাস্ত্রগ্রন্থে শত শত রূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই শাস্ত্রবর্ণিত বিষয় সকল তোমারও অজ্ঞাত নাই। তোমার যাহা জানা আছে, শাস্ত্রের বর্ণনাও সেইরূপই; তাহা বৈ শাস্ত্রে অধিক কিছুই নাই; অতএব আমি আর এখন ইহার বিষয় বর্ণন করিব কি?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডাকারে সম্পন্ন হইলেন কিরূপে? তিনি এইরূপে থাকিবেনই বা কত কাল? ইহার পরিমাণই বা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ব্রহ্মের আদি-অন্ত নাই। অব্যয় তিনি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই বিশ্ব এই সেই অনাদি অনন্ত অব্যয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশেরই বিবর্ত্ত। এই নিমিত্ত এ বিশ্বের আদি অন্ত নাই। সেই পরম চিদাকাশের স্বতই যে স্বস্বরূপে বিকাশ, তাহাই এই বিশ্ব আখ্যায় অভিহিত। অতএব নিজেই তিনি বিশ্ব, এরূপ কথা বলা ভ্রমের কার্য্য। স্বপ্নে যেমন নগর দর্শন, তেমনি সেই চিদাকাশের যে নগরবৎ ভান, সেই ভানই এই বিশ্ব। এ সম্বন্ধে কঠিন পাষাণময় পর্ব্বত, দ্রবময় জল, শূন্যময় অম্বর এবং কল্পনাত্মক কাল, এ সমুদায়ের কিছুই ব্রহ্মে নাই। নিজের চিৎস্বভাব প্রযুক্ত ঐ অব্যয় ব্রহ্ম যাদৃশাকারে চেতিত হন, তাদৃশভাবেই পর্ব্বতাদিবৎ প্রতীত হইয়া থাকেন। যাহা শিলা নহে, তাহাও যেমন স্বপ্নে শিলারূপে প্রতিভাত হয়, আবার অনকাশই যেমন আকাশ বলিয়া জ্ঞান হয়, জানিবে—চিন্ময় ব্রহ্মে দৃশ্য প্রপঞ্চের যে অবস্থিতি, তাহাও সেইরূপই। শান্ত নিরাকার চিৎ স্বপ্নের ন্যায় স্বীয় চিৎস্বরূপের যে অনুভব করেন, সেই অনুভবই জগদাখ্যায় অভিহিত হয়। বাস্তব পক্ষে তাহা কিন্তু আকারহীন। বায়ুর অভ্যন্তরে স্পন্দ থাকে, সে স্পন্দ যেমন বায়ুরূপেই অবস্থিত, তেমনি ব্রহ্মপদে এ জগৎ ব্রহ্মরূপেই বিরাজমান। ইহার ক্ষয়োদয় কিছুমাত্রই নাই। যেমন জলে দ্রবত্ব, আকাশে শূন্যত্ব ও বস্তুতে বস্তুত্ব, ব্রহ্মেও তেমনি এ জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে জগতের আবির্ভাব বা তিরোভাব—কারণ নাই বলিয়াই নাই। অথচ ব্রহ্মপদে এ জগৎ নাই, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। তাহাতেই ইহা আছে, এ কথাই বা বলি কেমন করিয়া? সেই ব্রহ্ম আদি-বর্জ্জিত, আকার-বিরহিত,

নিরাভাস ও চিদাকাশ; সৃষ্টিপ্রবাহের কারণ তিনি কখনই হইতে পারেন না। সুতরাং অবয়বীর অবয়ব, অবয়বী হইতে যেমন অপৃথক্, নিরবয়ব ব্রহ্মাকাশেও এ জগৎ তেমনি আকাশরূপেই বিরাজমান। সকলই একমাত্র অনাময় শান্ত জ্ঞানস্বরূপ; ইহাতে সত্তা, অসত্তা বা নানা কিছুই বিদ্যমান নাই। যিনি সেই অনাদি অনন্ত অজ অব্যয় শান্ত ব্রহ্মাকাশ, তিনিই সঙ্কল্প-কল্পিত বা স্বপ্নদৃষ্ট নগরবৎ সর্ব্বরূপে বিরাজিত। যিনি নির্ম্মল কমনীয় পরম চিদাকাশ, তাঁহার যাহা সারভূত স্বরূপ—তাহাই চিৎস্বভাব হইতে ভ্রান্তি-ক্রমে যথাযথ আকারে প্রতিভাত পাইয়া থাকে, স্বকল্পিত মায়ার বশে তাহাই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জগদাকারে পরিজ্ঞাত হয়।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিক দ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কারণ বিনা এই জগদ্ভাব বস্তুতঃ কিছুই নহে; ফলে ব্রহ্মপদার্থই ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজিত। হে প্রশস্তমতে! এক্ষণে শ্রবণ কর,—কোন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত এ বিষয়ে আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। এই পৃথিবীমণ্ডলে কুশদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত দ্বীপ আছে। উহা বলয়াকারে অবস্থিত। ঐ দ্বীপের দুইদিকে দুই সমুদ্র; উহার পূর্ব্বোত্তর কোণে এক সুবর্ণময়ী পুরী; তাহার নাম ইলাবতী। সুবর্ণপুরী ইলাবতীর সুবর্ণময় ভূভাগ হইতে যে কিরণপুঞ্জ ঊর্দ্ধদিকে নিঃসৃত হইয়া শোভা পায়, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তাহা যেন একটা সুবর্ণস্তম্ভ;—যেন গগন ভেদ করিয়াই ঐ স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। সেই পুরীর পূর্ব্বদিকে এক রাজা রাজ্য করিতেন; তাঁহার নাম প্রজ্ঞপ্তি; এ জগতের নিখিল লোকই সেই রাজার প্রতি অনুরক্ত। বলিতে কি, তিনি যেন স্বর্গভূমিতে অপর ইন্দ্র বলিয়াই মনে হইত।

এক দিন কোন কারণবশতঃ আমি সেই রাজার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও পুষ্পাদি দ্বারা আমার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর উপবেশনান্তে কথা প্রসঙ্গে সেই রাজা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—যখন সমস্ত সংহার হওয়ায় অখিল কারণ ক্ষয় পাইয়া যায় এবং পর্য্যবসানে একমাত্র সেই শূন্য পরমাকাশই থাকেন, তখন এমন কি মৌলিক কারণ থাকে, যাহাতে পুনঃসৃষ্টি হয়? অপিচ সেই সৃষ্টির সহকারী কারণই বা কোথায় কিরূপ থাকে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আরও এক কথা, এই যে জগৎ দেখা যায়, এটাই বা কি? ইহার সৃষ্টি-সংহারাদিই বা কিরূপ? এই জগতের মধ্যে দেখা যায়, কোন দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোন স্থান আকাশময়, আবার কোন কোন স্থানে বা আকাশের উপরও সমুদ্র; ইহার কোন অংশ কৃমিকীটকুলে পরিব্যাপ্ত, কোন কোন স্থান আকাশকোষের অন্তরালে বিরাজিত, এবং কোন কোন স্থান পাষাণোদরে নিহিত; এইরূপ যে নানা বৈচিত্র্য, ইহারই বা কারণ কি? ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতপঞ্চক এবং সেই ভূতপঞ্চকময় চতুর্ব্বিধ জীবজাতি, ইহারাই বা বাস্তবিক কি? অপিচ ঐ জীব-জাতির আধ্যাত্মিকাদি বুদ্ধিই বা কেন উৎপন্ন হইয়া থাকে? এতৎসমস্তের কর্ত্তা বা দ্রষ্টাই বা কাহাকে বলা যায়? এই সকলের মধ্যে যে আধারা-ধেয়তা, তাহাই বা কি প্রকার? এ জগতে মহানাশ একেবারে কখনই হয় না, ইহাই কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়-কাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্রের মত। পরন্তু সেই সেই প্রাণিপুঞ্জের কৃত পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে নিয়তই এই জগদ্ব্যবহার প্রবর্ত্ত-মান। যদি এইরূপই নিশ্চয় হয়, তবে তো প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারের স্থায়ই অনুভব হইয়া পড়িবে। অতএব সেই সংস্কারকেই কি দেহাদির কারণ বলা যাইবে? না—অপর কাহাকেও দেহাদির কারণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? যদি আপনার মতে ভাবনাই কারণ হয়, তবে সেই ভাবনাকে নিত্য বা নশ্বর, কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? যদি বলেন, উহা অনশ্বর, তবে তো তাহা কূটস্থচৈতন্য হইয়াই দাঁড়ায়; দেহাদির বিকার তা হ'লে তাহাতে হ'তেই পারে না। আর যদি বলেন—নশ্বর, তাহ'লে তাহার একটা উৎপত্তি স্বীকা-রের আবশ্যক হয়, আর সেই উৎপত্তিরই বা কারণ কি হইয়া দাঁড়ায়? ফলে

সেরূপ কারণ তো কিছুই দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য অর্থাৎ মাতা পিতা প্রভৃতিকে দেহাদির কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, আমার জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, এই জম্বুদ্বীপে যাহারা দেহ ত্যাগ করে বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরে, তাহাদের স্বর্গ-নরক-ভোগার্থ দেহ কিরূপে উদ্ভূত হইবে? মরণ হইবার পর স্বর্গ-নরক ভোগার্থ যে দেহ প্রাদুর্ভূত হয়, ইহা অবশ্যই অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে যে সেই দেহোৎপত্তি, তাহা তো মাতা-পিত্রাদি কৃত নহে। অতএব কোথা হইতে তাহার উপস্থিতি? সেই দেহের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ বলিয়াই বা কাহাকে বলা যায়? ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই দেহাদির আকারে পর্য্যবসিত হয়, এ কথা বলিলে, ইহারও তো যৌক্তিকতা দেখি না; কেন না, ধর্ম্মাধর্ম্মের মূর্ত্তি নাই। যাহার মূর্ত্তি নাই, সে কিরূপে মূর্ত্তিমান্ দেহ হইয়া দাঁড়াইবে? মাতাপিত্রাদি নিমিত্তের অসম্ভাবনা বলিয়াই কি স্বর্গ-নরকভোগ-মগ্ন দেহের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্মকে কারণ বলা যাইবে? না, অপর কোন কারণ বলিবেন? যদি এমন কথা বলেন যে, মাতাপিত্রাদিই দেহের কারণ, তা ছাড়া দেহোৎপত্তি হইবার নহে, এ কথা বলায় তো সিদ্ধান্ত এইরূপই হইয়া দাঁড়ায় যে, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কর্ত্তার পরলোক নাই। আমার মতে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নাই। কেন না, এই বর্ত্তমানে যে জন্ম, এই জন্মই পূর্ব্ব জন্মের পরলোক বলিয়া গণনীয়। যদি ইহা না বলা হয়, তবে নিখিল বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হইয়া দাঁড়ায়। আর একটা জ্ঞাতব্য এই যে, এক দেশে রাজা, অন্য দূরদেশে তাঁহার প্রজা; হঠাৎ কোন কারণে রাজাদেশ প্রচারিত হইল। এই আদেশের সহিত ইচ্ছা, চেষ্টা বা কোন সম্বন্ধসম্পর্ক নাই; ইহা মূর্ত্তিবর্জ্জিত অথচ ইহার দ্বারা প্রজার বধবন্ধাদি দণ্ড হইতেছে! এই ব্যাপারেই বা যুক্তি কি আছে? এক স্থানে এক পাষাণময় স্তম্ভ আছে, দেবগণ বর প্রদান করিলেন, হঠাৎ তাহা সুবর্ণময় হইয়া উঠিল, এই ব্যাপারেই বা যুক্তি কি? বিধিনিষেধ সকল অচেতন; তাহারা প্রয়োজনসিদ্ধিরূপ নিমিত্ত বিনাই প্রবর্ত্তিত হইয়া কতক কতক অংশে প্রচারিত, কতক কতক অংশে বা অপ্রচারিতভাবে আছে। এইরূপ হইবারই বা কারণ কি? এই সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন! হে ভগবন্! এই জগৎ অগ্রে অসৎ থাকিয়া

পরে সম্পন্ন হইয়াছে; ইত্যাদিরূপ অর্থ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিরই বা সঙ্গতি বলা যায় কিরূপে? মুনীন্দ্র! সৃষ্টির যখন উপক্রম, তখন শূন্যাকাশ হইতেই বা কিরূপে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়? আপনি যদি এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, আকাশেরই ঐ প্রকার শক্তি আছে। তাহ'লে বলিব—আকাশ তো অনন্ত; সেই অনন্তাকাশ হইতে আরও অনেক ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় না কেন? আর ওষধিনিচয়ের স্ব স্ব বীজোৎপাদিকা শক্তি আর অগ্নিপ্রভৃতির যজ্ঞাদি স্বভাবই বা কোথা হইতে আসিল? হে মুনিবর! আমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি আপনি যেরূপ জানেন, সেইরূপই বিবৃত করুন। আমার আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য আছে, শুনুন। কোন ব্যক্তির কোন শত্রু গিয়া বাসনাফলদায়ক প্রয়াগাদি পুণ্য-ক্ষেত্রে তদীয় মৃত্যুকামনায় প্রাণ পরিহার করিল, ঐ সময়েই ঐ ব্যক্তির কোন বন্ধু উল্লিখিত পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া যাহার মৃত্যুকামনা করা হইয়াছে, তাহারই জীবন কামনা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। এ ক্ষেত্রে একইকালে একই ব্যক্তির মরণ ও জীবন কামনা সাফল্য লাভ করে কি করিয়া? আরও এক কথা, বহু ব্যক্তি একই সময়ে এইরূপ কামনা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল যে, আমি আকাশের পূর্ণচন্দ্র হইব। তপস্যার ফলে সকলেরই সে কামনা সিদ্ধ হইল, সকলেই চন্দ্রভাব উপগত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ স্থলে আকাশ বহু চন্দ্রশালী হয় না কেন? আরও একটা জিজ্ঞাস্য এই যে, বহু ব্যক্তি একই রমণীকে পত্নীরূপে ধ্যান করে; ধ্যানের ফলে সে রমণী সকলেরই পত্নী হয়; কিন্তু একেবারে ঐ রমণী স্বীয় পূর্ব্ব স্বামীর গৃহে তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মচারিণী, তপঃফলে সেই ধ্যানকারীদিগের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী সাধ্বী এবং বহুজনভোগ্যা বলিয়া অসাধ্বী হয় কিরূপে? একাকিনী রমণী কিরূপে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন গৃহে তাহাদের পত্নী হইয়া থাকিবে? যদি বলেন, এ সমস্ত স্বীকার্য্য নহে, তা'হলে ওদিকে আবার ধ্যানের ফল মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। আমি গৃহ হইতে এক পদও বহির্গত হইব না; অথচ আমি সপ্ত দ্বীপের অধিপতি হইব। এরূপ বিরুদ্ধ বাসনা বর ও অভিশাপ প্রভাবে যদি সিদ্ধি লাভ করে, তবে একই গৃহের অভ্যন্তরে সপ্তদ্বীপের ঐশ্বর্য্য ভোগ কিরূপে সম্ভব হয়? আরও কথা এই—দানই কি,

ধর্ম্মই কি, তপস্যাই কি, ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মই কি, সকল কর্ম্মের ফলই হইল অদৃষ্ট; সেই অদৃষ্ট কর্ম্মক্ষয় প্রদেশে উৎপন্ন হইবে, এইরূপই যদি নিয়ম থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহকালে উক্ত প্রকার দানধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া লোকান্তরে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় কিরূপে? অদৃষ্ট পদার্থটা তো মূর্ত্ত দেহেই ফলপ্রদ হইবে। ঐহিক মূর্ত্ত দেহ পরলোকে অবশ্য যায় না; পরন্তু ইহ লোকেও যে কোন একটা ফল হইবে, তাহাও দেখা যায় না। ব্যবহারী জীব ও অদৃষ্ট উভয়েই যথায় মিলিত হয়, সেইখানেই তাহার ফল ফলে, ইহকালের যে অদৃষ্ট, তাহা তো কর্ম্মজনিত; উহা পরকালে আসিয়া ব্যবহারী জীবে মিলিত হয়। সেই নিমিত্তই তথায় ফলভোগ হইয়া থাকে। আপনার বক্তব্য এরূপ হইলে বলা যায় যে, তাহা হওয়া অসম্ভব। কেন না, একই মূর্ত্তি ব্যবহারী জীব ইহ-পর উভয় লোকে থাকিবে, এরূপ সম্ভব নহে। এ দেশের বা একালের যে শরীর, তাহা ভিন্নদেশে ভিন্নকালে কিরূপে থাকিবে? তাই বলিতেছি, ঐহিক মূর্ত্তজীবের যে কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট ফল, তাহা পরকালে হয় কিরূপে? এই সমুদায় অসঙ্গত ঘটনার সঙ্গতি ঘটন কিরূপে হইয়া থাকে? হে মুনীন্দ্র! স্বকিরণে চন্দ্রমার সান্ধ্য অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় আপনি শান্তিময় স্বচ্ছ উপদেশ প্রদানে মদীয় উক্ত সংশয়রাশি নিরাস করিয়া দিন। পরমাত্ম সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা দূরীকরণে উভয় লোকেরই হিতবিধান করা হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে তাদৃশ হিতই সম্পাদন করুন। আমার জানা আছে, সাধুজনসমাগম কাহারই কখন ব্যর্থ হইবার নহে। সেই জন্য ভবদাগমনে আমার বিপুল আশা হইয়াছে।

ষড়ধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৬ ॥

সপ্তাধিক দ্বিশততম সর্গ।

—:*:—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—নরপতে! আপনার সমস্ত কথারই যথাযথ উত্তর বাক্য আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভবদীয় সর্ব্বসংশয় যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই স্পষ্ট করিয়া উত্তরগুলি প্রদত্ত হইবে। এই শুনুন, এ জগতের অখিল বস্তুই ভাবনার বলে সর্ব্বদা সৎ ও অসৎ হইয়া উঠে। ফল কথা, সত্য ভাবনায় সৎ হয়, আর অসত্য ভাবনায় অসৎ হইয়া পড়ে। যথায় 'ইহা এইরূপ', ইত্যাকার ভাবনার প্রতিফলন হয়, তাহা সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, সেই ভাবনার অনুরূপ হইবেই হইবে। কেন না, ভাবনার বা সম্বিদের স্বভাবই এই প্রকার। যাহা হউক, এই যে ভাবনার কথা কহিলাম, উহা হইতেই দেহ ভাবিত হয়। এই ভাবনার প্রভাবেই ভোক্তৃ পুরুষ দেহবান্ হইয়া থাকে। ঐ ভাবনা বা সম্বিৎ দেহকে আত্মরূপেই ভাবনা করিয়া লয়। অনন্তর সেই দেহ সম্বিদভিব্যক্তি অনুভব করে। ফল কথা এই যে, সে নিজে আত্মা হয় আর সম্বিৎকে স্বীয় ধর্ম্ম করিয়া তোলে। এই নিমিত্তই লোকে স্বপ্নে এবং জাগ্রদবস্থায় দেহকেই জ্ঞাতা বা চেতয়িতা বলিয়া অবগত হয়, এবং তাহা ভিন্ন অন্য এক সম্বিদকে উল্লিখিত চেতয়িতার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এই জন্যই বিদিত হওয়া যায় যে, যাহা ভ্রান্তিরূপিণী সম্বিৎ তাহাই দেহভাব, আর তদিতর দেহভাব নাই। কোন কারণেরই সম্ভাব-সম্ভাবনা-বিরহে সৃষ্টির উপক্রমে জগদ্ভাবভাবিত কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা, চিন্ময় আত্মাই জগদ্ভাবে প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা আত্মারই স্বপ্ন; তদ্ভিন্ন ইহাকে আর কিছুই বলা যায় না। এইভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিলে, সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, ব্রহ্মনামক নির্ম্মলজ্ঞানই জগদাকারে প্রতিভাত। তা ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। অবিকারস্বভাব ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিরাজিত। কি বেদশাস্ত্রে, কি সুধীসমাজে, কি অন্যান্য আধ্যাত্মজ্ঞানমূলক মহাগ্রন্থে, সর্ব্বত্রই উহা প্রমাণিত এবং আমাদের সকলেরই ইহা অনুভবসিদ্ধ। জগতের নিত্য জ্ঞানময়ত্ব নিখিল প্রাণীর অনুভবসিদ্ধ ও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত। যাহারা ইহার অপলাপ

করিয়া বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুভব ও তাহাকে প্রমাণীকৃত করত এই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সম্বিৎ নিত্য নহে ; জ্ঞান জড় দেহ হইতেই উদ্ভূত , সুতরাং তাহা জড় ধর্ম্ম, তাহারা নিশ্চয়ই মোহমগ্ন হইয়া অন্ধকূপ-মণ্ডূকবৎ অজ্ঞ ও উন্মত্ত ; তথাবিধ মূর্খদিগের সহিত আমাদের আলাপও অবৈধ। অজ্ঞ উন্মত্ত আর জ্ঞানী অনুন্মত্ত, এতদুভয়ের আবার পরস্পর কথোপকথন কি প্রকার ? যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহার উপদেশ শুনিলে সর্ব্ব-সন্দেহ নিরস্ত হয়, মূর্খজনের বাক্যালাপ তাঁহার সহিত কি সম্ভবপর হয় ? যে মূঢ় লোক প্রত্যক্ষ বিষয়কেই প্রমাণ বলে, অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে প্রমাণ-রূপে অঙ্গীকার করিতে চাহে না ; সুতরাং বেদোক্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, অভিজ্ঞ জন তাহার কথা কর্কশ, অশ্রদ্ধেয়, হেয় এবং একান্তই যুক্তিবর্জ্জিত বলিয়া প্রতিপাদন করেন। সমস্ত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকটই তথাবিধ মূঢ়বুদ্ধি অন্ধকূপমণ্ডূক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ এই যে, ঐ মূঢ় লোক পূর্ব্বাপর বিচারবুদ্ধি বর্জ্জন করে ; বর্ত্তমান যাহা প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহা লইয়াই সে থাকে। তাহা ছাড়া তাহার আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। যাঁহারা বেদ জানেন, তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহা-দের নিকট জিজ্ঞাসিয়া দেখিবেন, তাঁহারাও আমারই ন্যায় স্বানুভববেদ্য তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ দিবেন। ইহাতেই একেবারে অখিল সন্দেহ দূরী-ভূত হইয়া যাইবে। আদ্য আত্মচৈতন্যেরই শরীরে পরিণতি হয় ; এরূপ হইলে শবদেহ চেতনাবান্ না হইবার কারণ কি আছে? এই প্রকার আশঙ্কা যাহার উপস্থিত হয়, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কহি-তেছি শুনুন। বুঝিয়া দেখুন, আপনি স্বপ্নাবস্থায় একটা নগর দর্শন করি-তেছেন ; আপনার এই যেরূপ নগরদর্শন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার বেশধারী পরব্রহ্মও সঙ্কল্পবলে সেইরূপ যে নগর নিরীক্ষণ করেন, তাহারই নাম এই জগৎ ; বস্তুগত্যা বিচার করিলে এ জগৎ সর্ব্বদার জন্যই সেই সত্য চিৎস্বরূপে বিদ্যমান। স্বীয় স্বপ্নদৃষ্ট নগরে যেমন চেতন ভ্রম নাই, তেমনি শবাদি জড় পদার্থেও চেতনভ্রম হওয়া অসম্ভব। নিজে নিজে স্বপ্ন নগর দেখা যায়, তাহাতেও যেমন দিক্, শৈল ও পৃথ্বী প্রভৃতি অনুভূতিগোচর হয় ; ফলের বেলায় সে সকল চিন্ময় পরমাকাশ বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই

যে শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগরী—বিশাল জগৎ অবস্থিত, ইহাও ফলে সেই চিন্ময় পরমাকাশই। আপনি যেমন আপন সঙ্কল্প-কল্পিত নগরাভ্যন্তরে যে যে বিষয়ের ভাবনা করেন, সেই সেই বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকেন, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা স্বীয় সঙ্কল্পকল্পিত জগতে যে যে বিষয়ের সঙ্কল্প করেন, তাহাই তাঁহার অনুভূতিগম্য হইয়া থাকে। ভবদীয় সঙ্কল্প নগরে আপনি যাহার সঙ্কল্প করেন, তাহাই তো প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগর এই যে জগৎ, এখানেও সেইরূপই হয় নিশ্চয়ই। এই জন্য হিরণ্যগর্ভ দেহভেদে যে স্পন্দাস্পন্দ কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবদেহে স্পন্দ আর মৃত দেহে অস্পন্দ, এই যে নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎকর্তৃক অনুভবও অবিকল সেইরূপই করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পকল্পিত জগৎ মহাপ্রলয়াবধিই বিদ্যমান; তাহার পর অখিল কারণের অবসানে দ্রব্য পর্য্যন্তেরও বিলয় হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রহ্মারও এই সময় বি-মুক্তি ঘটে; তদীয় স্মৃতি পর্য্যন্তও লোপ পাইয়া থাকে। এখন আপনার এই প্রশ্ন যে, ইহার পর দ্রব্যহীন ব্রহ্ম কোথায় দ্রব্য পান, আর কি দিয়া জগৎ বিরচন করেন? শুনুন তবে আমাদের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাতে আপনার এ প্রশ্ন আমাদের অনুকূলই হইয়াছে। কেন না, আমাদের কথা এই যে, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তাহা ভিন্ন দ্রব্যরূপ জগৎ আর একটা কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, আকাশ-রূপী ব্রহ্ম আপনা হইতে অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রতিভাত হন—হইয়া নিজ আকাশরূপকে জগদাকার সঙ্কল্পনগররূপে জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেমন মাত্র চিৎস্বরূপই সঙ্কল্পনগররূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি চিৎস্বরূপের বিকা-শই অকারণে জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। দেহ থাকুক, আর যাউক, যেখানেই চিদাকাশ, সেইখানেই উহা আপনার স্বরূপকে দ্বৈতা-দ্বৈতময় জগদাকারে জ্ঞান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর চিদাকাশ স্বপ্নপুরী বা সঙ্কল্পনগরবৎ জগৎ দর্শন করে। জীবিতই কি, আর মৃতই কি, সকলের নিকটই এই জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পৃথ্ব্যাদিময় না হইলেও পৃথ্ব্যাদিময়ের ন্যায় প্রতিভান প্রাপ্ত হয়। প্রবুদ্ধ বা জাগরিত জনের প্রত্যক্ষ যে জাগ্রদ্দশা, তাহাতে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট দেশকালের প্রতীতি

হয় না, পরলোকগত ব্যক্তির নিকট ঐহিক দেশকালও তেমনি কিছুই প্রত্যয় হয় না। এই জগৎ স্পষ্টতঃ অনুভূত হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট ইহা অপ্রতীয়মান; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি ইহা নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সুপ্ত ব্যক্তির তাহা যেমন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তেমনি পরলোকগত ব্যক্তিবর্গের নিকট চিদাকাশই সৃষ্টি-রূপে বিভাত হইয়া থাকেন। আকাশ-পর্ব্বত প্রকৃত পক্ষে ক্ষিত্যাদিময় না হইলেও যেন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষিত্যাদিময় হইয়া রহিয়াছে। পরলোকগত ব্যক্তির নিকট ইহাই প্রতীত হয়, আমি মরিয়াছি, নরকাদি ভোক্তৃদেহি-রূপে উৎপন্ন হইয়াছি, এই যমলোকে আগমনপূর্ব্বক এক্ষণে শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। জীবের পরলোক প্রাপ্তির পর এইরূপ ভ্রান্তিই উপস্থিত হয়। যাহারা মুক্তির উপায় অন্বেষণ করে না, সে দিকে অবহেলা করিয়াই সর্ব্বদা কালাতিপাত করে, তাহাদিগেরও এ মোহ বিদ্যমান। তবে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বাসনারে বর্জ্জন করিয়াছেন, এ মোহ তাঁহাদের নিবৃত্তি পায়। অজ্ঞ জনের যে বৈধাবৈধ কর্ম্ম বিষয়ে অনুভব, তাহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনা; ফলে আকাশেই তাহা আকাশরূপে অবস্থিত। পরে তাহাই জগৎস্বরূপে প্রত্যয়গোচর হয়। এই জগৎস্বরূপ যদিও শূন্যরূপী, তথাচ ইহা অসৎস্বরূপ নহে। ইহা ব্রহ্মাখ্য চৈতন্যরূপেই প্রতীত। ইহার অনর্থরূপে পরিণতি কেবল অজ্ঞানবশেই হয়। এ তত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহা সেই পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মমাত্রেই।

সপ্তাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ভূপতে! মূর্ত্তিবর্জ্জিত অসঙ্গত রাজনিদেশের বশে দূরস্থিত প্রজা কিরূপে শুভাশুভ ফল ভোগ করে? এক্ষণে আপনার এই প্রশ্নেরই উত্তর করিতেছি, শুনুন; ব্রহ্মই যখন দৃশ্যবোধে দৃশ্য হন,

আর ব্রহ্মবোধে ব্রহ্ম হন, তখন জগৎও তাদৃশবোধে ব্রহ্মের সঙ্কল্পনগর হওয়া অসম্ভবপর নহে। সঙ্কল্পনগরে যৎকালে যাহা সঙ্কল্পিত হইবে, অনুভবও অবিকল সেইরূপই তখন হইয়া দাঁড়াইবে। এই ভবদীয় সঙ্কল্পময় ভবনের প্রজা যেমন ভবদীয় সঙ্কল্পানুসারে সুসম্পন্ন, ব্রহ্মের সঙ্কল্পময় জগতেও প্রজা তেমনি ব্রহ্মসঙ্কল্পানুসারে নিষ্পন্ন। তপঃপ্রভাবশালী মুনিগণের বিশুদ্ধ সম্বিৎ যেমন বর ও শাপদানে সমর্থ হয়, যাহা ব্রহ্মসম্বিৎ, তাহাও অবিকল সেইরূপই হইয়া থাকে। ব্রহ্মের যেমন যেমন সঙ্কল্প হয়, সেই অনুসারেই তপস্বিগণের বর ও শাপ-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রজাগণ ব্রহ্মের কল্পনাপ্রভাবেই বৈধাবৈধ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। এ জগৎ পূর্ব্বে দেহীদিগের অনুপলব্ধিগোচর ছিল, তাই তখন ইহা অসৎ আর পরে উপলব্ধিগোচর হইয়াছিল, তাই ইহা সৎ হইয়া রহিয়াছে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই এ জগতের সত্তা; আর তাঁহার বিকাশই সৃষ্টি ও নিমেষই লয়।

রাজা প্রজ্ঞপ্তি কহিলেন,—হে ভগবন্! এ জগৎ যদি ব্রহ্মসঙ্কল্পেই সৎ হয়, তবে সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে ইহা উপলব্ধ না হইবার কারণ কি? জাগ্রৎ ও সৃষ্টিকালেই বা ইহার উপলব্ধি হয় কি জন্য? অপিচ এ জগৎ সর্ব্বদার জন্য অস্থির এবং বিকারী, ইহা সুস্থিরভাবে প্রতীয়মান হয় কেন? ইহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মায়াময় চিদাকাশের যাহা সঙ্কল্পনগর, তাহার স্বভাবই এই প্রকার যে, স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশায় প্রকাশ পাইয়া প্রলয়, সুষুপ্তি বা মোক্ষফলের উপস্থিতিতে ক্ষণমধ্যেই তাহা অদৃশ্য হইয়া থাকে। চিদাত্মায় এই সৃষ্টিপরম্পরা বালসঙ্কল্প-কল্পিত নগরীবৎ কিম্বা নীল নভস্তলে প্রতীত কেশগুচ্ছাদিবৎ সৎ ও অসদাকারে উপলভ্যমান হয়। আপনি যেমন সঙ্কল্পনগর নির্ম্মাণ করেন, ক্ষণমধ্যে তাহার বিনাশ করেন, এবং ভবদীয় স্বভাব যেমন সেই সঙ্কল্পনগরের প্রলয়সঙ্কল্পে বা অন্য কোন সঙ্কল্পে পরিস্ফুরিত হয়, জানিবেন—তেমনি চিদাকাশের কল্পনাময়ী পুরীর যে উন্মেষ ও নিমেষ, তাহাই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাববিকাশ। এই নিমিত্ত এই ত্রিভুবনাকাশ যদিও সম্বিদ্ঘনমাত্র, তথাচ ইহা অনাদি-অনন্ত ব্রহ্মাকাশমাত্রই। কেন

না, সেই ব্রহ্মাকাশ নিজেই জগৎস্বরূপ; তাই উক্ত সঙ্কল্পকর্ত্তা যাহা সঙ্কল্প করেন, তাঁহাই অনুভব করিয়া থাকেন। ঐ নিরাবরণ চিদাত্মার শত শত দূরে শত শত যুগের প্রথমে যাদৃশ সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহা আজও পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ ও যেন বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায়ই কার্য্যকর হইতেছে। চিদাত্মা নিরাবরণ এবং একাদ্বয়; তাই ভিন্নদেশীয় বা অতীতকালীয় ঘটনাপরম্পরা প্রত্যক্ষানুভব করিয়া থাকেন। যেমন স্বচ্ছ মণিতে অন্য প্রকার প্রভার পতন ও তিরোধান স্পষ্টানুভব হয়, তেমনি চিৎস্বরূপ মণিতে এ জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুভূত হইয়া থাকে। সুনিয়ম দ্বারা সমাজবন্ধনই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কর্ম্মের এই ফল, এই এই প্রকার নিয়মনিচয় জীবসমূহের ভাবনাময় হইয়া থাকে বলিয়া মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালেও তাহা ফলপ্রসূ হয়। পরন্তু যিনি সেই চিন্ময় ব্রহ্ম, তাঁহার অস্তোদয় কখনই নাই। সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মচৈতন্য পরিস্ফুরিত হইতেছে। উক্ত চিদাত্মার যে কল্পনা, তাহাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব উপগত হইয়া যৎকালে সঙ্কল্পনগরে পর্য্যবসানঘটনায় জগদাকারে প্রতিভাসমান হয়, তখনই উহা জগদাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার ঐ ব্রহ্মচৈতন্য যখন নিজের ঐ জগদ্ভাব স্ফূর্ত্তির সংহারসাধনান্তে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন ঐ চিদাকাশস্থ ব্রহ্মচৈতন্য শান্ত বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন। যেমন স্পন্দ এবং অস্পন্দ এই দুইটি বায়ুর স্বভাব, তেমনি জগদ্ভাবে স্ফুরণ-অস্ফুরণ এই উভয়ই উক্ত আত্মার অক্ষয় অচ্ছ স্বভাব। স্বীয় কল্পনাময়ী পুরীতে যেমন জরা-মরণধ্বংসী ওষধি সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন করিয়া কল্পনা করা হয়, তেমনি ব্রহ্মও স্বসঙ্কল্পনগর—ত্রিলোকাভ্যন্তরে সঙ্কল্পপ্রভাবে ওষধিপ্রভৃতি পদার্থপুঞ্জের বিভিন্নস্বভাব নিয়মিত করিয়াছেন। বালক যেমন ক্রীড়াসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিবার, তাহা এককালে কল্পনা করিয়া রাখে, তাই প্রত্যহ ক্রীড়াকালে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া অথবা তৎসদৃশ অন্য কোন ক্রীড়াবস্তু লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, এই সঙ্কল্পনগরের যিনি সঙ্কল্পকর্ত্তা, তিনিও তেমনি সঙ্কল্প করিয়া রাখেন; পরে সঙ্কল্পের গুণে তাহাই চিরপ্রথিত হইয়া দাঁড়ায়। চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম যাহা যাহা সঙ্কল্প করিবেন, তাহাই তৎস্বরূপে শীঘ্র প্রতিভাত হইবে, ইহাই তাঁহার

স্বভাব। এই নিমিত্ত সঙ্কল্পকল্পিত পদার্থপরম্পরা একমাত্র চৈতন্যময় হইলেই নানারূপে নানাপ্রকার ও নানাস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে কিছু সঙ্কল্পকল্পিত পদার্থ আছে, তাহাতেই ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজ করেন। সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচৈতন্য যথায় যে ভাবে আছে, তাহা সেইভাবেই প্রতিভাত হইতেছে। এই অনাদি অমধ্য অনন্ত ব্রহ্ম অকিঞ্চিৎ হইলেও কিঞ্চিৎ এবং অসত্য হইলেও সত্যস্বরূপ। নিখিল প্রাণিবর্গ—নিখিল বস্তুপরম্পরা, যথায় যাদৃশরূপে সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্ম বিরাজিত, তদ্রূপেই তিনি প্রকাশ প্রাপ্ত হন।

অষ্টাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত॥ ২০৮॥

নবাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে একই পুরুষের জীবন ও মরণ কামনা করিয়া কোন শত্রু ও মিত্র প্রাণ পরিহারপূর্ব্বক কিরূপে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, ভবদীয় এতৎপ্রশ্নের উত্তর এখন শুনিতে থাকুন। সৃষ্টির প্রারম্ভেই হিরণ্যগর্ভ স্বীয় সঙ্কল্পনগরাধিকারী জীবসমূহের পুণ্যক্ষেত্রাদিতে জীবন বা মরণ পুণ্যকর্ম্মেরই ফলস্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং যাহার যেরূপ কামনা, ফলও তাহার অবিকল সেইরূপই। ব্রহ্মা স্বীয় সঙ্কল্পনগরাধিকারী জীবের ইষ্ট-সাধনোদ্দেশে কল্পনাক্রমে প্রয়াগাদি পুণ্যভূমি ও স্নান-দানাদি অপরাপর পুণ্যকর্ম্মের ফল নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন; তাই অধিকারী ব্যক্তি তদীয় নিয়মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক যেরূপ কর্ম্ম করে, ফল পাইতে সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য মহাপাপী ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসহকারে প্রয়াগাদি পুণ্যক্ষেত্রে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই পুণ্যক্ষেত্রে মরণনিবন্ধন ক্ষেত্রমাহাত্ম্যপ্রভাবে সে তাহার অর্জ্জিত পাপ নষ্ট করিয়া পরে নিজেও নষ্ট হইয়া থাকে। অন্যদিকে তদীয় পূর্ব্বকৃত পাপভাগ অল্প আর পুণ্যক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ফল যদি অধিক হয়, তবে তাহার সেই পুণ্য পাপপ্রশমন-

পূর্ব্বক আপনা হইতে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই সুফলপ্রদ হয়। হে রাজন্! যথায় শাসনাই পাপীর সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রে কৃত কর্ম্মের পুণ্য তুল্যমূল্য হয়, তথায় পাপ-পুণ্য উভয়েরই তুল্যবলত্ব-বশতঃ কেহই কাহাকে নাশ করিতে পারে না; অতএব পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ভোগ নিমিত্ত সেই অধিকারী ব্যক্তির শরীরদ্বয় এবং সেই শরীরদ্বয়ের দুইটী চিদা-ভাস ভ্রমজ্ঞানবৎ পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। এইরূপে ব্রহ্মের সঙ্কল্প নিমিত্ত পাপ-পুণ্যের ফলরাশি প্রাদুর্ভূত হইতেছে। উক্ত চিৎ পদার্থকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ঐ ব্রহ্মই কমলযোনি ব্রহ্মা; এই ব্রহ্মাই 'তুমি,' 'আমি' ইত্যাদি নানাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। উক্ত ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম যেভাবে থাকিবেন, তৎসঙ্কল্পিত জগৎও অবিকল সেইরূপই হইবে। পাপীর যেমন নরকাদি ভাবনা উপস্থিত হয়, বিধাতার সঙ্কল্পানুসারে পুণ্য-ক্ষেত্রকৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগও স্বপ্নবৎ সেইরূপই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে পুণ্যাপুণ্যের ফল অনুভব করে আর পাপাত্মার ভাবনা হয়,—এই আমি মরিলাম, এই আমার বন্ধুবর্গ রোদন করিতেছে, আমি একাকীই এই পরলোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। পাপীদিগের বন্ধুবর্গের ভাবনাও আবার ঐরূপই হইতে থাকে। যৎকালে অতি উৎকট পাপ বা পুণ্য সঞ্চয় হয়, তখন অধিকারী পুরুষেরা চিৎকল্পনার বশে অপরের অলক্ষিতক্রমে মহাত্মগণের নিগ্রহ বা অনুগ্রহদৃষ্টিতে কুফল বা সুফল পাইয়া থাকে। অতি বড় পুণ্য ও পাপের প্রকর্ষে আপনাকে যে মৃত ভাবনা করে, তদীয় বন্ধু-বর্গও তাহাকে তেমনি মৃত অচেতনভাবে পতিত শবাকারে সন্দর্শন করে। অপিচ তাহারা সে জন্য রোদন করে এবং বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে লইয়া তদীয় দাহাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। আর একই পুরুষের স্নেহ ভাবনা-রূপী বন্ধু তদীয় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিলে, সে আপনাকে জরামরণবর্জ্জিত অদুঃখিত বলিয়া অনুভব করে। সেই যে উপস্থিত দেহ, তাহাতেই সে স্বীয় জীবনসত্তা উপলব্ধি করিতে থাকে। অপিচ সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কোন শত্রু প্রয়াগে গিয়া যদি তাহার মরণকামনাপুরঃসর দেহত্যাগ করে, তাহ'লে সেই সময়েই সে পুণ্যক্ষেত্রে তদীয় শত্রুর পুণ্যপ্রভাবে অন্য এক অদৃশ্য দেহে আপন মরণ অনুভব করিতে থাকে। তৎকালে শত্রুকৃত

অভিচারক্রিয়ার প্রতিকার ভাবনা সে করেনা; কেবল মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজের মৃত্যুই ভাবিতে থাকে। কিন্তু সেই মৃত্যুভাবনাগ্রস্ত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ তখন সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুবর্জ্জিত জীবিত বলিয়াই দর্শন করে, এই প্রকারে একই লোক ঐকই সময়ে আপনার জীবন মরণ দুই অবস্থাই উপলব্ধি করিয়া থাকে। ফলে এই সমস্ত জগৎই যখন ভ্রমপরিপূর্ণ, তখন ইহার আভ্যন্তরিক ঘটনাপরম্পরা লইয়া আর বিরোধ কি, আর তাহাদের সঙ্গতিই বা কি? এই জগৎটাই যখন একটা ভ্রম-মাত্র, তখন ইহার বিরোধী কি না হইবার সম্ভাবনা? ভ্রমের পর ভ্রম তাহার পরও তো কত ভ্রম বিদ্যমান। সঙ্কল্প বা স্বপ্ন অবস্থায় যে নগরভ্রম অনুভবগম্য হয়, এই জাগ্রতস্বপ্নের ভ্রম তদপেক্ষা কম নহে।

রাজা প্রজ্ঞপ্তি কহিলেন,—ভগবন্! দেহ জ্ঞানের প্রতি ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম কিরূপে কারণ হয়? দেখুন, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কাহারই তো মূর্ত্তি নাই; কিন্তু দেহ হইল মূর্ত্ত পদার্থ; অমূর্ত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপে তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়? এই বিষয়টি আমার নিকট বিশেষ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে প্রশস্তবুদ্ধে! এ জগৎ ব্রহ্মার সঙ্কল্পনগর; যাহা সঙ্গত বা সত্য না হয়, এরূপ ইহাতে কি আছে? সঙ্কল্পনগরে কিছুরই যেমন অসম্ভবপরতা নাই, ব্রহ্মকল্পনাপুরী—এ জগতে তেমনি কোন কিছুই অসম্ভবপর নহে। সঙ্কল্পকলিত নগরে কিম্বা স্বপ্নদৃষ্ট পুরে একই বস্তু লক্ষ লক্ষ বস্তু হইয়া পড়ে; তা যদি না হইবে, তবে দেখ একই ব্যক্তি স্বপ্নে সৈনিকভাব লাভ করে, সে-ই সহস্র হইয়া পুনর্ব্বার একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই যে স্বপ্নসৈনিক, তাহাই পরবর্ত্তিকালে পুনর্ব্বার এক সুষুপ্ত হইয়া পড়ে। এই সম্বিদাকাশময় অনুভবস্বরূপ জগতে সঙ্কল্পে বা স্বপ্নকালে যে সঙ্কল্পিত বা স্বপ্নাবলোকিত সৈনিকানুভব হয়, এ অনুভব সঙ্কল্পের বা স্বপ্নভঙ্গের পরেও কাহার না হইয়া থাকে? সুতরাং চিদাকাশের সঙ্কল্পস্বরূপ এ জগতে কিই বা সম্ভবপর? আর কিই না অসম্ভবপর? ফলে সকলই সম্ভব হইতে পারে, আবার কোনও কিছু সম্ভব হইতে নাও পারে। স্থূল কথা, এই যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, সকলই ভ্রান্তি মাত্র। একমাত্র উজ্জ্বল আকাশময় সকলই; ইহাতে না সৎ না অসৎ কিছুই নাই। যাহা

যাহা যেরূপে যেরূপে ইহাতে অনুভূত হইবার সম্ভাবনা আছে, যিনি তত্ত্বদর্শী প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহার নিকট তাহা সেই সেইরূপেই প্রতিভাত হইতে পারে। তত্ত্বদর্শীর নিকট অসঙ্গত কিছুই নাই। ইহলোকে যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে অন্তে স্বর্গধামে গিয়া লোকে সুধাময় ভূধর প্রাপ্ত হয়। এইরূপ শাস্ত্রবাণীর উপর নির্ভর করিয়া উল্লিখিত ফলকামনায় যে ব্যক্তি ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করে, তাহার অবশ্যই স্বর্গবাস হয়; সেখানে গিয়া সে সুধাময় ভূধর নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। যদি এ প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ব বোধ হয়, তবে ঐহিক কর্ম্মের পারত্রিক ফল-ভোগাদি নিয়মও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই জগতের সমস্ত বস্তুই যদি সত্য হইত, আর তাহাতে বিরোধ দেখা যাইত, তাহা হইলেই ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, এইরূপ বলা যাইতে পারিত; পরন্তু সঙ্কল্পের বশে অখিল দ্রষ্টাই যখন চিদ্ভার হইতে প্রকট হইয়া নিজ নিজ কল্পনায় দৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, তখন সঙ্গতই কি, আর অসঙ্গতই বা কি আছে? এই নিমিত্তই আমরা স্বপ্ন ও সঙ্কল্পসিদ্ধ বস্তুর অনুভবক্রমেই এই জাগ-তিক অনুভবের কথা কীর্ত্তন করিয়াছি। কেন না, ব্রহ্মস্বরূপাবস্থ চিতেরই এ জগৎ সঙ্কল্পমাত্র। ভবদীয় সঙ্কল্পনগরে অসম্ভব যেমন কিছুই নাই, যিনি সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহারও সঙ্কল্পনগরে তেমনি কোন প্রকার অসম্ভব কিছুই নাই। এই ব্রহ্মসঙ্কল্পভূত জগতে যেরূপে যাহার কল্পনা হইবে, তাহার উপস্থিতি স্বভাবতঃ সেইরূপই হইবে। এতদন্যথা কোন ক্রমেই হইবে না। কেন না, যে পর্য্যন্ত ভিন্ন কল্পনার না উপস্থিতি হয়, সে পর্য্যন্ত কল্পিত বস্তুর বিদ্যমানতা পূর্ব্বকল্পনারূপই থাকে। এই নিমিত্তই যে পর্য্যন্ত না মহাপ্রলয়োদয় হয়, সে পর্য্যন্ত সৃষ্টির আদ্যা-বস্থায় ব্রহ্মসঙ্কল্পে এ জগৎ যেমনটী হইয়াছিল, তেমনটীই থাকিয়া যায়। মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে অন্যবিধ সঙ্কল্পে আবার অন্য প্রকার হইয়া পড়ে। প্রতিজীবের চৈতন্যে প্রতি স্বপ্নে যেমন বিভিন্ন স্বপ্নপুরী আপনা হইতেই প্রতীতিলভ্য হয়, তেমনি প্রত্যেক কল্পে সঙ্কল্পস্বরূপ জগৎ আপনা হইতেই প্রতিভান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগৎস্বরূপ সঙ্কল্প-নগরে অসম্ভবপরতা কিছুরই নাই। এ জগৎ চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র

নহে। তাই বলিতেছি, ভূপতে! এই সমুদায় জগৎই আপনি ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন।

নবাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

দশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

—:০:—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভূপতে! তুমি এইরূপ একটা প্রশ্ন করিয়াছ যে, আমি অক্ষয় পূর্ণচন্দ্র হইব। এই প্রকার কামনায় শত লোকে ধ্যান করিল, আর ধ্যানের প্রভাবে তাহারা সকলেই পূর্ণচন্দ্রভাব প্রাপ্ত হইল। তখন আকাশ কেন শত পূর্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণ হয় না? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষণে শ্রবণ কর। আমি চন্দ্র হইব, এইরূপে যাহারা চন্দ্র-বিষয়ক ধ্যান করে, তাহারা ধ্যানের প্রভাবে চন্দ্রভাব লাভ করত ভাবান্তর ভুলিয়া সুস্থির হয়। তবে তাহারা এ আকাশে ঐ ভাব লাভ করে না, বা আকাশের ঐ চন্দ্রেও লব্ধপ্রবেশ হয় না। আপন আপন সঙ্কল্পবলে নিজকে চন্দ্র বলিয়া অবধারণ করে মাত্র। যে সঙ্কল্প করে, সঙ্কল্পনগরে অভীষ্ট লাভ সে-ই করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া একের সঙ্কল্পনগরে অন্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা কখনও বলিতে পারেন কি? ঐ চন্দ্র-সঙ্কল্পকারীদিগের স্ব স্বসঙ্কল্পিত চন্দ্রসমূহ সেই সেই সঙ্কল্পকর্ত্তারই সঙ্কল্প-কল্পিত জগদাকাশে অক্ষয় পরিপূর্ণতম হইয়া কিরণ বিকিরণ করিতে থাকে। সে দৃশ্য অপরে দেখিবে সাধ্য কি? আমি আকাশের চন্দ্রে প্রবিষ্ট হই, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যদি কেহ ধ্যান করে, তবে সে ঐ চন্দ্রেই প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। সে নিশ্চয়ই চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশানন্তর সুখভাগী হইয়া থাকে,—যে এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে ধ্যান করে যে, আমি চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করিব। অনপায়িনী সম্বিৎ যেরূপ স্বভাবের অনুসরণ করে, দৃঢ় নিশ্চয় থাকিলে অবিকল সেইরূপ অনুভবই তাহার হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ ধ্যানকর্ত্তার ধ্যানবৈভবে যে সাধ্বী রমণী

তাহাদের ভার্য্যা হয়, সেই কল্পনাজনিত ভার্য্যাকারে যে অনুভব, তাহাও তাহাদের অন্তঃকরণোপহিত সাক্ষিচৈতন্যেই ঐরূপে হইয়া থাকে। জীব গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না, অথচ তাহার সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য হওয়া চাই; এক্ষেত্রে তাহার ঐ ঐশ্বর্য্য লাভ নিজ গৃহাকাশেই কল্পনার বশে হয়। এই অখিল দৃশ্যই সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার কখনা জন্ম; এই জন্য সকলই শূন্য, সকলই অপ্রতিঘ এবং সকলই শান্ত; অবস্থা যখন এইরূপ, তখন উল্লিখিত উপাসকসম্প্রদায়ের কল্পিত জগৎ কখন কি রূপান্তরিত হইতে পারে? কখনই না; অতএব ইহাতে কি সঙ্গতি আর কিই বা অসঙ্গতি? ইহলোকে যাগ, তপ, জপ ও শ্রাদ্ধাদি নিরাকার কার্য্য করা হইল, পরলোকে তাহার সাকার ফল কিরূপে কেন হয়, তাহা এখন বলি শুনুন। জীব ইহকালে দানাদি সৎকর্ম্ম সকল করে; তাহার হৃদয়ে এরূপ ধারণা সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে যে, আমি শুভ কর্ম্মের শুভ ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইব। ঐরূপ ধারণা থাকে বলিয়াই মরণান্তে নিরাকার হইলেও চিৎশক্তিবলে মূর্ত্তি কল্পনাপুরঃসর স্বপ্নবৎ মূর্ত্তকর্ম্ম-ফল অবলোকন করিয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা কিন্তু কিছুই নহে। জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ ভ্রান্তির বশেই চৈতন্য মনের সহযোগিতায় কার্য্যকারী কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ যুক্তভাবে স্পন্দ ও অস্পন্দস্বরূপ হন। যৎকালে ভ্রান্তি চলিয়া যায়, তখন নির্ম্মল চৈতন্যই মাত্র অবশেষে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম-সঙ্কল্পময় জীব ইহলোকে অনুষ্ঠিত দানাদি কর্ম্ম সম্পাদনান্তে পরলোকে চৈতন্যপ্রতিভাসকেই তৎফলরূপে লাভ করিয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রাদেশের সাফল্য নিশ্চয়ই। সংসার কল্পনাত্মক; এখানকার অকৃত্রিম কল্পনারূপ দানফল বা অদানফল পরলোকে যে সিদ্ধি লাভ করিবে,তাহাতে বিরোধ তো কিছুই দেখা যায় না। হে রাজন্! আপনার জিজ্ঞাস্য সমস্ত বিষয়েরই আমি উত্তর প্রদান করিলাম, পুনর্ব্বার সংক্ষেপতঃ আমার বক্তব্য এই যে, জানিবেন—এই যে অখিল জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা চৈতন্যেরই কল্পনা মাত্র, ইহাতে প্রতিঘ বলিয়া কিছুই একটা নাই।

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! চৈতন্য বিদেহ, তৎকৃত এই দেহ-কল্পনার প্রতিভান হয় কিরূপে? দেহ বিনা চৈতন্যের প্রতিভান

অসম্ভব কথা। এ অবস্থায় তৎকল্পিত দেহের প্রতীতি কিরূপে হয়? চতুর্দ্দিকে যদি ভিত্তির অভাব থাকে, তবে দীপপ্রভার প্রকাশ হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মতিমন্! দেহ শব্দের যে অর্থ আপনি অবগত হইয়াছেন, তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির নিকট সে অর্থ আকাশে পাষাণ-নর্ত্তনবৎ অলীক মাত্র। তাঁহারা বুঝেন, ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ, দেহশব্দেও সেই একই অর্থ। জল আর অম্বু এই দুইটা শব্দের যেমন আর্থিক পার্থক্য কিছুই নাই, তেমনি ব্রহ্ম ও দেহ শব্দের অর্থগত পার্থক্যের সম্পূর্ণ অভাব। ঐ দেহ স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান; বস্তুতঃ কিন্তু ব্রহ্মই। কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্যই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান দেহরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। ফলতঃ তাহা স্বপ্ন নয়। যাহা স্বপ্ন, তাহা আপনারই অনুভূত বিষয়। এই নিমিত্ত স্বপ্নদৃষ্টান্ত প্রকাশপূর্ব্বক আপনাকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইলাম। বাস্তবপক্ষে এ জগৎ চিৎস্বরূপেই প্রতিভাসমান; যাহা স্বপ্ন, তাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ফল কথা, এ দেহ কি? আর যে স্বপ্নপদার্থ বা স্বপ্নবুদ্ধি, তাহাই বা কাহার হইবে? এই স্বপ্ন ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াই তত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা; তাঁহারা আরও বুঝেন যে, অজ্ঞকে বুঝাইতে গিয়া এই ভ্রান্তিদৃষ্টান্তের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, তাঁহাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন বা সুষুপ্তি এতত্রয়ের কিছুমাত্রই নাই। তবে এই যাহা কিছু প্রতিভান পাইতেছে, এতৎসমস্তই আকাশ; প্রণবের তুরীয়াংশে সমস্তই পর্য্যবসিত। এক্ষণে যাহা প্রতিভাত হইতেছে বা পূর্ব্বে যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল, বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন প্রভৃতিও কোন কিছুই নাই। যাহা আছে, সমস্তই সুনির্ম্মল ব্রহ্ম। জ্ঞান যখন এক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তর বিষয়ীকৃত করে, তৎকালে পূর্ব্ব বিষয়ের পরিহার ও পরবিষয় পরিগ্রহের পূর্ব্বকাল, এই কালটুকুর মধ্যে তাহার যাদৃশ আকার পরিস্ফুরিত হয়, এই দ্বৈতাদ্বৈত যে কিছু প্রতিভান পাইতেছে, সকলই সেই তাদৃশ আকারের জ্ঞানস্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানী বুঝেন, দ্বৈতাদ্বৈত বা শুভাশুভ সকলই চিন্ময়মাত্র। তাঁহার মতে নিরাবরণ চিদাকাশের সহিতই ইহার উপমা সঙ্গত হইয়া থাকে। কি শূন্য, কি অশূন্য, কি

দ্বৈত, কি ঐক্য, কি সৎ, আর কি অসৎ, সকলই পরম চিদাকাশ। যিনি পূর্ণ অপেক্ষাও পূর্ণ, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজিত। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেই এ জগতের অবস্থিতি। স্ফটিকোপলের ঘন মধ্যভাগের ন্যায় ইহা প্রতিভাত বা অপ্রতিভাত কিছুই নয়। যাহা চিদ্বিকাশ, তাহাই জগৎ, এই নিমিত্ত চিদাকাশ অপ্রতিঘ; যথায় যথায় চিদাকাশের বিদ্যমানতা, সেই সেইখানেই জগৎসত্তা। চিদাকাশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; এই জন্য সকলই জগন্ময়। জগৎ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাও সেই শান্ত ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নয়। এই হেতু এই বিশ্ব যে ভাবে অবস্থিত,সেইরূপেই অনাময়রূপে চিরতরে বিরাজ করিতে পারে। কারণ, অনিন্দ্যস্বরূপ ব্রহ্ম চিৎসঙ্কল্প নগরাকারে প্রতিভান পাইতেছেন। ইহাই বটে সম্যক্ যুক্তি। ইহাতে অন্যবিধ যুক্তির সম্ভবপরতা নাই; যে সকল শ্রোতা পুরুষার্থ-লাভে সমুৎসুক, তাঁহাদের নিকট অযৌক্তিক বা অনুভববিরুদ্ধ কথার অবতারণা করা কোনক্রমেই সুসঙ্গত নহে। লোকব্যবহারে বা বেদাদিশাস্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, বলিতে হইবে, তাহাই প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ও সুসিদ্ধ। বেদাদিশাস্ত্রে ব্রহ্মই সৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, আর এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ সকলই অসৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমার কথাও ইহাই। সুতরাং আমার এ কথার হেয়ত্ব কোনক্রমেই হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহাকে পূর্ব্বে বদ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছেন, জানিলে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইবেন। তৎকালে এই বিশ্ব বিলয় পাইয়া এক সেই ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হইবে। ভবৎসমীপে অদ্য যাদৃশ যুক্তি প্রদর্শিত হইল, এই যুক্তি অবলম্বন করিলে জীবন্মুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই লোকবেদাদি নিখিল জগৎই যে ব্রহ্ম, ইহাও তাহাতে স্থিরীকৃত হয়। এইরূপ যুক্তিই পরমপুরুষার্থলাভের উপায়; ইহা জানিতে না পারাতেই এই সংসারতরু পরিস্ফুরিত হয়। যদি জানিতে পারা যায়, তবে সংসার চিদাকাশ হইয়া পড়ে। সেই যে অপরিজ্ঞাত বা পরিজ্ঞাত চিদাকাশ, তাহাই আমি, জগৎ, বন্ধন, মোক্ষ, ইত্যাদি রূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম উপগত হইয়াছে। উহার এই প্রকার বিভিন্ন নাম অপরিজ্ঞাত-দশাতেই হয়। চিদাকাশের পরিজ্ঞানে তাহার আর কোনই নামনিরুক্তি নাই। এই বন্ধাবন্ধ দৃশ্য যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়,

তখন ইহা লয় প্রাপ্ত হয়; কোন কিছুই থাকে না। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকটে এই দৃশ্যের অস্তিত্ব নাই। যাহা পাষাণপ্রতিম নির্ম্মল নিশ্চল, সেই চিদ্রূপেই তাঁহার স্বরূপ পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বিচারে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে কিম্বা বেদাদি আধ্যাত্মশাস্ত্রে যাহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ, তাহাই স্বানুভববেদ্য এবং তাহাই পরম পুরুষার্থরূপে ফলিত। অপর সকল বিষয় পরিহারপূর্ব্বক উক্ত স্বানুভববেদ্য চিদাকাশের নিমিত্ত প্রযত্ন করিলে নিশ্চয়ই উহা অধিগত হওয়া যায়। এ কথা সর্ব্বত্রই সুনিশ্চিত যে, বিষয়ান্তর পরিহারপূর্ব্বক একাগ্রমনে যাহার জন্য যত্ন করিবে, তাহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। মোক্ষই সত্য, তদিতর অপর লৌকিক কর্ম্ম সকলই অসত্য; এই প্রকারে মোক্ষ এবং লৌকিক, এতদুভয়ে বিশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও সাধনোদ্যমে ও ফলানুভব-ব্যাপারে মোক্ষের বা লৌকিক আচারের কুত্রাপি কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সমস্তই তুল্য মূল্য।

হে মহাশয়! ভবদীয় মহাপ্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিয়া দিলাম। অধুনা আপনি মদীয় মীমাংসিত পথে প্রয়াণ করিয়া নিরাময় ও অনাসক্ত-ভাবে সর্ব্বোন্নত পদে সমাসীন হউন।

দশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

একাদশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

—•—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি সেই ইলাবতী রাজধানীস্থ প্রজ্ঞপ্তি রাজের প্রাসাদে বসিয়া যৎকালে এই প্রকার প্রশ্নমীমাংসা করিলাম, তখন সেই রাজা আমার যথোচিত সৎকার-সপর্য্যা করিলেন। তদনন্তর আমি প্রয়োজন সাধনান্তে স্বর্গগমনের অভিপ্রায়ে আকাশপথ বহিয়া চলিতে লাগিলাম। হে প্রশস্তবুদ্ধে! সেই প্রজ্ঞপ্তি রাজার প্রশ্নের যে সকল উত্তর আমি দিয়াছিলাম, অদ্য এই স্থানে বসিয়া সে সকলই পুনর্ব্বার তোমার

নিকট প্রকাশ করিলাম। যদি এই যুক্তিগর্ভ উপদেশাবলীর অনুসরণ করিয়া চলিতে পার, তবে তুমি শান্তচিত্ত ও আকাশময় হইতে পারিবে। এই সমস্ত দৃশ্যই একাদ্বয় ব্রহ্ম, নামবর্জ্জিত নির্ম্মল আকাশমাত্র। ইহা আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত; অজ, শান্তিময়। চিতের বিকাশমাত্র বলিয়াই ইহাকে নিরূপণ করা হয়। ইহার নামান্তর কিছুই নাই। পরাৎপর ব্রহ্ম, এইরূপ নাম কেবল কল্পনা দ্বারাই ইহার করা হইয়াছে। কেন না, চিৎ হইলেন—নিজে কূটস্থ নির্ব্বিকার বস্তু; ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য বৃদ্ধিশীল অর্থ তাঁহাতে সঙ্গতই হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে নামবর্জ্জিত পরম পদ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সিদ্ধ, সাধ্য যম, ব্রহ্মা, বিদ্যাধর ও দেবসমূহের লোকনিচয়, লোকের আধার হইল কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কি সিদ্ধ, কি সাধ্য, কি যম, কি ব্রহ্মা, কি বিদ্যাধর, কি দেব বা কি অন্যান্য অপূর্ব্ব মহাত্মা, সকলেরই নিম্নে, পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকসমূহ বিদ্যমান। চূড়ালোপাখ্যানে আমি যে ধারণাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছি, তুমি তাহার সাহায্যে দেখিতে পারো তো, তোমার সকলই দেখা হইবে। সিদ্ধ লোক দ্বিবিধ; তন্মধ্যে মহ, জন, তপ ও সত্য নামে যে সকল লোক আছে, তাহারা অতি দূরে অবস্থিত। আর যে সকল সঙ্কল্প-সিদ্ধলোক, তাহা বিশ্বব্যাপী; সর্ব্বত্রই তাহার অস্তিত্ব আছে। যদি ধারণা-ভ্যাস কর, তবে তোমার দ্বিবিধ লোকই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। তোমার ধারণাভ্যাস নাই; তাই তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না। পক্ষান্তরে ধারণাভ্যাসে দেখিবারও কিছুই দেখি না। কেন না, আমাদের কল্পনা জন্য লোকও যেমন, সিদ্ধবৃন্দের সঙ্কল্পলোকও অবিকল সেইরূপই। সঙ্কল্পজনিত তরুও যেমন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সঙ্কল্পলোকসমূহও তেমনি সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। ভবদীয় সঙ্কল্প বা স্বপ্ন হইতে সমুৎপন্ন লোকনিচয় যেমন অহোরাত্র প্রতীত হয়, সেই যে সিদ্ধসঙ্কল্প লোক বা তাদৃশ অন্যান্য লোক, তাহারাও তেমনি স্থিরীকৃত হইয়া সদাই প্রতিভাত হইতে পারে। তোমার সঙ্কল্পিত লোক সকলকে তুমি যদি ধারণাস্থিরীকৃত ধ্যানের প্রভাবে সুস্থির করিতে সক্ষম হও, তবে তোমার কল্পিত যে সকল লোক, তাহারাও

স্ববাধে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার সঙ্কল্পকারী নর ধারণাভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া যদি ইচ্ছা করে, তবে সিদ্ধসমূহের ন্যায় স্বীয় সঙ্কল্পজগৎকে বিস্তৃত ও সম্পৎসমলঙ্কৃত করিতে অনায়াসেই পারে। স্বর্গাভিমুখগামী প্রাক্তন পুণ্য-পুঞ্জের বলে সিদ্ধগণ সহজেই আপনাদের সঙ্কল্প-লোক স্থিরতর করিতে সক্ষম হন। যদি লোকান্তরের সঙ্কল্প-লোক স্থিরতর করিতে হয়, তবে বহু প্রয়াসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সমগ্র জগৎই শান্ত চিদাকাশ, এই চিদাকাশকে যে ভাবে দৃঢ় নিশ্চিত করা যাইবে, ইনি সেইরূপেই প্রতিভাত হইবেন। এ ব্যবস্থার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। সঙ্কল্প বিনা প্রতিভান প্রাপ্ত কিছুই হয় না। তৎকালে আছে কি নাই এরূপ তর্কের বিষয়ীভূত কিছুই থাকে না। সকলই শূন্য, সকলই অপ্রতিঘ এবং সকলই শূন্যাকাশরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুদৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা যাহার প্রতিভান হয়, বস্তুতঃ তাহা চিৎস্বভাবেরই স্ফুরণমাত্র। সঙ্কল্প বিনা চিৎস্বভাবের স্ফুরণ কোথাও নাই। কার্য্য-কারণভাবে চিৎস্বভাবের স্ফুরণ হউক না কেন? এ কথা উত্থাপন করিলে তদুত্তর ইহাই যে, এ ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ-ভাবের কথাই কিছু নাই, কেবল একমাত্র অনন্ত আকাশই সর্ব্বত্র বিরাজ-মান। ইহাতে আবার উৎপন্ন হইবার কি আছে? তবে যাহা উৎপন্নের ন্যায় পরিস্ফুরিত হয়, তাহা অন্য কিছুই নহে; সে কেবল আকাশেই আকাশের প্রতিভান; সে উৎপত্তিতে বাস্তবপক্ষে কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অতএব একত্ব বা দ্বিত্ব কল্পনা কিরূপে হইবার সম্ভাবনা? সেই নির্ব্বিকার আকাশ যেমন ছিল, তেমনই আছে। স্বপ্নাবস্থায় আকাশই অচলবৎ প্রতিভাত হয়। সঙ্কল্পকালে চিত্তই পর্ব্বতাকারে সমুদিত হয়, বস্তুতঃ তাহা না পর্ব্বত, না আকাশ, কিছুই নহে। এই যেরূপ, ব্রহ্মও অবিকল সেই-রূপেই জগদ্ভাবধারী। মহাজ্ঞানশালী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যবহার-পরায়ণ লোকের ন্যায় প্রতীতিগম্য হইলেও কাষ্ঠপুত্তলিকা হেন নিশ্চলভাবেই অব-স্থিত। ফলে তাঁহাদের ধারণা এই যে, আমরা করিয়াও কিছুই করিতেছি না। তরঙ্গ ও আবর্ত্তাদি নানা বিবর্ত্ত যেমন জলে প্রতিভাত হয়, সৃষ্টিসমূহ ব্রহ্মেও প্রতিভাত হয় সেইরূপই। বায়ুর স্পন্দ যেমন বায়ু হইতে এবং আকাশের শূন্যত্ব যেমন আকাশ হইতে অস্বতন্ত্র ও অমূর্ত্ত, সেইরূপ

সৃষ্টিও পরব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ ও নিরাকার। সঙ্কল্পনগরী শূন্য ও নিরাকার, তথাচ সাকারবৎ যেমন তাহার প্রতিভান, এই যে জগৎ, ইহাকেও জানিবে সেইরূপই। এই ত্রৈলোক্য চিরদিনের অনুভূত ও চিরদিন ধরিয়া যদিও কার্য্যকর হউক্, তথাচ ইহা সঙ্কল্পনগরোপম শূন্য ও নিরাকার। যেমন চিত্তসঙ্কল্প ও সঙ্কল্পিত নগর একই বস্তু, তেমনি নির্ম্মল ব্রহ্ম ও জগৎ একই পদার্থ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জগদাখ্যায় অভিহিত। এই জগৎনামধেয় পদার্থ যদিও সর্ব্বদা অনুভূত, তথাচ স্বপ্নে স্বীয় মৃত্যুদর্শনবৎ অকিঞ্চিৎ। লোকে স্বপ্নাবস্থায় মরে, মরিয়া আপন শবদেহ দাহ করিতে দেখে; ফলে কিন্তু সেই দেহদাহ-দর্শন অলীক। এইরূপ, এই যে পরব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহাও অলীকমাত্র। জগদ্ভাবই কি, আর অজগদ্ভাবই কি, সকলই সেই পরব্রহ্মেরই নির্ম্মল আকার। বাস্তবিকই এই জগৎ পদার্থ রজ্জুগত সর্প-জ্ঞানবৎ অলীক বৈ আর কিছুই নয়।

রামচন্দ্র! এই সিদ্ধ লোকেও ভোগাদিফল—মদীয় বর্ণনানুসারে কল্পনামাত্র, সত্য, কিম্বা অসত্য, যাহাই হউক, জীবন্মুক্ত যোগী পুরুষ কিন্তু উহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন না। তাঁহার ধারণায় উহা অসার অকিঞ্চিৎকর। তাই বলিতেছি, তুমিও ইহাকে অসার বলিয়া জ্ঞান কর এবং ইহার প্রতি যদি আগ্রহ থাকে, তবে তাহা বিসর্জ্জন কর। এই সমুদায় ভোগলাভার্থ অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিও না।

একাদশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্মাকাশ নিজেই নিজের চিন্ময়ভাব হইতে সর্ব্বাগ্রে আপনাকে যে 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাবিধ জ্ঞানই হিরণ্যগর্ভত্ব। এই জগৎ সেই জ্ঞানেরই মধ্যস্থ। এই অবস্থায় পরে ব্রহ্মার বা জগতের বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই। একমাত্র অজ পরব্রহ্মই পূর্ব্ববৎ যথাস্থিতরূপে বিদ্যমান। তবে কথা এই, জ্ঞানময় ব্রহ্মের যে জগদ্ভাবে প্রতিভাস, তাহা প্রতিভাসমাত্রই; বাস্তবপক্ষে মরীচিকাজলবৎ উহা মিথ্যা। তাই বলিতেছি, এ জগৎ সৃষ্টিকাল হইতে আবির্ভূত একটা ভ্রান্তিমাত্র; অথবা ইহাকে ভ্রান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; কেন না, ভ্রান্তি কোথায় কাহার হইবে? এই প্রতিভাত যাহা কিছু, তাহা তো সকলই সেই অনাময় ব্রহ্ম। জল ও আবর্ত্তের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্ম একই বস্তু; ইহাতে দ্বিত্বৈকত্ব কি? আকাশবৎ বিশাল বিস্তৃত শান্ত ব্রহ্মই চিন্ময়তাহেতু স্বান্তরস্থিত শূন্যতাকে 'আমি' ইত্যাকারে জ্ঞান করেন। বায়ু যেমন আপন স্পন্দ, অগ্নি যেমন আপন ঔষ্ণ্য এবং পূর্ণচন্দ্র যেমন আপন শৈত্য অনুভব করেন, তেমনি ব্রহ্ম আপনিই আপন সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ঐ আদি-অন্ত-বিরহিত নিরাবরণ ব্রহ্ম-চৈতন্য 'আমি' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বে কি কখন স্বীয় সত্তা উপলব্ধি করেন নাই? না—মাত্র সম্প্রতি উপলব্ধি করিতেছেন? ইহা আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বসময়ের জন্যই 'আমি' ইত্যাদিরূপ উপলব্ধি করিতেছেন। পরন্তু ব্রহ্মের ঐ 'আমি' ইত্যাদিরূপে বা শুদ্ধ চৈতন্যাকারে যে স্ফুরণ, সে বিষয়ে অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। সৃষ্টি ও অসৃষ্টি এই উভয়রূপী ব্রহ্মই সতত সর্ব্বত্র বিরাজিত। অজ্ঞদৃষ্টিই কি, আর তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টিই কি, কোথাও তো বাহ্য বিষয়ের সত্তা বা আমকাবশতঃ উক্ত ব্রহ্মাকাশের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয় না। কল্পনার বশে কি তত্ত্বজ্ঞানী, কি অতত্ত্বজ্ঞানী, উভয়ের দৃষ্টিতেই দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রতিভাস প্রাপ্ত হয়। যদি

কল্পনারে পরিহার করা যায়, তবে আর কুত্রাপি কিছুই থাকে না। পবন এবং স্পন্দ, চন্দ্র এবং শৈত্য, আকাশ এবং শূন্যত্ব, এই সকলের দুই দুই বস্তু যেমন এক, তেমনি ব্রহ্ম আর যে অহন্তাব, এ উভয়ও মিশ্রদৃষ্টিতে অপৃথক্। এইরূপে ব্রহ্মে অহন্তাবসত্তা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ইহার ব্যতিক্রম কখনই নাই। কেন না, যিনি সেই অনাদি অনন্ত নিরাময় ব্রহ্ম, তিনিই এই জগৎ।

রামচন্দ্র! তুমি একাদ্বয় পরম বোধ লাভ করিয়াছ; তথাচ আমার এই উপদেশ শ্রবণরূপ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য মদুক্ত ব্রহ্মকে যদি জগৎ ও অজগৎ এই উভয়রূপে স্বীকার করিতে চাও, কর; তাহাতে নিশ্চয়ই ক্ষতি কিছুই নাই। সুতরাং সেই মিশ্রদৃষ্টি তুমি অবলম্বন করিতে পার; পরন্তু ইহা যেন স্থির থাকে যে, পরমার্থজ্ঞানে তাহা করিয়া বসিও না। মিশ্রদৃষ্টি অবলম্বনে বুঝিতে হয়, ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ; সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে যে জীব অনুভবকর্ত্তা আছে, তাহাই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই জীবরূপে অনুভব করিতেছেন। তিনিই সতত সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বদৃশ্য উপলব্ধি করেন। যদি বিশুদ্ধ ব্রহ্মদৃষ্টি অবলম্বন করা যায়, তবে বুঝিতে হয়, কেহই কদাচ কিছু অনুভব করে না। কেবলমাত্র ব্রহ্মই বোধরূপে বিরাজমান। যেমন বৃক্ষ বা প্রস্তর কখন আকাশ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে কদাচ জগৎ উদ্ভূত হয় না। ইহা অবগত হইয়া পরম শান্তি আশ্রয় কর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার সন্দেহজাল সম্পূর্ণরূপে না ছিন্ন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান—তুমি অতি দৃঢ়ভাবে না লাভ করিতে পারিতেছ, ততকাল মদীয় উপদেশ শুনিবার জন্য ভেদদৃষ্টি স্বীকার করা তোমার পক্ষে অনুচিত হইবে না। তদনন্তর যৎকালে তুমি প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে, তখন আর তোমার কোন বিষয়েই কোন সংশয় রহিবে না। শাস্ত্রই কি, উপদেশই কি, আর ভেদজ্ঞানই কি, সেকালে তোমার কিছুই থাকিবে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ইহা আমার বুঝা হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে যাহা বলিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, মদীয় বোধার্থ পুনরায় তাহা এখন কীর্ত্তন করুন। সেই যিনি পরম পদ ব্রহ্ম, তাঁহাকে যদি অহন্তাবে ভাবনা করা যায়, তবে অগ্রে কি সম্পন্ন হয়? সর্ব্বজ্ঞ আপনি, অবশ্যই

তাহা আপনার পরিজ্ঞাত আছে। ভবদীয় বচনসুধা পান করিয়া-করিয়া আমিও এখন পর্য্যন্ত তৃপ্তিশেষ পাইতে পারি নাই; তাই আমার একান্তই শ্রবণোৎসুক্য রহিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পরব্রহ্মে অহম্ভাব ভাবনা করিবার পর প্রথমতঃ আকাশসত্তা, তৎপশ্চাৎ দিক্‌সত্তা, শেষে কালসত্তা ও ভেদসত্তা প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। যৎকালে দেহাদির উপর 'আমি' ইত্যাকার প্রত্যয় হয়, তখন দেহাদিবিরহিত ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই প্রতীত হয় যে, আমি এখানে নাই। এইভাবে যখন দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছিন্নভাব উদিত হয়, তখন আত্মাই ক্রমশঃ দ্বৈধভাব ধারণপূর্ব্বক সমুদিত হইয়া থাকেন। এই যে সকল আকাশময়ী সত্তা, ইহাদের যখন নামরূপাদি ভেদ কল্পনা হয়, তখন উহা আকাশরূপেই থাকে। এইভাবে যখন দিক্ ও কালকল্পনাময় আকাশ তন্মাত্ররূপে অহম্ভাব সম্পন্ন হয়, তখন এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্য-প্রপঞ্চরূপে পরব্রহ্মই প্রতিভাত হন; কিন্তু তিনি যেন ব্রহ্ম নহেন, এই-রূপই তখন হইয়া পড়েন। সেই আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত শান্ত ব্রহ্মই আকাশ হইয়া আপনাকে জীবভাবে ভাবেন, ভাবিয়া নিরাবরণ আকাশই স্বীয় স্বরূপকে বিস্তৃত দৃশ্যাকারে দেখিয়া থাকেন এবং যত দিন না তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয়, সে পর্য্যন্ত পুনরায় আপনাকে যেন অন্যরূপে দেখিতে থাকেন।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

—:*:—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অরিন্দম! অদ্য তুমি যে বিষয় যেরূপে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এতৎপূর্ব্ব জন্মেও মদীয় শিষ্য হইয়া তুমি আমায় এই বিষয়ই জিজ্ঞাসিয়াছিলে। পূর্ব্বতন কল্পে তুমি রাম হইয়াছিলে, আর আমিও বশিষ্ঠ হইয়াছিলাম। কোন একটা কারণে সংসারে তোমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়; তখন তুমি মৎসমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসিয়াছিলে। তখন তোমাতে আমাতে গুরুশিষ্যরূপে বনাভ্যন্তরে এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সেখানে আমি তোমার গুরুরূপে উত্তর করিতেছিলাম, আর আমার উত্তম শিষ্য হইয়া তুমি উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলে। তখন শিষ্য তুমি আমায় সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলে,—ভগবন্! আমার মহা-সংশয় উপস্থিত। ইহা এক্ষণে ছেদন করুন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মহাকল্পে কোন্ কোন্ বস্তু নষ্ট হয়? আর কোন্ কোন্ বস্তুরই বা নাশ নাই?

তখন গুরু [আমি] বলিলেন,—স্বপ্ন দর্শনানন্তর সুষুপ্তিদশায় যখন উপনীত হওয়া যায়, তখন স্বপ্ননগরের যেমন বিনাশ হয়, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও মহাপ্রলয়ে তেমনি নষ্ট হইয়া যায়। পৃথ্বী, পর্ব্বত, দিঙ্‌নিচয়, কাল, ক্রিয়া, সকলই নষ্ট হইয়া যায়; অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। মহাপ্রলয় দিনে এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চের ভোক্তারই যখন অভাব হয়, তখন এই ভোগ্যপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব রহিবে কিরূপে? যে সকল নিখিল কারণের কারণ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি, তাঁহারাও মহাপ্রলয়ের পর থাকেন না, বা তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও স্থায়ী হয় না। কিন্তু চিৎপদার্থ অক্ষয়; এই দৃশ্যাবলী সেই অক্ষয় চিৎপদার্থেরই বিবর্ত্ত; তাই একমাত্র চিদাকাশই অবশিষ্ট আছেন; ইহাই এখন অনুমানগোচর হয়। অধ্যস্ত সৃষ্টি প্রপঞ্চানুভবের হেতুভূত চিদাত্মাই অবশেষে থাকেন, ইহাই তখন স্বীকার্য্য; কেন না, তাঁহার নাশ হইয়া যায়,

এ কথা কহিলে, প্রলয় যে হইল, এ কথার সাক্ষী থাকিবে কে ? সাক্ষিবিহীন প্রলয়ই তো অসম্ভব ব্যাপার।

শিষ্য কহিল—ভগবন্! অসতের সত্তা, আর সতের অসত্তা, ইহা তো সর্ব্বরকমেই অসম্ভব। তাই বলিতেছি, এই বহু বিস্তৃত বিশাল বিদ্যমান জগৎ কোথায় চলিয়া যায় ?

গুরু কহিলেন,—বৎস! সত্য বটে, সতের অসত্তা, আর অসতের সত্তা হয় না, কিন্তু তোমার যাহা সৎ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা তো সৎ নহে। কেন না, ইহার বিনাশ দেখা যায়। রামচন্দ্র! বাস্তবিকই যাহা কখন নাই, এরূপ অভাবরূপ বস্তু তো কুত্রাপি কিছুই নাই। অতএব তাহার আবার বিনাশ কি ? বল দেখি, মৃগতৃষ্ণাজল কোথায় আছে ? আর দ্বিতীয় চন্দ্রই বা কোথায় রহিয়াছে ? অপিচ আকাশেই বা কোথায় প্রকৃত পক্ষে কেশগুচ্ছ আছে? আর ভ্রমানুভবই বা কোথায় সত্য হইয়াছে ? দেখ বৎস! এই সমস্ত দৃশ্যই অলীক ভ্রমমাত্র ; স্বপ্নে যেমন নগর দর্শন হয়, তেমনি ইহা অলীকরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার নাশ না হইবে কেন ? স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্‌ঘটনার এবং জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন ঘটনার যেমন কিছুই থাকে না, সকলই শান্ত হইয়া যায়, তেমনি এই যে কিছু দৃশ্য, সকলই শান্তভাবে অবস্থিত। স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নপুরী কোথায় যায়, তাহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি এই জগদ্দৃশ্য যখন শান্ত হয়, তখন ইহা কোথায় যায়, জানা যায় না।

শিষ্য কহিলেন,—ভগবন্! দৃশ্যের অসত্তাবে কোন্ বস্তু দৃশ্যবেশে কিয়ৎকাল প্রতিভাত হয় ? আর যখন জ্ঞানলাভ হইয়া যায়, তাহার পরই তাহা তৎস্বরূপে প্রতিভাত হয় না কেন ? এই দৃশ্য বিশাল চিদাকাশের ? না,—অন্য কোন বস্তুর রূপ ?

গুরু কহিলেন,—সুনির্ম্মল চিদাকাশ যে শুক্তিরজতবৎ পরিস্ফুরিত হইতেছেন, এ জগৎ তাঁহার তাদৃশ স্ফুরণই। তাহা ছাড়া জগদাখ্যায় আর অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। অনন্ত চিদাকাশ স্বীয় নির্ম্মল স্বভাব পরিত্যাগ করেন না ; না করিয়া যে এরূপভাবে প্রতিভাত হন, এই প্রতিভানেরই নাম সৃষ্টি, আর তথাবিধ প্রতিভানের যে অভাব, তাহারই

নাম ক্ষয় বা প্রলয়। যেমন অবয়বভেদে অবয়বীর আকার ভিন্নবৎ প্রতি-ভাত হয়, তেমনি স্ফুরণ ও অস্ফুরণস্বরূপ সৃষ্টি ও ক্ষয়রূপী আকাশ-চিদাকারে ভিন্নবৎ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। স্বচ্ছ সরোবরাভ্যন্তরে প্রবেশ-ঘটনায় তুমি যেমন বিম্ব প্রতিবিম্ব-ভেদে স্বতন্ত্র হও না, সরোবর প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন একরূপ ছিলে, পরেও তেমনই একরূপ থাক, যিনি সেই যে নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিও সৃষ্টি বা সৃষ্টিক্ষয়দশায় ক্ষয়োদয়-বিরহিতভাবে সেই একইরূপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন স্বপ্নে ও সুষুপ্ত অবস্থায় একমাত্র নিদ্রাই অক্ষয়রূপে বিরাজমান, তেমনি সৃষ্টিই কি, আর প্রলয়ই কি, সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই একমাত্র অব্যয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরিস্ফুরিত হইতেছেন। স্বপ্ন-সমবলোকিত জগৎ যখন জাগ্রদবস্থায় প্রশান্ত হয়, তখন যেমন আর কিছুই থাকে না, তেমনি আমাদের অজ্ঞানাবস্থায় এই দৃশ্যমান জগৎ যখন শান্ত হয়, তখন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের স্বপ্নসমবলোকিত জগৎ বাধিত হইয়া যৎকালে আকাশ হইয়া যায়, তখন তাহার আর অন্যত্র অস্তিত্ব থাকে না। অবশ্য অজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার থাকা-নাথাকা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের যে স্বপ্ন জগৎ, তাহাও অন্যের জীবাকাশে গিয়া অবস্থিত হওয়া আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া ধারণা হয়। কেন না, আমাদের যে বাসনাময় জগৎ, তাহা আমাদেরই জীবাকাশে থাকা সম্ভবপর; অন্যত্র তাহার অস্তিত্ব রহিবে কি জন্য? আমাদের অজ্ঞানাবস্থায় যে জগৎ অনুভূয়মান হয়, তাহা আমাদের জ্ঞানদশায় যদি অন্যের চিদাকাশে লব্ধপ্রবেশ হয়, তবে সেই ব্যক্তির জ্ঞানাবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকাশের স্ফুরণ হয় না বলিয়াই কল্পনা করিতে হয়। তাদৃশ কল্পনাকরণে প্রমাণ কি আছে?

শিষ্য কহিল,—এইরূপে আমাদের চিদাকাশগত বিষয় পরম চিদাকাশে যদিও প্রতিভান প্রাপ্ত হয় না, তথাচ আমার মনে হয়, স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যতীত অন্য জাগ্রদ্ ব্যক্তিও যাদৃশ দৃশ্যজ্ঞানশালী হয়, তেমনি অন্যত্র প্রলয়কালেও পুরুষান্তরে জগদাদি দৃশ্যজ্ঞান নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে।

গুরু কহিলেন,—হে মতিমন্! ভবদুক্ত কথা সত্যই বটে; কিন্তু জগৎ চিত্তের স্বরূপ নয় বলিয়া সকলের নিকট নিশ্চয়ই একরূপ নহে।

চিৎস্বরূপের প্রতিভান যেরূপে হয়, চিদধ্যস্ত জগৎ সেরূপে অবশ্য প্রতিভান প্রাপ্ত হয় না। তবে কথা এই, চিৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাদৃশ ব্যবস্থানুসারেই জগৎস্বরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। সর্ব্বজনসমীপে সমানরূপে জগৎপ্রতিভান হয় না, এই নিমিত্ত বাস্তবিকই উহা কিছুই নহে; উহা সৎ কিছুতেই বলা যায় না; ফলে কিন্তু উহা জীবচিদাকাশেরই বিকাশমাত্র। উহাতে সৎ বা অসৎ বলিয়া জ্ঞান হয় না। যদি চিদাকাশরূপে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে জগৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপেই বিদ্যমান। এ জগৎ দৃশ্যাকারে চিদাকাশ; কিন্তু সর্ব্বত্রই অবিদ্যমান। ব্রহ্ম সদসৎস্বরূপী; তাই জগৎ সদসৎস্বরূপ অবিনশ্বর চিদাকাশ। এই নিমিত্ত চিদাকাশময় জগৎও অবিনশ্বর। সচ্চিদাকাশই সৃষ্টি প্রলয়স্বরূপ; তাহার যতদিন অপরিজ্ঞান থাকে, তত দিনই তাহা দুঃখের হেতুভূত হইয়া দাঁড়ায়। যখন পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাহার পরমশান্তিতেই পর্য্যবসান হয়। সর্ব্বদাই তাহা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান। কিন্তু অজ্ঞজনের নিকট তাহা আছে বলিয়া প্রতিবোধ হয় না। ঘট, পট, মঠ, নদ, নদী, সাগর ভূধর, তৃণ, অগ্নি, প্রভৃতি চরাচর—সকলই সেই চিদাকাশদেবই। ইনি অস্তি, নাস্তি, শূন্য, ক্রিয়া, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, ভাব, অভাব, জনন, মরণ, সম্পদ, বিপদ, ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপে বিরাজমান। যাহা চিদাকাশ নহে, এই চরাচর বিশ্বে এমন পদার্থই নাই। অথচ এই চিদাকাশকেই আদি, মধ্য ও অবসানে অবস্থিত বলা হয়। ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক অবস্থায় অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই এইরূপে ইনি বিদ্যমান, অথচ কুত্রাপি ইঁহার বিদ্যমানতা নাই।

রামচন্দ্র! যদি ব্রহ্মভাবে দেখা যায়, তবে স্বপ্নকালীন সম্বিৎ যেমন নগরাকারে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি যিনি সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্বরূপে বিরাজিত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। তদবস্থায় এক তৃণই কর্ত্তা, ভোক্তা, বিভু; একমাত্র ঘটই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বেশ্বর; একা পটই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বেশ্বর; এক দর্শনই কর্ত্তা, ভোক্তা ও বিভু; এক পর্ব্বতই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বেশ্বর এবং এক মনুষ্যই কর্ত্তা, ভোক্তা ও সর্ব্বপ্রভু হইতে পারে। বলিতে কি, তাহা হইলে প্রত্যেক পদার্থই কর্ত্তা

ভোক্তা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর। কেন না, যত কিছু পদার্থ আছে, সকলই তো সেই অনাদি-অনন্ত অবিনশ্বর ধাতা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই বিভু পরব্রহ্মই স্বকীয় বিভুত্ব-বশতঃ ঘট, পট ও তৃণাদি পদার্থাকারে প্রতি-ভাসিত হইতেছেন। ব্রহ্মের উক্ত বিভুতাবলেই ক্ষয়োদয় নিষ্পন্ন হই-তেছে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থস্বীকারকারীদিগের মতে উক্ত বাহ্য পদার্থই কর্ত্তা, এবং ভোক্তা; একমাত্র বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে বিজ্ঞানই কর্ত্তা ও ভোক্তা; শূন্যবাদীদিগের মতে কর্ত্তা বা ভোক্তা কেহই কোথাও নাই; পাশুপত মতাবলম্বীগণ কোন প্রথিতনামা ঈশ্বরকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করে। ফল কথা, সেই যে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদ, তাহাতে সকলই সম্ভবপর। তাহাতে বিধিনিষেধ কিছুই নাই; আর কি-ই বা তাহাতে না আছে? চিদাকাশ স্বীয় শুদ্ধ আত্মাতেই সেই সেই বাসনার বশে দৃশ্যভাবের প্রকাশ করিয়া নিজেই দ্রষ্টা হইয়া নিজ স্বরূপকে যদিও দর্শন করিতে থাকেন, তথাচ বাস্তব-পক্ষে তিনি অনাময়রূপেই অবস্থান করিতে পারেন। নিখিল জীবের যে নিজ নিজ অনুভবসিদ্ধ পদার্থদৃষ্টি ও বিধিনিষেধদৃষ্টি, তাহা তাহাদের স্ব স্ব সঙ্কল্প, ভাবনা, বাসনা ও কামনানুসারে সম্পন্ন হইয়া তাহাদের স্ব স্ব ব্যবহারে সেই সেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই সমুদায় তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া ধারণা হয় এবং অন্যের নিকট সেই সকল অপ্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্য শশশৃঙ্গবৎ অলীক বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, প্রত্যগাত্মার যেরূপ অনুভব হয়, তিনি সেইরূপ জগদা-কারই ধারণ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! অতীত কল্পে তুমি আমার শিষ্য হইয়া যখন এই সকল শুনিয়াছিলে, তখন তোমার ইহা বোধগম্য হয় নাই। সেই নিমিত্ত তুমি আবার অন্য জগতের ত্রেতাযুগে জন্মিয়াছ এবং আমার নিকট তাহাই আবার জিজ্ঞাসিতেছ। এক্ষণে আমি তোমায় যে জ্ঞানোপদেশ দিলাম, জানিবে—ইহা সংসাররজনীর তিমিরপটল-নাশিনী নিশাকরকর-স্বরূপিণী। এ উপদেশ এখন সকলই তোমার শুনা হইয়াছে। অতএব অধুনা তুমি অজ্ঞান দূরীভূত করিয়াছ, পরমানন্দরূপ অভ্যুদয় অধিগত

হইয়াছ, এবং নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপে বিরাজ করিতেছ; সুতরাং যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরম্পরা তুমি পালন করিতে থাক।

রঘুবর! তুমি অখিল দৃশ্যজাল হইতে মুক্ত হও, বিমল স্বভাবপ্রকাশময় সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মায় তোমার অবস্থিতি হউক। তুমি নিরতিশয় আনন্দময়, শান্ত, আকাশকোষবৎ কান্ত ও তৃষ্ণাবিরহিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে থাক।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের বাক্যাবসান হইবামাত্র নভোমণ্ডলে অমৃতরসপূর্ণ পয়োদবৎ অমর-দুন্দুভি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই সভাপ্রাঙ্গণে তুষারধারাবৎ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাতে দিক্ সকল সহসা শুক্লবর্ণ হইয়া গেল। আকাশ হইতে অবিরলধারে পুষ্প পতনকালে মনে হইতে লাগিল, বুঝি বা উৎসব দেখিবার জন্য পুণ্যলক্ষ্মী সন্ধ্যার ন্যায় অরুণাভ কিঞ্জল্করূপ অঙ্গরাগ ধারণপূর্ব্বক বায়ু-বিধূত শুভ্র শুভ্র কেশররূপ হারগুচ্ছ পরিয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। মনে হইল, প্রলয়কালরূপ কপিকুল-কম্পিত কোষরূপ কল্পতরু হইতে ইতস্তত পতিত প্রভান্বিত নক্ষত্রনিচয় যেন সংহাররুদ্রের তাড়নায় নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। দুন্দুভিধ্বনি সহ পতিত পুষ্পবৃষ্টি তখন তুষারশুভ্র সুন্দর পুষ্পবর্ষণ দ্বারা অখিল সভাস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। দর্শকবৃন্দ সেই পুষ্প বর্ষণ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমশঃ সেই পুষ্পবর্ষণ বিরত হইল। সেই সভাস্থলীর সর্ব্বোচ্চস্থানে বশিষ্ঠদেব সমাসীন; তাঁহার সন্নিকটে মুনিবৃন্দ, তৎসন্নিকটে দশরথ ও রামচন্দ্রাদি রাজকুমারগণ, তদনন্তর মন্ত্রী ও সামন্ত নরপতিগণ; সভার সভ্যগণ সকলেই পতিত পুষ্পরাশি লইয়া বশিষ্ঠপদে অঞ্জলি প্রদানপুরঃসর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের শোক-দুঃখ দূরীভূত হইল।

দশরথ কহিলেন,—মুনিবর! অদ্য বড়ই আশ্চর্য্য হইল। যেমন শরৎকালে পয়োদপটল পর্ব্বতোপরি বিশ্রাম করে, তেমনি অদ্য আমি সংসারাখ্য সুদীর্ঘ কান্তার হইতে বিশ্রাম লাভ করিলাম। এই জীর্ণকান্তারে এতকাল আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, অদ্য অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের চরম সীমায় আমার উপস্থিতি হইল। আপদের অবধি যে কত দূর, তাহাও আমার দেখা হইল। যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, সকলই আমি জানিলাম। পরমপদে আমার বিশ্রাম লাভ ঘটিল।

হে ব্রহ্মন্! ধ্যানকল্পিত আকাশান্তরে চিরবিহারাদির অনুভূতিরূপ ভ্রমসঙ্কল্প প্রভাবে নগরনির্ম্মাণ, স্বপ্নে জগৎ দর্শনানন্তর সেই জগতে কষ্টানুভব, শুক্তিকে রৌপ্যজ্ঞান, স্বপ্নে স্বীয় মৃত্যুদর্শন, পবন ও স্পন্দের ঐক্য প্রতিপাদনকরণ, ইন্দ্রজালক্রিয়ায় পুরী-সন্দর্শন, দ্বিচন্দ্রোদয় ভ্রম, মত্তভাবশে বিবেকনাশে পুরীস্পন্দ অনুভব, কারণ বিনা ভূকম্পদর্শন, এবং আকাশে কেশগুচ্ছাবলোকন, ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেরই অনুভূতিযোগ্য নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনি মদীয় দৃশ্যবুদ্ধি প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্র! ভবৎপ্রসাদাৎ মদীয় মোহাপগম হইয়াছে। আমি পরমপদ অধিগত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি অধুনা বিশুদ্ধ হইয়াছে। আমি সত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। মদীয় নিখিল সন্দেহজাল ছিন্ন হইয়াছে। আমি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছি। নিরাবরণ বিজ্ঞানরূপে আমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীরে সুধাসেক করিলে যাদৃশ সুখোদয় হয়, ভবদীয় সুমধুর বাক্যও অবিকল সেইরূপই সুখপ্রদ হইয়াছে। আমি কৃতকৃত্য ও শান্ত হইলেও আপনার মধুর উপদেশ বারবার স্মরণপূর্ব্বক অত্যধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। অদ্য আমার কোন কার্য্যেই

প্রয়োজন নাই; অকার্য্যেও আবশ্যক নাই। আমি পূর্ব্বে ব্যবহার-দশাতেও যেমন ছিলাম, আজও সেইরূপ আছি। আমার অন্তর বিজ্বর হইয়াছে, আমি বিজ্বরভাবেই অবস্থান করিতেছি। ভবদীয় উপদেশগুণে আমি বিশ্রামোপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ঈদৃশ উপায় আর কোথায় কাহার নিকট পাইব? অন্যবিধ দর্শনই বা আর কোথায় কি আছে? অহো! অদ্য আমি বিশ্রামসুখের অপার অনন্ত পদ অধিগত হইয়াছি। আহা! এই জননমরণাদি নানা অনর্থময় সংসারি-প্রাণীদিগের কি কষ্টকরী দশাই না উপস্থিত হয়! শত্রুই কি, মিত্রই কি, সুজনই কি, আর দুর্জ্জনই কি, কোন কিছুই এখন আর আমার নিকটে নাই। আমার এখন ইহাই বোধ হইয়াছে যে, এই আত্মচৈতন্যই যত কাল দুর্জ্ঞেয় থাকেন, ততকালই এই দুঃখাবহ জগৎস্বরূপে অনুভূয়মান হন। কিন্তু এখন আর সেই আত্ম-চৈতন্য আমার দুর্জ্ঞেয় নাই; তিনি আমার সুজ্ঞেয় হইয়াছেন; তাই শান্ত ও সর্ব্বার্থশোভনরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। ভগবন্! ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুগ্রহ বিনা কে এই আত্মচৈতন্য অবগত হইতে পারে? যদি কোন সেতু বা নৌকার সংঘটন না হয়, তবে বালকের পক্ষে সাগর পার হওয়া সম্ভবপর হয় কি?

লক্ষ্মণ কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের উপদেশপরম্পরা শ্রবণ করিয়া আজ আমার অনেক জন্মান্তরের সংশয়রাশি দূরীভূত হইল। আমি একই কালে যেন শত জন্মের পুণ্য সঞ্চয় প্রাপ্ত হইলাম। অদ্য মদীয় হৃদয়ে বিচারশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেবের উপদেশপর-ম্পরায় প্রবোধিত হওয়ায় হৃদয় আমার এতদূর নির্ব্বৃত ও নির্ম্মল হইয়াছে যে, যেন মনে হইতেছে হৃদয়ের অন্তরালে স্বয়ং শীতরশ্মিই সমুদিত হইয়া-ছেন। হে মুনীন্দ্র! ভবদীয় উপদেশগুণে কি এক নিরতিশয় পূর্ণানন্দ-স্বরূপ সতত আমার প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অহো, কি আশ্চর্য্য! এই প্রকার অপূর্ব্বত্ব হইলেও হতভাগ্য মানবসমাজ মহতের সেবা করে না। তাহারা তাহা না করিয়া সর্ব্বদা কেবল রাগ-দ্বেষ ও জনন-মরণাদি দুঃখ-দশায় নিপতিত হয়।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—অহো, আজ আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন

উপস্থিত! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের মুখে যে জ্ঞানোপদেশ শুনিলাম, তাহাতে আমাদের মহাপুণ্য সঞ্চিত হইল। মনে হইতেছে, যেন আজ আমরা সহস্র গঙ্গাসলিলে স্নান করিয়া উঠিলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—সম্পদ্, বিপদ্, শাস্ত্র, সদুপদেশ, দেশ ও কাল ইত্যাদি যতই থাকুক, আজ আমি সমুদায়েরই চরম সীমা সন্দর্শন করিলাম।

নারদ কহিলেন,—মুনিবর! স্বর্গে বা ভূতলে, বলিতে কি ব্রহ্মলোকেও যাহা কখন আমি শ্রবণ করি নাই, অদ্য ভবন্মুখে সেই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণে মদীয় শ্রুতিযুগল চরিতার্থ ও পবিত্র হইল।

লক্ষ্মণ কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক তমস্তোম অপসারিত করিয়া দিয়া আপনি অধুনা আমাদের নিকট মহান্ অহিমদীধিতির ন্যায় প্রকাশমান হইতেছেন।

শত্রুঘ্ন কহিলেন,—অদ্য আমি পরম পদ পাইয়াছি। নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছি, এখন আমার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, আমি কেবল সুখরূপেই বিরাজ করিতেছি।

দশরথ কহিলেন,—আমাদের জন্মজন্মের অশেষ পুণ্য সঞ্চিত ছিল, তাহারই ফলে অদ্য এই ধীর মুনিবর বশিষ্ঠদেব এক্ষণে মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পুণ্যপূত করিলেন।

বাল্মীকি কহিলেন,—রাজার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যই ঐ কথা কহিলে বশিষ্ঠ তখন এই অতিপূত বাক্যাবলী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! হে রঘুকুলচন্দ্র! যাহা আমি বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর; দেখ, ইতিহাসকথার অবসানে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। সুতরাং তুমিও অদ্য তাহা করিয়া তাঁহাদের অভীষ্টপূরণ কর। তোমা কর্ত্তৃক এই কার্য্য নিষ্পাদিত হইলে, তুমি ইহার অক্ষয় ফল অধিগত হইবে। মোক্ষাবহ কথার অবসানে সাধারণ ব্যক্তিরও সামর্থ্যানুসারে দ্বিজগণের পূজা করা বিধেয়, তাহাতে আপনি এক জন রাজা! ব্রাহ্মণার্চ্চনা তো আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মুনিবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ দূতদ্বারা দশ সহস্র

ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করাইলেন। মথুরা, সৌরাষ্ট্র ও গৌড়দেশীয় আরও দশ সহস্র কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও আনয়ন ও অর্চ্চনান্তে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তিনি অতি বড় জ্ঞানবান্ ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানশালী-দিগকে যথারুচি ভোজ্যান্ন ও দক্ষিণা দান দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং দেব, পিতৃ, সমবেত নৃপতি ও মন্ত্রীদিগকে যথাক্রমে শ্রাদ্ধাদি, যজ্ঞাদি ও রত্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। ভৃত্য, দরিদ্র, অন্ধ ও কৃপণ সর্ব্বশ্রেণীর লোকই তাঁহার নিকট ভোজনাদি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। সেই দিন সংসারের চরম সীমাগত দশরথ রাজা বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে এক মহামহোৎসবের মহদনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে সেই সুমেরুশৈলবৎ শোভাসম্পন্ন অযোধ্যাপুরের মণি-কাঞ্চন-মণ্ডিত রাজ-প্রাসাদে ও তত্রত্য গৃহে গৃহে বিলাসিনী কামিনীরা সানন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। কোথাও অঙ্গনাদল অলঙ্কারবিশেষে সমলঙ্কৃত হইয়া বংশী, বীণা, মুরলী, মুরজ ও বাদল বাজাইতে আরম্ভ করিল। নৃত্যকালে কামিনীকুলের কর-নিকর বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা ইতস্তত চালিত হইতে লাগিল। তাহাতে শূন্য-প্রদেশে পল্লবশ্রেণীর শোভা সম্বর্দ্ধিত হইল। সুন্দর হাস্যকালে তাহাদের বিকসিত দন্তকিরণ চান্দ্রী প্রভাকে লজ্জিত করিল। তাহারা শৃঙ্গারাদি নানা রসের অভিনয়কালে ভূতলে নানারূপ পদ সঞ্চার করিতে লাগিল। অভিনয়কালের নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী বশতঃ কাহারও কাহারও পুষ্পমাল্য হইতে আকাশচ্যুত নক্ষত্রনিকরবৎ সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পসকল পতিত হইল। তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে অনেকের শরীর পাণ্ডুরাভা ধারণ করিল। নৃত্যবেগে কাহারও কাহারও হারগুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইল; তাহাতে জলধারার ন্যায় মুক্তাপঙ্ক্তি ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল এবং হারসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পদ-স্খলন হইতে লাগিল। কোন কোন সুন্দরী নৃত্যকালে বিবিধ বিলোল অলঙ্কারসৌন্দর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক সেই সভাস্থলে যেন বিগ্রহধারী কন্দর্প-দেবকেই উপস্থাপিত করিল। সুরাপায়িগণ উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল। ভোজনপ্রয়াসীরা বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া নানা ভোজ্য বস্তু ভোগে স্বাভিলাষ পূরণ করিল। সেই উৎসবে সমস্ত গৃহভিত্তি সুধাধবলিত পুষ্পমালালঙ্কৃত ও সুগন্ধি ধূম-পরিব্যাপ্ত হইল। তখন রামচন্দ্রের রূপ-

লাবণ্যে সর্ব্বত্র যেন ইন্দুকিরণ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। পরিচারক-পরিচারিকাগণ বসনে, পুষ্পাভরণে ও সুগন্ধি দ্রব্যে বিভূষিত হইয়া চারিদিক্ গন্ধামোদিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। নর্ত্তকীরা একপ্রকার সুগন্ধি চন্দনে নিজ নিজ দেহ পরিলিপ্ত করিয়া সেই সুশোভন সভা-প্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। মহারাজ দশরথ অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার সংসার-অমানিশার অবসান হইল। তিনি সেই উৎসবে সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত মুক্তহস্তে দানকার্য্য করিলেন এবং ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া মহানন্দে দিন যাপন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ওহে আমার প্রধান শিষ্য ভরদ্বাজ! সেই রামচন্দ্রাদি—এইরূপেই জ্ঞাতজ্ঞেয় ও শোক-বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। এইরূপে তুমিও পূর্ণব্রহ্ম অবলম্বন কর, বিষয়াসক্তি-শূন্য হও, প্রশান্তবুদ্ধি হও, এবং জীবন্মুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কমনে যথাসুখে অবস্থান করিতে থাক। হে নিষ্পাপ! বিমূঢ়মতি গাঢ় মোহমগ্ন মানবেরাও যদি রামাদিবৎ ঈদৃশ জ্ঞানোপদেশে বিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হয়, তবে তাহাদিগকেও আর কখন মোহমগ্ন হইতে হয় না। রামচন্দ্রাদি রাজকুমারগণ ও দশরথাদি নরপতিগণ উল্লিখিতরূপেই মহাসত্ত্ব ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। বৎস ভরদ্বাজ! তোমারও বুদ্ধি মুক্তিবিষয়িণী হইয়াছিল। অদ্য এই মোক্ষকথা শ্রবণ করিয়া তুমিও মুক্ত হইলে। এই পুণ্য মোক্ষশাস্ত্র পূর্ণব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিবার ফলে বালকজনও তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারে। যিনি স্বভাবতই প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহার তো কথাই নাই। হে সাধো! মহাপ্রভাবসম্পন্ন রঘুবংশীয়েরা বশিষ্ঠোপদেশে যেরূপে পুণ্য পরম পদ অধিগত হইয়াছেন, সেইরূপে তুমিও পরম পদ লাভ করিয়া শোকশূন্য হইবে। বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গগুণে রঘুনন্দনগণ যেরূপ জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাত হইয়াছেন, অন্যান্য সুধীগণও ঐরূপ সাধুসঙ্গলাভে অপ্রমত্ত হইয়া সাধুসেবা করেন এবং তাঁহাদের নিকট জ্ঞানোপদেশ পাইয়া জ্ঞাতব্য পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অরসিকা বালিকা যৌবনে যেমন রসিকা হইয়া স্বামী সহ একরসবতী হয়, তেমনি অজ্ঞ জনের হৃদয়ে তৃষ্ণারজ্জুবদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি দৃঢ়াসক্তিরূপ গ্রন্থিসকল এই মোক্ষশাস্ত্রের সমালোচনায় পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দরসে মিলিয়া যায়। যে সকল শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী এই মহামহিমমণ্ডিত মোক্ষশাস্ত্রের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, সংসারে তাঁহাদিগকে আর কখনই আসিতে হয় না। বৎস! এ বিষয়ে বেশী বলা অনাবশ্যক। যে সকল সাধু পণ্ডিত বহু শাস্ত্রপারদর্শী,

তাঁহারা গুরুপরম্পরায় এই মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া উপদেশাদি দ্বারা অন্যের নিকট প্রচার করিবেন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হইবে না। তাঁহারা একেবারেই মুক্ত হইয়া যাইবেন। অন্যথা যদি গুরু-পরম্পরা ক্রমে অধ্যয়ন না করা হয়, তবে ইহা হইতে কোনই ফল পাওয়া যাইবে না। অর্থাবগতি না হইলেও, যাহারা অন্য দ্বারা মাত্র এই মোক্ষ-শাস্ত্র পড়াইয়া বা লিখাইয়া প্রচার করিবে, কিম্বা বৃত্তি বিধানপূর্ব্বক ভদ্র-জনসমাজে ইহার বক্তা বা ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্থাপন করিবে, তাহারা কামনাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভান্তে পুনঃপুন স্বর্গে প্রয়াণ করিবে। নিষ্কাম হইয়া উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুইবার জীবন্মুক্ত অবস্থায় জন্মলাভান্তে তৃতীয় জন্মে একেবারে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পুরাকালে অচিন্ত্যমূর্ত্তি ব্রহ্মা এই মোক্ষশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিচারালোচনা-পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। যে সুধীজন এই মোক্ষশাস্ত্র পাঠ করিবেন, পাঠ সমাপনের পর তিনি সযত্নে উৎকৃষ্ট গৃহ ও অভিলষিত অন্নপানাদি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবেন। স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে সেই সকল পূজিত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি প্রদান করিতে হইবে। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এই সাধুকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তিনি নিশ্চিতই এই শাস্ত্রানুমোদিত ফল প্রাপ্ত হইবেন। ভরদ্বাজ! এই মোক্ষশাস্ত্র বিবিধ উপাখ্যান-পরিপূর্ণ, দৃষ্টান্ত ও যুক্তিগর্ভ এবং ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রতিপাদক; তোমায় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্তই ইহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহা শ্রবণে তুমি জীবন্মুক্ত হও, এবং মাত্র লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ জ্ঞান ও তপস্যার ফলশালী প্রারব্ধ সৎ-কর্ম্মের ফলভূত অক্ষয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত দেহশালী হইয়া অবস্থান কর, অন্তে একেবারে পূর্ণা-নন্দ লাভ করিও।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত। ২১৫ ॥

ষোড়শাধিক দ্বিশততম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—হে রাজন্! বশিষ্ঠ মুনি রামচন্দ্রাদির নিকট এবং অগস্ত্য মুনি সুতীক্ষ্ণের প্রতি যে সুমধুর মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, আমি এক্ষণে তাহাই আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই মদুপদিষ্ট শাস্ত্রীয় তত্ত্বপথে থাকিয়া নিশ্চয়ই আপনি পরমপদ অধিগত হইবেন।

রাজা কহিলেন,—ভগবন্! ভবদীয় কৃপাদৃষ্টি ভববন্ধননাশিনী; আপনি মৎপ্রতি সেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাই অদ্য আমি ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।

দেবদূত কহিলেন,—সেই রাজা এই কথা কহিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে আমার দিকে তাকাইলেন এবং মধুর বাক্যে আমায় বলিলেন,—ওহে দেবদূত! তোমায় নমস্কার করি। হে বিভো! তোমার মঙ্গল হউক। সাধুগণ সাপ্তপদী মৈত্রীর নির্দ্দেশ করেন; আপনার দ্বারা অদ্য তাহা যথার্থ হইল। ফল কথা, আপনি আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। এক্ষণে আপনি নিজ নিকেতনে প্রস্থান করুন। আমি মোক্ষশাস্ত্র শুনিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আমার পরমানন্দ হইল। আমি যে বিষয় শুনিলাম, ইহা ভাবনা করিতে করিতে এতক্ষণে আমার সর্ব্ব-সন্তাপ বিদূরিত হইল। আমি অধুনা বিজ্বর হইয়া অবস্থান করিব। হে ভদ্রে, সুরুচে! রাজার এই কথা শ্রবণে এবং তাঁহার বিনয়াদি গুণ-গ্রাম দর্শনে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিল। এ হেন অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানসার কথা আর কখন আমি শুনি নাই। আমার সৌভাগ্য ছিল; তাই সৎসঙ্গলাভে আমার ইহা শ্রুত হইল। আমি যেন সুধাপানেই পরি-তৃপ্ত হইলাম, এইরূপই আমার মনে হইতে লাগিল। তদনন্তর বাল্মীকির সহিত বিদায়-সম্ভাষণ হইয়া গেলে আপনার নিকট আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। হে পুণ্যশীলে! আপনি মৎসমীপে যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এতক্ষণে সেই সকলই আপনার নিকট কহিলাম। আর কেন, এখন অনুমতি দিন, আমি মহেন্দ্রভবনে প্রয়াণ করি।

অপ্সরা সুরুচি কহিলেন,—হে মহাভাগ দেবদূত! আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি যে পরমার্থ-জ্ঞান-কথা কহিয়াছেন, তাহা শুনিয়া যৎপরংনাস্তি আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার শোকতাপ চলিয়া গিয়াছে। আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এখন বিজ্বরভাবে বিরাজ করিব। আপনার কুশল হউক; আপনি মহেন্দ্রভবনে প্রয়াণ করুন।

অগ্নিবেশ্য কহিলেন,—অনন্তর সেই বরবর্ণিনী সুরুচি উপদেশলব্ধ তথাবিধ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয় অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিতে করিতে হিমাচলোপরিস্থিত সেই গন্ধমাদনশৈলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, হে বৎস! এক্ষণে বশিষ্ঠোপদিষ্ট বিষয় শুনিলে তো? কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম, অথবা জ্ঞানকর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ কি না, তাহা এক্ষণে তুমি বুঝিতে পারিলে তো? এখন তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর।

কারুণ্য কহিলেন,—পিতঃ! আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া এক্ষণে অতীত বিষয়ের স্মৃতি ও বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ মৎসমীপে জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ ও বন্ধ্যার পুত্রসন্তানদর্শনের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। আমার নিকট এই সাংসারিকী স্থিতি এখন মরুভূমিতে মরীচিকাজলবৎ প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে আমি কর্ম্ম করি, আর নাই করি, কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই। আমি এখন হইতে রাগাদিবৎ নিরিচ্ছ হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার সমাধা করিতে থাকি। ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মত্যাগে প্রয়োজন কি?

অগস্তি কহিলেন,—অগ্নিবেশ্যনন্দন কৃতী কারুণ্য এই কথা কহিয়া যথাকালে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহ সমাধা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ স্নান, দান, জপ, হোম, ইত্যাদি কর্ম্মসমুদায়ের মধ্যে যখন যেটী উপস্থিত হইতে লাগিল, তখনই তাহা করিতে লাগিলেন।

ওহে সুতীক্ষ্ণ! যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর কর্ম্ম করা হয়, তবে আবার সংসারবন্ধন হইবে, এপ্রকার সন্দেহ করা কোন প্রকারেই সমুচিত নহে।

লোকে এরূপ সন্দেহ করে বলিয়াই স্বার্থভ্রষ্ট হয়; সংশয়াকুল হইয়াই লোকনষ্ট হইয়া থাকে।

মুনিবর অগস্তির নিকট অখিল সাংসারিক বিষয়ের ঐক্যপ্রতিপাদক জ্ঞানোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এখন আমার অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য নষ্ট হইয়াছে। আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন দীপালোকের সাহায্যবশেই নাট্যশালায় নটনর্ত্তকাদির কার্য্যপরম্পরা প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই নিষ্পন্ন হয় না, তেমনি যিনি সেই সর্ব্বসাক্ষী নিত্যপ্রকাশ নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা, তাঁহারই প্রকাশাশ্রয়ে সমগ্র ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কনক যেমন কটককুণ্ডলাদি বিবিধাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি যাঁহা হইতে জলে আবর্ত্ততরঙ্গাদিবৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের পরিস্ফুরণ, সেই পরমাত্মাই এই সমগ্র জগৎ, সেই পরমাত্মা হইতে কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে। সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মে এই অখিল দৃশ্য পূর্ণস্বরূপেই বিরাজমান। তখন হইতে আমি ভবদুপদেশানুসারেই যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুসরণ করি; বস্তুতঃ সাধুর উপদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহার আছে?

হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহে আমি অখিল জ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয়াছি; তাই আপনাকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি। শিষ্য যাহাতে গুরুর ঋণমুক্ত হইতে পারে, এমন আর কোন্ কর্ম্ম বিদ্যমান? ফলে, কায়মনোবাক্যে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করাই শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই জন্য আমি কায়মনোবাক্যে ভবৎসমীপে আত্মনিবেদনই করিতেছি। আমি ভবদীয় চিরদাস হইয়াই রহিলাম। অক্ষম শিষ্যেরা আর কি করিতে পারিবে? হে প্রভো! আমি ভবদনুগ্রহে অখিল সংসারসাগর পার হইয়া সমগ্র বিশ্বব্যাপী পূর্ণানন্দস্বরূপে বিরাজ করিতেছি। মদীয় সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

যিনি অধিকারী মুক্তাত্মাদিগের করতলগত অপরোক্ষ বস্তুরূপে নিরূপিত, আমি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মপদে নমস্কার করি। যিনি 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের লক্ষ্য, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে অতিদূরে

অবস্থিত, যিনি কেবল জ্ঞান ও সাক্ষিস্বরূপ, সেই নিখিল ভাবাতীত সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণবিরহিত নিত্য নির্ম্মল ব্রহ্মরূপী ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে আমরা নমস্কার করিতেছি।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১৬

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
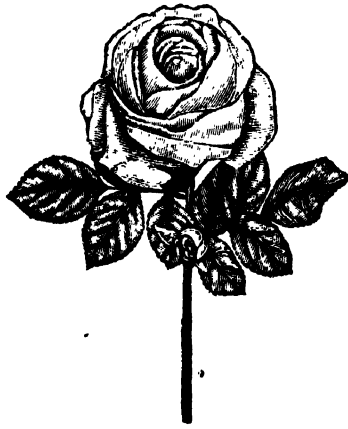
উপসংহার।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের শুভ বৈশাখে আমাদের পরমারাধ্য পিতাঠাকুর ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত মূল, টীকা এবং তাহার অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থখানি ছয়টী প্রকরণে বিভক্ত, যথা,—বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ। পিতাঠাকুর মহাশয় বৈরাগ্য প্রকরণ সমাপনপূর্ব্বক মুমুক্ষুর কতকাংশ মাত্র প্রকাশ করেন এবং সন ১৩১১ সালের প্রারম্ভেই ইহার প্রকাশকার্য্য নানা কারণবশত স্থগিত রাখিতে বাধ্য হয়েন। ১ম কারণ —গ্রাহক ভদ্র মহোদয়গণ আপত্তি করেন যে, যোগবাশিষ্ঠের মূল, টীকা, সাধারণের বোধগম্য নহে। এ হেতু সর্ব্বসাধারণের নিকট মূল-টীকার সমাদর হয় নাই। ২য় কারণ—মূল, টীকা ও অনুবাদ প্রকাশ নিমিত্ত মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়িয়াছিল, সে নিমিত্ত গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প মাত্র তালিকাভুক্ত হয়,—যদ্দ্বারা ইহার প্রকাশকার্য্য সঙ্কুলান হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ৩য় কারণ—পিতাঠাকুর মহাশয়ের বার্দ্ধক্যবশতঃ ও শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন মানসিক শক্তি পূর্ব্বের মত না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে তিনি ইহার প্রকাশকার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস না পাইয়া ক্ষান্ত হয়েন।

অতঃপর ১৩১২ সালের ১৮ই ভাদ্র নিশাবসানে তাঁহার পার্থিব দেহের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ২ বৎসররে কিঞ্চিদধিককাল পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগবাশিষ্ঠের পুনঃপ্রকাশের নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করিতে পারি নাই। ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে আমরা ইহার পুনঃ-প্রচারের চেষ্টা করি এবং তদবধি এই চারি বৎসর কাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের

অপার কৃপায় আমাদের আরাধ্য দেবতার চিরসঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী থাকিয়া সম্পূর্ণ যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদাংশমাত্র প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে অনুবাদিত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দের সুবিচারসাপেক্ষ। তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অনুবাদকালে মূলের একটী ছত্রও যাহাতে পরিত্যক্ত না হয় এবং উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশ যাহাতে সন্নিবেশিত না হয়, তদ্বিষয়ে যতদূর সাধ্য লক্ষ্য রাখিতে তিল-মাত্র ত্রুটি হয় নাই; বাঙ্গলা ভাষার মাধুর্য্য ও লালিত্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া পড়ে, সে বিষয়েও সাধ্যানুসারে যত্ন এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ পরিলক্ষিত হয়, সে গুলির নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমাদেরও ইচ্ছা ছিল যে, পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশ করি; কিন্তু যে কার্য্যে তাঁহাকে বিফলমনোরথ দেখিয়াছি,—তাহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই। ঐরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি আমাদের সুধী গ্রাহকগণের নিকট হইতে কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীভগ-বান্‌কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই যে, আমরা কেবল অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট হইতে আশাতীত কৃপা পাই-য়াছি। এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই গ্রন্থের সটীক মূল সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে তত বেশী ক্লেশ পাইতে হয় নাই। কারণ বোম্বাই সহর হইতে আজ কাল যে সমস্ত মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, সকলেরই বিশ্বাস, তাহা বিশুদ্ধরূপেই প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য আমরা একখানি বোম্বাই সংস্করণ সংগ্রহ করি এবং আরও কয়েকখানি অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, এই বিরাট গ্রন্থের অনু-বাদে ভূকৈলাসাধিপতি সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের

বিধায়, তিনি ইহার সম্যক্ অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। পানিহাটী নিবাসী ৺প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকালয়ে আমরা একখানি হস্তলিখিত বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণের কিয়ৎ অংশ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাও সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করি নাই। পূজ্যপাদ ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে পর্য্যন্ত ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও সংগ্রহ করিতে অবহেলা করি নাই—তাহার পর আরও দুই একখানি পুস্তকের অনুবাদ যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অনুবাদ সহ মিলাইতে ত্রুটি হয় নাই। একটী সংবাদ পত্রিকালয় হইতে প্রকাশিত অনুবাদ ব্যতীত অদ্যাবধি অন্য কাহারও প্রকাশিত সম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

এ গ্রন্থ অনুবাদব্যাপারে আমাদের পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থপ্রমুখ বহুবিজ্ঞ মহোদয়গণের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তাঁহাদিগকে পুনঃপুন প্রণাম জানাইতেছি।

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও উক্ত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ এই গ্রন্থ প্রকাশকালীন আমাদিগকে উৎসাহ দেওয়ায় আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের এ দেশে মহাভারত ও রামায়ণ যেরূপ আবাল বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত, সেরূপ অন্য কোন পুরাণ পরিচিত কি না সন্দেহ। উক্ত পুরাণদ্বয়ের এরূপ বহুল প্রচারকল্পে যদি পূজ্যপাদ কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস দণ্ডায়মান না হইতেন, তবে তৎপক্ষে এত অধিক আশা করা যাইতে পারিত না। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অনেক ভদ্র যুবক সন্তানের নিকট পরিচিত কি না বলিতে পারি না। যাহাতে এ গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপরিচিত হয়, এই মানসে আমরা এই বিরাট গ্রন্থ মাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য হই—বিশেষতঃ এরূপ বিরাট

গ্রন্থ এককালীন প্রকাশ করিতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক এবং সেই বিরাট গ্রন্থ এককালীন অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে তত সুবিধাকর নহে। তাই আমরা মাসিক মূল্যস্বরূপ যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া চারিবৎসর কাল নিয়মিতরূপে প্রকাশপূর্ব্বক আজ আমাদের উৎসাহদাতা গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। অলমিতি পল্লবিতেন।

কলিকাতা, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩১৮,
মহাভারত কার্য্যালয়।

প্রকাশক
জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স